মাসিক সমালোচনী পত্রিকা।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত

সংখ্যা-১-১২
-১২৮৬

তৃতীয় খণ্ড

১৮০১ শক।

কলিকাতা।

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ৩৷৷০ মাশুল সমেত ৪ টাকা।।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
ইংলণ্ডীয় প্রজাতন্ত্র ...	৩২৩।
উদয়নাচার্য্য	১৯৩, ২৪১, ২৮৯।
কাতন্ত্রজীবনী	১৭, ৬৫।
কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল	৩৬৮, ৩৮৫, ৪৩৩।
খড়্গ পরিণয়	৫৪৯।
গরবিনী	৭৭।
গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব ...	৫৬৪।
চ্যাটার্টণ বালক-কবি	১৩৮।
ছিন্নমুকুল	১, ৬০, ৯৭, ১৪৮; ২২৫, ২৬৯, ৩০৪, ৩৩৭।
জীব রহস্য	২৯।
জ্যামিতির নূতন সংস্করণ	৩৭৭, ৪১৬।
টঙ্ক পাষাণ বিদারণ যন্ত্র	১৪৫।
দুর্গসিংহ ও ময়ূরভট্ট	৫৬২।
নর্ম্মানজাতি ও আঙ্গ্লোনর্ম্মান সাহিত্য ...	৪৯।
নন্দনকাননে	৯৪।
নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা	১০৭, ১৭৭।
নিন্দা-তত্ত্ব	২৭৬।
প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম	২৫, ৭৮, ১০৩, ২০২, ২৬৫, ৩৬৫।
প্রতিমা বিসর্জ্জন	২৮৬।
প্রণয়ের আভাস ও অবসান	২৩১।
প্রেম মরীচিকা	৫১২।
পুরুষোত্তম	৫০৬।
বঙ্গ সাহিত্য	৩৫, ১৩১, ১৭০।
বঙ্গীয় গ্রন্থকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	১৯০।
বুদ্ধদেবের স্বপ্ন তত্ত্ব	৫৩২।
ভানুসিংহের কবিতা ...	৩৪।
ভগ্নতরী	১২৩।
ভাসিয়ে দে তরী	২২৫।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভক্তি	৪২৫, ৪৪৫।
ভারতী	৪৬৪, ৪৮৭।
য়ুরোপ-যাত্রী	৪২, ৮৭, ১১৯, ১৫৯, ২১৩, ২৫৯, ২৬৯, ৩৪৮, ৩৯৪, ৫১৩।
শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা	৪৭৩, ৪৯৫ ৫৩৫।
সুখ-দুঃখ	৫৪১।
সৌন্দর্য্যতত্ত্ব	৯, ৭০।
সুখের প্রেম	১৬।
সংক্ষিপ্ত সমালোচনা	৪৮, ৮৬, ২৮৮, ৩৩৬।
সামুদ্রিকানুমিতি বিদ্যা	৮২।
সাধের কুসুম কলি	১৬৮।
সম্পাদকের বৈঠক	৩১৭।
সাধের ভাষাণ	৪১১।
সারদা মঙ্গল	৪৫৪।
সরস্বতী আহ্বান	৪৮৯।
সেক্সপীয়রের নায়িকা-কল্পনা	৫২৫ ৫৭৪।
হৃদয় মন্থন	৩৩১, ৪২১।

ভারতী.

ছিন্নমুকুল।

বিংশ পরিচ্ছেদ—গুপ্ত শত্রু।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রমোদ পদব্রজে যামিনীনাথের বাটী-অভিমুখে আসিতেছিলেন। ক্রমে আসিতে আসিতে চৌরঙ্গির দীপ-মালা শোভিত পথ ছাড়াইয়া ভবানীপুরে পদার্পণ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যাও অতীত হইল। রজনী অন্ধকার, রাস্তা-ঘাট দীপমালাতে উজ্জ্বলিত নাই, পথপার্শ্বস্থ বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন, পথ-সকল অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবল আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘে দুই একটি নক্ষত্র হাসিতেছিল, নীচে আঁধারময় অট্টালিকা-প্রাচীরে মাঝে মাঝে দুই একটি খদ্যোত জ্বলিতেছিল, এবং অট্টালিকা-শ্রেণীর মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া গৃহ-মধ্যস্থ আলোক দৃষ্ট হইতেছিল। সেই অন্ধকারময় পথে কখনো কখনো দুই একটি গ্রাম্য কুক্কুর চীৎকার করিয়া প্রমোদের পথ-পার্শ্ব দিয়া দৌড়িয়া যাইতেছিল, কখনো বা মাথার উপর দিয়া কোন নিশাচর পক্ষী কর্কশ রবে চিন্তামগ্ন প্রমোদের ক্ষণেকের জন্য চিন্তা ভঙ্গ করিয়া উড়িতেছিল। পথে মাঝে মাঝে দুটি একটি লোক চলিতেছিল, অন্ধকারে তাহাদের স্পষ্ট চেনা যায় না, প্রমোদও তাহাদের চিনিতে বড় একটা উৎসুক ছিলেন না। তিনি সেই অন্ধকারময়ী স্নিগ্ধ রজনীতে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনেই চলিতেছিলেন। সহসা তাঁহার সেই চিন্তা ভঙ্গ হইল, সহসা পিস্তলের বিকট শব্দে চমকিত হইয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি দুই জন মনুষ্য তাঁহার পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া চলিয়া গেল। তাহাতে তাঁহার স্পষ্ট মনে হইল, তাঁহার প্রতিই পিস্তল লক্ষ্য করিয়া তাহারা পলাইল। যদিও তাহারা কোথায় গেল অন্ধকারে স্পষ্ট লক্ষিত হইল না, কিন্তু প্রমোদের মনে হইল একটি অট্টালিকা-প্রাচীরে তাহারা মিশাইয়া গেল। তিনি চৌকিদার চৌকিদার করিয়া হাঁকিয়া উঠিলেন। চৌকিদার তখন মোড়ের মাথায় একটি রেল ঠেসান দিয়া দিব্য ঘুমের ঘোরে সরজন্ সাহেবের উগ্রমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখিতেছিল। প্রমোদে আসিয়া তাহাকে ধাক্কা মারাতে সে ত্রস্তে

উঠিয়াই দীর্ঘ সেলাম ঠুকিয়া চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বীর-বিক্রমে লাঠি বাগাইয়া ধরিল। প্রমোদ বলিলেন "সেখ্‌তা-নেই কোন্ হাম্‌কো মার্‌নেকো ওয়াস্তে পিস্তল চালায়া, আওর তোম হিঁয়া নিদ্ যাতা।"

চৌকিদার তখন সদর্পে বলিল "নেই বাবু সাব, ও কোই লেড়কা পট্‌কা চালাতা, কুছ ডর নেই।"

প্র। "নেই নেই ও পিস্তলকা আওয়াজ —হম্ শুনা—আবি জলদি হামারা সাথ আও, ও বড়া কোঠীকা অন্দর ও পিস্তল-ওয়ালা ভাগ্‌কে গিয়া, জলদি হামারা সাথ আও"

চৌ। "চলিয়ে সাব, লেকেন ও কোঠীকা ভিতর এক—তোবা তোবা আল্লা আল্লা—আপদো চলিয়ে"

"জলদি হামারা সাথ আও" বলিয়া প্রমোদ ঊর্দ্ধ শ্বাসে ছুটিলেন। চৌকিদারও চলিল, কিন্তু "কোন হ্যায়রে, কোন হ্যায়রে" করিতে করিতে দিঙ্‌মণ্ডল ফাটাইয়া দিয়া মৃদু পদে প্রমোদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। যে প্রাচীরের কাছে তাহারা বিদায় হইয়া গিয়াছিল, প্রমোদ সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া দেখিলেন যে স্থানটি একটি অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগ। সেখানে আসিয়া প্রমোদ কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু আবার সহসা তখনি পিস্তলের শব্দ হইল, তখনি কিছু দূরে আবার দুই ব্যক্তিকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিলেন। পিস্তলের গুলি ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অর্দ্ধ হস্ত পশ্চাৎ দিয়া গিয়া সেই প্রাচীরে সজোরে লাগিল। পিস্তল যে তাঁহার উদ্দেশেই ছোড়া হইতেছে এবার আর তাহাতে তাঁহার বিন্দু মাত্রও সন্দেহ রহিল না। প্রমোদ সেই লক্ষ্য দেখিয়া সহসা আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া আবার তাহাদের অনুসরণে চলিলেন। ইতস্ততঃ করতঃ কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবার সেই অট্টালিকার পশ্চাৎভাগে আসিয়া অন্বেষণ করিলেন, এবারেও সেখানে কাহাকে না পাইয়া তিনি ঘুরিয়া অট্টালিকার সদর দ্বারে আসিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন দ্বার মধ্যে আলোক জ্বলিতেছে এবং এক জন দ্বারবান সেই দ্বার মধ্যে বসিয়া আছে। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখনি এই বাটী মধ্যে কেহ হঠাৎ প্রবেশ করিয়াছে কি না, কিম্বা এই দ্বারের নিকট দিয়া পিস্তলহস্তে কাহাকেও পলাইতে দেখিয়াছ কি না। দ্বারবান বলিল "না কিছুই দেখি নাই" তখন প্রমোদ সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দ্বারে পদার্পণ করিলেন। এই সময় দেখিলেন অট্টালিকার আর এক দ্বার দিয়া এক ব্যক্তি ত্রস্তে বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া অমনি উপরে চলিয়া গেল। যাইবার সময় একটি দীপালোক মুখে পড়ায় প্রমোদ হিরণকুমারকে চিনিতে পারিলেন। প্রমোদ দেখিলেন হিরণের হস্তে পিস্তল, বেশ ভূষা ছিন্নভিন্ন, এবং ব্যস্তভাবে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছেন। এই অবস্থায় পিস্তল হস্তে হিরণকে বাড়ী প্রবেশ

করিতে দেখিয়া সহসা প্রমোদ চমকিয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার একটি সন্দেহের ভাব মনে আসিল! ভাবিলেন "একি! হিরণের হস্তে পিস্তল! হিরণের এই ছিন্ন ভিন্ন বেশ! তবে কি হিরণই আমাকে মারিতে সঙ্কল্প করিয়াছিল?" আবার ভাবিলেন "কিন্তু তাহা কি করিয়া হইবে? তাহা অসম্ভব। হিরণ আমাকে মারিতে যাইবে কেন? আমাকে মারিয়া তাহার কি লাভ? আমি জানি হিরণ আমাকে দেখিতে পারে না, আমি জানি সেই জন্যই হিরণ আমাকে অন্যায় দোষী ভাবিয়া মকদ্দমায় দণ্ড দিয়াছে। কিন্তু দেখিতে পারে না বলিয়াই বা আমাকে মারিতে সঙ্কল্প করিবে কেন? এই আমিতো হিরণকে দেখিতে পারি না, উহাকে দেখিলেই তো আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় কিন্তু কই উহার অনিষ্ট-চিন্তাও তো আমার কখনো মনে আসে না, আর কেবল আমাকে দেখিতে পারে না বলিয়া হিরণ ঐরূপ ভয়ানক কার্য্যে ব্রতী হইবে? না না ইহা হইতেই পারে না। বিনা কারণে এরূপ মনে আসাই আমার অন্যায়, এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিলে আমারি মন নীচ হইবে। কিন্তু একটা কথা—এই সময় হিরণকে পিস্তলহস্তে দেখা কি আশ্চর্য্য নয়! এরূপ অবস্থায় কার না সন্দেহ হয়? যখনি আমি বাটীর পশ্চাৎ দিকে আমার প্রতি পিস্তল ছুড়িতে দেখিলাম, তাহারি কিছু পরে বাটীর মধ্যে হিরণ পিস্তলহস্তে ঢুকিল—ইহাতে কি হিরণকে দোষী মনে হয় না? নহিলে এই সময়ে হিরণের পিস্তলহস্তে থাকিবার আর কি কারণ হইতে পারে? কিন্তু তাই বা কেন? তাহার পিস্তলহস্তে থাকিবার আর সম্প্রতি কারণ থাকিতে পারে। সে কারণ আমি জানি না বলিয়া, এবং অবস্থাটা একটু সন্দেহ-জনক তাহা বলিয়াই কি সে বিনা কারণে দোষী? এক জন ছোট লোক হইলে বুঝিতাম আমার ঘড়ী লইবার জন্য, আমার টাকা লইবার জন্য আমাকে মারিতে গিয়াছিল, কিন্তু আর যাই হোক হিরণ ভদ্রলোক, তাহার কিছু চুরীর অভিপ্রায় হইতে পারে না। আর তাহা না হইলে ইহার আর কোন কারণই নাই। তবে অকারণে সে আমায় মারিতে যাইবে কেন? তবে এইটুক স্বীকার করি ইহাতে একজনের ঘা দাঁ লাগিতে পারে বটে। কিন্তু আমি আর এরূপ নীচ ভাবে মনকে কলঙ্কিত করিব না, যাহার কোন কারণই নাই তাহা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যদিও অসম্ভব তথাপি এরূপ স্থলে হিরণের হস্তে পিস্তল অতিশয় আশ্চর্য্য! আসল কথা আমিতো ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, দেখি যামিনীনাথ কি বলেন।" প্রমোদ যাহা দেখিলেন তাহাতে একবার সন্দেহে একবার বিশ্বাসে তাঁহার মন আন্দোলিত হইতে লাগিল, যাহা দেখিলেন তাহা তাঁহার নিকট হেঁয়ালি স্বরূপ বোধ হইল। তিনি নিজে সে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে অপারগ হইয়া যামিনীনাথকে বলিতে দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। রাস্তায় পদার্পণ করিলে চৌকিদারের সহিত সাক্ষাৎ

হইল। তাহার অনুবর্ত্তী হয় নাই বলিয়া প্রমোদ তাঁহাকে ধমকাইতে লাগিলেন। ধমক খাইয়া সে বলিল সে তাঁহাকেই এতক্ষণ খুঁজিতেছিল, তিনি দৌড়িয়া কোথায় গেলেন, সে বুঝিতে পারে নাই বলিয়া পশ্চাৎ যাইতে অসমর্থ হইয়াছিল।' অন্ধকারে আর এখন সেই পলাতক ব্যক্তিদের ধরা অসম্ভব জ্ঞানে চৌকিদারকে তাহা বুঝাইয়া তিনিও সে আশা ত্যাগ পূর্ব্বক আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত ভাবে ভাবিতে ভাবিতে আবার যামিনীনাথের বাড়ীর দিকে চলিলেন। তিনি কখন কাহার কি এমন অনিষ্ট করিয়াছেন যে সে তাঁহাকে বধ করিতে পারে ইহা তিনি কোন মতে খুঁজিয়া পাইলেন না—তাঁহার এমন কে গুপ্ত শত্রু আছে যে এই রাত্রে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল তিনি কোন মতে তাহা বাহির করিতে কৃতকার্য্য না হইয়া ভাবিতে ভাবিতে যামিনীর বাটীতে আসিয়া পহুছিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র ব্যগ্র ভাবে যামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন "একি,তুমি যে আজ এত দেরিতে আসিলে? তোমার ৯টার সময় আসিবার কথা ছিল, প্রায় দুঘণ্টা দেরি হইয়াছে, এখন বেধ এগারটা?' তখন প্রমোদ প্রথমেই পথের সমস্ত বিবরণ বলিলেন। যামিনী শুনিয়া কহিলেন " কি ভয়ানক।" বলিয়াই হঠাৎ যামিনীর মনে আর একটি অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার ভাব উদয় হইল, তিনি এই সময় তাহার বিলক্ষণ সুবিধা দেখিলেন। তিনি এক বাণে দুইটি পাখী মারিতে স্থির করিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের ঘটনা হইতে যামিনী হিরণের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, হিরণই সন্ন্যাসীর নিকট তাঁহাকে দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন,হিরণই যামিনীর সহিত মীরজার বিবাহে বাধা দিয়া প্রমোদের পক্ষ লইয়াছিলেন, যামিনী তাঁহার কর্ম্মের প্রতিফল দিবার এখন উত্তম সুযোগ দেখিলেন। প্রমোদের কথায় যামিনী লাফাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নেত্রে বলিয়া উঠিলেন "হিরণকে তুমি লণ্ডভণ্ড বেশে পিস্তলহস্তে হঠাৎ দ্বারে প্রবেশ করিতে দেখেছ? এতে আমার চক্ষের সামনে আসল ব্যাপার সকল খুলে গেল, আমি এখন সকল বুঝতে পারছি' প্রমোদ সবিস্ময়ে বলিলেন "কি! তোমার কথাতো আমি কিছু বুঝতে পারিতেছিনে, তোমারও কি আমার মত হঠাৎ সন্দেহ হইতেছে? "যামিনী তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন "সদর দ্বারের পরিবর্ত্তে অন্য দ্বার দিয়া তাঁহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেখেছিলে?"

প্র। "হাঁ।"

যা। "বেশভূষা এলোথেলো—চঞ্চল পদে বাড়ী এল? যেন কোন মহাব্যাপার করে উপস্থিত?'

প্র। "মহাব্যাপারই বটে!'

যা। "ঠিক ঠিক, তবেই হয়েছে, আর কোন ভুল নেই—সেই পাষণ্ডেরই এই কাজ' প্রমোদ আবার বলিলেন "কি কাজ? আমাকে মারিতে যাওয়া? কিন্তু—কিন্তু তাহার কারণ নাই—"

যা। "কারণ নাই কি। এই অজনা

ঘাতকের কাজ তাহারি।" প্রমোদ তখন শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন "হিরণকে আমি যতই ঘৃণা করিনা কেন, তাহাকে এরূপ কার্য্যে পামর মনে করিতে পারি না। বিশেষতঃ তাহাতে তার লাভ কি? হঠাৎ তাহাকে দোষী মনে হয় বটে, তবুও আমার কেবল সন্দেহ ছাড়া উহা সত্য মনে হয় না, না, না যাহার কারণ নাই তাহা অসম্ভব।"

যা। 'তুমি জাননা বলিয়া এ কথা বলিতেছ। হিরণ তোমাকে কতদূর শত্রু মনে করে জানিলে একথা বলিতে না। তুমি জান, হিরণ সন্ন্যাসীর কোন সম্পর্কীয় ব্যক্তি?'

প্র। "না।"

যা। "নীরজাকে লইয়া যাইবার সময় সন্ন্যাসী হিরণকে সঙ্গে আনেন, সেই সময় কথায় কথায় দেখিলাম হিরণ তোমাকে কতদূর ঘৃণা করে" প্রমোদ একটি ছোট দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন "সন্ন্যাসী তবে নীরজাকে লইয়া গিয়াছেন?"

যা। "হাঁ। সে সব ব্যাপার বলিতেই তো তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।'

প্র। "কি তবে বল?"

যা। "কথার কথায় তোমার কথা উঠিল। সন্ন্যাসী তোমার অতিশয় প্রশংসা করিলেন। কথায় কথায় আমি বলিলাম হাঁ প্রমোদ সর্ব্বপ্রকারে নীরজার উপযুক্ত একটি সুপাত্র বটে, এই কথা শুনিয়া হিরণ ভাবিল, সন্ন্যাসী তোমার সহিত নীরজার সম্বন্ধ করিয়াছেন, সে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, তোমার চরিত্রের উপর কতশত অপবাদ দিতে লাগিল তাহার ঠিক নাই। আমি ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম, আমাদের দুজনে একটু বিবাদ হইল, হিরণ তাহাতে অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেল। তাহার পর আমি সন্ন্যাসীর নিকট শুনিলাম হিরণ নীরজার একজন পাণিপ্রার্থী। শুনিয়া আমি হিরণের রাগের কারণ বুঝিলাম। তাহার পর তোমার মুখে আজিকার রাত্রের ঘটনা শুনিয়া নিশ্চয়ই তাহাকে দোষী মনে হইতেছে। তুমি কি বুঝিতেছ না তোমাকে কণ্টক বিবেচনায় তাহার পথ হইতে সরাইবার অভিপ্রায়ে ছিল?" প্রমোদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। এতক্ষণে তিনি সকল বুঝিতে পারিলেন। এইবার কারণ পাইয়া প্রমোদেরও হিরণকে দোষী বলিয়া মনে হইল। অকারণে অন্য কেহ তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিবে তাহা আর মনে করিতে পারিলেন না। তিনি হিরণকেই সম্পূর্ণ দোষী ভাবিয়া বলিলেন "পাষণ্ড! তাহার তো আমি কোন অনিষ্টই করি নাই কিন্তু সেই বাল্যকাল হইতে সে আমার সহিত শত্রুতাব্রতে ব্রতী হইয়াছে।"

যামিনী আপন অভীষ্ট সিদ্ধির সুযোগ হইতেছে দেখিয়া বলিলেন "আমার তো রাগে শরীর কাঁপিতেছে, কি করিয়া সে পাষণ্ডকে শাস্তি দেওয়া যায়? খুনের দায়ীতে তাহাকে বিচারালয়ে লইয়া গিয়া শাস্তি দিতে হইবে। এই কথায় প্রমোদ কিছু ঘৃণার হাসি হাসিয়া বলিলেন "উহার নামে নালিশ করিতে গেলেও আমার

অস্বীকার করা হয়, তাহা আমি করিব না।" যামিনী হিরণকুমারের শান্তির ইচ্ছায় তাহার নামে অভিযোগের নিমিত্ত প্রমোদকে অনেক বলিলেন। প্রমোদ কোন মতে স্বীকৃত হইলেন না। যামিনীনাথের বিশেষ পীড়াপিড়িতে শেষে বলিলেন "তাহার বিরুদ্ধে তো তেমন প্রমাণ কিছুই নাই, কি বলিয়াই বা নালিশ করিব? তাহাকে এক পিস্তল হস্তে মাত্র দেখিয়াছিলাম এই যা বলিবার কথা, তাহা সে অস্বীকার করিতে পারে।"

যা। "প্রমাণ বিশেষ না থাকিলে শাস্তি না হইতে পারে, কিন্তু বিচারালয়ে ঐ দাবীতে তাহাকে যাইতে হইলেই তো বিলক্ষণ অপমানও হইবে।" প্রমোদ বলিলেন "না, তাহাতে আর কাজ নাই। এই মকদ্দমা লইয়া আর আমার নিজের নাম জারী করিয়া কাজ নাই, হিরণকে চিনিয়া থাকিলাম এই যথেষ্ট।" কোন মতে না পারিয়া অগত্যা যামিনী সে চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। তখন ক্রমে অন্যান্য কথা আসিয়া পড়িল। নীরজার কথা পাড়িতে প্রমোদ বড়ই ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে কথা কহিতে গেলেই আপনা হইতে মুখ বন্ধ হইয়া যায়, লজ্জা সঙ্কোচ কতকি ভাব আসিয়া তাঁহার ইচ্ছার উপর আধিপত্য করে। নীরজা যামিনীর বাড়ী আছে জানিয়া অবধি কতবার প্রমোদের আবার আসিয়া দেখা করিতে ইচ্ছা করিত কিন্তু আসিতে পারিতেন না, যদি বা একদিন দুদিন আসিয়াছিলেন তখাচ নীরজার সহিত দেখা করিবার কথা তুলিতে পারেন নাই। যামিনীও আপনি সে কথা কিছুই বলেন নাই সুতরাং সেই রাত্রে হঠাৎ ছাড়া আর নীরজার সহিত প্রমোদের দেখা হয় নাই। প্রমোদ আজ কি করিয়া নীরজার কথা পাড়িবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন "সন্ন্যাসীর যে আমাদের উপর হইতে সে সন্দেহ ঘুচিয়াছে ইহাতে আমি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছি।"

যামিনী বুঝিলেন নীরজার বিষয় প্রমোদের কথা কহিবার ইচ্ছা। জানিয়া বলিলেন "হাঁ তাই তোমাকে এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নাই। সন্ন্যাসী আমার প্রত্যুপকার স্বরূপ নীরজাকে অর্পণ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে যদিও বলিলাম, নীরজার আমি যে যোগ্যপাত্র নহি, প্রমোদই তাহার সুপাত্র, তথাপি তিনি আমাকেই জামাতা করিতে স্থির করিয়াছেন" শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, কথাটি তীক্ষ্ণ শেল স্বরূপ হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। কিন্তু তিনি তাহা সামলাইয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। তিনি বুঝিলেন এরূপ মনে লাগা তাঁহার অন্যায়, সেই হেতু সে ভাব অতিক্রম করিতে মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি ভাবিলেন যামিনী নীরজার স্বামী হইবে ইহাতো সৌভাগ্যের কথা, প্রমোদ যদি নীরজাকে যথার্থ ভাল বাসেন ইহাতে তাঁহার আনন্দ হওয়াই উচিত। এইরূপে মনকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া প্রমোদ মনে মনে স্থির করিলেন যতই কষ্ট হোক, ভবিষ্যতে তিনি আপন স্বার্থময় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া নীরজার সুখেই

সুখী হইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ঐ কথা শুনিবার পর হইতে প্রমোদ কেমন নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, সহস্র চেষ্টা করিয়াও আর আগের মত কথা কহিতে সক্ষম হইলেন না। এক দিকে মনকে বুঝাইবার ইচ্ছা, অপর দিকে হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাসের প্রবল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রমোদের চক্ষে ভীষণ চিন্তার ভাব, অথচ অধরে অনিচ্ছা হাসির নিরুজ্জ্বল আভাস। যদিও তিনি হৃদয়ের ভাব ঢাকিতে বলপূর্ব্বক হাসিতেছেন, কিন্তু অনিচ্ছার সেই মৌখিক হাসিতে তাহার বিষাদ ভাব দ্বিগুণ প্রকাশিত হইতেছিল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া যামিনীও কিছু পরে মৌন হইয়া পড়িলেন। অনেক চেষ্টাতেও কোন মতেই তাঁহার সে মৌন ভাব ঘুচিল না, তখন তিনি আর বেশীক্ষণ সেখানে না থাকিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন। আসিতে আসিতে প্রমোদ তাঁহার মনের ভাব দমন করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখিলেন মন ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহে।

প্রমোদ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার চক্ষে সকলি শূন্য বোধ হইতে লাগিল। পৃথিবী যেন শূন্য, আকাশ যেন শূন্য। পৃথিবীতে যেন লোক নাই, বৃক্ষ নাই, আলো নাই, কিছুই নাই, পৃথিবী যেন শূন্যময় অন্ধকার। আকাশে যেন চাঁদ নাই, তারা নাই, মেঘ নাই, আকাশও যেন শূন্যময়। প্রমোদ এবার বাহ্য জগৎ হইতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিলেন, দেখিলেন হৃদয়ের মধ্যেও অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নাই।

ইহারই তিন চারি দিন পরে কনকের এক পত্রে প্রমোদ অবগত হইলেন সুশীলা শয্যাগত পীড়িত। শুনিয়া প্রমোদ সেই রাত্রেই রেল গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। গাড়ীতে যামিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার কাছে শুনিলেন সন্ন্যাসী যামিনীকে কানপুরে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এলাহাবাদে আসিয়া প্রমোদ যামিনীকে দুই এক দিনের জন্য এখানে থাকিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। নীরজাকে নিশ্চয় লাভ করিবেন জানিয়া এখন যামিনীরও আর সে বিষয়ে তত ব্যগ্রতা ছিল না। তিনি প্রমোদের অনুরোধে দুই এক দিন এলাহাবাদে কাটাইয়া পরে কানপুরে যাওয়াই স্থির করিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ—বিভীষিকা।

সুশীলার পীড়ার অগ্রে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল তাহা আমরা এই পরিচ্ছেদে বলিতেছি। কনকের শান্তির ১২ দিন এখনো ফুরায় নাই। রাত্রি অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, তাহাতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে এবং মাঝে মাঝে মেঘ গর্জ্জন পৃথিবী কাঁপাইয়া তুলিতেছে। এই সময় দীপশূন্য অন্ধকারময় একটি কক্ষে, এই মেঘ বৃষ্টির শব্দের মধ্যে বসিয়া একাকী শুইয়াছিল। সহসা বজ্রের কড়মড় শব্দে চমকিয়া উঠিল। অন্ধকারে ভীত হইয়া উঠিয়া

বলিল, আলোক পাইবার নিমিত্ত বিছানা হইতে হাত বাড়াইয়া কক্ষের একটি বাতায়ন খুলিয়া দিল। অমনি সহসা সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল শুনিল—

"রিমঝিম ঘন বরিষে—সখিলো,
বিরহী নয়ন-পারা, চালিছে শ্রাবণ ধারা,
হিজ্জলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে,
শুন শুন গর্জ্জনে, গর্জ্জে নবীন ঘন,
ঝলকে দামিনী বিকাশে।"

এই সময় আর একবার বজ্রের কড়মড় শব্দ হইল, গান থামিয়া গেল, অমনি সুশীলা এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঝড় বৃষ্টির প্রারম্ভে কনক একাকী আছে বলিয়া তাহার কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তিনি মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছিলেন যে তাহাকে আপনার দোষেই এইরূপ একাকী থাকিতে হইতেছে—তিনি কি করিবেন। পরে যখন একবার বজ্রধ্বনিতে বাড়ী কাঁপাইয়া তুলিল, বজ্রাগ্নি তাঁহার চক্ষু ঝলসিত করিয়া কিছু দূরে কনক যে কক্ষে বাস করিত সেই কক্ষের সম্মুখস্থ উদ্যানে গিয়া পড়িল, তখন সুশীলার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। সুশীলার ভয় হইল কনকের কক্ষে তাহা হয়তো পড়িয়াছে। তিনি ব্যাকুল ভাবে সেই গৃহের দিকে ছুটিলেন, মনে হইল তিনিই কনকের হত্যাকারী, তাঁহার নিমিত্তই বজ্রাঘাতে কনকের মৃত্যু হইল। বারাণ্ডা দিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে আকাশ পানে তিনি দেখিতে পাইলেন যেন সেই বজ্র বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে কনকের মাতা দাঁড়াইয়া বলিতেছেন "তুমিই আজ কনককে মারিয়া ফেলিলে,তোমার কঠোরতাতেই তাহার জীবন বিনষ্ট হইল।" সুশীলা তখন সে দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া "কনক কনক" করিয়া ছুটিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন কনক শয্যায় উপবিষ্টা। তাহাকে জীবিত দেখিয়া তিনি যেন পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সকল দোষ ভুলিয়া গিয়া সহর্ষে বালিকার মুখ চুম্বন করিলেন। এই সময় আবার গীত ধ্বনি উত্থলিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—

"জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা"—

গানটি শুনিবার জন্য সুশীলা কান পাতিলেন কিন্তু গান এই খানেই থামিয়া গেল। কে গান গাহিতেছে দেখিবার জন্য তিনি বাতায়নে দাঁড়াইলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল সম্মুখস্থ জাহ্নবীনদীর তরঙ্গ উচ্ছ্বাস সেই অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল। তাহা ছাড়া তীরে মনুষ্যের চিহ্নও দেখিলেন না, কিন্তু মনে হইল প্রাচীরের নিকট হইতে গীত-ধ্বনি উঠিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া আবার কে গাহিয়া উঠিল—

"জীবন ফুরায়ে এল আঁখি জল ফুরালোনা"

গান শুনিয়া সুশীলার মাথা ঘুরিয়া আসিল, তাঁহার কত কথাই মনে পড়িয়া গেল, সেই বালিকাজীবন, বাল্যের সুখ দুঃখ সমস্তই মনে পড়িয়া গেল। সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া নিস্পন্দে আবার সেই গানটির শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন কিন্তু আর কেহই গাহিল না। তখনি তিনি

সেই প্রাচীরের অভিমুখে একজন লোককে আসিতে দেখিলেন। ক্রমে সে নিকটে আগমন করিল। অমনি এই সময় একবার বিদ্যুৎ হাসিল, সেই আলোকে সে ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে পাইল, সুশীলাও তাহাকে দেখিতে পাইলেন। সুশীলা স্তম্ভিতের ন্যায় তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহাদের চক্ষে-চক্ষে সংলগ্ন হইল, অমনি সুশীলা বাত্যাহত বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমি-শায়িত হইলেন।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

সৌন্দর্য্যের কোন একটি অপরিবর্ত্তনীয় আদর্শ মানব-মনে নিহিত আছে কি না তদ্বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। একটি বস্তুকে আমরা কেনই বা সুন্দর বলি, আর একটিকে কেনই বা কুৎসিত বলি তাহার কি কোন কারণ নাই? সৌন্দর্য্যের কি কোন নির্দ্দিষ্ট মূল নিয়ম নাই? কালিদাস বলিয়াছেন "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"—এ বচনটির সত্যতা বিষয়ে কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু আমাদিগের অন্যান্য তাবৎ মানসিক বৃত্তির ন্যায়—এই সৌন্দর্য্য-রুচিও কি উন্নতি-সাপেক্ষ নহে? সমস্ত সৃষ্টি-ব্যাপারই যে ক্রমোন্নতি ও ক্রমাভিব্যক্তির নিয়মাধীন, এই সৌন্দর্য্য-রুচিই একমাত্র কি সেই নিয়মের ব্যভিচার-স্থল হইবে? সমস্ত সৃষ্টিই কোন একটি পূর্ণ আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইবার জন্য ক্রমাগত "যুঝাযুঝি করিতেছে—ও যতখানি সেই আদর্শের সমীপবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইতেছে ততখানিই তাহার উন্নতি। এই যুঝাযুঝির বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখিয়া সহসা মনে হইতে পারে যে উহা নিতান্ত উদ্দেশ্য-বিহীন ও সকল প্রকার নিয়মের বহির্ভূত। কিন্তু সকল যুদ্ধ ব্যাপারই যে অন্তিম চিরস্থায়ী শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপনের সোপান মাত্র ও সকল যুদ্ধের মধ্যেই যে শান্তির বীজ নিহিত আছে তাহা আমরা সহসা উপলব্ধি করিতে পারি না। মানব-জাতির সৌন্দর্য্য-রুচি সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। বিচিত্র মনুষ্য-জাতির মধ্যে রুচিও যে বিচিত্র, এ কথা প্রমাণ করিবার জন্য অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না—ইহার নিদর্শন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই রুচি-গত বিচিত্রতার অন্তর্নিহিত কোন প্রকার ধ্রুবত্বের নিয়ম লক্ষিত হয় কি না তাহাই বিবেচ্য।

সৌন্দর্য্য-লালসা সমস্ত মানব জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়—কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের আদর্শ সকল দেশে সমান দেখা যায় না। অতীব অসভ্য বন্য জাতিদিগকেও শারীরিক শো-

ভা-বর্দ্ধনের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে দেখা যায়—বেশ ভূষা অলঙ্কারের প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত অনুরাগ। কোন এক জন ইংরাজ পণ্ডিত এতদূর পর্য্যন্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শোভাবর্দ্ধনের জন্যই কাপড় পরার রীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, শরীরের তাপ রক্ষার জন্য নহে। Professor Waitz বলেন "একজন মানুষ যতই দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত হোক না কেন, আপনার শোভাবর্দ্ধনে তাহার একটি সুখ বোধ হয়।" "রেন-ডীয়র" নামক হরিণের সমকালবর্ত্তী য়ুরোপীয় অসভ্য লোকেরা কোন উজ্জ্বল বস্তু পাইবা মাত্রই তাহা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গহ্বর মধ্যে আনিত। বর্ত্তমান কালের বন্য জাতীয়েরা সর্ব্বত্রই পালক, কণ্ঠহার বাহুবন্ধ কানবালা প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা, আপনার শরীর বিভূষিত এবং বিচিত্র রঙ্গে রঞ্জিত করে। Humboldt বলেন "পরিচ্ছদধারী জাতিদিগের ন্যায় যদি রঞ্জিত জাতীয়গণের প্রতি ততদূর মনোযোগ দেওয়া হইত, তাহা হইলে দেখা যাইত—যে, কি রঙ্গের বিচিত্রতা কি কাপড়ের ঢং উভয়ই এক ফলবতী কল্পনা ও ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল খেয়াল হইতে প্রসূত।"

আফ্রিকার কোন অংশের অধিবাসীগণ চখের পাতা কাল রং দিয়া এবং কোন অংশের অধিবাসীগণ নখ্ পীত কিম্বা বেগ্নি রং দিয়া রঞ্জিত করে। অনেক স্থানে বেশও নানা প্রকার রঙ্গে রঞ্জিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে দাঁতে কাল, লাল নীল প্রভৃতি নানা প্রকার রং দিবার রীতি আছে এবং মালাই দ্বীপপুঞ্জ নিবাসীগণ কুকুরের ন্যায় দাঁত সম্পূর্ণ সাদা হওয়া অত্যন্ত লজ্জার বিষয় মনে করে। সকল অসভ্য জাতির মধ্যেই তো অনেক দেশে যত্ন পূর্ব্বক কেশ বিন্যাস করে, আবার কোন কোন দেশে মস্তক একেবারে মুণ্ডন করিয়া ফেলে। এমন কি, দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকা দেশের লোকেরা ভ্রূ পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া ফেলে। উপরিতন নীল নদী-কূলস্থ প্রদেশ-নিবাসী মনুষ্যগণ সাম্‌নেকার চারিটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহারা বলে যে, সামনের দাঁত রাখিয়া তাহারা পশু-তুল্য হইতে ইচ্ছা করে না। আরও দক্ষিণে, লিভিংষ্টোন সাহেব বলেন, বোটোকা নামে এক জাতি আছে, তাহারা সামনের উপরকার স্তবকের দুইটা দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে; তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগের নিম্ন চোয়াল বর্দ্ধিত হইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত কদাকার দেখায় কিন্তু তাহারা মনে করে যে ঐ স্থানের দাঁত থাকিলে বরং আরও বিশ্রী দেখিতে হয়। তাহারা কতকগুলি য়ুরোপীয়কে দেখিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল "দেখ দেখ—বড় বড় দাঁতগুলি দেখ।" আফ্রিকার বিভিন্ন প্রদেশে এবং মালাই দ্বীপপুঞ্জে সামনের দাঁত ঘসিয়া করাতের মত ছুঁচাল করে, অথবা ছিদ্রিত করিয়া তাহার মধ্যে গোঁজ পুরিয়া রাখে। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জাতি, উপরের কিম্বা নিম্নের ওষ্ঠ ছিদ্রিত করে—বোটোকুডো জাতীয়েরা নিম্ন-ওষ্ঠে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ৩ ইঞ্চি পরিধি পরিমাণ

কাঠের গোঁজ পুরিয়া রাখে। মধ্য আফ্রিকার স্ত্রীলোকেরা নিম্ন ওষ্ঠ ফুঁড়িয়া তাহাতে একটি স্ফটিক-খণ্ড পুরিয়া রাখে। লাটুকা প্রদেশের সর্দারের স্ত্রী বেকর সাহেবকে বলিয়াছিল যে,—"যদি তোমার স্ত্রী সামনেকার নিম্ন ওষ্ঠকের দাঁত উঠাইয়া তাঁহার ওষ্ঠে সূচ্যাগ্রবৎ মসৃণীকৃত স্ফটিকখণ্ড ধারণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অনেকটা শ্রী ফিরিয়া যায়।" আরও দক্ষিণে, মাকালো জাতীয়েরা উপরকার ঠোঁট ফুঁড়িয়া তাহাতে একটি বৃহৎ ধাতুখণ্ড এবং বংশের বলয় পরিধান করে। ইহাকে তাহারা 'পেলে' বলে। বেকর সাহেব বলেন, ইহার দরুন স্ত্রীলোকের ওষ্ঠ, নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দু ইঞ্চি পরিমাণ ঝুঁকিয়া পড়িতে তিনি দেখিয়াছিলেন। যখন স্ত্রীলোকটি মৃদু মধুর হাসা করিল—মাংসপেশী কুঞ্চিত হওয়া প্রযুক্ত ওষ্ঠটি চক্ষু ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে উঠিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমাদের স্ত্রীলোকে কেন এই সকল বস্তু পরিধান করে?" তাহাদের প্রবীণ সর্দার চিনসুর্দি এই প্রশ্নটি নিতান্ত নির্বোধের প্রশ্ন মনে করিয়া বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল "কেন, সৌন্দর্য্যের জন্য। স্ত্রীলোকদের ঐ যা একমাত্র সৌন্দর্য্যসাধক বস্তু আছে—পুরুষদের দাড়ি আছে—স্ত্রীলোকদের তো কিছুই নাই। এই 'পেলে' না থাকিলে স্ত্রীলোকদের কি অদ্ভুত দেখতেই হয়—দাড়ি নেই অথচ পুরুষের মত মুখ—সে স্ত্রীলোকি স্ত্রীলোকই নয়" Hearne যিনি আমেরিক ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত অনেকবার বাস করিয়াছিলেন তিনি বলেন "একজন উত্তর প্রদেশস্থ ইণ্ডিয়ানকে জিজ্ঞাসা কর সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে? সে উত্তর করিবে—চওড়া-পারা সমতল-মুখ, পুদে পুদে চোখ্—উঁচু উঁচু চোয়ালের হাড়, প্রত্যেক গালে তিন চারটে করে চওড়া চওড়া কাল রেখা—ছোট কপাল—বৃহৎ চওড়া দাড়ি(chin)—গাব্দা গাব্দা হুকের মত নাক—পিঙ্গলবর্ণের "চামড়া—এবং কোমোর পর্য্যন্ত লম্বমান স্তন—ইহাকেই বলে সৌন্দর্য্য।" Pallas যিনি চীন রাজ্যের উত্তরাংশে গমন করিয়াছিলেন তিনি বলেন "যাহাদের চওড়া মুখ, উচ্চ চোয়াল—খুব চওড়া নাক এবং প্রকাণ্ড কান, সেই সকল স্ত্রীলোককেই লোকে পছন্দ করে; Vogt বলেন যে, চীন ও জাপানবাসীগণের এমনিই তো চোক্ উপর দিকে টানা, তারা যখন আবার ছবি আঁকে তখন ছবিতে সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্য চোক আরও উপর-টানা করিয়া আঁকে। পাদ্রি Huc সাহেব পুনঃ পুনঃ অনেক স্থলে বলিয়াছেন যে,আভ্যন্তরিক প্রদেশস্থ চীনেরা য়ুরোপীয়দিগের সাদা চর্ম এবং উন্নত নাসিকা থাকা প্রযুক্ত তাহাদিগকে অতি কদাকার বলিয়া মনে করে। সিংহল বাসীগণের নাক এমনিইতো বসা বসা, কিন্তু সপ্তম শতাব্দির চীনগণের, মোগল জাতির সমতল মুখশ্রী দেখাই অভ্যাস ছিল সুতরাং তাহারা সিংহলবাসীগণের অত্যুন্নত নাক দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। Thsang বর্ণনা করেন যে তাহারা "মনুষ্যের ন্যায় শরীর

বিশিষ্ট কিন্তু তাহাতে পাখির ঠোঁট সংযুক্ত।" প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মঙ্গো পার্কের সাদা রং ও উন্নত নাক দেখিয়া নিগ্রোরা তাহার প্রতি উপহাস করিয়াছিল। আফ্রিকা-বাসী মুর-জাতীয়েরাও তাঁহার সাদা রং দেখিয়া "ক্রু যুগল কুঞ্চিত করিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিয়াছিল।" পূর্ব্ব উপকূলে, বর্টন সাহেবকে দেখিয়া নিগ্রো বালকেরা বলিয়া উঠিয়াছিল "দেখ দেখ একটা সাদা মানুষ —ওকে একটা সাদা বানরের মত ঠিক দেখাচ্চে না?" রীড্ সাহেব বলেন নিগ্রোরা কাল রং খুব পছন্দ করে—আবার কাফির জাতীয়েরা কাফ্রিদিগের ন্যায় অত কাল নয়—কাল ও লাল রঙ্গে মিশ্রিত—তাহারা এই জন্য শ্যামল বর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা পছন্দ করে—তাদের মধ্যে একজনের রং দুর্ভাগ্যক্রমে কর্সা হওয়ায় কোন স্ত্রীলোক তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। কোচিন চীনের একজন মনুষ্য একজন ইংরাজ দূতের স্ত্রীর রূপ সম্বন্ধে এইরূপ ঘৃণাব্যঞ্জক মত প্রকাশ করিয়াছিল "ওর দাঁত কুকুরের মত সাদা, আর ওর রং আলু ফুলের মত গোলাপি।" ডারুইন বলেন—এই একটি বড় আশ্চর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, যে দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ শ্মশ্রু-বিহীন তাহারাই মুখ ও শরীরের লোম রাখিতে ভাল বাসে না—যদি কোথাও দুই এক গাছা লোম থাকেতো তাহা তাহারা যত্ন পূর্ব্বক উৎপাটিত করিয়া ফেলে। কালমক্ জাতীয়েরা শ্মশ্রুবিহীন —তাহারা শরীরের লোম উন্মূলিত করে —মালাই ও শ্যামীয় জাতীয় কিয়দংশ লোকের মধ্যেও এই রীতি প্রচলিত আছে। নব জীলাণ্ড নিবাসীরা শ্মশ্রুহীন —তাহারাও মুখের লোম উৎপাটিত করে; তাহাদিগের মধ্যে এই একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "লোমশ পুরুষের ভাগ্যে কোন স্ত্রী নাই।"

পক্ষান্তরে শ্মশ্রু-বিশিষ্ট জাতীয়গণ শ্মশ্রুর প্রতি যত্ন ও আদর প্রদর্শন করে। অ্যাংগ্লো স্যাক্সনদিগের আইন-অনুসারে মনুষ্য শরীরের প্রত্যেক অংশের একএকটা মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল—"শ্মশ্রুর ক্ষতি পূরণ হিসাবে ২০টাকা ও জানু-অস্থি ভঙ্গের ক্ষতি পূরণ হিসাবে ৬টাকা মাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল"—প্রাচ্য দেশ সমূহে দাড়ি স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার রীতি দৃষ্ট হয়। প্রশান্ত সমুদ্রের ফিজি জাতীয়দিগের দাড়ি প্রচুর ও ঝাকড়া ঝাকড়া এবং দাড়িই তাহাদের একটা অহংকারের বিষয়—আবার এদিকে তাহাদের পার্শ্বস্থ দ্বীপ পুঞ্জ নিবাসী টাঙ্গা ও স্যামোয়া জাতীয়েরা স্বভাবতঃ শ্মশ্রুহীন, সেইজন্য দাড়ির প্রতি তাহাদিগের অত্যন্ত বিদ্বেষ।

ডারুইন বলেন "এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে Humboldt যে নিয়ম অনেক দিন হইল ব্যক্ত করিয়াছিলেন সেই নিয়মই অনেকটা যথার্থ বলিয়া উপলব্ধি হয়।" তিনি বলিয়াছিলেন—"প্রকৃতি মানুষকে যে সকল বিশেষ লক্ষণ প্রদান করেন, মানুষ সেই সকল বিষয়কেই প্রশংসা ও আদর করে এবং অনেক সময় তাহারই বাড়াবাড়ি করিতে চেষ্টা করে" শ্মশ্রু

হীন জাতীয়দিগের মধ্যে শ্মশ্রুর চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলোপ ও শরীরের সমস্ত লোমোৎপাটন করিবার রীতি এই নিয়মের একটী দৃষ্টান্ত স্থল। ডারুইন আরও বলেন "সাধারণতঃ এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমাদিগের বোধ-শক্তি সকল বাহ্য ব্যাপারের সহিত এপ্রকার উপযোগী করিয়া নির্ম্মিত যে, কতকগুলি আকার, উজ্জ্বল রং—সমবিভক্ত ছন্দোবদ্ধ শব্দ প্রভৃতিতে আমাদিগের সুখ বোধ হয়, এবং তাহাদিগকেই আমরা সুন্দর বলিয়া থাকি। আগুনে হাত দিলে শরীরে কেন যন্ত্রণা উপস্থিত হয় কিম্বা সুখস্পর্শ মলয়-সমীরণে কেনই বা আমাদিগের সুখ বোধ হয়—ইহার যেরূপ আমরা কারণ বলিতে পারি না, কোন কোন আকার কেনইবা আমাদিগের ভাল লাগে অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া বোধ হয়, এবং কোন কোন আকার কেনই বা খারাপ লাগে অর্থাৎ কুৎসিত বলিয়া বোধ হয়, তাহারও আমরা কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারি না।" অতএব, যদি প্রত্যেকের ভাল লাগার উপরেই সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, তাহা হইলে যার যাতে ভাল লাগে, তার নিকটে তাহাই সুন্দর। তবে কি, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলে কোন প্রকার বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব নাই?

কিন্তু এই একটি বিষয় আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে যত সাধারণ সভ্যতার উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যের আদর্শও ক্রমশঃ একতার দিকে অগ্রসর হইতেছে! এই জন্যই আমাদের প্রাকৃতিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন হইলেও সেক্সপিয়রের সৌন্দর্য্য আমরা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি, আবার য়ুরোপীয়গণ শকুন্তলার সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে অনুভব করিতে পারিতেছেন—আমরা রোমের Saint Peter কিম্বা রুসিয়ার Kremlin দেখিয়া যেরূপ আশ্চর্য্য হইতেছি, আমাদের দেশের তাজমহল দেখিয়া য়ুরোপীয়েরা তেমনি আবার বিমোহিত হইতেছেন। যদি সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলে কতকগুলি সাধারণ মূল তত্ত্ব না থাকিবে, তবে এ প্রকার ঘটনা কেন হয়?

আমরা সুন্দর পদার্থ সকলকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহার মূলে দুইটি মূল-উপকরণ দেখিতে পাই। সমতা ও বিচিত্রতা। এই সমতা ও বিচিত্রতার সামঞ্জস্যের নাম সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য আপেক্ষিক—তুলনা সাপেক্ষ। যদি সমস্তই একাকার হইত, কোন প্রকার ভিন্নতা না থাকিত, তাহা হইলে সৌন্দর্য্য আমরা আদৌ অনুভব করিতে পারিতাম না। কিন্তু এই বিভিন্নতা—এই বিচিত্রতার মধ্যে যতক্ষণ না আমরা সমতা উপলব্ধি করিতে পারি ততক্ষণ আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্রেক হয় না।

কোন পদার্থের সহিত কোন পদার্থের মিল দেখিতে যেমন আমরা ভাল বাসি, সেইরূপ ভিন্নতা দেখিতেও ভাল বাসি—বস্তুতঃ এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর মিল আছে, এ কথা বলিলে এই বুঝায় যে কোন কোন সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে মিল আছে এবং কোন কোন সম্বন্ধে অমিলও আছে। কেন না, যদি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে

অর্থাৎ সর্ব্বাংশে ও সর্ব্ব-সম্বন্ধে মিল থাকে, তাহা হইলে আর উভয় শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না, তাহা হইলে সে একই বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সৌন্দর্য্য কি? না—সাম্য ও বৈষম্যের সামঞ্জস্য। উহাতে সাম্যও থাকা চাই এবং বৈষম্যও থাকা চাই এবং এই সাম্য বৈষম্যের মধ্যে আবার সাম্য-সামঞ্জস্য থাকা চাই। এক্ষণে মনে কর একটি সম চতুষ্কোণ আর একটি সম্পূর্ণ অসমবেখা-বিশিষ্ট আকার আছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্ আকারটি আমাদিগের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়? সমচতুষ্কোণ আকারটি যে অপেক্ষাকৃত সুন্দর তাহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবে। কেন সুন্দর বোধ হয়? যেহেতু উহাদের মধ্যে পরস্পর সৌসাদৃশ্য আছে (সাদৃশ্য আছে বলিয়াই বোঝায় যে তাহাদিগের মধ্যে ভিন্নতাও আছে) কোন পদার্থের বা কোন আকারের সম বিষম অংশগুলি যখন এ প্রকারে কৌশলে যোগাযোগ করা হয় যে তাহাদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য একেবারেই সহজে আমাদিগের চক্ষে প্রতিভাত হয়—তখনি তাহাকে আমাদিগের সুন্দর বলিয়া উপলব্ধি হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র ভিন্নতা কিম্বা বিচিত্রতাতে আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধ তৃপ্ত হয় না। বিচিত্রতার মধ্যে যতক্ষণ না আমরা সমতা দেখিতে পাই, ততক্ষণ আমাদিগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উদ্রেক হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে সমতাই সৌন্দর্য্যের মুখ্য উপকরণ এবং বিচিত্রতা গৌণ উপকরণ। কোন নিতান্ত বাঁকা-চোরা রেখা অপেক্ষা যে একটি সকল রেখা সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঁকা-চোরা রেখার মধ্যে বিচিত্রতা অনেক আছে কিন্তু সে বিচিত্রতায় আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বোধের উদ্রেক হয় না—কিন্তু সেই একটি বাঁকা-চোরা রেখার সঙ্গে আর একটি ঠিক তদ্রূপ বাঁকা-চোরা রেখা যদি এরূপ কৌশলে সংযোজিত করা যায় যে তাহাদিগের বাঁকা-চোরা রূপ বিচিত্রতার মধ্যে আবার একটি সমতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তখন তাহাই আবার সুন্দর হইয়া পড়ে। অতএব সমতাই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের অঙ্গ—এবং বিচিত্রতাই তাহার ব্যঞ্জন-স্বরূপ। সৌন্দর্য্যের পক্ষে উভয়ই প্রয়োজনীয়।

ক্রমাগত এক-ঘেয়ে সাম্য-রস আস্বাদন করিয়া করিয়া আমাদের সৌন্দর্য্য রুচির পাছে অরুচি উপস্থিত হয়, এই জন্যই বিচিত্র সাম্যের প্রয়োজন। এর সঙ্গে ওর মিল, ওর সঙ্গে এর মিল—এইরূপ মিলের বিচিত্রতা আমরা ভাল বাসি।

সৌন্দর্য্য দুই প্রকার—সাদা-সিধা সৌন্দর্য্য ও জম্‌কাল সৌন্দর্য্য। যে সৌন্দর্য্যে তত বিচিত্রতা নাই—সে সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধা এবং যাহাতে বিচিত্রতার আধিক্য, তাহার সৌন্দর্য্যও সেই পরিমাণে অধিক জম্‌কাল। সমচতুষ্কোণ, সমত্রিকোণ প্রভৃতি আকার সাদা-সিধা সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত—সাদা-সিধা আকারের মধ্যে চক্র আকারই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। তাহার কারণ

এই যে, চক্র আকারে -সাম্য ও বৈচিত্র্যের অসমঞ্জস্য অতি সুন্দররূপে রক্ষিত হইয়াছে। চক্রাকারের প্রত্যেক অংশ পৃথক করিয়া ধরিতে গেলে প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক অংশ হইতে ভিন্ন—অথচ সেই সকল অংশগুলি এরূপ অল্পে অল্পে ক্রমশ ভিন্ন হইয়া বেমালুম পরস্পরের সহিত মিলিয়া গিয়াছে যে তাহা হইতে একটি সমগ্র সামঞ্জস্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইয়া আমাদিগের সৌন্দর্য্য-বৃত্তিকে তৃপ্ত করে।

একটি সমচতুষ্কোণ আকার অপেক্ষাও চক্রাকার এই জন্য অধিক সুন্দর। এই জন্য প্রকৃতিতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর তাহা সমস্তই প্রায় গোলাকারের দিকে উন্মুখ। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পুষ্প ফল প্রভৃতি সুন্দর পদার্থ সকল এই জন্য ন্যূনাধিক গোলাকার।

ফল হইতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌন্দর্য্য অধিক জমকাল কেন? না—যেহেতু ফল অপেক্ষা পুষ্পের বৈচিত্র্য অধিক।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় যে সকল সুন্দর পদার্থ তাহার সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ রং। বিচিত্রতাই রঙ্গের প্রধান উদ্দেশ্য—কিন্তু রঙ্গের বিষয়েও সাম্য বৈষম্যের সামঞ্জস্য দ্বারাই রঙ্গের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

চক্ষুরিন্দ্রিয়-গত সৌন্দর্য্যের আর একটি উপকরণ উজ্জ্বলতা। কোন দ্রব্যের যদি উজ্জ্বলতা ভিন্ন আর কোন সৌন্দর্য্যের উপকরণ না থাকে তথাপি সেই উজ্জ্বলতার জন্যই আমরা তাহাকে সুন্দর বলি। তবে, আকার-গত সাম্য বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্যের সঙ্গে যদি আবার কোন পদার্থের উজ্জ্বলতা গুণ থাকে—তাহা যে কেবলমাত্র উজ্জ্বলতা-বিশিষ্ট পদার্থ অপেক্ষা সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই।

সচরাচর, ফল অপেক্ষা ফুলে রং ফলান অধিক—আকার-গত বৈচিত্র্যও অধিক—এই জন্য ফল অপেক্ষা ফুলের সৌন্দর্য্য অধিক জমকাল। পূর্ণচন্দ্রকে কেন আমরা এত সুন্দর বলি? সৌন্দর্য্য-উপকরণের মধ্যে গোলাকার ও উজ্জ্বলতা এই যে দুইটি উপকরণ ইহা পূর্ণচন্দ্রে আছে বলিয়াই তাহাকে সুন্দর বলি—পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্যের এতদ্ভিন্ন আর কি কোন উপকরণ নাই? আর একটি আনুসঙ্গিক উপকরণ আছে, তাহা বৈপরীত্য। অনন্ত নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র উদিত হওয়ায় উহার সৌন্দর্য্য আরও দীপ্তি পাইয়াছে।

নীল আকাশে পূর্ণচন্দ্র যখন উদিত হয়, কিম্বা শ্যামল সরোবর-সলিলে যখন পদ্ম বিকসিত হয়, তাহাদিগের নিজের সৌন্দর্য্য ছাড়া রঙ্গের বৈপরীত্যে আর একটি অভিনব আনুসঙ্গিক সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হয়। উজ্জ্বলতা সৌন্দর্য্যের একটি সামান্য উপকরণ নহে। অন্যান্য গুণের অভাব অনেক সময়ে উজ্জ্বলতায় ঢাকিয়া যায়। বিকসিত পদ্ম ও সমুদিত পূর্ণচন্দ্রমা এই উভয়ের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, নির্ণয় করা সুকঠিন। চন্দ্র অপেক্ষা পদ্মের বৈচিত্র্য অনেক গুণে অধিক, যদি চন্দ্রের উজ্জ্বলতা গুণ না থাকিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারিত

চন্দ্র অপেক্ষা পদ্ম সুন্দর। কিন্তু এক উজ্জ্বলতার গুণে পদ্ম অপেক্ষা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য, তুলাদণ্ডে অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা এতক্ষণ বলিলাম তাহা সমস্তই চক্ষুরিন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের দৃষ্টান্ত। আমাদিগের যত ইন্দ্রিয় আছে, তাহার বিষয়ীভূত ততপ্রকার সৌন্দর্য্যও আছে। এতন্মধ্যে চক্ষু ও কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যই শ্রেষ্ঠ। সঙ্গীতই শেষোক্ত সৌন্দর্য্যের বিষয়, অতঃপর ইহার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

সুখের প্রেম।

যে অবধি আমি পাইনু জানিতে
যারে ভাল বাসি সে গো আমায়,
সকল প্রকৃতি হাসিল হরষে,
বাজিয়া উঠিল হৃদয়-তার॥
বন হল আরো হরিত-বরণ,
নীল নভ হল সুনীলতর,
তারকা সকল ভাতিল দ্বিগুণ,
মলয়-অনিল মাতিল আরো॥
যত দিন ভাল বাসিতে জানি নি
বেড়াতেম খেলি বালির তীরে,
প্রসারিত এবে উদার সাগর,
কত চারু দ্বীপ দেখি সে নীরে॥
যে দিকে নেহারি মমতা-লহরী
উথলি উঠিছে সকল ধার।
চাবি-দেওয়া ছিল লুকানো প্রকৃতি
হঠাৎ খুলিল হৃদয় তার॥
লতা পাতা গাছ যত উপবন
চারি দিকে সুখ প্রচার করে,
মধুপ মধুর করে গুণগুণ
কোকিল মাতায় সুধার স্বরে॥
সকলি আমার সহৃদয় সখা
রবি শশি নীল গগন-তল,
খেচর ভূচর সব চরাচর,
ভূধর, অনিল, সাগর-জল॥
ওগো গিরি নদি! ওগো উপবন!
তপন, পবন, সুধাই সবে,
আমার প্রেয়সী, যেমন রূপসী
কে কোথায় বল দেখেছ কবে?
শুধু রূপে নয়, গুণে অতুলন,
যা কিছু মধুর প্রকৃতি-মাঝে
আমি দেখি যেন তাহারি শোভায়
ছায়াতে পড়িয়া সবাই সাজে॥
কে জানে কি গুণ ধর ও গো প্রেম!
নূতন জীবন পাইনু প্রাণে,
কিসের কাজলে রাঙ্গিলে নয়ান
প্রিয়ারে যে দেখি সকল স্থানে॥
প্রেম তুমি মোর জীবন মরণ,
তুমি গেলে প্রাণ জীবন ছাড়ে।
প্রেম দিলে পাই নূতন পরাণ
ফিরে পেলে—প্রাণ দ্বিগুণ বাড়ে॥

কাতন্ত্র-জীবনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

(কাতন্ত্রের অতিরিক্ত গ্রন্থকারগণ।)

কাতন্ত্র অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মা কর্ত্তৃক কত গ্রন্থ বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়া কাতন্ত্র সহযোগী যে সকল গ্রন্থাদির বিষয় জানিতে পারিয়াছি তাহার তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

দুর্গবোধ (দুর্গসিংহ কৃত টীকা)

২। দুর্গবাক্যপ্রবোধ বা "কুলচন্দ্র" (কুলচন্দ্রকৃত দুর্গসিংহের টীকার টীকা)

৩। বিদ্যাসাগর (দুর্গসিংহের টীকার টীকা)

৪। কাতন্ত্র পঞ্জিকা (ত্রিলোচনদাস কৃত)

৫। কলাপচন্দ্র (সুসেন কবিরাজ কৃত; এখানি ত্রিলোচনকৃত টীকার টীকা)

৬। হেমকর।

৭। কলাপতত্ত্বার্ণব বা "শিরোমণি" (রঘুনাথ শিরোমণি কৃত)

৮। বিশ্লেশ্বর বা বিশ্বেশ্বর (ভট্টাচার্য্য)

৯। উমাপতি।

১০। ব্যাখ্যাসার।

১১। রামদাস।

১২। "ষট্‌কারিকা" ও ষট্‌কারিকার ব্যাখ্যা (ভবসনন্দিকৃত)

১৩। রমাকান্ত।

১৪। কৃষ্ণকুমারী (শিবরাম শর্ম্মকৃত)

১৫। কাতন্ত্রপরিশিষ্ট (শ্রীপতিদত্ত প্রণীত)

১৬। পরিশিষ্টপ্রবোধ' (গোপীনাথ তর্কাচার্য্য কৃত কাতন্ত্র পরিশিষ্টের টীকা।)

১৭। রামচন্দ্র (কাতন্ত্রের পরিশিষ্টের টীকা)

১৮। গণ (কাতন্ত্র সম্মত ধাতুপাঠ)

১৯। মনোরমা (কাতন্ত্রগণের টীকা)

২০। হলায়ুধ (ঐ)

ইত্যাদি ইত্যাদি।

উল্লিখিত গ্রন্থাদি ব্যতীতও কাতন্ত্র সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ আছে। কাতন্ত্র সহযোগী গ্রন্থাদি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত দেখা যায়। এস্থলে যে যে গ্রন্থ কাতন্ত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে, আবার অন্য স্থলে তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য যে সকল গ্রন্থের প্রচলন দৃষ্ট হয়, বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া নানাস্থান হইতে সেই সকল গ্রন্থ সংগ্রহ না করিলে কাতন্ত্র-অঙ্গীয় যাবতীয় গ্রন্থের বিবরণ সহজে জানা যায় না।

গ্রন্থকারের যে নাম, অনেক স্থলে তৎ-প্রণীত গ্রন্থেরও সেই নাম হইয়া থাকে (যেমন ভট্টি, মাঘ, চরক, সুশ্রুত, চক্রদত্ত

ইত্যাদি) কাতন্ত্র টীকাদির প্রায় অনেকই গ্রন্থকারের নামে পরিচিত; ঐ সকল গ্রন্থের প্রকৃত নাম বলিলে তাহা কেহই চিনিতে পারে না। আমরা উপরের তালিকান্থিত ৩।৪ খানা গ্রন্থ দেখিতে পারি নাই—দেখিবার যোও নাই, কেন না ঐ সকল গ্রন্থ প্রায় লোপ পাইয়াছে—সুতরাং এমন হইতে পারে যে, ঐ অপরিজ্ঞাত গ্রন্থ সম্বন্ধে একবার গ্রন্থকার-প্রদত্ত গ্রন্থের নাম ও একবার গ্রন্থকারের নাম দুই নামই উল্লেখ করিয়াছি; কিন্তু সে আশঙ্কা খুব অল্প।

কাতন্ত্রের যে সকল টীকা আছে, তাহার সমুদায় টীকাতেই যে কাতন্ত্রের চারি ভাগের ব্যাখ্যাদি আনুপূর্ব্বিক উল্লিখিত আছে তাহা নহে, কোন্ কোন্ টীকা কেবল অংশ বিশেষের ব্যাখ্যার জন্যও বিনির্ম্মিত হইয়াছে। যেমন, ষট্‌কারিকায় কেবল কারক সম্বন্ধেই অল্প কিছু বিবৃত আছে, কৃদ্মঞ্জরীতে কৃৎ প্রকরণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আছে এবং বিল্লেশ্বর বিশেশ্বরে আখ্যাত সম্বন্ধে কয়েকটী কথা লিখা আছে।

কাতন্ত্রের অতিরিক্ত গ্রন্থকারদের, টীকাকার, পরিশিষ্টকার প্রভৃতির বিষয় আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাদের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে—দুই চারি পংক্তি এই অধ্যায়ে বলিতেছি।

(কুলচন্দ্র)

কুলচন্দ্র একজন প্রাচীন টীকাকার। ইহার টীকার নাম "দুর্গবাক্য প্রবোধ।' দুর্গসিংহের টীকাই, কুলচন্দ্রকৃত টীকার আদর্শ স্বরূপ। কুলচন্দ্রের বৈয়াকরনিক নিপুণতা সুন্দর আছে। ইনি যে একজন প্রগাঢ় বিদ্বান ছিলেন তাহা ইহাঁর কৃত টীকাই বিলক্ষণ সাক্ষ্য দিতেছে। কুলচন্দ্রের পিতার নাম মহীধর ১। ইহাঁর আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিবার উপায় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এই অত্যুৎকৃষ্ট টীকা খানি প্রায় লোপ হইয়া যাইতেছে।

(বিদ্যাসাগর)

বিদ্যাসাগরকৃত টীকাও দুর্গসিংহকৃত টীকার টীকা স্বরূপ। বিদ্যাসাগরের টীকা অতি বিস্তীর্ণ এবং তর্ক বিতর্কে পরিপূর্ণ। ইনি যে তর্কশাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন, ইহাঁর টীকার প্রতি পৃষ্ঠাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই বিদ্যাসাগর কাহারও মতে দুর্গসিংহের শিষ্য ছিলেন ২। কিন্তু একথা

---

১ শ্রীমহীধরাত্মজকুলচন্দ্রকৃতৌ দুর্গবাক্য প্রবোধে (কুলচন্দ্র)

২ আমরা পূর্ব্বেও এই কথা বলিয়াছি (ভারতী, ২য় ভাগ, চৈত্র ৫৩৮)। বিদ্যাসাগরকৃত গ্রন্থ এখন সংগ্রহ করা বড় দুর্ঘট; এদেশে উহা প্রায় লোপ হইয়াছে। পুস্তকের অভাবেই পুরাতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ সংস্কৃতজ্ঞ লোকদের কথায় বিশ্বাস করিয়া পূর্ব্বেও বিদ্যাসাগরকে দুর্গসিংহের শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া ছিলাম। সংপ্রতি একখানা বিদ্যাসাগরের টীকা দেখিয়া আমাদের ঐ সংস্কার দূর হইল কিন্তু ঐ গ্রন্থখানি পাইয়াও আমরা বিদ্যাসাগরের সমুদয় বিষয় সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলাম

নিতান্তই কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয়; কেননা ইহার প্রণীত টীকায় শ্রীপতি, ত্রিলোচন, কলাপচন্দ্র প্রভৃতি দুর্গসিংহ অপেক্ষা অনেক পরবর্ত্তীয় লোক ও গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ আছে সুতরাং এই বিদ্যাসাগরকে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ৩।৪ শতাব্দির অধিক পূর্ব্বের লোক বলিতে পারি না। বিদ্যাসাগর ভট্টি কাব্যেরও কাতন্ত্র-সম্মত এক খানা টীকা প্রণয়ন করেন। ভরতমল্লিকের যে একখানা ভট্টির টীকা আছে উহার অনেক স্থল প্রায় বিদ্যাসাগরের টীকার অনুলিপি মাত্র—প্রভেদ এই যে বিদ্যাসাগরের টীকা কাতন্ত্রসম্মত। ভরতমল্লিকের টীকা মুগ্ধবোধসম্মত। ইহাতেই বোধ হয় বিদ্যাসাগর ভরতমল্লিক অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বের লোক। এখন কাতন্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের টীকারও তত প্রচলন দেখা যায় না; বোধ হয় বিস্তারিত-দোষই ইহার একমাত্র কারণ—বিশেষতঃ ঐ টীকার সংস্কৃত কিছু কঠিন।

(ভব-সনন্দি;—ষট্‌কারিকা প্রণেত.)

ভবসনন্দি কৃত "ষট্‌কারিকা" অতি প্রাচীন গ্রন্থ—কিন্তু অতি ক্ষুদ্র কলেবর বিশিষ্ট। ইহাতে কাতন্ত্র-সম্মত কারক, চতুর্দ্দশটী পদ্যময় কারিকায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও গ্রন্থকার আশ্চর্য্য কৌশলে উক্ত চতুর্দ্দশটী কারিকায় কারকের নিয়ম সকল, এরূপ সুন্দর প্রণালীতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাহা বুঝিয়া পাঠ করিলে উহা দ্বারাই কারকের ভাল জ্ঞান হইতে পারে। এত অল্প কথায় যে গ্রন্থকার কারকের নিয়মাদি সুন্দর রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা কেবল অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় নহে। গ্রন্থকার ঐ চতুর্দ্দশটী কারিকার টীকাও করিয়া গিয়াছেন। ইনি বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া গিয়াছেন। (৩) ষট্‌কারিকার শেষ ভাগে লিখিত আছে যে "এই গ্রন্থ ৪১৯ অব্দে প্রণয়ন আরম্ভ হইয়া ৪২০ অব্দে প্রকাশিত হইল(৪)। তাহার নির্দ্দিষ্ট অব্দ শকাব্দা কি সংবৎ কিছুই উল্লেখ করে নাই। যদি শকাব্দা হয় তবে খৃষ্টীয় ৪৯৮ এবং যদি সংবৎ হয় তবে খৃষ্টীয় ৩৬৩ অব্দে তাহার ষট্‌কারিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং ভব-সনন্দি দুর্গসিংহের কিছু পূর্ব্বের অথবা সমসাময়িক লোক। বোধ হয় কাতন্ত্রের বৃত্তি প্রণয়ন হইবার পূর্ব্বে ইহাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল।

না। কেন না ঐ গ্রন্থের আদি অন্ত কিছুই নাই সুতরাং বিদ্যাসাগরের প্রকৃত নাম কি এবং তাঁহার টীকার আর কোন নাম আছে কি না তাহা উহা দ্বারা জানা গেল না।

(৩) ভয়ং মারবলং যেন নির্জ্জিতং ভব-পঞ্জরম্।
নির্ব্বাণ-পদমারূঢ়ং তং বুদ্ধং প্রণমাম্যহম্॥

(৪) ঊনবিংশতিসংযুক্তা গ্রন্থস্যাস্য চতুঃশতীং।
নির্ম্মিতা নিগদব্যেহ স্ফুটং ভব-সনন্দিনা॥
ইমাং বিংশতি সংযুক্তা সাধবস্য চতুঃশতীং
আত্তাং

(ত্রিলোচনদাস—কাতন্ত্রপঞ্জিকা প্রণেতা)

ইদানীং যতগুলি কাতন্ত্র-টীকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ত্রিলোচনদাস-কৃত "কাতন্ত্র পঞ্জিকা" নামক টীকাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কাতন্ত্র-পঞ্জিকা সাধারণে "পঞ্জি" নামেই বিখ্যাত। ত্রিলোচন বিশেষ সাবধানের সহিত পূর্ব্বাচার্য্যদের নানা গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়া তদীয় "কাতন্ত্র পঞ্জিকাকে" অপূর্ব্ব সাজে সাজাইয়াছেন। ত্রিলোচন অযথা আড়ম্বরে না যাইয়া তাহার গ্রন্থে সার কথাই অধিক বিনিবেশিত করিয়াছেন। অন্যান্য টীকাকার অপেক্ষা এখন ত্রিলোচনদাসই সমাদর পাইতেছেন—তাঁহার টীকাই এখন সর্ব্বত্র প্রচলিত। ত্রিলোচনদাস এষ্ঠকুলোদ্ভব ছিলেন (৫) তাঁহার গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভা-পণ্ডিত গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব গোস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন (৬)। লক্ষ্মণ সেনের প্রিয় মন্ত্রী হলায়ুধ আবার ত্রিলোচনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। (৭) সুতরাং ত্রিলোচন যে লক্ষ্মণসেনের সমকালে (খৃঃ ১১০১ হইতে ১১২১ অব্দ পর্য্যন্ত) বর্ত্তমান ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। (৮) ত্রিলোচনের ন্যায় ভাল টীকাকার খুব অল্প দেখা যায় কিন্তু তিনিও হলায়ুধের অযথার্থ বাণ—নিন্দা হইতে অব্যাহতি পান নাই। হলায়ুধ ত্রিলোচনকে বলিয়াছেন "বুদ্ধিহীন ত্রিনেত্রঃ" অর্থাৎ ত্রিলোচন বুদ্ধিহীন। যিনি মহামহোপাধ্যায় দুর্গসিংহকে নিন্দা করিতে একটুকু কুণ্ঠিত হয়েন নাই তিনি যে ত্রিলোচনকে কেবল বুদ্ধিহীন বলিয়াই মুক্তি দিয়াছেন তাহাই ত্রিলোচনের পরম সৌভাগ্য কিন্তু তথাচ বলি, হলায়ুধের মুখে একথা একটুকুও শোভা পায় না—তিনি ত্রিলোচন অপেক্ষা বিদ্যা বিষয়ে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নন।

(সুসেন কবিরাজ—কলাপচন্দ্র প্রণেতা)

সুসেন কবিরাজ "কলাপ-চন্দ্র" নামক টীকা প্রণয়ন করেন (৯)। ত্রিলোচন দাস

৫ ইতি বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীত্রিলোচনদাস কৃত "কাতন্ত্র-পঞ্জিকা" ইত্যাদি।

৬ এবং ৭ তৃতীয় অধ্যায়ের ২৪ এবং ২২ সংখ্যক টীকা দেখ।

৮ লক্ষ্মণসেন নানামতে কত বৎসর রাজত্ব করেন ও কোন্ সময়ে রাজত্ব করেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—লক্ষ্মণসেনের বঙ্গে ১২ এবং দিল্লীতে ১০ একুনে ২২ বৎসর রাজত্ব (বৈদ্যকুল পঞ্জিকা) আইন আকবরির মতে লক্ষ্মণসেনের ৭ বৎসর রাজত্ব। রাজাবলির মতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব ১০ বৎসর ৫ মাস। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব ১১০১ খৃষ্টাব্দ ও তদুত্তরাধিকারী মাধবসেনের ১১২১ খৃষ্টাব্দ সুতরাং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ২১ বৎসর। (I. A. S. of B. 1865 P. I Page 139.) সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে লক্ষ্মণ সেন ১১০১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৯ আচার্য্য কবিরাজেন সুসেনেন বিনির্ম্মিতঃ। আত্তাং কলাপচন্দ্রোঽয়ং কালাপানাং মনোমুদে॥ (কলাপচন্দ্র)

কৃত কাতন্ত্র পঞ্জিকাই ইহাঁর গ্রন্থের আদর্শ স্থল। ত্রিলোচনের সমালোচনা করাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, ইনি তাহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।(১০) সুসেন কবিরাজ ত্রিলোচনের পরে ও রঘুনাথ শিরোমণির প্রায় সমকালে কিংবা কিছু পূর্ব্বে "কলাপচন্দ্র" প্রণয়ন করেন। ইনি একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন; "কলাপচন্দ্রে" ইহাঁর বিলক্ষণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটকচূড়ামণি দেবীবরের সমকালে একজন বিখ্যাত সুসেনের নাম দৃষ্ট হয় (১১) সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতার মতে সেই সুসেনের উপাধি "মুখোপাধ্যায়" এবং সুসেন একজন পণ্ডিত ছিলেন (১২)। উক্ত গ্রন্থকার সুসেনকে, ১৪৭২ শকে (১৫৫০ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া (একটা মোটা মোটি) অনুমান করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সময়েই চৈতন্য, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিরও আবির্ভাব সময় (১৩)। আমাদের বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত দেবীবরের সমকালীন সুসেন পণ্ডিতই "কলাপচন্দ্র" প্রণয়ন করিয়াছেন। এখন কাতন্ত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুসেনের কলাপচন্দ্র বিশেষ রূপে প্রচলিত দেখা যায়। এমন কি "কাতন্ত্র পঞ্জিকা" ও "কলাপচন্দ্র" যাঁহারা ভালরূপ পাঠ না করেন তাঁহারা কাতন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। "কলাপচন্দ্র" সাধারণে "কবিরাজ" বলিয়া বিখ্যাত।

(হেমকর)

ত্রিলোচনের "কাতন্ত্রপঞ্জিকা" হেমকরেরও আদর্শস্থল। তাঁহার কৃত নাতিপ্রসিদ্ধ টীকাও সম্ভবতঃ দশম খৃষ্টাব্দের পরার্দ্ধে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হেমকর অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব ছিলেন। হেমকরের টীকাও প্রায় লোপ হইয়া আসিল। হলায়ুধ, হেমকরকেও নিন্দা করিয়াছেন।

(উমাপতি)

উমাপতিধর লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন (১৪)। ইনি কাতন্ত্র-সম্মত একখানি পদ্যময় টীকা

কোন কোন গ্রন্থে "আচার্য্য কবিরাজেন" ইহার পরিবর্ত্তে "শ্রীবিদ্যাভূষণাচার্য্য" এই রূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

১০ শ্রীমত্ত্রিলোচন কৃতাখিল পঞ্জিকাসু দোষান্ধকারনিকরং প্রতিপক্ষদত্তং।
কলাপচন্দ্র।

(১১) যোগেশ্বরো দিনেশশ্চ হরিবর্ষধর স্তথা।
পঞ্চাননঃ সুসেনশ্চ ষড়েতে চৈকমেলকাঃ। (ধ্রুবানন্দ মিশ্র)
পঞ্চাননে হয়কুল দিনকর বংশে।
সুসেন হয়েন মূল নৃসিংহের অংশে॥
সুসেন বলিলে হয় ত্রিযোগের সংজ্ঞা।
চন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কুলপঞ্জিকা"

(১২) " ৬। সুসেন (মুখোপাধ্যায়) পণ্ডিত। " "সম্বন্ধ নির্ণয়" ১৮৫ পৃষ্ঠা।

(১৩) " সম্বন্ধ নির্ণয় ১৮৬। ১৮৭ পৃষ্ঠা।

১৪ গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ।

প্রস্তুত করেন উহাকে সাধারণে "উমাপতির কারিকা" বলে। সুসেন কবিরাজ প্রভৃতি আধুনিক টীকাকারগণ অনেক স্থলে উমাপতির মত গ্রহণ করিয়াছেন। উমাপতি একজন বিশুদ্ধ সংস্কৃত লেখক। রাজসাহীর অন্তর্গত বারিণ্ নামক স্থানে যে প্রস্তর ফলক পাওয়া যায়, তাহার রচয়িতা উমাপতিধর (১৫)। উমাপতির সংস্কৃত ভারি কঠিন। ইনি একজন অত্যুক্তি ভাষী কবি। গীতগোবিন্দকার জয়দেব উমাপতিকে পল্লবগ্রাহিতা দোষে দোষী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উমাপতি সম্বন্ধে মত এই—"প্রস্তরখোদিত শ্লোকের বিশুদ্ধ সংস্কৃত কিন্তু রচনা সাতিশয় অত্যুক্তিপূর্ণ। শ্লোকের রচয়িতা সামান্য তুলনায় সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহার কোন মন্দির বর্ণনার আবশ্যক হইলে তিনি তাহার বর্ণিত মন্দিরচূড়া সূর্য্যের গতিরোধক না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার বর্ণিত নৃপতিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের নায়কগণকে রূপাভিমানী এবং ঠাঁহাদের অবতার বলিয়া তিরস্কার করে, এবং তাহার যুদ্ধ তরণী গুলি গঙ্গাসৈকতে ভগ্ন দশায় পতিত হইয়া চন্দ্রকেও তিরস্কৃত করে। (১১)

উমাপতি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দির পরার্দ্ধে এবং একাদশ শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। কেহ অনুমান করেন উমাপতি অম্বষ্ঠকুলোদ্ভব ছিলেন,—ধর শব্দ অম্বষ্ঠদের উপাধিতেও প্রয়োগ হইয়া থাকে (১৮) এবং অনেক স্থলে উহা নামের অঙ্গীয় হইয়াও প্রয়োগ হয় সুতরাং উমাপতি অম্বষ্ঠ কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

---

১৫ নির্ণিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা
মগ্রস্থিমগ্রথনপক্ষমল সূত্রবল্লী।
এষা করোঃ পদ পদার্থবিচার শুদ্ধ
বুদ্ধে রুমাপতি ধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ।
(রাজসাহী প্রাপ্ত প্রস্তর ফলকোদ্ধৃত শ্লোক ৩৫)।

Journal of the Asiatic Society of Bengal P. 141 No 1 of 1865.

১৬ বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহ দ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর-সৎ প্রমেয়রচনৈ রাচার্য্য গোবর্দ্ধন—
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবি ক্ষ্মাপতিঃ।
(জয়দেব, ১সর্গ, ৯ শ্লো)

১৭ "On the Sena Raja of Bangal Journal of the Asiatic Society of Bengal. No III 1865 P. 129. আমরা উল্লিখিত রাজেন্দ্র বাবুর মত, রাজা পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরীর "আদিশূর ও বল্লাল সেন" হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

১৮ সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো "ধরঃ"।
রাজসোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
কুলপঞ্জিকাধৃত ব্যাস বচনম্ (শব্দ কল্পদ্রুম বৈদ্য শব্দ দ্রষ্টব্য)

(রঘুনাথ শিরোমণি—"কলাপ-তত্ত্বার্ণব"-প্রণেতা)

তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি "কলাপ

তত্ত্বার্ণব" নামক একখানা কাতন্ত্রটীকা প্রণয়ন করেন, উহা "শিরোমণি" নামেই বিখ্যাত। বোধ হয় তর্কাচার্য্য মহোদয়ের এই টীকা খানিই সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মাঝে মাঝে বৈয়াকরণিক নিপুণতা প্রকাশ হইয়াছে। শিরোমণি যেমন বাস্তবিকই, ভারতের শিরোভূষণ স্বরূপ——কলাপতত্ত্বার্ণব, তাদৃশ মহাত্মার প্রকৃত ক্ষমতার পরিচায়ক না হইলেও উহা একটী দেব আভরণ স্বরূপ। কলাপতত্ত্বার্ণব প্রণেতা আর কেহ হইলে তিনি উহা দ্বারাই যশস্বী হইয়া যাইতে পারিতেন। যেমন অমরাবতীর নিকট মানবীয় বহু সমৃদ্ধিশালিনী পুরীর তুলনা হইতে পারে না সেই রূপ রঘুনাথের তার্কিক গ্রন্থাদির সহিত কলাপতত্ত্বার্ণবের তুলনা না হইলেও উহা সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুর্ল্লভ।

কাহারও নিকট "কলাপতত্ত্বার্ণব" সাধারণে প্রকাশিত হওয়া সম্বন্ধে একটী জনশ্রুতি শুনা যায় "স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সহিত তার্কিক রঘুনাথ শিরোমণির বড় সদ্ভাব ছিল না, যো পাইলে কেহই কাহাকে অপদস্থ করিতে ত্রুটী করিতেন না। শিরোমণি, "কলাপ তত্ত্বার্ণব" প্রস্তুত করিলেন কিন্তু তাহা যাহাতে সাধারণে প্রকাশ না হইতে পারে রঘুনন্দন সতত সেই চেষ্টা করিতেন, ও ঐ টীকার নানা দোষ লোকসমাজে ঘোষণা করিতেন; এ দিকে শিরোমণিও রঘুনন্দনের সংকলিত স্মৃতি সকল যাহাতে সাধারণে প্রচার না হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন ও লোকের নিকট বলিয়া ফিরিতেন যে, রঘুনন্দনের স্মৃতি কয় খানির একখানিও শাস্ত্রসম্মত হয় নাই, উহা প্রায়ই কাল্পনিক পুরাণাদি হইতে সংকলিত ও স্বকপোলকল্পিত। এইরূপ পরস্পর বিদ্বেষ হেতু কিছু দিন কাহার গ্রন্থই প্রচার হইতে পারিল না। একদিন কোন শ্রাদ্ধোপলক্ষে উভয় মহাত্মার সাক্ষাৎ হইল। তখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শিরোমণিকে বলিলেন—রঘুনাথ! আমাদের পরস্পর বিদ্বেষ ভাব থাকাতে আমাদের উভয়ের পরিশ্রমার্জ্জিত গ্রন্থগুলির প্রচার সম্বন্ধে মহা প্রতিবন্ধক ঘটিতেছে—উহাতে উভয়েরই যশের হানি করিতেছে। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার গ্রন্থ যাহাতে সাধারণে প্রচলিত হইতে পারে তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিব—আর কোন বাধা দিব না। তোমারও আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে যে, অদ্য এই শ্রাদ্ধে যেন আমার স্মৃতি অনুসারে কার্য্য হয়। তখন শিরোমণি উত্তর করিলেন, যদি এমত হয়, তবে আমিও তোমার স্মৃতি কয় খানি অবশ্যই প্রচার করিয়া দিব। সেই দিন হইতে উভয় মহাত্মার সন্ধি হইল এবং তখন হইতে নির্ব্বিবাদে উভয়ের গ্রন্থ প্রচারিত হইতে লাগিল। ঐ জনশ্রুতিটী কতদূর সত্য, জানি না।

রঘুনাথ শিরোমণি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক লোক। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অঃ) নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া

১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খৃ অব্দে) নীলাচলে (জগন্নাথ ক্ষেত্রে) তিরোভূত হয়েন ১৯। ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্ব্বিগাহ ধীষণাশক্তি সহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতনরূপ পন্থা আবিষ্কার করেন। এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহা পাণ্ডিত্য সহকারে তৎকালপ্রচলিত ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব নামক অভিনব প্রকার স্মৃতি সংগ্রহের প্রণয়ন করেন। ২০

কাহারও মতে "স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য, শিরোমণি ও চৈতন্য একই সময়ে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হয়েন। রঘুনাথ শিরোমণি "চিন্তামণি দীধিতি" নামক প্রসিদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং মিথিলায় পক্ষধর মিশ্রকে ২১ বিচারে পরাস্ত করিয়া ন্যায় বিষয়ে নবদ্বীপের মহিমা বিস্তার করেন।—২২ " আর একজনের মতে —"তখন কানাভট্ট শিরোমণি (রঘুনাথ শিরোমণি) পক্ষধর মিশ্রের নিকট পাঠ সমাপ্তি পূর্ব্বক মিথিলা হইতে ন্যায় শাস্ত্রের স্রোত ফিরাইয়া নবদ্বীপে আনয়ন করিয়া দেবলোকে অবস্থান পূর্ব্বক সর্ব্বদেশীয় নৈয়ায়িকদিগের মুখ হইতে স্বীয় প্রশংসা শ্রবণ করিতেছেন। তাঁহারা শিরোমণিকে গৌতমাদি অপেক্ষা কুশাগ্রবুদ্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ২৩

যে বৃহস্পতিসম প্রভ, তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি অপার্থিব প্রতিভা প্রভাবে তর্কশাস্ত্র বিষয়ে সমস্ত আর্য্যভূমির শীর্ষস্থান লাভ করিয়া অশ্রুচ্ছেদ্য ক্ষীণজীবী

---

১৯ শাকে চতুর্দ্দশ শতে রবিবাজিযুক্তে
গৌরো হরি র্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্থবতিভাজি তদীয় লীলা
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥
(চৈতন্য চন্দ্রোদয়)

——শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চর্ব্বিশবৎসর প্রকট বিহারী॥
চৌর্দ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌর্দ্দশত পঞ্চান্নে হইলা অন্তর্ধান॥
(চৈতন্য চরিতামৃত আদ্য কাণ্ড)

২০ বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে" ৪৪ পৃষ্ঠা। 'ভারতী' প্রথমখণ্ড ৪২৪ পৃষ্ঠা।

২১ কেহ বলেন গীতগোবিন্দ জয়দেব পঠদ্দশায় এক এক পক্ষান্তে স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ করিতেন বলিয়া পক্ষধরমিশ্র নামে অভিহিত হইতেন (কার্য্যকলাপ সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ এবং শ্রীযুক্ত ফিট্‌জ এডওয়ার্ড হল সম্পাদিত সাংখ্য প্রবচন ভাষা ভূমিকা ৬৩ পৃষ্ঠা) আবার কেহ বলেন চিন্তামণির আলোক" নামক ন্যায় গ্রন্থের টীকা পক্ষধর মিশ্রকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ (শব্দকল্পদ্রুম ১৭৯১ পৃষ্ঠা,) প্রসন্নরাঘবপ্রণেতা নিজকে তার্কিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং ঐ উপাধি প্রসন্নরাঘবপ্রণেতার হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ ইত্যাদি (জয়দেব চরিত ২৭।২৮ পৃষ্ঠা) আমরা বলি অনর্থক এত গোলমাল করিয়া ফলকি ? এ " পক্ষধর মিশ্র" এবং রঘুনাথ শিরোমণির আচার্য্য পক্ষধর মিশ্রকে অভিন্ন কল্পনা করিলে দোষ কি ?

২২ শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ বিএল-প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস ৯ ম সংস্করণ। ৩৩পৃষ্ঠা।

২৩। "সম্বন্ধ নির্ণয়" ১৮৭ পৃষ্ঠা।

বাঙ্গালির,দেশদেশান্তরে গৌরব বর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন, যিনি বাঙ্গালির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রথম গৌরবনিদান স্বরূপ যাঁহার দেবদুর্লভ মার্গ অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশ তর্ক বিজ্ঞানে, অন্যান্য পবিত্রকীর্ত্তি-বুধপ্রসূ ভূমিরও শিক্ষাগুরু হইয়াছেন, —সেই বঙ্গপ্রভাকর কাতন্ত্রকে সমাদর করিয়া যে একটী সামান্য আভরণ প্রদান করিয়াছেন তদ্বিবন্ধনও কাতন্ত্র বিশেষ উপকৃত ও গৌরবান্বিত হইয়াছে। (২৪)

শিবরাম শর্ম্মা (কৃষ্ণজরী-প্রণেতা)

শিবরাম শর্ম্মা অতি সংক্ষেপে কৃৎপ্রত্যয়াদি সম্বন্ধে কয়েকটী সার কথা বলিয়াছেন—

"সংক্ষেপতঃ শ্রী শিবরাম শর্ম্মা
—কৃষ্ণজরীং বালমুদে তনোতি।"

ইঁহার গ্রন্থের আয়তন ১০।১২ পৃষ্ঠার অধিক নয়। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। অনেক স্থলে এই গ্রন্থ খানি প্রচলিত দেখা যায়। বোধ হয় গ্রন্থ খানির বয়ঃক্রম ৩০০ বৎসরের অধিক নয়।

ক্রমশঃ

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ২ ভাগ ১২ সংখ্যা ৪৪১ পৃষ্ঠার পর।

পূর্ব্বে উন্নতির যে ছয়টি ধাপ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যদিও বহির্বস্তুর সঙ্গ-সাপেক্ষ কিন্তু তাহার মূল আদর্শ আমাদের আপনার আপনার জ্ঞানাভ্যন্তরেই বর্ত্তমান

২৪ কেহ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ প্রণীত "কারকচক্র" নামক ন্যায়ঘটিত পদার্থ গ্রন্থকেও কাতন্ত্র সহযোগী বলিতে চাহেন বাস্তবিক তাহা নহে কারকচক্রের সহিত কোন ব্যাকরণ বিশেষের সংস্রব নাই, উহাতে কেবল ন্যায়শাস্ত্র অনুযায়ী কারকের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে;—

নত্বা কৃষ্ণপদদ্বন্দং কারকাণামর্থ নির্ণয়ঃ।
শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশেন বিতন্যতে॥

তবে উদাহরণ স্থলে প্রায় কাতন্ত্রের উদাহরণ গুলিই অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া কাতন্ত্রের সহিত উহার কোন সংস্রবও নাই। ভবানন্দ এক জন এদেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত। ইনি ন্যায়শাস্ত্রের একটী অমূল্য রত্ন। কাহারও মতে রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্ব্বভৌম গদাধর তর্কালঙ্কার জগদীশ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ বাঙ্গালি ও আমাদের গৌরবের স্থল (বঙ্গদর্শন ৩য় ভাগ ৪৮৮পৃ।) মাধব চম্পূ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রনেতা চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র ছিলেন এবং রাঘবেন্দ্র ইহাঁর শিষ্য ছিলেন। (বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)

আছে। দুই বিপরীত পক্ষের সঙ্গ হইতে তৃতীয়ের উৎপত্তি এই যে একটি ব্যাপার ইহা বহির্জগতে শুধু নয়, আমাদের জ্ঞানের মধ্যেও নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে। প্রথমে জ্ঞান মূলতত্ত্ব সকলের সহিত এবং মন ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার সহিত মিলিয়া মিশিয়া তন্ময়ীভূত হইয়া থাকে, এইটি প্রথম ধাপ; তাহার পরে মন জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইয়া আপনাকে জ্ঞানের হস্তে সমর্পণ করে; মন স্বয়ং কিছু নয়, তাহা জ্ঞানের বৃত্তি স্বরূপ, জ্ঞানের এই রূপ স্বামিত্ব তখন প্রকটিত হয়; জ্ঞান তখন মন-দ্বারা রঞ্জিত হয় এবং মন জ্ঞান-দ্বারা আবিষ্ট হয়; উভয়ের এই যে দাম্পত্য সম্বন্ধ এইটি দ্বিতীয় ধাপ; তাহার পর ভাবনাদি প্রকরণ দ্বারা মন-হইতে বিশেষ বিশেষ নানাবিধ জ্ঞান প্রসূত হয়, এই রূপ বিশেষ বিশেষ জ্ঞান বিজ্ঞান-শব্দের বাচ্য; বিজ্ঞান যত আছে সকলই জ্ঞানের সন্তান-সন্ততি। বিজ্ঞানের প্রতি জ্ঞানের যে বাৎসল্য সম্বন্ধ, এইটি তৃতীয় ধাপ; বিজ্ঞানের সহিত বিজ্ঞানের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ, বিজ্ঞান এবং শিল্পের মধ্যে ভ্রাতৃ-ভগিনী সম্বন্ধ, ইহাদের পরস্পর এই যে সৌহার্দ্দ সম্বন্ধ, এইটি চতুর্থ ধাপ; বিজ্ঞান-সমস্ত যখন সৌহার্দ্দে মিলিত হইয়া মূল-জ্ঞানের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করে, মূল-জ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের এই যে ভক্তি-সম্বন্ধ এইটি পঞ্চম ধাপ; এবং আদ্যোপান্ত সকলের মধ্যে একটি সম্বন্ধ-সূত্র সঞ্চারিত রহিয়াছে এই যে একটি সর্ব্ব-নির্বিশেষ উদার-প্রেম-সম্বন্ধ, এইটি ষষ্ঠ ধাপ।

প্রথমে যখন মন দেখা-শুনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াতেই নিমগ্ন থাকে, তখনকার সে দেখা-শুনা শুদ্ধ কেবল অবস্থার পরিবর্ত্তন মাত্র, তখনকার সে দেখা দেখাই নহে, শুনা শুনাই নহে; তাহার পরে মন যখন জ্ঞানকে স্বামী রূপে বরণ করে, তখন দেখা-শুনা-রূপ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া জ্ঞানা-রূপ জ্ঞান-ক্রিয়া-দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়; তখন "আমি দেখিতেছি" এবং "আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি" এই দুইটি ব্যাপার এক সঙ্গে চলিতে থাকে। তাহার পর জ্ঞানাভ্যন্তরে বস্তুগুণ, কার্য্যকারণ, একানেক, ভাবাভাব, প্রভৃতি যে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব আছে তাহা দেখা-শুনা-রূপ ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া, কেবল দেখা শুনা মাত্রকে নহে পরন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বস্তু সমূহকে জ্ঞানায়ত্ত করে; জ্ঞান হইতে যে সকল মূলতত্ত্ব স্ফূরিত হয়, মন ভাবনা দ্বারা বিষয় সকলকে তাহার অধীনে সমর্পণ করে, এই রূপে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি এবং মনের ভাবনা একত্র মিলিয়া বিজ্ঞান উৎপাদন করে। মূলতত্ত্ব সকলের উৎস স্বরূপ যে জ্ঞান, এবং সেই মূলতত্ত্ব সকলকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান-কার্য্যে ফলিত করে যে মন, বিজ্ঞানের প্রতি উভয়েরই পুত্রবাৎসল্য সমান। দর্শনশাস্ত্রে মূলজ্ঞান, এবং কারণ-রূপিণী ও কার্য্য-রূপিণী প্রকৃতি তত্ত্বশব্দে উক্ত হয়, এবং তদ্বিষয়ক যে জ্ঞান তাহা তত্ত্বজ্ঞান শব্দে উক্ত হয়। মন প্রকৃতির ছাঁচেই গঠিত; প্রকাশ

চাঞ্চল্য এবং বাধা—প্রকৃতির এই যে তিনটি অবয়ব যাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণ বলিয়া উক্ত হয়, মন তাহাদেরই ক্রীড়া-ক্ষেত্র; মন, খণ্ড-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে; এজন্য প্রকৃতিকে যেমন, মনকেও তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলিলে তাহাতে বিশেষ কোন অর্থ-বৈলক্ষণ্য ঘটে না। শৈশবাবস্থায় বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের আঁচল ধরিয়া চলে, এবং পুরুষাত্মক জ্ঞান অপেক্ষা প্রকৃতি-আত্মক মনের সহিত তাহার অধিক ঘনিষ্ঠতা-বশতঃ তাহা কল্পনার সবিশেষ বশবর্ত্তী হইয়া চলে। তাহার পর বিজ্ঞান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের অনুরাগ বল করিতে থাকে; বিজ্ঞানের এই অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি, ব্যক্তি-বিশেষের থাকে, ব্যক্তি-বিশেষের থাকে না—জন-সমাজে এইরূপ দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে যখন অনেক দূর পর্য্যন্ত সৌহার্দ্দ-বন্ধন বিস্তৃত হয়, তখন আবার সেই পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি তাহার অনুরাগ আবির্ভূত হয়; শৈশবাবস্থায় বিজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের আঁচল ধরিয়া চলিত বটে কিন্তু তখন সে মনেরই (প্রকৃতিরই) বিশেষ পক্ষপাতী ছিল, কল্পনাই তাহার পথের সম্বল ছিল, এখন সে, জ্ঞানের (পুরুষের) পক্ষ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত হয়; বিজ্ঞান এখন আরোহ প্রণালীর চরম সীমায় পৌঁছিয়া অবরোহ-প্রণালীর পন্থা অন্বেষণ করে। মূল-জ্ঞান, সকল-প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, এজন্য তাহা নিজে প্রমাণ-সাপেক্ষ নহে; এই কারণ বশত বিজ্ঞান, প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানকে আপনার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে, সমাক আয়ত্তের মধ্যে, আনিতে পারে না; পারে কি—না তত্ত্বজ্ঞানের অধীনে আপনাকে সংযত এবং নিয়মিত করা-টি মাত্র। বিজ্ঞানের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের যেরূপ বাৎসল্য ভাব, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের তদনুযায়ী শ্রদ্ধা ভক্তি হওয়াই নিয়ম-সংগত। বিজ্ঞান যখন তত্ত্বজ্ঞানের প্রসাদ অভ্যর্থনা করিয়া প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া অপার শান্তিরসে নিমগ্ন হয়, তখন সকল আবরণ ভেদ করত সকলের মধ্যে একটি প্রগাঢ় ঐক্য অনুভব করিয়া আপ্তকাম হয়; "আমি দেখিতেছি," এই গেল উপরের আবরণ; "আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি" "এই গেল মধ্যের আবরণ; এবং "আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি," এই গেল ভিতরের আবরণ; আমি দেখিতেছি কি? না আকাশব্যাপী বস্তু-সকল; আমি জানিতেছি কি? না আকাশব্যাপী বস্তু এবং কালব্যাপী-দর্শন-ক্রিয়া, উভয়কেই; সে জ্ঞান-ক্রিয়া কোথায় প্রকাশিত হইতেছে না অপরিবর্ত্তনীয় সুতরাং কালাতীত মূল-জ্ঞান যাহা প্রজ্ঞান শব্দের বাচ্য সেইখানে। কিন্তু যে আমি জ্ঞান দ্বারা আপনার বিজ্ঞানকে জানিতেছি, সেই আমি বিজ্ঞান-দ্বারা বিষয় সকল জানিতেছি এবং সেই আমি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় সকল দেখিতেছি, এই রূপ এক আত্মার ভাব উচ্চ নীচ সমুদায়-বৃত্তিকে এক উদার আত্মিক ঐক্য-বন্ধনে আবদ্ধ করে। "আমি দেখিতেছি" এই

আবরণটি শারীরিক সুখ-দুঃখের আয়তন; "আমি জানিতেছি যে আমি দেখিতেছি বা দেখিয়াছি বা দেখিব" এই আবরণটি মানসিক সুখ দুঃখের আয়তন এবং "আমি জানিতেছি যে আমি জানিতেছি" এই আবরণটি আধ্যাত্মিক সুখ দুঃখের আয়তন স্বরূপ। মূল-জ্ঞানের সহিত সাময়িক জ্ঞান-ক্রিয়া সকলের যদি পূর্ব্বাপর ঐক্য হয় অর্থাৎ এখনকার জ্ঞান যদি সর্ব্বসময়-কার জ্ঞানের সহিত সুসঙ্গত হয় তাহা হইলেই সত্য জানা হয়, সত্য জানা হইলে এবং তদনুসারে কার্য্য-কৃত হইলে আধ্যাত্মিক আনন্দ হয়—আত্মপ্রসাদ হয়, তাহার অনাথা হইলে আধ্যাত্মিক শূন্যতা অথবা আধ্যাত্মিক গ্লানি, ইহার একটি না একটি উৎপন্ন হয়। এইরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন জীবাত্মা অপরিচ্ছন্ন পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; কেননা মূলে অপরিচ্ছন্ন থাকিলে, তদবলম্বনেই পরিচ্ছন্ন দাঁড়াইতে পারে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে বাহিরের জন-সমাজে উন্নতি-সোপানের ছয়টি ধাপ যাহা নয়নগোচর হয়, আমাদের ভিতরে তাহার মূল আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে।

জ্ঞান-পক্ষীয় যে ছয়টি ধাপ তাহারও আদর্শ আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান আছে। প্রথম ধাপ স্বার্থ;—মনের স্বার্থ বিশেষ বিশেষ বিষয়েতে নিবিষ্ট হইয়া থাকা, জ্ঞানের স্বার্থ সার্ব্বভৌমিক মূলতত্ত্ব সকলেতে তর করিয়া থাকা। দ্বিতীয়—ধর্ম্ম; ধর্ম্ম ঐ দুই স্বার্থকে এক স্বার্থে পরিণত করে, অর্থাৎ মুখ্যরূপে যাহা মনের স্বার্থ, গৌণরূপে তাহা জ্ঞানের স্বার্থ এবং মুখ্যরূপে যাহা জ্ঞানের স্বার্থ, গৌণরূপে তাহা মনের স্বার্থ এইরূপ একটি ভাব দাঁড় করায়; মনের নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ বিষয় না পাইলে জ্ঞান আপনার সার্ব্ব-ভৌমিক তত্ত্ব-সকল কোথায় যে প্রয়োগ করিবে তাহার স্থান অন্বেষণ করিয়া পায় না, এবং জ্ঞানের নিকট হইতে মূলতত্ত্ব না পাইলে মন আপনার বিষয় সকলকে কোথায় যে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিবে তাহার স্থান দেখিতে পায় না; একের স্বার্থে অন্যের স্বার্থ—এটি ধর্ম্মের ভাব। তৃতীয়—শক্তি; বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা মনোমধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যখন সাধারণ তত্ত্বসকলেতে পরিণত হয়, তখন সেই বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব সকলেতে জ্ঞান এবং মন উভয়েরই শক্তি প্রতিফলিত হয়। চতুর্থ—সৌন্দর্য্য; বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সকলের ইতরেতর আনুকূল্য ভাবের মধ্য হইতে সৌন্দর্য্যের ভাব নিশ্বসিত হয়; কিরূপ? না যেমন "মণিনা বলয়ং বলয়েন মণির্ম্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ," মণিতে করিয়া বলয়, বলয়েতে করিয়া মণি এবং মণি ও বলয় উভয়েতে করিয়া কর শোভা পায়, জলেতে করিয়া কমল, কমলেতে করিয়া জল, এবং জল ও কমল উভয়েতে করিয়া সরোবর শোভা পায়; উদ্ভিদ্ বিদ্যা, জীবতত্ত্ব বিদ্যা; রসায়ন বিদ্যা প্রভৃতি, পরস্পর পরস্পরেতে প্রতিবিম্বিত হইয়া ঐরূপ সৌন্দর্য্য উদ্দীপন করে; এক

একটি বিদ্যার শাখাগণের মধ্য হইতেও ঐরূপ সৌন্দর্য্য উদ্গীরিত হয়। পঞ্চম—মঙ্গল; তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের যে গূঢ় একটি টান, বৈজ্ঞানিকেরা তাহা মানুন আর না মানুন, তাহাই বিজ্ঞানের উন্নতির মূল কারণ; সকল জগতের মধ্যে একটি যোগ-সূত্র রহিয়াছে এইটির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় কাহারো প্রবৃত্তি হইত না। তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিজ্ঞানের এই যে আকর্ষণ ইহারই উপরে বিজ্ঞানের মঙ্গল নির্ভর করে। ষষ্ঠ—সামঞ্জস্য; উচ্চ নীচ সকল ধাপের মধ্যে যে একটি একাত্ম ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহাতে সামঞ্জস্যের ভাব, শান্তির ভাব, সত্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পায়।

জীব-রহস্য।

পৃথিবী কি রূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার অন্তর্গত পদার্থ গুলিই বা কি তাহা বলা আমাদের এক্ষণকার উদ্দেশ্য।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রস্তর মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই গুলিই পৃথিবীর একমাত্র উপাদান সামগ্রী। কিন্তু ঐ সকল প্রস্তর বা মৃত্তিকারাশি একই রূপ পদার্থ নহে। প্রত্যুত উহারা নানা স্থানে, নানা প্রকার খণিত হইতে উৎপন্ন হওয়াতে পৃথক পৃথক নামে অভিহিত হইয়াছে, যথা চূর্ণক granite কর্ব্বর gravel, কর্দ্দম clay, বালুকা ও খড়ী ইত্যাদি। ভূতত্ত্ববেত্তারা অনেকেই এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে পৃথিবীতে বহুবিধ জীবজন্তু উদ্ভিজ্জ জন্মিবার পূর্ব্বে তথায় বহুকাল ব্যাপিয়া ঐ সকল মৃত্তিকা-রাশি স্তরে স্তরে সংরক্ষিত হইয়াছে। এবং এই মৃত্তিকারাশির নিম্নে যে উত্তপ্ত তরল পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নাই, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। আগ্নেয় পর্ব্বত-উৎক্ষিপ্ত ধূম ও অগ্নিশিখা যাঁহারা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছেন এবং উহার শিখর-দেশ-নিঃসৃত দ্রবীভূত ধাতুময় পদার্থ দ্বারা যাহারা বহুতর জলস্থল বা নগর প্লাবিত ও উৎসন্ন হইতে দেখিয়াছেন, তাহাদের মনে পৃথিবীর অতি নিম্ন তলপ্রদেশ যে অগ্নিময় তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। এদিকে ভূমিকম্পের সময় পৃথিবী যেরূপ কম্পান্বিত হইয়া থাকে তাহা সকলে অবগত আছেন। কিন্তু স্পেন ইটালি ও দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থান যে তদুপলক্ষে কোথাও দ্বিভাগে বিভক্ত এবং কোথাও বা বৃহদাকার অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হয় তাহা অনে-

কেই জানেন না। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে ভূপৃষ্ঠ ও ভূমধ্যভাগ এই দুয়ের প্রকৃতি অতিশয় বিভিন্ন প্রকার। প্রায় চারি পাঁচ বৎসর অতীত হইল, যৎকালে বিসুবিয়স নামক আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুদ্গারের উপক্রম হয়, তখন নেপল্‌সবাসীরা উহার ভাবী পরিণাম ফল মনে করিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন আবার এই ঘটনার কিছুকাল পরে ভূমিকম্প উপলক্ষে দক্ষিণ আমেরিকায় যেরূপ বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ হয় তাহা ও অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষে এরূপ শোকাবহ ব্যাপার কখনই দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না। এখানে মধ্যে মধ্যে অতি অল্প মাত্রায় ভূমিকম্প হইলেও, তজ্জন্য কাহারও প্রাণহানি বা অট্টালিকা স্থানভ্রষ্ট হয় না তথাপি এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ভূগর্ভমধ্যে যে এক প্রকার অসামান্য শক্তি ও উত্তাপ নিয়ত বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝা যাইতে পারে। এ-দেশের কোন হরিদ্বর্ণ শস্যক্ষেত্রে বা সমুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সহসা কাহারও মনে এরূপ উদয় হয় না যে পৃথিবীতে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত বলিয়া কোন ব্যাপার আছে। বস্তুতঃ যাহারা ভূমিকম্প স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন, অথবা স্বচক্ষে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ হইতে অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতে দেখিয়াছেন, তাহাদের মুখে ঐ সকল কথা না শুনিলে, কিম্বা অপরাপর গ্রন্থে ঐরূপ বিস্ময়কর বিষয় পাঠ না করিলে আমরা কখনই উহা বিশ্বাস করিতাম না।

পুরাকালীন লোকেরা আগ্নেয় পর্ব্বতকে মহাবল প্রেতগণের আবাসভূমি ও কার্য্যালয় মনে করিতেন। তাঁহাদের মনে এরূপ কুসংস্কার জন্মিবার বিশেষ কারণও ছিল। এক্ষণে আগ্নেয় পর্ব্বত কি, তাহা আমরা সকলেই জানিয়াছি। সুতরাং তৎসম্বন্ধে আর কাহারও মনে অন্য প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয় না।

অতঃপর, আমরা যে ভূপৃষ্ঠে অবস্থিতি করি তাহার প্রকৃতি যে ভূমধ্যভাগের প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে পৃথিবীর একাংশ অর্থাৎ ভূমধ্যভাগ যেরূপ উত্তপ্ত অপরাংশও সেইরূপ শীতল কেবল সূর্য্যের উত্তাপ জন্য ভূপৃষ্ঠে তাদৃশ শীতল বোধ হয় না।

যাঁহারা নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন, যে প্রস্তর বা মৃত্তিকার প্রকৃতি সকল স্থানে সমান নহে। প্রত্যুত স্থানবিশেষে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। যেমন খড়িমাটি, লোহিত প্রস্তর, কৃষ্ণ প্রস্তর, ইষ্টক নির্ম্মাণোপযোগী কর্দ্দম ও কর্কর। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, ইহাও জানা যাইতে পারে যে পৃথিবীতে এই সকল প্রস্তরগুলি বিশৃঙ্খলরূপে সংস্থিত নহে বরং ইহাদের অবস্থানের একটি রীতিমত ক্রম আছে। ইহাদের মধ্যে আবার কতক গুলি নিতান্ত পুরাতন এবং অপরগুলি নূতন

বলিয়া খ্যাত। এবং প্রায় সকলগুলির মধ্যেই কোন না কোন প্রকার খনিজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রস্তরগুলি অতিশয় পুরাতন হইলে উহার খনিজের (Fossil) সহিত অধুনাতন জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদির অধিকতর প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু নূতন প্রস্তরস্থিত খনিজের ভাব আবার ইহার ঠিক বিপরীত।

অতঃপর পাঠকগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যখন উভয়বিধ প্রস্তর বা মৃত্তিকাই ভূপৃষ্ঠে লক্ষিত হইতেছে, তখন একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিক পুরাতন ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। বস্তুত বহুকাল ব্যাপিয়া একাদিক্রমে পরিশ্রম না করিলে ইহা কখনই আপনাআপনি ঠিক করা যায় না। কিন্তু রেলওয়ের জন্য পর্ব্বত মধ্য দিয়া যে সকল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সকল স্থান এবং অপরাপর গিরিগুহা ও খনির মধ্যে প্রবেশ করিলে, পূর্ব্বোক্ত বিষয় অনেক পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে। কারণ এই সকল স্থানেই বিবিধ প্রকার প্রস্তর ক্রমান্বয়ে স্তরে স্তরে সংরক্ষিত আছে—তাহা স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রূপে ভূতত্ত্বজ্ঞেরা নানা স্থানে কূপ বা খাত খনন ও অপরাপর বহুবিধ অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন যে পৃথিবীর নিম্ন স্তরে চূর্ণক প্রভৃতি কঠিন প্রস্তরই লক্ষিত হয়, এবং তাহার পর ক্রমান্বয়ে অন্যান্য কোমলতর প্রস্তর ও মৃত্তিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—Slate, Sandstone, coal, Chalk, Clay ইত্যাদি। সেখানেই লোকে অনুসন্ধান করুক না কেন, সকল স্থানেই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তরগুলি এই নিয়মে অবস্থিতি করে। ইহার ব্যভিচার প্রায় ক্ষুদ্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যখন ঐ রূপ সংঘটন হয়, অর্থাৎ কোন পুরাতন স্তর উপরে আইসে, তখন গুরুতর ভূমিকম্প বা ভূমধ্যস্থ অপর কোন নৈসর্গিক কারণ দ্বারা উহা সাধিত হইয়াছে, তাহাই মনে হয়। বাস্তবিক ঈদৃশ কারণ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা কখনই সংঘটিতে পারে না।

অনন্তর যদি কেহ পাঁচ রকমের পাঁচ খানি প্রস্তরফলক উপর্য্যুপরি সাজাইয়া তন্নিম্নে অপর একখানি স্থূল প্রস্তর রাখিয়া দেন, তাহা হইলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৃত্তিকাস্তর গুলি কি রূপে সংরক্ষিত হইয়াছে—তাহা কিয়ৎ পরিমাণে অনুমান করিতে পারেন। ভূতত্ত্বজ্ঞেরা এই ছয়টি স্তরের ছয়টি নাম দিয়াছেন। তন্মধ্যে যেটি সর্ব্বনিম্নে তাহাকে চূর্ণক বলে, তদুপরি কৃষ্ণ প্রস্তর বা শ্লেট—তৃতীয়টি শৈকত, চতুর্থ মৃদঙ্গার, পঞ্চম খড়িমাটি, ষষ্ঠটি গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী মৃত্তিকা। এই ছয় প্রকার মৃত্তিকার মধ্যে মধ্যে আরও অনেক স্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এবং উহাদের নামও স্বতন্ত্র, কিন্তু এস্থলে আমরা প্রধান কয়েকটির নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর যেখানেই অনুসন্ধান করি না কেন, স্তর গুলির অবস্থান-রীতি একই প্রকার অর্থাৎ সর্ব্বনিম্নে চূর্ণক,

তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে আর আর স্তর লক্ষিত হয় *। খড়িমাটি কর্দ্দমসদৃশ মৃত্তিকা স্তরের উপর, অথবা মৃত্তিকা স্তর চূর্ণকের নিম্নস্থ, এবং মৃদঙ্গার খড়িমাটির পৃষ্ঠে, এরূপ দৃশ্য প্রায় কখনই কাহারও দৃষ্টি পথে পতিত হয় না। দুঃখের বিষয় এই যে বহুদূর পর্য্যন্ত ভূগর্ভ খনন করিলেও ঐ সমস্ত মৃত্তিকাস্তর এক স্থানে পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা যেখানে যতই নিম্নভূমি আবিষ্কার করি না কেন, সর্ব্বত্রই চূর্ণক স্তর সকলের নিম্নে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কখন কখন আবার চূর্ণক প্রভৃতি, প্রাচীন প্রস্তর সকল ভূগর্ভস্থিত কোন অসামান্য শক্তি প্রভাবে, উপরকার স্তর ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধগামী হয় ও অবশেষে বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর ন্যায় ভূপৃষ্ঠে বিরাজ করিতে থাকে মুঙ্গেরের পুরাতন দুর্গমধ্যে অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃশ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডে, স্কটলণ্ডে আয়ারলণ্ডে ও উভয় আমেরিকার মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে ইহার নিদর্শন লক্ষিত হয়।

এইরূপ উৎক্ষেপের সময় উপরিস্থ স্তর গুলি চতুর্দ্দিকে বিশৃঙ্খল ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে সুতরাং তৎকালে উহাদের পরস্পরের যথানিয়মে অবস্থানেরও ব্যতিক্রম ঘটে। যেখানে এরূপ কোন দুর্ব্বিপাক উপস্থিত না হয়, সেখানে ঐ সকল যথাক্রমে উপর্য্যুপরি অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়।

চূর্ণক বা তদনুরূপ অপর কোন কঠিন প্রস্তরের সহিত খড়িমাটি, কর্দ্দম অথবা শৈকতের তুলনা করিলে উহাদের মধ্যে পরস্পরের কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। বরং এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরের এতই ইতর বিশেষ যে ইহাদিগকে একবার দেখিলে ভবিষ্যতে একটিকে অপরটি বলিয়া আর কখন ভ্রম জন্মে না। এই গুলির মধ্যে চূর্ণকই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন প্রস্তর এবং পলিশ করিলে তন্মধ্য হইতে উজ্জ্বল শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের বিন্দু বাহির হওয়াতে উহা অতিশয় সুন্দর দেখায়। প্রধান প্রধান নগরের পথঘাট প্রস্তুত করিবার সময় ও রাজপ্রাসাদের থামের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ কখন ঈষৎ লাল, কখন বা কিঞ্চিৎ নীল আভা বিশিষ্ট ধূসর। ইহার মধ্যে অধিকমাত্রায় স্ফটিকাকার পদার্থ দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে কোন না কোন সময়ে ভয়ানক উত্তাপ জন্য ইহা ভূগর্ভে দ্রবীভূত হইয়াছিল ও পরে শীতল হইয়া এরূপকার আকার ধারণ করিয়াছে। শৈকত ও খড়িমাটি কঠিন প্রস্তর মধ্যে গণ্য হইলেও চূর্ণকের সহিত ইহাদের তুলনাই হয় না।

অধুনাতন পণ্ডিতেরা এই চূর্ণকের উৎপত্তি বিষয়ে এই কথা বলিয়া থাকেন যে চূর্ণক যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, ঐ সকল সাধারণ তাপে দ্রবীভূত হয়

* যথা কৃষ্ণপ্রস্তর, শৈকত, মৃদঙ্গার, খড়িমাটি, ও ধূলিবৎ মৃত্তিকা বা কর্দ্দম।

নাই। এমন কি লৌহ গলাইতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তদপেক্ষা ইহাতে বেশী তাপ লাগিয়াছে। তাঁহারা ইহাতে পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে লৌহ যেরূপ সহজে দ্রবীভূত হয়, চূর্ণক পদার্থ সেরূপ নহে। আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে যে সকল দ্রবীভূত মৃত্তিকারাশি উত্থিত হয়, তাহার সহিতও এই চূর্ণক পদার্থের অনেক প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য আছে। এই সকল অনুমান ব্যতীত চূর্ণকের উৎপত্তি-বিষয়ে ভূতত্ত্ববেত্তারা আর কিছুই বলিতে পারেন না।

শৈকতের উৎপত্তি বিষয়ে ভূতত্ত্ববেত্তারা তাদৃশ অনভিজ্ঞ নহেন। নদী বা সমুদ্রতীরে যেরূপ বালুকা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ রূপ বালুকাই ইহার এক মাত্র উপাদান সামগ্রী। ইহা কে না দেখিয়াছেন যে এক মুষ্টি বালুকা লইয়া সবলে চাপিয়া ধরিলে, উহার কণাগুলি কিছু কাল একত্রীভূত থাকে। সেইরূপ একটি বালুকাস্তরের উপর বহুদিন পর্য্যন্ত কোন প্রকার পর্ব্বতপ্রমাণ ভার সংরক্ষিত হইলে, উহার পেষণে যে ঐ বালুকারাশি জমাট হইয়া প্রস্তরের আকার ধারণ করিবে তাহা বিচিত্র নহে। বস্তুত এইরূপ পেষণগুণে ও কিঞ্চিৎ উত্তাপের সাহায্যে যে পূর্ব্বোক্ত প্রস্তর প্রস্তুত হইয়াছে তদ্বিষয়ে এক্ষণে আর কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হয় না। আদৌ এই সকল বালুকাকণা নদী বা সমুদ্রজলে ভাসমান থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে উহারা তীরে নীত হয়। কালসহকারে আবার ইহাদের উপর কর্দ্দম বা অন্য প্রকার মৃত্তিকারাশি তূপাকারে সঞ্চিত হইতে থাকে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বালুকাস্তরের উপর অধিক মাত্রায় ভার পড়াতে উহা অবশেষে প্রস্তররূপে পরিণত হয়। কিন্তু এইরূপ ব্যাপার অল্প দিনে সম্পন্ন হইবার নহে। বোধ হয় শত সহস্র বৎসর অতীত না হইলে আর ঈদৃশ প্রাকৃতিক ব্যাপার সাধিত হয় না।

প্রাসাদ বা গৃহনির্ম্মাণের জন্য বিলাতে এই সকল প্রস্তর ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু উহা অধিক দিন স্থায়ী হয় না। ভয়ানক শীতের সময় যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন ঐ সকল প্রস্তর আপনাপনি ফাটিয়া যায়, ও পরিশেষে স্ব স্থান হইতে স্খলিত হইয়া পুনরায় বালুকাকণায় পরিণত হয়। শৈকতের মধ্যে নানা-প্রকার খনিজের চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং ঐ সকল খনিজ যে সমকালীন সৃষ্ট তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডের দক্ষিণ সীমায় যে সকল সমুজ্জ্বল ধবল গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্য্য দূর হইতে সহসা সন্দর্শন করিয়া পথিকগণ অতিশয় পুলকিত ও চমৎকৃত হন, ঐ গুলি যে তদাকার খড়িমাটির প্রধান আকরভূমি তাহা বলা বাহুল্য। পৃথিবীর নানা স্থানে এই রূপ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। রাসায়নিক পণ্ডিতেরা বলেন যে ইহা পরীক্ষা দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে যে উক্ত খড়িমাটিতে চূণ ও আঙ্গারিক অম্ল Carbonic acid ব্যতীত আর কোন পদার্থ নাই। কিন্তু ইহার উৎপত্তির নিয়ম স্বতন্ত্র; Foraminifera ও Ammor-

ite নামক দুই প্রকার জীবের দেহাবশেষ অর্থাৎ খনিত হইতেই খড়িমাটি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা এক প্রকার সামুদ্রিক জীব বিশেষ (shell fish) এবং দেখিতে সমঙ্গা জাতীয় উদ্ভিদের অস্ফুট তরুণ পত্রের ন্যায়।

আটলাণ্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন অংশে, এখনও ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব অসংখ্য পরিমাণে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল প্রাণি যেমন মরিতে থাকে, অমনি উহাদের কঠিন অঙ্গাবরণ-গুলি সমুদ্রের তলদেশে নীত হয়, ও তথায় খড়ির ন্যায় এক প্রকার কর্দ্দমের আকার ধারণ করে।

যঃ নঃ-মুঃ

ভানুসিংহের কবিতা।

মাধব! না কহ আদর বাণী,
না কহ প্রেমক নাম!
জানই ময়কো অবলা সুরলা
ছলনা না কর শ্যাম!
কপট! কাহ তুঁহু ঝুট বোলসি
পীরিত করসি মোয়? (১)
ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নমু
না পতিয়াব রে তোয়!
তুঁহু না জানসি প্রেমক ধারা
কঠিন হৃদয় মধুভাষী—
পরশি দেহ মম সাঁচি বোল'অব
নহ তুঁহু রূপ-পিয়াসী? (২)

যাও শ্যাম তব—মিলবে শত শত
হমসে রূপসি নারী।
তুচ্ছ বালি হম কাহ তু টুটসি
ক্ষুদ্র এ হৃদয় হমারি?
দূর রহই হম রহব তোঁহারই,
(৩) সমরির তোঁহারি বাণী,
চিত্তই চিত্তই তোঁহারি বদন
ত্যাগব ক্ষুদ্র পরাণী।
(৪) ছিদল-তরী সম কপট-প্রেম পর
ডারমু যব মন প্রাণ,
বরখি নয়ন জল সহইব যাতন,
রহব কুফল সব কান!

(১) কপট, কেন তুমি মিথ্যা করিয়া বলিতেছ যে তুমি আমাকে ভাল বাস? আমি তোমাকে ভালয় ভালয় চিনিয়াছি আর আমি তোমাকে বিশ্বাস করিব না।

(২) আমার গা ছুঁইয়া সত্য করিয়া বল দেখি যে তুমি রূপ-পিয়াসী কি না?

(৩) স্মরিব।

(৪) ছিদ্র বিশিষ্ট।

মাধব, কঠোর বাত হমারা
মনে লাগল কি তোর ?
নিপট (৫) কঠিন দুখ সহই কহনু সব
ক্ষমগো কুবচন মোর !
মাধব ! কাহতু মলিন করলি মুখ ?
কুঞ্জে আসহ নাথ !
মধুর হাসি তুঅ হাসহ-হাসহ
রাখহ কাতর-বাত !
নিদয়-বাত অব কবহুঁ ন বোলব
তুঁহু মম প্রানক প্রাণ !

অতি অবোধ হম—বাখিহু হিয়া তব
ছোড়ই কুবচন-বাণ !
বাতরাখ' মঝু বেরি বোল' পহু
হমকো করহ সিনেহ ! (৬)
বেরি বোল পহু আদর বাণী
চলহ কুঞ্জ বন-গেহ !
মিটল মান অব—ভানু হাসয়ত
হেরই পীরিত-লীলা
কভু মানিনী কভু আদরিনী অতি
পীরিত-সাগর-বালা !

বঙ্গ-সাহিত্য।

মহাভারত ও কৃষ্ণ।

কথিত আছে যে সর্ আইজক্ নিউটন সমস্ত বিজ্ঞান আলোচনার পর এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে "আমি এতদিন ধরিয়া বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া দেখিলাম কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমি বিজ্ঞানরূপ সমুদ্রের বেলাভূমিতে শিশুর ন্যায় কেবল উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি।" মহাভারতের সমালোচনা করিতে গেলে সমালোচকের মনেও সেই ভাবের উদয় হয়। যতই ইহার সমস্ত ভাগ নখ-দর্পণবৎ দেখিতে চেষ্টা পাওয়া যায়, যতই ইহার চিত্র-সমূহের বৈচিত্র্য আয়ত্ত করিতে আয়াস পাওয়া যায়, যতই ইহার নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক; দার্শনিক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গের অসীম গভীরতার তলস্পর্শ করিতে যত্ন করা যায়, ততই হতাশ-হৃদয় ও শিথিল-প্রযত্ন হইয়া পড়িতে হয়। এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, মহাভারতের মত এক খানি চমৎকার গ্রন্থ কোন দেশে, কোন ভাষায় আর নাই। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, মানব-চরিত্র-তত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র উপাদানে গঠিত এই বিশালকায় মহাকাব্য পৃথিবীর একটি অদ্বিতীয় সামগ্রী। অভ্র-ভেদী হিমালয়ই, যে আর্য্যদিগের রক্ষা-প্রাচীর এবং বিপুল

(৫) অত্যন্ত।

(৬) আমার কথা রাখ্ একবার বল্ প্রভু যে তুমি আমাকে ভাল বাস।

জাহ্নবীই যাহাদের তর্পণ-নদী, রামায়ণ ও মহাভারত তাহাদেরই উপযুক্ত মহাকাব্য। আবার এই রামায়ণে ও মহাভারতে তুলনা করিতে গেলে রামায়ণের গভীর অথচ মহান্ কল্পনা-উচ্ছ্বাস দেখিয়া বাল্মীকিকে আমরা দেব-ভক্তি সহকারে প্রণাম করি, কিন্তু মহাভারতের বিচিত্র চমৎকারিত্ব দেখিয়া আমরা একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়ি। এই যে একটি লৌকিক প্রবাদ আছে যে "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—সে প্রবাদ কতদূর যে যুক্তিমূলক তাহা কেবল মহাভারতের নির্ঘণ্ট দেখিলেই প্রতীয়মান হয়। আহার-বিহার-নিদ্রার সংযম হইতে আত্মার মুক্তি পর্য্যন্ত, মল্লযুদ্ধের প্রণালী হইতে দুর্ভেদ্য ব্যূহরচনার প্রথা পর্য্যন্ত, সামান্য আতিথ্যের নিয়ম হইতে বৃহৎ যজ্ঞের প্রণালী পর্য্যন্ত, মনুষ্য-চরিত্র বিষয়েও কুটিল ক্রূরমনা হীন ব্যক্তি হইতে মহান্ দেব-প্রকৃতি পর্য্যন্ত—মহাভারতের কবিত্বময় বর্ণনা-প্রাচুর্য্যে সমালোচকের হৃদয়-মন তরঙ্গাহত ছিন্ন তৃণের ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। কিন্তু মহাভারতকার যে রামায়ণ হইতে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এমন কি, মহাভারতের প্রধান প্রধান নায়কগণের চরিত্র রামায়ণের প্রধান প্রধান নায়কগণের চরিত্র অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। রামের ধর্ম্মভয় যেমন যুধিষ্ঠির-চরিত্রের পত্তনভূমি বলিয়া মনে হয়, তেমনি লক্ষ্মণের ভ্রাতৃস্নেহ ও শৌর্য্য অর্জ্জুনে, মহাবীরের দুষ্কর্ষতা বৃকোদরে, ভরত শত্রুঘ্নের অমায়িকতা নকুল সহদেবে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অনুকরণেই বল, আর সৌসাদৃশ্যতেই বল, মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণ ব্যতীত আর পৃথিবীর কোন মহাকাব্যের সহিত তুলনা হইতে পারে না। যে ইংলণ্ডীয় কবি বলিয়াছেন যে হোমর মহান্ ভাব বিষয়েও বর্জ্জিল গম্ভীর সৌন্দর্য্য বিষয়ে জগতের সকল কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের অমূল্য সাহিত্য-রত্নের কথা কিছুই জানিতেন না। আমরা মহাভারত-প্রসঙ্গের উপসংহার-কালে এই সকল কবির গুণবিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

আপাততঃ দেখা যাইতেছে যে রামায়ণের কতকটা ছায়া অবলম্বন করিয়া মহাভারতের পত্তনভূমি নিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতে যে দুইটি বিশেষ চরিত্র আছে তাহা বাস্তবিকই অলৌকিক। সে দুইটি চরিত্র একটি কৃষ্ণের আর একটি দ্রৌপদীর। মহাভারত-কার কল্পনার সমুদ্র মন্থন করিয়া যত রত্ন সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, যা-কিছু অমৃত বা যা-কিছু গরল সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, সকলই বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে বিশ্লেষণ ও একত্রিত করিয়া কৃষ্ণ ও দ্রৌপদী-চরিত্র রচনা করিয়াছেন, এবং এ কথা আমাদের বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে বেদব্যাসের রচনা ও বর্ণনা-কৌশলেই নিকুঞ্জ-বিহারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্মরূপে প্রায় সর্ব্বত্রই আরাধিত, এবং

বেদব্যাসেরই রচনা ও বর্ণনাকৌশলে পঞ্চ-পুতি দ্রৌপদী পঞ্চসাধ্বীর মধ্যে পরিগণিত, ও তেজস্বিনী রাজপুত স্ত্রীজাতির বন্দনীয়।

চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠা পুত্র যদু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা যযাতি শাপপ্রভাবে জরাগ্রস্ত হইলে তিনি তাঁহার পুত্রগণের নিকট যৌবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু অস্বীকার করাতে যযাতি তাঁহাকে এই অভিশাপ দেন যে, যদুর বংশে কেহই কখন রাজা হইতে পারিবে না। সুতরাং কালক্রমে যদুবংশীয়েরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এই যদু-বংশীয়দিগের মধ্যে প্রভাবশালী এক দল আসিয়া মথুরা এবং তাহার সন্নিকটে রীতিমত বাস স্থাপনা করে। যে সময় রাজা কংস পিতৃনির্যাতন করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করে, সে সময় যদু-বংশীয় বসুদেব মথুরার যাদবদিগের দল-পতি-স্বরূপ ছিলেন। মথুরার সকল লোকই তাঁহার অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল,—কিন্তু রাজা কংস লোকদিগের অত্যন্ত অপ্রিয় ছিলেন। এই হেতু বসুদেবের সহিত তিনি আপন পিতৃব্য দেবকের কন্যা দেবকীর বিবাহ দিয়া আপন রাজ্যের ভিত্তিভূমি স্থির-প্রতিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কংস এই আকাশ বাণী শুনিতে পাইলেন যে "হে কংস, দেবকীর গর্ভজাত পুত্রই তোমার নিধনকারী হইবে।" তখন কংস দেবকীকে হত্যা করিবার মানসে অসি নিষ্কোষিত করিলেন, কিন্তু বসুদেব এই সত্য করিয়া দেবকীর প্রাণরক্ষা করিলেন যে তাঁহাদের সন্তান হইলেই তাঁহারা তাহাকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কালক্রমে দেবকীর গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইল, এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই তাঁহারা তাহাকে যমুনার পরপার গোকুলে গোপনে পরহস্তে রাখিয়া আসিলেন। সেই সন্তানের নাম বলরাম। এই কথা জনরবে কংসের কর্ণগোচর হইলে এবং দেবকী পুনর্ব্বার গর্ভবতী হইলে তিনি তাঁহাকে বসু-দেবের সহিত কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর বসুদেব কৌশল করিয়া তাহাকেও যমুনার পরপার গোকুলে গোকুলরাজ নন্দের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বলাই বাহুল্য যে ইনিই শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলে কৃষ্ণ দিন দিন বর্দ্ধিতকায় ও বলিষ্ঠ হইতে লাগিলেন। দৈহিক ও মানসিক শক্তি প্রভাবে তিনি গোকুলের যুবক সম্প্রদায়ের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া দাঁড়াইলেন, রাধিকা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ব্রজমণ্ডলকে যেন একটি প্রমোদ-কাননে পরিণত করিয়া তুলিলেন। এদিকে আবার কালিয়দমন, অসুরবধ প্রভৃতি নানা প্রকার বীরকার্য্য দ্বারা বন্ধুদিগের স্পর্দ্ধা ও শত্রুর মনে ভয় উৎপাদন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শৌর্য্যের কথা রাজা কংসের কর্ণে গিয়া প্রতিধ্বনিত হইল,—তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, দৈববাণীর কার্য্য-গত পরিণা

একেবারে উড়াইবার জন্য তিনি মথুরায় এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করিলেন, কৃষ্ণকে সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ সম্মানার্থে বৃন্দাবনে আপনার রথ পর্য্যন্ত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজা কংসের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইল না, কারণ কৃষ্ণ সেই মথুরায় আসিলেন, কিন্তু কংস দ্বারা তিনি নিহত না হইয়া কংসকে তিনিই নিহত করিলেন,—মথুরার সিংহাসন অনায়াসে অধিকার করিলেন, কারাবদ্ধ জনক জননীকে মুক্ত করিয়া সুখে মথুরায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ সুখের রাজত্ব বহুদিনের হইতে পারিল না, কারণ মগধরাজ জরাসন্ধ নিজ জামতা কংসের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে মথুরায় যাত্রা করিলেন, এবং উপর্য্যুপরি কৃষ্ণ দ্বারা পরাজিত হইলেও পরিশেষে জয়লাভ করিয়া মথুরা অধিকার করিলেন। তখন কৃষ্ণ আপন পিতা মাতা, অনুচরবর্গ ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া গুজরাটে আসিয়া দ্বারকা নামক মহানগরী স্থাপন করিলেন। দ্বারকা অল্পকাল মধ্যেই মহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল, এবং কৃষ্ণ তাঁহার নারায়ণী সৈন্যসহকারে রুক্মিণী হরণের সময় শিশুপালকে, উষাহরণের সময় মহাদেবকে, এবং পারিজাত হরণের সময় ইন্দ্রকে পরাজিত করিয়া আপন শৌর্য্যের মহাখ্যাতি আর্য্যাবর্ত্তময় প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এ দিকে হস্তিনাপুরে ঘোরতর ব্যাপার উপস্থিত। দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের পর পাণ্ডবেরা কৌরবদিগের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিবেন, কিরূপে অপহৃত রাজ্যের অংশ দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে ফিরিয়া লইবেন——সেই বিষয়ে সভা করিয়াছেন। এই সভাতে পাণ্ডব-পক্ষীয় প্রায় সকল রাজাই উপস্থিত ছিলেন, কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিলাষ যে, সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত দুষ্টমতি কুরুকুলের অধীনস্থ না হইয়া পঞ্চপাণ্ডবদিগের ছত্রাধীন হোক। তিনি জানিতেন যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিলে পাণ্ডবদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে যে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়—ইহাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি পাণ্ডবদিগের যেমন আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয়, কৌরবদিগেরও যেমনি আত্মীয় ও স্বসম্পর্কীয়। হৃদয়ের ভাল-বাসা পাণ্ডবদিগের প্রতি থাকিলেও কৌরবদিগের প্রতি তিনি লোকতঃ অনাত্মীয়তা প্রদর্শন করিতে পারেন না। সুতরাং এই পাণ্ডবসভায় সমবেত রাজাদিগের সম্মুখে কুরুপাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার যাহাই সম্পর্ক হউক না কেন, তিনি সে বিষয়ে নিতান্ত ঔদাস্য প্রকাশ পূর্ব্বক কেবল সত্য ও ধর্ম্মের সহায়তা করিবার জন্য যতটুকু যে ভাবে বলা উচিত তাহাই তিনি বলিলেন। তিনি বলিলেন—

"হে রাজন্যবর্গ! এই রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় সৌবল কর্ত্তৃক যেরূপ শঠতাপূর্ব্বক পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বনবাসের

নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। পাণ্ডুপুত্রগণ পৃথিবীমণ্ডল বলপূর্ব্বক স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াও কেবল সত্যপরায়ণতা প্রযুক্ত ত্রয়োদশ বৎসর এই দুরনুষ্ঠেয় ব্রত স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষত অজ্ঞাত বাস-সময়ে আপনাদিগের নিবাসে দাসত্বপাশে বদ্ধ হইয়া দুঃসহ ক্লেশরাশি সহ্য করত দুস্তর ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের অগোচর নাই। এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না; কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন। যদিও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ বল বীর্য্যে ইহাঁদিগকে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল শঠতা পূর্ব্বক পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করত ইহাঁদিগকে অসহ্য ক্লেশানলে দগ্ধ করিয়াছেন; তথাপি ইহাঁরা তাঁহাদিগের অনাময়ই কামনা করিতেছেন। ইহাঁরা স্বয়ং ভূপতিগণকে নিপীড়িত করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা এরূপ অসাধু যে, রাজ্য অপহরণ মানসে বিবিধ উপায় দ্বারা ইহাঁদিগকে বালাবস্থাতেই সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। অতএব কৌরবগণের ঈদৃশ প্রবল লোভ, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা ও ইহাঁদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনা করত আপনারা সমবেত বা পৃথকভূত হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করুন।

ইহাঁরা প্রতিজ্ঞাত সময় প্রতিপালন-পূর্ব্বক সত্যেরই অনুসরণ করিয়াছেন; কিন্তু কৌরবেরা ইহাঁদিগের প্রতি সতত অন্যাচরণ করিতেছেন। অতএব পাণ্ডবগণ সমস্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রকে নিহত করুন কিম্বা সুহৃদ্গণ অসদৃশ কার্য্য সকল অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবারিত করুন। যদি কৌরবগণ ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ইহাঁরা আহত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে নিহত করিবেন সন্দেহ নাই। যদ্যপি আপনারা এরূপ অনুমান করেন যে, পাণ্ডবগণ সংখ্যায় অল্প বলিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহা হইলে সকল সুহৃৎ মিলিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিতে যত্নশীল হউন। কিন্তু দুর্য্যোধন এবিষয়ে কি করিবেন, তাহার কিছুমাত্র জ্ঞাত হইতে পারি নাই; পরের অভিপ্রায় অবগত না হইয়া কার্য্যারম্ভ করা আপনাদের কি অভিপ্রেত? অতএব যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন, এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক কুলীন প্রমাদশূন্য পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন।"

এই বলিয়াই তিনি নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রকৃত মনোগত ভাবের আভাস

---

* মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদিত মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্ব।

মাত্র দিয়া মুক্তকণ্ঠে যুদ্ধের উদ্যোগ বিষয়ে কিছুই বলিতে পারিলেন না, কারণ তাহা স্পষ্ট অক্ষরে প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত মন্দ দেখায়। কিন্তু দ্রুপদ রাজা সভাস্থলে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন—

"দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত বাক্য প্রয়োগ করা একান্ত অবিধেয়; মৃদুতা অবলম্বন করিলে সেই পাপাত্মা কদাচ বশীভূত হইবে না। যে ব্যক্তি দুর্য্যোধনের সহিত শান্ত ব্যবহার করে; সে তাহাকে মৃদু ও অসার বিবেচনা করিয়া থাকে। আমরা মৃদু হইলে সে নিয়তই এই রূপ অনুমান করিবে যে, আমি অনায়াসেই কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইব। অতএব আমাদিগের ঐ রূপ অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়ঃকল্প; এক্ষণে তদ্বিষয়ে যত্নবিধান কর। সৈন্যসংগ্রহ ও মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ কর। দ্রুতগামী দূত সকল শল্য, ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন ও সমুদায় কৈকেয়দিগের নিকট অবিলম্বে গমন করুক। দুর্য্যোধনও সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। সাধারণে এই রূপ একটি নিয়ম প্রচলিত আছে, যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধু লোকেরা তাঁহারই পক্ষ অবলম্বন করিয়া কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন; অতএব আমরা অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করি; কারণ এক্ষণে আমাদিগকে নিতান্ত দুর্ভর কার্য্যভার বহন করিতে হইবে।" *

এই সকল কথা যখন দ্রুপদরাজ মুক্তকণ্ঠে বলিলেন তখন কৃষ্ণ সমস্ত সভাস্থ লোকের মনের ভাব বুঝিয়া এবং আপনারও অবসর পাইয়া সভ্যগণকে এই বলিলেন:—

"দ্রুপদরাজ পাণ্ডবরাজের প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যে কথার উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই অসম্ভাবিত বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। যদি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার আদেশানুসারে কার্য্য করাই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অন্যথাচরণ করিলে অতিশয় মূর্খতা প্রকাশ হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্যসম্বন্ধ; তাঁহারা কখন মর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছি এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন; এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে; আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব। আপনি বয়স ও জ্ঞানে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা; রাজা ধৃতরাষ্ট্রও সর্ব্বদা আপনারে বহুমান করিয়া থাকেন; আমরা আপনার শিষ্য স্বরূপ; অতএব যে সকল বাক্য পাণ্ডবদিগের পক্ষে অর্থকর; আপনি তাহার উল্লেখ করুন; আপনার বাক্যে আমাদিগের সংশয় জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যদি দুর্য্যোধন ন্যায়ত সন্ধি সংস্থাপন করেন, তাহা হইলে আর কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রাত্রনাশ বা কুলক্ষয় হয় না। কিন্তু যদি দুর্ম্মতি

* কা, প্র, সি, অনুবাদিত মহাভারত।

দুর্য্যোধন দর্পান্বিত হইয়া মোহবশতঃ সন্ধি না করে; তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে দুর্ব্বুদ্ধিপরতন্ত্র দুর্য্যোধন, বন্ধু বান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে তাহার সন্দেহ নাই।"

কৃষ্ণ এইরূপে মহাভারতীয় মহা যুদ্ধের বীজ রোপণ করিয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করিলেন। ক্রমে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। কুরু পাণ্ডব উভয়েই কৃষ্ণকে স্বদলভুক্ত করিতে চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উদ্দেশে দুর্য্যোধন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। যে দিন দুর্য্যোধন দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন, সেই দিন অর্জ্জুনও একই উদ্দেশে তথায় উপনীত হইলেন। দুর্য্যোধন অগ্রেই কৃষ্ণের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে কৃষ্ণ শয়ান ও নিদ্রাভিভূত। সুতরাং তিনি কৃষ্ণের জাগরণকাল অপেক্ষায় তাঁহার মস্তকসমীপস্থ দিব্য আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। পরক্ষণেই অর্জ্জুনও সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং দ্বারকাপতিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার পদতল সমীপে দণ্ডায়মান রহিলেন। কৃষ্ণ প্রবুদ্ধ হইয়াই অর্জ্জুনকে দেখিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরক্ষণেই তিনি মুখ ফিরাইয়া দুর্য্যোধনকে দেখিবামাত্র তাঁহাকেও আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, "হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদিগের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহার্দ্দ, তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তিরই পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন ১।"

কৃষ্ণ কহিলেন, "হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি। এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে; অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত।" এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন, 'হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে বিখ্যাত এক অর্ব্বুদ গোপ এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক; আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি; ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর হয়, তাহাই অবলম্বন কর ২।"

এই স্থলে কৃষ্ণের জটিল বুদ্ধি ও মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার শয়ন-গৃহে দুর্য্যোধনের প্রবেশকালে তিনি যে নিদ্রিত ছিলেন সে কেবল নিদ্রার ভান মাত্র। তিনি জানিতেন যে উভয় পক্ষই তাঁহার সাহায্যার্থে তাঁহার নিকট আসিবে, তিনি নিশ্চয় জানিতেন

১।২ কা. প্র. সি. অনুবাদিত মহাভারত।

যে দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই দ্বারিকায় উপস্থিত,—তিনি জানিতেন যে এই আত্মীয়দিগের মধ্যে যিনিই প্রথমে তাঁর শরণাপন্ন হইবেন তাঁহাকেই তাঁহার সাহায্য প্রদান করিতে হইবে,—তিনি জানিতেন যে তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় দেখিলে দুর্য্যোধন স্বীয় গর্ব্বিত ও দাম্ভিক প্রকৃতি বশতঃ কখনই তাঁহার শীয়রে ব্যতীত তাঁহার পদতলে আসন গ্রহণ করিবেন না, তিনি জানিতেন যে অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার পদতলে দণ্ডায়মান থাকিলে অর্জ্জুনকেই তিনি প্রথমে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে অর্জ্জুনকে প্রথমে দেখা ও দুর্য্যোধনের প্রথমে গৃহে প্রবেশ করা রূপ সমস্যাস্থলে ইতর-বিশেষ করিতে গেলে তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য সফল হয় না ও নিজের অপক্ষপাতিত্বের ভান করা যায় না, তখন তিনি উভয়কেই সাহায্য প্রদানে স্বীকৃত হইলেন। এই সাহায্য প্রদানেও আবার তাঁর ঘোর কুটিল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যখন তিনি দুর্য্যোধনের প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিয়া বলিলেন যে "এক দিকে আমার জগদ্বিখ্যাত সশস্ত্র সমস্ত নারায়ণী সেনা ও অপরদিকে নিরস্ত্র একেলা আমিমাত্র,—" দুর্য্যোধন মহা আহ্লাদে সেই অসংখ্য নারায়ণী সৈনাই গ্রহণ করিলেন—কিন্তু দুর্য্যোধন বুঝিলেন না যে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে কৃষ্ণেরই নারায়ণী সেনা কখনই বীরমদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইবে না। অথচ কৃষ্ণ নিরস্ত্র হইয়াও যদি অর্জ্জুনের সারথী ও পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণাদাতা হয়েন তাহা হইলে পাণ্ডবদিগের জয় ত স্থিরনিশ্চয়। আর কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী হইতেই প্রতিশ্রুত হইলেন। যাহা হউক, কৃষ্ণের অপক্ষপাতিত্বে ও উদারতায় অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধন উভয়েই মহা হর্ষে দ্বারকা হইতে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

বিশে সেপ্টেম্বর আমরা "পুনা" ষ্টীমারে উঠ্‌লেম। পাঁচটার সময় জাহাজ ছেড়ে দিলে। আমরা তখন জাহাজের ছাতে দাঁড়িয়ে। আস্তে আস্তে আমাদের চোখের সামনে ভারতবর্ষের শেষ তট-রেখা মিলিয়ে গেল। চারদিকের লোকের কোলাহল সহিতে না পেরে আমি আমার নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পোড়লেম। গোপন কর্‌বার বিশেষ প্রয়োজন দেখ্‌ছিনে, আমার মনটী বড়ই কেমন নির্জ্জীব অবসন্ন ম্রিয়মাণ হোয়ে পোড়েছিল, কিন্তু দূর হোক্‌গে—ওসব করুণ-রসাত্মক কথা লেখ্‌বার অবসরও নেই

ইচ্ছেও নেই ; আর লিখ্‌লেও, হয় তোমার চোখের জল থাক্‌বে না, নয় তোমার ধৈর্য্য থাক্‌বে না।

সমুদ্রের পায়ে দণ্ডবৎ! ২০ শে থেকে ২৬ শে পর্য্যন্ত যে কোরে কাটিয়েছি তা' আমিই জানি! "সমুদ্র পীড়া" কাকে বলে অবিশ্যি জান, কিন্তু কি রকম তা জান না। আমি সেই ব্যামোয় পোড়েছিলেম, সে কথা বিস্তারিত কোরে লিখ্‌লে পাষাণেরও চোখে জল আস্‌বে! ৬ টা দিন, মশায়, শয্যা থেকে উঠিনি। যে ঘরে থাক্‌তেম, সেটা অতি অন্ধকার, ছোট ; পাছে সমুদ্রের জল ভিতরে আসে তাই চারদিকের জান্‌লা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। অসূর্য্যম্পশ্যরূপ ও অবায়ুস্পর্শ-দেহ হোয়ে ছয়টা দিন কেবল বেঁচে ছিলেম মাত্র। প্রথম দিন সন্ধ্যে বেলায় আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে জোর কোরে বিছানা থেকে উঠিয়ে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেম তখন আমার মাথাটার ভিতর যেন একটা বিপর্য্যয় ব্যাপার বেধে গেল, মাথার ভিতর যা কিছু আছে সবাই মিলে যেন মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ কোরে দিলে, চোখে দেখ্‌তে পাইনে, পা চলে না, সর্ব্বাঙ্গ টলমল করে, ছুপা গিয়েই একটা বেঞ্চিতে বোসে পোড়লেম। আমার সহযাত্রীটি আমাকে ধরাধরি কোরে জাহাজের 'ডেকে' অর্থাৎ ছাদে নিয়ে গেলেন। একটা রেলের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেম। তখন অন্ধকার রাত। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। আমাদের প্রতিকূলে বাতাস বইচে। সেই অন্ধকারের মধ্যে—সেই নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্রে দুই দিকে অগ্নি উৎক্ষিপ্ত কর্‌তে কর্‌তে আমাদের জাহাজ একলা চোলেছে, যেখানে চাই সেই দিকেই অন্ধকার সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে—সে এক মহা গম্ভীর দৃশ্য! জাহাজ যখন চলে তখন তার দুই দিকে যেন আগুন ভেঙ্গে পড়ে, অন্ধকার রাত্রে সে বড় সুন্দর দেখায়। একেই Phosphorescence বলে।

সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌তে পারলেম না। ভয়ানক মাথা ঘুর্‌তে লাগল। ধরাধরি কোরে আবার আমার ক্যাবিনে (ঘরে) এলেম। সেই যে বিছানায় পড়্‌লেম, ছ দিন আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাথা তুলিনি। আমাদের যে স্টুয়র্ড্‌ ছিল, (যাত্রীদের সেবার জন্য জাহাজে যে সব চাকর থাকে)-কারণ জানিনে-আমার উপর তার কেমন বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। দিনের মধ্যে যখন-তখন সে আমার জন্যে খাবার নিয়ে উপস্থিত কর্‌ত ; না খেলে কোন মতেই ছাড়্‌ত না। সে বোল্‌ত, না খেলে আমি ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়্‌ব (weak as a rat) সে বোল্‌ত সে আমার জন্যে সব কাজ কর্‌তে পারে, আমি তাকে যথেষ্ট সাধুবাদ দিতেম, এবং জাহাজ ছেড়ে আস্‌বার সময় সাধুবাদের চেয়ে আরো কিঞ্চিৎ গৌরবান পদার্থ দিয়েছিলেম।

ছ দিনের পর আমরা যখন এডেনের কাছাকাছি পৌঁছলেম, তখন সমুদ্র কিছু শান্ত হোল। সে দিন আমার স্টুয়ার্ড্‌ এসে নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জন্যে আমাকে

বারবার অনুরোধ কোরতে লাগল। আমি তার পরামর্শ শুনে বিছানা থেকে ত উঠলেম, উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মত দুর্ব্বল হোয়ে পোড়েছি। মাথাটা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভাল-রকম বনে না; চুরি-করা কাপড়ের মত শরীরটা যেন আমার ঠিক্ গায়ে লাগ্‌ছে না। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের উপর গিয়ে একটা কেদারায় হেলান দিয়ে পোড়লেম। অনেক দিনের পর বাতাস পেয়ে বাঁচলেম। দূপর বেলা দেখি একটা ছোট নৌকা সেই সমুদ্র দিয়ে চোলেছে। চার দিকে ৯০ ক্রোশের মধ্যে আর ডাঙ্গা নেই, জাহাজ-শুদ্ধ লোক অবাক্। তারা আমাদের ষ্টীমারকে ডাক্‌তে আরম্ভ কর্‌লে; জাহাজ থাম্‌ল। তারা একটি অতি ছোট নৌকায় কোরে কতকগুলি লোক জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। এরা সকলে আরব দেশীয়, এডেন থেকে মস্কটে যাচ্চে। পথের মধ্যে দিক্‌ভ্রম হোয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে যা জলের পিপে ছিল, তা ভেঙ্গে গিয়ে জল সমস্ত নষ্ট হোয়ে গেছে; অথচ যাত্রী অনেক। আমাদের জাহাজের লোকেরা তাদের জল দিলে। একটি ম্যাপ খুলে কোন্‌দিকে ও কতদূরে মস্কট, তাদের দেখিয়ে দিলে; তারা আবার চল্‌তে লাগল। সে নৌকো যে মস্কট পর্য্যন্ত পৌঁছোবে, তাতে সকলেই সন্দেহ প্রকাশ কোরতে লাগ্‌ল।

২৮ শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি, আমাদের সম্মুখে সব পাহাড় পর্ব্বত উঠেছে। অতি সুন্দর পরিষ্কার প্রভাত; সূর্য্য সবে মাত্র উঠেছে, সমুদ্র অতিশয় শান্ত। দূর থেকে সেই পর্ব্বতময় ভূভাগের প্রভাতদৃশ্য এমন সুন্দর দেখাচ্ছে যে কি বল্‌ব। পর্ব্বতের উপর রঙ্গিন্ মেঘগুলি এমন নত হোয়ে পোড়েছে, যে মনে হয় যেন, অপরিমিত সূর্য্যকিরণ পান কোরে তাদের আর দাঁড়াবার শক্তি নেই, পর্ব্বতের উপরে যেন অবসন্ন হয়ে পোড়েছে। আয়নার মত পরিষ্কার শান্ত সমুদ্রের উপর ছোট ছোট পাল-তোলা নৌকোগুলি আবার কেমন ছবির মত দেখাচ্ছে!

এডেনে পৌঁছে বাড়িতে চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করলেম। কিন্তু লিখ্‌তে গিয়ে দেখি যে এই কদিন নাড়াচাড়া খেয়ে মাথার ভিতরে যেন সব উলটো-পালটা হোয়ে গেছে; বুদ্ধির রাজ্যে একটা অরাজকতা ঘোটেছে; কি কোরে লিখ্‌ব, কেমন কোরে লিখ্‌ব ভাল মনে আস্‌চে না। ভাব-গুলো যেন মাকড়্‌সার জালের মত, ছুঁতে গেলেই অমনি ছিঁড়ে খুঁড়ে যাচ্চে। কিসের পর কি লিখব, তার একটা ভাল রকম বন্দোবস্ত কোর্‌তে পারছিনে। এই অবস্থায় লিখ্‌তে আরম্ভ কর্‌লেম, এমন বিপদে পোড়ে তোমাকে যে লিখ্‌তে পারিনি তাতে তোমার ক্ষোভের কারণ কিছুই নাই।

দেখ, সমুদ্রের উপর আমার কতকটা অশ্রদ্ধা হোয়েছে। কল্পনায় সমুদ্রকে যা' মনে কর্‌তেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলেনা। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান্ বোলে মনে হয়, কিন্তু

সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না। তার কারণ আছে; আমি যখন বম্বের উপকূলে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতেম তখন দেখতেম, দূর দিগন্তে গিয়ে নীল জল নীল আকাশে মিশিয়ে গিয়েছে, কল্পনায় মনে কর্‌তেম যে, একবার যদি ঐ দিগন্তের আবরণ ভেদ কোর্‌তে পারি—ঐ দিগন্তের যবনিকা উঠাতে পারি, অমনি আমার সুমুখে এক অকূল অনন্ত সমুদ্র একেবারে উথ্‌লে উঠ্‌বে। ঐ দিগন্তের পরে যে কি আছে তা আমার কল্পনাতেই থাক্‌ত, তখন মনে হোত না, ঐ দিগন্তের পরে আর এক দিগন্ত আসবে! কিন্তু যখন সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ি, তখন মনে হয় যে, জাহাজ যেন চোল্‌চে না, কেবল একটি দিগন্তের গণ্ডীর মধ্যে বোসে আছে। আমাদের কল্পনার পক্ষে সে দিগন্তের সীমা এত সঙ্কীর্ণ যে মন কেমন তৃপ্ত হয় না। কিন্তু দেখ, এ কথা বড় গোপনে রাখা উচিত; বাল্মীকি থেকে বায়রণ পর্য্যন্ত সকলেরই যদি এই সমুদ্র দেখে ভাব লেগে থাকে, তবে আমার না লাগ্‌লে দশজনে যে হেসে উঠ্‌বে; গ্যালিলিওর সময়ে এ কথা বোল্লে হয়ত আমাকে কয়েদে যেতে হোত। এত কবি সমুদ্রের স্তুতিবাদ কোরেছেন যে আজ আমার এই নিন্দায় তাঁর বোধ হয় বড়-একটা গায়ে লাগ্‌বে না। স্বীকার করি, যখন তরঙ্গ ওঠে, তখন সমুদ্র বেশ দেখায়, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদ্রে তরঙ্গ উঠলেই আমার এমন মাথা ঘুর্‌তে থাকে যে আমার দেখাশুনো সব ঘুরে যায়।

আমি যখন ঘর থেকে বেরোতে আরম্ভ করলেম, তখন জাহাজের যাত্রীদের উপর আমার নজর পোড়্‌ল ও আমার উপর জাহাজের যাত্রীদের নজর পোড়্‌ল। আমি স্বভাবতই "লেডি"-জাতিকে বড় ডরাই। তাঁদের কাছে ঘেঁস্‌তে গেলে এত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা যে, চানক্য পণ্ডিত থাকলে "লেডি"-দের কাছ থেকে দশ সহস্র হস্ত দূরে থাকতে পরামর্শ দিতেন। সর্ব্বদাই ভয় হয় পাছে কি কথা বোল্‌তে কি কথা বোলে ফেলি, আর আমাদের অসহিষ্ণু কোমল-স্বভাব লেডি তাঁদের আদব-কায়দার তিলমাত্র ব্যতিক্রম সইতে না পেরে দারুণ ঘৃণায় ও লজ্জায় একেবারে মূর্চ্ছা যান, আর দশদিক্ হোতে দশটা জেণ্টল্‌ম্যান্ একেবারে হাঁ হাঁ কোরে এসে পড়েন। পাছে তাঁদের গাউনের অরণ্যের মধ্যে পথহারা হোয়ে একেবারে ভেবাচেকা লেগে যাই; পাছে রাস্তায় পা ফেল্‌তে তাঁদের গাউনের উপর পা ফেলি; পাছে আহারের সময় তাঁদের মাংস কেটে দিতে হয়, পাছে মাংস কাট্‌তে গিয়ে হাড় কেটে বসি—এই রকম সাত পাঁচ ভেবে আমি জাহাজের লেডিদের কাছ থেকে অতি দূরে থাক্‌তেম। আমাদের জাহাজে লেডির অভাব ছিল না, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যানরা সর্ব্বদা খুঁৎ খুঁৎ কর্‌তেন যে, তার মধ্যে অল্পবয়স্কা বা সুশ্রী একজনো ছিল না। একজন এত লম্বা, তাঁর ঠোঁট এত বন্ধুর, তাঁর মুখে এত দাগ, তাঁর দাঁতের এত দৈর্ঘ্য, তাঁর আহারের পরিমাণ এত অল্প-

রিমিত যে, তেমন দুইটা পুরুষ সচরাচর খুঁজলে পাওয়া যায় না। একজন আছেন তাঁকে জ্যামিতি শাস্ত্রের রেখা (Length without breadth) বলা যেতে পারে। তাঁর শরীর লম্বা, মুখ লম্বা, হাত লম্বা, পা লম্বা, চোক ছোট, নাক ছোট, মাথা ছোট। এক জনের দাঁতের সম্পূর্ণরূপে অভাব ছিল, কিন্তু আহার-কালে দন্তবান্ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পরাস্ত মান্ত। জাহাজে কেবল একজন যুবতী আছেন মাত্র, কিন্তু জেণ্টল্‌ম্যান্‌দের পোড়া অদৃষ্টবশতঃ যাঁরা অধিক বয়স্কা ছিলেন তাঁরাই যৌবনের মুখস পোরে নানা প্রকার হাবভাব কোরে পুরুষদের হৃদয়-রাজ্যে একটা গোলমাল বাধাবার জন্যে যথাসাধ্য বলপ্রয়োগ কর্‌তেন, আর যুবতীটি ছিবলামীর বয়স গিয়াছে মনে কোরে ঘোমটা (Veil) টেনে এক প্রান্তে সারাদিন বাইবেল পোড়তেন। পুরুষদের মন লুটপাট কর্বার জন্যে এই দিদিমার বয়সী লেডিগণ যে রকম প্রাণপণে যত্ন কর্‌তেন, তা দেখ্‌লে তোমার মায়া হোত। পুরুষের কাছে তাদের সেই অতি মধুর ললিত-গলিত ভাবের হাসি, অতি ঢল-ঢল ভাবের অঙ্গ-ভঙ্গী দেখে আমার প্রচুর পরিমাণে হাসা ও করুণরসের আবির্ভাব হোত! কাপড়ে চোপড়ে, রঙে-চঙে, তাঁরা তাঁদের ভাঙ্গা-চূরা রূপকে কোন প্রকারে ঠেকো দিয়ে রেখেছেন মাত্র!

পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোয়েছিল। ব—মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা হোয়েছিল। তিনি লোক বড় ভাল। এমন ধাঁচের লোক বড় সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কথা অনর্গল, হাসি অজস্র, আহার অপরিমিত। সকলের সঙ্গেই তাঁর আলাপ, সকলের সঙ্গেই তিনি হাসি তামাসা কোরে বেড়ান। তাঁর একটা গুণ আছে, তিনি কখনো বিবেচনা কোরে, ভেবে-চিন্তে, মেজে-ঘোষে কথা কন না; ঠাট্টা করেন, কিন্তু সকল সময়ে তার মানে থাকে না, কিন্তু না থাকুক্, তিনি নিজে হেসে আকুল হন। তিনি তাঁর বয়সের ও পদমানের গাম্ভীর্য্য বুঝে হিসাব কোরে কথা কন না, মেপে-জুকে হাসেন না ও চুদিক্ বজায় রেখে মত প্রকাশ করেন না, এই সকল কারণে তাঁকে আমার বড় ভাল লাগ্‌ত। তাঁর মনটা এখনো হামাগুড়ি দিচ্চে—কত প্রকার যে ছেলেমানুষী করেন তার ঠিক নেই; ঘোরতর বিজ্ঞতার আতিশয্যে মুখটা অন্ধকার কোরে তাঁকে মোটাগলায় কথা কইতে কখনো শুনি নি। বৃদ্ধত্বের বুদ্ধি, ও বালকত্বের সাদাসিদা নিশ্চিন্ত ভাব একত্রে দেখ্‌লে আমার বড় ভাল লাগে। তাঁর একটা স্বভাব আছে যে কাকেও তিনি তার পিতা-মাতা-প্রদত্ত নাম ধোরে ডাকেন না—তিনি নিজে স্বতন্ত্র নাম-করণ করেন। আমাকে তিনি "অবতার" বল্‌তেন, Gregory সাহেবকে "গড়্‌গড়ি" বলতেন, জাহাজের আর এক যাত্রীকে "রুহিমৎস্য" বোলে ডাক্‌তেন, সে বেচারীর অপরাধ কি তা জান? সাধারণ মানুষদের চেয়ে তার ঘাড়ের দিকটা কিছু খাটো ছিল, তার মাথা ও

শরীরের মধ্যে একটা স্বতন্ত্র যোজক পদার্থ ছিল না বোল্লেও হয়। এই জন্যে ব—মহাশয় তাকে মৎস্য শ্রেণীভুক্ত করে ছিলেন। কিন্তু আমি যে কেন অবতার-শ্রেণীর মধ্যে পোড়ে গিয়েছিলেম, তার কারণ সহজে নির্দ্দেশ করা যায় না। খাবার সময়ে তাঁর এক গল্প ছিল যে, এক জন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল, তার অপরিমিত আহার দেখে তার পাশের এক জন ভদ্র লোক বল্লেন, "মহাশয়, পরের খরচে আহার কোচ্চেন অতএব বড় ভাবনার বিষয় নেই বটে, কিন্তু মনে রাখবেন পেটটি আপনার।" কিন্তু ব—মহাশয় নিজে সকল সময় সেইটি মনে রাখেন না!

আমাদের জাহাজের Mr. T—মহাশয় কিছু নূতন রকমের লোক। তিনি ঘোরতর ফিলজফর মানুষ। তাঁকে কখনো চলিত ভাষায় কথা কইতে শুনিনি। তিনি কথা কইতেন না, বক্তৃতা দিতেন। এক দিন আমরা দু চারজনে মিলে জাহাজের ছাতে দুই দণ্ড আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছিলেম, এমন সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে ব—মহাশয় তাঁকে বল্লেন "কেমন সুন্দর তারা উঠেছে," এই আমাদের ফিলজফর মশায় তারার সঙ্গে মনুষ্য-জীবনের সঙ্গে একটা উৎকট সম্বন্ধ বাধিয়ে দিয়ে বক্তৃতা সুরু কল্লেন—আমরা বেচারীরা "ঘুর্ঘেতে চাহিয়া থাকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া" রইলেম। গল্প-সল্প ঘুচে গেল, গান বাজনা থেমে গেল, জন দুয়েক চুলতে আরম্ভ কোর্‌লেন, জন দুয়েক হাই তুল্‌তে আরম্ভ কোর্‌লেন—সমস্ত মাটি হয়ে গেল।

আমাদের জাহাজে একটি আন্তো জন্তু ছিলেন। তাঁর তাল বৃক্ষের মত শরীর, ঝাঁটার মত গোঁফ, সজারুর কাঁটার মত চুল, হাঁড়ির মত মুখ, মাছের চোকের মত ভাব-বিহীন ম্যাড়্‌মেড়ে চোক, তাঁকে দেখ্‌লেই আমার গা কেমন কর্‌ত, আমি পাঁচ হাত তফাতে সোরে যেতেম। এক এক জন কোন অপরাধ না কোর্‌লেও তার মুখশ্রী যেন সর্ব্বদা অপরাধ কোর্‌তে থাকে। প্রত্যহ সকালে উঠেই শুন্‌তে পেতেম তিনি ইংরিজি, ফ্রেঞ্চ, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি যত ভাষা জানেন সমস্ত ভাষায় জাহাজের সমস্ত চাকর বাকরদের অপরিমিত গাল দিতে আরম্ভ কোরেছেন, ও দশদিকে দাপাদাপি কোরে বেড়াচ্চেন। তাঁকে কখনো হাস্‌তে দেখি নি; কারো সঙ্গে কথা নেই বার্ত্তা নেই, আপনার ক্যাবিনে গোঁ হোয়ে বোসে আছেন। কোন কোন দিন "ডেকে" বেড়াতে আস্‌তেন, বেড়াতে বেড়াতে যার দিকে একবার কৃপা-কটাক্ষে নেত্রপাত কর্‌তেন, তাকে যেন পিঁপড়াটির মত মনে কর্‌তেন।

প্রত্যহ খাবার সময়ে ঠিক্ আমার পাশেই Mr B—বোস্‌তেন। তিনি একটি ইয়ুরাসীয়। কিন্তু তিনি ইংরাজের মত গান গাইতে, শিষ দিতে, পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক কোরে দাঁড়াতে সম্পূর্ণরূপে শিখেছেন। তিনি আমাকে বড়ই অনুগ্রহের চোখে দেখ্‌তেন। এক দিন এসে মহা গম্ভীর স্বরে বোল্লেন—'Young man, তুমি Oxford-এ যাচ্চ, Oxford University বড় ভাল বিদ্যালয়;'—এ কথা

তিনি না বোল্লে Oxford University যেন মাটি হোয়ে যেত! আমি এক দিন ট্রেক সাহেবের "Proverbs and their lessons" বই-খানি পোড়্‌ছিলেম, তিনি এসে বইটি নিয়ে শিষ দিতে দিতে দুচার পাত উল্‌টিয়ে পাল্‌টিয়ে বল্লেন "হাঁ, ভাল বই বটে!" ট্রেকের শুভাদৃষ্ট!! আমার উপর তাঁর কিছু মুরুব্বিয়ানা ব্যবহার ছিল।

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মানস প্রসূন। শ্রী নগেন্দ্রনাথ ঘোষপ্রণীত, কাশীধাম যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।০ মাত্র।

ইহা একখানি কবিতা-পুস্তক। চারিটি প্রসঙ্গ লইয়া যে চারিটি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সে-গুলি সুভাব-সম্পন্ন, হৃদয়-গ্রাহী ও প্রীতিকর। লেখকের মানস-প্রসূন প্রকৃত রূপে পরিস্ফুট হইলে লেখক বঙ্গসাহিত্য-মণ্ডলে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বিজন-সংগীত (কাব্য।) শ্রী যদুনাথ পালিত কর্ত্তৃক প্রণীত। বিজন যন্ত্রে মুদ্রিত—মূল্য ১ টাকা।

এই পুস্তক খানিও দ্বাদশটি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ লইয়া রচিত হইয়াছে। লেখকের সুন্দর ভাবুকতার পরিচয়-স্বরূপ আমরা পুস্তক খানি হইতে কটিকতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি—

"নব বলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন—
লাজহীন আগেকার সোজা গতি নাহি আর,
চলিতে জড়ায় এবে চরণে চরণ,
অগ্রসর হতে যেন নাহি সরে মন।

নব বলয়িতা লতা বালিকা-যৌবন—
ভয়ে লাজে জড় সড়, সততই হয়ে পড়,
নিজ দেহ সঙ্কুচিত কর অনুক্ষণ,
শিহর, সরমে যদি পরশে পবন।

আর, ওই সুমধুর সলাজ ধরণ—
এই মুখ প্রকাশিয়ে আবার ঘোমটা দিয়ে,
বারিদে করিছে যেন চাঁদে আবরণ?—
আকুলিতে বুঝি মোর চকোর নয়ন।

আর, ওই সুমধুর সলাজ বীক্ষণ—
এই বেশ চোখ চেয়ে—আবার কি লাজ পেয়ে
মৃদু হেসে অধোপানে করিতে লোকন—
জড়িত জড়িত দৃষ্টি সুন্দর কেমন।

ওই তব সুমধুর সলাজ কথন—
ক'ব না ক'ব না করে, অস্পষ্ট প্রেমের স্বরে,
নিজ মনে নিজে যেন বলিতে যখন,
অধোমুখে প্রণয়ের সঞ্চার নূতন।"

নর্ম্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গ্লো-নর্ম্ম্যান্ সাহিত্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

দ্বিতীয় ভাগ ১১ সংখ্যা ৫১২ পৃষ্ঠা ভারতীর পর।

আমরা "স্যাক্সন জাতি ও আঙ্গ্লো-স্যাক্সন সাহিত্য" নামক প্রবন্ধে বলিয়াছি যে আঙ্গ্লো-স্যাক্সন রাজত্বের পতনের কিছু পূর্ব্বে আঙ্গ্লো-স্যাক্সন জাতি ক্রমশই অবনতির গহ্বরে নামিতে ছিল। মহাত্মা আল্‌ফ্রেড তাঁহার প্রজাদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা বিষয়ে যে উদ্যম উদ্রেক করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহা ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া গেল। অকর্ম্মণ্যতা অজ্ঞতা ও আলস্যে সমস্ত জাতিই যেন জড়ীভূত ও অভিভূত হইয়া আসিতেছিল। টিউটনিক জাতির শিরায় শিরায় প্রধাবিত যে স্বাধীনতা-প্রিয়তার জ্বলন্ত-বহ্নি তাহাও যেন ক্রমশই নির্ব্বাপিত ও শীতল হইয়া আসিতেছিল। স্যাক্সনগণ যখন দিগ্বিদিক লুণ্ঠন করিবার মানসে দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্রবক্ষে বিচরণ করিত তখন তাহাদের দলপতি ছিল বটে কিন্তু রাজা ছিল না, তখন তাহারা সর্ব্বতোমুখী প্রভুতার অধীনে গ্রীবা নত করিতে পারিত না, কিন্তু যখন তাহারা ইংলণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল তখন দলপতি ও দলস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে ক্রমশঃ রাজা প্রজার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, উভয়ের মধ্যে ঐক্যভাব ঘুচিয়া গেল, ও সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা দলপতি ক্রমে উচ্চতর আসনে অধিষ্ঠিত হইল। দলপতির পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরো কতকগুলি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইল, এই রূপে অধিবাসিগণ উচ্চ ও নীচ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। যেখানেই উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর বিভাগ আছে, সেই খানেই যে উচ্চ শ্রেণী নীচ শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে তাহার আর কি কথা আছে? ডেনিষ দস্যুদের অত্যাচারে নিবাসীদের ধন প্রাণ এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল যে অ্যাল্‌ফ্রেডের সময় হইতে ইহা এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, সকলকেই এক জন Thign এর অর্থাৎ প্রভুর আশ্রয়ে থাকিতে হইবে; Thign অর্থে ভৃত্য বুঝায় কিন্তু রাজার ভৃত্য হউক প্রজাদের প্রভু।) আশ্রয়দাতা ও আশ্রিতদের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, এইরূপে সকল অধিবাসীর সমান অধিকার ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া গেল। বহিঃশত্রু ডেনিষ দস্যুদের দ্বারা স্যাক্সনেরা যথেষ্ট নিপীড়িত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাই তাহাদের একমাত্র দুর্ভাগ্য নয়; তাহাদের আপনাদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, ক্ষুদ্র ইংলণ্ড তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল, প্রত্যেক প্রদেশস্বামী অপরাপর প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের নিমিত্ত প্রাণপণ করিতেছিল। এইরূপ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন উপক্রত প্রান্ত

দেশে সাহিত্যের যে যথেষ্ট অবনতি হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা সমগ্র জাতির হৃদয়ের কথা প্রকাশ না করে, সমগ্র জাতির হৃদয়ে যাহা প্রতিধ্বনিত না হয় তাহাকে আর জাতীয় সাহিত্য বলিব কি করিয়া? যে বিদ্যা কেবল ধর্ম্মাচার্য্যগণের অধিকারের মধ্যেই বদ্ধ ছিল ও যে সাহিত্য আশ্রম-গৃহের ধূলিময় গ্রন্থাধারের অন্ধকারের মধ্যেই আচ্ছন্ন ছিল, সে বিদ্যাকে সমগ্র জাতির উন্নতির চিহ্ন ও সে সাহিত্যকে সমস্ত জাতির হৃদয়ের কথা বলিতে পারি না। একেত বিদ্যাচর্চ্চা অতিশয় সঙ্কীর্ণ শ্রেণীতেই বদ্ধ ছিল, তাহাতে তাহার সীমা আরো ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিতে লাগিল, ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে ক্রমশঃ বিদ্যানুশীলন রহিত হইল। এই রূপে অজ্ঞতা অন্ধকারাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের রক্তপাত ও অশান্তি রাজত্ব করিতে লাগিল।

এই রূপ অবস্থায় যখন নর্ম্মানেরা ইংলণ্ডে আসিল তখন তাহারা সাহিত্যশূন্য নিষ্ফল স্যাক্সন ভাষা ও স্যাক্সন ভাষীদের প্রাণপণে ঘৃণা করিতে লাগিল। সুতরাং স্বভাবতই ফরাসী তখনকার সাধুভাষা, রাজভাষা ও লিখিবার ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। পাছে অসভ্য স্যাক্সনদের সহিত মিশিয়া তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার কলুষিত হইয়া যায় এই জন্য নর্ম্মাণেরা তাহাদের সন্তানদের ফ্রান্সে পাঠাইয়া দিত। পাঠশালে ও বিশ্ব বিদ্যালয়ে সকলকেই ফরাসী অথবা ল্যাটিন ভাষায় কথা কহিতে হইত। স্যাক্সন ইতর ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সে ভাষায় আর পুস্তক লিখা হয় না। তখন ত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, সুতরাং অতি অল্প লোকেরই পুস্তক প্রাপ্তি ও পাঠের সুবিধা ছিল, সাধারণ লোকদিগের পাঠ করিবার অবসর, সুবিধা ও ক্ষমতা ছিল না; যাহাদের পুস্তক পাঠ করিবার ক্ষমতা ছিল তাহারা সঙ্গতিপন্ন উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ফরাসী বা ল্যাটিন ছাড়িয়া গ্রাম্য স্যাক্সন পুস্তক পড়িতে স্বভাবতই সঙ্কোচ ও অরুচি অনুভব করিত। আমাদের দেশে যখন নূতন ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দুইছত্র ইংরাজি লিখিতে পারিলে যেমন বিদ্যা শিক্ষা সফল হইল মনে করিতেন, নর্ম্মাণ অধিকারে স্যাক্সন যুবাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, এরূপ অবস্থায় স্যাক্সন ভাষায় লিখিতে চেষ্টা করা হেয় কার্য্যের মধ্যে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। স্যাক্সন ভাষায় পুস্তক লিখিতে গেলে পাছে কেহ মনে করে, তবে বুঝি লেখক ফরাসী জানে না, ইহা অপেক্ষা লজ্জার কথা কি আছে বল। কোন কোন কবি কয়েক ছত্র ফরাসি ও কয়েক ছত্র স্যাক্সন লিখিতেন, কেন না, এরূপ করিলে ফরাসী ভাষায় অজ্ঞতার অপবাদ লেখকের নামে পৌঁছাইতে পারে না, তাহা হইলেই তিনি এক প্রকার নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। নিম্নে একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি—

Len puet fere et defere,
Ceo fait-il trop sovent :

It nis nouther wel ne faire;
Therefore England is Shent.
Nostre prince de Englatere
Par le consail de sa gent
At Westminstr after the feirg
Made a gret parlement.

কেহ কেহ বা লাটিন, ফরাসী ও চলিত ভাষা এই তিন মিশাইয়া কবিতা লিখিতেন—

When mon may nest do
Tunc ville suum manifestat
In donis also si vult tibi
Præmia præstat.
Ingrato benefac, post
Hæc a peyne te verra;
Pur bon vin tibi lac non dat
Nec rem tibi rindra.

দুই তিনটি বিভিন্ন ভাষার এরূপ ঘোরতর মিশ্রণের ফল হয় এই যে, উহাদের কোনটা বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না, সবগুলাই বিকৃত হইয়া যায়। ফরাসীর মধ্যে স্যাক্সন ভাব ও কথা, স্যাক্সনের মধ্যে ফরাসী ভাব ও কথা প্রবেশ করিয়া ফরাসী ও স্যাক্সন উভয়ই ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে। ইংলণ্ডে তাহাই হইয়াছিল। নর্ম্মাণ আমীর-ওমরাওগণ স্যাক্সনমিশ্রিত ফরাসী কহিতে লাগিল ও সাধারণ অধিবাসীগণ ফরাসী মিশ্রিত স্যাক্সন কহিতে লাগিল। নর্ম্মাণেরা যে এত চেষ্টা করিয়াছিল, যাহাতে তাহাদের ভাষা বিশুদ্ধ থাকে, সে চেষ্টা সফল হইল না। যখন নর্ম্মান ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহের কোন বাধা ছিল না, তখন স্যাক্সন ও ফ্রেঞ্চ দুই ভাষার মিশ্রণ নিবারণের কোন উপায় ছিল না। এইরূপে যখন দুই ভাষা মিশিয়াছিল বা মিশিতে ছিল, তখনকার সাহিত্য Semi-Saxon অর্থাৎ অর্দ্ধ স্যাক্সন সাহিত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য আর কিছুই নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের বাল্যাবস্থা—সংগ্রহ, অনুকরণ ও অনুবাদের অবস্থা। ফরাসী সাহিত্যই তাহার আদর্শ। এ সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে Chivalryর বিষয় সংক্ষেপে অনুশীলন করা আবশ্যক।

"ইউরোপীয় ক্ষাত্র ধর্ম্ম" বলিলে Chivalry-র এক প্রকার বাঙ্গালা অনুবাদ করা হয়, কেবল আমাদের ক্ষাত্রধর্ম্মে মহিলা পূজা ছিল না, Chivalryতে তাহা ছিল। যদি "ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ, ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।" হয়, তবে Chivalrous অর্থেও তাহাই বুঝায়। মধ্য-যুগে ইয়ুরোপে যখন বলের নামই ন্যায়, ধর্ম্ম, শক্তি ছিল, তখন সেই নির্দ্দয় বলের হস্ত হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই Chivalryর উদ্দেশ্য ছিল। যদিও ইহাই তাহার উদ্দেশ্য তথাপি ফলে Chivalry সেই উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া ছিল—প্রকৃত পক্ষে, যশের ইচ্ছা তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত বিজয় সাধন করিয়া বেড়ানই Chivalryর কার্য্য হইয়াছিল। আপনার বলের উপর বিশ্বাস থাকিলে সেই বল পরীক্ষা ও অনু-

শীলন করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী অন্বেষণের বাসনা হয়, এই নিমিত্ত মধ্যযুগের নাইটগণ (Knight) বিপদ অন্বেষণ ও দুঃসাহসিকতা অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেন। সমাজের আদিম অবস্থায় রক্তপিপাসা শান্তির নিমিত্তই লোকে রক্তপাত করিত, কিন্তু য়ুরোপের সমাজ যখন অধিকতর উন্নত হইল তখন যশ-ইচ্ছার নিমিত্ত রক্তপাত প্রচলিত হইল। সামাজিকতা বিষয়ে অনেক উন্নত না হইলে কখনো যশের ইচ্ছা জন্মিতে পারে না। সমাজে বিখ্যাত হইবার ইচ্ছাই সমাজের প্রতি অনেক পরিমাণে মমতা জন্মিবার চিহ্ন। Chivalryর আর এক ভাগ মহিলাপূজা। এই মহিলা-পূজা এমন অপরিমিত সীমায় পৌঁছিয়াছিল যে, তাহা সমূহ গর্হিত ও হাস্যজনক। ঈশ্বর ও মহিলাপূজা এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। বুর্ব্বোঁর ডিউক Louis II তাঁহার নাইটদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "From them (ladies) after God comes all the honour that men can acquire." আরাগণের অধিপতি James II নিয়ম করিয়াছিলেন যে, মহিলার সঙ্গে থাকিলে হত্যা ভিন্ন যে কোন দোষে কেহ দোষী হউক্ না কেন তাহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না। নর্ম্মানরা এই Chivalry ভাব ইংলণ্ডে আনয়ন করিল। Chivalrous কবিতা ও সঙ্গীতে Semi saxon সাহিত্য পূর্ণ করিল। ইহার পূর্ব্বে আঙ্গ্লো-স্যাক্সন সাহিত্যে রক্তপাত ও যুদ্ধের বর্ণনা অনেক ছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে chivalry ভাব কিছু মাত্র ছিল না। এখন বীরত্বের গৌরব কীর্ত্তন, বিজয়-সঙ্গীত ও রমণীদের স্তুতিবাদে ইংরাজি সাহিত্যক্ষেত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিন্তু সকলগুলিই প্রায় অনুবাদ, ও তাহাদের মধ্যে কবিত্ব-উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র নাই। অতি পরিষ্কার ভাবে ছত্রের পর ছত্র আসিতেছে, গল্পের স্রোত অতি নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাব নাই, তুলনা নাই, কবিত্ব-পূর্ণ বিশেষণ নাই, কতকগুলি কথা ও ঘটনা জোড়া-তাড়া দিয়া এক একটা স্ফীতোদর পুস্তক রচিত হইয়াছে। লেখক অতিশয় বিরক্তিজনক অনর্গল বক্তার মত বকিয়া বকিয়া, গল্প টানিয়া বুনিয়া, কথা বিনাইয়া বিনাইয়া পাঠকের নিদ্রাকর্ষণ না করিয়া ক্ষান্ত নহেন। যত প্রকার অলীক অস্বাভাবিক, আশ্চর্য্যজনক কথা লেখকের কল্পনায় আসিতে পারে সকলি তিনি তাঁহার গল্পে গাঁথিয়া দিতে চাহেন। Romance of Alexanderনামক কাব্য গ্রন্থ হইতে দুই একটা নমুনা দিতেছি—

মকর নামেতে প্রাণী আশ্চর্য্য আকার
বলবান প্রাণী বটে, বড় জাঁক তার—
কুমীরের পরে যদি পড়ে তার চোখ,
তবে আর রক্ষে নেই, দেখে কেবা রোখ ?
দুজনে লড়াই বাধে বড় ঘোরতর
প্রহারে দোঁহারে দোঁহে করে জর জর
মকর সেয়ানা বড় দোঁহার মাঝারে,
চুপিচুপি অমনি সে জলে ডুব মারে ;
মুখে তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কুমীরের পেটে
যেমন বিঁধিয়ে দেয়, মরে পেট ফেটে।

একটি ypotame-এর বর্ণনা শুনুন—

জলহস্তী বড়ই আশ্চর্য্য জানোয়ার,
হাতিও তেমন নহে কি কহিব আর!
ঘোড়ার মতন তার ঘাড়, পিঠ, জানি,
লেজ তার বাঁকা আর পাটো শুঁড় খানি!
পিচের মতন তার রঙ্গ বড় কালো
যত কিছু ফল খেতে বড় বাসে ভালো,
আপেল বাদাম আদি কিছু নাহি ছাড়ে,
কিন্তু সব চেয়ে তৃপ্তি মানুষের হাড়ে!

এইত কবিতার শ্রী। এরূপ ধৈর্য্যনাশক শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত করিতে আমরা ভয় করিতেছি, সুতরাং নিরস্ত হইতে হইল। কেবল তখনকার Romance নামক গ্রন্থ সকলের ভাব বুঝাইবার জন্য Geste of kyng Horn নামক গ্রন্থের মর্ম্ম পাঠকদের কহিতেছি। রাজা "মারে" যুদ্ধে বিধর্ম্মী স্যারাসীনদের দ্বারা হত হইলে পর তাঁহার পুত্র, গ্রন্থের নায়ক, হরন্ একটি ক্ষুদ্র নৌকায় কতকগুলি সঙ্গীর সহিত রাজা এমারের (Aylmer) দেশে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানকার রাজসভায় তিনি বিদ্যা শিক্ষা করেন। ক্রমে রাজা এমারের এক মাত্র কন্যা রিমেন্‌হিল্‌ড্ (Rimenhild) তাঁহার প্রেমে পড়িল। রাজকন্যা, হর্‌ণ্‌কে একটি মায়াময় অঙ্গুরী উপহার দেন। সেই অঙ্গুরী লইয়া তিনি স্যারাসীনদের সহিত যুদ্ধ করিতে বহির্গত হন, ও অঙ্গুরী প্রভাবে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া পুনরায় এমারের সভায় ফিরিয়া আসেন। কিন্তু রাজা এমার হর্‌ণের সহিত তাঁহার কন্যার প্রেম বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া হর্‌ণ্‌কে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। হর্‌ণ্ তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত বিদায় লইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, রাজকন্যা যেন সাত বৎসর তাঁহার জন্য অপেক্ষা করেন—ইতিমধ্যে তিনি যদি না ফিরিয়া আসেন, তবে রাজকুমারী আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন। ইতি মধ্যে রাজা মোডি রিমেন্‌হিল্‌ডকে বিবাহ করিবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। রাজ কুমার হর্‌ণ্ ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে অনেক বিপদ আপদ সহিয়া রাজা মোডির মুষ্টি হইতে রাজকন্যাকে মুক্ত করিয়া বিবাহ করিলেন। বিবাহের পর তিনি যুদ্ধ করিয়া তাঁহার মাতৃভূমি সুদীন Suddine শত্রু-হস্ত হইতে মুক্ত করেন। যখন তিনি যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার কপট বন্ধু ফাউকনিল্‌ড (Fykenild) সুযোগ পাইয়া রিমেন্‌হিল্‌ড্‌কে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। যুদ্ধাবসানে হর্‌ণ্ ফাইকনিলডের দুর্গে বীণাবাদিকের বেশে প্রবেশ করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ও তাঁহার প্রণয়িনীর সহিত মিলিত হইলেন। গল্প কিছু মন্দ নহে, কিন্তু লেখক এমন খুঁটিনাটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন ও এমন শাদাসিদা ভাবে লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহাকে কবিতা বলিতে পারি না।

সেমি-স্যাক্সন ভাষায় অনেক প্রেমের কবিতা আছে, কিন্তু এমন ভাববিহীন অসার কবিতা অনুবাদ করিতে গেলে তাহার আর রস কস কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, এরূপ কবিতা অনুবাদ করিলে পাঠকদের কিছু লাভ নাই, কেবল অনুবাদকের যন্ত্রণা।

ভোগ্য। একটি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

কথা মোর রাখ দেখি, একবার দেও সখি
প্রেমের আশ্বাস।
চাহি না কো আর কারে, যতদিন এসংসারে
করিতেছি বাস।
নিশ্চয় জানিও প্রিয়ে, এখনি জুড়াবে হিয়ে
তুমি মোরে ভাল বাস' যদি;
ওই অধরের শুধু—একটি চুম্বন মধু
হবে মোর দুখের ঔষধি।

দুই একটা স্বভাব-বর্ণনা অনুবাদ-সমেত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Mury hit is in sonne risyng.
The rose openith and unspring ;
Weyes fairith, the clay's clyng ;
The maidenes flowrith, the foulis syng.

Damosele makith mournyng
Whan hire leof makith pertyng.

অনুবাদ

অতিশয় সুখকর সূর্য্য যবে ওঠে
গোলাপ ফুলের কুঁড়ি বাগানেতে ফোটে ;
রাস্তা হয় পরিষ্কার কাদা যায় এঁটে ;
পাখী গান গায়, ফুল ফোটে মাঠে মাঠে ;
প্রণয়ীদিগের সাথে হইয়া বিচ্ছেদ
বিরহিণী রমণীরা করে কত খেদ।

আর একটি—

Averil is meory, and lengith the day,
Ladies loven solas, and play
Swaynes, justes ; knyghtis, turnay ;
Syngith the nyghtyngale, gredeth thes fay ;
The hote sunne clyngeth the clay,
As ye will y-sun may.

অনুবাদ

এপ্রেল সুখের মাস, বেড়ে যায় বেলা ;
মহিলারা ভালবাসে আদর ও খেলা ;
চাষারা খেলায় জুষ্ট, টুর্ণি নাইটেরা ;
বুল্‌বুল্ গান করে, চেঁচায় কাকেরা ;
কাদা সব এঁটে যায় খর রৌদ্র বলে
দেখিতেই পাও তাহা, জানত সকলে।

Chivalryর সঙ্গে সঙ্গে নর্ম্মানেরা রাজসভার আড়ম্বর ও চাকচিক্য, য়ুরোপ হইতে আনয়ন করিয়াছিল। কপট যুদ্ধ, দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উৎসব আমোদ নর্ম্মান ব্যারণদিগের দুর্গে দুর্গে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রথম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে স্কট্‌লণ্ড্ অধিপতি শত সংখ্যক অশ্বারোহী নাইট সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে আসিয়াছিলেন, তাহারা প্রত্যেকে অশ্ব হইতে নামিয়া বহু মূল্য আভরণ সমেত অশ্বগুলি অর্থীদিগকে দান করিয়া গেল। আর্চ্‌বিষপ্ এবেকেট যখন ফ্রান্সে যান, তাঁহার সঙ্গে বিচিত্র বসন ভূষিত এক দল ভৃত্য, দুই শত নাইট্, বহু সংখ্যক ব্যারণ ও আমীর-ওমরাও, ছিল, আড়াইশত বালক তাঁহার সম্মুখে জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিতেছিল, তদ্ভিন্ন গাড়ি ঘোড়া, প্রত্যেক ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক একটি বানর ও মানুষ, অনুচর, সহচর, পুরোহিত, বন্ধু বান্ধবের আর অন্ত নাই। এইরূপ সকল বিষয়েই ধুমধাম। হাঙ্গারীর অধিপতি তাঁহার বিরহ-

বিধুরা দুহিতাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতেছেন—

গাড়ি কোরে নিয়ে যাব শিকারে তোমায়,
সে গাড়িটি মুড়ে দেব লাল মকমলে ;
পদ্ম আঁকা সাটিন ও জরির চাঁদোয়া
ঝল মল করিবেক মাথার উপরে ;
পরিবি সোনার হার, সুনীল বসন ;
সাথে সাথে যাবে তোর স্পেনের ঘোটক,
মকমল দিয়ে তার পিঠ দিব ঢেকে ;
গান বাদ্য হবে কত বিবিধ আমোদ।
নানা মদ্য আনাইব নানা দেশ হোতে।*
পোড়া হরিণের মাস করিবি আহার,
যত ভীল মুর্গী পাই এনে দেব তোরে।
পাইবি কুকুর কত হরিণ হরিণী,
খেলা করিবিরে বাছা তাহাদের সাথে।
হরিণেরা এমনি মানিবে তোর পোষ,
ডাকিলেই আসিবেক মুঠির কাছেতে।
শিকারের শিঙ্গাধ্বনি করিলে শ্রবণ
মন হোতে রোগ তোর যাবে দূর হোয়ে।
অবশেষে বাড়ি ফিরে আসিবি যখন
নাচ গান কত হবে নাই তার ঠিক,
ছোট ছোট ছেলে মিলে কোকিলের স্বরে
গান শুনাইবে তোরে সে বড় মধুর।
অবশেষে আসিবেক সন্ধ্যার ভোজন ;
যাইবি হরিত কুঞ্জে তাঁবুটির নীচে,
চুনি হীরে কাজ করা বিচিত্র-বসন
মাটির উপরে পাতা, বসিবি সেথায় ;
একশো নাইট মিলি বাজাবে বাজন।
সরোবরে দেখিবি মাছেরা খেলিতেছে,
মন তোর তুষ্ট হবে দেখিলে সে খেলা।
রোয়েছে একটি সাঁকো সরসীর পরে,
আধেক পাথর তার আধেক কাঠের।
নৌকা এক আসিবেক চব্বিশটি দাঁড়
বাজিবে বাজনা কত ভিতরে তাহার,
চড়ি সে নৌকার পরে যাবি হেথা হোথা,
জ্বলিবে সাঁকোর পরে চল্লিশটি বাতি,
গৃহে তোর ফিরে যাবি চড়ি সে নৌকায়।
বিছানাটি হবে তোর হীরা মণি গাঁথা,
সে কোমল বিছানায় শুইবি যখন
সোনার প্রদীপাধারে জ্বলিবেক আলো।
তবু যদি ঘুম তোর নাহি হয় বাছা
গায়কেরা গাবে গান সারারাত জেগে।

অসভ্য, মদ্যপানরত, কোলাহলপর, অপরিষ্কার, শিল্পজ্ঞানশূন্য স্যাক্সনদের সাহিত্যে এরূপ কবিতা নাই ও থাকিতে পারে না। স্যাক্সনদের আমোদের সহিত নর্ম্মানদের আমোদের অনেক প্রভেদ। নর্ম্মানদের আমোদের মধ্যে বিলাসের ভাব

---

* এখানে এত প্রকার মদ্যের নাম লিখিত আছে যে, তাহা বাঙ্গালা পয়ারের মধ্যে দিলে ভাল শুনায় না—নিম্নে মূল উদ্ধৃত করিলাম—ইহার বানান আধুনিক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

Ye shall have Rumney and malespine
Both hippocras and varnage wine:
Montrese and wine of Greek,
Both Algrade and dispice eke,
Antioch and Bastarde,
Pyment also and garnarde,
Wine of greek and Muscadel,
Both clare, pyment and Rochelle,
The reed your stomach to defy
And pots of osey sit you by.

অধিকতর পরিস্ফুট। ব্রিটন অধিপতি ভর্টিজরণ্ যখন স্যাক্সন দলপতি হেঙ্গিষ্টের শিবিরে নিমন্ত্রিত হইয়া হেঙ্গিষ্টের পরম রূপবতী কন্যা রোয়েনকে দেখিলেন, একজন নর্ম্মান কবি তখনকার বর্ণনা করিতেছে—

হেঙ্গিষ্ট করিল চেষ্টা প্রাণপণ করি
রাজা ও নাইটগণ সুখী হয় যাতে।
আমোদে উন্মত্ত যবে হইল সকলে,
গৃহমধ্যে প্রবেশিলা রোয়েন সুন্দরী;
করে মদিরার পাত্র, সুচারুবসনা;
জানুপাতি বসিল সে রাজার সমুখে,
মদিরা করিল পান, চুম্বিলা রাজারে;
কেমন সুন্দর বপু, গৌর কান্তি তার,
কেমন সুন্দর ভূষা, নয়নরঞ্জন!
দেখিয়া উন্মত্ত হৈল নৃপতির মন,
মদ্যপানে ভ্রংশ-বুদ্ধি, মজিলা ভূপতি,
বিধর্ম্মী সে রমণীরে বিবাহের তরে।

স্যাক্সনদের কঠোর লেখনী হইতে এরূপ মৃদু বিলাসময়ী কবিতা বাহির হইতে পারিত না।

কুমারী মেরীই মধ্যযুগের দেবতা ছিলেন। মহিলাপূজার উৎকর্ষ তাঁহাতে গিয়াই পৌঁছিয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি খৃষ্টের জননী ছিলেন, দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মহিলাদের তিনিই পূর্ণ প্রতিমা স্বরূপ ছিলেন। তখনকার লোকের রমণী-ভক্তি হইতেই তাঁহার স্তব উত্থিত হইত। একটি মেরীর স্তব উদ্ধৃত করিতেছি—

দেবী; তব হোক জয়, স্বর্গীয় আনন্দময়,
স্বর্গের মধুর পুষ্প তুমি!
মৃদুতার তুমি জন্ম-ভূমি!
দেবী, তব হোক জয়, উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যময়!
সব মম আশা তোমা পরি,
কিবা দিবা কিবা বিভাবরী!
নক্ষত্রের রাণী তুমি উজ্জ্বল বরণ,
দেখাওগো পথ মোরে দাওগো কিরণ,
দেবি, এই বসুন্ধরা মিথ্যা কপটতা ভরা
তুমিই আমারে হেথা করগো চালন!

রমণী-ভক্তির চর্চ্চা করিয়া করিয়া সে ভাব লোকের মনে সত্য সত্যই এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, যে এরূপ স্তব হৃদয় হইতে না বাহির হইয়া থাকিতে পারে না।

সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের উপদেশ অংশ হইতে উদাহরণ স্বরূপ দুই একটা উদ্ধৃত করিতেছি। মৃত দেহের প্রতি দেহমুক্ত আত্মার উক্তি—

একদা শীতের রাত্রে আছিনু নিদ্রিত;
দেখিনু আশ্চর্য্য দৃশ্য; ভূমির উপরে
গর্ব্বিত ধনীর এক দেহ আছে-পড়ি।
দেহ ছাড়ি আত্মা তার আসিল বাহিরে
ফিরিয়া দেখিল চাহি মৃত দেহ পানে।
কহিল সে, "ধিক্ রক্ত মাংস কলুষিত!
হতভাগ্য দেহ, কেন এমন অসাড়,
আগে যে বড়ই ছিলি উন্মত্ত, অধীর!
অশ্বে চড়ি হেথা হোথা বেড়াতিস ছুটি;
ছিলি সুগঠন, যশ ছিল দেশব্যাপী!
কোথা গেল গর্ব্ব তোর স্বর্গ ভেদী স্বর?
কেন পড়ি ভূমিতলে, বস্ত্র আচ্ছাদিত?
কোথা তোর দুর্গ, তোর গৃহ সুসজ্জিত?"

ইত্যাদি—

ইত্যাদি—পুরাণো কথা লইয়া অনেক

বকাবকি করা হইয়াছে। আনক্রেণ রিউল নামক গদ্যগ্রন্থ হইতে কতকটা উপদেশ-দায়ক বিভীষিকা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহাতে পাঠকেরা সেমি-স্যাক্সন গদ্য রচনা ও তখনকার লোকের অজ্ঞান কুসংস্কারের ভাব কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

অলস ব্যক্তিরা ডেভিলের (devil) বুকে তাহার প্রিয় শিশুটির ন্যায় ঘুমাইতে থাকে, এবং ডেভিল তাহার কানে মুখ দিয়া কথা কয় ও তাহার মনের বাসনা ব্যক্ত করে। যাহারা কোন সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকে তাহাদের এইরূপ ঘটিয়া থাকে, ডেভিল ক্রমাগত কথা কহিতে থাকে, এবং অলস ব্যক্তি অতিশয় ভাল বাসার সহিত তাহার নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করে। অলস ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তিরা ডেভিলের বক্ষশায়ী bosom sleeper। ডুম্‌স্‌ডে দিবসে দেবদূতের ভেরীধ্বনিতে তাহারা সহসা চমকিত ও নরকের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিবে।

লোভী ব্যক্তি ডেভিলের ছাইকুড়ুনে Ash-gatherer,। সে ছাইয়ের উপর ক্রমাগত শুইয়া থাকে, ছাই রাশীকৃত করিতে মহা ব্যস্ত থাকে, ছাই রাশ করিয়া তাহাতে ফুঁ দিতে থাকে, ও ছাই উড়িয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া তুলে, ছাইয়েতে খোঁচা মারে, ও তাহার উপরে জমা খরচের আঁক পাড়িতে থাকে। এই মূর্খের ইহাতেই আমোদ, ডেভিল তাহার এই সমস্ত খেলা দেখিতে থাকে এবং হাসিতে হাসিতে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সহজেই বুঝিতে পারেন যে, সোনা রূপা ও অন্যান্য পার্থিব ধনসম্পত্তি ছাই আর ধূলার রাশি মাত্র, যে ব্যক্তি তাহাতে ফুঁদিতে যায় সেই অন্ধ হইয়া যায়, এই ছাই ভস্মের জন্য তাহাদের মনে শান্তি থাকে না, ইহাদেরি জন্য তাহারা গর্ব্বিত হইয়া পড়ে, যাহা কিছু সে রাশীকৃত ও সংগ্রহ করিতে থাকে এবং প্রয়োজনাতীত যাহা কিছু সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা ছাই ভিন্ন আর কিছুই নয়, নরকে গিয়া সে সমুদয় তাহার কাছে সাপ ও ব্যাং হইয়া দাঁড়ায়। ঈশায়া বলেন যে ব্যক্তি প্রার্থীদিগকে খাদ্য বস্ত্র না দেয় তাহার কাপড় চোপড় পোকার দ্বারা নির্ম্মিত হইবে।

লোভী পেটুক ডেভিলের খাদ্য যোগাইয়া থাকে এই জন্য তিনি সর্ব্বদাই রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘরে ঘুর্ ঘুর্ করিয়া বেড়ান। তাঁহার মন খাবার থালায়, তাঁহার সমুদয় চিন্তা টেবিলের চাদরে, তাঁহার প্রাণ হাঁড়িতে, তাঁহার আত্মা ঘড়ায় পড়িয়া থাকে। এক হাতে থালা, এক হাতে বাটি লইয়া কাদা-মাখা কালি-মাখা অবস্থায় সে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়। সে কতকি এলোমেলো বকিতে থাকে, মাতালের মত টলমল করিতে থাকে, আপনার ভুঁড়ির দিকে চাহিয়া থাকে, ও এই সকল দেখিয়া ডেভিলের এমন হাসি পায় যে তাহার পেট ফাটিয়া যায়। ঈশ্বর ঈশায়ার মুখ দিয়া এরূপ লোকদের এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন যে, "আমার ভৃত্যেরা আহার করিতে পাইবে, কিন্তু তোমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি

হইবে না।" তোমরা ডেভিলের খাদ্য স্বরূপ হইবে। "যে ব্যক্তি যত বিলাসে জীবন যাপন করিয়াছে তাহাকে তত যন্ত্রণা দেও।" "গলান তাঁবা তাহার গলায় ঢালিয়া দেও।" ইত্যাদি

নর্ম্মাণ ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের ভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সাহিত্য কেমন পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। যখন নর্ম্মাণগণ প্রথম ইংলণ্ড অধিকার করিল, যখন স্যাক্সন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ অধঃকৃত হইল ও নবাগত বিজয়ীগণ তাহাদের ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করিল, যখন স্যাক্সন ধর্ম্মাচার্য্যগণ ধর্ম্ম-মন্দির হইতে বহিষ্কৃত হইল ও নর্ম্মাণ পুরোহিতগণ বেদী অধিকার করিল, তখন স্যাক্সন সাহিত্যও ম্রিয়মাণ হইয়া ক্রমশঃ বিনষ্ট হইয়া গেল ও ফরাসী সাহিত্য তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইল। যে দুই একজন লেখক প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, নিম্ন শ্রেণী লোকদের পাঠের নিমিত্ত কাব্য রচনা করিয়াই তাহাদের আশা তৃপ্ত থাকিত, তাহাদেরো আদর্শ ফরাসী; ফরাসী পুস্তক হইতে অনুবাদ করাই তাহাদের একমাত্র গতি। কবি লেয়ামন Laymon একটি ল্যাটিন কাব্যের ফরাসী অনুবাদ হইতে এক কাব্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহার ভাষা বিকৃত ও তাহার ছন্দ রচনায় কোথাও প্রাচীন প্রথানুযায়ী যমক-পদ্ধতি, কোথাও বা ফরাসী-আদর্শ-অনুযায়ী মিলের নিয়ম। লেয়ামনের ভাষা বিকৃত স্যাক্সন বটে কিন্তু তাহাতে ফরাসী প্রবেশ করে নাই, অনভ্যাস ও অপ্রচলিত থাকা প্রযুক্ত তখন স্যাক্সন অনেক পরিমাণে বিকৃত হইয়াছিল কিন্তু তখনো ফরাসী এমন চলিত হইয়া যায় নাই যে স্যাক্সনের মধ্যে স্থান পাইতে পারে। নর্ম্মাণদের যখন নূতন প্রভুত্ব, তখন স্যাক্সন সাহিত্যের এই দশা। যখন নর্ম্মাণেরা কিছু দিন ইংলণ্ডে বাস করিল, যখন নর্ম্মাণ ও স্যাক্সনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত হইল, যখন স্যাক্সন ভাষার সংস্পর্শে নর্ম্মাণ ফরাসী বিকৃত হইয়া গেল, ও সাধারণ অনক্ষর নর্ম্মাণগণ বিশুদ্ধ ফরাসী অনেক পরিমাণে ভুলিয়া গেল, শুদ্ধ তাহাই নহে, হয়ত স্যাক্সনদের সহবাসে স্যাক্সনই তাহাদের ভাষা হইল, তখন স্যাক্সন ও ফরাসী মিশিয়া একটা ভাষা জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সেই ভাষায় যে কিছু পুস্তক রচিত হইত, তাহার ভাব ফরাসী, তাহার রচনা-প্রণালী ফরাসী, শুদ্ধ তাহাই নহে, তাহা ফরাসী পুস্তকের অনুবাদ ও অনুকরণ! অবশেষে যখন স্যাক্সন ও নর্ম্মান জাতিদ্বয় সম্পূর্ণ রূপে বা অনেক পরিমাণে মিশিয়াগেল, যখন জেতা ও জিত জাতির মধ্যে বিভিন্নতা রহিল না, তখন দেশে নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইল। তখন সকলের ভাষাই অনেক পরিমাণে সমান হইল, তখনকার সাহিত্য সাধারণের সম্পত্তি হইল; তখন শ্রেণীবিশেষের জন্যই গ্রন্থ রচিত হইত না। তখন জাতির চক্ষুর সম্মুখ হইতে ফরাসী আদর্শ অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইল, লেখকেরা নিজের বুদ্ধি হইতে ও

নিজের হৃদয় হইতে অনেক পরিমাণে লিখিতে লাগিল। এমন কি একদল লেখক প্রাচীন আঙ্গ্লো সাক্সন আদর্শে লিখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কবি ল্যাংল্যাণ্ড Langland পিয়ার্সপ্লৌম্যান Piers Plough-man নামে এক কাব্য লিখিলেন, তাহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কবি প্রাচীন সাক্সন-প্রণালী অনুযায়ী যমক-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। নূতন জাতীয় ভাবের সঞ্চার হইলে লোকের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি টান পড়ে। পিয়ার্স্ প্লৌম্যান লেখক প্রাচীন আঙ্গ্লো সাক্সন রচনা-প্রণালীর অনুকরণ করিতে লাগিলেন ও একদল লেখক উত্থিত হইল, তাহারা পিয়ার্স প্লৌ-ম্যান লেখকের অনুকরণ করিতে লাগিল। কিন্তু ফরাসী অনুকরণে কাব্যরচনার মিল ও ছন্দের নিয়ম তখনকার সাহিত্যে এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মধ্য হইতে বিজাতীয়ত্ব দূর হইয়া গিয়া তাহাই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমন অবস্থায় কিছু হঠিয়া অগত্যা আঙ্গ্লো-সাক্সন রীতির অনুসরণ করিতে যাওয়া অনর্থক। ল্যাংল্যাণ্ডের অনুবর্ত্তী একদল উত্থিত হইল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না, প্রচলিত রীতি যদিও বিদে-শীয় আদর্শ হইতে গৃহীত হইয়াছিল তথাপি তাহারি জয় হইল। ল্যাংল্যাণ্ডের কাব্য হইতে উদাহরণ স্বরূপ দুই এক শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

Hire robe was ful riche,
Of rud scarlit engrenyned,
With ribanes of rud gold
And of riche stones

ইহাতে ছন্দ নাই, মিল নাই, কেবল robi, riche, rud, ribans প্রভৃতি কথায় R অক্ষরের যমক আছে মাত্র।

ইয়ুরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে ইং-লণ্ড দ্বীপের একটা বিশেষ উপকার হই-য়াছিল। যখন রোমে পোপের আসন অধিকারের জন্য বিবাদ বিদ্বেষ চলিতেছিল, যখন পোপেরা অধর্ম্মাচরণে রত ছিল, তখন ইংলণ্ড অমিশ্রভাবে থাকিয়া দূর হইতে অপক্ষপাতের সহিত বিচার করিতে পারিত, পোপের নর-দেবত্ব ভাব তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় নাই। রোমীয় চর্চ্চের চরণে তাহাদের রাশি রাশি মুদ্রা ঢালিতে হইত, তাহাতে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণের অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা থাকায় তাহারা কুধর্ম্মাচরণে দারুণ রত ছিল, এই সকল কারণে তখন-কার চর্চ্চের প্রতি ইংরাজদের অভক্তি জন্মিয়াছিল, এবং সাধারণ লোকের মুখ-পাত্র হইয়া ল্যাংল্যাণ্ড তাঁহার পিয়ার্স প্লৌম্যান কাব্যে তখনকার চর্চ্চ, ধর্ম্মা-চার্য্য ও তখনকার নানা প্রকার কুনীতির প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা উইক্লিফ্ ইহার পরে যে ধর্ম্ম-সংস্কার করেন, রোমীয় চর্চ্চের শৃঙ্খল হইতে ইংলণ্ডকে মুক্ত করেন, এই প্রকার কবিতা তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিল। এই প্রকার কবিতা যখন লিখিত হইয়াছিল তখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, তখনকার

লোকের মনের ভাব এইরূপ ছিল, ল্যাংল্যাণ্ড তাহাই কেবল লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই কারণেই এই কাব্য তখন এমন সমাদৃত হইয়াছিল।

পিয়ার্স প্লোম্যান্ কাব্যই সেমি-স্যাক্সন সাহিত্যের শেষ সীমাচিহ্ন স্বরূপ করা গেল। তাহার পরেই গাউয়ার Gower ও চসারের Chaucer কাল। তখন হইতে প্রকৃত পক্ষে ইংরাজি সাহিত্য আরম্ভ হইল। এতকাল ইংরাজি ভাষা নির্ম্মিত হইতেছিল এতক্ষণে তাহা এক প্রকার সমাপ্ত হইল।

সাহিত্যপ্রিয় ব্যক্তিরা সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া বড় আমোদ পাইবেন না। অনুবাদ অনুকরণ ভাবহীন কথার স্রোতেই এই সাহিত্যক্ষেত্র পূর্ণ। তবে ভাষা-তত্ত্ব-প্রিয় ব্যক্তি ইহা চর্চ্চা করিলে তাঁহাদের পরিশ্রমের অনেক পুরস্কার পাইবেন। সেমি-স্যাক্সন সাহিত্য প্রকৃত পক্ষে একটা বিশেষ সাহিত্য নহে, তাহা ইংরাজি সাহিত্যের সূত্রপাত মাত্র। তখন ব্যাকরণ বানান ও ভাষার কিছুই স্থিরতা ছিল না, একটি পুস্তকেই এক কথার নানা প্রকার বানান আছে, তাহাতে অর্থ বুঝিবার বড় গোল পড়ে। একটা স্থির আদর্শ না থাকাতে সকলেই নিজের ব্যাকরণে, নিজের বানানে, নিজের ভাষায় পুস্তক লিখিত। নর্ম্মাণ ও স্যাক্সন জাতিদ্বয়ের অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তখনকার ভাষা ও সাহিত্য কেমন পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অবশেষে কত প্রকার ঘাত সংঘাতে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্ম্মিত হইল। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণেরা ইংলণ্ডে প্রবেশ করে, তখন হইতে যদি ইংরাজি সাহিত্যের নির্ম্মাণ-কালের আরম্ভ ধরা যায়, ও ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে চসার জন্মগ্রহণ করেন, তখন যদি তাহার শেষ ধরা যায় তবে ইংরাজি সাহিত্য ও ভাষা নির্ম্মিত হইতে প্রায় তিন শত বৎসর লাগিয়াছে বলিতে হইবে।

ছিন্নমুকুল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ—দোষী নির্দ্দোষ।

সেই মূর্চ্ছার পর হইতে সুশীলার জ্বর আরম্ভ হইল। বাল্যকাল হইতে শোক পাইয়া পাইয়া সুশীলার শরীরে আর কিছুই ছিল না, তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, তিনি এক প্রকার চিররুগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। কিন্তু তিনি মরিলে প্রমোদ ও কনককে দেখিবার কেহই নাই ভাবিয়া তিনি এতদিন অতি যত্নে কেবল জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু সেই শরীরের উপর আর তাঁহার আধিপত্য চলিল না, এবার তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক হইল।

কনকের সর্ব্বনাশ হইল, তাহার আহার নিদ্রা প্রায় রহিত হইল। সারাদিন কনক তাঁহার সেবা করে, পীড়ার কষ্টের উপর মনের কষ্ট ব্যতীত কনকের যত্নে তাঁহার আর কিছুই কষ্ট নাই। তাহার যত্ন দেখিয়া সুশীলা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবেন "কনক চোর—কনক মিথ্যাবাদী, ঈশ্বরে কনকের মন নাই, তবে কনক দেবীর ন্যায় যত্ন শিখিল কোথায়? এরূপ ভালবাসা, এরূপ যত্ন করা তো অমানুষিক গুণ—" এই সকল ভাবিতে ভাবিতে যখন কনকের সেই বিষাদময় নির্দ্দোষ দেবী-প্রতিমার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িত, তিনি মুগ্ধ হইয়া তাহার পানেই চাহিয়া থাকিতেন, তাহার সেই অলুলায়িত কুন্তলজালে বেষ্টিত সরলতাময় বিষণ্ণ মুখকান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। মনে মনে অমনি ভাবিতেন "কি ভয়ানক! এই দেবীমূর্ত্তির প্রশান্ত অমায়িকতা দেখিলে ইহার ভিতরে যে দোষ থাকিতে পারে তাহা কে বিশ্বাস করিবে? ইহাতে যদি দোষ থাকে তবে বুঝি পৃথিবীতে কিছুই নির্দ্দোষ নাই, তবে বুঝি পৃথিবীতে কাহাকেও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।' এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে সুশীলার চক্ষু হইতে কষ্ট-নিঃসৃত অশ্রু পড়িয়া বালিস ভিজিয়া যাইত। বালিকা কনক যথার্থ কারণ বুঝিতে না পারিয়া পীড়ার কষ্টে অশ্রুজল পড়িতেছে ভাবিয়া ব্যাকুল-চিত্তে কিসে সুশীলার কষ্ট নিবারণ করিবে খুঁজিয়া পাইত না।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। প্রমোদকে কনক পীড়ার কথা টেলিগ্রামে সংবাদ দিল। যামিনীনাথের সহিত একত্রে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাড়ী আসিয়াই প্রমোদ সুশীলার নিকট যাইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া সুশীলা আহ্লাদিত হইয়া একথা সেকথা কহিয়া কিছুপরে বলিলেন "তুমি আসিয়াছ ভালই হইয়াছে, মরিবার আগে তোমাকে কতকগুলি কথা বলিব।' কনক ঐ সময় সে গৃহে ছিল না, কোন কার্য্য বশতঃ সে কিছু পূর্ব্বেই অন্য গৃহে গিয়াছিল। সুশীলার কথায় প্রমোদ সজল নেত্রে বলিলেন "ওকি কথা—আপনি মরিবেন কেন?'

সু। "না, আমি এবার বাঁচিব না, আমার দিন ফুরাইয়াছে। আমাকে সকলে ডাকিতেছেন, সে দিন রাত্রে দিদিকে যেন দেখিলাম মনে হইল, তার পর—তার পর স্পষ্টরূপে—যেন"—বলিতে বলিতে তাঁহার কথা বাধিয়া গেল, সেই রাত্রের ঘটনা মনে করিয়া সুশীলা শিহরিয়া উঠিলেন, সেই যেন অন্ধকারময় ঘোর মেঘ-বৃষ্টির মধ্যে সহসা বিদ্যুতালোক হইল, তিনি আবার যেন তাহার মধ্যে সেই সে দিনকার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ভয়ে শিহরিয়া সুশীলা বলিয়া উঠিলেন, "ঐ দেখ আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি" বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহার ভয় দূর হইতে লাগিল—আনন্দচিহ্ন তাঁহার মুখে বিভাসিত হইল, তিনি আপন মনে অপরিস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিলেন "এতদিন পরে আমাকে কি মনে পড়িল? আজ—আজ তুমি আমায় দেখা দিলে? আজ—অন্তিম

কালে—" সুশীলার কথায় প্রমোদ ভীত হইয়া বলিলেন "মা কি বলিতেছেন?" অমনি সুশীলার চমক ভাঙ্গিল—কোথায় সে মূর্ত্তি—বিকারের অসম্বদ্ধ প্রলাপে শূন্যে চাহিয়া তিনি বকিতে ছিলেন। সুশীলা বলিলেন "একি-কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—যাহা কখন আর এ অদৃষ্টে ঘটিবে না, সে আশা কেমন করে হইতে ছিল জানি না। তা যাই হোক প্রমোদ একটি কথা তোকে বলিবার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছি।"

প্র। "কি বলুন।"

সু। "আমি তো মরিতে বসিয়াছি, কনককে দেখিস্, উহার স্বভাব আজ কাল তেমন নাই, উহার স্বভাবটা তুই শোধরাইয়া দিস্—সে আমার মনে বড় আঘাত দিয়াছে" বলিয়া কনক কি কি গুরুতর দোষ করিয়াছে তাহা সবিশেষ প্রকাশ পূর্ব্বক সুশীলা দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে মনের কষ্টে বলিয়া উঠিলেন, "কনকের মন্দ স্বভাব প্রকাশ পাইবার আগে সে মরিল না কেন? প্রমোদ, কনকের স্বভাব ভাল করিতে চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়।"

সমস্ত শুনিয়া প্রমোদের হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, অনুতাপ ও কৃতজ্ঞতায় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। প্রমোদ দেখিলেন কনক তাঁহার জন্য বিস্তর সহ্য করিয়াছে, কনক তাঁহার জন্য অনেক কষ্ট অবিচলিতভাবে সহ্য করিয়াছে, প্রমোদ তখন সজল নেত্রে মুক্তকণ্ঠে আপনার দোষ সুশীলার নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রমোদই সুশীলার যত্নের বই গুলি ছড়াইয়াছিলেন, প্রমোদের জন্যই কনকের টাকার আবশ্যক হইয়াছিল, প্রমোদই সে কথা বিশেষরূপে গোপন রাখিতে বলায় বালিকা সে কথা কাহাকেও বলে নাই—প্রমোদ আপনার এই সমস্ত দোষ খুলিয়া বলিলেন।

তখন কনক নির্দ্দোষ জানিয়া সুশীলার আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার বক্ষ হইতে যেন একটি গুরুভার নামিয়া গেল। মৃত্যুকালে কনককে নির্দ্দোষ জানিয়া মরিতে পারিবেন—ইহাতে তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ সম্পূর্ণ দূর হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ—

দেব কি মানব।

এদিকে যামিনীনাথ দুই এক দিনের জন্য এখানে আসিয়া কনকের রূপ লাবণ্যে মোহিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে আর নীরজা স্থান পাইল না। নীরজাকে ছাড়িয়া তাঁহার এখন কনকের দিকে চক্ষু পড়িল। নীরজা বনফুল, যেখানে অন্য ফুল মেলে না সেইখানে নীরজার আদর। নীরজা অরণ্যে একাকী ফুটিয়া তাহা শোভিত করে, কিন্তু কনক বিকসিত গোলাপ, সকল স্থানে সকল সময় তাহার সমান আদর। রাশি রাশি বিকসিত পুষ্প সমাকুল কাননের মধ্যে গোলাপ পরম আরাধ্য, গোলাপ কুসুমরাণী। সেই গোলাপটি দেখিয়া তিনি যে বনবালা নীরজাকে ভুলিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ যত দিন নীরজাকে পাইবার আশা ছিল না—তত দিন

তাঁহার লালসা অত্যন্ত প্রবল ছিল, কিন্তু তাহাকে পাইবেন জানিয়া তাঁহার নিকট নীরজার মর্য্যাদা অনেক কমিয়া আসিয়াছিল। এইরূপ মনের অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী অন্য একটী রমণীকে দেখিয়া যামিনীর মনে নীরজা স্থান পাইবে আর কি রূপে? নীরজা মর্ত্তজাত কুসুম—কনক স্বর্গের পারিজাত, সুতরাং যামিনী কনকের রূপে মুগ্ধ হইলেন।

নীরজাতে আর এখন তাঁহার মন নাই, এখন আর বিবাহের নিমিত্ত কানপুরে যাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। দুদিনের জন্য এখানে আসিয়া ৫।৬ দিন হইয়া গেল, তবু যামিনী কানপুর যাইবার নামও করিলেন না। যামিনীর এখন একমাত্র চিন্তা—কি উপায়ে তিনি কনককে লাভ করিবেন। যামিনী মনে মনে জানিতেন প্রমোদ নীরজাতে অনুরক্ত, ভাবিলেন যদি তিনি নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে পারেন, তো প্রমোদ অনায়াসে তাহাকে ভগিনী সমর্পণ করিবেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া একদিন কথায় কথায় প্রমোদকে বলিলেন "প্রমোদ, দুদিনের জন্য আসিয়া—চার পাঁচ দিন কাটিয়া গেল—শীঘ্র যাইতে হইবে কিন্তু—"যামিনী এইখানে থামিলেন—বোধ হইল যেন কি একটি বিশেষ কথা চাপিয়া গেলেন। প্রমোদ তাহা বুঝিয়া সেই কথাটি শুনিবার নিমিত্ত বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "দেখ, ক দিন হইতেই তোমাকে একটি কথা বলিব ভাবিতেছি কিন্তু কে জানে কেন বলিতে গেলেই বাধিয়া যায়" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন "কি না জানি কথা যে বলিতে বাধিয়া যায়।" প্রমোদের হাসিতে যামিনী একটুও হাসিলেন না—অতি গম্ভীর স্বরে বলিলেন "না, তোমার কাছে আর লুকাইব না—যা বলিবার আছে বলি শুন। প্রমোদ, সন্ন্যাসী নীরজার সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্য কানপুরে ডাকিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই, তাই সেখানে শীঘ্র যাইতে পারিতেছি না।' প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "তাহাকে বিবাহ করিতে তোমার ইচ্ছা নাই?"

যা। "না তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই" এই কথায় প্রমোদ নিস্তব্ধভাবে বিস্ময় বিস্ফারিত চক্ষে যামিনীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, যামিনী কাতর স্বরে আবার বলিলেন "প্রমোদ, তাহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই ইহা সত্যই বিস্ময়ের কথা—কিন্তু তুমি বিস্মিত হইও না—প্রমোদ, ইহারও কারণ আছে।"

প্রমোদ তখন আস্তে আস্তে বলিলেন, ইহারও কারণ আছে! নীরজাকে কেহ কি ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে?"

যা। "তাহা ঠিক, প্রমোদ, তুমি ভাবিও না, তাহাকে আমি ভাল বাসি না বলিয়া তাহার সহিত আমার বিবাহে অনিচ্ছা। আমি তাহাকে জীবন অপেক্ষাও ভালবাসি। কিন্তু আমি তাহার অযোগ্য, আমি তাহাকে বিবাহ করিব না।'

প্র। "তুমি নীরজার অযোগ্য? তবে যে যোগ্য কে আমি তো তাহা বলিতে পারি না।'

যা। "লোকে যাহাই বলুক, আমি বাস্তবিকই তাহার অযোগ্য—নীরজা আমাকে ভাল বাসে না" এই কথায় প্রমোদ তাহার বিবাহের অনিচ্ছার কারণ বুঝিলেন, তাহার সেই বিষাদার্দ্র স্বরে তাহার হৃদয়ের গভীর যাতনাও অনুভব করিতে পারিলেন। সকল বুঝিয়া তিনি মর্ম্মপীড়িত হইয়া নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। যামিনী কিছু পরে আবার বলিলেন "প্রমোদ, তোমাকে বলিব? নীরজা কাহার প্রতি অনুরক্ত শুনিবে? নীরজা তোমাকেই ভালবাসে।"

বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু এই কথা শুনিয়া বন্ধুর গভীর দুঃখের মধ্যেও প্রমোদের হৃদয় সহসা যেন আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কিন্তু আবার তখনি আপনাকেই যামিনীর কষ্টের কারণ ভাবিয়া আপনা হইতে সে উচ্ছ্বাস থামিয়া আসিল। যামিনী বলিলেন "ভাই আমি কি কিছু বুঝি না? তুমিও যে মনে মনে নীরজাকে ভালবাস তাহা আমি বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি শুন—আমি তোমাদের পথের কণ্টক হইব না। আমি নিজে উদ্যোগী হইয়া তোমাদের বিবাহ দিয়া দিব এই আমার সঙ্কল্প।"

যামিনীর নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া প্রমোদ বিস্ময়-উৎফুল্ল ভাবে চাহিয়া রহিলেন। যামিনী দেব কি মানব তাহা প্রমোদ ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—কিন্তু তিনি বলিলেন "আমিও তোমার মত বন্ধুর নিকট কিছু লুকাইব না—বাস্তবিকই আমি যে দিন হইতে নীরজাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতে তাহাকে ভাল বাসিয়াছি। সে ছবি এখন পর্য্যন্তও হৃদয় হইতে উঠাইতে পারিলাম না। কিন্তু যাহা বলি বিশ্বাস করিও। তাহাকে আমি যতই ভাল বাসি না কেন, নীরজাকে না পাইলে যতই কষ্ট পাইনা কেন কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করিয়া তাহাকে পাইতে ইচ্ছা আমি কখনই করিব না—সে লাভে আমি কখনই সুখী হইব না" যামিনী বলিলেন "তাহা ভাবিতেছ কেন? তুমি বিবাহ না করিলেও কিছু আমি তাহাকে বিবাহ করিব না। নীরজা আমাকে ভাল বাসে না জানিয়া আমি তাহা কি প্রকারে করিব। বরং তোমাদের উভয়ে বিবাহ হইলে নীরজা সুখী হইয়াছে জানিয়া আমিও সুখী হইতে পারিব।" প্রমোদ যামিনীর কথা বুঝিলেন, বুঝিলেন যামিনীর মত অবস্থায় পড়িলে তিনিও ঠিক ঐ রূপ করিতেন। আপন ইচ্ছানুসারে অতি সহজেই তাহার কথা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু তথাপি যামিনীকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তিনি অনেক বুঝাইলেন—কিন্তু যামিনী কিছুতেই না বুঝিয়া বলিলেন "তুমি ভাবিতেছ আমি এখন যাহাই বলি না কেন—বিবাহ না হইলে পরে নিশ্চয়ই অসুখী হইব—কিন্তু আমাকে তুমি বিশেষ রূপে জানিলে কখনই ওরূপ হীন মনে করিতে না। আমি যে কালে এ বিবাহের প্রস্তাব নিজেই করিতেছি, তুমি ভাবিওনা ইহাতে আমার একটুও অসুখ হইবে। তোমাদের বিবাহে আমি সুখীই হইব, যদি অসম্মত হও

তাহা হইলে বরং অত্যন্ত কষ্ট হইবে" প্রমোদ কিছু উত্তর না দিয়া আপন মনেই ভাবিতে লাগিলেন, নানা ভাবনায় তাঁহার মন তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তিনি যামিনীর কথায় কিছুই উত্তর করিলেন না। যামিনী মৌন ভাবই সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "আজই আমি তবে কানপুরে চলিলাম, সন্ন্যাসীকে বলিয়া তোমার সহিত নীরজার বিবাহ নির্দ্ধারণ করিব।"

অনেক কথাবার্ত্তার পর যামিনী সেই দিনই কানপুর যাত্রা করিলেন। প্রমোদ সমস্ত দিন আহ্লাদে বিষাদে অভিভূত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। নীরজা তাঁহার হইবে। এই তাঁহার আহ্লাদ, যাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যাহা আশার অতীত সেই বিষয়ে আশার সঞ্চারই তাঁহার আহ্লাদ। আবার বিষাদ এই, তাঁহার পরম বন্ধু যামিনীকে তাঁহার জন্যই নিরাশ হইতে হইল।

যামিনী বাবুর নিঃস্বার্থ ভাব দেখিয়া প্রমোদ অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। সমস্ত দিন মনে মনে তাঁহার অতুল গুণরাশির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, প্রমোদ ভাবিলেন যামিনীর মত দ্বিতীয় লোক আর সংসারে নাই।

কাতন্ত্র-জীবনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

(কাতন্ত্রের অতিরিক্ত গ্রন্থকারগণ।)

শ্রীপতি দত্ত (কাতন্ত্র পরিশিষ্ট প্রণেতা)

শ্রীপতিদত্ত কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট প্রণয়ন করেন। ইঁহারও ব্যাকরণ শাস্ত্রে অগাধ বিদ্যা ছিল। কাতন্ত্রে যে সকল বিষয়ে অভাব রহিয়া গিয়াছে শ্রীপতি নানা গ্রন্থ হইতে সেই সকল সংকলন করিয়া পরিশিষ্টে যোজনা করিয়াছেন; কেবল তাহাই নহে। অধুনাতন সাহিত্যকর্ত্তাগণ যে সকল নূতন নিয়মাদি প্রয়োগ করিয়াছেন শ্রীপতি তাহা হইতে নূতন বৈয়াকরণিক নিয়মাদি সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় ইনি গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই;—কেবল সন্ধি ও চতুষ্টয়ের (তদ্ধিত ব্যতীত) পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। বোধ হয় অকালে কালকবলিত হওয়াই—ইহার এক মাত্র কারণ। গোপীনাথ প্রভৃতির মতে শ্রীপতি দুর্গসিংহ অপেক্ষাও ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবীণ ছিলেন; একথা আমরা একটুকুও স্বীকার করিতে পারি না, কেন না শ্রীপতি

দত্তের "কাতন্ত্র পরিশিষ্টে" যে সকল অতিরিক্ত বিষয় আছে—উহা প্রায়ই দুর্গসিংহের অতিরিক্ত সূত্র ও বক্তব্যের চর্ব্বিত চর্ব্বণ মাত্র। তবে শ্রীপতি যে কোন নূতন বিষয় যোজনা করেন নাই—তাহাও আমরা বলি না; নাম ধাতু,লিঙ্গ,স্ত্রী প্রত্যয় প্রভৃতি সম্বন্ধে শ্রীপতি অনেক কথা বলিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীপতির সূত্রচয় অপেক্ষাকৃত প্রণালীক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীপতির এতগুলি গুণ থাকিলেও তাঁহাকে দুর্গসিংহ অপেক্ষা ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রবীণ বলা যাইতে পারে না। কেননা দুর্গসিংহই অতিরিক্ত সূত্র গুলির সৃষ্টিকর্ত্তা—তিনিই নানা শাস্ত্র মন্থন করিয়া ব্যাকরণ অমৃত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলিতে গেলে শ্রীপতি সেই সূত্রগুলিই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন। একজনে একটি বিষয় আবিষ্কার করিয়া গেলে পরে একজন সামান্য লোকও তাহার কিছু উন্নতি করিতে পারে কিন্তু তাই বলিয়াই আবিষ্কারকের শতাংশের একাংশও যশ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা ঘটিকা, তাড়িত বার্ত্তাবহ প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পরকীয় লোক আবিষ্কারকগণ অপেক্ষা এখন ঐ সকল যন্ত্রাদির কত উন্নতি করিতেছেন কিন্তু ইহাঁদের নাম তো কেহই মুখে আনে না অথচ সৃষ্টিকর্ত্তাগণ প্রতিমুহূর্ত্তে কোটি কোটি লোকের মুখে উচ্চরিত হইতেছেন। সুতরাং দুর্গসিংহের নিকট শ্রীপতির এক টুকুও তুলনা হইতে পারে না। গোপীনাথ যে দুর্গসিংহকে নিন্দা করিয়া শ্রীপতির প্রশংসা করিয়াছেন—তাহার মূল কারণ এই যে গোপীনাথ শ্রীপতির পরিশিষ্টের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শ্রীপতিকে সম্মানিত করিতে পারিলে তাহার কৃত গ্রন্থেরও সমাদর বৃদ্ধি হয় অথচ দুর্গসিংহের প্রশংসা করিলে তাহার টীকার সম্মান রক্ষা পায় না। গোপীনাথ এক জন কৃতবিদ্য হইয়া যেন এইরূপ পাপে কলুষিত হইলেন, বুঝা যায়। কিন্তু গোপীনাথের এই গর্হিত কাজের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিদ্যাসাগর নামক টীকাকার তাহাকে স্থানে স্থানে আচ্ছা জব্দ করিয়াছেন। এবং তিনি যে শ্রীপতিকে একেবারে স্বর্গে তুলিয়াছেন, বিদ্যাসাগর সেই শ্রীপতির চর্ব্বিত-চর্ব্বণ বাক্যগুলির 'শ্রীপতি-প্রলাপ' নাম রাখিয়াছেন। বিদ্যাসাগর প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীপতিকে উপহাস করিয়াছেন। শ্রীপতির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার কোনো উপায় নাই। ইনি অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব ছিলেন ২৫। ইহাঁর অনেক শাস্ত্রে বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ছিল। ইহাঁর সময় নিরূপণ করিবারও কোন ভাল প্রমাণ পাওয়া গেল না, তবে ইনি হর্ষবিক্রম ও লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের প্রায় সন্ধিস্থলে বর্ত্তমান ছিলেন। বোধ হয় শ্রীপতি খৃষ্টীয় ৯ ম শতাব্দির লোক।

গোপীনাথ।

গোপীনাথ কাতন্ত্র পরিশিষ্টের পরি-

২৫ ইতি বৈদ্যমহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীপতিদত্তবিরচিত "কাতন্ত্র পরিশিষ্ট ইত্যাদি (শ্রীপতি)।

শিষ্ট-প্রবোধ নামক টীকা প্রণয়ন করেন। গোপীনাথ পশুপতির পুত্র ছিলেন এবং তর্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ২৬। কাতন্ত্রবাবসায়ীগণ বলিয়া থাকেন গোপীনাথের ন্যায় পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ সমধর রাখিয়া প্রশ্ন কোন টীকাকারই টীকা প্রণয়ন করিতে পারেন নাই।" বাস্তবিক গোপীনাথ একজন কৃতবিদ্য লোক ছিলেন। ইনি লক্ষ্মণ সেনের পরে ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতির পূর্ব্বে প্রায় খৃঃ চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি একজন পরনিন্দক ছিলেন।

গোপীনাথ-প্রণীত টীকার প্রথম শ্লোকে তাঁহার এই রূপ পরিচয় আছে যিনি (গোপীনাথ) চন্দ্ররশ্মিতে কুমুদশ্রেণীর ন্যায় শ্রীবিশিষ্ট, অপাপমানস, আচার্য্য-শ্রেষ্ঠ শ্রীমান পশুপতি হইতে জন্ম গ্রহণ করেন, যিনি ধরণীধরেন্দ্র হিমাদ্রির তনয়া উমার পতির সমুজ্জ্বল চরণে আশক্তাত্মা ছিলেন, যিনি কীর্ত্তিরূপী লক্ষ্মীতে জয়শীল, দানালী স্বরূপ তরবারি দ্বারা শাসিতা ধরার দীনশ্রেণীর দীনতা রূপ অরির পরস্ত, সুরিসভা এবং সমাজে বিজয়ী, কামাভিরামাকৃতি, সত্যের উৎসেক বশীকরণ জন্য ঈশ্বরে মতিযুক্ত এবং যিনি শ্রীমতী যোজনা দেবীর সন্তান ছিলেন (তাঁহার মাতার নাম যোজনা) সেই মধুর বাহার বাগীশ্বর তর্কাচার্য্যবর, সদর্থচতুর, সুবিদ্বান শ্রীযুক্ত গোপীনাথ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন"। তথাহি——

গো জাহ্নবীধরণীধরেন্দ্র-
তনয়ানাথস্যি পাথোরুহা-
শক্তাত্মাহনঘমানসাৎ
পশুপতেরাচার্য্যসিংহাৎ সতঃ
কীর্ত্তি শ্রীজিতপীত রশ্মি-
কুমুদশ্রেণীশ্রিয়ঃ শ্রীমতো
দানালীতরধারিধারিত-
ধরাদীনালীদৈন্যারিতঃ ॥ ১
সোয়ং সূরিসভাসভাজিত-
মতিঃ কামাভিরামাকৃতিঃ,
সত্যোৎসেকবশীকৃতেশ্বর
মতিঃ শ্রীযোজনাসন্ততিঃ।
গোপীনাথ ইমঞ্চকার
মধুর ব্যাহার বাগীশ্বর
তর্কাচার্য্যবরঃ সুদর্থ চতুরঃ
সশ্রীকবিদ্যাধরঃ ॥ ২

এই শ্লোক দুইটী ব্যতীত গোপীনাথের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বোধ হয় ঐ শ্লোক দুটী গোপীনাথের নিজকৃত নহে, পরে কেহ তাঁহার গ্রন্থে বিনিবেশিত করিয়া দিয়াছে, কেননা তিনি তাঁহার আপনাকে আপনি এত প্রশংসা করিতে পারিতেন না এবং "ইমঞ্চকার" এরূপও বলিতেন না।

হলায়ুধ।

লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ (খৃঃ ১১০১—১১৭১) কাতন্ত্রসম্মত পণের কবিরহস্য

২৬ শ্রীমদাচার্য্য পশুপতিতনুজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদগোপীনাথ বিরচিতে "পরিশিষ্ট-প্রবোধ" ইত্যাদি (গোপীনাথ)

নামক টীকা করেন। ইনি দক্ষের সন্তান ও চন্দ্রবংশ সম্ভূত ২৭। হলায়ুধ নিজ পরিচয় স্থলে লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে কৈশোরাবস্থায় সভাপণ্ডিত পদে যৌবন অবস্থায় মন্ত্রীপদে এবং বার্দ্ধক্যে ধর্ম্মাধিকার-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন ২৮। হলায়ুধ প্রভৃতি বল্লালের নিকট তরুণ বয়সেই কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, হলায়ুধ তাঁহার যৌবনে অর্থাৎ কৌলীন্য প্রাপ্তির ২৩ বৎসর পরেই লক্ষ্মণের সভা পণ্ডিত হয়েন। হলায়ুধ প্রভৃতির শেষাবস্থায় কৌলীন্যসমীকরণ কালে তাঁহারা লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক প্রপূজিত হইয়া ছিলেন। লক্ষ্মণের সভায় যে সকল সভাপণ্ডিত বিরাজ করিতেন তন্মধ্যে গোবর্দ্ধনাচার্য্য ২৯ ও হলায়ুধ কুলীনের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া কথিত আছে ৩০।

---

২৭ সম্বন্ধ নির্ণয় ১৬২ পৃষ্ঠা।

২৮ বভূব তস্যাং প্রকৃতের্ম্মহানিব
শ্রিয়ো নিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎ কীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচিদণ্ড
দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি। ১
লব্ধং তস্য ধনঞ্জয়াদ্ভগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষ্মাপতে
রাকৃত্যা লঘুতা নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
শব্দব্রহ্মকরোদরামলকবদ্ভোগোত্তরা সৎক্রিয়ে।
অস্তি প্রাথয়িতব্যমস্য কৃতিনঃ কিঞ্চিন্ন সাংসিদ্ধিকং॥ ২
যেনাসীদজিতং ন সিন্ধুলহরীধৌতাঙ্গ নায়াং ক্ষিতৌ
যস্যাজ্ঞাতমভূন্ন সপ্তভুবনে নাম্নাবিধং বাঙ্ময়ং।
দেবঃ স ত্রিকলিঙ্গরাজ্য মহিমা শ্রীলক্ষ্মণ ক্ষ্মাপতি
র্নেতা যস্য মনীষিতাধিকপুরস্কারোত্তরাঃ সম্পদঃ। ৩
বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহত্তমুপদং প্রাপ্য নবে যৌবনে।
যশ্চৈষ্য যৌবনশেষযোগ্যমখিলক্ষ্মাপালনারায়ণঃ,
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেন দেব নৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ। ৪
(ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব)

২৯ ঘটকদিগের মিশ্রী গ্রন্থের কারিকায় পুতিতুণ্ড বংশের গোবর্দ্ধনাখ্য মহা কবির ও চন্দ্রবংশীয় হলায়ুধের পরিচয় আছে:—
বহুরূপঃ সুচোনাম্না অরবিন্দো হলায়ুধঃ।
বন্দ্যোলাশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঙ্কৈতে চন্দ্রবংশজাঃ। ১
পুতির্গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিবো ঘোষাল সম্ভবঃ।
গাঙ্গুলীয়ঃ শিশো নাম্না কুন্দো রোষা করোপিচ॥ ২
জাহুনাখ্যস্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥ ৩
উৎসাহগরুড়াখ্যাতৌ মুখবংশসমুদ্ভবৌ।
কাম্বুকুতূহলানেতৌ, কাঞ্জিকুলপ্রতিষ্ঠিতৌ।
উনবিংশতিসংখ্যাতা মহীরাজেন পূজিতাঃ॥ ৪
(ধ্রুবানন্দ মিশ্র)

(৩০) সম্বন্ধ নির্ণয়; ২০৯। ২১০ পৃষ্ঠা।

হলায়ুধ ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব, কবিরহস্য নামক ধাতুপাঠ ও সংস্কৃত অভিধান প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব ও অভিধান লোকসমাজে প্রসিদ্ধ। ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরম মান্য ছিলেন। এতদ্বিবন্ধন তৎকালে লোকসমাজে প্রায় দেববৎ পূজিত ছিলেন। হলায়ুধ একজন অসামান্য পণ্ডিত ও অলৌকিক প্রতিভা-বিশিষ্ট লোক ছিলেন। তাঁহার এতগুলি গুণ থাকিলেও তিনি একটী দোষ হইতে অব্যাহতি পান নাই অর্থাৎ তিনি অপরের সৌভাগ্য দেখিতে পারিতেন না—ইনি দুর্গসিংহ সর্ব্ববর্ম্মা প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় ও অগাধবিদ্যাবিশারদগণকে সামান্য লোকের ন্যায় নিন্দা করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কয়েকটী অতিরিক্ত বক্তব্য।

গরুড়পুরাণে কাতন্ত্রের অপর নাম "কুমার" স্পষ্টাভিধানে উল্লিখিত আছে:—

"কাত্যায়নঃ কুমারস্তু শ্রুত্বা বিস্তরমব্রবীৎ"

ইতি গারুড়ঃ।

কেহ বলেন অগ্নিপুরাণেও কাতন্ত্রের নাম উল্লেখ আছে এমন কি উহাতে কাতন্ত্রের "সিদ্ধো বর্ণ সমরাম্নঃ" প্রভৃতি শ্লোক ও উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন যে কাতন্ত্র বহু দিনের পুরাণ প্রচরণ; বাস্তবিক তাহা নহে, হয় উল্লিখিত পুরাণগুলি শালিবাহন রাজার পরে প্রণীত হইয়াছে নয় কেহ কাতন্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করিবার জন্য ঐ পুরাণ সকলে কাতন্ত্রসম্পর্কিত দুই এক কথা যোজনা করিয়া দিয়াছেন।

কাতন্ত্র সম্বন্ধে আরো দুইটী দেশ প্রচলিত শ্লোক :—

তস্য দুঃখস্য শান্ত্যর্থং কুমারং গিরিজাত্মজং
আরুরাধ ততঃ সোঽপি ব্যমহস্তেন তাড়িতঃ। (১)
তস্মৈ দাতুং বরং তেন
সিদ্ধ শব্দো জাহ বকে (?)
পদ্য পাদং যুতং শাস্ত্রং
স্বয়মেবাকরোদ্দ্রুতং।
অধ্যাপনং ততশ্চক্রে
নিজ শিষ্যং সমন্ততঃ ২ †

আমরা শকাব্দা আবিষ্কারক বিক্রমাদিত্য ও হর্ষবিক্রম এ উভয় নৃপতির নিবাসভূমি উজ্জয়িনী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, ইহা যে কেবল আমাদের ভ্রম তাহা নহে; ইহার কোন্ বিক্রমাদিত্যের নিবাস কোথা, এবং নবরত্ন-সভা কোন্ বিক্রমাদিত্যের ছিল সে সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত; বাস্তবিক সে সম্বন্ধে এখনো কোন প্রামাণ্য ও সটীক যুক্তি কেহই প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, প্রথম

---

* শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত "কোষরত্নাকর" ৭ পৃষ্ঠা।

† এই শ্লোকগুলি বোধ হয় একেবারে জনশ্রুতি নয়, ইহার কোন মূল অবশ্য আছে।

বিক্রমাদিত্যের নিবাস কাহার কাহারও মতে অবন্তী নগরে ছিল।

অধ্যাপক লেথ্‌ব্রিজ সাহেবের মতেও কাত্যায়ণ পাণিনি সূত্রের সমালোচক ও কাত্যায়ণ পতঞ্জলির আচার্য্য ও সমসাময়িক লোক ছিলেন P। কাত্যায়ণ যে পতঞ্জলির আচার্য্য ছিলেন একথায় কেবল এক জন বাঙ্গালিই অযথা গোলমাল বাধাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা পূর্ব্বেই লিখা হইয়াছে।

আমরা সুসেন কবিরাজকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছি; কিন্তু অনেকে তাঁহাকে অম্বষ্ঠ কুলসম্ভূত বলিয়া থাকেন। কেননা কবিরাজ শব্দে চলিত ভাষায় আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ চিকিৎসককে বুঝায়। কিন্তু কবিরাজ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে উহা ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেই অধিক খাটে। কবি শব্দের এক অর্থ পণ্ডিত S সুতরাং কবিরাজ শব্দে "পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ" এই অর্থ হওয়াতে কোন দোষ দেখি না, তাহা হইলে সুসেন কবিরাজ অম্বষ্ঠ না হইয়া ব্রাহ্মণ হইলেও কোন অর্থের বিপর্য্যয় হয় না। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ সে সম্বন্ধে ও আমরা অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি নাই। ফল কথা তিনি ব্রাহ্মণই হউন বা অম্বষ্ঠই হউন আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছি বোধ হয়, তাহার বড় ব্যতিক্রম হইবে না।

শ্রীযাদবানন্দ গুপ্ত।

---

‡ জয়দেব নামক প্রস্তাব ৪৬ পৃষ্ঠা।

P The rules of Panini were criticised by Katyayana, were in all probability was the teacher of Patanjalio.

E Leathbridge's 'History of India' (873) P 65 Sec. 106.

S। "বিদ্বান্ বিপশ্চিদ্দোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কোবিদো বুধঃ।
ধীরো মনীষী ভঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান পণ্ডিতঃ কবিঃ।" ইত্যমরঃ।
"———কবি বাল্মীকি শুক্রয়োঃ
সুরৌ কাব্যকরে পুংসি স্যাৎ খলীনেতু যোষিতি।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের মূল উপকরণ যেরূপ আকার ও রং, কর্ণেন্দ্রিয়-বিষয়ীভূত সৌন্দর্য্যের মূল উপকরণ সেইরূপ সুর ও তাল এবং তাহাকেই সঙ্গীত বলে। সঙ্গীতে প্রথমতঃ সামান্য শব্দেরই প্রীতিপ্রদ নানা প্রকার বিচিত্রতা দৃষ্ট হয়—মধুর শব্দ, গম্ভীর শব্দ—ক্রম-বর্দ্ধমান ও ক্রম-হ্রসমান এইরূপ নানা প্রকার শব্দ—তৎপরে সাদাসিধা রাগ রাগিণী (Melody) ও নির্দ্দিষ্ট ভাগ-পরিমাণের নিয়মানুসারে

বিচিত্র সুরের সামঞ্জস্য (Harmony) লক্ষিত হয়।

কোন সমান ওজনের শব্দ অর্থাৎ যে শব্দে প্রতি সেকেণ্ডে কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্পন্দন হয় তাহাকে সাঙ্গীতিক শব্দ, অর্থাৎ সুর বলে। এই স্পন্দনের সমতা হইতে আমাদিগের মনে এক প্রকার সুখ উৎপন্ন হয়। শব্দের অনিয়মিত স্পন্দন অপেক্ষা নিয়মিত স্পন্দন আমাদিগের নিকট অধিক সুখপ্রদ। সুর-সামঞ্জস্য (Harmony) কি? না—কোন সরল ভাগ-পরিমাণের নিয়মানুসারে দুই কিম্বা অধিক সমযোগী সুরের মধ্যে সাম্য ভাব। তাহার দৃষ্টান্ত, ষড়জ, গান্ধার, কোমল গান্ধার, এবং পঞ্চম, এই সমযোগী সুর গুলি বিভিন্ন হইলেও—ইহাদের মধ্যে পরস্পর একটি মিল আছে, এবং এই প্রত্যেক সুরের স্পন্দনের সংখ্যা সমান না হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি ভাগের নির্দ্দিষ্ট সরল পরিমাণ আছে—যে সকল সুরে এই পরিমাণের নিয়ম যত সরল, সেই সকল সুরের মধ্যে সেই পরিমাণে তত মিল দৃষ্ট হয় এবং আমাদিগের নিকট ততই শ্রুতি-সুখকর হয় *। কোন গানে যত উচ্চ নীচ নানা সুরের সামঞ্জস্য থাকে, সেই গান সেই পরিমাণে সুর বিষয়ে সুন্দর এবং কোন গানে যে পরিমাণে সম বিষম নানা তালের সামঞ্জস্য থাকে, সে গান সেই পরিমাণে তাল বিষয়ে সুন্দর। সরল রেখা দ্বারা যে সকল আকার নির্ম্মিত হয়, সেই সকল আকারের প্রতিরূপ—য়ুরোপীয় সঙ্গীত এবং সমবক্র রেখার দ্বারা যে সকল আকার গঠিত হয় তাহার প্রতিরূপ আমাদিগের দেশীয় সঙ্গীত। সমবক্র রেখা-গঠিত আকারে যেরূপ খোঁচা-খুঁচি থাকে না পরন্তু এক অংশের সহিত আর এক অংশ আস্তে আস্তে বেমালুম মিলিয়া যায়, আমাদিগের সঙ্গীত অনেকটা তাহারই প্রতিরূপ—ইংরাজদের সঙ্গীত আমাদিগের অপেক্ষা বোধ হয় অধিক খোঁচা খুঁচি-বিশিষ্ট—অর্থাৎ একটা সুর হইতে আর একটা সুর ক্রমশঃ না গড়াইয়া আসিয়া একটা সুর হইতে আর একটা সুর অকস্মাৎ উত্থিত হয়। এই জন্য ইংরাজি খোঁচা-খুঁচি সুরে আমাদিগকে জাগ্রত করিয়া তোলে এবং আমাদের গড়ানে সুর ইংরাজদিগের নিদ্রা আকর্ষণ করে। ইংরাজদিগের অপেক্ষা আমাদিগের মূল সুরগুলি (Melody) যে অধিক সুন্দর তাহাতে সন্দেহ নাই, ইংরাজদিগের মূল সুর হইতে যদি

* "If we sound together two notes whose vibration-ratio is expressed by two terms of the series of natural numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, &c, we shall have a musical concord more or less perfect or pleasing according to the simplicity of the numerical ratio and more or less displeasing as the ratio is more or less complex—the whole series of such notes is known in music as Harmonic Sound" by John Cook M A—Sound.

তাহার আনুসঙ্গিক-বিচিত্র "সুর-সম্মিলন Harmony অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা অতি সামান্য হইয়া পড়ে, অনেক সময়ে তাহাদিগের মূল সুরের দারিদ্র্য আনুসঙ্গিক সুর-বৈচিত্র্যে ঢাকিয়া যায়। Captain willard সাহেব তাঁহার প্রণীত "ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত" নামক গ্রন্থে বলেন—

"The modern melody has got the merit of the ancient and that harmony is used with the view of compensating for its poorness, and diverting the attention of the audience from perceiving the barrenness of genius."

যদিও আমাদিগের মূল সুরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত অধিক যে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য Harmony রূপ অলঙ্কারের তত প্রয়োজন হয় না, তথাপি আর একটু আনুসঙ্গিক সুর-বিচিত্রতা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বোধ হয় আমাদিগের সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়—কিন্তু মূল রাগ রাগিণীর ভাব রক্ষা করিয়া Harmony প্রয়োগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিচিত্রতার খাতিরে আমরা রাগ রাগিণী কিম্বা ভাবের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। Harmonyর দরুণ অনেক সময় যে গানের ভাব নষ্ট হয় তাহা কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজ গ্রন্থকার স্বীকার করেন—Dr Burney বলেন:—

If may indeed happen from the number of performers, and the complication of the harmony, that meaning and sentiment may be lost in the multiplicity of sounds; but this, though it may be harmony, loses the name of music"

সঙ্গীতের আবার দুইটি অংশ আছে একটি ইন্দ্রিয়ঘটিত, আর একটি মানসিক। গানের যেরূপ সুর ও তাল, সেইরূপ ভাবও একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু এই ভাবকে যদি সুর-তাল হইতে পৃথক করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহা কবিতার অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ভাবকে যখন সুর-তালের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখি তখনই সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

সুরের ভাব-সৌন্দর্য্য কাহাকে বলি না—যখন কোন মানসিক ভাবের সহিত সুর-তালের ঐক্য কিম্বা সামঞ্জস্য হয়। আমাদিগের ভৈরব ও পূরবী প্রভৃতি রাগ ভাব-সৌন্দর্য্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। এই দুই রাগ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার ভাব মনোমধ্যে যে রূপ উদয় করিয়া দিতে পারে, এরূপ আর কোন রাগ করিতে পারে না। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার যেরূপ ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত ভাব—কড়ি কোমল প্রভৃতি অর্দ্ধ সুর প্রয়োগ করিয়া সুরের গড়ান-ভাব বিধান করিয়া—প্রাতঃ সন্ধ্যার ভাবের অনুকরণ করা হইয়াছে। এই রূপ বিশেষ বিশেষ সুরে আমাদের বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব যে উদ্দীপিত হয়, তাহা অনুসঙ্গ-নিয়মেই (Association) হইয়া থাকে।

কিন্তু এই বিষয়ে Alison সাহেবের মতের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না—তিনি বলেন শব্দ-সকলের কোন নিজস্ব মনোহারিতা নাই—শব্দের সহিত হৃদয়-ভাবের অনুসঙ্গ না হইলে শব্দের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—তিনি বলেন উচ্চ নীচ, গম্ভীর তীক্ষ্ণ দীর্ঘ হ্রস্ব প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের সহিত বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবের যোগ আছে—এবং ঐ সকল স্বর বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবকে উদ্রেক করে বলিয়াই সেই সকল স্বরের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করি। যদিও আমরা স্বীকার করি, বিশেষ বিশেষ স্বর বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ভাবকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কি আমরা শব্দের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না? কোন কর্কশ শব্দ শুনিলে স্বভাবতই যেরূপ আমাদের বিরক্তি বোধ হয়, কোন মধুর শব্দ শুনিলে, শুধু আমরা সেই শব্দের মাধুর্য্যেই বিমোহিত হই, তবে, যতক্ষণ না ঐ সুরে কোন আনুসঙ্গিক মধুর হৃদয়-ভাবকে উদ্রেক করিতে পারে, ততক্ষণ অবশ্য আমাদিগের হৃদয়ে সঙ্গীতের পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় না।

এই রূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। আর একটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর সৌন্দর্য্য-রাজ্য আছে—তাহা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। সামঞ্জস্য ও বিচিত্রতা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরও মূল উপকরণ। দয়া প্রেম ভক্তি সৌহার্দ্য বাৎসল্য সরলতা—এ সমস্ত এক একটি বিশেষ-বিশেষ আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। পিতা ভিন্ন ব্যক্তি, পুত্র ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু স্নেহ ভক্তির বন্ধনে উভয়ের মধ্যে যে যোগ তাহা হইতে একটি সৌন্দর্য্য ভাব প্রকাশ পায়—এই রূপ পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বিচিত্র হইয়াও তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি সুন্দর যোগ আছে—যে পরিবারের মধ্যে এই বিচিত্রতার মধ্য হইতে সাম্য ভাবের স্ফূর্ত্তি পায়—সেই পরিবারের মধ্যে একটি অনুপম গার্হস্থ্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। যার প্রতি যেরূপ সম্বন্ধ তাহার প্রতি সেইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার করিলে যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাকে আর এক কথায় নৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে। প্রজার সহিত রাজার যে সম্বন্ধ তাহাকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বলা যায়—এই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য হইতে যে সৌন্দর্য্য নিঃসৃত হয় তাহাকে রাজনৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক প্রকার সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত এক একটি শিল্প আছে। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের শিল্প কি? না—কবিতা—ইহাই অনুসঙ্গ নিয়মের অব্যবহিত অধীন। বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত যখন হৃদয়-সৌন্দর্য্যের মিল হয় তখনই তাহা কবিতার বিষয় হইয়া পড়ে। যখন উষার বাহ্য-সৌন্দর্য্য, কবির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যকে উদ্বোধিত করে, তখনই কবি উষাকে পবিত্র-মূর্ত্তি, স্নেহময়ী দেবী রূপে কল্পনা করিয়া এই রূপ বর্ণনা করেন:—"ঐ কে অমরবালা

তাহার আনুসঙ্গিক-বিচিত্র সুর-সম্মিলন Harmony অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে তাহা অতি সামান্য হইয়া পড়ে, অনেক সময়ে তাহাদিগের মূল সুরের দারিদ্র্য আনুসঙ্গিক সুর-বৈচিত্র্যে ঢাকিয়া যায়। Captain willard সাহেব তাঁহার প্রণীত "ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত" নামক গ্রন্থে বলেন—

"The modern melody has not the merit of the ancient and that harmony is used with the view of compensating for its poorness, and diverting the attention of the audience from parceiving the barrenness of genius."

যদিও আমাদিগের মূল সুরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য এত অধিক যে তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য Harmony রূপ অলঙ্কারের তত প্রয়োজন হয় না, তথাপি আর একটু আনুসঙ্গিক সুর-বিচিত্রতা প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলে বোধ হয় আমাদিগের সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়—কিন্তু মূল রাগ রাগিণীর ভাব রক্ষা করিয়া Harmony প্রয়োগ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিচিত্রতার খাতিরে আমরা রাগ রাগিণী কিম্বা ভাবের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। Harmonyর ঘর্ষণ অনেক সময় যে গানের ভাব নষ্ট হয় তাহা কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজ গ্রন্থকার স্বীকার করেন—Dr Burney বলেন:—

If may indeed happen from the number of performers, and the complication of the harmony, that meaning and sentiment may be lost in the multiplicity of sounds; but this, though it may be harmony, loses the name of music"

সঙ্গীতের আবার দুইটি অংশ আছে একটি ইন্দ্রিয়ঘটিত, আর একটি মানসিক। গানের যেরূপ সুর ও তাল, সেইরূপ ভাবও একটি প্রধান উপকরণ। কিন্তু এই ভাবকে যদি সুর-তাল হইতে পৃথক করিয়া দেখি, তাহা হইলে তাহা কবিতার অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই ভাবকে যখন সুর-তালের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখি তখনই সঙ্গীত-শাস্ত্রের অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়ে।

সুরের ভাব-সৌন্দর্য্য কাহাকে বলি না—যখন কোন মানসিক ভাবের সহিত সুর-তালের ঐক্য কিম্বা সামঞ্জস্য হয়। আমাদিগের ভৈরব ও পূরবী প্রভৃতি রাগ ভাব-সৌন্দর্য্যের জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল। এই দুই রাগ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার ভাব মনোমধ্যে যে রূপ উদয় করিয়া দিতে পারে, এরূপ আর কোন রাগ করিতে পারে না। প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার যেরূপ ঢুলু ঢুলু ঘুমন্ত ভাব—কড়ি কোমল প্রভৃতি অর্দ্ধ সুর প্রয়োগ করিয়া সুরের গড়ান-ভাব বিধান করিয়া—প্রাতঃ সন্ধ্যার ভাবের অনুকরণ করা হইয়াছে। এই রূপ বিশেষ বিশেষ সুরে আমাদের বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব যে উদ্দীপিত হয়, তাহা অনুসঙ্গ-নিয়মেই (Association) হইয়া থাকে।

কিন্তু এই বিষয়ে Alison সাহেবের মতের সহিত আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐক্য হয় না—তিনি বলেন শব্দ-সকলের কোন নিজস্ব মনোহারিতা নাই—শব্দের সহিত হৃদয়-ভাবের অনুসঙ্গ না হইলে শব্দের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না—তিনি বলেন উচ্চ নীচ, গম্ভীর তীক্ষ্ণ দীর্ঘ হ্রস্ব প্রভৃতি বিভিন্ন স্বরের সহিত বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবের যোগ আছে—এবং ঐ সকল স্বর বিশেষ বিশেষ হৃদয়ভাবকে উদ্রেক করে বলিয়াই সেই সকল স্বরের সৌন্দর্য্য আমরা উপলব্ধি করি। যদিও আমরাও স্বীকার করি, বিশেষ বিশেষ স্বর বিশেষ বিশেষ হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু ভাবকে ছাড়িয়া শুদ্ধ কি আমরা শব্দের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারি না? কোন কর্কশ শব্দ শুনিলে স্বভাবতই যেরূপ আমাদের বিরক্তি বোধ হয়, কোন মধুর শব্দ শুনিলে, শুধু আমরা সেই শব্দের মাধুর্য্যেই বিমোহিত হই, তবে, যতক্ষণ না ঐ সুরে কোন আনুসঙ্গিক মধুর হৃদয়-ভাবকে উদ্রেক করিতে পারে, ততক্ষণ অবশ্য আমাদিগের হৃদয়ে সঙ্গীতের পূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয় না।

এই রূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে পৃথক্ পৃথক্ সৌন্দর্য্য-ক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। আর একটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর সৌন্দর্য্য-রাজ্য আছে—তাহা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। সামঞ্জস্য ও বিচিত্রতা আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যেরও মূল উপকরণ। দয়া প্রেম ভক্তি সৌহার্দ্য বাৎসল্য সরলতা—এ সমস্ত এক একটি বিশেষ-বিশেষ আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য। পিতা ভিন্ন ব্যক্তি, পুত্র ভিন্ন ব্যক্তি, কিন্তু স্নেহ ভক্তির বন্ধনে উভয়ের মধ্যে যে যোগ তাহা হইতে একটি সৌন্দর্য্য ভাব প্রকাশ পায়—এই রূপ পিতা পুত্র, ভ্রাতা ভগিনী স্বামী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি বিচিত্র হইয়াও তাহাদিগের মধ্যে কেমন একটি সুন্দর যোগ আছে—যে পরিবারের মধ্যে এই বিচিত্রতার মধ্য হইতে সাম্য ভাবের স্ফূর্ত্তি পায়—সেই পরিবারের মধ্যে একটি অনুপম গার্হস্থ্য সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। যার প্রতি যেরূপ সম্বন্ধ তাহার প্রতি সেইরূপ উপযুক্ত ব্যবহার করিলে যে সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, তাহাকে আর এক কথায় নৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে। প্রজার সহিত রাজার যে সম্বন্ধ তাহাকে রাজনৈতিক সম্বন্ধ বলা যায়—এই সম্বন্ধের সামঞ্জস্য হইতে যে সৌন্দর্য্য নিঃসৃত হয় তাহাকে রাজনৈতিক সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে।

প্রত্যেক প্রকার সৌন্দর্য্যের বিষয়ীভূত এক একটি শিল্প আছে। আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যের শিল্প কি? না—কবিতা—ইহাই অনুসঙ্গ নিয়মের অব্যবহিত অধীন। বাহ্য সৌন্দর্য্যের সহিত যখন হৃদয়-সৌন্দর্য্যের মিল হয় তখনই তাহা কবিতার বিষয় হইয়া পড়ে। যখন উষার বাহ্য-সৌন্দর্য্য, কবির আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যকে উদ্বোধিত করে, তখনই কবি উষাকে পবিত্র-মূর্ত্তি, স্নেহময়ী দেবী রূপে কল্পনা করিয়া এই রূপ বর্ণনা করেন:—"ঐ কে অমরবালা

দাঁড়াবার উদয়াচলে, ঘুমন্ত প্রকৃতি প্যানে চেয়ে আছে কুতূহলে!"

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে বিচিত্রতা ও সামঞ্জস্য সকল প্রকার সৌন্দর্য্যেরই মূল নিয়ম। সৌন্দর্য্যের কোন একটি ধ্রুব আদর্শ না থাকিলেও তাহার মূলে কতক গুলি বিশ্বজনীন মূলতত্ত্ব নিহিত আছে এবং অন্যান্য মনোবৃত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্য-রুচিও উন্নতিসাপেক্ষ, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই সৌন্দর্য্য-রুচিও যে উন্নতি লাভ করে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে কখন কখন যে সম্পূর্ণ বিপরীত সৌন্দর্য্য-রুচির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কারণ আছে।

সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা এক কথা এবং সৌন্দর্য্য ভাব বাহিরে প্রকাশ করা স্বতন্ত্র কথা। কোন শ্রেষ্ঠ কবিকে জিজ্ঞাসা কর—তিনি যত খানি হৃদয়ে অনুভব করেন, তার শতাংশের একাংশও কবিতায় প্রকাশ করিতে পারেন কি না—যাঁর যে পরিমাণে এই প্রকাশ করিবার শক্তি আছে, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কবি। কোন ব্যক্তি সঙ্গীতের সমজ-দার হইতে পারেন কিন্তু নিজে গান করিতে গেলে হয় তো সকলের সমক্ষে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। Darwin যে বলেন "The idea also of beauty in natural scenery has arisen only within modern times"—এ কথা কতদূর সত্য সন্দেহস্থল। এ কথা স্বীকার করি—আমাদিগের অন্যান্য সকল বৃত্তির ন্যায় সৌন্দর্য্য-বৃত্তিও উন্নতি-সাপেক্ষ—কিন্তু অসভ্যেরা যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারে না এ কথা বিশ্বাস্য হয় না। Darwin নিজেই বলিয়াছেন যে, অতীব অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও নানা প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। সেই অলঙ্কার সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে সেই সকল অলঙ্কার ফুল ও ফলের অসম্পূর্ণ অনুকৃতি মাত্র। কোন ফুলের অবিকল সৌন্দর্য্য অনুকরণ করা উৎকৃষ্ট শিল্পের কার্য্য। অসভ্যেরা ফুলের কিম্বা ফলের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিলেও, তাহা শিল্পে প্রকাশ করা তাহাদের পক্ষে সহজ নহে। এই সৌন্দর্য্য জ্ঞান শিল্পে প্রয়োগ করিবার সময়েই তাহাদিগের নানা প্রকার ভ্রম হইয়া পড়ে। তাহাদিগের অলঙ্কারের আকার যে প্রায়ই গোলাকার হয়, ইহাতেই বুঝা যায় যে, গোলাকারের সৌন্দর্য্য তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল এবং এই আকারটি মাত্র অপেক্ষাকৃত সাদা-সিধা বলিয়া তাহারা শিল্প কার্য্য দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ফুল ও ফলের আকার-গত যে সামান্য সৌন্দর্য্য গোলাকৃতি, সেইটুকু পর্য্যন্ত প্রকাশ করাই তাহাদিগের শিল্পের দৌড়; ফুলের পাপড়ি প্রভৃতি বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করা তাহাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া প্রথমতঃ হয় তো তাহারা সেই সকল ফুল অঙ্গে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়—পরে, যখন সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে শিল্পের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইল, তখন এই সকল প্রাকৃ-

তিক অলঙ্কার চিরস্থায়ী করিবার জন্য বোধ হয় উহারা তাহারই সাধ্যমত অনুকরণে ধাতু-নির্ম্মিত অলঙ্কার রচনা করিতে প্রথম আরম্ভ করে। বৃক্ষে রাশি রাশি পুষ্প-ফল লম্বিত দেখিয়া তাহারই অনুকরণে নাক কান ঠোঁট ফুঁড়িয়া পুষ্প ও ফলানুকৃতি অলঙ্কার সকল পরিবারপ্রথা বোধ হয় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়।

যে অসভ্য মনুষ্য প্রথম এইরূপ অলঙ্কার পরিধান করিয়াছিল বোধ হয় তাহার মনে এই প্রকার কোন যুক্তি উপস্থিত হয় যে, ঐ পুষ্পসমূহে যখন বৃক্ষের শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে, তখন তাহার অনুকরণে এই সকল কৃত্রিম অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে বিলম্বিত করিলে অবশ্য শরীরের শোভা বৃদ্ধি হইবে—এই প্রকার একবার বিশ্বাস ও সংস্কার উৎপন্ন হইলে, ওষ্ঠ ফুঁড়িয়া "পেলে" নামক বালা পরিধান করা কুরুচির বিষয় মনে হইতে পারে না—বরং তাহাই সৌন্দর্য্য-সাধক বলিয়া সেই অসভ্যদিগের মনে হইবে। এবং তাহার দৃষ্টান্ত ও অনুকরণে তাহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে বংশপরম্পরাক্রমে এই প্রকার অলঙ্কার পরিধানের প্রথা প্রচলিত হইয়া এই প্রকার রুচি তাহাদিগের মধ্যে বদ্ধমূল হইবার কথা। এবং সৌন্দর্য্য-জ্ঞান মূলে থাকা সত্ত্বেও তাহার প্রয়োগে এই প্রকার ভ্রম হইয়া সুরুচিকেও ক্রমে কুরুচিতে পরিণত করিতে পারে। এই জন্য সকল দেশেই সৌন্দর্য্য-রুচি যেরূপ শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে, শিল্পও আবার সৌন্দর্য্য-রুচির উপর সেইরূপ প্রভাব প্রতিফলিত করে। অনুকরণ, অভ্যাস ও দৃষ্টান্তের প্রভাব মানব-প্রকৃতিতে অত্যন্ত বলবৎ; কুৎসিত বস্তুকে যদি আমরা সুন্দর বলিয়া রোজ রোজ দেখি, ক্রমে সেই বাস্তবিক কুৎসিত পদার্থও আমাদের চক্ষে সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়। আমাদিগের বাজারে শিশুদের জন্য যে সব পুতুল বিক্রয় হয় তাহা অতি জঘন্য—এই বিশ্রী শিল্পকার্য্য ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া দেখিয়া আমাদের শিল্পরুচি বিকৃত হইবার কথা। গুপ্ত Brothersকর্ত্তৃক এখন যে সচিত্র পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে তাহার চিত্র সকল অপেক্ষাকৃত অনেক উৎকৃষ্ট হওয়ায় সাক্ষাৎভাবে না হউক আনুসঙ্গিক ভাবেও সাধারণের সৌন্দর্য্য-রুচির উন্নতির পক্ষে যে সহায়তা করিতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই।

অসভ্যদিগের অনেক বেশভূষা মূলতঃ সৌন্দর্য্য স্পৃহা হইতে উৎপন্ন না হইতেও পারে। সে বিষয়ে বিদেশীয় পর্য্যটকদিগের বুঝিবার ভ্রম হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। মালাই দ্বীপপুঞ্জ নিবাসী লোকেরা যে, কুকুরের ন্যায় দাঁত সম্পূর্ণ সাদা হওয়ায় লজ্জার বিষয় মনে করে, কিম্বা উপরিতন নীলনদকূলস্থ প্রদেশনিবাসী মনুষ্যগণ পাছে পশুর মত দেখিতে হয় বলিয়া যে সম্মুখভাগের দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলে তাহাতে কি প্রকাশ পায়? তাহারা কি সৌন্দর্য্যের জন্য এইরূপ করে? না, তাহারা পশুর হীনতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে কোন প্রকারে পশুদিগের মত দেখিতে না হয়, এই উদ্দেশেই এই প্রকার আচরণ করে? যে সকল লক্ষণকে পশুর বিশেষ লক্ষণ বলিয়া তাহাদিগের ধারণা হয়,

আপনাদিগের শরীরে সেই সকল লক্ষণের কিছুমাত্র আভাস থাকিলে তাহা সমূলে উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

অনেক সময় কোন পদার্থ দেখিলে আমরা সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতে পারি, কিন্তু কেন সুন্দর দেখাইতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময়, সমস্ত অংশের সামঞ্জস্যে যে সৌন্দর্য্য উৎপন্ন হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে না পারিয়া তাহার কোন একটি অংশকে সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া স্থির করি এবং এই রূপে ভ্রমে পতিত হই। মনে কর এক জনের মুখ-শ্রী আমাদিগের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হইল, কেন সুন্দর দেখাইতেছে, আমি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কি বিশেষ লক্ষণ থাকায় অন্য মুখশ্রী অপেক্ষা তাহার মুখশ্রী সুন্দর হইয়াছে, তাহা বুদ্ধি দ্বারা নির্ণয় করিতে গিয়া হয় তো ভ্রমে পতিত হইলাম। আমার মনে হইল, সুবক্র "শুক-চঞ্চু জিনি" নাসিকাই তাহার মুখশ্রীর বিশেষ লক্ষণ—আমি এই স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম শুকচঞ্চু বিনিন্দিত নাসিকাই তবে সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আদর্শস্থল। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যেখানে সেখানে পাত্রাপাত্র ভেদ না করিয়া এই নিয়মের প্রয়োগ করিতে লাগিলাম, কাজেই সৌন্দর্য্য বিষয়ে আমার পদে পদে ভ্রম হইবার কথা। এক জনের মুখশ্রীতে চোক মুখ ঠোঁট প্রভৃতির যে রূপ গঠন, "শুক চঞ্চু জিনি নাসা" তাহারই মানানসই হওয়াতেই সেই মুখে সুন্দর দেখাইতেছে—কিন্তু তাই বলিয়া সকল মুখশ্রীতেই যে সেই "শুক চঞ্চু জিনি নাসা" সুন্দর দেখাইবে তাহার কোন অর্থ নাই। এক জনের অন্যান্য অংশের তুলনায় হয়তো তাহার ছোট কপাল মানাইতে পারে—কিন্তু সেই ছোট কপাল তাই বলিয়া সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আদর্শ হইতে পারে না। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, সৌন্দর্য্যের মূলতত্ত্ব ধ্রুব হইলেও সৌন্দর্য্যের আদর্শ ধ্রুব হইতে পারে না। সকল সৌন্দর্য্যই আপেক্ষিক, তুলনাসাপেক্ষ। প্রত্যেক সুন্দর পদার্থের বিভিন্ন সৌন্দর্য্য সেই পদার্থগত অংশ-সমূহের বিভিন্ন প্রকার সংস্থান-প্রণালীর উপর নির্ভর করে, যে কোন সুন্দর পদার্থের যেরূপ সংস্থান-প্রণালী—তদনুসারেই তাহার সামঞ্জস্য বিধান হইয়া থাকে। এই জন্য পাত্রাপাত্র অবস্থা বিবেচনা না করিয়া এক জনের কিম্বা এক পদার্থের সৌন্দর্য্য আর এক জন কিম্বা আর এক পদার্থে আরোপ করিলেই ভ্রমে পতিত হইতে হয়। স্থূল কথা—কোন জীব-শরীরের অবয়ব-সংস্থানের নানা প্রকার প্রণালী হইতে পারে,—কিন্তু তাহাদিগের অবস্থাগত সামঞ্জস্য হইতেই তাহাদিগের বিশেষ সৌন্দর্য্য স্ফূর্ত্তি পায়। এই জন্য যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে—ঘোটক সুন্দর—না কুকুর সুন্দর—আর আমি যদি উৎকৃষ্ট আদর্শের ঘোড়া ও উৎকৃষ্ট আদর্শের কুকুর উভয়ই দেখিয়া থাকি—তাহা হইলে আমি কখনই বলিতে পারি না যে, ঘোড়া কুকুর অপেক্ষা সুন্দর,

কিম্বা কুকুর ঘোড়া অপেক্ষা সুন্দর—তাহাদের সৌন্দর্য্য আদর্শ স্বতন্ত্র—ঘোড়া ঘোড়ার হিসাবে সুন্দর—কুকুর কুকুরের হিসাবে সুন্দর। তাহার অর্থ এই, উহাদের মধ্যে যাহার যেরূপ শরীরের অবয়ব-সংস্থান প্রণালী তদনুসারেই তাহাদের প্রত্যেকের অবয়বসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। যাহার যে পরিমাণে এইরূপ সামঞ্জস্য থাকে, তাহাকে সেই পরিমাণে আমরা সুন্দর বলি।

আরব দেশীয় ঘোড়াকে এই জন্য আমরা ঘোটক জাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া থাকি। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশীয় ঘোড়া সুন্দর না গাধা সুন্দর? গাধা অপেক্ষা আরব ঘোড়া যে অসংখ্য গুণে সুন্দর তাহাতে বোধ হয় কাহারো দ্বিরুক্তি হইবে না। কেন সুন্দর? না—যেহেতু গাধা অপেক্ষা আরব ঘোড়ার অবয়ব-সংস্থানের অধিক সামঞ্জস্য আছে। পশু-সাধারণের মধ্যে শূকর গাধা প্রভৃতির কোন কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নিতান্ত অসামঞ্জস্য থাকা প্রযুক্তই তাহারা জন্তুর মধ্যে কুৎসিত বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহা বিবৃত হইল তাহাতে বোধ হয়—যথেষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে সমতা ও সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্যের মূল উপাদান। কোন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের সমতা কিম্বা সামঞ্জস্য দেখিয়া আমাদিগের মনে যে, সুখোদয় হয় তাহারই নাম সৌন্দর্য্য। যেহেতু সৌন্দর্য্য তুলনা-সাপেক্ষ—সেই হেতু তুলনা-বৃত্তি ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৌন্দর্য্য-রুচিরও উন্নতি হইয়া থাকে।

গরবিনী।

১

গরবিনি! থাক তুমি আপন গরবে,
কে চায় গো—কে চায় গো—তব ভালবাসা?
নাগাল কি পায় তোমা অধম মানবে?
বহু দূর তুমি—তায় নাহি মোর আশা।

২

যদিও উজ্জ্বল তুমি তারার মতন
তোমার কিরণে মোর নাহি কোন ফল,
অত দূর হতে তব শীতল কিরণ
উত্তাপিতে পারে কি গো নিম্ন ধরাতল?

৩

জীবন-পথের মোর নাশিতে তিমির
নাহি চাহি দীপ্তিমান তারকার ভাতি,
চাহি মাত্র দীপ এক মলিন মাটির—
কুটীর করিবে আলো হবে যবে রাতি।

৪

চাহি না গো বট-বৃক্ষ উন্নত মহান্,
ছাইবার তরে মোর এ ক্ষুদ্র কুটীর,
চাই, যেন নম্র মুখী লতার বিতান
ঘন আলিঙ্গনে ছায় আমারি প্রাচীর।

না চাহি হীরক-খচিত উজ্জ্বল অতুল,
মণি মুক্তা মাণিক্যের কোন অলঙ্কার,
আমার সে মনোনীত—ভুঁই-চাঁপা ফুল,
দাও মোরে, রাখি তারে হৃদয় মাঝার।

৬

তোমার রূপের যশ গাক্ ত্রিভুবনে,
তোমা পানে সকলের হোক্ দৃষ্টিপাত,
আমি যারে ভাল বাসি, চাহি তার মনে
প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া থাকি দিবা রাত।

না রাখি তোমার কোন ভাল বাসা-আশ,
সে প্রত্যাশা নাহি মোর, শোন গরবিনি,
ফুল দিয়া দাও নেত্র অন্য যার তার,
বাঁধিতে নারিবে কভু আমারে, মোহিনি!

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

উন্নতির নিয়ম আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি একবার প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক্। প্রথমে বলিয়াছি যে, সৃষ্টির যত কিছু ব্যাপার সমস্তই সাম্যবৈষম্য দুয়ের সংযোগ-সাপেক্ষ; কেবলি যদি সাম্য ভাব থাকে, বৈষম্য কিছুই না থাকে, তাহা হইলে সে নির্জ্জীব ভাবের থাকা না-থাকারই মধ্যে, কেবলই যদি বৈষম্য ভাব থাকে সাম্য-ভাব কিছুই না থাকে তাহা হইলে সে বিশৃঙ্খল-ভাবের থাকাও না-থাকারই নামান্তর; এক যাহা আছে তাহাই থাকিয়া যাইতেছে, তাহা হইতে নূতন কিছুই হইতেছে না, এরূপ "এক" শূন্যের ন্যায় নিষ্ফল,—শূন্যের যত দিয়া গুণ কর না কেন তাহা শূন্যই থাকিয়া যায়; আর এখন যাহা আছে পর মুহূর্ত্তে যদি তাহার চিহ্ন মাত্রও না থাকে, আদ্যোপান্ত সর্ব্বাংশে বিভিন্ন আর একটি সামগ্রী উপস্থিত হয়, এইরূপ যদি ক্রমাগতই সম্পূর্ণ নূতন নূতন ব্যাপার নিরবচ্ছেদে সংঘটিত হইতে থাকে, তাহা হইলে, শুদ্ধ একটি মাত্র মুহূর্ত্ত যেমন তাহার অব্যবহিত পর মুহূর্ত্ত এবং পূর্ব্বমুহূর্ত্ত হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে একেবারেই শূন্য হইয়া যায়, তেমনি সেইরূপ-একটি মুহূর্ত্তের উপর স্তর করিয়া ঘটনা ঘটিতেছে, পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের ঘটনার সহিত কোন অংশেই তাহার সাম্য নাই, সমস্ত ঘটনাই এরূপ হইলে সেই অসম্বদ্ধ মুহূর্ত্ত-টুকুর ন্যায় শূন্যত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে নিতান্ত

বৈষম্য-রহিত সাম্য কিংবা নিতান্ত সাম্য-রহিত বৈষম্য সৃষ্টির কুত্রাপি সম্ভবে না। অতএব সৃষ্টিতে আপেক্ষিক সাম্য-বৈষম্য ভিন্ন ঐকান্তিক সাম্য-বৈষম্য স্থান পাইতে পারে না। পরে বলিয়াছি যে, উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে অভাবের আধিক্য সুতরাং বৈষম্যের আধিক্য। পরস্পর-সঙ্গ দ্বারা পরস্পরের অভাব দূর হইলে বৈষম্য ক্রমশই সাম্যে পরিণত হয়, এইরূপ করিয়া নীচ শ্রেণী উচ্চ শ্রেণীর সহিত সাম্য লাভ করে, ইহারই নাম উন্নতি।

পরে বলিয়াছি যে, বৈষম্য হইতে পর্য্যায় ক্রমে সাম্যে উত্থান করিবার ছয়টি ধাপ নির্দ্দিষ্ট আছে। বৈষম্য সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে অভাব পূরণের চেষ্টা, এবং সাম্য সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। প্রথম ধাপে বিষয়াসক্তি; এইধাপে স্বার্থ অভাব-পূরণ-মানসে আমাদিগকে অর্থ সংগ্রহ করিতে পরামর্শ দেয়। দ্বিতীয় ধাপে দাম্পত্য প্রেম; এই ধাপে ধর্ম্ম ভাব-সংস্থাপন-মানসে আমাদিগকে ন্যায়-সঙ্গত ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়। তৃতীয় ধাপে বাৎসল্য; এই ধাপে অভাব-পূরণ মানসে শক্তি আমাদিগকে কর্ত্তৃত্ব করিতে পরামর্শ দেয়; চতুর্থ ধাপে সৌহার্দ্দ; এই ধাপে ভাব-সংস্থাপন-মানসে সৌন্দর্য্য আমাদিগকে শোভন ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেয়; পঞ্চম ধাপে ভক্তি; এই ধাপে অভাব পূরণ মানসে মঙ্গল আমাদিগকে হিতানুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দেয়। ষষ্ঠ ধাপে সর্ব্ব নিরপেক্ষ শৃঙ্খলমুক্ত প্রেম, এই ধাপে ভাব সংস্থাপনার্থে সত্য আমাদিগকে বহির্জগৎ অন্তর্জ্জগৎ আত্মা পরমাত্মা সকলের সহিত সামঞ্জস্য সাধনে পরামর্শ দেয়।

সঙ্গীতের যেমন সপ্তক-প্রবাহ অনন্ত, উন্নতির ঐ ধাপ কয়টিও সেইরূপ। যদিও ছয়টি ধাপ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু তাহার আদিতে আত্মার অপরিস্ফুট জ্ঞান প্রেম এবং তাহার চরম প্রান্তে আত্মার পরিস্ফুট জ্ঞান-প্রেম, দুই দিককার দুই ষড়জ সুরের (সা—এই আদি সুরের) ন্যায় গণ্য হইতে পারে। অতঃপর ভূতসৃষ্টি হইতে মনুষ্যসৃষ্টি পর্য্যন্ত, সমস্ত জগৎ কি প্রণালীতে এক সপ্তক হইতে উচ্চতর আর এক সপ্তকে উত্থান করে তাহা প্রদর্শন করা যাইতেছে।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত মনুষ্য এবং মনুষ্যের মনোবৃত্তির মধ্যেই আলোচ্য-বিষয়ের অন্বেষণ-কার্য্য আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন বহির্জগতে তাহাকে একবার বিচরণ করিতে দেওয়া যাউক।

ভৌতিক পদার্থ সকলের গোড়ার ভাব আকাশ-ব্যাপ্তি; এবং বিক্ষেপ-শক্তিই সেই আকাশ-ব্যাপ্তি-প্রবর্ত্তক। ধূমরাশি যে শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশই দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, আদিম কালের সূক্ষ্ম ভূত তাহা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সেই বিক্ষেপ-শক্তির বশবর্ত্তী ছিল ইহাতে আর সংশয় নাই।

বিষয়াসক্তি এবং স্বার্থ যেমন মনুষ্য-সমাজে ব্যক্তিগণের পার্থক্য সাধন করে,

বিক্ষেপ-শক্তি সেইরূপ ভৌতিক রাজ্যে পরমাণুগণের পার্থক্য সাধন করে। তাহার পরে রাসায়নিক আকর্ষণের বশে পড়িয়া পরমাণু সকল সংহত-ভাব ধারণ করে, মনুষ্য সমাজে যেমন দম্পতি-প্রেম, ভৌতিক রাজ্যে সেইরূপ রাসায়নিক আকর্ষণ। রাসায়নিক শক্তির গুণ এই যে তাহা ভূতত্বয়কে বন্ধন করিয়া অল্প স্থানের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া আনে এবং তাহাতে করিয়া উত্তাপের উৎপত্তি হয়; ভূতত্বয় যখন রাসায়নিক শক্তির বন্ধনে পড়িয়া একই বস্তু রূপে পরিণত হয়, তখন তাহা হইতে উষ্মা উদ্গীরিত হইয়া তারাকর্ষণ বলে মূল বস্তুর আয়তনের মধ্যে বিধৃত হইয়া থাকে; মনুষ্য সমাজে যেমন বাৎসল্য ভাব, ভৌতিক রাজ্যে সেইরূপ তারাকর্ষণ; গুরু জনের স্নেহ যেমন নীচগামী, গুরু বস্তুর তারাকর্ষণও সেইরূপ। পরে উক্ত উষ্মরাশি লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে দূর নিকটে প্রসারিত হইয়া যোগাকর্ষণ-বলে এক এক স্তরে এক এক দল মিলিয়া মিসিয়া স্থিতি করে; ইহাতে করিয়া সেই মূল বস্তুর চতুর্দ্দিকে কতকগুলা সমকেন্দ্রিক চক্রপরম্পরা আবির্ভূত হয়। মনুষ্য-সমাজে যেমন সৌহার্দ্দ ভৌতিক রাজ্যে সেই রূপ যোগাকর্ষণ। পরে কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক বেষ্টন-চক্রের কোন না কোন স্থানে তদীয় সমস্ত পরমাণু জড় হইয়া ক্রমে ক্রমে গোলাকারে পরিণত হয়; সূর্য্য হইতে গ্রহগণ যখন এই রূপ দূরে সরিয়া দাঁড়ায়, অথচ সূর্য্যের আকর্ষণ মানা করিয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করে, যেমন স্বাধীনভাব প্রাপ্ত হয় সেই সঙ্গে সূর্য্যের অধীনতা স্বীকার করে, মনুষ্য-সমাজে গুরু লঘু ব্যক্তির মধ্যে এই ভাবটি দৃষ্ট হইলে তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। তাহার পরে সূর্য্য এবং সমস্ত গ্রহগণের মধ্যে যখন একটি সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হয়, সকলের মধ্যে যখন একটি বাঁধা-প্রণালী অনুসারে স্থির ভাবে কার্য্য চলিতে থাকে, তখনকার সেই ভাবটি মনুষ্য-সমাজে দৃষ্ট হইলে তাহা বিশ্বব্যাপী প্রেম বলিয়া উক্ত হয়। এই ছয়টি ধাপের আদিতে জীবগণের বাসোপযোগী পৃথিবী সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য একটি যাহা অব্যক্ত রূপে বর্ত্তমান ছিল, তাহা প্রথম সপ্তকের আদিসুর এবং তাহার অন্তে পৃথিবীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিটি দ্বিতীয় সপ্তকের আদিসুর।

পৃথিবীর সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিটি সৌরজগতের সহিত সামঞ্জস্য-সাপেক্ষ, তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যটি মূলগত ঐক্য-সাপেক্ষ, এজন্য বলা যাইতে পারে যে তাহা সাম্য-প্রধানও নহে বৈষম্য-প্রধানও নহে, পরন্তু তাহা দুয়ের মাঝা-মাঝি। অতঃপর দ্বিতীয় সপ্তকের অবশিষ্ট ছয়টি ধাপ প্রদর্শিত হইতেছে।

পৃথিবীর যে অবস্থায় বৈষম্যের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া তাহার পরমাণু-সকল বিক্ষেপ-শক্তি-দ্বারা দূরে দূরে প্রসারিত হয়, তাহাই তাহার উন্নতি সপ্তকের প্রথম ধাপ। তাহার পরে যখন রাসায়নিক আকর্ষণ-বশে তাহার আগ্নেয় ভাব অভিব্যক্ত হয়,

সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের দ্বিতীয় ধাপ। তাহার পরে সেই আগ্নেয় পিণ্ড যখন জল-রাশি দ্বারা পরিবৃত হয়, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের তৃতীয় ধাপ; তাহার পর বায়ু হইতে অঙ্গারাদির মূল-উপকরণ-সকল পৃথক্-কৃত হইয়া যখন নানাবিধ ভূস্তর সংগঠিত হইতে থাকে, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের চতুর্থ ধাপ; পৃথিবীর বায়বীয় অবস্থাতে বিক্ষেপ শক্তি, আগ্নেয় অবস্থাতে রাসায়নিক আকর্ষণ, জলীয় অবস্থাতে ভারাকর্ষণ, এবং মৃত্তিকাদির স্তর-নির্ম্মাণাবস্থাতে যোগাকর্ষণ বিশিষ্ট রূপে কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার পর যখন পৃথিবীর জল বায়ু মৃত্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি উচ্চ নীচ সমস্তের যাহার যে অধিকার তাহা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে আনীত হয়, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের পঞ্চম ধাপ; এবং তাহার পরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তুষারখণ্ড জলে ভাষমান হইয়া সমুদ্র তলস্থিত উচ্চ নীচ ভূমি সকল মাজিয়া ঘসিয়া সমান করিয়া ফেলে; এবং কালে সেই-সকল ভূমি জলরাশি ভেদ করিয়া ভূলোকের আলোকে সমুত্থিত হয়, তখন তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হয়, সেই তাহার উন্নতি-সপ্তকের চরম ধাপ; এক দিকে এই যেমন ভৌতিক সৃষ্টি আর এক দিকে তেমনি অচেতন সচেতন জীবসৃষ্টি, উভয়ই পাশাপাশি উন্নতি-সোপান অবলম্বন করিয়া উচ্চ উচ্চ ধাপে আরোহণ করে।

এখন অবধি সপ্তকের উপমা-অনুসারে উন্নতি সোপানের এক একটি ধাপকে এক একটি সুর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। সপ্তকের সুর-পরম্পরা এইরূপ একটি সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে যে, পরপরবর্ত্তী সুরের ভবিতব্যতা পূর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী সুরে বীজরূপে অবস্থিতি করে। যাহা কিছু আছে সমস্তটিকে যদি একটি সপ্তক বলিয়া ধরা যায়, তবে দাঁড়ায় এই যে তাহার প্রথম সুর (সা। পরমাত্মা এবং অন্তিম সুর (সা) মনুষ্য। মনুষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—জীবজন্তু। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে মনুষ্যের ভবিতব্যতা জীবজন্তুগণের ভিতরে বীজ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। জীবজন্তুগণের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—উদ্ভিদ। এক ত এই দেখা যায় যে জীবগণের যাহা কিছু মুখ্য প্রয়োজন সমস্তই কোথাও বা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোথাও বা পরোক্ষ সম্বন্ধে উদ্ভিদরাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে আবার জীবোৎপত্তির পূর্ব্বে জীবগণের সমস্ত গঠনোপকরণ উদ্ভিদ-জগতের মধ্যেই পরিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—ধাতু, ধাতু—অর্থাৎ রাসায়নিক মূল পদার্থ। ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—আদিম পৃথিবী; আদিম কালের বাষ্পভূত পৃথিবীতে সকল ধাতুই একাকার অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। আদিম পৃথিবীর পূর্ব্ববর্ত্তী সুর—জ্যোতিষ্ক জগৎ; তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী সুর নৈহারিক Nebular জগৎ। সর্ব্বসমেত এইরূপ

নৈহারিক জগৎ
জ্যোতিষ্কজগৎ
পৃথিবী

ধাতু
উদ্ভিদ
জীবজন্তু
মনুষ্য

এই মূল সপ্তকের প্রতি প্রণিধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সকলের মধ্যে সাম্য ভাব যেটি তাহা বস্তুগত এবং বৈষম্য ভাব যেটি তাহা আকারগত এবং গুণগত। মনুষ্যের সমস্ত উপকরণ জীব-জগতে, জীব-জগতের সমস্ত উপকরণ উদ্ভিদ জগতে, এইরূপ করিয়া নৈহারিক জগৎ পর্য্যন্ত উঠিলে শেষোক্তে সর্ব্বজগতের সমস্ত উপকরণই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি মনুষ্যে নিকৃষ্ট জীবে, নিকৃষ্ট জীবে উদ্ভিদে, উদ্ভিদে ধাতুতে, ধাতুতে আদিম পৃথিবীতে, আদিম পৃথিবীতে তৎপূর্ব্বের জ্যোতিষ্ক জগতে, জ্যোতিষ্ক জগতে নৈহারিক জগতে, অলঙ্ঘনীয় প্রভেদ বিদ্যমান। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে কার্য্য এবং কারণের মধ্যে যেমন বস্তুগত সাম্য তেমনি গুণগত বৈষম্য উভয়ই থাকিতে চায়। কোন একটি সুর ধরিয়া তাহার পূর্ব্ব সুরে উঠিতে হইলে বৈষম্য অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনই তাহা সম্ভবে না; মনুষ্য হইতে জীব-জগতে যাও একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে গিয়া পড়িবে; জীব হইতে উদ্ভিদরাজ্যে যাও সেখানেও ঐরূপ; সমস্ত জগতের লয়-স্থান স্বরূপ সেই যে আদিম নৈহারিক জড় জগৎ যাহার একমাত্র গুণ কেবল জড়ত্ব তাহার সম্বন্ধেও ঐরূপ; অর্থাৎ যেমন মনুষ্যের গুণ হইতে জীবের গুণ ভিন্ন, জীবের গুণ হইতে উদ্ভিদের গুণ ভিন্ন, সেইরূপ আমরা যেখানে সকল জগতের গুণ জড়তারূপ একটি মাত্র গুণে পর্য্যবসিত হয় সেখান হইতে আর এক ধাপ উপরে উঠিতে হইলে জড়তা-গুণ-হইতে ভিন্ন আরেক প্রকার গুণ মানিতেই হয়; জড়তা কি? না অজ্ঞান; যাহা অজ্ঞান হইতে ভিন্ন তাহা অবশ্য জ্ঞান; অতএব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই সকল জগতের আদি সুর।

সামুদ্রানুমিতিবিদ্যা।

দ্বিতীয় ভাগ ১১ সংখ্যা ভারতীর ৫০৩ পৃষ্ঠার পর।

একজন বিদেশীয় বহুদর্শী পুরুষ বলিয়া গিয়াছেন, "মনুষ্যের মুখ, মনুষ্যের চরিত্রের সূচীপত্র।" দেশীয় পণ্ডিতদিগেরও বিশ্বাস ছিল "কিমিহ ন ভাসতে মুখে?" মুখে কি না প্রকাশ পায়? অন্তরস্থ সারল্য কৌটিল্য সমস্তই প্রকাশ পায়।"

মুখ দেখিয়া চরিত্রাদি অনুমান করা যায়, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া এদেশের

পুরাতন সামুদ্রিকেরা যেরূপ যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অনেকাংশই পাঠকগণের গোচর করা হইয়াছে। এবারে অন্যান্য অবয়বের কথা বলিব এবং উত্তমাঙ্গের কথা কিছু বলিব।

মূর্দ্ধা—মাথার উপরিভাগ।

মূর্দ্ধা বা মস্তকের গঠন সকলের সমান নহে। সকলের রুচিও সমান নহে। মস্তকের সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির কোন যোগ আছে তন্নিমিত্তই মস্তকের গঠন দেখিয়া তদন্তর্বাসী মানব স্বভাব অনুমান করা যায়, ইহা সামুদ্রিকেরা বিশ্বাস করিতেন। তাহাদের পরীক্ষা বা বিশ্বাস অনুসারে লিখিত সিদ্ধান্ত এই যে, মনুষ্য অসংখ্য সুতরাং মস্তকের গঠনও অসংখ্য প্রকার সত্য; কিন্তু সাধারণ পক্ষ বিবেচনা করিলে মাথার গঠন অষ্ট প্রকার। পরিমণ্ডল, ছত্রাকার, চিপীট, করোটি, ঘট, দ্বিমস্তক, নিম্ন ও বহুনিম্ন। প্রধান কল্পে এই (৮) আট শ্রেণীর মস্তক; ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণীর সংক্ষেপ ফলাফল এই—

পরিমণ্ডলৈর্গবাঢ্যাশ্ছত্রাকারৈঃ শিরোভিরবনীশাঃ।

চিপীটৈঃ পিতৃমাতৃস্বা করোটিশিরসাং চিরায়ুষ্যাঃ।"

পরিমণ্ডল—অর্থাৎ গোল। যাহাদের মস্তক গোলাকৃতি তাহারা গবাঢ্য অর্থাৎ পশুভাগ্যসম্পন্ন ধনী হয়।

প্রাচীন কালে গো, মেষ, ছাগ, প্রভৃতি পশুবর্গই এদেশের ধন ছিল, সুতরাং তৎকালের ধনীতে আর এ কালের ধনীতে কিছু প্রভেদ আছে, থাকিলেও হানি নাই; যেহেতু ফল সমান। অতএব উক্ত বচন অনুসারে আমরা বলিতে পারিতেছি যে পরিমণ্ডল-মস্তক পুরুষেরা ধনী হয়। ধনী হয় কি? না তাহাদের ধনবুদ্ধি কিছু সাধারণাপেক্ষা বিশেষ থাকে।

ছত্রাকার—ছত্রাকার মস্তক কিরূপ? তাহা তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, যাঁহারা পুরাতন কালের ছত্র দেখিয়াছেন। এখন আর সে কালের ছাতা নাই, কি দেখাইয়া গঠনটী অনুভব করাইব? অগত্যা ভেকছত্র অর্থাৎ বেঙের ছাতা মনে কর। যাহাদের মস্তক তত্তুল্য গঠনসম্পন্ন তাঁহারা অবনীশ অর্থাৎ রাজা। রাজা কি সত্য সত্যই রাজা? তাহা নহে। রাজার ন্যায় সুখবুদ্ধি বা সুখী হয়।

চিপীট—চিঁড়ে। যাহাদের মস্তক চিঁড়ের মত চাপ্‌টা তাহারা পিতৃমাতৃস্বা, অর্থাৎ নিষ্ঠুর। কোন প্রকার বল থাকিলে চাপ্‌টা মাথার লোকদিগের নিষ্ঠুরতা কার্য্যে পরিণত হয়, বল না থাকিলে তাহা অন্তরে অন্তরে সঞ্চরণ করে মাত্র।

করোটি—মড়ার মাথার খুলি। মাথাটী যদি জীবন্ত অবস্থাতেও খুলি খানির মত হয় তাহা হইলে সে দীর্ঘায়ু হয়।

"ঘটমূর্দ্ধা ধানকৃচির্দ্বিমস্তকঃ পাপকৃদ্ধনৈস্ত্যক্তঃ।

নিম্নস্তু শিরোমহতাং বহুনিম্নমনর্থদং ভবতি।

"একটা ঘট উপুড় করিয়া রাখিলে যেরূপ দেখা যায়, যাহার মস্তকের গঠন তদ্রূপ, তিনি "ঘটমূর্দ্ধা।" এই ঘটমূর্দ্ধা ব্যক্তিরা চিন্তাশীল; কোন না কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। [যদি "ধ্যান-রুচি" এমন পাঠ হয় তবে তাহার অর্থ শব্দ-রুচি। তাহারা শব্দ শুনিতে ভাল বাসে; অথবা সঙ্গীত শুনিতে ভাল বাসে]

দ্বিমস্তক—কপাল ও মূর্দ্ধা যেন যোড়া, যেন দুই খানা আলাদিদা। অর্থাৎ কপালের উপরে ও শিখা স্থানের নিম্নে একটী "খাক" থাকিলে তাহাকে দ্বিমস্তক বলা যায়। এই দ্বিমস্তক পুরুষ মাত্রেই পাপকৃৎ অর্থাৎ পাপমতি ও অন্তঃকুটিল। এরূপ ব্যক্তিরা কোন ক্রমেই ধনশালী হইতে পারে না।

নিম্ন—মাথার উপরি ভাগটা যুবতীর স্তনতুল্য উচ্চ না হইলেই তাহা নিম্নমস্তক। টিপি না থাকিলে ও সমোচ্চ সমতল সমগোল হইলেও নিম্ন শ্রেণীতে যাইবেক। এরূপ নিম্ন মস্তক মহৎ ব্যক্তিদেরই হইয়া থাকে। অর্থাৎ নিম্ন মস্তক দেখিলে তাহার অন্তরে যেন না কোন মহত্ব থাকা অনুমিত হইবেক।

বহু নিম্ন—মস্তকের তালু উচ্চ এবং পশ্চাদ্ভাগও উচ্চ; মধ্য ভাগ তাহার সমান নহে অর্থাৎ "খাল" থাকিলে তাদৃশ মস্তকের নাম "বহুনিম্ন।" বহুনিম্ন মস্তক হইলে অনেকবিধ অনর্থ আনয়ন করে। অর্থ এই যে, যাহাদের মস্তক বহু নিম্ন তাহাদের বুদ্ধি অতীক্ষ্ণ ও অপরিস্কৃত। তাহারা সকল কাজেই অনর্থ ঘটায়। (অসার বুদ্ধি বলিলেও বলা যায়)।

হাস্য ও রোদন।

হাস্য ও রোদনের সহিত অন্তরের অতি নিকট সম্বন্ধ। অন্তরের ভাব অনুসারেই হাস্যের প্রবৃত্তি; অন্তরের ভাব অনুসারেই রোদনের উৎপত্তি। সদাঃপ্রসূত অবস্থা হইতেই এই দুইটী প্রতিফলে উদ্ভূত হইতেছে; এজন্য হাস্যের ভঙ্গী ও রোদনের ভঙ্গী এক এক জনের এক এক প্রকার স্বভাবভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলের মনে সমান ভাবে সুখ দুঃখ বিদ্বিত হয় না; একারণ সকলের হাসি কান্না সমান স্বভাবের নহে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, সামুদ্রিকেরা হাসি কান্নাকেও চরিত্রানুযায়ক বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বিশ্বাস ও পরীক্ষালব্ধ প্রাথিক ফল অনুসারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই:—

"রুদিতমদীনমনক্ষস্নিগ্ধক শুভাবহং মনুষ্যানাম।

রুক্ষং দীনং প্রচুরাক্ষ তৈব ন শুভপ্রদং পুংসাম্"।

যাহাদের রোদনকালে অত্যল্প মাত্র অশ্রু বিসর্জিত হয়, চক্ষুতে দীনতা লক্ষ্য হয় না, স্নিগ্ধদৃশ্য হইয়া দাড়ায়; তাহাদের সে রোদন শুভ। অর্থাৎ এরূপ ভাবের রোদমান-স্বভাবেরা অতি ধীরান্তঃকরণের লোক। আর যাঁহাদের রোদনে প্রচুরতর অশ্রু আবর্জিত হয়, নেত্রে দৈন্য অবলম্বন করে এবং রুক্ষ দৃশ্য হইয়া দাড়ায় তাঁহাদের

সে রোদন শুভপ্রদ নহে। অর্থাৎ তাঁহারা লঘুচিত্তের শ্রেণীর লোক।

"হসিতং শুভদমকম্পং সনিমীলিত লোচনঞ্চ পাপস্য।

হৃষ্টস্য হসিতমসকৃৎ সোন্মাদস্যাসকৃৎ প্রান্তে।

অকম্পহাস্য শুভপ্রদ আর যাঁহারা নিমীলিত লোচনে (চোক বুঁজিয়ে) হাসেন, তাঁহারা নিশ্চিত পাপী। তাঁহাদের হৃদয় দুরভিসন্ধিতে পরিপূর্ণ। যাঁহারা বার বার হাসেন, সর্ব্বদাই হাসেন, তাঁহারা হৃষ্ট স্বভাবের লোক। সন্তোষ তাঁহাদেরই দাস। যদিও বায়ুরোগী অর্থাৎ পাগলেরা সর্ব্বদা হাসে সত্য; তথাপি পাগলের হাসিতে ও হৃষ্টস্বভাবদিগের হাসিতে একটু প্রভেদ আছে। "সোন্মাদস্যাসকৃৎ প্রান্তে" উন্মাদের সার্ব্বকালিক হাস্য প্রান্তে ওষ্ঠের প্রান্তে অর্থাৎ সে হাসি ফাঁকা হাসি।

"চাউনি দেখিলেও লোকের অন্তর জানা যায়। অন্তঃস্বভাবের সহিত দৃষ্টির (চাউনির) সংযোগ থাকা সকলই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। চক্ষুর গঠনভঙ্গী, চরিত্রের অনুমাপক, ইহা গত দ্বিতীয় সংখ্যক ভারতীতে প্রকাশ করা গিয়াছে. এবারে দৃষ্টির বিষয় বলা যাউক।

সামুদ্রিকানুমিতিবিদ্যার মতে, মনুষ্যের দৃষ্টি (চাউনি) ছয় প্রকার। স্থূল দৃষ্টি, দীন দৃষ্টি, স্নিগ্ধ দৃষ্টি, অনিমেষ দৃষ্টি, ও কুঞ্চিত দৃষ্টি।"

স্থূল দৃষ্টি—পরিষ্কার তরল দৃষ্টিকে স্থূল দৃষ্টি বলে। কোন বস্তু দর্শন কালে ভ্রুযুগ কুঞ্চিত হয় না; নেত্রছদ বিক্ষিপ্ত হয় না, সংযোগ মাত্রেই যেন দেখা শেষ হইয়াছে এবং নিমেষপাত না হইতেই যেন দৃষ্টি দৃশ্য বস্তুর অন্তর ভেদ করিয়া আসিয়াছে। এরূপ দৃষ্টিকে 'পরিষ্কার তরল' বলা যাইতে পারে। 'মন্ত্রিত্বং স্থূলদৃশাং' এই পরিষ্কার তরল দৃষ্টির পুরুষেরা মন্ত্রী হয় অর্থাৎ ইহাদের মন্ত্রণাশক্তি প্রবল *।

দীন দৃষ্টি—দীন দৃষ্টি কি? তাহা সকলেই অনুভব করিতে সমর্থ। দীন দৃষ্টি দরিদ্রতার চিহ্ন।

স্নিগ্ধ দৃষ্টি—স্নিগ্ধ দৃষ্টিও সহজবোধ্য। বিপুল ভোগশালী ব্যক্তিদেরই দৃষ্টি স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয়। 'স্নিগ্ধা বিপুলার্থভোগবতাম্' ইত্যাদি সামুদ্রিক শাস্ত্রের বাক্যগুলি উদ্ধৃত না করিলেও ক্ষতি নাই।

সনিমেষ দৃষ্টি—সনিমেষ দৃষ্টি কাহাকে বলে, তাহা আমরা ঠিক অবগত নহি। বোধ হয় মিট্ মিটে চাউনিকেই সামুদ্রিকেরা সনিমেষ দৃষ্টি বলিয়াছেন। মিট্ মিটে দৃষ্টিতে ঘন ঘন পলক পড়ে, সুতরাং তাহা সনিমেষ।

ধূর্ত্তাঃ সনিমেষদৃষ্টয়ঃ
সাভিপ্রায়াঃস্যুঃকুঞ্চিতদৃষ্টয়ঃ।"

সনিমেষ দৃষ্টি স্বভাবের পুরুষেরা প্রায়ই ধূর্ত্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের মন সরলধর্ম্মী নহে। কুঞ্চিতদৃষ্টি পুরুষেরাও সরল না হইতে পারে, হইতেও পারে, পরন্তু তাহা-

* যখন বার বার পুরুষের উল্লেখ করিতেছি তখন পাঠকগণ অবশ্য বুঝিবেন যে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে স্বতন্ত্র লক্ষণ বলিব।

দের অন্তরে কোনও না কোন অভিসন্ধি জাগরূক থাকে।

কুঞ্চিতদৃষ্টি কিরূপ? ইহাও ঠিক বুঝা যায় না। বোধকরি, যাঁহারা শ্রোতার মুখপানে চেয়ে কথা কন না, চক্ষু অন্যদিকে বাঁকাইয়া বাক্যালাপ করেন, অথবা যেন ঘোরতর চক্ষুলজ্জা, কিংবা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার কালে চক্ষু ছোট হইয়া যায়, কি চক্ষুতে চক্ষুতে সংযোগ হইলে কুঁচ্‌ড়ে আইসে, এরূপ কোন দৃষ্টির নাম কুঞ্চিত দৃষ্টি। এই কুঞ্চিত দৃষ্টির লোকেরা বিনা অভিপ্রায়ে, বিনা অভিসন্ধিতে কাহারও সঙ্গে কোন কথা কহেন না, সুতরাং ইহারা "সাভিপ্রায়াঃ *।"

এস্থলে একটী গল্প স্মরণ হইল। আমরা কিম্বদন্তীক্রমে শুনিয়াছি যে, ইয়ুরোপে যখন ফিজিয়গ্‌নমী বিদ্যার বহুতর বিস্তার দাস উৎপন্ন হইয়াছিল, মহাত্মা সক্রেটীস্ যখন সে দেশ উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, তখন, সক্রেটীসের এক দল শিষ্য পরস্পর পরামর্শ করিল যে, "চল, অমুকের নিকট আমরা আমাদের গুরুকে লইয়া যাই, দেখা যাউক, উহারা কে কি বলে।"

পরামর্শান্তে তাহারা পরামর্শের অনুরূপ কার্য্যই করিল, সক্রেটীস্ শিষ্যমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ফিজিয়গনমীর আলোচনা সভায় উপনীত হইলেন। সভ্যেরা তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে এক জন বলিয়া উঠিল, "এই সক্রেটীসের মনে অনেক পাপ আছে। ইনি কামুক, ইনি পরনিন্দাপ্রিয়, ইনি লুব্ধস্বভাব।

শুনিয়া সক্রেটীসের শিষ্যেরা হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল, বলিল, সক্রেটীসের মনে পাপ? তোমাদের সর্ব্বৈব মিথ্যা, সমস্তই ভণ্ডামি।"

এই সময়ে সক্রেটীস্ অতি গভীর ভাবে ও অতিধীরতার সহিত শিষ্যদিগকে আহ্বান করিলেন, "তোমরা উপহাস কর কেন? মিথ্যা বলেন নাই, সত্যই বলিয়াছেন। যাহা যাহা বলিয়াছেন সমুদায়ই সত্য। আমার মনে উল্লিখিত পাপ-প্রবৃত্তি সকল উদিত হইয়া থাকে পরন্তু আমি তাহা জ্ঞানবলে ও অভ্যাসবলে দমন করিয়া থাকি।"

ক্রমশঃ

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

* আমরা যে হঠাৎ সামুদ্রিকানুমিতি বিদ্যা অনুবাদ করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিতেছি ইহা আমাদের পক্ষে অন্যায় কার্য্য। কেন না আমরা এবিদ্যা গুরুর নিকট শিক্ষা করি নাই। এরূপ বিষয় শিখিতে হয়, না শিখিলে কোন ক্রমেই এরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না। এই যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অবয়ব ভঙ্গী উত্থিত হইতেছে এ সকল না চিনিতে পারিলে সামুদ্রিক শাস্ত্রের উপর সত্য মিথ্যা কোন পক্ষই স্থাপন করা যায় না। তবে যে আমরা লিখিতেছি সে কেবল দেখাইবার জন্য এরূপ শাস্ত্র ও আমাদের আছে, কেবল ইহাই দেখান আমাদের উদ্দেশ্য।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

তৃতীয় ভাগ ১ সংখ্যা ভারতীর ৪৮ পৃষ্ঠার পর।

এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক লেগেছিল। যারা ব্রিন্দিশি পথ দিয়ে ইংলণ্ডে যায় তাদের জাহাজ থেকে নেবে সুয়েজে রেলোয়ের গাড়িতে উঠে আলেক্‌জান্দ্রিয়াতে যেতে হয়; আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দরে তাদের জন্যে একটা ষ্টীমার অপেক্ষা করে—সেই ষ্টীমারে চোড়ে ভূমধ্য-সাগর পার হোয়ে ইটালীতে পৌঁছিতে হয়। আমরা over-land যাত্রী, সুতরাং আমাদের সুয়েজে নাব্‌তে হোল। আমরা তিন জন বাঙ্গালী ও এক জন ইংরাজ একখানি আরব নৌকা ভাড়া কর্‌লেম। মানুষের "divine" মুখশ্রী কতদূর পশুত্বের দিকে নাব্‌তে পারে, তা' সেই নৌকোর মাঝিটার মুখ দেখ্‌লে জান্‌তে পার্‌তে। তার চোক দুটো যেন বাঘের মত। কালো-কুচ্‌কুচে রং। কপাল নীচু। ঠোঁট পুরু। সবশুদ্ধ মুখের ভাব অতি-ভয়ানক। অন্যান্য নৌকোর সঙ্গে দরে বোন্‌ল না, সে একটু কম দামে নিয়ে যেতে রাজি হোল। ব—মহাশয় ত সে নৌকোয় বড় সহজে যেতে রাজি নন; তিনি বোল্লেন আরবদের বিশ্বাস কর্‌তে নেই—ওরা অনায়াসে গলায় ছুরি দিতে পারে। তিনি সুয়েজের দুই একটা ভয়ানক ভয়ানক অরাজকতার গল্প কোর্‌লেন। কিন্তু যাহোক্, আমরা সেই নৌকোয় ত উঠলেম। মাঝিরা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ইংরিজি কয়, ও অল্প অল্প ইংরিজি বুঝ্‌তে পারে। আমরা ত কতক দূর নির্ব্বিবাদে গেলেম। আমাদের ইংরাজ যাত্রীটির সুয়েজের পোষ্টআপিসে নাব্‌বার দরকার ছিল। পোষ্ট-আফিস অনেক দূর, এবং যেতে অনেক বিলম্ব হবে, তাই মাঝিটি একটু আপত্তি কোর্‌লে; কিন্তু শীঘ্রই সে আপত্তি ভঞ্জন হোল। তার পরে আবার কিছু দূরে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা কোল্লে "পোষ্ট-অফিসে যেতে হবে কি? সে দুই এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া অসম্ভব"—আমাদেরকক্ষ-স্বভাব সাহেবটি মহা খাপা হোয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "your grand mother" এইতো আমাদের মাঝি রুখে উঠ্‌লেন, "What? mother? mother? what mother dont say mother' আমরা মনে করিলাম সে সাহেবটিকে ধরে বুঝি জলেই ফেলে দিলে, আবার জিজ্ঞাসা কোল্লে "what did say? (অর্থাৎ কি বল্লি?") আমরা রয়েছি বোলেই বোধ হয় সাহেব তাঁর রোখ ছাড়লেন না। আবার বল্লেন 'your grand mother' এইত আর রক্ষা নেই। মাঝিটা মহা তেড়ে উঠল। সাহেব গতিক ভাল নয় দেখে নরম হয়ে বল্লেন 'you don't

seem to understand what I say!' অর্থাৎ তিনি তখন grand mother বলাটা যে গালি নয় তাই প্রমাণ কোর্ত্তে ব্যস্ত। তখন সে মাঝিটা ইংরাজি ভাষা ছেড়ে ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "বস্—চুপ!' সাহেব থতমত খেয়ে চুপ করে গেলেন, আর তাঁর বাক্য স্ফূর্ত্তি হল না। আবার খানিক দূর গিয়ে সাহেব জিজ্ঞাসা কর্‌লেন "কতদূর বাকী আছে?" মাঝী অগ্নিশর্ম্মা হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "Two shillings give, nsk what distance" এই অপূর্ব্ব ইংরাজির ভাষান্তর হচ্চে "সবে দুশিলিং মাত্র ভাড়া দেবেন, তা আবার জিজ্ঞাসা করা হচ্চে কতদূর।" আমরা এই রকম বুঝে গেলেম যে, দুশিলিং ভাড়া দিলে সুয়েজ রাজ্যে এই রকম প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা আইনে নেই বুঝি! মাঝীটা যখন আমাদের এই রকম ধমক দিচ্চে, তখন অন্য অন্য দাঁড়িদের ভারি আমোদ বোধ হচ্চে, তারা ত পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কোরে মুচকি মুচকি হাসি আরম্ভ কোল্লে। মাঝি মহাশয়ের অপরিমিত বদ্‌মেজাজ দেখে তাদের হাসি সামলানো দায় হোয়ে উঠেছিল। এক দিকে মাঝি ধম্‌কাচ্চে, একদিকে দাঁড়ি-গুলো হাসি জুড়ে দিয়েছে, আমরা নিরুপায়, রাগে ও লজ্জায় পুড়্‌ছিলেম। মাঝিটার উপর প্রতিহিংসা তোল্‌বার আর কোন উপায় না দেখে আমরাও তিন জনে মিলে হাসি জুড়ে দিলেম—ও মনে মনে একটা সান্ত্বনা পেলেম যে 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে!' এরকম সুবুদ্ধি অনেক স্থলে দায়ে পড়ে খাটাতে হয়। মানে মানে সুয়েজ সহরে গিয়ে ত পৌঁছিলেম। আমার চক্ষে সুয়েজ সহরের সুন্দরত্ব এইটুকু লাগল যে, এর চেয়ে খারাপ সহর আমি আর দেখি নি। কিন্তু সুয়েজ সহর সম্বন্ধে আমার কিছু বল্‌বার অধিকার নাই, কারণ আমি সুয়েজের আধ মাইল জায়গার বেশী আর দেখি নি। সহরের চারি দিকে একবার প্রদক্ষিণ করবার বাসনা ছিল, কিন্তু আমার সহযাত্রীদের মধ্যে যারা পূর্ব্বে সুয়েজ দেখেছিলেন, তাঁরা বল্লেন, "এ পরিশ্রমে শ্রান্তি ও বিরক্তি ছাড়া অন্য কোন ফললাভের সম্ভাবনা নেই।" তাতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি কিন্তু শুন্‌লেম গাধায় চড়ে বেড়ান ছাড়া সহরে বেড়াবার আর কোন উপায় নেই। শুনে সহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কোমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এদেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, চালক যে দিকে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, গাধাটির সকল সময়ে সেদিকে যাবার ইচ্ছে হয় না; তাঁরো একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছে আছে; এই জন্যে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়, কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়। সুয়েজে এক প্রকার চক্ষুনা চোকের রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—রাস্তায় অমন শত শত লোকের চোখ ঐ রকম রোগগ্রস্ত দেখ্‌তে পাবে। এখানকার মাছিরা ঐ রোগ চারদিকে বিতরণ কোরে বেড়ায়। রোগ-গ্রস্ত চোখ থেকে

ঐ রোগের বীজ আহরণ করে তারা অরুণ্ণ চোখে গিয়ে বসে, এই রকমে চার দিকে ঐ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

সুয়েজে আমরা রেলোয়ে উঠ্‌লেম। এ রেল গাড়ির অনেক প্রকার রোগ আছে। প্রথমতঃ শোবার কোন বন্দবস্ত নেই, কেন না, বস্‌বার জায়গা-গুলি অংশে অংশে বিভক্ত, দ্বিতীয়তঃ এমন গজ-গামিনী রেল গাড়ি সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। দুর্ভাগ্য ক্রমেই বল, আর সৌভাগ্যক্রমেই বল, আমরা রাত্রের যাত্রী ছিলেম, দুর্ভাগ্য-ক্রমে এই জন্য, যে, সমস্ত রাত বোসে বো সেই কাটাতে হোয়েছিল, আর সৌভাগ্য ক্রমে এই জন্য, যে, আফ্রিকার সে অসহ্য রৌদ্র-তাপ ভোগ্ করতে হয় নি। সমস্ত রাত্রিই গাড়ি চোলেছে, দিনের বেলা যখন জেগে উঠ্‌লেম তখন দেখ্‌লেম ধূলোয় আমাদের কেবল গোর হয় নি, আর সব হয়েছে। চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জোমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধান চাস করা যায়। এই রকম ধূলোমাখা সন্ন্যাসীর বেশে আমরা অ্যালেকজান্দ্রিয়াতে গিয়ে পৌঁছলেম। রেলের লাইনের দুপারে—সবুজ শস্য-ক্ষেত্র। জায়গায় জায়গায় খেজুরের গাছে থোলো থোলো খেজুর ফলে রোয়েছে। মাঠের মাঝে মাঝে কুণ্ড। মাঝে মাঝে দুই একটা কোঠা বাড়ি—বাড়ি গুলো চৌকোনা, থাম নেই, বারান্দা নেই—সমস্ত-টাই দেয়ালের মত, সেই দেয়ালের মধ্যে মধ্যে দুই একটা জানলা। এই সকল কা-রণে বাড়ি গুলোর যেন শ্রী নেই। যাহোক্ আমি আগে আফ্রিকার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যে রকম অনুর্ব্বর মরুভূমি মনে কোরে রেখেছিলুম, চারদিক দেখে তা কিছুই মনে হোলনা। বরং চারদিককার সেই হরিৎক্ষেত্রের উপর, খেজুর-কুঞ্জের মধ্যে প্রভাতটি আমার অতি চমৎকার লেগেছিল। অ্যালেকজান্দ্রিয়া বন্দরে আমা-দের জন্যে "মঙ্গোলিয়া" ষ্টীমার অপেক্ষা কোর্‌ছিল। এইবার আমরা ভূমধ্যসাগরের বক্ষে আরোহণ কর্‌লেম, আমার একটু একটু শীত-শীত কোর্‌তে লাগ্‌ল। জাহাজে গিয়ে খুব ভাল কোরে স্নান কর্‌লেম, আ-মার তো হাড়ে হাড়ে ধূলো প্রবেশ কো-রেছিল। স্নান করার পর আলেকজান্দ্রিয়া সহর দেখ্‌তে গেলেম। জাহাজ থেকে ডাঙ্গা পর্য্যন্ত যাবার জন্যে একটা নৌকা ভাড়া কর্‌লেম। এখানকার একটা একটা মাঝী সার উইলিয়ম জোন্সের দ্বিতীয় সংস্করণ বল্লেই হয়। তারা গ্রীক, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইংরিজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলন-সই রকম কথা কইতে পারে। শুন্‌লেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তা ঘাটের নাম, সাইন্‌বোর্ডে দোকানগুলির আত্ম-পরিচয়, অধিকাংশই ফরাসী ভাষায় লেখা। অ্যালেকজান্দ্রিয়া সহরটি সমৃদ্ধি-শালী মনে হল। এখানে যে কত জাতের লোক ও কত জাতের দোকান বাজার আছে তার ঠিকানা নেই। রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাঁধানো—তাতে বেশ পরিষ্কার থাকে, কিন্তু গাড়ির শব্দ বড় বেশী রকম হয়।

খুব বড় বড় বাড়ি—বড় বড় দোকান, সহরটি খুব জম্‌কালো বটে। আলেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দর খুব প্রকাণ্ড। অসংখ্য অসংখ্য জাহাজ এখানে আশ্রয় পায়। ইয়ুরোপীয়, মুসলমান সকল প্রকার জাতিরই জাহাজ এ বন্দরে আছে, কেবল দুঃখের বিষয় হিন্দুদের জাহাজ নেই।

চার পাঁচ দিনে আমরা ইটালীতে গিয়ে পৌঁছলেম। তখন রাত্রি একটা দুটো হবে। গরম বিছানা ত্যাগ কোরে, জিনিষ পত্র নিয়ে আমরা জাহাজের ছাতে গিয়ে উঠ্‌লেম। জ্যোৎস্না রাত্রি, খুব শীত; আমার গায়ে বড় একটা গরম কাপড় ছিল না, তাই ভারি শীত কচ্ছিল। আমাদের সুমুখে নিস্তব্ধ সহর, বাড়ি গুলির জানেলা দরজা সমস্ত বন্ধ—সমস্ত নিদ্রামগ্ন। আমাদের যাত্রীদের মধ্যে ভারি গোল পোড়ে গেল, কখনো শুনি—ট্রেন পাওয়া যাবে, কখনো শুনি পাওয়া যাবে না। জিনিষ-পত্র গুলো নিয়ে কি করা যাবে ভেবে পাওয়া যায় না, জাহাজে থাক্‌ব কি বেরোবো কিছুই স্থির নেই। এক জন Italian officer এসে আমাদের গুণ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে—কিন্তু কেন গুণ্‌তে আরম্ভ কোর্‌লে তা' ভেবে পাওয়া গেল না, জাহাজের মধ্যে এই রকম একটা অস্ফুট জনশ্রুতি প্রচারিত হোল যে, এই গণনার সঙ্গে আর আমাদের ট্রেণে চড়ার সঙ্গে একটা বিশেষ যোগ আছে। কিন্তু সে রাত্রে মূলেই ট্রেন পাওয়া গেল না। শোনা গেল, তার পরদিন বেলা তিনটের আগে ট্রেন পাওয়া যাবে না। যাত্রীরা মহা বিরক্ত হোয়ে উঠ্‌ল। অবশেষে সে রাত্রে ব্রিন্দিশির হোটেলে আশ্রয় নিতে হোল।

এইত প্রথম য়ুরোপের মাটিতে আমার পা পড়্‌ল। জানোই ত আমি কি রকম কাল্পনিক, মনে কোরেছিলেম য়ুরোপে পৌঁছিয়েই কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সুমুখে খুলে যাবে, সে যে কি, তা' কল্পনাতেই থাকে, কথায় প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌ছি, কল্পনার সঙ্গে সত্য-রাজ্যের প্রায় বনে না। আমার স্বভাব দোষে অনেক জিনিষ ভাল কোরে ভোগ কর্‌তে পারি নে। কোন নূতন দেশে আস্‌বার আগেই আমি তাকে এমন নূতনতর মনে কোরে রাখি যে, এসে আর তা' নূতন বোলে মনেই হয় না; কোন মহান্ দৃশ্য দেখ্‌বার আগেই আমি তাকে এমন মহান্‌তর মনে কোরে রাখি যে, তা দেখে আর মহান্ বোলে মনে হয় না। ইউরোপ আমার তেমন নতুন মনে হয়নি শুনে সকলেই অবাক্!

আমরা রাত্রি তিনটের সময় ব্রিন্দিশির হোটেলে গিয়ে শুয়ে পোড়্‌লেম। সকালে একটা আধ-মরা ঘোড়া ও আধ-ভাঙ্গা গাড়ি চোড়ে সহর দেখ্‌তে বের হোলেম। সারথীর সঙ্গে আর গাড়ি ঘোড়ার সঙ্গে এমন অসামঞ্জস্য, যে কি বোল্‌ব! সারথীর বয়স চোদ্দ হবে—কিন্তু ঘোড়াটির বয়স পঞ্চাশ হবে—আর গাড়িটি পৌরাণিক যুগের মনে হোল। ছোট-খাটো সহর যেমন হোয়ে থাকে, ব্রিন্দিশিও তাই।

কতক গুলি কোঠা বাড়ি, দোকান বাজার, রাস্তাঘাট আছে, হাঁ কোরে দেখ্‌বার জিনিষ একটিও নেই। ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা কোরে ফির্‌চে, দু চার জন লোক মদের দোকানে বোসে গল্প-গুজব কোর্‌চে—দুচার জন রাস্তার কোনে দাঁড়িয়ে হাসি-তামাসা কোরচে, লোক জনেরা অতি নিশ্চিন্ত-মুখে গজেন্দ্র গমনে গমন কর্‌চে; যেন কারো কোন কাজ নেই, কারো কোন ভাবনা নেই —যেন সহর শুদ্ধ ছুটি। রাস্তায় বড় গাড়ি ঘোড়ার সমারোহ নেই,লোক জনের সমাগম নেই। আমরা খানিক দূর যেতেই রাস্তা থেকে এক জন ছোকরা আমাদের গাড়ি থামিয়ে হাতে একটা তরমুজ নিয়ে গাড়োয়ানের পাশে গিয়ে বোস্‌লে। ব—মহাশয় বোল্লেন, "বিনা আয়াসে এঁর কিছু রোজগার করবার বাসনা আছে;" তিনি এসে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেখিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, "ঐটে চর্চ্চ, ঐটে বাগান, ঐটে মাঠ," ইত্যাদি; তাতে যে আমাদের বিশেষ কিছু উপকার হয়েছিল তা নয়, তাঁর টীকাতে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হয় নি, আর, তাঁর টীকা না হলেও আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞানের ব্যাঘাত হোত না। তাঁকে কেউ আমাদের গাড়িতে উঠ্‌তে বলে নি, কেউ তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসাও করে নি, কিন্তু তবু এই অযাচিত অনুগ্রহের জন্যে তাঁর যাচঞা পূর্ণ কর্‌তে হোল। তারা আমাদের একটা ফলের বাগানে নিয়ে গেল। সেখানে যে কত প্রকার ফলের গাছ, তার সংখ্যা নেই। চারদিকে আঙ্গুরে আঙ্গুরে আচ্ছন্ন। থোলো থোলো আঙ্গুর ফোলে রয়েছে। দু রকম আঙ্গুর আছে—কালো আর সাদা। তার মধ্যে কালো গুলিই আমার বেশী মিষ্টি লাগ্‌ল। বড় বড় গাছে আপেল, পিচ প্রভৃতি অনেক প্রকার ফল ধোরে আছে। এক জন বুড়ি (বোধ হয় উদ্যান-পালিকা) কতকগুলি ফল ফুল নিয়ে উপস্থিত কোর্‌লে, আমরা সে দিকে বড় নজর কল্লেম না; কিন্তু ফল বিক্রয় করবার উপায় সে বিলক্ষণ জানে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াচ্চি, এমন সময়ে দেখি একটি সুন্দরী মেয়ে কতকগুলি ফল আর ফুলের তোড়া নিয়ে আমাদের সুমুখে হাজির হোল, তখন আর অগ্রাহ্য করবার সাধ্য রইল না।

ইটালির মেয়েদের বড় সুন্দর দেখ্‌তে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, কালো চোখ, আর মুখের গড়ন অতি চমৎকার। আমরা রাস্তায় ঘাটে কেবল ছোটলোকদের মেয়েদের দেখেছি মাত্র, কিন্তু তাদেরি এমন ভাল দেখ্‌তে যে কি বোল্‌ব।

তিনটের ট্রেনে আমরা ব্রিন্দিশি ছাড়লেম। রেলোয়ের পথের দুধারে আঙ্গুরের ক্ষেত্র, সে চমৎকার দেখ্‌তে। চারদিকের দৃশ্য এমন সুন্দর যে কি বোলব। পর্ব্বত, নদী, হ্রদ, কুটীর, ক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম প্রভৃতি যত কিছু কবির স্বপ্নের ধন, সমস্ত চারদিকে শোভা পাচ্চে। গাছ পালার মধ্যে থেকে যখন কোন একটি দূরস্থ নগর, তার

প্রাসাদ-চূড়া, তার চর্চ্চের শিখর, তার ছবির মত বাড়ি সি আস্তে আস্তে চোখে পড়ে লে লাগে। এক একটি দৃশ্য আমার এত ভাল লেগেছিল যে তা বর্ণনা কোর্‌তে আমার ইচ্ছে কোর্‌চে না। সন্ধ্যে বেলায় একটি পাহাড়ের নীচে অতি সুন্দর একটি হ্রদ দেখেছিলেম, তা আমি আমি ভুল্‌তে পার্‌ব না, তার চারদিকে গাছপালা, সন্ধ্যার ছায়া জলে পোড়েছে, সে অতি সুন্দর, তা আমি বর্ণনা কোর্‌তে চাইনে!

রেলোয়ে কোরে যেতে যেতে আমরা mont cenis এর বিখ্যাত tunnel দেখলেম। এই পর্ব্বতের এপাশ থেকে ফরাসীরা ওপাশ থেকে ইটালিয়নরা একসঙ্গে খুদ্‌তে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদ্‌তে খুদ্‌তে দুই দলী দল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখী-সমুখী উপস্থিত হয়। এই গুহা অতিক্রম কোর্‌তে রেল গাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগ্‌ল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিন রাত আলো জ্বালাই আছে, কেন না, এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা পর্ব্বত-গুহা ভেদ কোর্‌তে হয়—সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালী থেকে ফ্রান্স পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা—নির্ঝর, নদী, পর্ব্বত, গ্রাম, হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম—এই রাস্তাটুকু আমরা যেন একটি কাব্য পোড়তে পোড়তে গিয়েছিলেম। ৫ সকাল বেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌঁছলেম। কি জমকালো সহর! সেই অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যের মধ্যে গিয়ে পোড়লে অভিভূত হোয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরীব লোক নেই। আমার মনে হোল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কি আবশ্যক। একটা হোটেলে গেলেম, তার সমস্ত এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড, যে ঢিলে কাপড় পোরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলে থাকতে গেলেও আমার বোধহয় তেমনি অসোয়াস্তি হয়। একটা ঘরের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে যাই তার ঠিক নেই। স্মরণ-স্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে-বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জন-কোলাহল প্রভৃতি দেখে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌঁছিয়েই আমরা একটা "টার্কিষ্ বাথে" গেলেম। প্রথমতঃ আমরা একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বোস্‌লেম, সে ঘরে অনেক ক্ষণ থাক্‌তে থাক্‌তে কারো কারো ঘাম বেরোতে লাগ্‌ল, কিন্তু আমার ত বেরোল না, আমাকে তার চেয়ে আর একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের মত, চোক মেলে থাক্‌লে চোক জ্বালা কোর্‌তে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে আমার খুব ঘাম হোতে লাগ্‌ল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে—তার পরে ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্ব্বাঙ্গ ডল্‌তে লাগ্‌ল। তার সর্ব্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংস-পেশল চমৎকার শরীর আমি আর কখনো দেখিনি "বৃঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ"। আমি

মনে মনে ভাব্‌লেম, ক্ষীণকায় এই মৈশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোন আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বোল্লে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে—এখন পাশের দিকে বাড়্‌লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব। আধ ঘণ্টা ধোরে সে আমার সর্ব্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন কোল্লে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে আমি যত ধূলো মেখেছি, আমার শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। শরীরটিকে যথেষ্ট রূপে দলিত কোরে আমাকে আর একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ কোরে পরিষ্কার কোল্লে। পরিষ্করণ-পর্ব্ব শেষ হোলে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড় পিচ্‌কিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল—হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ কোরে বরফের মত ঠাণ্ডা জল বর্ষণ কোর্ত্তে লাগল—এই রকম কখনো ঠাণ্ডা কখন গরম জলে স্নান কোরে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম—তার উপর থেকে, নীচে থেকে, চার পাশ থেকে, জল বাণের মত গায়ে বিঁধ্‌তে থাকে—সেই বরফের মত ঠাণ্ডা বরুণ-বাণের-বর্ষণের মধ্যে খানিক ক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্য্যন্ত যেন জমাট হোয়ে গেল—রণে ভঙ্গ দিতে হোল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের মত আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা কোর্‌লে,—আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন; তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি কোরতে লাগল—দেখ, দেখ, এরা কি অদ্ভুত রকম কোরে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মত।" এতক্ষণে স্নান শেষ হোল। আমি দেখ্‌লেম, টার্কিষ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা! তার পরে সমস্ত দিনের জন্য এক পাউণ্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস্ এক্‌জিবিষণ দেখ্‌তে গেলেম। তুমি এইবার হয়ত খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া কোরেছ, ভাবছ আমি প্যারিস্ এক্‌জিবিষণের বিষয় কিনা জানি বর্ণনা কোরব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কি বলব, কলকাতার য়ুনিবর্সিটিতে বিদ্যা শেখার মত আমি প্যারিস এক্‌জিবিষণের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভাল কোরে দেখি নি। একদিনের বেশী আমাদের প্যারিসে থাকা হোল না—সে বৃহৎকাণ্ড একদিনে দেখা কারো সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখ্‌লেম—কিন্তু সে রকম দেখায়,দেখ্‌বার একটা তৃষ্ণা জন্মালো কিন্তু দেখা হোল না। সে একটা নগর বিশেষ। এক মাস থাক্‌লে তবে তা বর্ণনা কর্‌বার দুরাশা কর্‌তেম। প্যারিস এক্‌জিবিষণের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণতঃ মনে আছে যে, চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি—স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্ত্তি দেখেছি—নানা দেশ বিদেশের নানা জিনিষ দেখেছি; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর,

প্যারিস থেকে লণ্ডনে এলেম—এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখিনি—ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি, কোয়াসা, কাদা আর লোক জনের ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, এই হচ্চে লণ্ডনের যথা সর্ব্বস্ব। আমি দুই এক ঘণ্টা মাত্র লণ্ডনে ছিলেম—যখন লণ্ডন পরিত্যাগ করলেম, তখন নিশ্বাস পরিত্যাগ কোরে বাঁচলেম—আমার বন্ধুরা আমাকে বোল্লেন, লণ্ডনের সঙ্গে প্রথম-দৃষ্টিতেই ভালবাসা হয় না; কিছু দিন থেকে তাকে ভাল কোরে চিন্‌লে তবে লণ্ডনের মাধুর্য্য বোঝা যায়।

নন্দন-কাননে।

আমার হৃদয় কই হ'ল রে আমার—
পড়িয়ে যাতনা ঘোরে, বুঝালাম এত কোরে,
সাধিলাম, ফেলিলাম এত অশ্রুধার——
তবুও আমার হৃদি হ'ল না আমার!
দলিত মরম-মাঝে, যে প্রতিমা সদা রাজে
চাহিলাম অশ্রুজলে বিসর্জ্জিতে তায়—
তাহে যদি এ হৃদয়, ছিঁড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়,
বহুক শোণিত-স্রোত অজস্র ধারায়—
তাহে যদি এ সংসার, ধরে রে শ্মশানাকার,
জ্বলুক্ চিতার অগ্নি আকাশ ছাইয়ে।
গৃধিনীর ঘোর রবে, আকুলিত দিক্ সবে,
ছুটুক আলেয়া-আলো দিগন্ত ব্যাপিয়ে।
—হোক্ তা শ্মশান ক্ষেত্র, চমকি হেরিবে নেত্র,
বিভীষিকা সমাকীর্ণ সীমান্ত আবরি,
নাহি সূর্য্য নাহি চন্দ্র, আঁধারে নাহিক রন্ধ্র
ঘোরা দ্বিপ্রহরা অমা সমেঘ শর্ব্বরী—
যা হোক্ তা হোক্ ধরা, আমিত জীয়ন্তে মরা
আমার ত সব সাধ হোয়েছে নির্ব্বাণ,
আমার ত সুখ-আশা, আমার ত ভালবাসা
হ'য়েছে আমার তো রে সব অবসান।
শ্মশানে মশানে রই, সাগরে নিমগ্ন হই
প্রেম-সাধ, প্রাণ-সাধ সকলি ত গেছে।
অস্থি চর্ম্মময় কায়া, নাহি তাহে আর মায়া,
জীয়ন্তে শৃগাল-ভক্ষ্য হয়েই রয়েছে—

যখনি পরেরি করে,——মরম-বিশ্বাস-ভরে
হৃদয়ের সব ভার করিনু স্থাপন,
যখনি আপনা ভুলে, সোহাগের সাধ তুলে,
করিনু প্রেমের নদে আত্ম-বিসর্জ্জন,
যখনি পরেরি টানে, বাঁধিনু স্বাধীন প্রাণে
আমার আমিত্ব যবে হোল অবসান,
কেন না ভাবিনু তবে, এই জন্মে এই ভবে,
আমার সুখের সাধ হোল সমাধান।
কেন না ভাবিনু হায়, অধীরে উন্মত্ত প্রায়
বিলায়ে আপন ধন ভিক্ষা হবে সার—
উপস্থিত হোলে দ্বারে গর্ব্বিতের অহঙ্কারে
বিফলে ফেলিতে হবে নয়ন-আসার।
যারি মন তারি আছে, আমি গেলে তার কাছে
কেনই বা অকাতরে করিবে সে দান,

যার মন রবে তার, আমার কি অধিকার
আমি যে সোহাগ ভরে দেখাইব টান !
সোহাগে, যতনে বলে, অথবা কৌশল কলে
কভু কি পরের মন হয় রে আপন,
ভিক্ষা চাও ভিক্ষা পাবে,নহিলে কাঁদিতে হবে,
অধিক কাঁদিলে হবে বিরক্তি ভাজন।
ধন মান হারাইলে, যত্নে পুনঃ সব মিলে
সম্পদ-বিপদ-চক্র ঘোরে অনিবার।
কিন্তু রে পরেরি মন করিলেও প্রাণ পণ,
পুনঃ ফিরে নাহি আসে গেলে একবার।
—নাই বা পরেরি মন হোল রে আমারি ধন,
আমার হৃদয় কেন হোল রে তাহার,
বিচিত্র কল্পনা রঙ্গে ফিরিছে তাহারি সঙ্গে
আমার হইয়ে যেন নহে সে আমার।
যার হৃদি হোক তারি, জন্ম জন্ম থাক তারি
আমারি, আমার হৃদি না হইল কেন।
দুর্জ্জয় পরেরি টানে, ছুটিল আপন মনে,
অস্থি চর্ম্মময় আমি কেহ নই যেন।
তবে আর কেন মোরে,ফেলিতে যাতনা ঘোরে
আনিলে সুষমাময় নন্দন কাননে ?
ফুটুক কুসুম-রাশি, দশদিক্ পরকাশি,
দুলুক্ মাধবী-লতা মৃদুল পবনে,
গাহুক কোকিলে গান, পাপিয়া ধরুক তান,
বহুক অলস ভরে ধীর সমীরণ,
জ্বলুক্ তারকাদল আলো করি নভস্তল,
করুক্ পূর্ণিমা-শশি সুধা বরিষণ,
শোভার সুষমা আর নাহি লাগে মনে,
কেন গো আনিলে মিছে নন্দন-কাননে।

দেবি !
বরঞ্চ এমন স্থল নাহিকি ধরায় ?—
বিদীর্ণ অনল-গিরি, অগ্নি উদ্গীরণ করি
ছাইছে দিগন্ত ব্যাপি অনল শিখায়,
পিও পিও অগ্নি-পিও ভীষণ উচ্ছ্বাসে
মাতিয়ে চৌদিকে ধায়,শব্দে ব্যোম ফেটে যায়
লও ভণ্ড ঘোর কাণ্ড অবনী আকাশে।
—তাহাতে প্রলয় ঝড় !—গিরিশৃঙ্গ দড়বড়
আমূল কাঁপিছে গিরি কাঁপায়ে ধরায়,
শৈলখণ্ড চাপে চাপে উড়িছে ঝটিকা দাপে
পড়িছে—ছুটিছে পুনঃ কে জানে কোথায়,
অদূরে স্ফুরণা স্থলে, দাবানল ওঠে জ্বলে,
উচ্ছ্বাসি অনল শিখা নভস্তল ছায়।
অজগর ঊর্দ্ধশ্বাসে, চৌদিকে ছুটিছে ত্রাসে,
কেশরী ঊর্দ্ধ কেশরে গর্জ্জিয়ে পলায়।
থেকে থেকে ভূকম্পন হতেছে সঘনে,
বাসকি উঠেছে রেগে, জলধি উথলে বেগে
আলোড়িত বিশ্বকাণ্ড প্রলয় পীড়নে।
ধরাধর ধরাসাৎ, ঘন ঘন উল্কাপাত,
ধকধক ধূমকেতু জ্বলিছে আকাশে,
ব্রহ্মাণ্ড স্বকেন্দ্র-ছিন্ন—বিভীষিকা সমাচ্ছন্ন—
শশাঙ্ক গ্রাসিত পুনঃ কাল রাহু গ্রাসে !
থাকে যদি হেন স্থান, ছিঁড়িয়ে সকল টান,
অবাধে পশিব সেই ভয়াবহ স্থানে,
ভয়ের ভীষণ ভাবে, হৃদয় স্তম্ভিত হবে,
প্রেমের উচ্ছ্বাস আর মাতিবে না মনে,
সভয়ে নয়ন-ধারা, জমাট তুষার পারা,
নয়নে আটকি রবে, ঝরিবে না আর,
আমাতেই আমি রব,কারো পানে নাহি চাবো,
আমারি হৃদয় পুন হইবে আমার।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ভারত ভৈষজ্য তত্ত্ব।

দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত কর্ত্তৃক সংকলিত—চিকিৎসা তত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত।

এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থকার যেরূপ প্রভূত যত্ন ও গবেষণা সহকারে ভারতীয় গাছ গাছড়ার ও অন্যান্য দ্রব্যের গুণ নির্দ্দেশ ও রোগ বিশেষে তাহাদের ব্যবহার নির্দ্দেশ করিয়া সহজ-আকারে আয়ুর্ব্বেদকে জনসাধারণের করতলস্থ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।—এই রূপ উপযোগি পুস্তক সমূহের প্রচার ও আদর বঙ্গ-সাহিত্য পক্ষে একটি বিপুল আশার সোপান বলিতে হইবে।

কানন কথা। নাটক, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ তর্কচূড়ামণি কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা সত্য যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

পুস্তকখানির ইংরাজি ভূমিকাতেই লেখক বলিয়াছেন যে "আমার কানন-কথা নাটকাকারে না ছাপাইলেও ছাপাইতে পারিতাম; কিন্তু বিষয়টি উচ্চ পদবীগত নয় বলিয়াই নাটক-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছি।" কানন-কথা শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের কথা, সুতরাং এ বিষয়টিকে যে লেখক নিম্ন শ্রেণীগত মনে করেন ও নাটক রচনা তাহারি উপযুক্ত মাত্র বিবেচনা করেন, তাঁহার নাটক সম্ভবতঃ যে কি মেওয়া হইতে পারে তাহা বোধ হয় আর বলিবার আবশ্যক করে না।—বিরাধ রাক্ষস কর্ত্তৃক শ্রীরামচন্দ্র আহত হইলে সীতা এই বলিয়া কাঁদিতেছেন "হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি, রে বিধে, কেন আমার কমল প্রাণবল্লভকে হরণ করিলি! কেন আমার জীবন গেল না! হায়, পৃথিবি এত দিনে তুমি নিরাশ্রয় হইলে, হায় সত্য! আর কে তোমায় আশ্রয় করিবে"—ইত্যাদি।

মাসিক সমালোচক।—সর্ব্বশাস্ত্র বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচক, সম্পাদক শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা—বৈশাখ মাস। বহরমপুর অরুণোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা।

এই মাসিক পত্র খানিকে আমরা অতিশয় প্রীতির সহিত পাঠ করিলাম। "উত্তরে সখীর প্রতি" বলিয়া কবিতাটি যেমন সুন্দর হইয়াছে, "বাঙ্গলার বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ক প্রবন্ধটিও তেমনি সৎচিন্তা-মূলক হইয়াছে—অন্যান্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই।

ছিন্নমুকুল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ—মৃত্যু-শয্যা।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। সুশীলার আরোগ্য লাভের স্থিরতা নাই। তাঁহার পীড়া দু দিন হয় তো বাড়িয়া ওঠে আবার দুদিন যেন বেশ সারিয়া যায়। প্রমোদ আর কতদিন কলেজ কামাই করিয়া থাকিবেন, সম্মুখেই তাঁহার পরীক্ষা। কিছু দিন দেখিয়া দেখিয়া তিনিও কলিকাতা যাত্রা করিলেন। প্রমোদ কলিকাতায় যাইবার তিন চারি দিন পরে সুশীলার পীড়া আরো বৃদ্ধি হইল, তিন চারি দিনেই জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি হইল, ক্রমে বিকার হইয়া দাঁড়াইল। সুশীলা ক্রমাগত তাঁহার সম্মুখে সেই রাত্রের সেই মূর্ত্তিটী দেখিতে লাগিলেন, সেই দিনকার সেই গীতটি তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল—ক্রমাগত যেন তিনি শুনিতে লাগিলেন,

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা
জীবন ফুরায়ে এল আঁখি জল ফুরালো না।

কাছে কনক বসিয়াছিল,তাহাকে বলিলেন "কনক কি সুন্দর গান! আহা ঐ গানটি আমার স্বামীর, আমি গানটি জানি" বলিতে বলিতে সুশীলার চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িয়া বালিস ভিজিয়া গেল। থাকিয়া থাকিয়া তিনি আবার বলিলেন "আহা ঐ গানটি এক দিন আমাকে গাহাবার নিমিত্ত স্বামী কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। পোড়া লজ্জা আসিয়া চাপিল কিছুতেই গাহিতে পারিলাম না। আজ কনক ঐ গানটি কে গাহিতেছে? ও গলা কার? সুশীলা সেই গলা চিনিবার জন্য মনোযোগ পূর্ব্বক কিছু ক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন,পরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না না চিনিতে পারিলাম না। তাঁহাকে চিনিয়াছি কিন্তু কে গাহিতেছে তার গলা চিনিতে পারিলাম না। কনক কে গাহিতেছে?"

কনক সুশীলার কথায় কাঁদিতেছিল, অশ্রু জল মুছিয়া বলিল "আমি কই কিছুই শুনিতে পাইতেছি না।

সু। "শুনিতে পাচ্ছিস না? ভাল করে শোন। কনক আহা কি গাচ্ছে"

এই সময় চিকিৎসক আসিলেন। সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, বুঝিলেন শীঘ্রই মৃত্যু হইবে, আর আশা নাই। তবু যদি কিছু করিতে পারেন ভাবিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বাহিরে গিয়া বসিলেন। বলিয়া গেলেন লক্ষণের কোন রূপ পরিবর্ত্তন হইলেই যেন তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হয়। চিকিৎসক চলিয়া গেলে সুশীলা কনককে জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কে? কেন আসিয়াছিল?" কনককে নিরুত্তর দেখিয়া সুশীলা আবার বলিলেন "কনক, ওই গানটি শুনে

আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, একি আমি কি আজ মরিব! ঐ শোন গাচ্ছে,

এই শেষ দিনে সখি সেই বুকে মাথা রাখি,
ঘুমায়ে পড়িব আহা তাও তো হোল না
কাঁদিতে কাঁদিতে ওরে চলিনু জন্মের তরে
না পুরিল অভাগীর অন্তিম বাসনা---

আমারি মনের মত গান কে গাচ্ছে? ঐ শোন ঐ শোন" এই সময় সহসা এক জন এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুশীলার মস্তকের দিকে দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া অমনি সুশীলা চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। আবার যখন চক্ষু খুলিলেন তখন তাঁহার যেন কিছু জ্ঞান হইয়াছে আর সে বিকারের ঘোর নাই, তিনি সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন মৃত্যুকালে এখন আমাকে দেখা দিলে "

" প্রাণেশ্বরী সুশীলা " কোন মুখে আর তোমার কাছে আসিব" বলিয়া দয়ানন্দ সুশীলার হস্ত আপন হস্তে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্বামীর পানে চাহিয়া স্বামীর হস্তে হস্ত রাখিয়া সুশীলা প্রাণত্যাগ করিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ—পূর্ব্ব-ঘটনা।

সুশীলা বিধবা বলিয়া পরিচিত, হঠাৎ কি করিয়া মৃত্যুকালে তাঁহার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন? এই স্থানে ইঁহাদের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কিছু বলা আবশ্যক। তারাকান্তের জ্যেষ্ঠা কন্যা চারুশীলাকে তাহার স্বামী বিবাহের পরই সেই যে পিত্রালয় হইতে লইয়া গিয়াছিলেন সেই অবধি আর তারাকান্তের নিকট পাঠান নাই। তাহাকে আনিবার কথা বলিলেই বিনোদলাল কোন না কোন ওজর করিতেন, আসল কথা চারুশীলাকে ছাড়িয়া তিনি এক দিনের জন্যও থাকিতে চাহিতেন না। তাহা দেখিয়া তারাকান্ত সুশীলার বিবাহ দিয়া ছোট জামাতাকে ঘর-জামাই করিয়া রাখিলেন। পুত্রাদি আর কেহই না থাকায় তাঁহার মনে হইল, তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় দুই কন্যাকে কাছ ছাড়া করিয়া তিনি কি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ বিবাহের অল্পদিন পরেই এ জামাতার স্বভাবে একটি বিলক্ষণ দোষ জন্মিল। দয়ানন্দ কি প্রকারে মদ্যপানে শিক্ষিত হইলেন। সুশীলা তাহাকে শোধরাইবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। একদিন কোথা হইতে দয়ানন্দ মদ খাইয়া গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে পুনরায় মদ আনিতে আদেশ করায় সুশীলা ভৃত্যকে বারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই মত্ত অবস্থায় অজ্ঞানে সুশীলাকে স্বামী মারিলেন। এই কথা কি করিয়া তারাকান্তের কর্ণে ওঠে। তিনি জামাতার আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে অনেক তিরস্কার করেন। দয়ানন্দ ইহাতে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন। ভাবিলেন তিনি শ্বশুরের ন্যায় ধনশালী হইলে, শ্বশুর ওরূপ করিয়া কখনই বলিতে পারিতেন না। তাহা হইলে দয়ানন্দ যাহা

ইচ্ছা করিতে পারিতেন, কিছুতেই তাঁহার উপর কেহ কথা কহিতে পারিত না। অপমানিত হইয়া সেই দিনই তিনি শ্বশুরালয় ত্যাগ করিলেন। তাহাতে সুশীলার অত্যন্ত মনস্তাপ হইল। যাইবার সময় স্বামী সুশীলাকে বলিলেন "সুশীলা, আমাদের বিবাহ অযোগ্য হইয়াছে আমরা সমকক্ষ নহি। আমি দরিদ্র, তুমি ধনবানের কন্যা। আমি চলিলাম, তুমি পিত্রালয়ে সুখে থাক" এই কথায় স্বামীর সমস্ত অসদ্ব্যবহার সুশীলা ভুলিয়া গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তুমি আমাকে ওকথা বলিতেছ কেন? তুমি দরিদ্র, তবে আমি কি? তবে আমিও কি দরিদ্র নহি? আমিও দরিদ্রের পত্নী। পিতার ধন আছে তাঁহারি থাক, তোমার সহিত আমি ভিক্ষা করিয়া জীবন কাটাইব, তোমার সহিত বনবাসেও আমার সুখ, আমাকে সঙ্গে লইয়া চল।" পত্নীর করুণ বাক্যে দয়ানন্দ যেন কিছু নরম হইলেন। কিন্তু শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিবেন এই যে তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প, তাহা কোন মতেই টলিল না। তিনি সেই দিনই তাহা ত্যাগ করিয়া গেলেন।

দিন যায় মাস যায়, দয়ানন্দের আর কোন খবর নাই, সুশীলা চাতকীর ন্যায় তাঁহার পত্রের জন্য হা-প্রত্যাশ করিয়া থাকেন, প্রত্যহই ভাবেন, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার পত্র পাইব, শেষে রাত্রি হইলে হতাশ হইয়া অশ্রুবারিতে মনের জ্বালা নিবারণ করেন। যদি এই দুঃখময় পৃথিবীতে ঈশ্বর আমাদের অশ্রুজল না দিতেন, জানিনা তাহা হইলে কি হইত। ক্রমে একবর্ষ দুইবর্ষ অতীত হইল, তবুও কোন সংবাদ নাই। অবশেষে তৃতীয় বৎসরের শেষে জনরবে শোনা গেল, দয়ানন্দের মৃত্যু হইয়াছে। শুনিলেন কলিকাতা হইতে জাহাজে উড়িষ্যা গমন করিতে ছিলেন, ঝড়ে জাহাজ ডুবি হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুনিয়া সুশীলা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তাহার পর হইতে সুশীলা বিধবার বেশ ধারণ করিলেন।

এদিকে দয়ানন্দ সেই যে শ্বশুরের উপর রাগ করিয়া জন্মের মত শ্বশুরবাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই অবধি আর সুশীলার সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি তারাকান্তের প্রতি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, যে আর কখনো তাঁহার বাটীতে আসিবেন না, তাঁহার কন্যাকে লইবেন না এইস্থির করিয়া, আপন মৃত্যু-সংবাদ রটনা করিয়া আর একটি কন্যার পাণিগ্রহণ পর্য্যন্ত করিলেন। তাহার গর্ভেই নীরজার জন্ম। কিন্তু কন্যার জন্মের কয় বৎসর পরে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর মৃত্যু হইল। এই ঘটনায় দয়ানন্দ সন্ন্যাসী হইয়া আপন সম্পত্তি বিক্রয় পূর্ব্বক যাহা কিছু সম্বল হইল, তাহা লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কানপুর অরণ্যে আসিয়া কন্যার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। অন্য সকল সংসার-সম্পর্ক ছাড়িয়া এখানে শাস্ত্র আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন।

এদিকে যত দিন যাইতে লাগিল ততই দয়ানন্দ তাঁহার শ্বশুরকৃত অপমান ভুলিয়া

যাইতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে তখন আবার সুশীলাকে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, কিন্তু কোন্ মুখে আর তখন দেখা করিতে আসেন? তাহাকে ত্যাগ করিয়া আবার বিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছেন, এখন তাহার নিকট কি করিয়া আসিবেন?

কিন্তু এইবার যখন নীরজাকে কলিকাতা হইতে লইয়া দয়ানন্দ কানপুর যাইতেছিলেন—এলাহাবাদে আসিয়া সুশীলার সংবাদ লইবার জন্য তাঁহার এত ইচ্ছা হইল—যে তিনি এলাহাবাদে নামিয়া, সেখানে দুদিন থাকিয়া লোকমুখে সুশীলার সমস্ত সংবাদ লইলেন। কিন্তু ইচ্ছা হইলেও লজ্জা বশতঃ দেখা করিতে কোন মতে পারিলেন না। এলাহাবাদে আসিয়া দয়ানন্দ প্রমোদের যথার্থ পরিচয় পাইলেন। তিনি সুশীলার বাড়ীর নিকট নদীতীরে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে দুদিন রহিলেন। এখানে আসিয়া নীরজা সেই আগেকার মত রাত্রি হইলেই নদীতীরে নদীতীরে ভ্রমণ করিত। সে দিন বৃষ্টির দিনেও নীরজা সন্ধ্যাকালে নদীতীরে ভ্রমণ করিতেছিল। সহসা বৃষ্টি আসায় সে নিকটস্থ অট্টালিকার প্রাচীর-নিম্নে আশ্রয় লইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সেই বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুৎ দেখিয়া নীরজার হৃদয় একটী অপূর্ব্ব ভাবে মুগ্ধ হইল। নীরজার প্রকৃতিই এমন উপাদানে গঠিত—যে মেঘের ডাকে, তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠিত, বিদ্যুৎ চমকিলে সে যেন তাহা ধরিবার আশায় ছুটোছুটি করিত, মুষলের ধারে বৃষ্টি পড়িলে সে তার সেই দেহখানি, নিবিড় জলদবৎ কুন্তলরাশি, সকলি ভিজাইয়া দয়ানন্দের তিরস্কারের পাত্র পর্য্যন্ত হইত। সে দিন সে আপন মনে সেই বৃষ্টির ঝন্ ঝন শব্দের সহিত আপন মধুর তান মিশাইতে লাগিল। ছেলেবেলা সে যখন একাকী, সেই কানপুরে বনে বনে বেড়াইতে বেড়াইতে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া গান গাহিত, সেইরূপ সে আজ ভিজিতে ভিজিতে গান গাহিতে লাগিল। অতীত কালের স্মৃতিতেই তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল—বর্ত্তমান তাহার নয়ন হইতে অপসৃত হইল। তাহারি গানে সে দিন কনক ও সুশীলা মুগ্ধ হইয়া ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহারি গান সুশীলার কর্ণে লাগিয়াছিল। এদিকে তাহার পিতা বাড়ী ফিরিয়া তাহাকে গৃহে না দেখিয়া নদীতীরে খুঁজিতে আসিলেন—এই সময় সহসা বিদ্যুতালোকে মুক্ত বাতায়নে তিনি সুশীলাকে দেখিতে পাইলেন। একবার দেখিয়া তাহার পরদিন তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা আরো প্রবল হইল, কিন্তু আর দেখিতে আসিতে পারিলেন না। সেই দিন হইতে তাঁর আর একটি ইচ্ছার সঞ্চার হইল। তাঁহার নীরজার সহিত প্রমোদের বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইল, সুশীলার পিতৃবংশ তাঁহার পিতৃবংশ এক করিতে তাঁহার অত্যন্ত আবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু দেখিলেন সে ইচ্ছা তাঁহার কখনই পূর্ণ হইবে না। যামিনী নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে, যামিনীকে তিনি জামাতা করিবেন বলিয়া শেষ কালে এক রকম

কথা দিয়াছেন। এখন অন্য কোন কথা মনে আনাই অন্যায়—সুতরাং তিনি আর তাঁহার সে ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিলেন না। পরদিনই দয়ানন্দ কন্যাকে লইয়া কানপুর যাত্রা করিলেন। দেখিলেন এখানে থাকিয়া সুশীলাকে দেখার ইচ্ছা দমন করা অত্যন্ত দুষ্কর। কিছু দিন পরে যখন যামিনী কানপুরে আপন বিবাহের নিমিত্ত গিয়া, প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ প্রস্তাব করিলেন—তখন দয়ানন্দ মহা সন্তুষ্ট চিত্তে ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এই উপলক্ষে বিবাহের কথা কহিতে লজ্জা সত্ত্বেও সুশীলার সহিত একবার দেখা করিতে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা দেখিবেন জানিলে হয়তো আসিতেন না।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্রুমচ্যুত বল্লরী।

সুশীলার মৃত্যুতে কনকের অত্যন্ত আঘাত লাগিল, সে যেন আজ অনাথা হইল। বাল্য কালে মাতাকে হারাইয়া সে সুশীলাকেই মা বলিয়া জানিত। বাস্তবিক কনককে সুশীলা মাতার ন্যায়ই ভাল বাসিতেন। কনক ভাবিল তাহার আর কেহ নাই, আজ হইতে আর তাহাকে কেহ স্নেহ করিবে না। কত অপরাধ করিয়াছে, তবুও সুশীলা তাহাকে ভাল বাসিতেন। স্বভাব শোধরাইবার জন্য, কনকের ভালর জন্য তাহাকে শাস্তি দিয়া মনে মনে আবার তাঁহার সে নিমিত্ত কতই কষ্ট হইত। ছেলেবেলা হইতে কনক সকলকে ভালবাসে কিন্তু সুশীলা বই কেহ আর কনককে ভাল বাসেন নাই। পিতাকে তাহার বড় স্মরণ হয় না, তথাপি যেটুক মনে আছে, তাহাতে কনকের অপেক্ষা তাহার পিতা প্রমোদকে সহস্রগুণে অধিক ভাল বাসিতেন। প্রমোদের জন্য পিতা মাতার নিকট সে বাল্য কালে কত না ভৎর্সনা খাইয়াছে, একদিনও মা বাপের আদর পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবুও সে জন্য কনক কখনো দুঃখ করিত না। কনক প্রমোদকে এত অধিক ভাল বাসিত যে পিতা মাতা তাহাকে অযত্ন করিয়া প্রমোদকে ভাল বাসিতেন বলিয়া তাহার সেই কষ্টের মধ্যেও একটি সুখ হইত। কিন্তু প্রমোদকে সে যে এত ভালবাসে তাহার কাছে প্রতিদান না পাইয়া তাহার বড় দুঃখ হইত। প্রতিদান পাওয়া দূরে থাকুক তাহার অসীম ভ্রাতৃস্নেহের প্রতিদানে সে উপেক্ষিত না হইলেই যথেষ্ট মনে করিত, কিন্তু তাহাও তার অদৃষ্টে বড় ঘটিত না। ভাল বাসিয়া সে সকল স্থানেই কষ্ট পাইয়া আসিতেছে, কেবল সুশীলার নিকটেই সে প্রতিদান পাইয়াছিল, সুশীলার ভালবাসাই তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল, আজ কনক সেই স্নেহময়ী মাতাকে হারাইল, আজ তাহার সর্ব্বস্ব হারাইল, এখন তাহার কি দশা হইবে?" বালিকা কনক সুশীলার সেই মৃতশয্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। দাসীগণ যখন তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিল তখন কনক দেখিল সে শয্যায় আর সুশীলা নাই। চমকিতভাবে অমনি বালিকা

উঠিয়া দাঁড়াইল। অশ্রু পূর্ণ নেত্রদ্বয় অঞ্চলে মুছিয়া কি ভাবে জানি না অশ্রুহীন নিরাশার গম্ভীর প্রস্তর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মাতাকে কোথায় লইয়া গিয়াছে দেখিতে চলিল। এদিকে দাস দাসীগণ, সুশীলার সৎকার নিমিত্ত মৃতদেহ সাজাইয়া তাহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে ছিল। তাহারা মৃত দেহ গঙ্গাতীরে লইয়া গেল কনকও নিস্তব্ধে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তখন সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে, রজনী অন্ধকারময়ী, সেই অন্ধকার নিশায় সেই ক্ষুদ্রবালিকা নির্ভয়ে শবের সহিত গঙ্গাতীরে আসিল। সুশীলাকে শ্মশানে আনিলে চিতায় অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে মৃতের অতি নিকটে আসিয়া কনক সেই মৃত মুখ একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। শেষবার ভাল করিয়া দেখিবার অভিপ্রায়ে দেখিতে লাগিল, আর তো কখনই দেখিতে পাইবে না। ক্রমে চিতায় অগ্নি প্রদান করিল, অল্পে অল্পে তাহা ধরিয়া উঠিল, সুশীলার গাত্রে অগ্নি স্পর্শ করিল কনক আর দেখিতে পারিল না, এতক্ষণ কষ্টে অশ্রুরাশি থামাইয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর পারিল না, উন্মত্তের মত চীৎকার করিয়া উঠিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এদিকে তাঁহার সৎকার শেষ হইলে দাস দাসীগণ ঘাট হইতে কিছু দূরে স্নান করিতে লাগিল, একটি দাসী কনককে গৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল "এখন এবেশে ঘরে যাইতে নাই, নদীতে স্নান করিয়া চল পরে ঘরে যাইবে' কনকের আর তখন নিজের ভাল মন্দের বিবেচনা শক্তি ছিল না। দাসীর কথায় অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নদীতীরে আসিল।

রজনী গভীর অন্ধকার, সেই আঁধার নিশীথে গঙ্গার অতল জলরাশির উপর দুইটি স্ত্রীলোক আসিয়া নামিল। আঁধারে আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল ঊর্দ্ধে আকাশ নীচে জল। নীচে যে দিকেই দেখ সেই দিকেই জল—চরণতলে জলরাশি, সম্মুখে জলরাশি, আশে পাশে চারি দিকেই অতল জলরাশি, তল তল ঢল ঢল করিয়া যেন উদাস ভাবে চলিতেছে। আর উপরে তারকাখচিত অনন্ত আকাশ প্রসারিত। আবার সেই তারকাখচিত আকাশ নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত হইয়া, গঙ্গার সেই আঁধার বক্ষ কিছু উজ্জ্বল করিয়া, দূরের অন্ধকার আরো ঘনীভূত করিতেছে। সেই আকাশালোক ছাড়া মাঝে মাঝে গঙ্গা বক্ষঃস্থিত একখানি নৌকার প্রদীপ মিটমিট করিয়া এক এক বার আলেয়ার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। কনক সেই আলোটির পানে চাহিয়া চাহিয়া জলে নামিল। দেখিতে দেখিতে সেই আলোটি আর দেখিতে পাইলনা, এই অনন্ত জলরাশির মধ্যে যে একটি আলোক ছিল, তাহাও যেন নিভিয়া গেল। কনকের সংসার-সমুদ্রের মধ্যেও তেমনি সুশীলা যে একটি আলো ছিলেন, তাহাও এইরূপ নিভিয়া গিয়াছে, কি দেখিয়া এখন কনক থাকিবে? ভাবনা পীড়িত কনক যাতনায় মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে করিতে ব্যাকুল ভাবে

ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিল। দেখিল সেই অনন্ত আকাশ কেমন নীরব, কেমন গম্ভীর, কেমন শোভাময়। মনে হইল যেন তাহার দুঃখে তারাগণ ভ্রূকুটী করিয়া হাসিতেছে। সহসা সেই তারকারাশির মধ্য হইতে একটি তারকা খসিয়া পড়িল। কনকের অমনি মনে হইল "আমি যদি একটি তারা হইতাম তাহা হইলে কি হইত? আমিও এক দিন ঐরূপ করিয়া খসিয়া পড়িতাম। তাহাতে আর কাহার কি হইত। একটি কমিয়াছে বলিয়া কেহ জানিতেও পারিত না। এই যে একটি খসিল, এই অসংখ্য তারকারাশির মধ্যে একটীর জন্য কাহার কি আসিবে যাইবে? আবার ভাবিল" এখানেই বা আমি কে? এই বিস্তৃত পৃথিবী তাহার মধ্যে আমি কে? আমি একটি তারকা হইতেও অধম। আমি খসিয়া পড়িলে কাহার কি আসিবে যাবে, আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু ফেলিবারও এখন কেহই নাই" ভাবিতে ভাবিতে কনক আপন মনে একটী একটী করিয়া সোপানশ্রেণী অবতরণ করিতে লাগিল। ক্রমে সোপান গুলি ফুরাইয়া আসিল কিন্তু কনকের আর তাহা ফুরাইল না, সে জলে নামিয়া যেমন আর একটি সোপানে পদার্পণ করিতে পা বাড়াইল, অমনি সেই গভীর অন্ধকারময়ী নিশীথে, সেই অনাথা বালিকা, সেই অরক্ষিতাবস্থায় গঙ্গার অতল জলরাশি মধ্যে ডুবিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে গঙ্গার কৃষ্ণকায়া মধ্যে কনক মিশিয়া গেল, দাসী তাহা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চীৎকার করিতে করিতে উপরে উঠিয়া আসিল।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ৩ ভাগ ২ সংখ্যা ২৮ পৃষ্ঠার পর।

সৌর জগতের সপ্তক, ভূস্তর গঠনের সপ্তক, এবং মূল সপ্তক, যথা ক্রমে প্রদর্শন করা গেল, এক্ষণে উদ্ভিদ্ জাতি এবং জীবজাতির সপ্তক ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য-শৃঙ্খলা—সম্পূর্ণাবয়ব একটি বৃক্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেরূপ ক্রমাভিব্যক্তি, সমগ্র উদ্ভিদ্জাতিরও ঠিক সেইরূপ; যথা, প্রথম,—বীজ; সমুদ্রে একরূপ উদ্ভিদ পাওয়া যায়, যাহা শুদ্ধ কেবল একটি মাত্র কোষ-বিহীন, গর্ভাঙ্কুর-(Nucleus)-বিহীন বীজ, আর কিছুই নহে। দ্বিতীয়—মূল; দ্বিতীয় শ্রেণীর

উদ্ভিদ্ মূলরূপী; প্রথম শ্রেণী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ পূর্ণতা-প্রাপ্ত বীজগণ একত্র গ্রথিত হইয়া বর্ত্তমান শ্রেণীর মূলরূপী উদ্ভিদে পরিণত হয়; ইহাও সামুদ্রিক উদ্ভিদ্। তৃতীয়,—স্তম্ব (Stem) শাখা প্রশাখা; সমুদ্রে একরূপ উদ্ভিদ্ জন্মে যাহার চরম-সীমা শাখা-বিস্তার মাত্রেই পর্য্যাপ্ত; চতুর্থ,—পল্লব; এক জাতীয় উদ্ভিদ্ আছে যাহাদের কেবল পল্লবোদ্গম মাত্রই চরম সীমা,—ইহাদের নাম দেওয়া গেল—পর্ণী (Fern) অথবা পর্ণতরু। পঞ্চম,—পুষ্প এক জাতীয় বৃক্ষ এরূপ যে, তাহাদের পুষ্পাভ্যন্তরে বীজকোষ নাই; বীজকোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই তাহা ফলে পরিণত হয়, সুতরাং এ জাতীয় বৃক্ষের ফলোৎপত্তি সম্ভবে না, ইহাদের চরম সীমা পুষ্পোদ্গম মাত্রেই পর্য্যাপ্ত। ষষ্ঠ,—অখণ্ড-বীজী ফল; তাল, নারিকেল, পুগ প্রভৃতি বৃক্ষ ফল-যাহা প্রসব করে তাহার বীজ অখণ্ডাকৃতি। সপ্তম,—দ্বিখণ্ড-বীজী ফল. আম্র নেবু চনক প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ-গুলির শাঁস সর্ব্বদা দুই খণ্ডে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

উপরি-উক্ত সপ্তকের যাহার পর যেটি ক্রমান্বয়ে ধরা হইয়াছে, বাস্তবিকই তাহার পর সেইটি যথাক্রমে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল ইহা ভূতত্ত্ববিদ্যার সিদ্ধান্ত। উক্ত সপ্তকের মধ্যে কার্য্য এই একটি দেখা যায় যে, মূলরূপী উদ্ভিদ্ স্বার্থের ন্যায় এক ত বিক্ষেপ শক্তির বশবর্ত্তী, কেননা একটি বীজ-পিণ্ডের মধ্যে ক্রমিক অংশ বিচ্ছেদ হইয়া ঐ প্রকার উদ্ভিদ্ পরিগঠিত হয়; তাহাতে আবার বিষয়াসক্তির ন্যায় শোষণ-কার্য্যেই তাহার বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্বশাখাদিরূপী উদ্ভিদ্ দাম্পত্য প্রেম এবং ধর্ম্মের ন্যায় বন্ধন-কার্য্যের সবিশেষ পরিচয় দেয়; বন্ধন-কার্য্য কি? না দুই বিপরীত শুষ্কত্বয়কে এক বন্ধনে বিধৃত করিয়া রাখা; মূল এক দিকে প্রসারিত হইতেছে, স্তম্ব শাখা অপর-দিকে প্রসারিত হইতেছে অথচ উভয়ের মধ্যে সাম্য রক্ষিত হইতেছে, ইহা ধর্ম্ম-ভাবের একটি বহিরাদর্শ; এরূপ সচরাচর দেখা গিয়া থাকে যে ঝটিকাঘাতে বৃক্ষ যদি একপার্শ্বে অধিক হেলিয়া পড়ে তবে তাহার বিপরীত পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে শাখা প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া মূলের সহিত স্তম্বের বন্ধন যেমন তেমনি অব্যাহত রাখে। পর্ণী জাতীয় উদ্ভিদ্ পর্ণোৎপাদন করিয়াই স্থগিত থাকে; বৃক্ষের পত্র দেখিতে দেখায় ঠিক যেন স্তম্ব-শাখা-প্রশাখার নূতন সংস্করণ; পত্রের বৃন্ত বৃক্ষের স্তম্ব, পত্রের শিরা উপশিরা বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, দুয়ের মধ্যে এমনি মিল যে, প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির শিশু-সন্তান বলিলেই হয়; কর্ত্তৃত্ব-শক্তির ন্যায়, বৃক্ষ আপনার পত্র গুলিতে আপনাকে নূতন নূতন করিয়া প্রতিফলিত করে। পুষ্প-তরুর পুষ্পোদ্গম সৌহার্দ্দ এবং সৌন্দর্য্যের ন্যায় চমৎকার একটি নূতনভাব উদ্গীরণ করে; পুষ্প যদিও বৃক্ষের আপনার বস্তু, তথাপি দেখিতে দেখায় এমনি যেন তাহা শাখা পল্লবের

প্রবাহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে; স্কন্ধ-শাখা-পল্লব যেমন ধারাবাহিক চলিয়া আসিতেছে, পুষ্পোৎপত্তি তাহা পশ্চাতে ফেলিয়া আর একটি যেন নূতন রাজ্য আনিয়া উপস্থিত করে; পুত্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা যেমন পিতা মাতার ক্রোড়ে থাকিয়াও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সৌহার্দ্দিবন্ধনের দিকে আকৃষ্ট হয়, বৃক্ষের পল্লব যেন সেইরূপ বয়ঃপ্রাপ্তি-সুলভ সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পুষ্পের দলরাজি আকারে নূতন রূপে আবির্ভূত হয়। আবার এই দেখা যায় বন্ধুকে পুষ্প উপহার দেওয়াটি যেমন স্বাভাবিকী শোভা পায়,অন্য কোন বস্তু উপহার দেওয়া তেমন নহে। নারিকেলাদি অখণ্ড-বীজী তরুগণ ভিতর হইতে ভিতরে বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশই উপর হইতে উপরে উত্থান করে, ইহাতে উচ্চের প্রতি টান বুঝায়; এবং তাহাদের শাখাদিতে ভক্তির অধনম্র ভাব এবং সমগ্র অবয়বে মঙ্গলের ঊর্দ্ধগতি ভাব উভয় আদর্শই মূর্ত্তিমান দেখা যায়; নারিকেল কদলী প্রভৃতি আমাদের দেশে মাঙ্গলিক কার্য্যেই বিশেষ রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহা কাহারো অবিদিত নাই; আর একটি উপমা এই যে, বন্ধুকে পুষ্প উপহার দেওয়া যেমন শোভা পায়, রাজারা উচ্চপদস্থিত ব্যক্তিকে ফল উপহার দেওয়া সেইরূপ শোভা পায়।

খণ্ড-বীজী বৃক্ষ বাহির হইতে বাহিরে বর্দ্ধিত হয়, ইহাতে সকলের প্রতি প্রেম বিস্তারের লক্ষণ প্রকাশ পায়,এবং তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সকল পরস্পর সাম্য রক্ষা পূর্ব্বক বর্দ্ধিত হয়,ইহাতে সামঞ্জস্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অখণ্ড-বীজী তরুর ভাব এই—উচ্চের প্রতি লক্ষ্য নিবিষ্ট রাখিয়া ও আপনাতে আপনি সংযত থাকিয়া বর্দ্ধিত হওয়া; খণ্ড-বীজী তরুর ভাব এই—অসংকোচে মুক্ত ভাবে বর্দ্ধিত হওয়া; সাধনাবস্থা এবং সিদ্ধাবস্থার মধ্যে যে প্রভেদ এ দুই জাতীয় তরুর মধ্যে তাহারই উপমা বিদ্যমান দেখা যায়।

আদিম বীজ-রূপী বৃক্ষ যে উপকরণে নির্ম্মিত চরম পূর্ণাবয়ব বৃক্ষের বীজের সারাংশও সেই উপকরণে নির্ম্মিত; অথচ শেষোক্তের শক্তির পরিধি পূর্ব্বোক্ত অপেক্ষা কত বিস্তৃত। বৃক্ষের মৃত্তিকা-নিহিত বীজ তাহার প্রথম সুর এবং তাহার ফল-গর্ভস্থ বীজ অষ্টম সুর বলিয়া গণনীয় শেষোক্ত বীজ হইতে পুনর্ব্বার যখন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তখন সে বৃক্ষ দ্বিতীয় সপ্তকের স্থান অধিকার করে এবং প্রথম সপ্তকের অষ্টম সুর সেই যে ফলগর্ভস্থ বীজ তাহা এক্ষণকার এই দ্বিতীয় সপ্তকের প্রথম সুর বলিয়া গণনীয়। এই উপমানুসারে বলা যাইতে পারে যে, চরম পূর্ণতাপ্রাপ্ত বৃক্ষের বীজ-সকল বৃক্ষজাতির অষ্টম সুর।

কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, উপর্য্যুপরিস্থ দুইটি সপ্তক এক সঙ্গে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে; সে দুইটি সপ্তক কি ? না উদ্ভিদ্ সপ্তক এবং জীব-সপ্তক; দুই স্বর-সপ্তকের দুইটি সমস্থানীয় সুর একত্র গীত হইলে যেমন উভয়ে উভয়ের পোষকতা করে,উদ্ভিদ্ এবং জীব এ দুই সপ্তকের মধ্যেও সেইরূপ

পরস্পর পোষকত্বের ভাব দৃষ্ট হয়। আদিম উদ্ভিদ্ যেমন বীজ-রূপী, আদিম জীবও সেইরূপ; বীজরূপী আদিম উদ্ভিদ্ প্রথম সপ্তকের প্রথম সুর, বীজরূপী আদিম জীব প্রথম সপ্তকের অষ্টম সুর এবং দ্বিতীয় সপ্তকের প্রথম সুর; একজাতীয় সামুদ্রিক জীব আছে যাহারা মধ্যদেশ হইতে চতুর্দিকে মূল-বিস্তারের ন্যায় রজ্জুরূপী গুটি কত অঙ্গ বিস্তার করে। মূল-রূপী বৃক্ষ যেমন প্রথম সপ্তকের দ্বিতীয় সুর, এই মূলাঙ্গী (Radiata) জীব সেইরূপ দ্বিতীয় সপ্তকের দ্বিতীয় সুর। উদ্ভিদ্ পক্ষে শাখাযুক্ত সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ এবং জীব পক্ষে শাখাঙ্গী জীব (Articulata, কীট পতঙ্গ) তৃতীয় সুর; বৃশ্চিকাতে শাখাঙ্গী-ভাব সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়; তাহার শরীরটি কতকগুলি শাখাঙ্গের সমষ্টি মাত্র। মধুমক্ষিকা পিপীলিকা প্রভৃতির প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে পারে যে, তিনটি শাখা-শরীর যুড়িয়া একটি সমগ্র শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে; এমন কি বোল্‌তার দেখা গিয়াছে যে তাহার ছিন্ন শাখাঙ্গ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। উদ্ভিদ্ পক্ষে পর্ণীজাতীয় তরু এবং জীব পক্ষে মৎস্য, চতুর্থ সুর; উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, প্রথমতঃ পর্ণীজাতীয় তরুগণের মধ্যে প্রধানতম যে জাতীয় তরু তাহার গাত্র শল্কময়, তজ্জন্য তাহা শল্কী পর্ণতরু (Scale fern) বলিয়া উক্ত হয়; দ্বিতীয়তঃ—মৎস্যের শল্ক-পরিচ্ছদ এবং পর্ণীর পর্ণপরিচ্ছদ সামান্যত পরস্পর উপমেয় হইতে পারে; তৃতীয়তঃ উভয়েরই স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ নির্ণয় করা সুকঠিন। উদ্ভিদ্ পক্ষে ফলশূন্য তরু এবং জীব পক্ষে নরীরূপ পঞ্চম সুর, উভয়েরই স্ত্রীপুরুষ-ভেদ অতীব অস্পষ্ট। উদ্ভিদ্ পক্ষে নারিকেলাদি অখণ্ডবীজী তরু এবং জীব পক্ষে পক্ষীজাতি ষষ্ঠ সুর; এজাতীয় তরুর শাখা পত্রের সহিত পক্ষীজাতির পক্ষের অবয়ব-সাদৃশ্য স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; পাখীর পালক আর তাল বা নারিকেল গাছের ডাল, দুইকে তুলনা করিয়া দেখিলেই উভয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একই আদর্শে পরিগঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। দূর হইতে দেখিলেও তাল নারিকেলাদির শাখা-বিস্তার উড্ডয়নোদ্যত পক্ষীর পক্ষ-বিস্তারের ন্যায় প্রতিভাত হয়। উদ্ভিদ্ পক্ষে দ্বিখণ্ডবীজী বৃক্ষ এবং জীব পক্ষে স্তন্যপায়ী জীব সপ্তম সুর; উভয়ই স্ব স্ব সপ্তকের চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে; এই জীব-সপ্তকের অষ্টম সুর মনুষ্য।

সপ্তক-শ্রেণী যখন মনুষ্য অবধি পৌঁছিয়াছে তখন আড্ডায় পৌঁছিয়াছে, কেননা মনুষ্যই সৃষ্টির চরম অভিব্যক্তি, অতএব এখন তাহাকে বিশ্রাম দেওয়া যো'ক্। সপ্তক-শ্রেণীর সহিত আমরা এতটা পথ একত্রে যাপন করিলাম—সত্য, কিন্তু পর্য্যটন কার্য্যে শশব্যস্ত থাকাতে উহার সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে সময় পাওয়া যায় নাই, এখন স্থানে পৌঁছিয়া নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া গিয়াছে—ইহার পর ধীরে সুস্থে উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা।

নিদ্রার সময় শারীরিক অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন হয় তদ্বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা প্রকার মত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহবা হৃদয়ে কেহ বা মস্তকে নিদ্রার উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মতটি বলবৎ ছিল যে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া শিথিল হইয়া তথা হইতে রক্তরাশি মস্তিষ্ক মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্ক মধ্যে রক্ত-রোধ (Congestion) উপস্থিত হয় এবং এই রক্তরোধের চাপে মস্তিষ্ক অসাড় ও অচেতন হইয়া পড়ে। ইহাকেই নিদ্রা বলে।

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতটি অপেক্ষা আধুনিক মতটি উৎকৃষ্ট বলিয়া সহজেই উপলব্ধি হয়। সে মতটি এই যে, মস্তিষ্ক হইতে রক্ত-রাশি আকৃষ্ট হইয়া যখন অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় এবং এই রক্ত-শূন্যতা হেতু মস্তিষ্ক সূত্রগুলি শিথিল হইয়া পড়ে, তখনই নিদ্রা উপস্থিত হয়। অতএব মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য নিদ্রার কারণ না হইয়া রক্তের অভাবই তাহার কারণ বলিয়া আজ কাল অবধারিত হইতেছে।

এই মতটি পরীক্ষার দ্বারাও সপ্রমাণ হইয়াছে। এক জন জীবন্ত মনুষ্যের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে, নিদ্রার সময় তাহার মস্তিষ্কের পাক্‌গুলি (Convolutions) শিথিল হইয়া পড়িত, এবং জাগ্রৎ হইলেই আবার সে-সকল পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইত; মনের চালনা হইলেই মস্তিষ্কের পাক-গুলি ফুলিয়া উঠিত।

নিদ্রা হইতে যদি আমাদিগকে কেহ হঠাৎ জাগাইয়া দেয় মস্তিষ্কের মধ্যে বেগে রক্ত প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্ক মধ্যে কেমন এক প্রকার প্রসার উপলব্ধি হয়— রক্তাগমে শিথিল মস্তিষ্ক-সূত্রগুলি দাড়াইয়া উঠে, এই জন্যই বোধ হয় ঐ প্রকার ভাব আমাদের মনে অনুভব হয়।

এই মতটির সত্যতা বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। শারীরিক কিম্বা মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেগবান হইলে, কিছুতেই আমাদের চক্ষে নিদ্রা আইসে না; মস্তিষ্ক যতক্ষণ সক্রিয় থাকে ততক্ষণ নিদ্রাকর্ষণের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। নিদ্রাকর্ষণ করিবার জন্য আমরা সচরাচর কি উপায় অবলম্বন করি? যে ঔষধে বা যে উপায়ে মস্তিষ্ক হইতে রক্ত-রাশি চালিত হইয়া হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে আনীত হয়, তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকি। উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে কি জন্য নিদ্রাকর্ষণ হয়? মস্তিষ্ক হইতে রক্ত আকৃষ্ট হইয়া পাকাশয়ে প্রবাহিত হওয়া প্রযুক্ত মস্তিষ্কের রক্তাভাবই সেই সময়ে নিদ্রাকর্ষণের এক মাত্র কারণ।

নিদ্রা আসিবার সময় আমাদিগের মানসিক অবস্থা কিরূপ হয় ও নানা প্রকার

কল্পনা-ছবি আমাদের মনে অনাহূত প্রবেশ করে—বাহ্য বস্তু-সকল নেত্র সমক্ষে অস্পষ্ট হইয়া যায়—এবং শব্দ সকল অতি মৃদু-ভাবে কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। আমরা বেশ উপলব্ধি করিতে পারি যে আমাদের ইচ্ছা-শক্তি শিথিল হইয়া গিয়াছে। হয় তো আমরা সেই ইচ্ছাকে পুনর্ব্বার আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করি—হয় তো সেই ইচ্ছা ক্ষণকালের জন্য আমাদের বশে আইসে—যে কর্ম্মে আমরা নিযুক্ত ছিলাম তাহাতে পুনর্ব্বার মনঃসমাধান করিতে হয় তো ক্ষণকালের জন্য সমর্থ হই—কিন্তু পরক্ষণেই আবার চিন্তা সকল বিক্ষিপ্ত হয়—মনশ্চক্ষুর সমক্ষে আবার নানা প্রকার অনাহূত ছবি আসিয়া চলা-ফেরা করিতে থাকে, আমরা বুঝিতে পারি শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছে, চক্ষের পত্র নিমীলিত হইয়া আসিতেছে—পরক্ষণেই বাহ্য অস্তিত্ব আমাদের অগোচর হয়, আমরা নিদ্রিত হই।

আমরা নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় যে সকল ব্যাপার দেখিতে পাই, মানসতত্ত্ব কি আত্মতত্ত্ব-ক্ষেত্রে তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার আর কিছুই নাই। কিন্তু নিতান্ত পরিচিত বলিয়াই সেই সকল ব্যাপারে আমরা বিস্মিত হই না। সেই সকল ব্যাপার প্রতিদিন দেখিতে পাই বলিয়াই তাহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কৌতূহল হয় না।

জাগ্রৎ অবস্থা ও নিদ্রাবস্থার মধ্যে যে টুকু ব্যবধান তাহা অতি ক্ষণিক ও সঙ্কীর্ণ, অতি সূক্ষ্ম আত্মদর্শীরাও তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, কি বিষম মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। মনুষ্য যেন আর সে মনুষ্য থাকে না। তাঁকে আর বুদ্ধি-বিবেচনা-সমন্বিত উন্নত জীব বলিয়া বোধ হয় না, বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, তাহার নিকট যেন বাহ্য জগতের অস্তিত্বই থাকে না, তাঁহার ইচ্ছা—যাহা চেতনাবান আত্মার বাহ্য বিকাশের শক্তি মাত্র, সে ইচ্ছা-শক্তিও অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে—তাঁহার চিন্তা ও ভাবের উপর তাঁহার আর কোন কর্ত্তৃত্ব থাকে না—তাঁহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল তাঁহার আর বশে থাকে না। কিন্তু তাঁহার প্রাণ-ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ অবিকৃত ভাবে ও সুশৃঙ্খল রূপে সমান চলিতে থাকে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না—ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হয় কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নহে—আমরা শুনিতে পাই কিন্তু অতি অস্পষ্ট রূপে, আমরা শব্দের পরিমাণ উপলব্ধি করিতে পারি না। অনেক সময় হয় তো উচ্চ শব্দও আমাদের কর্ণগোচর হয় না, আবার এক এক সময় সামান্য ফুস্ ফুস্ শব্দেই জাগিয়া উঠি—কিম্বা অতি মৃদু শব্দকেও কখন কখন কামানের উচ্চ আওয়াজ বলিয়া বোধ হয়। দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াও যে একেবারে স্থগিত হয় তাহাও ঠিক বলা যায় না—আস্বাদন ও ঘ্রাণ-শক্তি

মন্দীভূত হয় বটে কিন্তু একেবারে অপনীত হয় না। এই সকল তথ্য আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয় সকল যখন আংশিক রূপে অসাড় হইয়া পড়ে, বাহ্য জগতের সহিত আমাদিগের মনের যে সকল অব্যবহিত যোগাযোগের স্থল—সে সকল স্থল সে সময় একেবারে অসাড় হয় না, পরন্তু ইন্দ্রিয় স্নায়ু সমূহের শেষ সীমা এবং মস্তিষ্ক এই উভয়ের কোন মধ্য দেশে, কিম্বা যেখানে চেতনাবান আত্মার সহিত মস্তিষ্কের অব্যবহিত যোগ সেই স্থলেই অসাড়তা উপস্থিত হয়। কি জাগ্রৎ অবস্থা কি নিদ্রাবস্থা সকল অবস্থাতেই স্নায়ুর উপরেই যে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল প্রকটিত হয় তাহাতে আর সংশয় নাই। এবং এই বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল মস্তিষ্কমণ্ডলের তলদেশস্থ স্নায়ু-সঙ্গম-দেশে (ganglion) ইন্দ্রিয়-স্নায়ু কর্তৃক যে নীত হয় তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়। Professer Ferrier সাহেবের পরীক্ষা-সমূহে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়-স্নায়ু সকল যেখানে গিয়া সম্মিলিত হয়, সেই মস্তিষ্ক-তল-দেশস্থ ganglionই এই কেন্দ্র-স্থল। এই কেন্দ্রস্থলে প্রথমে বাহ্য জগতের প্রতিবিম্ব সকল প্রবাহিত হয়—পরে, সেখান হইতে মস্তিষ্ক-মণ্ডলে নীত হয়—তখন আত্মা তাহাদিগের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে।

নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্ক শরীরের উপর হুকুম চালাইতে অসমর্থ হয়। স্নায়ু সকল তাহার হুকুম মানে না। কোন পদার্থ—যাহা মস্তিষ্ক এবং স্নায়ু-সমূহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে এবং যাহা জাগ্রৎ অবস্থায় সক্রিয় থাকে—সেই পদার্থটি নিদ্রাকালে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে—সেই পদার্থটি কি?—না ইচ্ছা। এই ইচ্ছার কার্য্য স্থগিত হয়, এই জন্যই শরীরের উপর মনের আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না—এই প্রণালী অনুসারেই শরীরের আবশ্যক বিরাম কার্য্য সাধিত হয়।

এই খানে এই প্রশ্নটি উপস্থিত হইতেছে, এই যে ইচ্ছা-শক্তির কার্য্য স্থগিত হয় এবং শরীর হইতে আত্মার কর্তৃত্ব আংশিক রূপে তিরোহিত হয়—এই পরিবর্ত্তনটি মানসিক যন্ত্রের কোন্ স্থানে সংঘটিত হয়? নিদ্রা দ্বারা এই মহান্ বিপ্লব কিরূপে সাধিত হয়? যদি সমুদায় যন্ত্র নিদ্রাবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে তাহা হইলে সহজেই তো এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে, "সমস্ত মস্তিষ্ক নিদ্রিত থাকা প্রযুক্তই সমস্ত মানসিক যন্ত্রের কার্য্য স্থগিত থাকে, জাগ্রদবস্থায় ঐ যন্ত্র যে সকল শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়, সেই সকল শক্তি স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে কিয়ৎকালের জন্য নিদ্রাবস্থায় বিরত হয় বলিয়াই সমস্ত যন্ত্র স্থগিত হয়।" কিন্তু তাহা তো প্রকৃত ঘটনা নহে। সকল শক্তিই নিদ্রাবস্থায় তো স্বীয় স্বীয় কার্য্য হইতে বিরত হয় না। জীবনী শক্তি সে সময় সম্পূর্ণ রূপে কার্য্য করিতে থাকে—মনও একেবারে নিষ্ক্রিয় হয় না, যেহেতু মনে নানা প্রকার স্বপ্নের উদয়

হয়—তবে যদি মস্তিষ্কমণ্ডল উপরি ভাগে জাগ্রৎ থাকে এবং অবশিষ্ট শরীর নিম্ন ভাগে নিদ্রিত থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের মধ্যে যোগ ঠিক্ কোন স্থলে নিদ্রার সময় বিনষ্ট হয়?—যে মস্তিষ্ক-মণ্ডল বুদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ, সেই মস্তিষ্ক-মণ্ডলের কোন নিম্ন ভাগে অবশ্য সেই যোগের স্থান, অর্থাৎ যে বিন্দুতে মস্তিষ্কের শাখাপ্রশাখা স্নায়ু-মণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হয়। এই বিন্দু দিয়া আমাদের ইচ্ছা-শক্তি শরীরের উপর অব্যবহিতরূপে কর্তৃত্ব করে।

Professor Ferrier সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, যে মস্তিষ্ক-মণ্ডল বুদ্ধির ইন্দ্রিয় স্বরূপ, সেই মস্তিষ্কমণ্ডলেই ইচ্ছা-শক্তির পরিচালনা হয়। জাগ্রৎ ও অবিকৃত অবস্থায় ইচ্ছা শক্তি শরীরের উপর কর্তৃত্ব করে। নিদ্রিত অবস্থায় কিম্বা শরীরের বিকৃত অবস্থায় ইচ্ছার আর সে কর্তৃত্ব শক্তি থাকে না। মস্তিষ্ক মণ্ডল এবং শরীর পরিচালক স্নায়ু সমূহ—এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এমন কোন একটি স্থল আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যেখানে ইচ্ছা শক্তির কার্য্য অসাড় হইয়া পড়ে কিম্বা ইচ্ছা যে সকল আজ্ঞা শরীরের উপর প্রচার করে, সেই আজ্ঞা-সকল যেখান দিয়া বহন করিতে নিরস্ত হয়। সে অংশ কি? শারীরবিধান বিদ্যার সাহায্যে আমরা দুইটি ganglionএর বিষয় অবগত হই। ইহার মধ্যে একটি ganglion ইন্দ্রিয়-স্নায়ু সমূহের সঙ্গম-কেন্দ্র।

আমরা ইহাও অবগত আছি যে, নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য প্রতিবিম্ব সকল বহন করিতে একেবারেই ক্ষান্ত হয় কিম্বা অতি অস্পষ্টরূপে বহন করে। ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়, এই ganglionই নিদ্রার আধারস্থান। এই ganglion নিদ্রিত হইয়া পড়ে বলিয়াই ইচ্ছার আজ্ঞা সকল মস্তিষ্ক হইতে শরীর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে পারে না। এবং ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ সকলও মস্তিষ্ক মধ্যে নীত হয় না।

সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্র, না তাহার কতক গুলি অংশ মাত্র নিদ্রাবস্থায় পতিত হয়? আর যদি অংশমাত্রই নিদ্রিত হয় তাহা হইলে সে কোন্ কোন্ অংশ—ইহা সমস্যা-স্থল। কিন্তু সে যাহাই হউক, উপরে যে সকল তথ্য বিবৃত হইল তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে মস্তিষ্কের নিম্ন তলস্থ ganglionই নিদ্রার আধার স্থান। ইহা নিশ্চিত যে, সমস্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডল কখনই নিদ্রিত হয় না—তাহা যদি হইত তাহা হইলে কখনই স্বপ্ন হইত না। মস্তিষ্ক কেন্দ্র (cerebral centre) এবং শরীর এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে ganglionটির অবস্থিতি—যেখান হইতে স্নায়ু সমূহ প্রবাহিত হয়—সেই ganglionটি নিদ্রাভিভূত হয় কি না আমরা নিশ্চিত রূপে অবগত নহি। নিদ্রিত হয় না বলিয়াই সহজে অনুমান হয়, কারণ, জীবনী-শক্তি-গত ইন্দ্রিয়গুলির ক্রিয়াকে যে সকল স্নায়ু পোষণ করে সেই সকল স্নায়ুকে কখনই নিদ্রিত হইতে দেখা যায় না। মস্তিষ্ক-যন্ত্রের অন্যান্য অংশে কেনই বা বিশ্রামের

প্রয়োজন হয় আর সেই সকল স্নায়ুর বিশ্রামের কেনই বা প্রয়োজন হয় না তাহা আমরা অবগত নহি। মস্তিষ্ক-যন্ত্রের যে ভাগটি ইচ্ছা শক্তির অধীন সেই খানেই বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মস্তিষ্ক ও শরীর যে সকল বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ নিদ্রাকালে সেই সকল বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। তাহাদের উপর ইচ্ছা-শক্তির কর্তৃত্ব তিরোহিত হয়। জড় শরীর বিশ্রাম করে। ইচ্ছা-শক্তি অসাড় হইয়া পড়ে বলিয়াই বিশ্রাম করে। ইচ্ছা-নিরপেক্ষ যে সকল শারীরিক ক্রিয়া, তৎ সমুদায়ের কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় না, বরং ইচ্ছা-শক্তির বাধা-বহির্ভূত বলিয়া আরও নিয়মিত রূপে ও সুচারু রূপে চলিতে থাকে।

কিন্তু এই যে ইচ্ছা-শক্তি—ইহা কি?

চেতনাবান আত্মার বহির্বিকাশ-শক্তি ভিন্ন ইহা আর কিছুই নহে। এই ইচ্ছা দ্বারা আত্মা জড় শরীরের উপর এবং জড়-শরীর দিয়া বাহ্য জড়-জগতের উপর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে।

কোন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দেখিলে মনে হয় বুঝি সে একেবারে মৃতপ্রায় কিন্তু সেই নিদ্রিত ব্যক্তির সমক্ষে বহির্জগতের অস্তিত্ব যদিও লুপ্ত হয়, তথাপি সেই হত-চেতন নিদ্রিত ব্যক্তি সেই সময়ে আপনার অন্তরের মধ্যে একটি নূতন জগৎ-নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিচরণ করে—শরীর নিদ্রিত হয় বটে কিন্তু তাহার মন নিদ্রিত হয় না। বরং জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রাকালীন মনকে আরও ক্রিয়াশীল বলিয়া বোধ হয়। সেই সময় মন কত প্রকার নাটক রচনা করে, কত নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি করে, আত্মসৃষ্ট জগতের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, বৎসরব্যাপী ঘটনা সকল এক ঘণ্টার মধ্যে একত্র করে, কতকি দেখে, কতকি শোনে, কতকি অনুভব করে, জাগ্রৎ অবস্থায় তাহার শতাংশের এক অংশও দেখিতে, শুনিতে, বা অনুভব করিতে পারে না। এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিলে কি আমাদের বিস্ময় উপস্থিত হয় না? স্বপ্ন যদি আমাদের সকলেরই পরিচিত বিষয় না হইত, তাহা হইলে কি আমরা উহাকে অবিশ্বাস্য অসম্ভব ঘটনা বলিয়া মনে করিতাম না? যদি কেহ আমাদের নিকট আসিয়া বলিত যে আমি নিদ্রাকালীন এই প্রকার ব্যাপার সকল দেখিয়াছি, তাহা হইলে কি আমরা তাহাকে প্রবঞ্চক প্রতারক মিথ্যাবাদী কিম্বা অলীকবিশ্বাসী বাতুল বলিয়া স্থির করিতাম না? স্বপ্ন ব্যাপারের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার পূর্ব্বে যে জড়-যন্ত্র তাহার উৎপাদনে সাহায্য করে তাহা প্রথমে বিবৃত করা আবশ্যক।

মেরুগ্রন্থির উপরিতন সীমান্তে প্রসারিত হইয়া যে ganglion অর্থাৎ যে স্নায়ু-সঙ্গম মস্তিষ্কের সহিত মিলিত হয়—সেই স্নায়ু-সঙ্গমকে Medulla oblongata বলে।

এই স্থলে আসিয়া মস্তিষ্ক শেষ হয় এবং

স্নায়ু-প্রণালীর আরম্ভ হয়। কিন্তু মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-জাল এই উভয়ের কাহার কোথায় আরম্ভ বা শেষ তাহা উপলব্ধি করা সুকঠিন। সমস্ত স্নায়ু জাল মস্তিষ্কের বিস্তৃতি ও অনুবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে—অঙ্গুলির অগ্রভাগে যদি কোন স্নায়ুর ঈষৎ উত্তেজনা হয়, তাহা হইলে সেই স্নায়ুর সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কও উত্তেজিত হয়। স্নায়ু ঐ বোধ-ক্রিয়াকে মস্তিষ্ক মধ্যে বহন করিয়া লইয়া গেলে মন তাহা অনুভব করে।

মেরু-গ্রন্থিতে যে স্নায়ুরাশি জড়ান আছে সেই স্নায়ু সমূহ এই ganglionএর শেষ সীমায় পরস্পরের উপর দিয়া পরস্পর ট্যারচা ভাবে চলিয়া গিয়া মস্তিষ্ক এবং শরীরের পরস্পর-বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যে সকল স্নায়ু শরীরের বাম ভাগকে চালিত করে তাহারা মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগে চলিয়া গিয়াছে এবং যে সকল স্নায়ু শরীরের দক্ষিণ ভাগকে চালিত করে তাহারা মস্তিষ্কের বাম ভাগে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রকার বৈপরীত্যের ফল এই হইয়াছে যে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগ—শরীরের বাম ভাগের উপর কর্তৃত্ব করে এবং মস্তিষ্কের বাম ভাগ, শরীরের দক্ষিণ ভাগকে চালনা করে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ এই ganglionএর উপরে এবং ইহাতেই সংযুক্ত আর একটি ganglion আছে—শারীর-বিধানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু আপাতত সমস্ত এক করিয়া ধরিয়া নিলে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই তলস্থ বৃহৎ ganglionটি হইতে ছোট ছোট সাদা-সাদা সূত্র সকল মস্তিষ্কমণ্ডলে প্রসারিত হইয়াছে।

এই তলদেশস্থ ganglionএর উপরি ভাগে আর একটি বৃহৎ ganglion আছে, তাহাকে Ceribellum অর্থাৎ পশ্চাত্য মস্তিষ্ক বলে, এই Ceribellum আবার তলস্থ ganglionএর সহিত বন্ধন দ্বারা সংযোজিত। পুরো-মস্তিষ্ক-মণ্ডলের সহিত দুইটি বন্ধনে আবদ্ধ। কেন্দ্রস্থ ganglionএর সহিত Ceribellum ganglion একটি সূক্ষ্ম চর্ম দ্বারা সংযুক্ত, এই সূক্ষ্ম চর্ম অন্যান্য ganglion পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রূপে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র এবং গতি-কেন্দ্রের সহিত সকল ganglion-এরই যোগ রক্ষিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-কেন্দ্র কি?—না, অর্থাৎ মস্তিষ্কের যে কেন্দ্র ইন্দ্রিয়-সকল হইতে সংবাদ গ্রহণ করে। গতি-কেন্দ্র কি?—না, ইচ্ছা-প্রচারিত আজ্ঞা সকল যে কেন্দ্র হইতে শরীরের নিকট প্রবাহিত হয়।

এই সকল ganglionএর উপরে এবং পুরোভাগে cerebrum অর্থাৎ পুরো-মস্তিষ্ক অবস্থিতি করে। এই পুরো-মস্তিষ্কই বুদ্ধির ইন্দ্রিয় স্বরূপ। এই পুরো-মস্তিষ্ক আবার দুইটি মণ্ডলার্দ্ধে বিভক্ত।

এই দুই বৃহৎ মণ্ডলার্দ্ধের প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ গঠিত অথচ একার্দ্ধ হইতে সূত্র সকল অপরার্দ্ধে সঞ্চা-

রিত হইয়া উভয় অর্দ্ধকে একত্র সংযুক্ত রাখিয়াছে এবং এইরূপে উভয়ের কার্য্যগত একতা সম্পাদিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে যে মস্তিষ্কের কেন্দ্রগত ganglion-এর কথা বলা হইয়াছে, সেই ganglionটি এই পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধযুগলের ঠিক নিম্ন দেশে সংলগ্ন। যাবতীয় ইন্দ্রিয়-স্নায়ু আসিয়া এই ganglionএ সম্মিলিত হয় এবং এই ganglionএর প্রত্যেক অংশ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট। যেরূপ পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার আধার বলিয়া এক্ষণে সপ্রমাণ হইয়াছে অথচ সমস্ত মণ্ডলার্দ্ধ যেরূপ একটি সমগ্র পদার্থ সেইরূপ এই ganglion-এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলেও উহা একটি সমগ্র পদার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

এই পুরোমস্তিষ্কের মণ্ডলার্দ্ধদয় গোটানো সূত্র-বাণ্ডিল সমূহের মত প্রতীয়মান হয়—এবং এই সমস্ত মস্তিষ্ক এক প্রকার অসাধারণ বোধ-বাহী সূক্ষ্ম স্নায়বীয় আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে এই সূক্ষ্ম আবরণ থাকা প্রযুক্তই বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগ স্থাপিত হইয়া সমস্ত মস্তিষ্ক-যন্ত্রের একতা রক্ষিত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক পদার্থ স্বয়ং অচেতন—যদিও উহাই শরীরের কিম্বা স্নায়ু সমূহের সুখ দুঃখের আধার বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। শরীর না বলিয়া স্নায়ু বলাই অধিক সঙ্গত, যেহেতু স্নায়ুতেই অনুভব-ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, মাংস অস্থিতে কিছু মাত্র অনুভব শক্তি নাই। যে সকল জড়বাদীরা বলেন যে সংজ্ঞা, মস্তিষ্ক কিম্বা জড় পদার্থের অবস্থা মাত্র, তাঁহাদিগের নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি হইলে কিম্বা বিনাশ হইলে মস্তিষ্ক যখন তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন মস্তিষ্ক কিরূপে চেতনাবান পদার্থ হইতে পারে? কিন্তু এই মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম স্নায়বীয় আবরণ অতীব স্পর্শ-বোধবাহী—উহাই "মাথা-ধরা"—"মদ্য-বিকার" Delerium tremens,—মস্তিষ্ক জ্বর এবং অন্যান্য রোগের আধার স্বরূপ। ঐ সকল রোগ আমরা মস্তিষ্ক পদার্থের প্রতি আরোপ করি।

"আমরা" আরোপ করি—"কে" আরোপ করে?—"কি" আরোপ করে?—মস্তিষ্ক মস্তিষ্কের প্রতি আরোপ করে? কিম্বা মস্তিষ্কের এক অংশ অন্য অংশের প্রতি আরোপ করে? জড়বাদিগণ কি ইহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বুঝাইয়া দিবেন?

ইহা সম্ভব যে এই স্নায়বীয় আবরণ দ্বারা মস্তিষ্কের সকল অংশের সহিত পরস্পর যোগ রক্ষিত হইয়া সমস্ত মস্তিষ্কের কার্য্যগত একতা ও সহযোগিতা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু কোন ঘোর-অন্ধ বিশ্বাসী জড়বাদীও কখন একথা স্বীকার করিবেন না যে এই স্নায়বীয় আবরণই সচেতন আত্মা।

Professor Ferrier ভূরি ভূরি সূক্ষ্ম পরীক্ষা সমূহের দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন

যে, প্রত্যেক Ganglionএরই যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে শুদ্ধ তাহা নহে কিন্তু প্রত্যেক Ganglionএর প্রত্যেক অংশেরও স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে—অতএব যাঁহারা বলেন যে, কোন মানসিক ক্রিয়া সমস্ত মস্তিষ্কের কার্য্য তাহাদিগের মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডিত হইতেছে। ইহা দ্বারা এই অনুমানটি সিদ্ধ হয় যে, মস্তিষ্ক মনের বাহ্য ইন্দ্রিয় ভিন্ন আর কিছুই নহে—মস্তিষ্কের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অংশ—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মানসিক ক্রিয়ার যন্ত্র-চক্র স্বরূপ। কিন্তু আমরা যাহাকে "আমি" বলি তাহাকে আমরা কখনই খণ্ড ভাবে ভাবিতে পারি না—সে "আমি" একটি অখণ্ড পদার্থ, সেই আমিই আত্মা—অতএব মস্তিষ্ক কখন আত্মা হইতে পারে না।

এই প্রশ্নটির মীমাংসা পক্ষে Professor Ferrier অনেক সাহায্য করিয়াছেন। মস্তিষ্কের নিম্নতলস্থ যে ganglia যাহা বুদ্ধি বৃত্তির আধার নহে, সেই ganglia র কি কি কার্য্য তাহা তাঁহার পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন কার্য্য বিষয়ে Professor Ferrier কি বলিয়াছেন শোনা যাউক, তিনি বলেন:—

"মস্তিষ্কই মনের ইন্দ্রিয় ও যন্ত্র-স্বরূপ এবং মস্তিষ্ক দ্বারা এবং মস্তিষ্কের মধ্যেই মানসিক ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হয়। এই যে মতটি ইহা এক্ষণে এতদূর সুপ্রতিষ্ঠ ও সর্ব্বসাধারণের গ্রাহ্য হইয়াছে যে, এতৎ-সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়া এই সুসিদ্ধান্ত সত্যটি হইতেই আমরা সূত্রপাত করিব।" তার পর তিনি বলিতেছেন "যাহা হউক মস্তিষ্কের শরীরতত্ত্ব-ঘটিত ক্রিয়াশীলতা উহার মনস্তত্ত্ব ঘটিত ক্রিয়া সমূহের সহিত সমব্যাপক নহে। গতি ও ইন্দ্রিয়বোধের Presentative consciousness অর্থাৎ "সাক্ষাৎ সম্বন্ধীয় সংজ্ঞার যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহাকে দুই-অর্দ্ধ বিশিষ্ট একটি সমগ্র যন্ত্র বলিয়া দৃষ্ট হয়—এবং মনন ও কল্পনার (ideation) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে, অর্থাৎ প্রতিফলিত সংজ্ঞার (representative consciousness) যন্ত্র বলিয়া দেখিতে গেলে উহাকে দ্বিগুণাত্মক (Dual) যন্ত্র বলিয়া উপলব্ধি হয়—অর্থাৎ উহার প্রত্যেক মণ্ডলার্দ্ধ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

যদি কোন রোগ বশতঃ মস্তিষ্কের এক মণ্ডলার্দ্ধ অপসারিত বা একবারে ধ্বংস হয়, তাহা হইলে একদিককার গতি ও বোধ ক্রিয়া তন্নিবন্ধন বিনষ্ট হয় বটে কিন্তু অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে মানসিক ক্রিয়া সকল সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হইতে পারে। বিপরীত দিকের মস্তিষ্কে (মনে কর দক্ষিণ দিকের) কোন রোগ উৎপন্ন হইয়া যদি কোন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়-বোধ এবং গতি-শক্তি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় তাহা হইলে তাহার মনও সেই সঙ্গে অসাড় ও অকর্ম্মণ্য হয় না—কারণ সেই ব্যক্তি অপর মণ্ডলার্দ্ধের সাহায্যে অনুভব করিতে পারে, ইচ্ছা করিতে পারে, চিন্তা করিতে পারে ও বুঝিতে পারে। এই সকল ক্রিয়া পূর্ব্বকার ন্যায় ততদূর বলবৎ ভাবে

না চলুক কিন্তু তাহাদিগের সমস্ততা সম্বন্ধে কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় না।"

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন স্বতন্ত্র কার্য্য অনুসারে মস্তিষ্ককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ ganglion শরীরের কার্য্য সকলকে নিয়মিত করে।

মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ ganglion ইন্দ্রিয়-পতিত বোধ-প্রতিবিম্ব সকলের আধার স্বরূপ হইয়া বাহ্য জগতের সহিত আমাদের যোগ নিবদ্ধ করে।

মস্তিষ্কের চূড়াদেশস্থ মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় বুদ্ধির যন্ত্রস্বরূপ। প্রতি মানসিক ক্রিয়ায় সমস্ত মস্তিষ্কই কার্য্য করে ইহাই ডাক্তার কার্পেন্টারের মত। এবং মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট, ইহাই ফ্রেনলজিষ্ট পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মত। এই দুই মতের মধ্যে কোনটি সত্য তাহাই অবধারিত করিবার জন্য ডাক্তার ফেরিয়র পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

এই সকল পরীক্ষা প্রধানতঃ বানর ও কুকুরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছিল। বানরের উপর দিয়া যে পরীক্ষা হইয়াছিল তাহা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রামাণ্য বলিতে হইবে, যেহেতু মনুষ্য-মস্তিষ্ক গঠনের সহিত, বানর-মস্তিষ্ক-গঠনের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে।

ঐ সকল জন্তুকে ক্লরফরম্ দ্বারা অচেতন করিয়া মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ মস্তিষ্ক হইতে বাহির করিয়া কিম্বা দহন-ক্রিয়ায় তাহাকে বিনষ্ট করিয়া এই সকল পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল। ঐ সকল অংশে Electrode নামক তাড়িৎ যন্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগের ক্রিয়া সকল অতি সাবধানে পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছিল।

এই সকল পরীক্ষার তন্ন তন্ন বিবরণের উল্লেখ না করিয়া কেবল তাহাদের কতকগুলি স্থূল সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিলেই এখানে যথেষ্ট হইবে।

তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমস্ত মস্তিষ্কই বেণীবন্ধন (interlacing) প্রণালী-অনুসারে স্নায়ু-সমূহের সহিত সংযুক্ত।

শরীরের বাম ভাগ দ্বারা মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগের এবং শরীরের দক্ষিণ ভাগ দ্বারা মস্তিষ্কের বাম ভাগের উত্তেজন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার প্রণালী অনুসারে বুদ্ধিযন্ত্রগত মস্তিষ্কের ক্রিয়াও নিয়মিত হয় কি না তাহা তিনি অবধারণ করিতে পারেন নাই—যেহেতু, জন্তুদিগের উপর এই সকল পরীক্ষা হওয়ায়, তাহাদিগের মস্তিষ্কের কোন্ অবস্থায় তাহাদের মনে কিরূপ ভাব উত্তেজিত হয় তাহা জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস এই যে, বুদ্ধি-যন্ত্রগত মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয়েও ঐ রূপ প্রণালী অনুসারে কার্য্য হয়।

মস্তিষ্কের তলদেশস্থ বৃহৎ ganglion বা উপমস্তিষ্ক তাড়িৎ দ্বারা উত্তেজিত করিয়া কিম্বা দাহন দ্বারা বিনষ্ট করিয়া পরীক্ষা দ্বারা এই ganglion সম্বন্ধেও এই একই সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পরীক্ষাতে এই রূপ সপ্র-

মাণ হইয়াছে যে এই ganglion দুইটি অসদৃশ ও স্বতন্ত্র অর্দ্ধাংশে বিভক্ত হইলেও পরস্পর সংযুক্ত ভাবে থাকা প্রযুক্ত উহাদের কার্য্যগত সমানতা রক্ষিত হয় এবং এই প্রকার গঠন-প্রণালী ও ক্রিয়া-প্রণালীর বশবর্ত্তী হইয়া তদনুসারেই শরীরের গতি-সমূহকে নিয়মিত করাই এই ganglionএর বিশেষ কার্য্য। আমাদের শরীর দুই ভাগে বিভক্ত, এই দুই ভাগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে রূপ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গতি-ক্রিয়া আছে সেইরূপ তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা যোগের নিয়ম আছে—একটা পরস্পর সাপেক্ষিতার নিয়ম আছে—তদনুসারেই তাহাদিগের গতি সকল নিয়মিত হয়—এবং এই ganglion প্রত্যেক অর্দ্ধাংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া এবং দুই অংশের সম্মিলিত ক্রিয়া থাকা প্রযুক্তই পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়মে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতি সকল নিয়মিত হয়। এই তলস্থ ganglion যন্ত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে শারীরিক গতি-ক্রিয়ারও ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, এত দূর ব্যতিক্রম হয় যে, কোন জন্তুর উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে "সিধে চলিবার" শক্তি তাহার একেবারে অপসৃত হওয়ায় সে চক্রাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মস্তিষ্কের যেটি দ্বিতীয় বিভাগ যাহা সমস্ত মস্তিষ্কের কেন্দ্রদেশে অবস্থিত এবং যাহার উপরি ভাগে বুদ্ধিযন্ত্র-গত মস্তিষ্কমণ্ডল আধিপত্য করিতেছে, সেই মস্তিষ্ক-বিভাগের উপর সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্নায়ু আসিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে—ইহাও পরীক্ষাতে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই দ্বিতীয় ganglionটি বাহ্য জগৎ প্রেরিত প্রতিবিম্ব সকলের কেন্দ্র-স্থল—ঐ খান হইতেই ঐ সকল প্রতিবিম্বের সংবাদ বুদ্ধিযন্ত্রগত মস্তিষ্কে নীত হয়। পরীক্ষা দ্বারা এইরূপ আরও আভাষ পাওয়া যায় যে এই ganglion স্থিত প্রত্যেক অংশ এক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-ক্ষেত্র—এই সকল বিভিন্ন অংশের বিনাশে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের কার্য্য-নাশ কিম্বা কার্য্য-লাঘব উপস্থিত হয়। এই মস্তিষ্ক বিভাগ দ্বিগুণাত্মক—যেহেতু এই স্নায়ু-পুঞ্জীভূত উপমস্তিষ্কের (ganglion) দক্ষিণ দিক বিনষ্ট হইলে শরীরের বাম ভাগস্থ ইন্দ্রিয় সকলের পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়—এবং এই উপমস্তিষ্কের বাম ভাগ বিনষ্ট হইলে শরীরের দক্ষিণ ভাগস্থ ইন্দ্রিয় সকল অসাড় হইয়া পড়ে।

এই খানে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। মস্তিষ্কের এই ইন্দ্রিয়বোধগ্রাহী অংশটির প্রকৃত কার্য্য কি? যে সকল প্রতিবিম্ব উহার নিকট আনীত হয়, নিজেই কি ঐ সকল প্রতিবিম্বের বোধ-গ্রাহী না উপরিস্থ মস্তিষ্কমণ্ডলে ঐ সকল প্রতিবিম্বের সংবাদ বহন করিবার দূত-স্বরূপ? সুস্থ অবস্থায় বহির্জগৎ হইতে যে সকল প্রতিবিম্ব উহার নিকট উপস্থিত হয়, উহা যে ঐ সকল প্রতিবিম্বের অবিকল সংবাদ উপরিস্থ মস্তিষ্কমণ্ডলে বহন করে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রত্যেক মানসিক ক্রিয়াতে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে

পারি। ইহাও আমরা অবগত আছি যে, মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে নানা প্রকার মিথ্যা সংবাদ বুদ্ধির নিকট আনীত হয়। এই মস্তিষ্ক অংশটি স্বয়ং কর্ত্তা না ক্রিয়ার আধার মাত্র তাহা অবধারিত করিতে পারিলে নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়ক মানসিক তত্ত্বানুসন্ধান পক্ষে অনেক সুবিধা হয়।

আচার্য্য ফেরিয়রের পরীক্ষা সমূহ দ্বারা এই প্রশ্নটির এক প্রকার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তিনি একবার একটা বানর ও একটা কুকুরের পুরোমস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় অপসারিত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদের জীবনের কিম্বা স্বাস্থ্যের কিছু মাত্র ব্যাঘাত বা বৈলক্ষণ্য হয় নাই—কেবল তাহাদের বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছিল মাত্র। তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-বোধ লোপ হয় নাই—ইন্দ্রিয়-স্নায়ু আনীত প্রতিবিম্ব সকল যে তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে তাহা স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। বুদ্ধির যন্ত্র অপসারিত করিবার পূর্ব্বে বাহ্য জগৎ তাহারা যেরূপ উপলব্ধি করিত, এখনও সেইরূপ করিতে লাগিল। কিন্তু যখন আবার কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক অপসারিত করা হইল, এবং যে তলস্থ উপমস্তিষ্ক শরীরের পৈষিক গতিকে নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্ক ভিন্ন মস্তিষ্কের আর কোন অংশ যখন অবশিষ্ট রহিল না তখন ইন্দ্রিয়বোধের ক্রিয়াও বন্ধ হইয়া গেল—কিন্তু তলস্থ উপমস্তিষ্ক তখনও থাকা প্রযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতি ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হয় নাই।

ইন্দ্রিয়-বোধ ক্রিয়ার আধার স্বরূপ যে কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক, তাহার উপর যে দুইটি মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধ অবস্থিত, তাহাই বুদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ। এই দুই মণ্ডলার্দ্ধের প্রত্যেক অর্দ্ধই স্বতন্ত্র ও স্বসম্পূর্ণ। প্রত্যেক অর্দ্ধই অপরার্দ্ধের সাহায্য ব্যতীত কার্য্য করিতে সক্ষম। উচ্চতর মানসিক ক্রিয়াই এই দুই মণ্ডলার্দ্ধের বিশেষ কার্য্য। উহাদের সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি—বিচার করি এবং অনুভব করি। এই মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধের কোন অংশ নষ্ট হইলে মনেরও কিয়দংশ অর্থাৎ কোন কোন মানসিক বৃত্তি নষ্ট হয়—সমস্ত মনের ক্রিয়াশক্তি নষ্ট হয় না।

এই মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয়ের সমস্তই নষ্ট হইয়া গেলে বুদ্ধি বিলুপ্ত হয় কিন্তু মৃত্যু সংঘটিত হয় না। পাঠকগণের এইটি যেন স্মরণ থাকে যে, সমস্ত মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান বিভাগ। বুদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি চূড়ায় অবস্থিত—ইন্দ্রিয়ের যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি কেন্দ্র-দেশে অবস্থিত—এবং শারীরিক গতি-ক্রিয়ার যন্ত্র স্বরূপ বিভাগটি তলদেশে অবস্থিত।

১। পুরোমস্তিষ্ক।

২। কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক।

৩। তলস্থ উপমস্তিষ্ক।

এই তিনটি প্রধান বিভাগের আবার অন্যান্য উপবিভাগ আছে—এ প্রসঙ্গে তাদের আলোচনা অনাবশ্যক।

জাগ্রৎ অবস্থায় কিম্বা প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সমস্ত মস্তিষ্কই জাগ্রৎ থাকে—এবং তাহার

সকল অংশই একত্র মিলিয়া কার্য্য করে—তাহাদের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষিতার ভাব আছে। বুদ্ধিবৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়বোধদিগকে সংশোধন করে; ইন্দ্রিয়বোধ সকল কল্পনা বৃত্তিকে সংশোধন করে; বুদ্ধি হৃদয়-গত ভাবের উপর কর্তৃত্ব করে—হৃদয়ের ভাব-সকল ইচ্ছা-শক্তির বলবিধান করে—ইচ্ছা শক্তি সমস্তের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিয়া বুদ্ধি এবং হৃদয়ের সম্মিলিত ক্রিয়াকে অর্থাৎ যাহাকে আমরা সচরাচর "মন" বলি সেই মনের ক্রিয়াকে—বাহ্য জগতের নিকট প্রকাশ করে।

নিদ্রাবস্থায় এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি ভাঙ্গিয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি সকল ইন্দ্রিয়বোধদিগকে আর সংশোধন করে না—ইন্দ্রিয়বোধ সকল কল্পনা-বৃত্তিকে আর সংশোধন করে না—হৃদয়ের ভাব-সকল ইচ্ছা-শক্তিকে সেরূপ আর উত্তেজিত করিতে পারে না—শরীর ও মনের উপর ইচ্ছা-শক্তির কর্তৃত্ব আর বলবৎ থাকে না। স্বপ্নহীন সুষুপ্তির সময় যাই হোক্ না কেন, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত মস্তিষ্ক যন্ত্র যে নিদ্রিত হয় না তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। উহার কিয়দংশ অবশ্য জাগ্রৎ ও সক্রিয় থাকে—সেই জাগ্রৎ অংশটি কোন্ অংশ?

ইহা নিশ্চিত যে, স্বপ্নাবস্থায় চূড়ান্ত-মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধদ্বয় সম্পূর্ণরূপে কিংবা আংশিকরূপে জাগ্রৎ থাকে। গভীর নিদ্রাবস্থায় ইন্দ্রিয়বোধের আধার—কেন্দ্রস্থ উপমস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত হয়। নিদ্রার সকল অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গণ নিদ্রিত থাকে—তবে, কখন কখন ততদূর গভীররূপে নিদ্রিত হয় না, যাহাতে করিয়া ইন্দ্রিয়-বাহিত প্রতিবিম্ব সকল চেতনাবান আত্মার একেবারেই অগোচর হইতে পারে। শারীরিক গতিক্রিয়াকে যে উপমস্তিষ্ক নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্কও নিদ্রার আয়ত্তাধীন। এইরূপেই নিদ্রার প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। শরীরের জড়-যন্ত্রকে বিশ্রাম দিবার নিমিত্ত—তাহার পরিবর্দ্ধন ও নবীকরণ-ক্রিয়ার জন্য তাহাকে সময় দিবার নিমিত্তই প্রধানতঃ নিদ্রার সৃষ্টি। এই নিমিত্তই, যে ইচ্ছা জাগ্রৎ অবস্থায় শরীরকে চালিত করে—নিদ্রাবস্থায় তাহার কর্তৃত্ব স্থগিত হইয়া যায়। স্বয়ং ইচ্ছা-শক্তি জাগ্রৎ থাকে—কারণ স্বপ্নাবস্থাতেও আমাদিগের ইচ্ছা অনুভব করিতে পারি—কিন্তু শরীরের জড়যন্ত্র নিদ্রিত থাকে বলিয়াই—আমাদিগের ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর পালন করে না—এই মাত্র।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে—মস্তিষ্কের কেন্দ্রস্থ ও তলদেশস্থ বিভাগই নিদ্রার আধার স্বরূপ। তাহারা নিদ্রিত না হইলে আমরা নিদ্রিত হই না। যদিও পুরো-মস্তিষ্ক মণ্ডলদ্বয়—সেই সময় সম্পূর্ণরূপে জাগ্রৎ থাকে তথাপি উপরোক্ত উপমস্তিষ্ক দ্বয় নিদ্রিত হইলেই আমরা নিদ্রিত হই।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমি ইংলণ্ড-দ্বীপটাকে এত ছোট, ও ইংলণ্ডের অধিবাসীদের এমন বিদ্যালোচনা-শীল মনে কোরেছিলেম যে, ইংলণ্ডে আস্‌বার আগে আমি আশা কোরেছিলেম যে, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত বুঝি টেনিসনের বীণা-ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হোচ্চে, মনে কোরেছিলেম, এই দুই হস্ত-পরিমিত ভূমির যেখানে থাকি না কেন, গ্লাডষ্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্‌মূলরের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুন্‌তে পাব, মনে কোরেছিলেম, যেখানে যাই না কেন intellectual আমোদ নিয়েই আবাল বৃদ্ধ বনিতা বুঝি উন্মত্ত, কিন্তু তাতে আমি ভারি নিরাশ হোয়েছি, মেয়েরা বেশ ভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম্ম কোর্‌চে, সংসার যেমন চোলে থাকে তেমনি চোল্‌চে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা কিছু কোলাহল শোনা যায়, তুমি যদি কোথা গেলে ত মেয়েরা জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, তুমি Ballএ গিয়েছিলে কি না, কন্সর্ট কেমন লাগ্‌ল, থিয়েটরে একজন নতুন actor এয়েচে, কাল অমুক জায়গায় ব্যাণ্ড হবে ইত্যাদি। পুরুষেরা বোল্‌বে, আফ্‌গান যুদ্ধের বিষয় তুমি কি বিবেচনা কর? Marquis of Lorneকে লণ্ডনীয়েরা খুব সমাদর কোরে-ছিল, আজ দিন বেশ ভাল, কালকের দিন বড় miserable ছিল। এদের মেয়েতে মেয়েতে যে সব গল্প চলে তা' শুন্‌লে তোমার ভারি মজা মনে হবে, একটি কুশ্রী বালিকার সঙ্গে একটি ধনী ব্যারিষ্টরের বিয়ে হওয়াতে তাই নিয়ে একটি স্ত্রীসভায় যে সমালোচনাটা চোল্‌ছিল, তা শুনে আমার চক্ষুস্থির হোয়ে গিয়েছিল—কুশ্রী মেয়ের বিয়ে হোয়ে গেলে এদেশের মেয়েদের প্রাণে বোধ হয় বড় আঘাত লাগে, মাতৃ-শ্রেণীর মধ্যে ভারি চোক-টেপাটেপি পোড়ে যায়, তাঁরা মনের যন্ত্রণায় আর কিছু কোরতে না পেরে আড়ালে আব্‌ডালে সে বেচারীর প্রতি যথাসাধ্য বিদ্রূপের বাণ বর্ষণ কোরতে থাকেন। মাতৃদলের মধ্যে যাঁদের কুশ্রী মেয়ে আছে, তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার যদি অমন ভাল বিয়ে হোয়ে গেল তবে আমার মেয়েরা কি অপরাধ কোরলে; যাঁদের সুশ্রী মেয়ে আছে তাঁরা মনে করেন অমুক মেয়েটার বিয়ে হোয়ে গেল আর আমার মেয়েদের হোল না? আর সাধারণ মিস্‌শ্রেণীদের ত রাগে ঘৃণায় অভিমানে বুক ফেটে যায়, যে বেচারীর সৌভাগ্যক্রমে বিয়ে হোয়ে গেছে যেন তার কত অপরাধ! যাঁরা সেই কুশ্রী মেয়ের রূপ নিয়ে সমালোচনা কচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি মেয়ে সুশ্রী

ছিলেন না, পুরুষের কুরূপ নিয়ে বিদ্রূপ করার অধিকার তাঁদের এক তিলও নেই। কাপড় চোপড় গয়না পত্র, কার চোক টেরা, কার নাক মোটা, কার ঠোঁট পুরু, কার বাঁ হাতের কোড়ে আঙ্গুলের নখের কোন্ বাঁকা—এই সব নিয়ে এখানকার মেয়েতে মেয়েতে ভারি হাসি-তামাসা চোলে থাকে; আমার যত খানি অভিজ্ঞতা (যদিও খুব কম) তাতে তো আমি এই রকম দেখেছি। এদেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজায়, গান গায়, আগুনের ধারে আগুন পোয়ায়, সোফায় ঠেসান দিয়ে নভেল পড়ে, ভিজিটরদের সঙ্গে আলাপ-চারি করে ও আবশ্যক বা অনাবশ্যক মতে যুবকদের সঙ্গে flirt করে, এইত আমার অভিজ্ঞতা। কিন্তু এদেশের old maid শ্রেণীরা ভয়ঙ্কর কাজের লোক। Temperance Meeting, Working men's Society প্রভৃতি যত প্রকার সংস্কারের কোলাহল আছে, সমুদয়ের মূলে তাঁরা আছেন। পুরুষদের মত তাঁদের আপিসে যেতে হয় না; মেয়েদের মত তাঁদের ছেলে পিলে মানুষ কোরতে হয় না, এদিকে হয়ত অত বয়স হোয়েছে যে "বলে" গিয়ে নাচ্‌লে বা flirt কোরে সময় কাটালে দশ জনে হাস্‌বে, হাতে তাঁদের সময় অগাধ পোড়ে রোয়েছে, তাই জন্যে তাঁরা অনেক কাজ কোর্‌তে পারেন, বাস্তবিক তাতে অনেক উপকার হয়, বিদেশ থেকে আমরা এই মেয়েদেরই নাম বেশী শুন্‌তে পাই—কিন্তু এদের থেকেই যদি সমস্ত বিলিতি মেয়েদের বিচার কোর্‌তে যাও তবে হয়ত ভ্রমে পোড়বে—এখানকার বিবিরা দরজি-শ্রেণীর জীবিকা, ফ্যাসান্-রাজ্যের বিধাতা ও মুরুব্বি দলের খেলানা স্বরূপ, খেলানা আমি এই অর্থে বল্‌চি—যে, যখনি কারো সন্ধ্যের সময় একটু সময় কাটাবার আবশ্যক হোল, দুই একটি মিসের সঙ্গে হয়ত তিনি Sentimental অভিনয় কোরে এলেন। পুরুষদের মন ভোলানোই মেয়েদের জীবনের একমাত্র ব্রত, যদি এক জন পুরুষের মন ভোলাতে পারেন তবে মনে কোরলেন জীবনের একটা মহান্ লক্ষ্য সিদ্ধ হোল, পূর্ব্ব জন্মের অনেক তপস্যা সার্থক হোল, মন ভোলানো যজ্ঞে তাঁদের নিজের সুখ-স্বাস্থ্য বলিদান দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত নন, কোমর এঁটে এঁটে তাঁরা বোল্‌তার মত কোমর কোরে তুনবেন, তার জন্যে তাঁরা সকল প্রকার যন্ত্রণা সহ্য কোরতে ও সকল প্রকার রোগ সঞ্চয় কোরতেও রাজি আছেন। বাহারে কাপড় পোরে মাথায় গোটা কতক পালক গুঁজে দিন রাত্রি তাঁরা পুতুলটি সেজে আছেন, অভিনয় কোরে কোরে এমন তাঁদের অভ্যাস হোয়ে গেছে যে অস্বাভাবিকও তাঁদের স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। যে মেয়ের সাজসজ্জা সৌন্দর্য্য বাইরে থেকে খুব স্বাভাবিক ও অযত্ন-সাধ্য বোলে মনে হয়, যাদের কথা বার্ত্তার মাধুরীতে আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না, মনে হয় affectation আদোবে জানে না, তারাই হয় তো পাকা affectation জানে। এমন হোতে পারে যে, একজন মেয়ে হয়ত পুরুষের প্রেমে পোড়েছে, সেই পুরুষের হৃদয় অধিকার করাই তার মুখ্য

উদ্দেশ্য, কিন্তু তাই বোলেই যে তিনি নিশ্চিন্ত হোয়ে বোসে থাকেন, তা প্রায় দেখা যায় না—যেমন অনেক শিকারী, খাবার জন্যে পাখী মারতে যায় না, তাদের বন্দুকের লক্ষ্য সিদ্ধ হোল বোলে আরাম পায়, হৃদয় অধিকার কোরতে এঁরাও সেই আরাম পান। আমি মন ভোলাবার জন্য এ রকম হাব ভাব, হাত পা নাড়া, গলা সেধে সরু করা, মিষ্ট ভাবের হাসি বের করা দু চক্ষে দেখতে পারিনে, হাব ভাবে আমার মন বোধ হয় কেউ ভোলাতে পারে না—পুরুষদের মন ভোলানো যাদের জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য, সেই মেয়েদের দেখলে আমার বড় মায়া হয়—যেন তাদের নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। আমাদের দেশের মেয়েদের চেয়ে এদেশের মেয়েদের বেশী উন্নতি কি দেখছি জান?—না, এঁরা সাজগোজের শাস্ত্রে আমাদের চেয়ে বেশী ব্যুৎপত্তি লাভ কোরেচেন, আর লেখা পড়া শিখেছেন। লেখা পড়া শিখেছেন অর্থে এখানে এই রকম বোঝাচ্ছে যে নভেল পড়বার সময় এঁদের কখনো ডিক্সনারী খোলবার আবশ্যক হয় না! আমি মনে কোরতেম intellectual খাদ্যই এদেশের লোকদের মনের এক মাত্র খোরাক—আমি মনে কোরতেম,এদেশের মেয়েরাও intellectual আমোদকেই প্রধান আমোদ মনে করে ও নাচ তামাসাকে তার নীচে স্থান দেয়। যদিও এদেশের মেয়েদের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা সুরু হোয়েচে, কিন্তু সে এত অল্প যে, তা' কারো নজরেই আসে না। বিলেতে এসে আমি অনেক বিষয়ে নিরাশ হোয়েছি। এখানে দ্বারে দ্বারে মদের দোকান। আমি রাস্তায় বেরোলে জুতোর দোকান, দরজীর দোকান, মাংসের দোকান, খেলনার দোকান রাশ রাশ দেখতে পাই কিন্তু বইয়ের দোকান ছুটো দেখতে পাইনে—আমিত একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেছি। আমাদের একটি শেলীর কবিতা কেনবার আবশ্যক হোয়েছিল কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে বইয়ের দোকান না দেখে এক জন খেলনা-ওয়ালাকে সেই বই আনিয়ে দিতে হুকুম কোরতে হোয়েছিল—আমি আগে জানতেম, এ দেশে একটা কসাইয়ের দোকান যেমন দরকারী একটা বইয়ের দোকানও তেমনি!

ইংলণ্ডে এলে সকলের চেয়ে চোখে কি পড়ে জান, লোকের ব্যস্তভাব। রাস্তা দিয়ে যারা চলে তাদের মুখ দেখতে মজা আছে—বগলে ছাতি নিয়ে হস্ হস্ কোরে চোলেছে, পাশের লোকদের ওপর ভ্রূক্ষেপ নেই, মুখে মহা ব্যস্ত ভাব প্রকাশ পাচ্চে—সময় তাদের ফাঁকি দিয়ে না পালায় এই তাদের প্রাণ পণ চেষ্টা। ইংলণ্ডে যে কত রেলোয়ে আছে তার ঠিকানা নেই—সমস্ত লণ্ডন-ময় রেলোয়ে—প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর এক একটা ট্রেন যাচ্চে। একটা রেলোয়ে ষ্টেশনে গেলে দেখা যায়, পাশাপাশি যে কত শত লাইন রোয়েচে তার ঠিক নেই। লণ্ডন থেকে ব্রাইটনে আসবার সময় দেখি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ট্রেণ দিচ্চে

একটা, নীচে দিয়ে একটা, পাশ দিয়ে একটা, এমন চারদিক থেকে হুস্‌হাস্ কোরে ট্রেন ছুটেছে—সে ট্রেন-গুলোর চেহারা দেখ্‌লে আমার লণ্ডনের লোক মনে পড়ে—এদিক থেকে ওদিক থেকে মহা ব্যস্তভাবে হাঁস্ ফাঁস্ কোর্‌তে কোর্‌তে চোলেছে, এক তিল সময় নষ্ট কোর্‌লে চলে না! দেশ ত দুই এক রত্তি, নোড়ে চোড়ে বেড়াবার জায়গা নেই, দু পা চোল্লেই ভয় হয় পাছে সমুদ্রে গিয়ে পড়ি, এখানে এত ট্রেন যে কেন ভেবে পাইনে! আমরা এক বার লণ্ডনে যাবার সময় দৈবাৎ ট্রেন মিস্ কোরেছিলেম, কিন্তু তার জন্যে বাড়ি ফিরে আস্‌তে হয় নি, তার আধ ঘণ্টা পরেই আর এক ট্রেন এসে হাজির!

জীবিকার জন্যে এদেশে যেমন যুঝা-যুঝি এমন আর কোথাও দেখি নি! এ দেশের লোক প্রকৃতির আদুরে ছেলে নয়—কারু নাকে তেল দিয়ে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বোসে থাক্‌বার যো নেই—একেত আমাদের দেশের মত এদেশের জমীতে আঁচড় কাট্‌লেই শস্য হয় না, তাতে শীতের সঙ্গে মারামারি কোর্‌তে হয়—প্রথমতঃ শীতের উপদ্রবে এদের কত কাপড় দরকার হয় তার ঠিক নেই—তার পরে কম খেলে এ দেশে বাঁচ্‌বার যো নেই, শরীরে তাপ রক্ষা কোর্‌বার জন্যে অনেক খেতে হয়, এ দেশের লোকের কাপড়, কয়লা, খাওয়া অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে না থাক্‌লে চলে না, তার ওপরে আবার মদ আছে। আমাদের বাঙ্গলার খাওয়া নাম মাত্র, কাপড় পরাও তাই। এ দেশে Fittest রাই Survive করে, এ দেশে যার ক্ষমতা আছে সেই মাথা তুল্‌তে পারে, দুর্ব্বল লোকদের এখানে রক্ষা নেই—একে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ কোর্‌তে হয়, তাতে কার্য্য-ক্ষেত্রে সহস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রোখারুখি কোর্‌চে।

এ দেশের ছোট লোকদের দেখ্‌লে মনে হয় না তাদের কিছু মাত্র মনুষ্যত্ব আছে—তারা যেন পশু থেকে এক ধাপ উঁচু। তাদের মুখ দেখ্‌লে—নিদেন তাদের মধ্যে এক এক জনের মুখ দেখ্‌লে আমার কেমন গা শিউরে ওঠে—তাদের মুখ দেখে আর কেউ "human face divine" বোল্‌তে পারে না—পশুত্ব ভাব-ব্যঞ্জক তাদের সেই লাল-লাল মুখ দেখ্‌লে কেমন ঘৃণা হয়! আর, তারা যে মদ্‌লা তা' আর কি বোল্‌ব। এই সে দিন একটা পুলিসের মোকদ্দমা দেখ্‌ছিলেম; একটা ছোট লোকের ছেলে মজা দেখবার জন্যে একটা ঘোড়ার জিব টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল, এমন পশুত্ব কখনো শুনেছ?

ক্রমে ক্রমে এখানকার দুই এক জন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হোতে চোল্লো। একটা মজা দেখ্‌চি, এখানকার লোকেরা আমাকে অতি-দুগ্ধ-পোষ্য বালকের মত মনে করে। মনে করে, ইণ্ডিয়া থেকে এসেচে কিছু জানে না, শোনে না, এ-কে দুচারটে জিনিষ দেখিয়ে-শুনিয়ে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দেওয়া ভাল। এক দিন Dr—এর ভাইয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছিলেম, সে যে আমাকে বিরক্ত কোরে

তুলেছিল তা আর বল্‌বার কথা নয়। একটা দোকানের সুমুখে কতকগুলো ফোটোগ্রাফ ছিল—সে মনে কোরেছিল, ফোটোগ্রাফ দেখে আমার একেবারে তাক্ লেগে যাবে—চক্ষু স্থির হোয়ে যাবে—সে আমাকে সেই খানে নিয়ে গিয়ে ফোটোগ্রাফের মহা ব্যাখ্যান কোর্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে—সে আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এক রকম যন্ত্র দিয়ে ঐ ছবি-গুলো তৈরি হয়, মানুষে হাতে কোরে আঁকে না—আমার চার দিকে লোক দাঁড়িয়ে, আমার এমন লজ্জা কোচ্ছিল! আমি তাকে বিশেষ কোরে বল্লেম যে, আমি ও খবরগুলি বিশেষ কোরে জানি, কিন্তু সে বিশ্বাস কোরবে কেন? একটা ঘড়ির দোকানের সাম্‌নে গিয়ে, ঘড়িটা যে একটা খুব আশ্চর্য্য যন্ত্র তাই আমার মনে সংস্কার জন্মাবার জন্যে চেষ্টা কোর্‌তে লাগ্‌লেন; আমিত তাঁর অনুগ্রহের জ্বালায় একেবারে জ্বালাতন হোয়ে গিয়েছিলেম! একটা Evening party তে miss——আমাকে জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিলেন, আমি এর পূর্ব্বে পিয়ানোর ডাক শুনেছি কি না? এ দেশের অনেক লোক হয়ত পরলোকের একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের সম্বন্ধে যদি এক বিন্দুও খবর জানে! ভারতবর্ষের লোকেরা গোখাদক নয় শুনলে হয়ত তারা চার দণ্ড হাঁ কোরে থাকে—ইংলণ্ড থেকে কোন দেশের যে কিছু তফাৎ আছে তা তারা কল্পনাও কোর্‌তে পারে না। ভারতবর্ষের কথা দূরে থাক্—সাধারণ লোকেরা কত বিষয় জানে না তার ঠিক নেই। এই মনে কর,——ডাক্তারকে আমার শিক্ষক——খুব educated man বোলে সুখ্যাতি কোরে থাকেন কিন্তু তিনি shelly বোলে যে এক জন কবি তাঁদের দেশে জন্মেছিল সেই খবর টুকু মাত্র জানেন, কিন্তু শেলী যে চেঞ্চি (Cenci) বোলে এক খানা নাটক লিখেছেন, বা তাঁর Episychidon বোলে যে একটি কবিতা আছে, তা' আমার মুখে প্রথম শুন্‌তে পেলেন!

ভগ্নতরী।

(গাথা)

প্রথম সর্গ।

ডুবিছে তপন, আসিছে আঁধার,
দিবা হোল অবসান!
ঘুমায় সাঁঝের সাগর, করিয়া
কনক-কিরণ পান।

অলস-মহরী তটের চরণে
ঘুমে পড়িতেছে ঢুলি,
এ উহার গায়ে পোড়েছে ঢলিয়া
ভাঙ্গাচোরা মেঘ গুলি,

কনক-সলিলে লহরী তুলিয়া
তরণী ভাসিয়া যায় ;
উড়িয়াছে পাল, নাচিছে নিশান,
বহে অনুকূল-বায়।
শত কণ্ঠ হোতে সাঁঝের আকাশে
উঠিছে সুখের গীত,
তালে তালে তার, পড়িতেছে সাড়
ধ্বনিতেছে চারি ভিত !
বাজিতেছে বীণা, বাজিতেছে বাঁশি,
বাজিতেছে ভেরী কত,
কেহ দেয় তালি, কেহ ধরে তান,
কেহ নাচে জানহত !
তারকা উঠিছে ফুটিয়া ফুটিয়া,
আকাশে উঠিছে শশি,
উছলি উছলি উঠিছে সাগর
জোছনা পড়িছে খসি !
অতি নিরিবিলি, নিরালয় এক—
না-মিশিয়া কোলাহলে—
ললিতা হোথায়, পতি সাথে তার
বসি আছে গলে গলে।
অজিতের গলে বাঁধি বাহুপাশ
বুকেতে মাথাটি রাখি,
ঢল ঢল দেহ—গল' গল' কথা
ঢুলু ঢুলু দুটি আঁখি।
আধো আধো হাসি অধরে জড়িত,
সুখের নাহিক ওর,
প্রণয়-বিভল প্রাণের মাঝারে
লেগেছে ঘুমের ঘোর !
পরশিছে দেহ নিশীথের বায়ু
শান্তি ধীর মৃদু-শ্বাসে,
লহরীরা আসি করে কলরব
তরণীর আশে পাশে।
মধুর মধুর সকলি মধুর—
মধুর আকাশ ধরা !
মধু-রজনীর মধুর অধর
মধুর জোছনা ভরা।
যেতেছে দিবস, চলেছে তরণী
অনুকূল বায়ু ভরে।
ছোট ছোট ঢেউ মাথা-গুলি তুলি
টল মল করি পড়ে।
প্রণয়ীর কাল যেতেছে তুলিয়া
শত বরণের পাখা—
মৃদু বায়ু ভরে লঘু মেঘ যথা
সাঁঝের কিরণ মাখা !
আদরে ভাসিয়া গাহিছে অজিত
চাহি ললিতার পানে—
মরম গলানো সোহাগের গীত
আবেশ-অবশ প্রাণে ;—

পাগলিনী তোর লাগি কি আমি করিব বল ?
কোথায় রাখিব তোরে খুঁজে না পাই ভূমণ্ডল
আদরের ধন তুমি—আদরে রাখিব আমি
আদরিণি,তোর লাগি পেতেছি এ বক্ষ স্থল।
আয় তোরে বুকে রাখি,তুমি দেখ আমি দেখি,
শ্বাসে শ্বাস মিশাইব আঁখি জলে আঁখি জল।

হরষে কভুবা গাইছে ললিতা
অজিতের হাত ধরি,
মুখ পানে তার চাহিয়া চাহিয়া
প্রেমে আঁখি দুটি ভরি।
ওই কথা বল সখা, বল আরবার,
ভাল বাস' মোরে তাহা বল বারবার !

কতবার শুনিয়াছি—তবুও আবার যাচি,
ভাল বাসো মোরে তাহা বল গো আবার!

সন্ধ্যে দিকবধূ স্তব্ধ ভয় ভারে,
একটি নিশ্বাস পড়ে না তার ;
ঈশান-গগনে করিছে মন্ত্রণা
মিলিয়া অযুত জলদ-ভার,
তড়িত-কৃপাণে বিঁধিয়া বিঁধিয়া
ফেলিছে আঁধারে শতধা করি,
দূর ঝটিকার রথ চক্ররব
ঘোষিছে অশনি ত্রিলোক ভরি।
সহসা উঠিল গরজন এক
প্রলয় ঝটিকা আসিছে ছুটে,
ছিন্ন মেঘ-জাল দিগ্বিদিক ধায়,
ফেনিল তরঙ্গ আকুলি উঠে,
পাগলের মত তরী-যাত্রী যত
যেথা সেথা ছুটে তরণী পরে,
ছিঁড়িতেছে কেশ, হানিতেছে বুক,
এ উহারে ডাকে অধীর স্বরে;
ছিন্ন-তার বীণা যায় গড়াগড়ি,
অধীরে ভাঙ্গিয়া ভেলেছে বাঁশি,
ঝটিকার স্বর দিতেছে ডুবায়ে
অযুত কঠোর বিলাপ রাশি!
তরণীর পাশে নীরব অজিত,
ললিতা অবাক্ হিয়া—
মাথাটি রাখিয়া অজিতের কাঁধে
রহিয়াছে দাঁড়াইয়া।
কি ভয় মরণে, এক সাথে যবে
মরিবে দুজনে মিলি?
মুকুতা শয়নে সাগরের তলে
ঘুমাইবে নিরিবিলি!

দুইটি প্রণয়ী বাঁধা গলে গলে
রহিয়াছে পাশাপাশি,
পশিকেনা সেথা ঘোর কোলাহল,
কুটিল কঠোর হাসি।
ঝটিকার মুখে দুরবল তরী
করিতেছে টলমল,
উঠিছে, নামিছে, আছাড়ি পড়িছে
ভিতরে উঠিছে জল।
বাঁধিল ললিতা অজিতের বাহু
দৃঢ় তর বাহু ডোরে,
আদরে অজিত ললিত-অধর
চুমিল হৃদয় ভোরে।
ললিতা-কপোলে বাহিয়া পড়িল
একটি নয়ন জল,—
একটু কেমন বিষাদের ঘোর
ঘিরিল হৃদয় তল!
"আয় সখি আয়," কহিল অজিত
হাত ধরাধরি করি—
দুজনে মিলিয়া ঝাঁপায়ে পড়িল,
অধীর সাগর পরি॥

দ্বিতীয় সর্গ।

নবরবি সুবিমল কিরণ ঢালিয়া,
নিশার আঁধার রাশি ফেলিল ক্ষালিয়া।
ঝটিকার অবসানে প্রকৃতি সহাস,
সংযত করিছে তার এলোথেলো বাস।
খেলায়ে খেলায়ে শ্রান্ত সারাটি যামিনী,
মেঘ-কোলে ঘুমাইয়া পোড়েছে দামিনী।
শান্ত লহরীরা এবে শ্রান্ত পদক্ষেপে ;—
উপল রাশির গায়ে পড়ে কেঁপে কেঁপে।

দ্বীপের শৈলের শির প্লাবিত করিয়া।
অজস্র কনক ধারা পড়িছে ঝরিয়া।
মেঘ, দ্বীপ, জল, শৈল, সব সুরঞ্জিত,
সমস্ত প্রকৃতি গায় স্বর্ণময় গীত।
বহু দিন হোতে এক ভগ্নতরী জন
করিছে বিজন দ্বীপে জীবন যাপন।
বিজনতা-ভারে তার অবসন্ন বুক,
কত দিন দেখে নাই মানুষের মুখ।
এত দিন মৌন আছে না পেয়ে দোসর,
শুনিলে চমকি উঠে আপনার স্বর!
সুরেশ প্রভাতে আজি ছাড়িয়া কুটীর
ভ্রমিতে ভ্রমিতে এল সাগরের তীর।
সাগর সে ভাষাহীন বান্ধব তাহার,
পেয়েছে কতনা তার অজস্র উপহার।
বিমল প্রভাতে আজি শান্ত সমীরণ
ধীরে ধীরে করিতেছে দেহ আলিঙ্গন।
নীরবে ভ্রমিছে কত—একিরে—একিরে—
সুমুখে কি দেখিতেছি সাগরের তীরে?
রূপসী ললনা এক রোয়েছে শয়ান,
প্রভাত-কিরণ তার চুমিছে বয়ান;
মুদিত নয়ন দুটি, শিথিলিত কায়;
সিক্ত কেশ এলোথেলো শুভ্র বালুকায়।
প্রতিক্ষণে লহরীরা চলিয়া বেলায়,
এলানো কুন্তল লোয়ে কতনা খেলায়।
বহু দিন পরে যথা কারামুক্ত জন
হর্ষে অধীরিয়া উঠে হেরিয়া তপন,
বহুদিন পরে হেরি মানুষের মুখ,
উচ্ছ্বসি উঠিল হর্ষে সুরেশের বুক।
দেখিল এখনো বহে নিশ্বাস-সমীর,
এখনো তুষার-হিম হয়নি শরীর!
যতনে লইল তারে বাহুতে তুলিয়া,
কেশ পাশ চারি পাশে পড়িল খুলিয়া।
সুকুমার মুখ-খানি রাখি স্কন্ধোপরে,
দ্রুত পদে প্রবেশিল কুটীর ভিতরে।
কতক্ষণ পরে তবে লভিয়া চেতন,
ললিতা সুধীরে অতি মেলিল নয়ন।
দেখিল যুবক এক রোয়েছে আসীন,
বিশাল নয়ন তার নিমেষ বিহীন;
কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি গৌর গ্রীবা পরে—
এলাইয়া পড়ি আছে অতি অনাদরে।
চমকি উঠিল বালা বিস্ময়ে বিহ্বল,
সরমে সত্বরে তার শিথিল অঞ্চল।
ভয়েতে অবশ দেহ, দুরু দুরু হিয়া—
আকুল হইয়া কিছু না পায় ভাবিয়া।
সহসা তাহার মনে পড়িল সকলি—
সহসা উঠিল বসি নব-বলে বলী।
সুরেশের মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া,
পাগলের মত বালা উঠিল কহিয়া;
"কেন বাঁচাইলে মোরে কহ-মোরে কহ—
দুই প্রণয়ীর কেন ঘটালে বিরহ?
অনন্ত মিলন যবে হইল অদূর—
দ্বার হোতে ফিরাইয়া আনিলে নিষ্ঠুর!
দয়া কর একটুকু দুখিনীর প্রতি,
দিওনা তাপস-বর বাধা এক রতি—
মরিব—নিভাব প্রাণ সাগরের জলে
মিলিব সখার সাথে নীল সিন্ধুতলে,
উপরে উঠিবে ঝড়—উর্ম্মি শৈলাকার,
নিম্নে কিছু পশিবে না গোলাহল তার!"

তৃতীয় সর্গ।

মরমের ভার বহি—দারুণ যাতনা সহি
ললিতা সে কাটাইছে দিন।

নয়নে নাই সে জ্যোতি—হৃদয় অবশ অতি
শরীর হইয়া গেছে ক্ষীণ।
আলু থালু কেশ পাশ, বাঁধিতে নাহিক আশ,
উড়িয়া পড়িছে থাকি থাকি।
কি করুণ মুখ খানি—একটি নাইক বাণী
কেঁদে কেঁদে শ্রান্ত দুটী আঁখি।
যে দিকে চরণ ধায়,সে দিকে চোলেছে হায়,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নাই মনে,
গাছের কাঁটার ধার, ছিঁড়িছে আঁচল তার
লতা-পাশ বাধিছে চরণে।
একাকী আপন মনে, ভ্রমিতে ভ্রমিতে বনে
যাইত সে তটিনীর তীরে,
লতায় পাতায় গাছে—আঁধার করিয়া আছে,
সেই খানে শুইত সুধীরে।
জল কলরব রাশি, প্রাণের ভিতরে আসি
ঢালিত কি বিষাদের ধারা!
ফাটিয়া যাইত বুক, বাহুতে ঢাকিয়া মুখ
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হোত সারা।
কানন-শৈলের পায়ে, মধ্যাহ্নে শৈলের ছায়ে
মলিন অঞ্চলে রাখি মাথা,
কতকি ভাবিত হায়—উচ্ছ্বসি উঠিত বায়
ঝরিয়া পড়িত শুক পাতা।
একাকী নীরব রাতে—উঠিয়া শৈলের মাথে
বসিয়া রহিত একাকিনী—
তারা-পানে চেয়ে চেয়ে,কতকি ভাবিত মেয়ে,
পড়িত কি বিষাদ কাহিনী!
কি করিলে ললিতার—ঘুচিবে হৃদয় ভার
সুরেশ না পাইত ভাবিয়া—
কাতর হইয়া কত, যুবা তারে শুধাইত,
আগ্রহে অধীর তার হিয়া।

"রাখ কথা, শুন সখি, একবার বল দেখি,
কি করিব তোমার লাগিয়া?
কি চাও,কি দিব বালা,বল গো কিসের জ্বালা?
কি করিলে জুড়াবে ও হিয়া?
বল কি করিতে পারি, মুছাতে ও অশ্রুবারি?
ও হৃদি-অনল নিভাইতে?
যদি বিন্দু হাসি-রেখা, ও অধরে দেয় দেখা
ঐ জীবন পারি সমর্পিতে!"
করুণ মমতা পেয়ে—সুরেশের মুখ চেয়ে
অশ্রু উচ্ছ্বসিল ঝর ঝরে।
ললিতা কাতর রবে রুদ্ধ কণ্ঠে কহে তবে
"সখা গো ভেবনা মোর তরে,
আমারে দিওনা দেখা—বিজনে রহিব একা
বিজনেই নিপাতিব দেহ।
এ দগ্ধ জীবন মোর, কাঁদিয়া করিব ভোর
জানিতেও পারিবে না কেহ!"
সুরেশ ব্যথিত-হিয়া, একেলা বিজনে গিয়া
অবিত-কাঁদিত আনমনে—
প্রাণপণ করি তার, তবুও ত ললিতার
পারিল না অশ্রু বিমোচনে।
সুরেশ প্রভাতে উঠি—সারাটি কানন লুটি
তুলিয়া আনিত ফুল-ভার,
ফুলগুলি বাছি বাছি, গাঁথি লোয়ে মালা গাছি
ললিতারে দিত উপহার।
নির্ঝরে লইত জল—তুলিয়া আনিত ফল
আহারের তরে বালিকার।
যতন করিয়া কত—পর্ণ-শয্যা বিছাইত
গুছাইত ঘর খানি তার।

শীতের তীব্রতা সহি—তপন কিরণে দহি
করিয়া শতেক অত্যাচার

মনের ভাবনা মনে অবসন্ন কলেবরে,
পীড়া অতি হল ললিতার।
অনলে দহিছে বুক—শুকায়ে গেছেছে মুখ
শুষ্ক অতি রসনা তৃষায়,
নিশ্বাস অনলময়—শয্যা অগ্নি মনে হয়
ছট ফট করে যাতনায়।
ত্যজিয়া আহার পান—সারা রাত্রি দিন মান
সুরেশ করিছে তার সেবা—
তৃষার্ত্ত অধরে তার—ঢালিছে সলিল ধার
ব্যজন করিছে রাত্রি দিবা।
নিশীথে সে রুগ্ন-ঘরে, একটি শিলার পরে
দীপ-শিখা নিভ' নিভ' বারে—
জ্যোতি অতি ক্ষীণতর,ছুপা হোয়ে অগ্রসর,
অন্ধকারে যেতেছে হারায়ে।
আকুল নয়ন মেলি—সুধীরে নিশ্বাস ফেলি
সুরেশ সে ব্যাকুলিত হিয়া
শিয়রের সন্নিধানে বসিয়া, সে মুখ পানে
এক দৃষ্টে রহিত চাহিয়া।
বিকারে ললিতা যত—বকিত পাগল মত,
ছট ফট করিত শয়নে—
ততই সুরেশ হিয়া—উঠিত গো ব্যাকুলিয়া,
অশ্রুধারা পূরিত নয়নে।
যখনি চেতনা পেয়ে—ললিতা উঠিত চেয়ে,
দেখিত সে শিয়রের কাছে,
ম্লান-মুখ করি নত—নিস্তব্ধ ছবির মত
সুরেশ নীরবে বসি আছে।
মনে তার হোত তবে, এবুঝি দেবতা হবে
অসহায়া অবলা বালারে
করুণা-কোমল প্রাণে, এঘোর বিজন স্থানে
রক্ষা করে নিশার আঁধারে।
অশ্রুধারা দরদরি—কপোলে পড়িত ঝরি
সুরেশের ধরি হাত খানি
কৃতজ্ঞতা পূর্ণ প্রাণে, আঁখি তুলি মুখ পানে
নীরবে কহিত কত বাণী!
রোগের অনল-জ্বালা,সহিতে না পারি বালা
করিত সে এ পাশ ও পাশ!
হেরিয়ে করুণাময় সুরেশের আঁখিদ্বয়—
অনেক যাতনা হোত হ্রাস।
ফল মূল অন্বেষণে—যুবা যবে যেত বনে
একেলা ঠেকিত ললিতার।
চাহিত উৎসুক-হিয়া—প্রতি শব্দে চমকিয়া
সমীরণে নড়িলে দুয়ার।
বনে বনে বিহরিয়া—ফুল ফল আহরিয়া—
সুরেশ আসিত যবে ফিরে—
আঁখি পাতা বিমুদিত—অতিমৃদু উঠাইত
হাসিটি উঠিত ফুটে ধীরে।
দিন রাত্রি নাহি মানি—বনৌষধি তুলি আনি
সুরেশ করিছে সেবা তার।
রোগ চলি গেল ধীরে,বল ক্রমে পেলে ফিরে,
সুস্থ হোলো দেহ ললিতার।
রোগ-শয্যা তেয়াগিয়া—মুক্ত সমীরণে গিয়া,
মন-সুখে বনে বনে ফিরি,
পাখীর সঙ্গীত শুনি—সিন্ধুর তরঙ্গ গুনি,
জীবনে জীবন এল ফিরি!

চতুর্থ স্বর্গ।

বসন্ত-সমীর আসি, কাননের কানে কানে
প্রাণের উচ্ছ্বাস ঢালে নব-যৌবনের গানে।
এক ঠাঁই পাশাপাশি, ফুটে ফুল রাশি রাশি—
গলাগলি ফুলে ফুলে, গায়ে গায়ে ঢলাঢলি।

খেলি প্রতি ফুল পরে, সুরভি রাশির ভরে
শ্রান্ত সমীরণ পড়ে প্রতি পদে টলি টলি।
কোথায় ডাকিছে পাখী, খুঁজিয়া না পায় আঁখি
বনে বনে চারিদিকে হাসিরাশি বাদ্যগান।
দুরগম শৈল যত, ঢাকা লতা গুল্মে শত
তাদের হরিত হৃদে তিল মাত্র নাই স্থান।
ললিতার আঁখি হোতে শুকায়েছে অশ্রুধার।
বসন্ত-গীতির সাথে বাজিছে হৃদয় তার।
পুরাণো পল্লব ত্যজি নব-কিশলয়ে যথা
চারি দিকে বনে বনে সাজিয়াছে তরুলতা,—
তেমনি গো ললিতার হৃদয় লতাটি ঘিরে
নবীন হরিত-প্রেম বিকশিছে ধীরে ধীরে।
ললিতা সে সুরেশের হাতে হাত জড়াইয়া
বসন্ত হসিত বনে, ভ্রমিত হরষ মনে,
করুণ চরণ ক্ষেপে ফুল রাশি মাড়াইয়া!
একটি দুর্গম শৈল সাগরে পোড়েছে ঝুঁকি
অতি ক্লেশে সেথা উঠি, বসিয়া রহিত দুটি
সায়াহ্ন কিরণ, জলে করিত গো ঝিকি মিকি।
লহরীরা শৈল পরে, শৈবাল গুলির তরে
দিন রাত্রি খুদিতেছে নিকেতন শিলাসার।
ফুল ভরা গুল্মগুলি, সলিলে পোড়েছে ঝুঁলি
তরঙ্গের সাথে সাথে ওঠে পড়ে শতবার।
বিভলা মেদিনী বালা, জোছনা-মদিরা পানে,
হাসিছে সরসী এক কাননের মাঝ খানে,
সুরেশ যতনে অতি বাঁধি তরুশাখা গুলি,
নৌকা নিরমিয়া এক সরসে দিয়াছে খুলি,—
চড়ি সে নৌকার পরে, জ্যোৎস্না-সুপ্ত সরোবরে
সুরেশ মনের সুখে ভ্রমিতেছে ফিরি ফিরি,
ললিতা থাকিত শুয়ে— কোলে তার মাথাপুয়ে
মৃদুমৃদু মধুমাখা গান গেয়ে ধীরি ধীরি।
যদি কভু সায়াহ্নের বিষণ্ণ কিরণ-জালে,
অথবা জোছনা যবে ঘুমন্ত সৌন্দর্য্য ঢালে,
মৃদুমৃদু বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ লাগি,
সহসা ললিতা হৃদি—আকুলি উঠিত যদি—
সহসা দুয়েক কথা স্মরণে উঠিত জাগি,—
সহসা একটি শ্বাস বাহিরিত আনমনে,
দুইটি অশ্রুর রেখা দেখা দিত দুনয়নে!
অমনি সুরেশ আসি ধরি তার মুখ খানি,
কহিত করুণ-স্বরে কত আদরের বাণী।
মুছাইত আঁখি ধারা যতন করিয়া অতি,
শরত মেঘের মত হৃদয় আঁধার যত
মুহূর্ত্তে ছুটিত আর ফুটিত হাসির জ্যোতি।
অমনি সে সুরেশের কাঁধে মুখ লুকাইয়া
আধো কাঁদি আধো হাসি, হৃদয়ের ভার-রাশি
সোহাগের পারাবারে দিত সব বিসর্জ্জিয়া।

পঞ্চম সর্গ।

নারিকেল-তরুকুঞ্জে বসিয়া দোঁহায়
একদা সেবিতেছিল প্রভাতের বায়;—
সহসা দেখিল চাহি প্রাণ পণে দাঁড় বাহি
তরণী আসিছে এক সে দ্বীপের পানে,
দেখিয়া দোঁহার হিয়া, উঠিল গো উথলিয়া
বিস্ময় হরষ আর নাহি ধরে প্রাণে!
সহস্র ফুটুক ফুল, গাহুক বিহগ কুল
অনন্ত বসন্ত সেথা করুক বিরাজ—
তবু সে বিষম ঠাঁই, যেথায় মানুষ নাই
মানুষ খুঁজিতে থাকে মনুষ্য সমাজ।
হরষে ভাবিল দোঁহে দেশে যাবে ফিরে
কুটীর বাঁধিবে এক বিপাশার তীরে।
দুখ শোক ভুলি গিয়া···একত্রে দুইটি হিয়া
সুখে জীবনের পথে করিবে ভ্রমণ
একত্রে দেখিবে দোঁহে সুখের স্বপন।

উঠিল তরণী পরে অনুকূল বায়ু ভরে,
স্বদেশে করিল আগমন ;
বাঁধিয়া পরণ শালা, না জানিয়া কোন জ্বালা
করিতেছে জীবন যাপন।
নির্ঝর কানন নদী, দ্বীপের কুটীর যদি
তাহাদের পড়িত স্মরণে
ছুটিতে মগন হোয়ে, অতীতের কথা লোয়ে
ফুরাতে নারিত সারা ক্ষণে।
আধ' ঘুমঘোরে প্রাতে, পল্লব মর্ম্মর সাথে
শুনি বিপাশার কল স্বর—
স্বপনে হইত মনে, দূর সে দ্বীপের বনে
শুনিতেছে নির্ঝর ঝর্ঝর!
দ্বীপের কুটীর খানি, কল্পনার মনে আনি
ভাবিত সে শূন্য আছে পড়ি,
ভগ্ন ভিতে উঠে লতা, গৃহ সজ্জা হেথা হোথা
প্রাঙ্গণে যেতেছে গড়া গড়ি ;
হয় ত গো কাঁটা গাছে, এতদিনে ঘিরিয়াছে
ললিতার সাধের কানন—
এত দিনে শাখা ভুড়ি, ফুটেছে মালতী কুঁড়ি
দেখিবার নাই কোন জন।
সেই যে শৈলেতে উঠি, বসিয়া রহিত দুটী
নারিকেল কুঞ্জটির কাছে—
চারি দিকে শিলা রাশি, ছড়াছড়ি পাশা পাশি
তাহারা তেমনি রহিয়াছে।
মজিয়া কল্পনা মোহে, কতকি ভাবিত দোঁহে
মাঝে মাঝে উঠিত নিশ্বাস
অতীত আসিত ফিরে, গায়ে যেন ধীরে ধীরে
লাগিত সে দ্বীপের বাতাস।
একদা জ্যোছনা রাতি, দুজনে প্রমোদে মাতি
গেছে এক বিজন-কাননে—
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা, কহিতে কহিতে কথা
কত দূরে গেল আন্‌মনে।
সহসা সে বিভাবরী, আইল আঁধার করি—
গগনে উঠিল মেঘ রাশি,
পথ নাহি দেখা যায় ক্ষণে ক্ষণে ঝলকায়
বিদ্যুতের নিদারুণ হাসি।
প্রতি বজ্র গরজনে, ললিতা শঙ্কিত মনে
দৃঢ় তর স্বরেশে জড়ায়।
অবসন্ন পদ তার, প্রতি পদে বাধা পায়
মাথা লাগে তরুর শাখায়।
ঝলিল বিদ্যুৎ-শিখা, ভগ্ন এক অট্টালিকা
অদূরেতে প্রকাশিল তথা—
কক্ষ এক হোতে তার, মুমূর্ষু-আলোক ধার
কহে কি রহস্যময় কথা!
চলিল আলয় পানে, দোঁহে আশ্বাসিত প্রাণে
সহসা জাগিল নীরবতা,
উঠিল সঙ্গীত-স্বর, বালার হৃদয় পর
প্রবেশিল দু একটি কথা—
"পাগলিনী তোর লাগি কি স্বামি করিব বল
কোথায় রাখিব তোরে খুজে না পাই ভূমণ্ডল।"
কাঁপিছে বালার বুক, নীল হোয়ে গেছে মুখ
কপোলে বহিছে ঘর্ম্ম জল—
ঘুরিছে মস্তক তার, চরণ চলে না আর
শরীরে নাইক বিন্দু-বল।
তবুও অবশ মনে অলক্ষিত আকর্ষণে
চলিল সে ভীষণ আলয়ে
অঙ্গন হইয়া পার, খুলি এক জীর্ণ-দ্বার
গৃহে পদার্পিল ভয়ে ভয়ে।
ভগ্ন ইষ্টকের পরে, দীপ মিট্ মিট্ করে
বিদ্যুৎ ঝলকে বাতায়নে,

ভেদি গৃহ ভিত্তি যত, বটমূল শত শত
হেথা হোথা পড়িছে নয়নে।
বিছানো শুকানো পাতা, শুয়ে আছে রাখি মাথা,
পুরুষ একটি শ্রান্ত-কায়,
অতি শীর্ণ দেহ তার এলো থেলো জটা ভার
মুখশ্রী বিবর্ণ অতি ভায়।
জ্যোতিহীন নেত্র তাঁর; পাতাটি ও তুলিবার
নাই যেন আঁখির শকতি;
দ্বারে শুনি পদ ধ্বনি হৃদয়ে বিস্ময় গণি
তুলে মুখ ধীরে ধীরে অতি।
সহসা নয়নে তার জ্বলিল অনল!
সহসা মুহূর্ত্ত তরে দেহে এল বল।
"ললিতা" "ললিতা" বলি করিয়া চীৎকার—
তুপা হোয়ে অগ্রসর—কম্পবান কলেবর
শ্রান্ত হোয়ে ভূমি তলে পড়িল আবার।
করুণ নয়নে অতি—ললিতা মুখের প্রতি
অঙ্কিত রহিল স্তব্ধ এক দৃষ্টে চাহি;—
দীপ শিখা অতিস্থির—স্তব্ধ গৃহ সুগভীর
চারি দিকে এক টুকু সাড়া শব্দ নাহি!
দুই হাতে আঁখি চাপি, থর থর কাঁপি কাঁপি
মূর্চ্ছিয়া ললিতা বালা পড়িল অমনি;
বাহিরে উঠিল ঝড়, গর্জ্জিল অশনি,
জীর্ণ গৃহ কাপাইয়া—ভগ্ন বাতায়ন দিয়া
প্রবেশিল বায়ুচ্ছাস গৃহের মাঝারে,
নিভিল প্রদীপ,—গৃহ পূরিল আঁধারে।

বঙ্গ-সাহিত্য।

(কৃষ্ণ)

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

কিছু দিবস পরে কৃষ্ণ পাণ্ডবমণ্ডলে উপস্থিত হইলে পর বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সন্ধি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রশান্ত-প্রকৃতি যুধিষ্ঠির সেই প্রস্তাব অনুসারে কার্য্য করিতেই প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ সেই খানে উপস্থিত ছিলেন—তিনিই আর্য্যাবর্ত্তের ভাবী দুর্দ্দশা কল্পনাতে দেখিতে পাইয়া যুধিষ্ঠিরকে সন্ধি স্থাপন হইতে নিরস্ত করিলেন ও সঞ্জয়কে দিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়া পাঠাইলেন যে পাণ্ডবেরা সমস্ত রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ না পাইলে কোন মতেই যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইবে না। বহুদিন গত হইলে কৌরবেরা কৃষ্ণের এই কথার উত্তর আর পাঠাইলেন না—তাহাতে পাণ্ডবেরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণকে কৌরব-সভায় দূতরূপে প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সন্ধি স্থাপনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু অন্য সকলে—বিশেষতঃ দ্রৌপদী স্বীয়

অপমানের কথা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণকে সমরানল প্রজ্বলিত করিতে অনুনয় করিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ মহাবিপদে পড়িলেন—এক দিকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধি-স্থাপনের অনুরোধ এবং কৌরব পক্ষীয় সমস্ত আত্মীয় বন্ধুর একান্ত অভিলাষ, অপর দিকে রণস্থলেই সত্বাসত্বের কথা নিষ্পত্তি করা বিষয়ে নিজের ও ভীমার্জ্জুনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—এক দিকে কৌরব সভায় সমবেত রাজাদিগের সম্মুখে স্বীয় অপক্ষপাতিত্ব ও যুদ্ধবৈরাগ্য দেখাইতে হইবে—অপর দিকে তাঁহার উত্তেজনাতেই সেই কৌরব সভাতে যুদ্ধবিগ্রহের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিতে হইবে। এরূপ স্থলে প্রকৃত মধ্যস্থের কার্য্য কত কৌশলে যে সম্পাদিত করা আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণ চতুরতা ও কৌশলে যেরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, বাগ্মিতায়ও সেই রূপ পারদর্শী ছিলেন। এই জন্যই তিনি আপনিই পাণ্ডবদিগের দৌত্যকার্য্য আপন স্কন্ধেই লইলেন। তিনি জানিতেন যে বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রবাৎসল্য-প্রাচুর্য্যে দুষ্টমতি দুর্য্যোধনেরই হস্তগত প্রায়, তিনি জানিতেন যে অসার অথচ দাম্ভিক, মূর্খ অথচ দুর্জ্জন, দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে তীব্র তিরস্কার করিলে, গর্ব্বিত ও পাণ্ডবদ্বেষী কর্ণের সম্মুখে পাণ্ডবদিগের অনুপম শৌর্য্য বীর্য্যের মহিমা কীর্ত্তন করিলে, তাহারা উভয়েই উন্মত্ত হইয়া উঠিবে এবং আপনার কৌশলময় সন্ধির প্রস্তাব ও সন্ধি বিষয়ক বাগ্মিতা আগ্নেয় তরঙ্গে ছিন্ন তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। এই সকল বিলক্ষণ রূপে বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ কৌরব সভায় উপস্থিত হইলেন। যে দ্বারকাপতি যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞস্থলে ভারতবর্ষের সমস্ত মহীপতিমধ্যে সর্ব্বপ্রাধান্যের নিদর্শন স্বরূপ অর্ঘ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি আজ কৌরব সভাতে উপস্থিত হইলে

যেমন বারংবার অমৃত পান করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না; তদ্রূপ ভূপতিগণ বহুক্ষণ কৃষ্ণকে অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অতসী কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবসন জনার্দ্দন সুবর্ণমণ্ডিত নীলকান্ত মণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ সভায় সমুদায় সভাগণ এক মনে অনিমিষ নয়নে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করত নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; কাহারও মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

এই রূপে সমুদায় সভাগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া উপবিষ্ট রহিলে মহাত্মা মধুসূদন বর্ষা কালীন সজলজলদগম্ভীর নিঃস্বনে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! আমার মানস যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হয়; বীর পুরুষগণের বিনাশ না হয়। আমি ইহাই প্রার্থনা করিতে

---

* এই প্রস্তাবে যে সমস্ত মহাভারতীয় অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তৎসমুদায়ই মৃত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনার অন্য কিছু হিতোপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যক নাই; যাহা জ্ঞাতব্য আপনি তৎসমুদায় অবগত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনাদিগের কুল বিদ্যা সদাচার প্রভৃতি সমুদায় গুণসম্পন্ন ও অন্যান্য সমুদায় ভূপতিগণের কুল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, অনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে বিশেষ রূপে বর্ত্তমান আছে। অতএব এই কুলে বিশেষতঃ আপনা হইতে অযুক্ত কার্য্য সমুৎপন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা থাকিতে কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃতব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্রগণ নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যাদানাশক ও লোভপরতন্ত্র। উহারা ধর্ম্মার্থের উপর দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছে।

দেখুন এক্ষণে কুরুকুলে এই ঘোরতর আপৎ সমুত্থিত হইয়াছে; যদি আপনি ইহাতে উপেক্ষা করেন; তাহা হইলে ইহা পরিশেষে সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট করিবে। হে মহারাজ! আপনি মনে করিলেই এই আপৎ বিনাশ করিতে পারেন; বোধ হয় উভয় পক্ষের শান্তি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর নহে। কুরুপাণ্ডবগণের শান্তি আপনার ও আমার অধীন। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন; আমি পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য আপনার শাসনে থাকিলে তাঁহাদের যথেষ্ট শ্রেয়োলাভ হইবার সম্ভাবনা। আপনি শান্তি সংস্থাপন করিলে কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবে; অতএব বৈর নিষ্ফল বিবেচনা করিয়া শান্তি সংস্থাপনে যত্নবান হউন; প্রাণ পণে যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অসাধ্য। হে রাজন্! কৌরবগণ আপনার সহায় আছে; এক্ষণে পাণ্ডবগণকে সহায় করিয়া সচ্ছন্দে ধর্ম্মার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া থাকুন। আপনি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে ভূপতিগণের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণ সমভিব্যাহারে আপনার প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।

হে মহারাজ! সংগ্রাম মহা ক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই উভয় পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলেই আপনার যথেষ্ট হানি হইবে; পাণ্ডবগণ বা কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইলে আপনার কি সুখোদয় হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, কৃতাস্ত্র ও যুদ্ধাভিলাষী, তাঁহারাও আপনার আত্মীয় অতএব আপনি তাঁহাদিগকে এই ভাবী বিপৎ হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে যেন সমুদায় কৌরব ও পাণ্ডবগণকে সমরে ক্ষীণ ও রথিগণকে রথিগণ কর্ত্তৃক নিহত দেখিতে না হয়। ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত ভূপালেরা ক্রুদ্ধ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনষ্ট না হয়। আপনি প্রকৃতিস্থ হইলেই ইহাঁদের পরস্পর বিবাদ

ভঞ্জন হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া পবিত্র কুলসম্ভূত বদান্য অতি, যশস্বী, লজ্জাপরবশ, মহামানা, পরস্পরমিত্রভাবসম্পন্ন কুরুপাণ্ডবগণকে এই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। এই সকল ভূপতিগণ পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রোধ ও বৈর পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তম বসন ও মালা ধারণ করত একত্র পান ও ভোজন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত আপনার যেরূপ সৌহৃদ্য ছিল; এক্ষণেও সেইরূপ হউক; আপনি সন্ধি সংস্থাপনে যত্ন করুন: পাণ্ডবেরা বাল্যাবধি পিতৃহীন হইয়া আপনা কর্ত্তৃক পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া ছিলেন; অতএব এক্ষণে তাহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে যথাবিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবগণ সকল সময়ে বিশেষত আপৎকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব আপনি তাহার বিপরীতানুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মার্থ নাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! পাণ্ডবেরা আপনারে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া কহিয়াছেন যে, আমরা আপনারে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি। এই ব্রাহ্মণগণ জানেন যে, আমরা প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যাংশ লাভ করিতে পারি এরূপ করুন। আপনি ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ; আমরা আপনারে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া অশেষ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া আছি; অতএব এক্ষণে মাতা পিতার ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন্! শিষ্যের গুরুর প্রতি যাদৃশ ব্যবহার করা উচিত; আমরা আপনার প্রতি সেই রূপ করিতেছি; আপনি আমাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করুন। আমরা উৎপথগামী হইলে আমাদিগকে সৎপথাবলম্বী করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আপনি ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে সেই পথে আনীত করুন।

পাণ্ডবগণ সভাসদ্গণকেও কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মজ্ঞ সভাগণ সে স্থানে থাকিতে অন্যায় কার্য্য হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। যদি সভাসদ্গণের সমক্ষে অধর্ম্মপ্রভাবে ধর্ম্ম ও অসত্যপ্রভাবে সত্য বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যদি কোন সভামধ্যে ধর্ম্ম অধর্ম্মস্বরূপ শল্যে বিদ্ধ হয়, আর তত্রস্থ সভ্য সেই শল্য ছেদন না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হন। নদী যেমন তীরস্থ বৃক্ষ সমুদায় ভগ্ন করে; তদ্রূপ ধর্ম্ম উক্তরূপ সভাগণকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মানুগত ও ন্যায্য বাক্য কহিয়া থাকেন।

হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধি করা ভিন্ন আপনারে অন্য কিছু বলিতে পারি

না; অথবা অন্যান্য পারিষদ্গণ এ বিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়, বলুন। হে মহীপাল! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে; তাহা হইলে এই সমুদায় ভূপতিগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরতকুলপ্রদীপ! এক্ষণে প্রশান্ত হউন, ক্রোধপরবশ হইবেন না; পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সুখ সচ্ছন্দে বিবিধ ভোগ উপভোগ করুন। আপনি মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিতেন। ঐ মহাপুরুষ আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন; তাহা আপনার অবিদিত নাই। আপনি তাঁহারে দাহিত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; তিনি তথাপি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরামর্শানুসারে তাঁহারে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তদনুসারে তথায় বাস করিয়া স্বপ্রভাবে সমুদায় ভূপতিগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই অধীন করিয়াছিলেন; আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলনন্দন শকুনি আপনার মতানুসারে কপট যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য ও ধন সম্পত্তি সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় সভামধ্যে দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না।

আমি এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গল বাসনায় এই সকল কথা কহিতেছি, আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখভ্রষ্ট করিবেন না। আপনার পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ ও অর্থকে অনর্থ জ্ঞান করিতেছে; আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। ফলত পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন; আপনার যাহা অভিরুচি হয়, করুন।

কৃষ্ণের বক্তৃতায় আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হইল—ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম ও অন্যান্য ভূপতিগণ পাণ্ডবীয় রাজদূতের সরল উদারভাবে মোহিত হইয়া সন্ধি সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইলেন কিন্তু দুর্য্যোধন, কর্ণ ইত্যাদি পাণ্ডবশত্রুবর্গ একান্ত ক্রোধ পরবশ হইয়া যাহাতে সন্ধি স্থাপন না হয় সেই চেষ্টাতেই কৃতসংকল্প হইলেন। দুর্য্যোধন রোষ সংযত করিতে না পারিয়া উগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন।

হে কেশব! পাণ্ডবগণ প্রীতিপূর্ব্বক দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলে শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন; তাহাতে আমার অপরাধ কি? ঐ সময় পাণ্ডবগণের যে সমুদায় ধন পরাজিত হইয়াছিল; তাহা তাঁহাদের অসম্মতিক্রমে হয় নাই। অতএব অক্ষেয় পাণ্ডবগণ যে দ্যূতোদয়মুখে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বনে গমন করিয়াছিলেন; তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এক্ষণে সেই নিতান্ত অসমর্থ পাণ্ডবগণ কি বলিয়া হৃষ্টচিত্তে শত্রুর ন্যায় আমাদের সহিত বিরোধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন? আমরা তাঁহাদের কি করিয়াছি? তাঁহারা কি অপরাধে স্বজ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে আমাদি-

পের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছেন ?' আমরা উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণ বচনে ভীত হইয়া সুরঃ রাজের সমীপেও নত হই না।- হে কৃষ্ণ! আমি এমন কোন ক্ষত্রিয়কে অবলোকন করি না যে, যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে উৎসাহযুক্ত হয়। পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, দেবগণও সংগ্রামে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা স্বধর্ম্মে উপেক্ষা না করিয়া সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক যদি অস্ত্রাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করি; তাহা হইলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব। সংগ্রামে শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। যদি আমরা শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়া সংগ্রামে বীরশয্যা প্রাপ্ত হই; তাহা হইলে আমাদের নিমিত্ত কেহই অনুতাপিত হইবেন না। কোন্ সদ্বংশজাত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি ভীত হইয়া শত্রুর নিকট অবনত হইতে সম্মত হয়? মাতঙ্গ মুনি কহিয়াছেন, "উদ্যমই পৌরুষ বলিয়া গণ্য; অতএব উদ্যম করা নিতান্ত আবশ্যক; নত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে; বরং অসময়ে ভগ্ন হইবে, তথাপি কোন ক্রমে নত হইবে না।" হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ মাতঙ্গের এই বচনানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হে মহাত্মন্! মদ্বিধ ব্যক্তিরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রণত হইয়া থাকেন। অতএব অন্য কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া যাবজ্জীবন উক্তরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিবে; ইহাই ক্ষত্রিয়ের যথার্থ ধর্ম্ম এবং আমারও এ বিষয়ে বিলক্ষণ সম্মতি আছে।

আমার পিতা যে পূর্ব্বে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন; আমি জীবিত থাকিতে তাহা কখনই হইবে না। ফলত যে পর্য্যন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন; তাবৎ আমরা বা তাহারা এক পক্ষকে অবশ্যই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকের ন্যায় কালাতিপাত করিতে হইবে। হে কেশব! পূর্ব্বে আমি পরাধীন ও বালক ছিলাম; তৎকালে অজ্ঞানবশতই হউক বা ভয়প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয় রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল; এক্ষণে আমি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবগণ কদাপি তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণে ভূমিভাগ বিদ্ধ করা যায়; পাণ্ডবগণকে তাহাও প্রদান করিব না।

তখন কৃষ্ণ সর্ব্ব সমক্ষে উত্তর করিলেন।

হে দুর্য্যোধন! তুমি অমাত্যের সহিত বীরশয্যা লাভ করিতে বাসনা করিতেছ; তাহা তোমার অবশ্যই লাভ হইবে। স্থির হও; অচির কাল মধ্যেই মহৎ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইবে। হে মূঢ়! তুমি যে কহিলে, পাণ্ডবগণের প্রতি আমার কিছুমাত্র অত্যাচার নাই, অত্রস্থ ভূপতিগণ তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখুন। হে ভরতকুলকলঙ্ক! তুমি পাণ্ডবগণের সম্পত্তি দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া শকুনির সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক কপট দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। কপটাচারবিহীন অতি প্রধান তোমার জ্ঞাতিবর্গ কিরূপে কুটিল

ব্যক্তির সহিত অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধিলোপ এবং অসাধুগণের ভেদ ও বাসন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তুমি অদমীক্ষাকারিতা প্রযুক্ত সদাচারপরায়ণ পাণ্ডবগণের সহিত কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া এই ব্যসন সমুৎপন্ন করিয়াছ। তুমি কুলশীলসম্পন্না পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীরে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক যেরূপ অপমান ও কটূক্তি করিয়াছ আর কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃভার্য্যার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে? পাণ্ডবগণের অরণ্য গমন সময়ে দুঃশাসন কুরুসভামধ্যে তাহাদিগকে যাগা যাহা কহিয়াছিল; কৌরবগণ তৎসমুদায় অবগত আছেন। ফলত তোমরা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছ; অন্য কোন ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুগণের সহিত তাদৃশ অসৎ ব্যবহার করিতে পারে না। হে দুর্য্যোধন! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই তিন জনে অনার্য্য ও নৃশংস পুরুষের ন্যায় তাঁহাদিগকে বারংবার বহুবিধ কটূক্তি করিয়াছ।

দেখ, তুমি পাণ্ডবগণের বাল্যাবস্থায় বারণাবত নগরমধ্যে তাঁহাদিগকে মাতৃসমভিব্যাহারে দগ্ধ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তাঁহারা সেই বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃসমভিব্যাহারে একচক্রা নগরে ব্রাহ্মণের নিকেতনে বহুদিবস প্রচ্ছন্ন ভাবে বাস করিয়াছিলেন। তুমি বিষসর্প প্রভৃতি বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়াছিলে; কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তুমি উক্তরূপে বারংবার মহাত্মা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ, অতএব পাণ্ডবগণের নিকট যে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই ইহা কিরূপে বলিতে পারি।

পাণ্ডবগণ স্বীয় পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিতেছে; তুমি তৎপ্রদানে সম্মত হইতেছ না; কিন্তু অচিরাৎ তোমারে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হইয়া তাহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে। তুমি পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের প্রতি নিতান্ত হীন ও নৃশংসের ন্যায় নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করিয়া এক্ষণে পুনরায় তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিতে বাসনা করিতেছ। তোমার পিতা, মাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তোমারে শান্তিমার্গ অবলম্বন করিতে বারংবার অনুরোধ করিতেছেন; কিন্তু তুমি তাহাতে সম্মত হইতেছ না। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে সন্ধিস্থাপন হইলে তুমি ও যুধিষ্ঠির উভয়েরই যথেষ্ট লাভ হয়; কিন্তু তুমি অল্পবুদ্ধি প্রযুক্ত তাহাতে সম্মত হইতেছ না। তুমি সুহৃজ্জনের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া নিতান্ত অধর্ম্ম ও অযশস্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে তোমার শ্রেয় লাভ হইবে না।

এই কহিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়া কৌরব সভায় যুদ্ধঘোষণা পূর্ব্বক পাণ্ডব সমাজে ফিরিয়া আসিলেন।

উভয় পক্ষেই যুদ্ধের ঘোর আয়োজন হইতে লাগিল। শেষে কুরুপাণ্ডবগণ কুরু-

ক্ষেত্রে থাকিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যখন অর্জ্জুন সম্মুখে আপনার ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন সমূহকে সমরানলের আহুতি স্বরূপ সজ্জিত দেখিয়া যুদ্ধে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িলেন তখন কৃষ্ণের ভয় হইল, কারণ অর্জ্জুন শিথিলপ্রযত্ন হইলে পাণ্ডবদের আর জয়ের আশা থাকিবে না—এই অবস্থায় কৃষ্ণ স্বীয় গভীর দূরদর্শিতা প্রভাবে বেদান্ত-মিশ্রিত সাংখ্য দর্শনের গভীর তত্ত্ব সকল অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া তাঁহার সমরলিপ্সা আবার বলবতী করিয়া তুলিলেন। তখন প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে যে কৃষ্ণ না থাকিলে পাণ্ডবদিগের কখনই জয় হইত না তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। যদিও তিনি স্বয়ং অস্ত্রধারণ করেন নাই বটে, তবু তাঁহার কৌশলে তাঁহার চাতুরীতে কৌরব পক্ষীয় প্রধান প্রধান বীর পুরুষেরা নিহত হইয়াছিল। সে সকল কথার বহুল বিস্তারে প্রয়োজন নাই। পরিশেষে পাণ্ডবদিগের জয় হইলে তিনিই আবার এক দিকে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। আবার অপরদিকে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রকে এমন বুঝাইলেন যে তাঁহারাও পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

হস্তিনাপুরে যখন কৃষ্ণ এই রূপ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিল যে তাঁহার রাজধানী দ্বারকায় দারুণ অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে এবং পুরবাসীগণ, বিশেষতঃ তাঁহারই পুত্র-পৌত্রেরা নানা প্রকার বিলাস ও মদ্য পানে অনুরক্ত হইয়া ঘোর উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। ব্রাহ্মণেরা ক্রমে ক্রমে দ্বারকাপুরী ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং উন্মত্ততা ও যথেচ্ছাচারিতা সমস্ত রাজধানীতে সগর্ব্বে বিচরণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রভাস তীর্থে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং সেখানে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে মদ্য পানও প্রভূত পরিমাণে চলিতে লাগিল। এই উৎসবের মধ্যে তাঁহাদিগের আপনাআপনির ভিতরে বিরোধ উপস্থিত হইল এবং সুরা-উন্মত্ত যাদবেরা আপনাআপনি হত্যাকাণ্ডে উপস্থিত, সকলেই নিহত হইল। এই সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণ ভগ্ন হৃদয়ে যে সময় একটি বিজন বনে একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একটি ব্যাধ কর্ত্তৃক ভ্রম বশতঃ বিনষ্ট হইলেন।

চ্যাটার্টন—বালক-কবি।

at sober eve would round
thee throng,
enraptured, on thy
stately song;

And greet with smiles the young-
eyed Poesy,
All deftly mashed, as hear Antiquity."
Coleridge.

কবি যখন আপনার গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন, ও জগৎ যখন তাঁহার গুণের সমাদর করিতেছে না, তখন তাঁহার কি কষ্ট! যখন তিনি মনে করিতেছেন পৃথিবীর নিকট হইতে যশ ও আদর তাঁহার প্রাপ্য, তাঁহার ন্যায্য অধিকার, তখন তিনি যদি ক্রমাগত উপেক্ষা সহ্য করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু কি উপায়ে সে প্রতিহিংসা সাধন করেন? আপনাকে বিনাশ করিয়া! তিনি বলেন, পৃথিবী যখন তাঁহাকে অনাদর করিল, তখন পৃথিবী তাঁহাকে পাইবার যোগ্য নহে, তিনি আপনাকে বিনষ্ট করেন ও মনে করেন পৃথিবী এক দিন ইহার জন্য অনুতাপ করিবে। বালক কবি চ্যাটার্টন যখন যশ ও অর্থের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া লণ্ডনে গেলেন ও যখন নিরাশ হইয়া অনাহারে দিন যাপন করিতেছিলেন, তখন একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি কেন তাঁহার লেখা ছাপাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন না, তখন কবি কহিলেন, পুরাণো বস্ত্র কিনিবার জন্য ও গৃহ সাজাইবার জন্য তিনি কোন কবিতা লেখেন নাই; পৃথিবী যদি ভালরূপ ব্যবহার না করে তাহা হইলে সে পৃথিবী তাঁহার কবিতার একটি ছত্রও দেখিতে পাইবে না! আরো কিছুদিন অপেক্ষা করিলেন, দেখিলেন পৃথিবী ভাল ব্যবহার করিল না, তখন তিনি তাঁহার সমস্ত অপ্রকাশিত কবিতা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন ও আপনার প্রাণও নষ্ট করিয়া ফেলিলেন; পৃথিবী আজ অনুতাপ করিতেছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে যে পৃথিবী তাঁহার মৃত্যুর পর একটি অশ্রুজলও ফেলে নাই; ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সেই পৃথিবী তাঁহার স্মরণার্থে প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বকৃত অন্যায় ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রতিকার করিবার চেষ্টা পাইল।

চ্যাটার্টন তাঁহার শৈশব কাল অবধি এমন সংসর্গে ছিলেন যে তাঁহার প্রতিভা কিরূপে স্ফূর্ত্তি পাইল ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অনুকূল অবস্থায় অনেকের প্রতিভার বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় তাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে অনুকূল না হইলে অসময়ে শৈশবে প্রতিভার পূর্ণস্ফূর্ত্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। পিতার মৃত্যুর তিনমাস পরে ব্রিস্টল নগরে চ্যাটার্টনের জন্ম হয়। তাঁহার মাতা, তাঁহার ধর্ম্মমা Mrs Edkins, ও তাঁহার অপেক্ষা দুই বৎসরের জ্যেষ্ঠা এক ভগিনী তাঁহার শৈশবের সঙ্গী ছিলেন। ইঁহারা কেহই চ্যাটার্টনকে প্রকৃত প্রস্তাবে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার মাতা চ্যাটার্টনকে পাগল মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ছিলেন। প্রায় বালক মাঝে মাঝে অনেক ক্ষণ ধরিয়া আপনার মনে বসিয়া বসিয়া কাঁদিত অথচ কেহ তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইত না; একবার তাঁহার এইরূপ চিন্তিত বিষণ্ণ অবস্থায় Mrs Edkins বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "তোর বাপ যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে তোকে সিধা করিতেন!' শুনিয়া বালক চমকিয়া

উঠিয়া কহিল, "আহা যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতেন।" বলিয়াই একটি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অনেক ক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিল! কখন কখন অনেক ক্ষণ কি কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপোলে একটি একটি করিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িত, তাহা দেখিয়া তাঁহার মাতা আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বালক যথার্থ কারণ বলিতে চাহিত না! আবার এক এক সময় কতক্ষণ নিস্তব্ধ বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা খাতা লইয়া অনর্গল লিখিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু কি লিখিত সে বিষয়ে কাহারো কখনো কৌতূহল হয় নাই। এ সকল যে অসাধারণ অস্ফূর্ত্ত প্রতিভা উদ্ভূত, তাহা তাঁহার মাতা কি রূপে বুঝিবেন বল? স্কুলের শিক্ষক তাঁহাকে একটা গর্দ্দভ মনে করিত, তাঁহার সহপাঠীরা তাঁহার ভাব গতিক বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইত। বাল্যকালে তাঁহার পাঠে তেমন মন ছিল না—কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে এমন তাঁহার পড়িতে মন বসিয়া গেল যে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই পড়িতে আরম্ভ করিতেন, ও ঘুমাইতে যাইবার সময়ে বহি বন্ধ করিতেন। যখন তিনি পাঠের গৃহে বসিয়া পাঠে মগ্ন থাকিতেন, তখন কিছুতেই আহার করিতে আসিতেন না, অবশেষে Mrs Edkins তাঁহার বাল্য-প্রিয়তমা Miss Sukey Willএর নাম করিলে তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিতেন!

যখন এমন কেহ তাঁহার সঙ্গী ছিল না, যে তাঁহাকে বুঝিতে পারিবে, তাঁহার সহিত সমানুভব করিবে, তখন ব্রিষ্টলের এক অতি প্রাচীন গির্জ্জা, ও সেই গির্জ্জার মধ্যস্থিত অতি প্রাচীন কালের লোকদের পাষাণ-মূর্ত্তি সকলই তাঁহার সঙ্গী ছিল। শুনা যায়, প্রায় তিনি সেই গির্জ্জায় যাইতেন, ও ক্রীড়া-সহচরদিগের মধ্যে তাঁহার বিশেষ সুহৃদদিগকে কবিতা শুনাইতেন। শৈশবে কি বিষয় লইয়া তিনি কবিতা লিখিবেন? স্কুলের হেড্-মাস্টার তাঁহাকে প্রহার করিয়াছিল, তাহার নামে ঠাট্টা করিয়া একটা কবিতা লিখিলেন, দুষ্টামি করিয়া পাড়ার একটা দোকানদারের নামে কবিতা লিখিয়া খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিলেন। লোকে বলে এগারো বৎসরের সময় তিনি কবিতা লিখিতে সুরু করেন, কিন্তু তাহারো পূর্ব্বে দশ বৎসরের সময় তাঁহার একটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে। কবিতাটি যিশুখ্রীষ্টের পৃথিবীতে অবতরণ সম্বন্ধে। আসলে এ কবিতাটির মূল্য তেমন কিছুই নহে, এ সম্বন্ধে তিনি স্কুলে যাহা পড়িয়াছেন তাহাই ছন্দে গাঁথিয়াছেন মাত্র, তথাপি দশ বৎসরের বালকের কবিতার একটা নমুনা পাঠকদের হয়ত দেখিতে কৌতূহল হইবে। অনুবাদ অবিকল করিবার মানসে অমিত্রাক্ষরে লিখিলাম——

উপর হইতে দেখ আসিছেন মেঘে,
বিচারক, বিভূষিত মহিমা ও প্রেমে!
আলোকের রাজ্য দিয়া আনিবারে তাঁরে
বিধা হোয়ে গেল দেখ শূন্য একেবারে
বদন ঢাকিয়া তার ফেলিল তপন

শিশুর উজ্জ্বলতর হেরিয়া কিরণ
চন্দ্র-তারা চেয়ে থাকে বিস্ময়ে মগন!
ভীষণ বিদ্যুৎ হানে, গরজে অশনি
কাঁপে জলধির তীর কাঁপিল অবনী!
স্বর্গের আদেশ—শৃঙ্গ বাজিল অমনি
জল স্থল ভেদি তার উচ্ছ্বসিল ধ্বনি!
মৃতেরা শুনিতে পেলে আদেশের স্বর
পুণ্যবান হাসে, পাপী কাঁপে থর থর
ভীষণ সময় কাছে এসেছে এখন
উঠিবেক কবরের অধিবাসীগণ
অনন্ত আদেশ তাঁর করিতে গ্রহণ।

ব্রিস্টলের রেড্‌ক্লিফ্ গির্জ্জায় (St Mary Redcliffe Church) একটি ঘর ছিল, সেখানে কতকগুলি কাঠের সিন্দুকে অনেক দিনকার পুরাণ নানা প্রকার কাগজ পত্র দলিল দস্তাবেজ থাকিত। সে সকল পুরাণ অক্ষরের পুরাণভাষার কাগজপত্রের বড় যত্ন ছিল না। চ্যাটার্টনের পিতা যখন গির্জ্জার কর্ম্মচারী ছিলেন, তখন মাঝে মাঝে সেই সকল সিন্দুক হইতে রাশি রাশি লিখিত পার্চমেণ্ট লইয়া তাঁহার রান্না ঘরের জিনিষ পত্র সাফ করিতেন ও অন্যান্য নানা গৃহ কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন। যাহা কিছু প্রাচীন তাহারি উপর চ্যাটার্টনের অসাধারণ ভক্তি ছিল। চ্যাটার্টন সেই সকল কাগজ পত্র তাঁহার পড়িবার ঘরে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া প্রাচীন অক্ষর ও ভাষা পাঠ করিতে চেষ্টা করিতেন, ও সেই সকল অক্ষর অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই রূপে প্রাচীন ইংরাজি ভাষা তাঁহার দখল হয়, ও তখন হইতে প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার পাঠ গৃহে দরজা বন্ধ করিয়া কতকগুলা রঙ্গ ও কয়লার গুঁড়া লইয়া স্তূপাকার প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে চ্যাটার্টন কি করিতেন তাহা তাঁহার মাতা ভাবিয়া পাইতেন না। কিরূপ করিলে পার্চমেণ্ট প্রাচীন আকার ধারণ করে তিনি তাহা নানা বিধ উপায়ে পরীক্ষা করিতেন। এই সময়ে চ্যাটার্টন প্রাচীন ভাষায় কবিতা লিখিতেন ও অতি যত্নে তাহা লুকাইয়া রাখিতেন, ও যখন প্রকাশ করিতেন, কহিতেন রাউলি (Rowley) নামক এক জন ব্রিস্টলের অতি প্রাচীন কবি এই সকল কবিতা লিখিয়াছেন, তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া সেই সকল পুস্তক পাইয়াছেন। কেহ অবিশ্বাস করিত না, কে করিবে বল? কে জানিবে যে, এক জন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক প্রাচীন কবিদের অনুকরণ করিয়া এই সকল কবিতা লিখিতেছে। তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যেই বা এমন কে ছিল যে সেই সকল প্রাচীন ইংরাজি ভাল করিয়া বুঝিবে? তাঁহার মাতা, তাঁহার ভগিনী, একটা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কতকগুলি মূর্খ বালক, ও তাহাদের অপেক্ষা জ্ঞানে দুই এক সোপান মাত্র উন্নত দুই একটি অল্প বেতনের শিক্ষক প্রাচীন ইংরাজি সাহিত্যের অতি অল্পই ধার ধারিত।

Town and Country Magazine নামক এক পত্রিকায় চ্যাটার্টন রাউলির ছদ্ম-নাম ধারণ করিয়া "Elinoure and Juga"

"এলিনোর ও জুগা" নামক একটি গাথা প্রকাশ করিলেন। রডবোর্ণ নদী তীরে বসিয়া এলিনোর ও জুগা আহাদের মৃত নিহত প্রণয়ীর জন্য শোক করিতেছে। জুগা কহিতেছে—

আয় বোন, করি মোরা হেথায় বিলাপ,
এই ফুলময় তীরে, বিষাদ যথায়
রোয়েছে তাহার দুটি পাখা ছড়াইয়া
উষার শিশির আর সাঝের হিমে
এই খানে বসি বসি ভিজিব দুজনে!
বজ্র-দগ্ধ, শুষ্ক দুই পাদপ যেমন
উভয়ের পরে রহে উভয়ে ঝুঁকিয়া।
কিম্বা জনশূন্য যথা ভগ্ন নাট্যশালা
হৃদয়ে পুষিয়া রাখে বিভীষিকা শত,
অমঙ্গল কাক যেথা ডাকে অবিরাম।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পেঁচা জাগায় নিশিরে।
বংশীরবে উষা আর উঠিবে না জাগি
নৃত্যগীত বাদ্য আদি হবে নাকো আর।

এলিনোর।

ঘোটকের পদশব্দ শৃঙ্গের গর্জ্জনে
অরণ্যে প্রাণীরা আর উঠিবেনা কাঁপি!
সারা দীর্ঘ দিন আমি ভ্রমিব গহনে
সারা রাত্রি গোরস্থানে করিব যাপন
প্রেতাত্মারে কব মম দুখের কাহিনী।

যদিও চ্যাটার্টনের অহঙ্কার অতি অল্পই প্রশ্রয় পাইয়াছিল ও তাঁহার যশ-লালসা-তৃপ্ত হয় নাই তথাপি তাঁহার অহঙ্কার ও যশের ইচ্ছা অতি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বলবান ছিল। তাঁহার বাল্যকালে তাঁহার মাতার এক ব্রহ্মকার বন্ধু চ্যাটার্টনকে একটি মৃৎপাত্র উপহার দিবার মানস করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে পাত্রের উপর কি চিত্র আঁকিবে। চ্যাটার্টন কহিলেন—একটি দেবতা (angel) আঁক; তাহার মুখে একটি শঙ্খ দেও, যেন সমস্ত পৃথিবীময় সে আমার যশঃ কীর্ত্তন করিতেছে।" তাঁহার এমন প্রশংসা-তৃষ্ণা ছিল যে, যতদিন তিনি ব্রিষ্টলে ছিলেন, তিনি এমন একটি সামান্য কবিতা লিখেন নাই যাহা তাঁহার সহ পাঠীদের শোনান নাই; অনেক সময়ে সে বেচারীরা বিরক্ত হইয়া উঠিত। সন্দিগ্ধ লোকেরা কহিত, যাঁহার যশ-লালসা এত প্রবল, তিনি কোন্ প্রাণে নিজে কবিতা লিখিয়া ছদ্ম নামে প্রকাশ করিলেন? "রাউলি-রচিত কবিতা' গুলি চ্যাটার্টনের রচিত নয়, বলিয়া সন্দেহ করিবার এই একটি প্রধান কারণ! মানুষের চরিত্রে এত প্রকার বিরোধী ভাব মিশ্রিত আছে, যে, ওরূপ একদিক মাত্র দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে গেলে ভ্রমে পড়িতে হয়। তাঁহার সহস্র অহঙ্কার থাক্, তথাপি কত কারণ বশতঃ যে তিনি তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার চলিত ভাষায় লিখিত ছোট খাট কবিতা গুলিতে তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করিতেন, ও তাহা লইয়া যথেষ্ট গর্ব্ব-অনুভব করিতেন, আর তাঁহার প্রাচীন ভাষায় রচিত কবিতাগুলি যদিও খুব গর্ব্বের সহিত সকলকে শুনাইতেন, তথাপি তাহাতে নিজের নাম ব্যবহার করিতেন না, ইহার কারণ

পুঁজিতে গেলে যে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়িতে হয় তাহা নহে। যতদূর জানা যায়, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি তাঁহার নিজের লিখিত প্রাচীন ভাষার কবিতা গুলিকে অতিশয় ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, যেরূপ ভক্তির সহিত লোকে অতি পুরাকালের গ্রন্থ সমূহকে পূজা করে, তাঁহার নিজ-রচিত কবিতার প্রতি তাঁহার ভক্তি যে তদপেক্ষা ন্যূন ছিল, তাহা নহে ; কল্পনার মোহিনী-মায়ার মানুষ নিজহস্তগঠিত প্রতিমাকে দেবতার মত পূজা করে ও সেই কল্পনার ইন্দ্রজালে চাটার্টন সাধারণ লোকের অনধিগম্য পবিত্র মৃত ভাষায় যে কবিতা লিখিতেন তাহা এক প্রকার সম্ভ্রমের সহিত নিরীক্ষণ করিতেন। যেন সে গুলি তাঁহার নিজের সাধ্যায়ত্ত কবিতা নহে, যেন প্রাচীন যুগের কোন মৃত কবির আত্মা তাঁহাতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মুখ দিয়া সেই কবিতা বলাইয়াছেন মাত্র। সামান্য সামান্য বিষয় মূলক-রাজনীতি বা বিদ্রূপ সূচক কবিতা লইয়া তিনি খবরের কাগজে ছাপাইতেন, নাম দিতেন, সকলকে শুনাইতেন—অর্থাৎ সে গুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে বড় সঙ্কোচ অনুভব করিতেন না, কিন্তু "রাউলি কবিতা" এক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা অতি গোপনে লিখিতেন, গোপন রাখিতেন, যদি কখনো বাহিরে প্রকাশ করিতেন তবে সে প্রাচীন কালের ও অতি প্রাচীন লেখকের বলিয়া। দুই একবার, তিনি নিজে লিখিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকের মুখে সন্দিগ্ধ উপহাসের হাসি দেখিয়া তখনি আবার ঢাকিয়া লইতেন। তাঁহার 'রাউলি কবিতা' লইয়া ওরূপ সন্দেহ, উপহাস তিনি সহিতে পারেন না, লোকের ঐ কবিতাগুলি ভাল লাগিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথম প্রথম যখন তিনি প্রাচীন ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন হয়ত বালক-স্বভাব বশতঃ অনেককে ফাঁকি দিবেন ও মজা করিবেন মনে করিয়া ছদ্ম নাম ব্যবহার করেন, অথবা হয়ত মনে করিয়াছিলেন যদি তিনি নিজের নাম প্রকাশ করেন তাহা হইলে কেহ বিশ্বাস করিবে না এই ভাবিয়া একটা মিথ্যা নামের আশ্রয় লইয়া থাকিতেন। কিন্তু ক্রমে তিনি যতই লিখিতে লাগিলেন, ততই কল্পনা-চিত্রিত প্রাচীন, পুরোহিত কবি রাউলি তাঁহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, যেন সত্যই রাউলি এক জন কবি ছিলেন, রাউলিকে যেন দেখিতে পাইতেন, রাউলির কথা যেন শুনিতে পাইতেন। আর প্রথমে যে কারণ বশতই এই সকল কবিতা তাঁহার লুকাইয়া ও ঢাকিয়া চুকিয়া রাখিতে প্রবৃত্তি হোক না কেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিজের চক্ষেও সেই সকল কবিতার উপর একটা রহস্যের আবরণ পড়িয়া গেল, তাঁহার নিজের কাছেও সে সকল কবিতা যেন কি একটি গোপনীয়, পবিত্র, প্রাচীন পদার্থ বলিয়া প্রতিভাত হইল। ইহা নূতন কথা নহে যে, অনেকে কোন একটি বিষয়ে অন্যকে প্রতারণা করিতে গিয়া সেই বিষয়ে আপনাকেও প্রতারণা করে। তাহা ছাড়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে এমন সব সঙ্গী ছিল, যাহারা প্রতারিত হইতে চায়। একটি প্রাচীন ভাষায় রচিত ভাল কবিতা শুনিলে তাহারা বিশ্বাস করিতে চায় যে, তাহা কোন প্রাচীন কবির রচিত। যদি তাহারা জানিতে পায় যে, সে সকল কবিতা একটি আধুনিক বালকের লেখা, যে বালক তাহাদেরি ভাষায় কথা কয়, তাহাদেরি মত কাপড় পরে—বাহিরের অনেক বিষয়েই তাহাদের সহিত সমান তাহা হইলে তাহারা কি নিরাশ হয়! তাহা হইলে হয়ত তাহারা চটিয়া যায়, তাহারা সে কবিতাগুলির মধ্যে কোন পদার্থ দেখিতে পায় না, নানা প্রকার খুঁটি নাটি ধরিতে আ-

রস্ত করে, যদি বা কেহ ঐ সকল কবিতার প্রশংসা করিতে চায়, তবে সে নিজে একটি উচ্চতর আসনে বসিয়া বালকের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে অতি গম্ভীর স্নেহের স্বরে বলিতে থাকে যে, হাঁ, কবিতাগুলি মন্দ হয় নাই, এবং বালককে আশা দিতে থাকে যে, বড় হইলে চেষ্টা করিলে সে একজন কবি হইতে পারিবে বটে! তাহাদের যদি বল, এ সকল একটি প্রাচীন কবির লেখা, তাহারা অমনি লাফাইয়া উঠিবে, ভাবে গদগদ হইয়া বলিবে, এমন লেখা কখনো হয় নাই হইবে না; কাগজে পত্রে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে—শত প্রকার সংস্করণে শত প্রকার টীকা ও ভাষ্য বাহির হইতে থাকিবে, এরূপ অবস্থায় এক জন যশোলোলুপ কবি বালক কি করিবে? সে আপনার নাম প্রকাশ করিয়া কতক গুলি বিজ্ঞতাভিমানী বৃদ্ধের নিকট হইতে দুই চারিটি ওজর করা ছাঁটা ছোঁটা মুরুব্বিয়ানা আদর-বাকা শুনিতে চাহিবে, না যে নামেই হউক্ না কেন, নিজের রচিত কবিতার অজস্র অবারিত প্রশংসাধ্বনি শুনিয়া তৃপ্ত হইতে চাহিবে? যে যশোলালসার দোহাই দিয়া তুমি "রাউলি-কবিতা" গুলি বালকের লেখা বলিয়া অবিশ্বাস করিতে চাহ, সেই যশোলালসাই যে, তাহাকে আত্মনাম গোপন করিতে প্রবৃত্তি দিবে, তাহার কি ভাবিলে বল? লোকে যখন "রাউলি-কবিতা" বিষয়ে সাধ করিয়া প্রতারিত হইতে চাহিত, তখন কবি তাহাদের প্রতারণা করিতেন। ব্যারেট্ নামক এক জন লেখক ব্রিস্টলের বিস্তারিত ইতিহাস লিখিতেছিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গ সেই ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। এক দিন ক্যাট্‌কট নামক তাঁহার এক বন্ধু আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, যে চ্যাটার্টন নামক এক বালক অনুসন্ধান করিতে করিতে অনেক গুলি ব্রিস্টলের প্রাচীন কবিতা ও বিবরণ পাইয়াছে ব্যারেট্ চ্যাটার্টনের নিকট হইতে তাঁহার ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বালকের ভাণ্ডার অজস্র, তুমি যে বিষয় জানিতে চাও, সেই বিষয়েই সে একটা না একটা প্রাচীন ভাষায় লিখিত প্রমাণ আনিতে পারে—ঐতিহাসিকের তাঁহাকে সন্দেহ করিবার বড় একটা কারণ ছিল না। চ্যাটার্টন তাঁহাকে অনর্গল প্রমাণ রচনা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিলেন, তাঁহার ইতিহাস লেখাও অবাধে অগ্রসর হইতে লাগিল-তিনি গর্ব্বের সহিত লিখিলেন—"এই নগরের (ব্রিস্টল) পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার উপযোগী প্রাচীন পুস্তকাদি আমি যেরূপে পাইয়াছি, এমন আর কাহারো ভাগ্যে কখনো ঘটে নাই।" তাহা সত্য বটে! ব্যারেট একবার "রাউলি-রচিত" "হেষ্টিংসের যুদ্ধ" নামক এক অসম্পূর্ণ কবিতা আনিবার জন্য চ্যাটার্টনকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন, চ্যাটার্টন সমস্তটা লিখিয়া উঠিতে পারেন নাই; অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি স্বীকার করিলেন যে, সে কবিতাটি তাঁহার নিজের লেখা। সহস্র প্রমাণ পাইলেও ব্যারেট তখন বিশ্বাস করিতে চাহিবেন কেন? তাঁহার ইতিহাসের অমন সুন্দর উপকরণ গুলি এক কথায় হাতছাড়া করিতে ইচ্ছা হইবে কেন? তিনি প্রতারিত হইতে চাহিলেন, চ্যাটার্টন তাঁহাকে প্রতারণা করিলেন। চ্যাটার্টন তাঁহার অসম্পূর্ণ "হেষ্টিংসের যুদ্ধ" সম্পূর্ণ করিয়া আনিয়া দিলেন।

ক্রমশঃ

টঙ্ক পাষাণ-বিদারণ যন্ত্র।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কিয়ৎ সংখ্যক ভারতীতে "প্রাচীন ভারতের শিল্প" ইত্যাভিধেয় কতিপয় প্রস্তাব লিখিয়াছি। তাহাতে প্রাচীন কালের কাল-বিনির্ণায়ক শিল্প যন্ত্রের বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে, দ্বি সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে এদেশে যে প্রকারান্তরের ঘড়ী ছিল এবং তদ্দ্বারা যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপে কাল নির্ণয় করা হইত, ইহা মনে হইলে মনোমধ্যে কেমন এক প্রকার কুতূহল উদিত হয়, তদ্বিবন্ধন কিঞ্চিৎ আনন্দেরও সঞ্চার হয়। এতাদৃশ প্রবন্ধ পাঠে সকল পাঠকের মনোরক্তি সঞ্চার না হইতে পারে, কিন্তু পুরাতত্ত্ব-বিবিৎসু পাঠকের মনে কুতূহল সঞ্চারের সুসম্ভাবনা আছে। অদ্য এই প্রস্তাবে প্রস্তর কাটিবার যন্ত্রের যথা বলিব। ভারতবাসীদিগের মধ্যে কোন্ সময়ে কাহার দ্বারা পাথর কাটিবার কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় হয় না। যে ঋগ্বেদ পৃথিবীর পুরাতন বলিলেও সম্ভবে তাহাতেও পাথরের অট্টালিকার উল্লেখ আছে। যথা—

"শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাস্যৎ।
দিবোদাসায় দাশুষে।

ইন্দ্রদেব দিবোদাস নামক নিজ যাজককে এক শত প্রস্তর-নির্ম্মিত পুরী দান করিয়াছিলেন।

পাথরের পুরী পাথর কাটিবার কৌশল না জানিলে হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বেদ, স্মৃতি, মহাভারতাদি ইতিহাস গ্রন্থেও লৌহস্তম্ভ ও প্রস্তর-স্তম্ভযুক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকার ভূরি ভূরি বর্ণনা আছে। সুতরাং সহজে বলা যাইতে পারে যে, প্রস্তর কর্ত্তন ও লৌহস্তম্ভকরণের সুকৌশল তত্তৎ কালের বহু পূর্ব্ব হইতে এদেশের অধিবাসীরা অবগত ছিল সন্দেহ নাই *।

বৈদিক কালে কি রূপে প্রস্তর কর্ত্তন সিদ্ধ হইত তাহা আমরা জানি না। তখন পুস্তক লেখার প্রথা ছিল না বলিয়াই এখন জানিতে পারি না। যদিও তত পুরাতন পুস্তক নাই—অথবা ছিল কিন্তু আমরা পাই না—তথাপি উনবিংশ শতাধিক বৎসরের এক খানি জীর্ণ পুস্তক পাই তদ্দৃষ্টে বুঝা যায় যে, পাথর কাটিবার কৌশল এদেশে কত পূর্ব্বে উদ্ভাবিত হইয়াছিল। সে পুস্তক খানির নাম "বৃহৎসংহিতা"। প্রস্তর কর্ত্তন

* কলিকাতার লৌহ কাণ্ড দেখিয়া নব্য জীবেরা সিদ্ধান্ত করেন যে, ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে এরূপ ঢালাই কাণ্ড কেহ কখন অবগত ছিল না। পূর্ব্বে যে এ দেশীয়রা লৌহস্তম্ভকরণ বিধি অবগত ছিল তাহা প্রস্তাবান্তরে সপ্রমাণ করা যাইবেক।

সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতায় যাহা লেখা আছে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ দেখুন যে, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল।

"কৃষ্ণায়সৈঃ সুবিহিতৈর্ভবতঃ সুটঙ্কৈ
ছেদায় ভেদায় চ প্রস্তরাণাম্।"

প্রস্তর সকলের ছেদ ও ভেদের নিমিত্ত কৃষ্ণায়স অর্থাৎ জাত্য লৌহ বা ইস্পাত দ্বারা বিবিধ টঙ্ক নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

টঙ্কের লৌহ কিরূপ বিধানে প্রস্তুত করিতে হয় তাহা আমাদের জানা নাই, লিখিতও নাই কিন্তু দুই প্রকার টঙ্কই আমরা দেখিয়াছি যাহা এক্ষণে সচরাচর প্রচলিত। এক প্রকার টঙ্ককে "বাঁটালি" বলে, দ্বিতীয় প্রকারকে "টাঁকি" বলে। বাঁটালি টঙ্কের দ্বারা ভেদ সিদ্ধি হয়, আর টাঁকি টঙ্কের দ্বারা ছেদ সিদ্ধি হয়। ছেদনের টঙ্কটী আর কিছুই নহে, একটী পাকা লৌহের "তার" মাত্র, ইহার দ্বারা করাতের নিয়মে কাটিতে হয় এবং ছেদ স্থানে মুহুর্মুহুঃ জল ও তীক্ষ্ণ বালুকা প্রক্ষেপ করিতে হয়।

বাঁটালী টঙ্কই হউক, আর টাকি টঙ্কই হউক, উভয়েরই "পান" (কর্ম্মকার প্রসিদ্ধ "পানান") উত্তম হওয়া আবশ্যক; নচেৎ ভাঙ্গিয়া বা কুণ্ঠিত হইয়া যায়। এক্ষণকার কর্ম্মকারেরা কিরূপ প্রকারে টঙ্কাস্ত্রের "পান" দিয়া থাকেন জানি না, পরন্তু শাস্ত্র অনুসারে পূর্ব্বকালের পান এইরূপঃ—

"আর্কং পয়ো হড়ুবিষাণমসীসমেতং
পারাবতাখুশকৃতা চ যুতং প্রলেপঃ।
টঙ্কস্য তৈলমথিতস্য ততোঽস্য পানং
পশ্চাচ্ছিতস্য ন শিলাসু ভবেদ্বিঘাতঃ।"

অর্কক্ষীর (আকন্দ ফুলের নির্য্যাস,) হড়ুশৃঙ্গের মসী অর্থাৎ কএলা, পায়রার বিষ্ঠা ও ইন্দুরের বিষ্ঠা একত্রিত করিয়া টঙ্কের সর্ব্বাঙ্গে প্রলেপ দিবেক। প্রলেপ দিবার পূর্ব্বে উত্তম রূপে টঙ্কের সর্ব্বাবয়বে তৈল মর্দ্দন করিবেক; পশ্চাৎ কথিত প্রকারে প্রলিপ্ত করিয়া পান দিবেক। (অস্ত্রাদিতে কোন বস্তু প্রলিপ্ত করিয়া পোড়ানকে কর্ম্মকারেরা "পান" দেওয়া বলে)। এই প্রকারে পান দিয়া পশ্চাৎ শাণ দিবেক। এই শাণিত টঙ্ক শিলাতে বিহত হইবে না।

প্রকারান্তর,—

"ক্ষারে কদল্যা মথিতে নবঙ্গে
দিনোষিতে পাত্রিতমাত্রসং যৎ।
সম্যক্ ছিতং চ শ্মনি নৈতি ভঙ্গম
ন চান্য লোহেষ্বপি তস্য কৌণ্ঠ্যম্।"

কদলীক্ষার (তক্ কি পত্র দগ্ধ করিয়া তদুৎপন্ন ক্ষার) মর্দ্দন করিয়া এক দিন রাখিবেক। পর দিন তাহাতে "পান" দিয়া শাণ দিবেক। এইরূপ পানান লৌহ কিছুতেই ভাঙ্গে না এবং অন্য লৌহে ও কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা লৌহও কর্ত্তিত হয়। এই রূপ টঙ্ক অথবা পাষাণ বিদারণ যন্ত্রের সৃষ্টি এদেশে কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না। আমরা যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম ইহা সম্বৎ অব্দের সৃষ্টি কর্ত্তার সমকালে-উৎপন্ন বৃহৎসংহিতা নামক গ্রন্থ হইতে

উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে পাষাণ শিল্পের কত রূপ অঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিল। আবার এমন কঠিন প্রস্তর আছে যে সে সকল প্রস্তর টঙ্ক যন্ত্রেরও অভেদ্য। যে সকল শিলা সহজে ছেদ ভেদ করা যায় না—সে সকল শিলার ছেদ ভেদ করিবার জন্য উপায়ান্তরও আবিষ্কৃত হইয়া ছিল। কি কি উপায়ে কঠিন প্রস্তরের ছেদ ভেদ সাধিত হয়—তাহা নিম্নে প্রচারিত করা গেল।

" ভেদং যদা নৈতি শিলা তদানীং
পালাশকাষ্ঠৈঃ সহ তিন্দুকানাম্।
প্রজ্বাল্যিত্বানলমগ্নিবর্ণা
সুধাম্বুসিক্তা প্রবিদারমেতি * । "

যখন দেখা গেল যে শিলাস্তূপ কিছুতেই ভেদ করা গেল না, তখন এবম্বিধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবেক। যথা—পলাশ ও তিন্দুক কাষ্ঠ একত্র করিয়া ভেদ্য স্থানে অগ্নি জ্বালিবেক। ভেদ্য স্থানটী যখন অগ্নিবর্ণ হইবেক তখন তাহাতে চূণের জল সিঞ্চন করিবেক। কিয়ৎপরে ভেদ্য স্থানটী আপনিই বিদীর্ণ হইয়া যাইবেক।

প্রকারান্তর।

"তোয়ং শৃতং মোক্ষকভস্মনা বা
যৎ সপ্তরাত্রং পরিষেবনং তৎ।
কার্যাং শরক্ষারযুতং শিলায়াঃ
প্রস্ফোটনং বহ্নি বিতাপিতায়াঃ।

ভেদনীয় শিলাতে অগ্রে বহ্নির উত্তাপ লাগাইবেক। পশ্চাৎ সেই তপ্ত অবস্থায় তাহাতে "মোক্ষক "নামক দ্রব্যের ভস্ম আর উষ্ণ জল সেক করিবেক। পশ্চাৎ " শর " নামক তৃণের ক্ষার প্রক্ষেপ করিবেক। সপ্তরাত্র এইরূপ ক্রিয়া অবলম্বন করিলেই স্তূপপ্রমাণ প্রস্তরও স্ফটিত হইয়া যাইবেক।

তৃতীয় প্রকার।

" তক্রকাঞ্জিকসুরা সকুলত্থা
যোজিতানি বদরাণিচ তস্মিন্।
সপ্তরাত্রমুষিতান্যভিতপ্তাঃ
দারয়ন্তি হি শিলাং পরিষেকৈঃ।

তক্র, কাঁজি, সুরা, কুলত্থ (কুত্তীকলায়), ও বদর (কুল) একত্র করিয়া প্রস্তরের উপর তাহার জল সপ্তাহ পর্য্যন্ত সেক করিয়া পশ্চাৎ উত্তাপ লাগাইবা মাত্র প্রস্তর বিদীর্ণ হইয়া থাকে।

শিলা বিদারণের এইরূপ অনেক প্রক্রিয়া আমাদের পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। কাষ্ঠের তক্ষণ ও ছেদন করিবার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়াও অদ্যাপি লিপিবদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এক সময়ে যে এ দেশে বিলক্ষণ শিল্প চর্চার সূত্রপাত হইয়াছিল—তাহার নিদর্শনের স্বরূপ এই প্রস্তাবে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করা গেল মাত্র।

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

* এই সকল প্রক্রিয়া কেবল উৎখাত ও ভেদ করণের নিমিত্ত অবধারিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া বিদীর্ণ করিবার উপায় স্বতন্ত্র।

ছিন্নমুকুল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—অঙ্কুর-বিকাশ।

প্রাতঃকালের মন্দমন্দ সমীরণ-ভরে কম্পিত হইতে হইতে একখানি সুদৃশ্য বোট গঙ্গা-বক্ষ তরঙ্গিত করিয়া চলিতে ছিল। বোটে দুইটি কামরা, একটি কামরায় একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে একটি পীড়িতা রমণী শয়ান, পার্শ্বে দুইটি যুবা দুইখানি চৌকিতে বসিয়া, আর নীচে পদপার্শ্বে এক জন দাসী। একটি যুবাকে অপর যুবা জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আজ কেমন দেখিতেছেন? বাঁচিবার আশা কি আছে?" চিকিৎসক বলিলেন 'এতুই দিন হইতে আজ কিছু ভাল, তবে আরো দুইচারি দিন না গেলে ঠিক বলিতে পারি না।'

দিন যাইতে লাগিল, রমণীর নিকট যুবা প্রায় সর্ব্বদাই আছেন, আবশ্যক না হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নাড়ী টিপিয়া দেখিতেছেন, ক্ষণে ক্ষণে কপালের উষ্ণতা অনুভব করিতেছেন এবং রমণী এখন কেমন আছেন,' মাঝে মাঝে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চিকিৎসককে বিরক্ত করিয়া তুলিতেছেন, কিন্তু চিকিৎসকের সাহস বাক্যে তাঁহার কিছুতেই প্রত্যয় জন্মিতেছে না। যখন অন্য কোন কাজ নাই, তখন যুবা রমণীর সেই অজ্ঞান সুষুপ্ত মুখ পানে চাহিয়াই আছেন, তাহার সেই অর্দ্ধনিমীলিত পদ্ম-কোরক-সদৃশ নয়ন-যুগলের পানে চাহিয়াই আছেন, পলকহীন স্থির দৃষ্টিতে বিষণ্ণ ভাবে চাহিয়াই আছেন—তাহা দেখিয়া তাঁহার কি তৃপ্তি হইতেছে তিনিই জানেন।

এইরূপে তিন চারি দিন অতীত হইল, রমণীর পীড়া ক্রমে উপশম হইয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে তিন চারি দিনে একটু একটু করিয়া তাহার চৈতন্য লাভ হইল। তিনি যখন মানুষ চিনিতে পারিলেন তখন এই অপরিচিত যুবাদিগের মধ্যে আপনাকে দেখিয়া যেন বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কনকের সমস্ত ঘটনা অল্পে অল্পে স্মরণ হইল। সুশীলার মৃত্যু ও সেই দিন তাঁহার নদীতে পতন ক্রমে মনে পড়িল। তাহা ছাড়া যদিও আর কিছুই মনে করিতে পারিলেন না তবুও কনক বুঝিলেন তাহার পর ইহাঁরা তাহাকে বাঁচাইয়াছেন। কনক ভাবিল ইহাঁরা কে? তাহাকে বাঁচাইল কেন? মরিলেই সব দুঃখ ফুরাইয়া যাইত, আবার তাহার যন্ত্রণা ভোগের জন্য ইহারা কেন বাঁচাইল? ভাবিতে ভাবিতে যুবার করুণ দৃষ্টিতে কনকের বিষণ্ণ দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, অমনি আপনা আপনি কনকের চক্ষু নত হইয়া পড়িল, সেই পাংশুবর্ণ মুখ-মণ্ডলও ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যুবা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কি

আপনি ভাল আছেন ?" চিকিৎসক তখন অপর কক্ষে ছিলেন। সহসা এই কক্ষে আসিয়া বলিলেন "উহাকে এখনো কথা কওয়াইও না, বড় দুর্ব্বল" কিন্তু যুবার সেই সকরুণ সোৎসুক জিজ্ঞাসায় কনকের নতচক্ষু আবার উন্নত হইল,কিছু আশ্চর্য্য ও সন্দিগ্ধ চিত্তে তিনি যুবার পানে আবার চাহিলেন। কনকের জন্য সুশীলা ছাড়া কেহ কখনো উৎসুক হয় নাই, আজ এই অপরিচিত যুবা তাহার জন্য কাতর হইবেন, ইহা যেন কনকের স্বপ্নবৎ বোধ হইল।

ক্রমে এক মাসের মধ্যে বালিকা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন আর চিকিৎসকের আবশ্যক না থাকায় চিকিৎসক চলিয়া গেলেন। বালিকার পরিচয় পাইয়া তখন বোট লইয়া যুবা এলাহাবাদের দিকে আসিতে লাগিলেন। এই এক মাসে আস্তে আস্তে বালিকা, যুবকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গিতে লাগিল। প্রথমে একটি কথা কহিতেও তাহার লজ্জা হইত, ক্রমে অল্পে অল্পে একটি দুইটী করিয়া তাহার কথা ফুটিল। তখন যুবার জিজ্ঞাসায় কনক আপন পরিচয় সমস্তই দিল। পরিচয় না জানিলেই বা যুবা কি করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের কাছে তাহাকে দিবেন ? একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেলে বালিকা একটি একটি করিয়া তখন যুবার নিকট কত গল্পই করিল। একদিন কনকের শয্যার নিকট বসিয়া যুবা একটি কথার পর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বালিকার গল্প শুনিতেছিলেন। কথার মধ্যে যুবা একবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, তোমার পিতা যখন মরেন তখন তোমার বয়স কত ? তখনকার কথা তোমার কি মনে আছে ?" কনক বলিল "কিছু কিছু মনে পড়ে বই কি। বয়স তখন আর কত হবে, এই চার পাঁচ বৎসর"

যু। " উঃ তোমার তত ছোট বেলার কথা মনে আছে—আশ্চর্য্য তো ?

ক। " আমার তো আর তখনকার দিনগুলি বড় সুখে যায় নাই, অন্য ছেলেদের মত আদরে দিন কাটাইতে পারিলে আর অত ছোট বেলার কথা মনে থাকিত না। " যুবা ব্যথিত হইয়া বলিলেন "কনক, তোমার ঐ কথাটি শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল? তুমি কি ছেলেবেলায় কাহারো কাছে একদিনও আদর পাও নাই ? "

ক। "কই মনে তো পড়ে না—তাহা হইলে মনে থাকিত" এই কথা শুনিবামাত্র যুবার চক্ষে যেন আপনা আপনি জল আসিল এবং তিনি মনে মনে করিতে লাগিলেন "এই হৃদয়ে যত দিন শোণিত-ধারা বহিবে তত দিন শত সহস্র জনক জননীর আদর আমি তোমাকে দিতে পারি। " কনক তাঁহার অশ্রু পাত দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। কনকের বালা দুঃখে যুবা এতদূর দুঃখিত হইলেন যে তাঁহার চক্ষে জল পড়িল ! কই কনকের দুঃখেতো কেহ কখনো কাঁদে নাই ! কনক বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে যুবাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। যুবা তাহার এই সন্দেহের

ভাব যেন কিছু বুঝিতে পারিয়া তাহাতে মনে মনে দুঃখিত হইলেন। কিন্তু যুবার পানে চাহিয়া কনক যখন তাঁহার সেই স্নেহপূর্ণ মুখকান্তি দেখিল, অবিশ্বাস করিয়াছিল বলিয়া তাহার সেই মমতাময় চক্ষের নীরব অথচ করুণ তিরস্কার দেখিতে পাইল, তখন আর কনকের সন্দেহ রহিল না; তাঁহার স্নেহে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল। এই বিশ্বাসই কনকের কাল হইল, এই স্নেহের পরিবর্ত্তে অজ্ঞাত ভাবে বালিকা আপন হৃদয় বিনিময় করিয়া ফেলিল, যে কাহারো নিকট কখনও ভাল-বাসা পায় নাই, সে যে প্রথম নিঃস্বার্থ প্রেমের হস্তে আজ হৃদয় দান করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? যুবা ব্যাকুল ভাবে চক্ষু মুছিয়া আবার বলিলেন "কনক, ভাল করিয়া মনে করে দেখ দেখি কখনই কি কেহ তোমাকে বাল্য কালে আদর করে নাই।"

ক। "কই, কখনইতো আদর পাইয়াছি বলে মনে পড়ে না। সেই ছেলেবেলা একটি অপরিচিত যুবা আমার প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছিলেন, সেটি পর্য্যন্ত আমার এখনো মনে আছে, আর কেহ আদর করিলে কি ভুলিতাম।"

যু। "কিরূপ দয়া, কনক?

ক। "সেরূপ দয়াও আমি আগে আর কখনো পাই নাই। তার আগে আমার পক্ষ হইয়া কেহ একটি কথাও বলে নাই। সেই জন্য সে দিনটি এখনো আমার বিশেষ রূপে মনে আছে। তার পর আমার মাসী-মার সহিত এলাহাবাদে আসিলে তিনি আমাকে আদর যত্ন করিতেন। কিন্তু ছেলে বেলার সেই অপরিচিত যুবার আদরটি কেমন আমার এখনো মনে পড়ে"— বালিকা এই বলিয়া, সেই ছেলেবেলা এক দিন প্রমোদ যখন তাহাকে মারিতে গিয়াছিল একটি যুবা যে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে বাধা দিয়াছিলেন সেই গল্পটি করিল। সেই ক্ষুদ্র দয়াটি বালিকার হৃদয়ে এখনো গাঁথা রহিয়াছে দেখিয়া যুবা আশ্চর্য্য হইলেন। যুবা সে কথা আর না উঠাইয়া বলিলেন "কনক, তুমি বাঁচিয়াছ এই সংবাদ তোমার দাদাকে লিখিয়াছি তা জান! প্রমোদের নাজানি কতই আহ্লাদ হইবে।" কনক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল "তা কি হইবে!

যু। "ছিঃ কনক, তোমার কেন ওরূপ সন্দেহ হয়" এই তিরস্কার বাক্যে কনকের মুখটি যেন আরো ম্লান হইয়া পড়িল, যুবা বলিলেন "কনক, বাড়ী যাইবে, আবার তোমার সেই যতনের ভাইটিকে দেখিতে পাইবে, আহা তোমার কতদূর আহ্লাদ হইতেছে বল দেখি।" কনক একটু থামিয়া থামিয়া বলিল "হাঁ আহ্লাদ হইতেছে বই কি"

যু। "তোমার সেই স্নেহের রাজ্যে গিয়া কি আর কখনো এখানকার এই অপরিচিত পরের কথা মনে পড়িবে?" কনক এ কথার কিছুই উত্তর না করিয়া ভাবগর্ভ শূন্য দৃষ্টিতে যুবার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এই কথাটি জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া যুবার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,

তিনি তাহা ঢাকিতে সেই কক্ষ হইতে, উঠিয়া বোটের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ—মিলন।

এই রূপে বোটের দিন গুলি কাটিতে লাগিল। বালিকার লজ্জা ক্রমে আরো ভাঙ্গিয়া আসিল। যুবার নিকট আস্তে আস্তে সে তাহার জীবনের কত গল্প করিত, কতই অর্থহীন অমৃতময় আবল-তাবল বকিত। কনক কখনো কাহারো নিকট জীবনে ওরূপ করিয়া গল্প করিতে পায় নাই, তাহার গল্প ওরূপ আগ্রহ সহকারে কেহই শুনে নাই। যদি কখনো একটি মনের কথা ছেলেবেলা সে প্রমোদকে শুনাইতে যাইত প্রমোদ বিরক্তির সহিত 'কাজ আছে' বলিয়া উঠিয়া যাইত, সুতরাং এখন যুবার নিকট এই রূপ মনের কথা খুলিয়া সে এক প্রকার নূতন আমোদ পাইত, এরূপ আমোদ সে জীবনে কখনো পায় নাই। যুবাও বালিকার সেই সকল অসংলগ্ন এলোথেলো অথচ মর্ম্ম-গাথুনীতে গ্রথিত কথাগুলি কতই আগ্রহ সহকারে শুনিতেন। সেই অর্থশূন্য কথায় তিনি যত অর্থ পাইতেন—তাহা যত সার কথা বলিয়া তাঁহার মনে হইত, জীবনে ওরূপ সার কথা তিনি আর কখনো শুনেন নাই। কত ঔৎসুক্যের সহিত তিনি তাহার মুখপানে চাহিয়া তাহার সেই কথা গুলি শুনিতেন বলা যায় না: জীবনে কিছু শুনিতে তাঁহার ওরূপ মিষ্ট লাগে নাই, কিছু দেখিয়া তাঁহার ওরূপ অতৃপ্তিময় তৃপ্তি জন্মায় নাই। গল্প করিতে করিতে যদি কোন কাজে যুবা উঠিয়া যাইতেন, অমনি বালিকার হৃদয়-মধ্যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইত, সমস্ত স্ফূর্ত্তি চলিয়া যাইত, কতক্ষণে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, কতক্ষণে সে তাহার গল্পটি শেষ করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইত। যুবা ফিরিয়া আসিলে তবে সে নিশ্চিন্ত হইত। তিনি ফিরিয়া আসিলে তখনই অমনি কথা কহিতে পারিত না কিন্তু নীরব নয়নে তাঁহাকে কত বকিত, কেন চলিয়া গেলেন বলিয়া কত মৃদু তিরস্কার করিত, মনে মনে বলিত "না, আমার মত আমার গল্প শুনিতে অথবা আমাকে দেখিতে তোমার কখনই ভাল লাগে না। কিন্তু তাহলে আমিই বা কেন তোমাকে শোনাবার জন্য এত ব্যাকুল হই" যুবা বুঝিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া একটু আদরের হাসি হাসিয়া বলিতেন "নিতান্ত দরকার ছিল তাই গিয়াছিলাম, দেখ দেখি কাষ অসমাপ্ত রেখেই আবার কত শীঘ্র এসেছি" অমনি বালিকা সকল ভুলিয়া যাইত, আবার গল্প করিতে আরম্ভ করিত, কিন্তু একটি গল্পও তাহার শেষ হইত না, একটি গল্পও যেন তাহার ভাল করিয়া বলা হইত না, সে সেই একটি গল্প কতবারই করিত তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু তাঁহাদের সেই সুখ ফুরাইয়া আসিল। কনককে যুবা তাহার ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছায় বোট লইয়া এলাহাবাদের দিকেই আসিতেছিলেন, ক্রমে তাঁহারা এলাহাবাদে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহাদের আগমন বার্ত্তা পাইয়া প্রমোদ

মহা আহ্লাদের সহিত কনককে লইবার জন্য যে ঘাটে বোট লাগিয়াছিল, সেই ঘাটেই আসিলেন। কতদিন কনকের সহিত দেখা হয় নাই, আর যে কখনো দেখা হইবে তাহারো আশা ছিল না, এখন মনে মনে কনকের রক্ষাকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে নদীতীরে আসিতে লাগিলেন। দূরে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া তীরস্থ একখানি বোট হইতে একটি যুবা তীরে লাফাইয়া পড়িলেন। প্রমোদ তাহাকেই কনকের জীবনদাতা ভাবিয়া আলিঙ্গন করিবার অভিপ্রায়ে সোৎসুক চিত্তে তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। কিন্তু নিকটে আসিয়াই সহসা প্রমোদ একটু পিছাইয়া দাঁড়াইলেন, সহসা তাঁহার মূর্ত্তি কেমন ভিন্নভাব ধারণ করিল। প্রমোদ দেখিলেন তিনি যাহাকে আন্তরিক ঘৃণা করেন, তিনি যাহাকে শত্রু বলিয়া জানেন সেই হিরণই কনকের উদ্ধারকর্ত্তা। কি দৈব! হিরণের নিকট হইতে প্রমোদের আজ এমন উপকার গ্রহণ করিতে হইল! কনকের মৃত্যু ইহা অপেক্ষা যে ভাল ছিল!

হিরণকুমার প্রমোদের ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন, তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাইলেন না। প্রথম মনোবেগ কিছু শান্ত হইলে প্রমোদ ভাবিলেন "হিরণকুমার হাজার শত্রু হইলেও কনকের প্রাণ বাঁচাইয়াছে" ইহা ভাবিয়া প্রমোদ মনের অসন্তুষ্টি-ভাব দমন করিতে চেষ্টা করিয়া হিরণকুমারকে নিতান্ত কষ্টে-সৃষ্টে সাধুবাদ দিয়া কনককে গৃহে লইয়া আসিলেন। যাহাই হোক প্রমোদের ব্যবহারে হিরণ সন্তুষ্ট হইলেন না।

কনক কতদিন পরে আজ প্রমোদকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল। দুই মাসের পর বাড়ী আসিয়া কনক অনেক পরিবর্ত্তন দেখিল। দেখিল তাহার ভ্রাতার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি সঙ্গিনী জুটিয়াছে। সুশীলার মৃত্যুরপর প্রমোদ সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া নববধূ লইয়া এখন এলাহাবাদেই আছেন। প্রমোদ কলিকাতায় আর পড়েন না, স্ত্রী এবং বিদ্যা এই দুই রত্নের আদর এক সময়ে হয় না, প্রমোদের এখন পড়া সাঙ্গ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যুর কিছু দিন পরেই প্রমোদের বিবাহ হইয়াছিল। সুশীলার মৃত্যু এবং কনকের জলমগ্ন-সংবাদ পরদিন তাড়িতবারে পাইবামাত্র প্রমোদ কলিকাতা ছাড়িয়া তাহার পরদিন বাড়ী আসেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও কনকের দেহ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইলেন না। এদিকে দয়ানন্দ কন্যা লইয়া এখানে আসিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াই নিরুদ্দেশ হইলেন। সুশীলার মৃত্যুর এক মাস পরেই নীরজার বিবাহ হইল। কনকের মৃত্যু শুনিয়া যামিনীনাথ অত্যন্ত হতাশ হইলেন—যে লোভে নীরজাকে ছাড়িলেন তাঁহার সে লোভও ব্যর্থ হইল, অতি লোভে তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয় কুলই তিনি হারাইলেন।

বাড়ী আসিয়া কনক নববধূ নীরজার সহিত সাক্ষাৎ করিল, অমন সুন্দরী বধূ

দেখিয়াও কনকের মনে হইল "দাদার সমযোগ্য বৌ হয় নাই"

নীরজা এখানে আসিয়া অল্প দিনের মধ্যেই কুলবধূর মত হইয়া পড়িয়াছে, এখন আর সে আগেকার মত আরণ্য বালিকা নাই, এখন নীরজা প্রমোদের কাছে থাকিয়া থাকিয়া সহরের অনেক হাব ভাব কথা বার্ত্তা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দিন কতকের জন্য তাহার মনে যে বিষণ্ণ ভাব আসিয়াছিল তাহা গিয়া নীরজার হৃদয় এখন হর্ষ-উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। মনের মত লোক পাইয়া এখন আর সে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহে না, ফুল লইয়া খেলেনা, এখন তার খেলা আমোদ গল্প সকলি মানুষের সহিত। এখন লীলাময়ী যমুনার উপর, কূলস্থ বট-বৃক্ষ-পতনের মত নীরজার আরণ্য তরল স্বভাবে সাংসারিক ভাব আসিয়া পড়িয়াছে—এখন বনের পক্ষী পিঁজারায় আবদ্ধ হইয়া লোক-রঞ্জন কথা কহিতে শিখিয়াছে, এখন বনবালা নীরজা আবার গৃহস্থ নীরজা হইয়াছে। ক্রমে দিনে দিনে নীরজার সহিত কনকের বন্ধুতা জন্মিতে লাগিল।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ—মনের কথা।

অন্তঃপুরে প্রমোদের শয়ন-কক্ষে বসিয়া, কনক নীরজার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। এ বড় সাধের চুল বাঁধা, প্রমোদের মনে ধরাণ চাই, কিন্তু প্রমোদের মনে ধরিবে কি, না ধরিবে সে তো পরের কথা, কনকের এখন মনে ধরিলে হয়। কতবার যে কনক চুল খুলিয়া বাঁধিল তাহার ঠিক নাই, তথাপি কনকের মনে ধরিল না, বাঁধাও শেষ হইল না, বেচারী নীরজা আর সে চুল বাঁধা হইতে ত্রাণও পাইল না। এ চুল বাঁধার অন্ত নাই দেখিয়া নীরজা বলিল "নে ভাই, তোর কি আর হবে না নাকি? রাত হয়ে গেল যে।" কনক তাহার হেলিত মস্তক সমান করিয়া লইয়া বলিল "তুই ভাই সেই অবধি যে নড়ছিস তা কি করে হবে? তা নইলে এতক্ষণ হয়ে যেত। কতবার বাঁকা হয়ে গেল বলে যে খুলতে হোলো? তুই ভাই বনে থেকে থেকে বনের হরিণের মত চঞ্চল হয়ে পোড়েছিস"

নী। "আহা ভাই বনের হরিণ হওয়ায় যে কি সুখ তা তাঁই তুই জানবি কি করে?

ক। "তুই সেই জন্যে বুঝি সাধ করে বাঘের হাতে ধরা দিলি"

নী। "আমি কি ভাই আর ইচ্ছা করে ধরা দিলেম?"

ক। "আমার দাদা তো পাখী শীকারে গেছলেন, তা তুই ধরা দিলি কেন।"

নী। "তা ভাই সাধ করে কি ধরা দিলেম?

ধরা পড়লেম ফাঁদে,
নইলে কোথায় হরিণবালা বাঘের লাগি
ফাঁদে?"

তা যাক, এখন তোর পায়ে পড়ি ভাই

শীঘ্র বেঁধে নে, হাঙ্গার বাঁ
পুলিস নে ভাই "

ক। "কেন, এর মধ্যেই তোর সাধ ফুরুলো? এই যে বাঁধবার সময় বলি 'সে দিনকার বাঁধাটা উনি প্রশংসা করেছেন সেই রকম করে বেঁধে দেও "

নী। "তা ভাই কি করব? আমার মাথা ব্যথা হয়ে গেছে আর পারিনে ভাই। তুই এতক্ষণে বাঁধতে পারলিনি আমি কি করব" কনক সোহাগ ভরে চুল বাঁধা রাখিয়া একটু অভিমান করিয়া বলিল "তবে এই রইল, আমি আর বাঁধব না, আমার মনের মত বাঁধতে দিবিনে তবে তোর যেমন ক'রে ইচ্ছা বাঁধগে "

নী। "রাগ! আচ্ছা আর বাপু বলব না, তুই যত ইচ্ছা দেরি কর সেই কাল সকাল বেলা উঠিস "

কনক। " অমনি আর কি! তোর ঐ এক কথায় বুঝি আমার রাগ যাবে! আজ তোকে পায়ে ধরে সাধাব তবে হবে। তুই যে বড় কথায় কথায় অভিমান করে দাদাকে সাধাস, আমার বুঝি তাতে রাগ হয় না? আমি আজ তার শোধ তুলব?'

নীরজা। " আচ্ছা তাই সই, কিন্তু ভাই সাধতে গেলেই গান গাইতে হয়, একটা সাধবার গান তুই আমাকে শিখিয়ে দে, আমি তাই বুনোমানুষ ওসব গানের তো আমার বিদ্যে নেই" কনক এই কথায় ঠাট্টা ছাড়িয়া বলিল "ভাই নীরজা, আমার তো অদৃষ্টে কখনো অভিমানের পর আদর ঘটেনি, চিরকাল অভিমান করে মনে মনেই কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছি। তাই কষ্টের গান ছাড়া তো আর আমি কিছুই শিখিনি, যে তোকে শেখাব।" কনক এই বলিয়া যেন কিছু বিষণ্ণ হইল—পূর্ব্বের আমোদের ভাব ছাড়িয়া কনক আপন মনে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

"কে আছে রে অভাগিনী, আমার মতন,
জানিনে কখনো কি বা সোহাগ যতন।
জনম দুখিনী হায়, আপনারি ভাবি যায়,
ছুঁতে যাই, অমনি সে হয় অদর্শন—
পরিমলে মাখামাখি, একটি গোলাপ দেখি
আপনা ভুলিয়ে আহা মোহময় হরষে—
তুলিতে গিয়েছি সেই, প্রফুল্ল কুসুম সেই
অমনি ঝরিয়ে গেছে এ হাতের পরশে।
একটি পুষেছি পাখী যদি ভাল বাসিয়ে,
দুদিনে খাঁচাটি ভেঙ্গে গিয়েছে সে পালিয়ে,
কাঁদিয়ে জনম গেল, কেহ তো বাসেনি ভাল,
অনন্ত এ অশ্রুধারা করেনি কেহ মোচন।"

গানটি অনেক ক্ষণ শুনিয়া শুনিয়া নীরজা বলিল, "এই এতক্ষণ ভাই তুই কেমন ছিলি, কেন আমি মরিতে গানের কথা পাড়িলাম! তোর এই রকম ভাব দেখলে আমার বড় ভয় হয়, জানি যে তাহলে সমস্ত দিনটিই তোর এই ভাবে কাটিবে'

ক। " তা কাটলোই বা? তাহাতে কার কি এল গেল?'

নী। "তা বইকি? আমার সঙ্গে যে তাহলে সমস্ত দিন কথা কইবিনে? আমার যে একলাটি চুপ্‌করে থেকে ঘুমরে মরিতে হবে।'

ক। "তা আমি নাইবা কথা কইলেম,

তুই দাদার গল্প করিস, আমি শুনিব এখন, তাহলেই তো তোর হোল ?'

নী। "সুধু ওরূপ করে শুনিয়ে কি তেমন মজা হয়"

ক। "তবে আবার কি চাই"

নী। "গল্প করিতে করিতে হেসে না শুনিলে আমি তোকে বলিব না"

ক। "তুই দেখিস দেখি, আমি তাই হেসে শুনব। তোর সুখের কথায় কি তাই আমার আমোদ হয় না ?

নী। "আচ্ছা তা যেন তোর হয়, কিন্তু তুই তাই মাঝে মাঝে অমন বিষণ্ণ হোস কেন ?"

ক। "কি করে তা বলব ?"

নী। "আপনার মনের কথা আর আপনি বলতে পারিবি নি। তবে কি তোর দাদাকে ও কথা জিজ্ঞাসা করিব নাকি ?"

ক। "তা বইকি ? আচ্ছা তুই বল দেখি সে দিন কাঁদলি কেন ?"

ন। "সত্যি কথা বলব ?
দার উপর অভিমান হয়েছিল ?"

ক। "কেন গো"

নীরজা একটু হাসিয়া বলিল "ভাই ও কথা জিজ্ঞাসা করিসনে। অভিমানের কারণ কিছুই নেই, সুধু সুধু"

ক। "আমারো ভাই তবে এরূপ ভাবের কারণ কিছুই নাই, তোকে কি বলব

নী। "দূর ভাই তুই দেখছি ছাড়বিনে। কিন্তু সে পাগলামীর কথা বলতে বড় লজ্জা করে, নিতান্ত শুনবি ?'

ক। "যদি বলিস"

নী। "দেখ ভাই আমি নতুন তোর কাছে পান সাজতে শিখে, নিজে একটি পান সেজে বাইরে তাঁকে পাঠিয়ে দিই, রাত্রে দেখা হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেম "খেয়েছিলে" তিনি বলিলেন, সেখানে একজন ভদ্রলোক ছিল, তাই তখন আপনি না খেয়ে তাঁকে দিতে হয়েছিল, এতেই ভাই আমার বড় দুঃখ হোল।"

তাহার অভিমানের কারণ শুনিয়া কনক একটু হাসিয়া বলিল "তোর ভাই এত অল্পে অভিমান হয় ?" সলাজে নীরজা বলিল "আমিতো এখন তোকে সব খুলে বল্লেম—এবার তুই বল দেখি তোর বিষণ্ণ ভাবের কারণ কি ?"

ক। "কেন ভাই, তোর যখন এত অল্পে দাদার উপর অভিমান হয়, আমি দাদাকে এত ভালবাসি মনে কর-না যখন ভাবি তিনি আমাকে ভাল বাসেন না, তখন দুঃখ কি হয় না ?" এই কথা শুনিয়া নীরজার অতিশয় আহ্লাদ হইল। প্রমোদকে কেহ ভাল বাসিলে সে অত্যন্ত খুসী হইত, প্রমোদকে যে ভাল বাসিত নীরজাও তাহাকে ভাল বাসিত। যদি কেহ নীরজার প্রিয় পাত্র হইতে ইচ্ছা করিত তাহা হইলে প্রমোদের প্রশংসা করাই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার একটি সহজ ও অকাট্য উপায় ছিল। নীরজা কনকের কথায় আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলিল "আচ্ছা ভাই সত্যি তুই তোর দাদাকে খুব ভালবাসিস ? তোর দাদাও তোকে ভাল বাসেন, আর দুঃখ করতে হবে না ?"

ক। "তোমার আর আমাকে প্রবোধ দিতে হবে না ?"

নী। "আচ্ছা তা দিচ্ছিনে কিন্তু বল দেখি দাদাকে সত্যি খুব ভাল বাসিস।"

ক। "কেন তাহাতে তোর রাগ হয় নাকি! সেজন্য যেন আবার দাদার উপর অভিমান করে বসিসনে। হাঁ খুব ভালবাসি, তোর চেয়েও ভালবাসি" এই কথায় আহ্লাদে ঢল ঢল ভাবে নীরজা বলিল "তোর দাদাটি যে মিষ্টি তা আর ভাল বাসবিনে। কিন্তু ভাই দেখিস আমাকে ফাঁকি দিসনে ?"

ক। "নে ভাই তোর ঐ এক পচা পুরাণ, জঘন্য ঠাট্টা রেখে দে, আর বুঝি ঠাট্টা জানিসনে।"

নী। "আমি ভাই ঐ ঠাট্টাটি নতুন যে শিখেছি,তা ভাই তোর আজ এখন মন ভাল নেই, এখন যে কি ঠাট্টা তোর ভাল লাগবে, তাতো জানিনে। তোর দাদার মত করে ঠাট্টা করব ?" বলিয়া নীরজা কনকের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার চিবুক ধরিয়া গাহিল—

আয়লো সরলে প্রাণের প্রতিমা,
আয়লো হৃদয়ে রাখি,
কতদিন হতে রয়েছি আশায়
বলিব কি বল সখি।
আয় আয় ভাই তেমনি করিয়ে
গানালো মধুর গান,
কি মোহিনীগুণ আছে ঐ গানে
পাই যেন নব প্রাণ,
পেয়েছি তোরেলো হাসিব এখনি
ভুলিব প্রাণের জ্বালা,
ও হাসি হেরিলে আঁধার এ হৃদে
ভোছনা ভাতিবে বালা,
সরে আয় সখি, ভাল করে দেখি,
আজি এ কেমন বেশ,
নয়ন কমল, জলে ঢল ঢল,
এলানো ছড়ানো কেশ,
পারিনে পারিনে দেখিতে পারিনে
ওমুখ তোমার ম্লান,
মরমের শিরে কি যে বেঁধে শেল
ফেটে ওঠে যেন প্রাণ,
সরলে আমার সর্ব্বস্ব ধন
আয়লো হৃদয়ে রাখি,
ভাঙ্গা চোরা এই হৃদয় আমার
চিরদিন তোরি সখি।
তোমারি কারণে জীবন ধারণ,
আমি যে তোমারি, সখি--
প্রমোদ-মাখানো আশার প্রতিমা !
আয় তোরে হৃদে রাখি।

ভাই তোর দাদার কাছে গানটি শিখেছি" কনক নীরজার পানে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার গানটি শেষ হইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল 'দাদার কাছে শিখেচিস, বেশ করেছিস, এখন এদিকে মুখ ফিরিয়ে আমার যে কাজ বাড়ালি, তার কি বল দেখি ? তুই ভাই আজ দেখছি কোন মতে ভাল করে চুল বাঁধতে দিবিনে" নীরজা অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া বলিল "তোর দাদার কথায় আমার ভাই জ্ঞান থাকে না; না ভাই আর করব না এবার, বেঁধে দে" নীরজার অসাবধানতায় অর্দ্ধ বিনারিত একটি বিনুনি

কনকের হস্তচ্যুত হইয়া যে অল্প খুলিয়া গিয়াছিল, সেই বিনুনী কনক আবার হস্তে তুলিয়া লইয়া বিনাইতে বিনাইতে বলিল " "গানটি ভাই কিন্তু বেশ। গানটি গেয়ে বুঝি দাদা তোর অভিমান ভাঙিয়েছিলেন? অত অভিমান করিস কেন ভাই?"

নী। "তুই অত দুঃখ করিস কেন ভাই।"

ক। "নে ভাই তুই আবার আমার এত দুঃখ পেলি কোথা?"

নী। "পাব আর কোথা? দেখতে পাই। ছি ভাই দাদার উপর কি মিছে দুঃখ করতে আছে? তাঁর হোলো কনক-গত প্রাণ।"

ক। "অল্পেতেই কথায় কথায় তোর যে অভিমান, কনক-গত প্রাণ হলে কি আর রক্ষা থাকত!"

নী। "না ভাই তাতে কি অভিমান করি"

ক। "এখন বাসেন না ভাই, দেখা যেত বাসলে করতিস কি না"

নীরজা বলিল "আমার সোনার চাঁদ কনক, তোকে পেয়েছি কত ভাগ্য, তোকে ভাল বাসলে কি রাগ করতুম? আমার ভাই ভাগ্য যে তুই জলে ডুবে মরিসনি, তাহলে এমন করে বসে কার সঙ্গে গল্প করতুম? আচ্ছা ভাই কনক তোকে তীরে দেখে যখন হিরণকুমার বোটে তুলে নিয়ে এল, তখন তোর কি একটুও জ্ঞান ছিল না?

ক। "আবার সেই জলে ডোবার গল্প? কত বার ঐ এক গল্প করব? এই নে ভাই চুল বাঁধা এবার শেষ হোলো" তখন নিস্তার পাইয়া কনকের দিকে ফিরিয়া বসিয়া নীরজা বলিল "তা করিলেই বা এক গল্প কি আর করিতে নেই নাকি! আমার কি মনে হয় জানিস? ভাগ্যে যে তীরে হিরণের বোট লাগান ছিল সেখানে তুই এসে পড়েছিলি তাই তো সে বাঁচালে নইলে কি হোত ভাই? আচ্ছা ভাই বাড়ীর লোকেরা তোকে কেউ পেলে না কেন? ভাল করে খুঁজলে কি আর রাতেই পেতো না?"

ক। "বাড়ীতে আর কে ছিল বল? এক চাকর দাসী? তা তারা মায়ের দাহ কার্যেই ব্যস্ত। হিরণকুমারের কি না কি কাজের জন্য সেই রাত্রেই তীরে নামতে হয়ে-ছিল তাই ফিরে বোটে ওঠবার সময় আমাকে দেখতে পেলেন আর বাঁচাতে বোটে তুলে নিলেন। চাকররা তো আর সে রাত্রে সমস্ত গঙ্গার তীরে খুঁজতে পারে না"

নীরজা আবার বলিল "ভাগ্যে হিরণ-কুমার যে তীরে সে দিন বোট লাগিয়ে ছিল সেই তীরে তুই গিয়ে পড়ে ছিলি।"

কনক আর কিছুই উত্তর করিল না, এই জলমগ্নের কথা হইতে কনক আরো বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। দেখিয়া নীরজা বলিল "কথায় কথায় তবু তোর বিষণ্ণ ভাব ঘুচে এসে ছিল আবার ভাই এভাব কেন বল দেখি! তুই ভাই বাস্তবিক কি একটী কথা আমার কাছে লুকাস। তুই আমাকে তোর দুঃখের যে কারণ বলিস তা ছাড়া

আর একটা কি নিশ্চয়ই তোর মনে আছে" কনক এই কথাটী শুনিয়া আর থাকিতে পারিল না তাহার চক্ষু হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রু বারি ধীরে ধীরে ভূমে পতিত হইল। নীরজা তাহা দেখিতে পাইল তাহাতে বুঝিল, নীরজার অনুমান সত্য, বাস্তবিক কোন লুকানো কথা কনকের হৃদয়ে আছে। নীরজা ব্যথিত হৃদয়ে বলিল "বলনা ভাই তুই আমার কাছে কি কথা লুকাচ্ছিস? কনক আমিতো ভাই তোর কাছে কিছু লুকাইনে" নীরজার স্নেহ বাক্যে কনকের ক্রন্দন দেখিয়া তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য নীরজা আপন মনে কতই প্রশ্নোত্তর করিতে লাগিল। কনকের হৃদয়ে যে একটি লুকানো ব্যথা জাগিতেছে তাহাতে আর তাহার সন্দেহ রহিল না। এখন সে ব্যথা কি? তাহাই নীরজা ভাবিয়া স্থির করিতে চেষ্টা করিল। ব্যথাটি যে গুরুতর তাহাও নীরজা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিয়া ভাবিল "কনকের হৃদয়ে দারুণ ব্যথাও ইহার কারণ? কনকের কথা বিশ্বাস করিতে গেলে ইহার কোন কারণই নাই। কিন্তু তাহা কি হয়? এত গুরুতর ব্যথা কি অমনি জন্মায়? ভাল বাসিলে তো এক এরূপ ব্যথা জন্মায়। কেননা আমি নিজেই দেখিছি যে যখন আমি প্রমোদকে ভালবেসে ফেলেছিলুম তখন প্রমোদের নাম শুনলেই, প্রমোদের কথা মনে এলেই, এমন কি তার সঙ্গে যে ফুলটী পর্য্যন্ত একত্রে দেখিছি সে ফুলটী দেখলেও মনটা ব্যাকুল হয়ে পড়ত, আপনা হতেই কেমন চোক দিয়ে জল আসত। এতো তাই নয়? কনক নিশ্চয়ই কাহাকে ভাল বাসিয়াছে। কিন্তু ভালই বা কাহাকে বাসিবে? প্রণয়ের পাত্র কই?" অমনি নীরজার মনে হইল অনেক দিন কনক হিরণের সহিত একত্রে বাস করিয়াছিল, হিরণই তাহাকে বাচাইয়াছে হিরণকে তো সে ভাল বাসে নাই?" নীরজা আপন বক্ষ হইতে কনকের মাথাটি তুলিয়া মুখটী মুছাইতে মুছাইতে জিজ্ঞাসা করিল "কনক তুই কি ভাই কাহাকেও ভাল বেসেছিস? বলনা ভাই? তুই কি হিরণকে ভাল বাসিস?" হিরণের নাম শুনিয়া কনকের মুখটী একটু আরক্তিম হইল, ক্রমে আবার সেই আরক্তিম বিষণ্ণ মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া আসিল, কনকের অধর প্রান্তে একটু সলাজ হাসির রেখা পড়িল। তাহাকে নিরুত্তর এবং তাহার ভাব দেখিয়া নীরজা বুঝিল কনক যথার্থই হিরণকে ভাল বাসে। বুঝিয়া কিন্তু নীরজা মনে মনে দুঃখিত হইল। প্রমোদের নিকট হিরণের কথা নীরজা যেরূপ শুনিয়া ছিল তাহাতে সে তাহাকে অতি মন্দ লোক বলিয়া ঘৃণা করিত, হিরণকে শত্রু বলিয়া জানিত। যাহাকে তাহারা শত্রু বলিয়া দেখিতে পারে না যাহাকে মন্দ লোক বলিয়া ঘৃণা করে তাহাকে কনক ভাল বাসিবে একথা মনে করিতেও তাহার কষ্ট হইল। যদি কোন মতে কনকের মন হইতে সে ভালবাসা ঘোচাইতে পারে এই চেষ্টায় বলিল "কেন ভাই তাকে তুই ভাল বাসলি? সে অতি মন্দলোক, সে তোর ভাইকে খুন করতে গিয়ে ছিল তাকে ভাই

তুই ভাল বাসলি? তাকে ভালবেসে তুই তো সুখী হবি নে" নীরজা বালিকা জানে না যে প্রণয়ের মূল উৎপাটন করিতে গেলেই আরো দৃঢ় হইয়া বসে। নীরজার কথায় কনকের বিষণ্ণ মুখমণ্ডল যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল, অশ্রু বারি শুকাইয়া গেল, কনক ধীর গম্ভীর ভাবে বলিল "হিরণ মন্দ লোক নহেন, হিরণ কখনও খুন করিতে যান নাই, একথা যে তোমাদের বলিয়াছে সে মিথ্যাবাদী, তাঁহাকে না জানিয়া কেন দোষ দাও?" এই খানেই তাঁহাদের কথোপকথন বন্ধ হইল, পরস্পর মনের ভাব দুজনে বুঝিয়া দুজনেই নিস্তব্ধ হইয়া গেলেন। কনক ভাবিয়াছিল, এক দিন তাহার মনের কথা নীরজাকে বলিয়া সে এক জন বাপার বাপী পাইবে। কিন্তু আজ বুঝিল নীরজার নিকট হইতে সে আশা আর নাই। সেই অবধি কনক নীরজার সহিত সে বিষয়ে কখনো কথা কহিত না। নীরজা সে কথা উঠাইলে কনক অন্য কথা দিয়া তাহা চাপা দিত। কনকের হৃদয় জ্বালা কনক লুকাইয়া লুকাইয়া একাকীই ভোগ করিত।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমরা সে দিন "ফ্যান্সি-বলে" অর্থাৎ ছদ্মবেশ-নাচে গিয়েছিলেম—কত মেয়ে পুরুষ নানা রকম সেজে-গুজে সেখানে নাচ্‌তে গিয়েছিল—সে দেখ্‌তে বেশ জম্‌কালো। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চার দিকে বাদ্য বাজ্‌চে—৬।৭০০ সুন্দরী, সুপুরুষ। ঘরে ন স্থানং তিল ধারয়েৎ—চাঁদের হাট ত তাকেই বলে—যে দিকে পা বাড়াই বিবিদের গাউন—যে দিকে চোক্ ফেরাই চোক্ ঝল্‌সে যায়—এক একটা ঘরে দলে দলে স্ত্রী পুরুষে হাত ধরা ধরি কোরে ঘুরে ঘুরে নাচ্‌তে আরম্ভ কোরেছে, দেখে মনে হয় যেন সবাই একেবারে আমোদে উন্মত্ত হয়ে গেছে—জ্ঞানশূন্য হয়ে যেন যোড়া-যোড়া পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্চে, এক একটা ঘরে এমন ৭।৮০ জন যুগল-মূর্ত্তি ঘুর্‌চে—এমন ঘেঁসাঘেঁসি যে, কে কার ঘাড়ে গিয়ে পড়ে তার ঠিক্ নেই, একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্য মাংসের ছড়া ছড়ি, সেখানে লোকে লোকারণ্য; এক একটা বিবির খাবার বিরাম নেই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার মুখ চোল্‌চে। এক একটা বিবির নাচের বিরাম নাই, দু তিন ঘণ্টা ধোরে ক্রমাগত তার পা চল্‌চে। সকলেরই মুখে হাসি, মন অধিকার কর্‌বার যত প্রকার গোলাগুলি আছে, বিবিরা তা অকাতরে নির্দ্দয়-ভাবে বর্ষণ কর্‌চেন—কিন্তু ভয় কোরো না, আমাদের মত পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও

পড়েনি। এক জন বিবি Snow maiden অর্থাৎ নীহার-কুমারী সেজে গিয়েছি; সেন, তাঁর সমস্তই শুভ্র, সর্ব্বাঙ্গে পুঁথির সজ্জা, আলোতে একেবারে ঝক্ ঝক্ কোর্‌তে, একজন মুসলমানিনী মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা লাল ফুলো ইজের, ওপরে একটা রেসমের পেশোয়াজ্, মাথায় একটা টুপির মত—এ কাপড়ে তাঁকে বেশ মানিয়ে গিয়েছিল। এক জন আমাদের দিশি মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—একটা সাড়ি ও একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার উপরে একটা চাদর পোরেছিলেন, তাতে ইংরিজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভাল দেখাচ্ছিল। এক জন বিলিতি দাসী সেজে গিয়েছিল—যে রকম তার চেহারা, তাতে দাসীর পোষাক ছাড়া আর কিছুতে তাকে মানাতো না—এই রকম নানা লোক নানা রকম পোষাক পোরে গিয়েছিল। আমি বাঙ্গালার জমীদার সেজেছিলেম, জরী দেওয়া মখমলের কাপড়, জরী দেওয়া মকমলের পাগ্‌ড়ি প্রভৃতি পরেছিলেম। জনকতক বাকি মিলে পীড়াপীড়ি কোরে আমাকে একটা দাড়ি গোঁপ পরালেন, দুই এক জন মহিলা আমাকে দেখে বোল্লেন যে, সে দাড়ি গোঁপে আমাকে ভারি ভাল দেখাচ্চে, তাতে আমার স্বভাবতই ভারি গর্ব্বের আবির্ভাব হোল, আমি সেই দাড়ি গোঁপ পোরেই "বলে" গিয়ে উপস্থিত হলেম—কিন্তু দর্পহারী মধুসূদন আছেন, আমি যে নাকালটা হলেম তা আর বক্তব্যও নয়, শ্রোতব্যও নয়, তা' শুনলে পাষাণেরও চোক্ ফেটে মুক্তার মত ডাগর ডাগর অশ্রুবিন্দু দরদর ধারে বিগলিত হয়ে ধরণীতল অভিষিক্ত করবে—যে সকল সুন্দরী বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল, আমার দাড়ি গোঁপ দেখে তাঁরা আর কেউ আমাকে চিন্‌তে পারেন না—অমুকের সঙ্গে সকলেই সেক্ হ্যাণ্ড কর্‌লে—অমুক বাবুর সঙ্গে সকলেই সেক্ হ্যাণ্ড কোল্লে কিন্তু এ গরীবকে আর কেউ পোচ্ছে না। আমি যার কাছে যাই, সেই সোরে পড়ে, আমি তো রাগে, দুঃখে, অভিমানে, বিরক্তিতে, আত্ম-গ্লানিতে অভিভূত হয়ে সেই মুহূর্ত্তেই দাড়ি গোঁপ উৎপাটন কোরে একেবারে পকেটে গুঁজলেম, তখন সমস্ত ভালোয় ভালোয় মীমাংসা হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে অমুক অযোধ্যার তালুকদার সেজে গিয়েছিলেন—সাদা রেশমের ইজের জরিতে খচিত, সাদা রেশমের চাপ্‌কান, সাদা রেশমের জোব্বা, জরীতে ঝক্‌মকায়মান পাগড়ি, জরীর কোমরবন্ধ—এইতো তাঁর সজ্জা। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে এই রকম কাপড় পরে তা মনেও কোরো না কিন্তু বিচার কর্‌বার লোক কোথায়? ধরা পড়্‌বার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমাদের মধ্যে অমুক বাবু আফ্‌গান সেনাপতি সেজেছিলেন।

গত মঙ্গলবারে আমরা অমুকের বাড়িতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম। সন্ধ্যে বেলায় কোথাও নিমন্ত্রণে যেতে হোলে কি রকম পোষাক পোর্‌তে হয় জান? এখানে

শীতের জন্য সচরাচর মোটা কাপড় পোরতে হয়, কিন্তু Evening party প্রভৃতিতে যেতে হোলে পাতলা কালো বনাতের কাপড় পোরতে হয়, কেননা নিমন্ত্রণ-সভায় খুব গ্যাস জ্বলে, অনেক লোকের সমাগম হয়, তাতে ঘর বেশ গরম হয়ে ওঠে, তা ছাড়া, যদি নাচতে হয় তা হোলে অত্যন্ত গরম হবার কথা। সন্ধ্যে পরিচ্ছদের কামিজটি একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধব্-ধোবে শাদা হওয়া চাই, তার ওপরে প্রায় সমস্ত বুক-খোলা এক বনাতের ওয়েস্ট কোট থাকবে, কাল ওয়েস্ট কোটের মধ্যে শাদা কামিজের সুমুখ দিকটা বেরিয়ে থাকবে, গলায় শাদা ফিতে (necktie) বাঁধা, সকলের ওপর একটি টেল্ কোট (লাঙ্গুল কোট)—টেল্-কোটের সুমুখ দিকটা কোমর পর্য্যন্ত কাটা, আমাদের চাপকান প্রভৃতি পোষাকগুলি যেমন হাঁটুপর্য্যন্ত পড়ে, এ তা নয়। এর সুমুখ দিকটার সীমা কোমর পর্য্যন্ত, কিন্তু পেছন দিকটা কাটা নয়, সুতরাং কতকটা ন্যাজের মত ঝুলতে থাকে; আমরা যখন ইংরাজদের অনুকরণ করি, তখন বাধ্য হোয়ে এই ল্যাজ কোট্ পোরতে হোলে, কেন না ল্যাজ কোট না পোর্লে অনুকরণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না। নাচ-পার্টিতে যেতে হোলে হাতে এক জোড়া শাদা দস্তানা পোরতে হয়, কারণ যে মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে হবে, তোমার খালি হাত লেগে তাঁদের হাত ময়লা হয়ে যেতে পারে কিম্বা তাঁদের হাতে যদি দস্তানা থাকে তাঁদের দস্তানা ময়লা হোয়ে যেতে পারে। অন্য কোন জায়গায় লেডিদের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কোরতে গেলে হাতের দস্তানা খুলে ফেল্তে হয়, কিন্তু নাচের ঘরে তার আর আবশ্যক হয় না। যাহোক্, আমরা তো সাড়ে নটার সময় তাঁদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেম। তখনও নাচ আরম্ভ হয় নি। ঘরের দুয়ারের কাছে গৃহকর্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি বিশেষ পরিচিতদের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কোরছেন, অপরিচিতদের প্রতি শিরঃকম্পন কোরছেন, সকলকে অভ্যর্থনা কোরছেন। এ গোরাদের দেশে গৃহকর্ত্তার নিমন্ত্রণ-সভায় বড় উঁচু পদ নেই, তিনি সভায় উপস্থিত থাকুন বা শয়ন-গৃহে গিয়ে নিদ্রা দিন, তাতে কারো বড় কিছু এসে যায় না। আমরা ঘরে প্রবেশ করলেম, গ্যাসের আলোয় ঘর আলোকাকীর্ণ, কিন্তু শত শত রমণীদের রূপের আলোকে সে গ্যাসের আলো ম্রিয়মান হোয়ে পোড়ছে, চার দিক উজ্জ্বল, হাস্যময়; রূপের উৎসব পোড়ে গিয়েছে, ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবা মাত্রেই চোকে ধাঁধা লেগে যায়। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা বাঁশি বাজছে, ঘরের চারিধারে কৌচ, চৌকি সাজানো রয়েছে। ইতস্ততঃ দেয়ালের আয়নার ওপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পোড়ে ঝক্মক্ কোরছে। নাচবার ঘরের মেজে কাঠের, তার ওপর কার্পেট প্রভৃতি কিছু পাতা নেই, সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে পা পিছ্লে যায়; এখানে ঘর যত পিছল হয় ততই নাচবার উপযুক্ত হয়, কেননা পিছল ঘরে

নাচের গতি খুব সহজ ও সুন্দর হয়, পা কোথাও বাধা পায় না, আর আপনা আপনি পিছলে আসে। ঘরের চার দিকে আশে পাশে যে সকল বারন্দার মত আছে, তাই একটু ঢেকে ঢুকে, গাছ পালা দিয়ে, দুই একটি কৌচ চৌকী রেখে Lover's bower (প্রণয়ীদের কুঞ্জ) নামে অভিহিত করা হোয়েছে। সেই খানে, নাচে শ্রান্ত হোয়ে বা কোলাহলে বিরক্ত হোয়ে দুই একটী যুবতী নিরিবিলি মধুরালাপে মগ্ন থাকতে পারেন। ঘরে ঢোকবার সময় সকলের হাতে সোনার অক্ষরে ছাপা এক এক খানি কাগজ দেওয়া হয়, সেই কাগজে কি কি নাচ হবে তাই লেখা থাকে। ইংরাজি নাচ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,এক রকম হচ্চে স্ত্রী পুরুষে মিলে ঘুরে ঘুরে নাচা, তাতে কেবল দুজন লোক এক সঙ্গে নাচে; আর একরকম হোচ্চে চারটি জুড়ি নর্ত্তক নর্ত্তকী সুমুখা-সুমুখী দাঁড়ায় ও হাত-ধরাধরি নানা ভঙ্গীতে চলা ফিরা কোরে বেড়ায়, কোন কোন সময় চার জুড়ী না হোয়ে আট জুড়িও হয়। ঘুরে ঘুরে নাচাকে Round dance বলে ও চলা-ফেরা কোরে বেড়ানোর নাম Square dance—নাচ আরম্ভ হবার পূর্ব্বে গৃহকর্ত্রী মহিলা ও পুরুষদের মধ্যে আলাপ কোরে দেন। অর্থাৎ পুরুষ-অভ্যাগতকে সঙ্গে কোরে কোন এক অভ্যাগত-মহিলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন "মিস্ অমুক! ইনি হোচ্চেন মিষ্টার অমুক।" অমনি মিস্ ও মিষ্টার পরস্পর পরস্পরকে শিরঃকম্পন করেন। কোন মিসের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তুমি যদি তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে ইচ্ছে কর, তা হলে পকেট্ থেকে সেই সোনার অক্ষরে ছাপানো Programmeটি বের কোরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো "আপনি কি অমুক নৃত্যে বাকদত্তা হয়ে আছেন?' অর্থাৎ আর কেউ কি আগে থাকতে আপনার সঙ্গে অমুক নাচের বন্দোবস্ত কোরে গেছেন?' তিনি যদি 'না' বলেন তাহলে তাঁকে বোলো 'তা" হোলে আমি কি আপনার সঙ্গে নাচ্‌বার সুখভোগ করতে পারি?" তিনি তোমাকে Thank you বোল্‌লে তুমি বুঝলে যে তোমার কপালে তাঁর সঙ্গে নাচ্‌বার সুখ আছে। অমনি সেই কাগজটীতে সেই নাচের পাশে তাঁর নাম লিখে রেখো। এবং তাঁর কাগজে তোমার নাম লিখে দিও। কাগজটা এই রকম,

PROGRAMME (নাচের নাম)	ENGAGEMENTS যাদের সঙ্গে নাচবার বন্দোবস্ত হল তাদের নাম।
I Lancers	
II Valse	Miss Gordon
III Quadrille	
IV Galop	Mrs Egincourt
V Polka	
ইত্যাদি।	ইত্যাদি।

এক পাশে নৃত্যের নাম, অপর এক পাশে নর্ত্তক বা নর্ত্তকীর নাম। নাচের বাজ্‌না বেজে উঠল। অমনি শত শত যুগলমূর্ত্তী হাত ধরাধরি কোরে নাট্য-গৃহে নাচের জন্যে প্রস্তুত হোয়ে দাঁড়ালেন। নাচ আরম্ভ হোল। ঘুর্—ঘুর্—ঘুর্। একটা ঘরে মনে কর, চল্লিশ পঞ্চাশ যুড়ি নাচ্‌চে, ঘেঁসাঘেসি ঠেলাঠেলি, এ-ওর ঘাড়ে

পোড়ছে, এ-ওর গাউন মাড়িয়ে দিচ্চে, ঘুড়িতে ঘুড়িতে ধাক্কা-ধাক্কি, কিন্তু তবু ঘুর্—ঘুর্—ঘুর্। মনে হয় যেন আহ্লাদে পাগল হোয়ে সবাই মিলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে; তালে তালে বাজনা বাজ্‌চে, তালে তালে পা পোড়্‌চে, ঘর গরম হয়ে উঠেছে, আর সে যে কি একটা উত্তেজনার তরঙ্গ উঠেছে, সে কি বলব! কোন নর্ত্তক-যুগলের দুজনের দুজনকেই হয়ত খুব ভাল লেগেছে, তাদের দুজনের ঠোঁটে হাসি একেবারে ফেটে পোড়্‌ছে। কোন যুবতীর ভাগ্যে এক রুক্ষ কুরূপ নর্ত্তক জুটেছে, তার মুখে আর হাসি নেই, সে অতি আড়ষ্ট ভাবে যন্ত্রের মত নাচ্‌চে। কোন সেডি partner (সহ-নর্ত্তক) পান নি, তিনি দেয়ালের কোণে দাঁড়িয়ে সদ্বেষ-নয়নে হাসিমুখ ঘূর্ণমান নর্ত্তক-যুগলকে নিরীক্ষণ কোর্‌চেন, আর বিফলে প্রফুল্লতার ভাণ কোরতে চেষ্টা কোর্‌চেন। একটা নাচ শেষ হোল, বাজনা থেমে গেল; নর্ত্তক মহাশয় তাঁর আস্ত সহচরীকে আহারের ঘরে নিয়ে গেলেন, সেখানে টেবিলের উপর ফল মূল মিষ্টান্ন মদিরার আয়োজন; হয়ত আহার পান কোর্‌লেন, না হয় দুজনে নিভৃত কুঞ্জে বোসে রহস্যালাপ কোরতে লাগলেন. আমি নতুন লোকের সঙ্গে বড় মিলে মিশে নিতে পারিনে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত, সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচ্‌তে পারিনে, প্রতিপদে ভুল হয়, লোকের গাউন মাড়িয়ে দিই, প্রতি লোককে ধাক্কা দিই, বেতালে পা ফেলি, কখনো বা অসাবধানে আমার সহনর্ত্তকীর পাও মাড়িয়ে দিই, আর এই রকম নানা প্রকার গলদ্ কোরে অবশেষে নাচের মাঝখানে থেমে পড়ি ও আমার সহচরীর কাছ থেকে মার্জ্জনা ভিক্ষা কোরে সে দিক থেকে আস্তে আস্তে পিট্টান দিই! সত্যি কথা বোল্‌তে কি, আমার নাচের নেমন্তন্ন-গুলো বড় ভাল লাগে না। অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে ওরকম পাগলের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আমার আদবে ভাল লাগে না। যাদের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ আছে, তাদের সঙ্গে নাচ্‌তে আমার মন্দ লাগে না। miss অমুকের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ ছিল, আর তাঁকে বেশ দেখ্‌তে, তাঁর সঙ্গে আমি gallop নেচেছিলেম, তাই ভনো তাতে আমার কিছু ভুল হয় নি। কিন্তু miss অমুকের সঙ্গে আমি Lancers নেচেছিলেম তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, আর তাঁকে অতি বিশ্রী দেখ্‌তে, তাঁর চোক দুটো বের করা, তাঁর গাল দুটো মোটা, দাড়ির দিকটা অত্যন্ত ছোট, সব চেয়ে তাঁর স্বভাব খিটমিটে। তাঁর সঙ্গে নাচ্‌তে গিয়ে যত প্রকার দোষ হওয়া সম্ভব, তা ঘোটেছিল। যেমন তাস খেল্‌বার সময়ে খারাপ partner পেলে তার পরে তার দলের লোক চোটে যায়, তেমনি নাচের সময় খারাপ partner পেলে মেয়েরা ভারি চোটে যায়। তিনি বোধ হয় নাচ্‌বার সময় মনে মনে আমার মরণ কামনা কোরে ছিলেন; নাচ ফুরিয়ে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেম, তিনিও নিস্তার পেলেন।

আমি একবার একটি সুন্দরী partner পেয়েছিলেম, তাঁর সঙ্গে না নাচ্‌তে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা কোরেছিলেম, কিন্তু গৃহ-কর্ত্রী আমাকে বিশেষ কোরে নাচ্‌তে অনুরোধ কোর্‌লে, পীড়াপীড়ির পর নাট্যশালায় অবতরণ কোরলেম, কোন মতে নাচ্‌টা সমাপন কোরে দে ছুট্! প্রথমে নাচের ঘরে ঢুকেই আমি একেবারে চোম্‌কে উঠেছিলেম; দেখি যে শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে আমাদের একটী ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছেন। দেখেই ত আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠেছিল। আমার তাকে এমন ভাল লাগল যে কি বলব! তার সঙ্গে কোন মতে আলাপ করবার জন্যে আমি ত ছট্‌ফট্ কোরে বেড়াতে লাগলেম। কত দিন মনে কর কাল মুখ দেখিনি! আর, তার মুখে আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের ভালমানুষী নম্রভাব এমন মাখানো যে কি বলব! আমি অনেক ইংরেজ মেয়েদের মুখে ভালমানুষী নরমভাব দেখেছি কিন্তু এর সঙ্গে তার কি একটা তফাৎ আছে বল্‌তে পারি নে। তার চুল বাঁধা আমাদের দেশের মত, শাদা মুখ দেখে দেখে, আর উগ্র অসঙ্কোচ সৌন্দর্য্য দেখে দেখে, আমার মনটা ভিতরে বিরক্ত হোয়ে গিয়েছিল, এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। সেই শ্বেতাঙ্গিনীদের সভায় একটি কালো মিষ্টিমুখ দেখে আমার মনটা চুম্বকের মত সেই দিকে আকৃষ্ট হোয়েছিল। আমার বোধ হয় এরকম হবার মানে আছে হাজার হোক্, ইংরেজ মেয়েরা সম্পূর্ণ আলাদা জাত, তারা আমাদের কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী আচার ব্যবহারের মর্ম্মের ভিতরে ঢুক্‌তে পারে না। আমি এতদূর ইংরিজি ভাব শিখিনি যে তাদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি পরিচিত ভাবে কথাবার্ত্তা কইতে পারি, তাদের সঙ্গে দেখা হোলে কথাবার্ত্তা কবার যে সকল বাঁধি গৎ আছে, সে-গুলি খুব ঝাড়তে পারি; আমি জিজ্ঞাসা কোরতে পারি, সম্প্রতি অপেরায় যাওয়া হয়েছিল কি না, অমুক থিয়েটরে অমুক অভিনেতার অভিনয় কেমন লাগল, আজ ভারি ভাল দিন, ইত্যাদি। এই সকল বাঁধি গতের সীমা লঙ্ঘন কোরতে সাহস হয় না, ইংরিজী মনের ভাব-গতি খুব ভাল রকম জানলে, তবে নির্ভয়ে স্বাধীন ভাবে দুই একটা কথাবার্ত্তা কওয়া যেতে পারে। ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের আপনাদের লোক, তাদের কাছে আমাদের অধিকার অনেকটা বিস্তৃত, চন্দ্রলোকের একটা মেয়ে মনে কোরে তাদের কাছে ঘেঁস্‌তে তেমন একটু ইতস্ততঃ করবার ভাব আসে না। যাহোক, দুঃখের কথা বোলব কি, যখন আমি একেবারে অত্যন্ত মুগ্ধ হোয়ে পড়েছি, তখন শোনা গেল যে সে একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে; শুনে আমার মনটা একেবারে বিগড়ে গেল, আর, তার সঙ্গে আলাপ করা গেল না, কিন্তু কালো মুখের ছাপ আমার মনে রয়ে গেল!

আজ ব্রাইটনের অনেক তপস্যার ফলে সূর্য্য উঠেছেন। এদেশে রবি যে দিন মেঘের অন্তঃপুর থেকে বের হন, সে দিন এ দেশে একটি লোকও কেউ অন্তঃপুরে

থাকে না—সে দিন লোকেরা একটু বেড়িয়ে বাঁচে, সে দিন সমুদ্রের ধারে বেড়াবার রাস্তায় লোক বিল্ বিল্ কোর্‌তে থাকে—এদেশে যদিও, "বাড়ির ভিতর" নেই, তবু এদেশের মেয়েরা যেমন অসূর্য্যম্পশ্যরূপা এমন আমাদের দেশে নয়—এদেশের সূর্য্যই যখন অনেত্রম্পশ্যরূপ তখন এ দেশের মেয়েরাও ত অসূর্য্যম্পশ্যরূপা হবেই।

সাড়ে আটটার কমে আমাদের বিছানা থেকে ওঠা হয় না, ছটার সময় বিছানায় থেকে উঠলে এ দেশের লোকেরা এত আশ্চর্য্য হয় যে, আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও তারা সে রকম আশ্চর্য্য হয় না—তার পরে উঠেই আমি রোজ ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এ দেশের লোকেরা যাকে স্নান বলে, আমি সে রকম স্নানের বিড়ম্বনা করি নে। আমি মাথায় জল ঢেলে স্নান করি; গরম জল নয়, এখানকার এই বরফের মত ঠাণ্ডা জল। মাথায় জল ঢেলে স্নান করাকে এ দেশের লোকে অসাধারণ বীরত্ব মনে করে, আমার নাম যে কেন এখনও ছাপার কাগজে উঠে যায় নি, আমি তাই ভাবচি। নটার সময় আমাদের খাবার আসে। এখানকার ৯ টা আর সেখানকার ৬ টা সমান। আমাদের আর একটি খাওয়া দেড়টার সময়, সেইটিই প্রধান খাওয়া—মধ্যাহ্ন ভোজন। প্রত্যহ——পার কর্‌চি তাতে কিছু মাত্র দ্বিধা নেই, মাঝে মাঝে ভেড়ার পদ-সেবাও কোরে থাকি, মধ্যে একবার চা রুটি প্রভৃতি আসে, তার পরে রাত আটটার সময় আর একটি সুপ্রশস্ত ভোজনের আয়োজন হয়ে থাকে, এই রকম আমাদের দিনের প্রধান কার্য্য হচ্চে খাওয়া। অন্ধকার হয়ে আস্‌চে, চারটে বাজে বোলে, চার্‌টে বাজ্‌লে পরে আলো না জ্বেলে পড়া দুষ্কর। এখানে প্রকৃত পক্ষে ৯টার সময় দিন আরম্ভ হয়, কেননা গড়ে রোজ আটটার কমে ওঠা হয় না। এখানকার লোকের ছটার সময় হয়তো দুপুর রাত্তির, এ দেশের পাঁচোরা ছাড়া আর কেউ তখন জেগে নেই, তার পরে আবার বৈকাল চারটের সময়েই এখানকার দিনের আলো নিভে যায়, তাই এখানকার দিনগুল এমন ছোট মনে হয় যে কি বল্‌ব! এখানকার দিনগুল যেন দশটার সময় আপিস্ কর্‌তে আসে, আর চারটের সময় বাড়ি ফিরে যায়। এখানে কাজ কোরে অবসর পাওয়া দূরে থাক্, কাজ কর্‌বার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যের পর আমার মনের জড়-অবস্থা হয়, এমন জড় অবস্থা হয় যে তখন আর কোন কাজ কর্‌বার শক্তি থাকে না—সুতরাং আমার এ রকম ছোট দিনের সঙ্গে কারবার করা পুষিয়ে উঠ্‌চে না—ট্যাক্-ঘড়ির ডালা খুল্‌তে খুল্‌তেই এ দেশের দিন চোলে যায়। এখানকার রাত্তির তেমনি ঘোড়ায় চোড়ে আসে, আর, পায়ে হেঁটে চলে যায়—সে আর ফুরোয় না। এখানকার দিনগুলি যে কেবল অচিরস্থায়ী তা নয়, যতক্ষণ থাকে তাই না হয় একটু ভদ্র লোকের মত থাক্; তা নয়—মুখ ভার কোরে খুঁৎখুঁৎ কর্‌তে কর্‌তেই তাঁর সমস্ত সময় চলে যায়।

মেঘ বৃষ্টি বাদল অন্ধকার শীত, এ আর এক দণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষল ধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে; এখানে এ তা নয়, এ টিপ্ টিপ্ কোরে সেই এক ঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ-পদসঞ্চারে চোল্‌চে ত চোল্‌চেই—সে কেমন একটা শিউরে ভিজে ভাব, রাস্তায় কাদা-পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজ্‌চে, কাঁচের জান্‌লার উপর টিপ্ টিপ্ কোরে জল ছিটিয়ে পড়্‌চে, কেমন একটা অন্ধকার-অন্ধকার কোরে এসেছে, আমাদের দেশে যেমন স্তরে স্তরে মেঘ করে, এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোন কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে; সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের সে কি একটা অবসন্ন মুখশ্রী দেখা যায় তা বর্ণনা করা যায় না। লোকের মুখে সময়ে সময়ে শুনতে পাই বটে যে, কাল বজ্র হয়েছিল, কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে, তাঁর মুখ থেকেই সে খবরটা পাই—এখানকার বজ্রধ্বনি শুনতে গেলে বোধ হয় Microphone ব্যবহার কোর্‌তে হয়। সূর্য্যতো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে। যদি অনেক ভাগ্যবলে সকালে উঠে সূর্য্যের মুখ দেখ্‌তে পাই, তবে তখনি আবার মনে হয়—

"এমন দিন না রবে—তা' জান"

এই অন্ধকার দেশে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গেছে, কিছু লেখা বেরোয় না, এমন কি গুছিয়ে একটা চিঠিও লিখতে পারিনে। চিঠি লেখ্‌বার বা অন্য কিছু লেখবার কথা মনে হোলেই আমার কেমন হাই উঠ্‌তে থাকে। দেশের সে সূর্য্যালোক ও জ্যোৎস্না কেমন সুখ-স্বপ্নের মত মনে পড়ে। আমাদের দেশের সেই সকাল সন্ধ্যার, ও জ্যোৎস্না রাত্রির মর্য্যাদা এ দেশে এসে বিশেষ কোরে বুঝ্‌তে পেরেছি!

দিনে দিনে শীত খুব ঘনিয়ে আস্‌চে, লোকে বল্‌চে, কাল পরশুর মধ্যে হয় ত আমরা বরফ পড়া দেখ্‌তে পাব—তাপমান যন্ত্র ৩০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছে সেই তো হচ্চে freezing Point—অল্প অল্প frost দেখা দিয়েছে। রাস্তার মাটি খুব শক্ত হয়ে গিয়েছে, কেননা তার মধ্যে যা জল ছিল সমস্ত জমাট্ হয়ে গিয়েছে, রাস্তার মাঝে মাঝে কাচের টুক্‌রোর মত শিশির খুব শক্ত হয়ে জোমে গিয়েছে, দুই এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে কে যেন চুন ছড়িয়ে দিয়েছে, বরফের এই প্রথম সূত্রপাত দেখ্‌চি। খুবই শীত পড়েছে এক এক সময়ে হাত পা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যায় যে জ্বালা কর্‌তে থাকে। সকালে লেপ থেকে বেরোতে যত ভাবনা হয়, সহমরণে যেতে হলেও আমার তত ভাবনা হয় না। কিন্তু আমার বীরত্বের কাহিনী শুন্‌লে হয়তো তুমি অবাক্ হয়ে যাবে। সেই সকালে উঠেই আমি বরফের মত ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢেলে স্নান করি, মনে হয়

মাথাটা যেন খোসে পড়্‌ল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে যায়—কিন্তু তার পরেই যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাতে সমস্ত যন্ত্রণা ভুলে যেতে হয়।

আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক এক জন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক এক জন এত আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে তাদের আর হাস্‌বার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছে, তারা আমাদের দিকে এত হাঁ কোরে চেয়ে থাকে যে পেছনে গাড়ি আস্‌চে হুঁস্ নেই। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দঙ্গল ইস্কুলের ছোক্‌রা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল—আমরা তাদের সেলাম করলেম, এক এক জন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক একজন চেঁচাতে থাকে—"Jack look at the blackies!" কিন্তু আমি সে সব কিছুই গ্রাহ্য করি নি, আমার এক তিলও লজ্জা করে না।

এখানকার এক জন বাঙ্গালী একটা গান তৈরি করেছিল।

"এবার মোলে সাহেব হব,
কাল চামড়া দেখলে পরে ডার্কি(darkies) বোলে মুখ ফেরাব।"

যিনি লিখেছিলেন, তিনি মরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন কি না সন্দেহ হয়!

আমরা সে দিন House of commonsএ গিয়েছিলেম, ভারি নিরাশ হোয়েছিলেম। পার্ল্যামেণ্টের অভ্রভেদী চূড়া, প্রকাণ্ড ঘড়ি। হাঁ-করা ঘরগুলো দেখ্‌লে খুব তাক্ লেগে যায়। কিন্তু ভিতরে গেলে তেমন ভক্তি হয় না। একটা বড় ঘরে House বসে, ঘরের চারদিকে গোল গ্যালারী, তার এক দিকে দর্শকেরা বসে, আর একদিকে খবরের কাগজের Reporterরা বসে। গ্যালারীর অনেকটা থিয়েটরের dress-circleএর মত। গ্যালারীর নীচে অর্থাৎ থিয়েটরের জায়গায় stall থাকে, সেইখানে মেম্বররা বসে, তাদের জন্যে দুপাশে হুদ্দ দশখানি বেঞ্চি আছে, এক পাশের পাঁচখানি বেঞ্চিতে গবর্ণমেণ্টের দল বসে, আর এক পাশের পাঁচ খানি বেঞ্চিতে বিপক্ষ দল বসে, আর সুমুখের একটা প্ল্যাটফর্ম্মের উপর একটা কেদারা আছে, সেই খানে প্রেসিডেণ্টের মত এক জন (যাকে speaker বলে) মাথায় পরচুলা (wig) পোরে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বোসে থাকেন। যদি কেউ কখন কোন অন্যায় ব্যবহার বা কোন আইন বিরুদ্ধ কাজ করে, তাহোলে speaker উঠে তাকে বাধা দেয়। যেখেনে খবরের কাগজের reporterরা সব বসে, তার পেছনে খড়খড়ি-দেওয়া একটা গ্যালারি থাকে, সেইখানে মেয়েরা বসে, বাইরে থেকে মেয়েদের দেখা যায় না; দেখেছো পার্ল্যামেণ্টের মেয়েদের আক্র কত! আমরা যখন গেলেম, তখন O'donnel বোলে এক জন Irish member ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, Press Act-এর বিরুদ্ধে ও অন্যান্য নানা বিষয় নিয়ে তিনি আন্দোলন কোরছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে Irish member-রা houseএ অ-

তান্ত অপ্রিয়—তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হোয়ে গেল। House এর ভাবগতিক দেখে আমি ভারি আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, এমন ছেলেমানুষী সচরাচর দেখা যায় না। যখন একজন কেউ বক্তৃতা কোরচে, তখন হয়ত অনেক মেম্বর মিলে "ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' 'ইয়া' কোরে জানোয়ারের মত চীৎকার কোরে ডাকাডাকি কোরচে, হাস্‌চে, এবং যত প্রকার অসভ্যতা করবার তা কোরচে,আমাদের দেশে সভায় ইস্কুলের ছোক্‌রারাও হয়ত এমন করে না। কিন্তু তাও দেখেছি, এখানকার অন্যান্য সভায় এ রকম গোলমাল চণ্ডীপাঠ হয় না। অনেক সময়ে বক্তৃতা হোচ্চে কিন্তু মেম্বরেরা কপালের ওপর টুপী টেনে দিয়ে অকাতরে নিদ্রা যাচ্চেন; একবার দেখলেম যে ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে একটা বক্তৃতার সময় ঘরে ৯।১০ জনের বেশী মেম্বর ছিল না, অন্যান্য সবাই ঘরের বাইরে হাওয়া খেতে, বা supper খেতে গিয়েছেন। আর যেই Vote নেবার সময় হোল অমনি সবাই চারদিক থেকে এসে উপস্থিত হোলেন; সবাই প্রায় ঘর থেকে ঠিক কোরে এসেছিলেন, কোন্ দিকে Vote দেবেন; বক্তৃতা শুনে বা কোন প্রকার যুক্তি শুনে যে কারো মত স্থির হয়, তাতো বোধ হয় না। অনেক সময় Patriotism, Parti-ism-এর কাছে পরাস্ত মানে। যতদূর দেখেছি আমার ত বোধ হয় Conservative রা অত্যন্ত অন্ধ ভাবে তাদের দলের গোঁড়া। Liberal দের কতকটা reasonable বোলে মনে হয়, তারা যা ভাল বোঝে তাই করে, তাই জন্যে liberal দের আপনাদের মধ্যেও এত মতভেদ। নাক কান চোকমুখ বুজে একটা দলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে চোল্লে আর বড় একটা পরস্পরের মধ্যে মতভেদ থাকে না। যাহোক্, আমি ভাবছিলেম, এই রকম দলাদলির ছিবলেমির উপর কত কত রাজ্য দেশের শুভাশুভ নির্ভর কোরচে!

সাধের কুসুম-কলি।

(মৃত শিশু কন্যা স্মরণে)

সাধের কুসুম-কলি কেন সখি ঝরিল—
এই যে বিগত রেতে,না কহিতে না চাহিতে
আমারি চোখের পরে মুকুলিত হইল,
সহসা আবার কেন অকালে তা ঝরিল?

এই যে দেখিনু তায়, ঈষৎ বহিলে বায়
কিশোর কোমল বৃন্তে ঢোলে-ঢোলে পড়িছে
নিশির শিশির ধার—ঝলকে অঙ্গেতে তার,
চাঁদের জোছনা মেখে হেসে হেসে উঠিছে,

এই যে সে রঙ্গ দেখে, কলিটি হৃদয়ে রেখে
চুমিলাম কতবার মরমের আদরে,
পল্লবে আটকি তায়, তাড়াইনু দুষ্ট বায়,
ঝড় হেরি রেখে দিনু হৃদয়ের ভিতরে,
ভাবিলাম ঝটিকায়, বরঞ্চ তেজিব কায়,
বরঞ্চ ধূলায় আমি ধূলা সহ মিশিব,
বুকের শোণিত দিয়ে, রাখিব তাহারে জীয়ে
তবুও পাপড়ীটি তার, খসিবারে না দিব।
দারুণ সে ঝড় শেষে—মিশিল দিগন্ত দেশে,
শারদ পূর্ণিমা পুনঃ চারিদিকে ছাইল—
আকাশে তারকা রাশি, ঝলকিল হাসি হাসি,
মধুর মৃদুল বায়—মন্দ মন্দ বহিল।
আমিও নিশ্চিন্ত হোয়ে, আশার ভরসা লয়ে,
অভয়ে আঁচল পেতে কুঞ্জধারে শুইনু।
স্নেহের প্রলাপ ভরে, কল্পনার মোহ ঘোরে,
জাগ্রতে স্বপনে তারে কত ভাবে দেখিনু—
দেখিনু যেন রে হায় পূর্ণ বিকশিত-কায়,
সাধের কুসুম কলি শতদলে ফুটেছে,
রেঙ্গেছে রঙ্গিল রং কতই বেড়েছে ঢং,
হেসে হেসে প্রেমাবেশে বায়ু সনে খেলিছে,
ফুটেছে কুসুম-কলি, মাধুরিতে পড়ে ঢলি,
ধীরে ধীরে প্রজাপতি আশে পাশে ঘুরিছে।
সোহাগের মিষ্ট রবে—কূ দিয়ে উড়াই সবে,
ফূ ঘায়ে কীটের দল ঝোরে ঝোরে পড়িছে,
দেখিনু যেন রে হায় পূর্ণ বিকশিত কায়
সাধের কুসুম-কলি শতদলে ফুটেছে।
সুধীরে মলয় বয়, নিকুঞ্জ সুরভিময়,
আমারো আশার নদী শতধারে উঠেছে।
এ দিকে ওদিকে চাই, ওটিতেই চুম খাই,
ওটিতেই মাথা রাখি সন্তর্পণে সুধীরে,
ওটিকেই চোখে দেখে, ওটিকেই বুকে রেখে
ওটিকেই নেড়ে চেড়ে ছাড়ি প্রাণ শিহরে,
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম, ভাঙ্গিল মোহের ধূ।,
আচম্বিতে কুঞ্জপানে হেরে দেখি নয়নে—
বাগান আঁধার ময়—ঝড়গ্রস্ত সমুদয়,
ঘন ঘন বজ্ররাশি পড়িতেছে সঘনে;
আমারি কুসুম কলি—সাধের কুসুম কলি
কইরে নিশানা তার কিছুই না রয়েছে,
সেই কুঞ্জ, সেই বন, এই সেই তরুগণ,
আমারি কপালে শুধু কলিকাটি ঝরেছে।
সখি ওলো দুঃখিনীর সব সাধ ভাঙ্গিল,
সাধের কুসুম-কলি অকালেতে ঝরিল।

সেই যে লো সুকুমার অস্ফুটো মূরতি তার,
সেই তার পাপড়ি গুলি মনে জেগে উঠিছে।
এখনো ভাসিছে মনে লীলাময় বায়ু সনে
কেমন সে হেসে-হেসে ঢুলে ঢুলে পড়িছে,
এখনো পড়িছে মনে, সঙ্গোপনে সন্তর্পণে
রাখিলে সাধের ফুল হৃদয়ের মাঝারে
কি যে হোত সুখোদয়, মরম জোছনাময়,
স্বর্গ মর্ত্য রুদ্ধ যেন একটী সে আধারে।
আদরে উচ্ছ্বাস-ভরে, বিহ্বল কল্পনা ঘোরে
এই তারে চুম খাই—পুনঃ তারে দেখি যে।
নাহি তৃপ্তি দেখিয়াই পুনঃ তারে "চুমি" খাই
পুনঃ তারে টেনে টেনে হৃদয়েতে রাখি যে,
সখি লো ভাবিতে তারে ভাবনা ফুরায় না,
ঝরিল কুসুম যদি—স্মৃতি কেন যায় না।

বঙ্গ-সাহিত্য।

(মহাভারতীয় কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম)

আমরা ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের জীবনী বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি। তাহার মধ্যে অনেক কথাই সাধারণে জানিতেন, সুতরাং সেই সকল চর্ব্বিত চর্ব্বন কতক অংশে বিরক্তিকর হইলেও হইতে পারে—কিন্তু যখন আমাদের উদ্দেশ্যই এই যে মহাভারতের সমগ্র কৃষ্ণকে তাঁহার স্বীয় পূর্ণ মহিমায় প্রকটিত করি; অপর সাধারণের চক্ষে কৃষ্ণের, কৃষ্ণত্ব স্পষ্টাক্ষরে জাজ্বল্যমান করি; যমুনা-পুলিন-বিহারী রাধিকা-মনোরঞ্জন কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথী ও আর্য্যরাজকুলপতি কৃষ্ণ হইতে কতদূর প্রভিন্ন তাহা দেখাই, তখন পাঠকদের বিরক্তি-ভাজন হইবার আশঙ্কা-সত্বেও আমাদিগকে তাঁহার মহাভারতীয় কীর্ত্তি-কলাপ বাহুল্য রূপে বর্ণনা করিতেই হয়। আমরা তাহা করিয়াছি—এখন দেখিতে হইবে যে মহাভারতের কৃষ্ণ কিরূপে পরব্রহ্মের নামান্তর মাত্র হইয়া উঠিলেন, কি রূপে পাণ্ডব-সখা ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকের ইষ্টদেবতা হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মের স্থলাভিষিক্ত হইলেন।

একথা বলাই বোধ হয় বাহুল্য যে ভালবাসার ন্যায় দেবভক্তিও মানব হৃদয়ের একটি অপরিহার্য্য কোমল বৃত্তি। লোক-সমাজে না থাকিলে আমাদের মনে দয়া দাক্ষিণ্য—প্রমোদ লালসা ও গৌরব আকাঙ্ক্ষা উত্তেজিত হইতে কখনই পারে না, কিন্তু আমরা যে অবস্থায় যেখানেই থাকি না কেন,—হেমগিরির সমুচ্চ শিখরেই বিহার করি অথবা বিপদ-সাগরে ছিন্ন তৃণের মত বিক্ষিপ্ত হই, সমাজ-কোলাহলের অভ্যন্তরেই অবরুদ্ধ থাকি, অথবা বিজন প্রান্তরে মুক্তভাবে বিচরণ করি, দেব-ভক্তি ও পার্থিব প্রেম আমাদের হৃদয়ের চিরঅনুগামী। সহসা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে জনশূন্য বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে থাকিয়া মানুষ কিরূপে প্রেমের প্রভাব বুঝিতে পারিবে? —কি রূপে প্রেমের পদার্থ অবর্ত্তমানে, মানুষে সে প্রেম বাহিরে নিয়োজিত করিবে? তাহারা বলিবে যে, বিষয়ের অভাবে প্রবৃত্তিরও লোপ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু সে কথা অমূলক। কারণ, ইতিহাস কাব্য নাটকে ইহা দেদীপ্যমান দেখাইয়া দিয়াছে যে মনের অন্য কোমল বৃত্তির মত পার্থিব প্রেম, বিষয়

সাপেক্ষ নহে। কেহ যদি আজন্ম হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরে একাকী বাস করিয়া আইসে তাহা হইলেও যৌবনের প্রভাবে তাহার হৃদয়ে প্রেমের উদ্রেক হইতেই হইবে—প্রেমের পদার্থ বিহীনে তাহার মনে এক প্রকার অস্পষ্ট অস্ফুট প্রেম-লালসার স্বপ্ন আভাসময় কি এক রকম তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইতে থাকিবে—মনের মানুষ পাইলেই তাহাতেই তাহা সংযোজিত হইবে, না পাইলে কোন পশুপক্ষীর উপরও তাহা পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ হইবে। এমন কি, আমরা গৃহস্থ আশ্রমেও দেখিয়াছি যে সুকুমারমতি বালিকারা আজন্ম-নিহিত ভালবাসার উচ্ছ্বাস আবদ্ধ না রাখিতে পারিয়া কাঠের পুত্তল পুত্তলিকার প্রতি সমস্ত হৃদয় অর্পণ করে। পরে যৌবনে সেই স্নেহ, সেই ভালবাসা তাহারা একত্রীভূত করিয়া স্বামীর প্রতি সংযোজিত করে। দেব-ভক্তিও সেইরূপ। আদিম কালে নিঃসহায় নিরাশ্রয় দুর্ব্বল মানবজাতির স্বভাব-নিহিত দেবভক্তি আপন হৃদয়ে অবরুদ্ধ রাখিতে না পারিয়া, অথচ অন্ধজ্ঞানে দেব-ভক্তির প্রকৃত পদার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সামান্য তরুলতা পর্য্যন্ত পূজা করিতে ত্রুটি করে না। পরিশেষে, যখন দিব্যজ্ঞান সহকারে তাহারা পূর্ণব্রহ্মের আভাস পাইতে থাকে, তখন সেই ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্ত ভক্তি-রশ্মি তাহারা এক পরব্রহ্মতে কেন্দ্রীভূত করে। আদিম জ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অকিঞ্চিৎকর তরুলতার উপাসনা ত্যাগ করিয়া মহত্তর পদার্থে সেই ভক্তি সংযোজিত করে—ক্রমে অসাধারণ গুণশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি তাহা প্রযুক্ত করিতে আপনা-আপনি শিক্ষা লাভ করে। এই রূপেই মনুষ্যজাতি আবার মনুষ্যকে পূজা করিতে আরম্ভ করে। যে সময়ে মহাভারতের কৃষ্ণ আর্য্যাবর্ত্তে অবতীর্ণ হয়েন, সে সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের প্রকৃত অবস্থা কি? আর্য্যজাতি তখন পূর্ব্বদিকে বঙ্গসাগর হইতে পশ্চিম দিকে মালাবার পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের দক্ষিণ হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিজয়ী ভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল—এমন কি, সিংহলরাজ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের করপ্রদ ছিল। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য কুশল ও শান্তিময় ছিল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা পরস্পরের সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিয়া ও মহত্তর নৃপতিরা পরস্পরের সহিত সমরানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া এবং ক্ষুদ্রে ও মহতে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত ভারত রাজ্যকে বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল। আদিম জাতি পরাজিত হইলেও আর্য্যেরা আপনাআপনি কখন ঈর্ষা প্রযুক্ত, কখন লোভপরবশ হইয়া, কখন সামান্য ছল ধরিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। শিল্প কার্য্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রণ-কৌশলের উন্নতি হইতে লাগিল,—এবং সামাজিক ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক বৈরিতাও প্রবল হইতে লাগিল। এ দিকে আবার ধর্ম্মের মহা বিপ্লব উপস্থিত। মহাভারত যে সময়েই রচিত হউক্ না কেন,—ইহা

বোধ হয় নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে যে, সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মরূপ ভাবী মহাবন্যার প্রথম তরঙ্গ ভারতবর্ষে উটাহত হইতে ছিল। অধুনাতন ঐতিহাসিক লেখকেরা মহাভারতের রচনা যীশু-খীষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে অনুমান করেন,—তাহা হইলে মহাভারত বুদ্ধদেব জন্মাইবার পরে অবশ্যই হইবে, কেন না শাক্যসিংহ যিশুখ্রীষ্ট জন্মাইবার ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাভারত যে সময়েই রচিত হউক না কেন,—তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম-সম্পর্কে এত উল্লেখ, এত কটাক্ষ, এত প্রাসঙ্গিক বিতণ্ডা আছে যে, সে সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের যে প্রথম হিল্লোল প্রবাহিত হইতেছিল, সে বিষয়ে আর কিছুই সংশয় হইতে পারে না। এই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম হিল্লোলে দার্শনিকদের নিরীশ্বরবাদ ও সেশ্বরবাদকে ভাগরূক করিয়া ফেলিল,—এক দিকে প্রকৃতি ও পুরুষ—কামনা-বিশিষ্ট ঈশ্বর, ঈশ্বরই নহে—অথবা সকলই ব্রহ্মের ছায়ামাত্র, অপর দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর দেববৈরিতা আসিয়া হুলস্থূল বাধাইতে লাগিল। দর্শনে দর্শনে যেমন ঘরোয়া-বিবাদ ও মর্ম্মান্তিক সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল, সেই রূপ সমগ্র দর্শনের বিরুদ্ধে শাক্য সিংহের সর্ব্ব-উচ্ছেদকারী মত ও বিশ্বাস মস্তকোত্তোলন করিয়া উঠিল। এই রূপে রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত হইয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত একটি বৈষম্য-তরঙ্গ-সমাকীর্ণ মহাসমুদ্রের মত তরঙ্গিত হইতে লাগিল। সেই তরঙ্গের প্রবল উচ্ছ্বাসে ইন্দ্র, ব্রহ্ম, মহাদেব আদি দেবতারা যে কোথায় ভাসিয়া গেলেন তাহার ঠিকানা পাওয়াই গেল না। আর্য্যাবর্ত্তে রাজনৈতিক স্থিরতা রহিল না, আর্য্যাবর্ত্তে ধর্ম্মের স্থিরতা রহিল না। এই রূপ ধর্ম্মবিপ্লবে আর্য্য-হৃদয় ক্ষুব্ধ সমুদ্রে কর্ণহীন তরীর মত আহত প্রতিহত হইয়া রাজনৈতিক বিপ্লবকে অধিকতর প্রবল করিয়া তুলিল। এই সময়ে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন। সেই ক্ষুব্ধ সাগরে তিনি পর্ব্বতের মত উত্থিত হইয়া তরঙ্গের কোলাহল দেখিলেন ও ভাবিলেন যে এই বিবিধ প্রতিদ্বন্দ্বী তরঙ্গ সমূহ প্রশান্ত না হইলে আর্য্যাবর্ত্তের আর সম্পদ নাই। এই ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি স্থির করিলেন যে সমস্ত আর্য্য সাম্রাজ্য এক-ছত্র-ভুক্ত করিলেই রাজনৈতিক বিপ্লব শমিত হইবে, এবং স্ব স্ব বিদ্রোহী দর্শন সমূহের সামঞ্জস্য করিলেই ধর্ম্মবিপ্লব শান্ত হইবে। প্রথম উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক, অথচ সকল দিক বাঁচাইয়া কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে সেই যুদ্ধের পরিণামস্বরূপ একা যুধিষ্ঠিরই সমস্ত ভারতরাজ্যকে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রভাবে এক রজ্জুতে গ্রথিত করিতে পারিবেন। অপর দিকে তিনি ভগবদ্গীতা প্রচার করিয়া নিরীশ্বর ও সেশ্বর দর্শনদিগকে এক সেশ্বর-সূত্রেতে গ্রথিত করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে এই সকল বিচ্ছিন্ন ও প্রতিভিন্ন মত ও বিশ্বাসকে যুক্তিময় এক সেশ্বরবাদিত্বে পরিণত করিলেই

তিনি ধর্ম্মবিপ্লবের ঝঞ্ঝা কিয়ৎ পরিমাণে নিরস্ত করিতে পারিবেন *।

স্বীয় বুদ্ধিবলে, স্বীয় কৌশল-চক্রে, স্বীয় পরিণাম-দর্শিতার অমোঘ প্রভাবে তিনি উভয় উদ্দেশ্যই সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। এক দিকে আর্য্যাবর্ত্তের কেন্দ্র-ভূমিতে যেমন যুধিষ্ঠিরের এক ছত্র প্রতিষ্ঠিত হইল, অপর দিকে বৈষম্যময় দর্শনের সামঞ্জস্যকারী ভগবদ্গীতাও সেই রূপ বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। কিন্তু ভগবদ্গীতার সার তত্ত্ব চারিদিকে প্রচারিত হইলেই বা কি হইবে? দর্শন সমূহের সামঞ্জস্য সম্পাদিত হইলেও, বৌদ্ধধর্ম্মের অরাতি-প্রভাব কি রূপে বিনষ্ট হইবে? ভগবদ্গীতা দ্বারা যাহা সমর্থিত হইল, বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবল স্রোতে তাহা উন্মূলিত হওয়াতে আর্য্য-হৃদয়ে কেবল স্তরে স্তরে মরু ভূমি সৃষ্ট হইতে লাগিল। আদিম দেবতারা মহাভারতের সাময়িক ধর্ম্মবিপ্লবে ও অন্তর্হিত হইয়াছিল, তার পরে বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন সমূহের সংঘর্ষণ, তাহার পরিণাম স্বরূপ একটা নাস্তিকতার অবতারণা। তাহার পরে ভগবদ্গীতা ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষণ, তাহার ফল স্বরূপ আর্য্য হৃদয়ে একটা কণ্টকর, অন্ধকারময় শূন্যভাব। এই দিগন্তব্যাপী শূন্য ভাবে ক্রমে ক্রমে যখন আর্য্য হৃদয় শিথিল, অবসন্ন, মৃতকল্প হইয়া আসিতেছিল, সেই সময়েই শ্রীমদ্ভাগবতকার জন্ম গ্রহণ করিলেন। তিনি ধর্ম্মের এই সাংঘাতিক অবস্থার শিরে শিরে প্রবেশ করিয়া নূতন এক দেবতার সৃজনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি কৃষ্ণকেই বিষ্ণুর এক অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। তিনি জানিতেন যে মহাভারত তখনও পর্য্যন্ত পরম্পরা ক্রমে সকলের মনেই জাগরূক রহিয়াছে—তিনি জানিতেন যে মহাভারতীয় বীর পুরুষেরাই তখনও পর্য্যন্ত সকলের মনে আরাধ্য হইয়া রহিয়াছেন, তিনি জানিতেন যে কৃষ্ণই সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর পদবীতে সমারূঢ় হইয়া মহাভারতীয় মহিমার শিখর দেশে বিরাজ করিতেছেন—তিনি জানিতেন যে মহাভারত পর্য্যন্ত তাঁহাতেই দেবত্বের আভাস দান করিয়াছে, সুতরাং তিনিও সেই কৃষ্ণের দেবত্ব-আভাস লইয়া আর্য্য-হৃদয়রূপ মরুভূমিতে একটি মৃতসঞ্জীবন লীলাময় সুন্দর নদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতকারের গূঢ়-উদ্দেশ্য সমালোচনা করিতে করিতে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। মহাভারতের প্রকৃত নায়ককে দেবত্ব পদে অভিষিক্ত করাতে তাঁহার মনোবিজ্ঞানবিদ্যার বিশেষ পরিচয়

* কেহ কেহ বলেন বটে যে ভগবদ্গীতা বহুকাল পরে মহাভারতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা বিশেষ প্রমাণ না পাইলে সে মত গ্রাহ্য করিতে পারি না। শুদ্ধ এক লেখার তারতম্য দ্বারা কিছুই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। আর ওয়েবর ও ল্যাসন প্রভৃতি যাঁরা ভগবদ্গীতাকে বাইবেল হইতে গৃহীত বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন, তাঁদের অগ্রে এইটিই প্রদর্শন করা উচিত যে ভগবদ্গীতা হইতে বাইবেল গৃহীত কি না।

দিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে অর্জ্জুনই মহাভারতের প্রকৃত নায়ক। আমরা সে কথা স্বীকার করি না, যদিও আমরা স্বীকার করি যে বেদব্যাস অর্জ্জুনকে বীরত্ব বিষয়ে যতদূর শ্রেষ্ঠতা প্রদান করা সম্ভব তাহা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাহার শৌর্য্যে অর্জ্জুনের শৌর্য্য?—কাহার বলে অর্জ্জুন বলীয়ান? যে অর্জ্জুন একা বিরাটপর্ব্বে তরঙ্গ-সমাকুল কৌরব-সাগর মন্থন করিয়া নিজ বীরত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন কর্ণ আদি মহাশূরদিগকে ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন, যে অর্জ্জুন দিগ্বিজয় করিতে গিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে আপন অমোঘ শক্তির কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন, কেনই বা তিনি কৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর স্বীয় গাণ্ডীব ধনু পর্য্যন্ত তুলিতে অক্ষম হইয়াছিলেন? কেনই বা কৃষ্ণের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা রমণীকুলকে তাঁহার সমক্ষেই ইতর দস্যুরা পর্য্যন্ত অপমান করিতে সক্ষম হইয়াছিল? ইহাতে কি স্পষ্টই বোধ হয় না যে বেদব্যাস অর্জ্জুন অপেক্ষা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য অধিকতর রূপে কীর্ত্তিত করিতে লালায়িত ছিলেন। মহাভারতে ভারত-কবি চারি জনকে বিশেষ চাকচিক্যে সমুজ্জ্বলিত করিয়াছেন। প্রথমে ভীষ্ম। কিন্তু ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশীয় সূর্য্যের মত কুরুপাণ্ডব-সমরে তাঁহাকে উদিত করিয়াই অচিরাৎ অস্তমিত করিলেন। দ্বিতীয় কর্ণ। কিন্তু কর্ণ কুরুপাণ্ডব-সমরে দাবানলের মত প্রজ্বলিত হইয়াই কৃষ্ণের কৌশলে অবিলম্বেই নির্ব্বাপিত হইলেন। তৃতীয়তঃ অর্জ্জুন। তিনি ভীষণ ধূমকেতুর মত অরাতি-অনিষ্টকারী হইলেও, কৃষ্ণ রূপ সূর্য্যের তেজেই তিনি তেজীয়ান হইয়াছিলেন। সুতরাং আপনার বলে বলী, আপনার তেজে তেজীয়ান, আপনার বুদ্ধিতে কৌশলী, আপনার অপ্রতিহত প্রতাপে প্রতাপান্বিত কৃষ্ণই বেদব্যাসের কল্পনার চরম শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মহাভারতকার শুদ্ধ তাঁহাকে ঐশিকী বলে বলীয়ান করেন নাই, শুদ্ধ তাঁহাকে পাণ্ডবদিগের মন্ত্রণাদাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই—শুদ্ধ তাঁহাকে অর্জ্জুনের সারথীরূপে বর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণ স্বীয় অমোঘ বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া, স্বীয় নারায়ণী সেনাগণের উপর নির্ভর করিয়া রুক্মিণী-হরণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, স্বীয় দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের উপর নির্ভর করিয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের সময় সমবেত আর্য্য ভূপতিগণের সমক্ষে শিশুপালকে স্বহস্তে বিনাশ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। কি রাজনৈতিক ব্যাপারে, কি শৌর্য্য-বিষয়ে, বেদব্যাস কৃষ্ণকে তাঁহার কল্পনার সকল প্রকার সার রত্নে, তাঁহার কবিতার সকল প্রকার সার বর্ণে, তাঁহার উল্লাসের সকল প্রকার সার উচ্ছ্বাসে, তাঁহার কারু কার্য্যের সকল প্রকার সার চাকচিক্যে বিভূষিত করিয়াছেন। মহাভারতীয় সময়ের যাহা কিছু লোকরঞ্জন, যাহা কিছু গৌরবান্বিত, যাহা কিছু দেব-প্রতিমতা তাহার দ্বারাই

কৃষ্ণকে গরীয়ান করিয়াছেন। মিল্‌টনকৃত প্যারাডাইজ্ লষ্টের যীশুখ্রীষ্টের মত, ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রকৃত নায়কই কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণকেই শ্রীমদ্ভাগবতকারের বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইবার কারণ কি? দার্শনিক কবি শ্রীমদ্ভাগবতকার জানিতেন যে, যে দেবতা মনুষ্যের পার্থিব দুঃখ বিমোচনের জন্য যুগে যুগে অবতার রূপে সময়োচিত আকার ধারণ করিয়াছিলেন, যে দেবতা মনুষ্যের দুঃখে সুখে মমতা অনুভব করিয়া বৈকুণ্ঠের সুখ-সমৃদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, যে দেবতা শুদ্ধ সৃষ্টি করিয়াই পরিতৃপ্ত নহেন ও সংহারই যাঁহার মুখ্য সঙ্কল্প নহে, মনুষ্যের পার্থিব হৃদয়ের সহিত সেই দেবতারই অধিকতর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইবার সম্ভাবনা,—সেই দেবতাকেই তিনি আর্য্যহৃদয়ের মরুভূমির মধ্যে লীলাময় উৎসরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু কেন তাঁহাকে সহস্র গোপিকা-বিমোহনরূপে বর্ণনা করিলেন? কেন তিনি তাঁহাকে যমুনা-পুলিন-বিহারী, গোপিকার মনোরঞ্জন রূপে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পাইলেন? তিনি দেখিলেন যে আর্য্যাবর্তে আর সে বীর-শঙ্খ বাদনের সম্ভাবনা নাই, তিনি দেখিলেন যে রাজনৈতিক সম্পর্কে কুরুপাণ্ডবদের যুদ্ধের পর সকলই কুশল ও শান্তিময়, সুতরাং তিনি সময়োচিত ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষ্ণকে রাসলীলাময় গোপবালকরূপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা পাইলেন। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা-ধ্বনি, রণ-শংখের উন্মাদকারী, ও যুদ্ধের উন্মাদকারী ভীষণ ব্যোম-বিদারক শব্দের পরিবর্ত্তে তিনি সময় বুঝিয়া বিলাসের মন্দ মন্দ মধুর নিক্কনে আর্য্য হৃদয় আর্দ্র করিয়া মহাভারতের রাজনীতি-পারদর্শী ও রণ-বিশারদ কৃষ্ণের পরিবর্ত্তে লীলাময় কৃষ্ণকে আর্য্যধর্ম্ম-স্থলে আহ্বান করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ কি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তিনি মহাভারতের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপময় সেনানায়ক নহেন, তিনি আর বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সারথী নহেন, তিনি এখন "ললিতলবঙ্গলতা" সমাবৃত গোপ-নায়ক, এবং তিনি এখন গোপিনী-মনোরঞ্জন মুরলীবাদক। শ্রীমদ্ভাগবতকারেরই আশা ফলবতী হইল। তাঁহার রচনা-কৌশল ও বর্ণনা চাতুর্য্যের সহিত আর্য্য হৃদয়ের উত্তরোত্তর দুর্ব্বলতা এতদূর মিলিয়া গেল যে, ব্রজবিলাসী কৃষ্ণের প্রভাবে মহাভারতীয় কৃষ্ণ একেবারে রাহুগ্রস্ত হইলেন। ভারতবর্ষের যে খানেই এখন কৃষ্ণের পূজা হউক না কেন, তিনি আর সুদর্শন-চক্রধারী নহেন, তিনি মুরলীধারী এবং তিনি আর নারায়ণী সেনার সেনাপতি নহেন, তিনি সহস্র গোপিকার প্রাণবল্লভ। এমন কি, কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করিবামাত্রই লোকের মনে তাঁর মহাভারতীয় মহিমার কথা মনে আসে না, কেবল তাঁহার বিভ্রম বিলাসের কথাই মনে আসে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হিন্দিতে অনুবাদিত হইয়া "প্রেম-সাগর" নামে আখ্যাত হইল, এবং শিথিলমনা

বঙ্গ-রাজো বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি কবিরা সেই দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া আদি রসের তুফান তুলিতে লাগিলেন। এই সকল বিলাসময় কবিতার পরিণাম স্বরূপ, কৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে এত প্রকার অঘন্য রীতিনীতি-সম্পন্ন সম্প্রদায় উঠিতে লাগিল যে বর্ণনা করা যায় না। এখনো বঙ্গদেশের কোন কোন অংশে ও বম্বাই প্রদেশের স্থানে স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে যদৃচ্ছাচারিতা এতদূর বলবতী, যে কোন কোন সময়ে পুলীসের সাহায্য লইয়া তাহার বিষময় স্রোত অবরুদ্ধ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সময় হইতেই বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই আভাস ঈষৎ পরিমাণে বিকাশ পাইয়াছিল এবং এই জন্যই কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের গূঢ় অভিপ্রায় কেবল রূপক ব্যতীত যে আর কিছুই নহে তাহা প্রতিপন্ন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। প্রথমেই ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে রাধা কৃষ্ণের লীলা কেবল প্রকৃতি পুরুষের লীলার রূপকমাত্র। রাধিকা প্রকৃতি-রূপা ও কৃষ্ণ পুরুষ-প্রধান, মর্ত্ত্যলোকে মানবমাত্রেই ঐ প্রকৃতি ও পুরুষের সমষ্টি মাত্র, ঐ উভয়ের একতা ও এক সঙ্গে লীলাতেই মানবজন্মের সুখ দুঃখ এবং মোহমায়া। যখন প্রকৃতি হইতে পুরুষ বিচ্ছিন্ন হয়েন, তখনই নির্ব্বান মুক্তির পথ উদ্ঘাটিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতকারের উদ্দেশ্য বাস্তবিক এই রূপ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য এতদূর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, সে উদ্দেশ্য অনুভূতির বিষয়ই নহে। বিশেষতঃ সাধারণে তাঁহার রূপকের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সহজেই কুপথের পথিক হইতেছে। বঙ্গদেশে আবার জয়দেব গোস্বামী "কোমল মলয় সমীরের" হিল্লোল তুলিয়া ও ললিত লবঙ্গ লতাকে মৃদু মন্দ কাঁপাইয়া কৃষ্ণের বসন্ত-বিহার যেরূপ কৌশলসহকারে বর্ণনা করিলেন তাহাতে তিনিও বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাঁহার আদি-রসময় তরল তরঙ্গে বঙ্গদেশ আপ্লুত না হইতে হইতেই চৈতন্য-দেব নিজ বিশ্বাস ও বুদ্ধি বলে বিশেষ রূপে সে তরঙ্গের গতি রোধ করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকারের ন্যায় তিনিও কৃষ্ণের লীলা-বর্ণনা কেবল রূপকমাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ আবার জয়দেব-বর্ণিত কৃষ্ণ-লীলাকে এইরূপে ভাঙ্গিলেন যে কবিবর আমাদের জীবাত্মাকে কৃষ্ণরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,—রাধিকা, ধর্ম্মের বিমল আনন্দ, এবং গোপিকাকুল, মর্ত্ত্যের পার্থিব লালসা সমূহ।

কিন্তু রূপকের যাহাই অর্থ হউক, সাধারণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় সে সকল অর্থ গ্রহণ করে না, এবং এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিন দিন এতদূর অবনতি হইয়া আসিতেছে।

নিদ্রা, স্বপ্ন, মস্তিষ্ক ও আত্মা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

আমাদের মনের প্রকৃতিই এই যে, একটি ভাবের সংসর্গ বা সংস্রবে আর একটি ভাব পরম্পরাক্রমে উদ্বোধিত হয়। আমাদের মানসিক ভাব-প্রতিবিম্ব সকল পরস্পর এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আছে যে, উহার একটির উদয় হইলে, আর কতকগুলি ভাব-প্রতিবিম্ব তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয়। অনেক সময় আমাদের মনে এমন অনেক ভাবের উদয় হয়, যাহার সূত্র আমরা ধরিতে পারি না,কি প্রকার অনুসঙ্গ-নিয়মে তাহাদের উদয় হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বিলক্ষণ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় যে ইন্দ্রিয়োপনীত কোন বাহ্য প্রতিবিম্ব আমাদের মনে অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ভাব কিম্বা চিন্তা-শ্রেণীর প্রথম সূত্রপাত করিয়া দেয়।

আমাদের জাগ্রৎ-অবস্থায় মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়োপনীত অসংখ্য বাহ্য প্রতিবিম্ব সকল চারিদিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়—নিদ্রাবস্থাতে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যে একেবারে নিবৃত্ত হয় না, তাহা পাঠক মাত্রেই নিজ নিজ পরীক্ষায় অবগত আছেন। তবে, সে সময় যে সকল বাহ্য প্রতিবিম্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা মনে উপনীত হয়, তাহার সংখ্যা অতি অল্প। নিদ্রার সময় কখন কখন কোন সামান্য মৃদু শব্দ কর্ণে পতিত হইলে মনে হয় বুঝি কামানের আওয়াজ হইল।

এইরূপে একবার কোন সূত্রে কোন একটি মানসিক প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে উদ্বোধিত হইলেই তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য নানা প্রকার মানসিক প্রতিবিম্বের উদয় হয়। এবং ঐ সকল প্রতিবিম্বের উদয়ে জাগ্রৎকালে হৃদয়ের যে সকল ভাব হয়—স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক্ সেই সকল হৃদয়ের ভাব উত্তেজিত হয়। অতএব ঐ পর্য্যন্ত জানা যাইতেছে যে, নিদ্রাকালে স্বপ্নাবস্থায় মন ও হৃদয়ের ভাব সকল নিদ্রিত হয় না। সকল না হউক, কতকগুলি ভাব যে জাগ্রৎ-কালের ন্যায় সমানরূপে সক্রিয় ও ব্যস্ত থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ইচ্ছাও নিদ্রিত হয় না—কেবল ইচ্ছার কর্ত্তৃত্ব শক্তি তিরোহিত হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমরা যে নানা প্রকার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—তবে আমাদের ইচ্ছার আদেশ শরীর পালন করে না এই মাত্র। আমরা অনেক সময়ে স্বপ্ন দেখি যেন আমরা কোন বিপদে পতিত হইয়াছি—সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাই-বার জন্য, সেই বিপদের স্থল হইতে পলা-ইবার নিমিত্ত, আমরা আমাদিগের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলকে চালিত করিবার জন্য

কত চেষ্টা করি এবং আমাদের চেষ্টার বিফলতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া স্বপ্নাবস্থাতেই কত সময় কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। নিদ্রাবস্থায় চূড়ান্ত মস্তিষ্ক-মণ্ডলদ্বয় জাগ্রৎ থাকে, আর কেন্দ্রস্থ ও তলস্থ উপমস্তিষ্ক দ্বয় নিদ্রিত হয়, এই যে মতটি—স্বপ্ন ব্যাপারের সহিত ইহার কোন বিরোধ দেখা যায় না, প্রত্যুত স্বপ্নব্যাপার দ্বারাই উহা সপ্রমাণ হয়। তবে এই চূড়ান্ত মস্তিষ্কমণ্ডলের মধ্যেও কতক অংশ নিদ্রিত ও কতক অংশ জাগ্রৎ থাকে কি না, তাহা আর একটি সমস্যা-স্থল।

আচার্য্য ফেরিয়ার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রত্যেক উপমস্তিষ্কেরই যে স্বতন্ত্র কার্য্য শুদ্ধ তাহা নহে, প্রত্যেক উপমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশেরও আবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য আছে। যদি উপমস্তিষ্ক গুলির প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র কার্য্য থাকা সত্য হয়,—তাহা হইলে চূড়ান্ত মস্তিষ্ক মণ্ডলদ্বয়ের প্রত্যেক অংশেরও যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকিতে পারে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু আমরা অবগত আছি যে উহার অংশ সকল বেণী-বন্ধন প্রণালীর অনুরূপ পরস্পর সংজড়িত ভাবে না থাকুক, তাহারা পরস্পর অতি ঘনিষ্ট ভাবে একত্র আবদ্ধ আছে। এই জন্য সহসা অনুভব করিতে পারা যায় না যে, কি করিয়া উহার এক অংশ নিদ্রিত ও তৎসংলগ্ন অপর অংশটি জাগ্রৎ থাকিবে। বিশেষতঃ আমরা যখন আরও অবগত আছি যে, নিদ্রাবস্থায় রক্ত-রাশি মস্তিষ্কের অংশ মাত্র হইতে নহে, পরন্তু সমস্ত মস্তিষ্ক মণ্ডলার্দ্ধ হইতেই অপসৃত হইয়া যায়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, স্বপ্নের প্রকৃতিগত কোন কোন লক্ষণ দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি-যন্ত্র-গত কোন কোন অংশের ক্রিয়াও স্থগিত হয়। আমরা যাহা স্বপ্ন দেখি তাহা যে অবাস্তব ইহা স্বপ্নাবস্থায় আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারি না। যাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব তাহা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়াই আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই না। অনেক দিনকার মৃত ব্যক্তিগণ স্বপ্নাবস্থায় যখন আমাদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন আমরা অনেক সময় বিস্মিত হই না। গভীর জলের উপর দিয়া আমরা হাঁটিয়া যাই, শূন্যে উড়িয়া বেড়াই, তাহাতে অনেক সময় আশ্চর্য্য হই না। যতই কেন অসাধ্য, যতই কেন অসম্ভব ব্যাপার হোউক না—তাহাতে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে।

মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের সাধারণ মতটি এই যে, নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য স্থগিত হয় বলিয়া তাহারা অন্যান্য মানসিক ক্রিয়ার ভ্রম সংশোধন করিতে পারে না।

মন, স্বসৃষ্ট ব্যাপারের সহিত কোন বাহ্য বস্তুর তুলনা করিতে পারে না বলিয়াই সেই সকল ব্যাপারকে বাস্তব বলিয়া গ্রহণ করে। জাগ্রৎ অবস্থার ঘটনা সকল মন যেরূপ অসন্দিগ্ধ ভাবে বিশ্বাস করে—স্বপ্ন-গত ঘটনা সকলের অস্তিত্বে

তেমনি তাহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে ; যে হেতু সে সময় এই উভয়বিধ ঘটনার মধ্যে কি প্রভেদ তাহা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় থাকে না।

কিন্তু Cox নামক কোন পণ্ডিত এই রূপ আপত্তি করেন—যে "ভাল, মানিলাম, মনের মধ্যে ঐ সকল অসম্ভব ঘটনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি বলিয়াই উহাদের বাহ্য অস্তিত্বেও আমাদের বিশ্বাস জন্মে; কিন্তু যখন মৃত ব্যক্তিকে সজীব দেখি, দূরকে নিকটে দেখি—অসম্ভব অসাধ্য ব্যাপারকে অনায়াসে সম্পন্ন করি; তখন আমরা বিস্মিত হই না কেন ? "

প্রথমতঃ এরূপ স্থলে যে বিস্ময় কখনই উদয় হয় না, তাহা কি সত্য ?

স্বপ্নব্যাপার সকলেরই পরীক্ষাধীন। আমি নিজ পরীক্ষার কথা বলিতেছি—আমি কোন অসম্ভব ঘটনার স্বপ্ন দেখিয়া কখন বা বিস্মিত হইয়াছি, কখন বা বিস্মিত হইও নাই। যখন মৃত ব্যক্তিকে স্বপ্নে সজীব দেখিয়াছি—কিম্বা শূন্যে উড়িতেছি, তখন কখন বা আশ্চর্য্য হইয়াছি, কখন বা হই নাই। অধিকাংশ সময়ে যে আমরা আশ্চর্য্য হই না, তাহার কারণ এই যে, হাজার অসম্ভব ঘটনা হউক না কেন, যখন আমি মনের স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তখন অবশ্য উহা অসম্ভব নহে—উহা তো হইতেই পারে, উহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই—এই রূপ যুক্তি-পরম্পরা দ্রুতগতি মনোমধ্যে দিয়া চলিয়া যায়। জাগ্রৎ অবস্থায় যদি কোন অসম্ভব ব্যাপারের কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে উদয় হয়—আর যদি সেই কল্পনা এতদূর দৃঢ়রূপে মনকে অধিকার করে যে আমাদিগের বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত কিয়ৎ কালের জন্য তিরোহিত হয়, তাহা হইলে কিয়ৎক্ষণের জন্য সেই কল্পনা-গত ব্যাপারকে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বাস্তব বলিয়া বিশ্বাস হয়—কিন্তু যখনি আবার আমাদের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আইসে—তখনি কল্পনাগত বিষয়কে বাহ্য-পদার্থের সহিত তুলনা করিয়া সে ভ্রম দূর হইয়া যায়। স্বপ্নাবস্থায় যে আমাদের বিচার-শক্তি, তুলনা শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়—এ কথা সত্য নহে। মনের মধ্যে যে সকল প্রতিবিম্ব বিচারের মূল-উপকরণ স্বরূপ বিদ্যমান থাকে সেই উপকরণ গুলি লইয়াই তখন মন বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়—এবং সেই মূল উপকরণ গুলিকে পত্তনভূমি করিয়া যুক্তি-পরম্পরা-অনুসারে যেরূপ সিদ্ধান্তে হইতে পারে, মন সেই রূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়। বিচারের উপস্থিত মূল উপকরণ ধরিতে গেলে—সে হিসাবে বিচারের সিদ্ধান্ত অনেক সময় যুক্তিসিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আসলে সত্য নাও হইতে পারে। সে সিদ্ধান্ত যে সত্য হয় না, তাহা অনেক স্থলে বিচারের দোষে নহে পরন্তু উপস্থিত মূল উপকরণের অসম্পূর্ণতা হেতু। মন, মানসিক বিষয় গুলির সহিত বাহ্য বিষয়ের তুলনা করিতে পারে না বলিয়াই অনেক সময়ে স্বপ্নাবস্থার সিদ্ধান্ত সত্য হয় না। কিন্তু যে সকল স্থলে বাহ্য-বস্তুর সহিত

তুলনার আবশ্যক হয় না—স্বপ্নাবস্থায় সে সকল স্থলে মন অনেক সময়ে সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরূপ তো অনেক শোনা গিয়াছে যে কোন কোন গণিত-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত যে সকল সমস্যা জাগ্রতাবস্থায় সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, স্বপ্নাবস্থায় তাহার যথার্থ সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অনেক সময় আমরা স্বপ্নে বক্তৃতা করি—প্রবন্ধ লিখি; সেই সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অনেক সময় বেশ যুক্তিগর্ভ হয়। যুক্তিগর্ভ হইয়াছে বলিয়া যে শুধু আমরা স্বপ্ন দেখি তাহা নহে—জাগ্রৎ হইয়া যখন সে স্বপ্ন-গত বক্তৃতা কিম্বা প্রবন্ধ আমাদের স্মরণে আইসে, তাহাতে বাস্তবিকই কোন প্রকার যুক্তির দোষ দেখিতে পাই না।

অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, আমাদের মস্তিষ্কের তলস্থ উপমস্তিষ্ক, যাহা শরীরের গতিক্রিয়াকে নিয়মিত করে, সেই তলস্থ উপমস্তিষ্কের উপরেই নিদ্রার অধিক প্রভাব, তাহার নীচে ইন্দ্রিয়-প্রতিবিম্ব গ্রাহী উপমস্তিষ্কের উপর—তাহার নিচে বুদ্ধির যন্ত্র-স্বরূপ চূড়ান্ত মস্তিষ্ক মণ্ডলের উপর। যখন আমাদিগর মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলি নিদ্রিত হয়, কেবল এই বুদ্ধিযন্ত্রগত চূড়ান্ত মস্তিষ্কটি জাগ্রৎ থাকে—তখনই আমরা স্বপ্ন দেখি, এই স্বপ্ন ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া আমরা মন ও আত্মার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে নিরূপণ করিতে পারি। আর একটি সুবিধার বিষয় এই যে, স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করা সকলেরই আয়ত্তাধীন। আর, কি জড়বাদী কি আধ্যাত্মিক সম্প্রদায়, এ প্রকার পরীক্ষাকে কেহই অবজ্ঞা করিতে পারেন না। কারণ স্বপ্ন-ব্যাপারের অস্তিত্বকে কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এই স্বপ্নাবস্থায় মন ও আত্মার কোন্ কোন্ বৃত্তি সক্রিয় থাকে, আর কোন্ বৃত্তিই বা নিষ্ক্রিয় হয় দেখা যাউক।

সে সময় কি আমাদের অহংবোধ তিরোহিত হয়? না—স্বপ্নের সময় আমাদের অহংবোধ বিলক্ষণ থাকে। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি কখন মনে করে না যে সে অন্য ব্যক্তি। সে এরূপ স্বপ্ন দেখিতে পারে যে, সে যেন রাজা কিম্বা ভিখারী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু সে রাজাই হোক্, ভিখারীই হোক্,—বা অন্য যে কেহই হোক—সে যে, সেই আছে, তাহাতে তার কোন সন্দেহ থাকে না, সে কেবল অন্যের চরিত্র অভিনয় করিতেছে এই মাত্র।

আমাদের ইচ্ছা কি সে সময় একেবারে তিরোহিত হয়? তাহাও নহে। স্বপ্নদর্শী মন, সে সময় উপলব্ধি করিতে পারে যে, সে তার ইচ্ছাকে চালনা করিতেছে, এবং সে বিশ্বাস করে যে সে যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে তাহাই সম্পন্ন হইতেছে। তাহার ইচ্ছা-শক্তি সে সময় সম্পূর্ণ থাকে, তবে তাহার ইচ্ছার আজ্ঞা শরীর বাস্তবিক পালন করে না। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা কথা কহিতে ইচ্ছা করি, দৌড়িতে ইচ্ছা করি, কিম্বা অন্য কোন কোন প্রকার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি, স্বপ্নাবস্থাতেও আমরা ঠিক

সেইরূপ করি। তবে প্রভেদ এই যে, আমাদের শরীরের স্নায়ুযন্ত্র সে সকল ইচ্ছাকে বাস্তবিক কার্য্যে পরিণত করে না।

কল্পনা শক্তি তো জাগ্রৎ অবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থাতে আরও অধিক বলবৎ ও সক্রিয় হয়। বুদ্ধিবৃত্তি সকলও সে সময় নিষ্ক্রিয় হয় না—কারণ স্বপ্নাবস্থায় আমরা বেশ বিচার করিতে পারি। তবে যে পূর্ব্বপক্ষ সমূহকে পত্তনভূমি করিয়া আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই—সেই পূর্ব্বপক্ষগুলি ঠিক না হইতে পারে, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগের সিদ্ধান্তও অনেক সময় মিথ্যা হইয়া যায়। আমাদের অহংজ্ঞানের সমক্ষে যে কোন প্রতিবিম্ব উপস্থিত হয়, তাহাই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করি এবং সেই সকল প্রতিবিম্ব-রূপ উপকরণ লইয়া আমরা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই।

হৃদয়ের ভাব সকলও স্বপ্নাবস্থায় অন্তর্হিত হয় না। স্বপ্ন-কল্পিত ঘটনাগুলি সত্য হইলে জাগ্রৎ অবস্থায় আমাদের হৃদয়ের ভাব যেরূপ উত্তেজিত হইত, স্বপ্নাবস্থাতেও ঠিক সেইরূপ উত্তেজিত হয়। স্বপ্নকল্পিত ঘটনাগুলি আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি বলিয়াই ঐরূপ হয়। সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি কেন? না যেহেতু তাহাদিগের সত্তা আমরা মনোমধ্যে উপলব্ধি করি।

বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মন যখন কার্য্য করে—মনের এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার ক্রিয়া সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্ব প্রথমে এই সত্যটি আমাদের মনে প্রতিভাত হয় যে, মনোমধ্যে এমন কোন একটি পদার্থ আছে যাহা বাহ্য জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন—বাহ্য জগতের অনস্তিত্বে তাহার অস্তিত্ব লোপ হয় না—সে আপনার অভ্যন্তরে আর একটি নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে থাকিতে পারে।

শুদ্ধ তাহা নহে। যে পদার্থ নিদ্রার সময় বাহ্য জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাতেই আপনি অবস্থিতি করে, শরীর নিদ্রিত হইলেও যে পদার্থ নিদ্রিত হয় না—যাহার নিজ অস্তিত্ব-জ্ঞান বরাবর সমান থাকে—যাহার স্মরণ-শক্তি আছে, যাহার ইচ্ছা আছে—যাহার সুখ দুঃখের জ্ঞান আছে, সে যে জড়ীয় মস্তিষ্ক নহে—সে যে মস্তিষ্করূপ জড়পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, এই অনুমান, কি নিতান্ত অমূলক? শরীর নিদ্রার সময় মৃতবৎ হইলেও যে পদার্থটি জীবিত থাকিয়া কার্য্য করে—এই নিদ্রারূপ ক্ষণিক বিচ্ছেদের স্থলে মৃত্যু আসিয়া শরীরের সহিত যখন চির বিচ্ছেদ স্থাপন করে, তখনও কি সেই পদার্থ নূতন জীবনের উপযোগী অবয়ব নূতন শক্তি লাভ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে না?

স্বপ্ন-কল্পিত বিষয় সকলের অস্তিত্বে আমরা অসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বাস করি কেন? বুদ্ধিবৃত্তি সকলের অন্তর্ধান তাহার হেতু নহে, যেহেতু বুদ্ধিবৃত্তি সকল সম্পূর্ণ রূপে সে সময় কার্য্য করে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, স্বপ্ন-কল্পিত ছবিগুলিকে

ইন্দ্রিয়োপনীত প্রতিবিম্ব বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, এই জন্যই তাহাদিগকে বাস্তবিক বলিয়া আমাদের মনে হয়। আমরা সকল বাহ্য পদার্থই ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করি—কিম্বা মনের মধ্যেই কোন প্রতিবিম্ব উদিত হইলে উপলব্ধি করি, আমাদের সকল প্রকার বোধক্রিয়াই মানসিক। বাহ্য বস্তুকে আমরা অব্যবহিতরূপে দেখিতে পাই না—বাহা বস্তুর প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে দেখিয়া তবে আমরা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করি। অতএব মানসিক প্রতিবিম্ব-সকলের সহিতই আমাদিগের অব্যবহিত সম্বন্ধ।

কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা এই অন্তর-উৎপন্ন প্রতিবিম্ব এবং ইন্দ্রিয়োপনীত বাহ্য প্রতিবিম্ব সকলের মধ্যে কি প্রকারে প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই? বাহ্য প্রতিবিম্ব গুলিকে বাস্তব ও অন্তরোৎপন্ন প্রতিবিম্ব গুলি অবাস্তব বলিয়া কি প্রকারে চিনিতে পারি? তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর কোন অনুপস্থিত বন্ধুকে তোমার কল্পনা-চক্ষে দেখিতেছ, তাঁহার একটি ছবি তোমার মনোমধ্যে উদয় হইল—এই ছবিটি সম্পূর্ণ রূপে তোমার বন্ধুর অনুরূপ নাও হইতে পারে, এক আধ টুকু তফাৎ হইতেও পারে। তার পরে মনে কর, সেই বন্ধুকে আবার চর্ম চক্ষে তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে, তাঁহার মূর্ত্তির ইন্দ্রিয়-বাহিত আর একটি প্রতিবিম্ব, আর একটি ছবি, আবার তোমার মনোদর্পণে পতিত হইল, এই কাল্পনিক ছবি এবং এই ইন্দ্রিয়বাহিত ছবি উভয়ই তোমার মনোমধ্যেই প্রতিবিম্বিত হওয়া প্রযুক্ত উভয়কেই মানসিক প্রতিবিম্ব বলিতে হইবে। এ উভয়ই মানসিক প্রতিবিম্ব, অথচ তুমি একটিকে কাল্পনিক এবং আর একটিকে বাস্তবিক বলিয়া জানিতেছ—তাহার অর্থ এই, একটির বাহ্য অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না—আর একটি তোমার মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া তুমি জানিতে পারিতেছ।

কি প্রণালী অনুসারে এই রূপ সিদ্ধান্তে তুমি উপনীত হইলে—উহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে কি রূপে সমর্থ হইলে?

আর কিছুই নহে—তোমার ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াকে তুমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছ বলিয়াই তুমি তাহাদের প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হইতেছ। তুমি অনুভব করিতে পারিতেছ যে তোমার চক্ষু তোমার বন্ধুর মূর্ত্তি দর্শনে নিযুক্ত হইয়াছে, আর চক্ষুরিন্দ্রিয়ও তোমার এই জ্ঞানটি জন্মিয়াছে যে ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক বাহ্য বস্তুর সংবাদ আসিলে তবেই তাহা বাস্তব বলিয়া তোমার গ্রাহ্য, নচেৎ নয়। আমাদিগের জাগ্রৎ অবস্থায় এই প্রণালী অনুসারেই ইন্দ্রিয়গণ মানসিক ক্রিয়াকে সংশোধন করে এবং ইন্দ্রিয়-প্রেরিত সংবাদ অবগত হইয়াই আমরা বাস্তব ও কাল্পনিকের মধ্যে প্রভেদ নিরূপণ করিতে সমর্থ হই।

অতএব স্বপ্নাবস্থায় কাল্পনিককে কেন আমরা বাস্তবিক বলিয়া গ্রহণ করি, তাহার কারণ এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হই-

তেছে। মন জাগ্রদবস্থায় যাহার সাহায্যে অবাস্তব ও বাস্তবের প্রভেদ নিরূপণ করিতে পারে, নিদ্রাবস্থায় সেই ইন্দ্রিয়গণ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া প্রযুক্ত তাহা আর পারে না। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হয় যে, যত কিছু প্রতিবিম্ব মনে পতিত হয়, মন সকলকেই এক প্রকার বলিয়া উপলব্ধি করে—সুতরাং সকলই বাস্তব বলিয়া তাহার নিকট প্রতীয়মান হয়। অতএব যে হেতু, মনের যত কিছু প্রতিবিম্ব, গোড়ায় ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃকই আনীত, সেই জন্য যখন কোন প্রতিবিম্ব মনোমধ্যে আসিয়া উদয় হয়, তখন মন নিরূপণ করিতে পারে না যে ঐ প্রতিবিম্বটি সদ্য বাহির হইতে মনোমধ্যে প্রবেশ করিল, না পূর্ব্বে যে প্রতিবিম্ব আসিয়া অবস্থান করিতেছিল তাহা উদ্বোধিত হইল মাত্র।

এই জন্যই মন স্বপ্নাবস্থায় স্বসৃষ্ট কল্পনাগুলিকে বাস্তব বলিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারে না—এবং এই খণ্ড খণ্ড কল্পনাগুলি যখন আবার স্বপ্নে একটি নাটকাকারে সংযুক্তিত হয়, তখন মন ভাবে যে, এই নাটকবৎ স্বপ্ন-গত ঘটনাগুলি বাস্তবিক জগতে বুঝি সত্যই সংঘটিত হইতেছে!

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদের অন্তরে এমন একটি পদার্থ বিদ্যমান আছে, যাহা মস্তিষ্ক-ক্রিয়া সকলের সমালোচক ও সাক্ষী স্বরূপ, সুতরাং মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। সেই পদার্থটিই আত্মা।

সৃষ্টির আধ্যাত্মীয় জড় অংশের সহিত যোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশেই ইহলোকে আমাদের উন্নতির এই বর্ত্তমান সোপানে, আমাদের আত্মা আণবীয় জড়যন্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র।

স্বপ্ন-ব্যাপার পরীক্ষা করিয়া আরও এই একটি বিষয় আমরা জানিতে পারি যে, যে সময় শরীরের সহিত মনের যোগ শিথিল হয় সেই স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মানসিক বৃত্তি সকল নিস্তেজ হওয়া দূরে থাকুক, জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা অসংখ্যগুণে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। রচনাশক্তি কল্পনাশক্তি সে সময় অত্যন্ত প্রবল হয়। যে ব্যক্তি অত্যন্ত মূর্খ ও নির্ব্বোধ, সেও স্বপ্নাবস্থায় যেরূপ কল্পনা-শক্তির পরিচয় দেয়—জাগ্রৎ অবস্থায়—যে সময় সকল মানসিক বৃত্তিই সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তে থাকে—তখন সেরূপ পারে না। প্রত্যেক স্বপ্নই এক একটি গল্প বিশেষ। অনেক স্বপ্ন আবার নাটকের ন্যায়—তাহাতে শুদ্ধ যে একটি গল্প মাত্র থাকে তাহা নহে—বাস্তবিক জীবন-রঙ্গ-ভূমিতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতেও সেইরূপ নানা প্রকার চরিত্র অভিনীত হয়। অতএব স্বপ্নদর্শী মন শুদ্ধ যে একটি গল্পমাত্র রচনা করে তাহা নহে, তন্মধ্যস্থিত পাত্রগণের চরিত্র পর্য্যন্ত রচনা করে। যে পাত্রের মুখে যে কথা শোভা পায়, তাহার মুখে সেই কথাই বসাইয়া দেয়। স্বপ্নে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই দেখা যায় যে, মানসিক ক্রিয়ার বেগ সে সময় আশ্চর্য্যরূপ দ্রুত হয়। জড়-শরীরের জড়বৎ গতির বন্ধন হইতে মুক্ত

হইয়া স্বপ্নদর্শী মন, জাগ্রদবস্থার কাল-পরিমাণকে অনেকগুণে অতিক্রম করে। যে ঘটনা পরম্পরা বাস্তবিক জীবনে সঙ্ঘটিত হইতে অনেক দিন লাগিবার কথা, স্বপ্নাবস্থায় দুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা সংঘটিত হয়। স্বপ্নাবস্থার কাল-পরিমাণের সহিত জাগ্রদবস্থার কাল-পরিমাণের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের মানসিক শক্তি সকল জাগ্রদবস্থা-অপেক্ষা যে অনেক গুণে সতেজ হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই নিজ নিজ পরীক্ষায় অবগত আছেন। আমরা স্বপ্নে কখন কখন এমন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারি, প্রবন্ধ কিম্বা গান রচনা করিতে পারি, যাহা জাগ্রদবস্থায় বোধ হয় আমাদের সাধ্যাতীত। এরূপ স্বপ্ন-রচনার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোল্‌রিজের কুব্‌লাই খাঁ নামক কাব্য-খণ্ডাংশটি এইরূপ স্বপ্ন-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত কাব্যটি রচনা করেন; সেই স্বপ্নটি এত উজ্জ্বলরূপে তাঁর মানস-পটে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তিনি তাড়াতাড়ি একটা কলম ধরিয়া সেই দীর্ঘ কাব্যটি লিখিতে বসিলেন। এই "কুব্‌লাই খাঁ" কাব্যের যে সুন্দর অংশটি মাত্র ইংরাজি সাহিত্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহা লেখা শেষ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁর নিকট সহসা কোন বিষয়-কর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায় লেখার ব্যাঘাত হইল। বিষয়কর্ম্ম শেষ করিয়া আবার যখন লিখিতে বসিলেন তখন দেখেন যে অবশিষ্ট সমস্তই তাঁর স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে।

মিস্‌কব্‌ এইরূপ স্বপ্ন রচিত আর একটি ফরাসিস্‌ কবিতার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও অতি সুন্দর। তাহার অনুবাদ আমরা নিম্নে দিতেছি—

১

পুরাতন দুরগের প্রাকার উপরে
দাঁড়ায়ে প্রহরী প্রান্তে উত্তুঙ্গ চূড়ায়,
হাঁকিতেছে মাঝে মাঝে উচ্চ কণ্ঠ স্বরে—
'কে যায় পথিক নিচে, কে যায় কে যায়?'

২

শুনি সে উত্তর সব—আশা-ভরপুর,
উপজিল মনে মোর অনির্দ্দেশ্য ভয়,
আশা হতে নৈরাশ্য জানি নহে দূর,
দিবা পিছু রাত্রি যথা আইসে নিশ্চয়।

৩

"কে যায় কে যায়?"—
সুন্দর যুবক এক অশ্ব আরোহিয়া
ঝকমকি অসি হস্তে—উড়ায়ে পতাকা
যাইতেছে রণ-ক্ষেত্রে আনন্দিত-হিয়া,
গাইতে গাইতে পথে গৌরব-গীতিকা।

৪

"কে যায় কে যায়?"
সুন্দরী বালিকা এক, যুবার পিছনে,
সাদা অশ্ব পরে চড়ি ঘোড়-দাস-বেশে,
"চোখে চোখে রাখি দিব মোর প্রাণধনে"
বলিয়া মুচকি হাসি চলে অনিমেষে।

৫

"কে যায় কে যায়?"
শুভ্র-বেশ বৃদ্ধ এক থলি হস্তে যায়,
তার মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা ঝক্‌মক্‌ করে,

কাঁপিতে কাঁপিতে তাহা যতনে লুকায়,
বলে আর, মহাধনী হইব সত্বরে।

৬

"কে যায় কে যায় ?"
সুন্দর যুবক এক, ভগিনীরে লয়ে
ফুল তুলিবার তরে চলে মাঠ দিয়া,
"তোরে মা এসব দেব মোরা বাড়ি গিয়ে"
এই বলি দুজনায় উঠিল হাসিয়া।

৭

পুরাণ দুরগ পরে উতরিলা রাত্রি,
আবার প্রহরী সেথা উচ্চে হাঁক দায়,
দুরগের নিচে দিয়া যায় যত যাত্রী,
সবারে ডাকিয়া বলে 'কে যায় কে যায় ?'

৮

রক্ত-মাখা সেই অশ্ব তেজে গ্রীবা-বাঁকা
শূন্য-জীন টানি লয়ে চলে বীরবরে,
মুমূর্ষু সে বীর ধরে সাপটি পতাকা,
প্রাণ বায়ু বহির্গত হইবে সত্বরে।

৯

"কে যায় কে যায় ?"
সুন্দরী বালিকা সেই অশ্ব আরোহণে
যোদ্ধৃ-সেবকের বেশ পরিধান করি,
আকুল হইয়া চলে পিছনে পিছনে,
হাহাকার করে ঘোর গগন বিদরি।

১০

"কে যায় কে যায় ?"
সুবিষণ্ণ বৃদ্ধ সেই অতি শুভ্র কেশ,
শূন্য থলি লয়ে হাতে আসিতেছে ধীরে,
কাঁপিতে কাঁপিতে বলে "কি বিষম ক্লেশ !
সরবস্ব ধন মোর হরিল তস্করে।"

১১

"কে যায় কে যায় ?"
সুন্দর বালক সেই—ভগিনীটি কোলে,
ভুজঙ্গে দংশিল তারে মাঠের মাঝার,
নিরশ্রু নয়নে বালা ঘুমায় অকালে,
ফেলিতে হবে না তারে অশ্রু কভু আর !

আর একটি স্বপ্ন-দৃষ্ট ইংরাজি কবিতার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি—

১

ক্লান্ত আত্মা মোর-নাথ-চাহিছে সতত,
পশিবারে তার সেই বিশ্রামের ঘরে,
সেই দিকে মোর দৃষ্টি রয়েছে নিয়ত
পুণ্য-আত্মা সবে যথা আনন্দে বিচরে।

২

এখনো হয় নি শেষ ভবের সংগ্রাম,
বাহিরের অন্তরের ভীম শত্রুগণ
আক্রমিয়া পথমাঝে মোরে অবিরাম
দেখাইছে কত শত পাপ-প্রলোভন।

৩

হয়ে এই রণ-মাঝে দুর্ব্বল আহত,
সকাতরে ডাকি তোমা হাত যোড় করি,
রক্ষা কর রক্ষা কর ত্রিভুবন-পিতঃ
রক্ষা কর মোরে নাথ নতুবা যে মরি।

৪

হেন কালে ধীরে ধীরে মধুর বচন
ভয়-হর শান্তিপ্রদ পশে শ্রুতি-পুটে,
অবসন্ন মৃত আত্মা পাইল জীবন—
"ভয় নাই সাধুবর ঈশ্বর নিকটে।"

৫

সে বাক্য-অমৃত-পানে হয়ে বলীয়ান
আবার সেই সে পথে হয়ে অগ্রসর,

"ঊর্দ্ধ দিকে শান্তি-ধামে রাখিয়া নয়ান
চলিলাম তাহা পরে করিয়া নির্ভর।

লও নাথ, লও মোরে, ডাকি কর যোড়ে,
শান্তি-নিকেতন-দ্বার খোল আমা প্রতি,
লও নাথ সেই তব প্রেমময় ক্রোড়ে,
পাপ তাপ হতে প্রভু দাওগো নিষ্কৃতি।

ডাক্তার কার্পেণ্টারকে অনুসরণ করিয়া মিস্ কব্ বলেন—"আমাদের কার্য্য-সকল ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। Involuntary ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (যথা হৃৎস্পন্দন—পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি)—Voluntary ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং Volitional ইচ্ছা-চালিত। ইচ্ছা-সাপেক্ষ এবং ইচ্ছা চালিত এই উভয় জাতীয় কার্য্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে প্রথমোক্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছার অনুমতি অপেক্ষা করে—এবং ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগে তাহা আবার স্থগিত করা যাইতে পারে মাত্র কিন্তু তাহাতে ইচ্ছাশক্তির অবিরত উদ্যম আবশ্যক হয় না। এবং ইচ্ছা-চালিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবার জন্য ইচ্ছার অব্যবহিত অবিরত উদ্যম প্রয়োগ আবশ্যক হয়। এক্ষণে এই তিন শ্রেণীর কার্য্যের মধ্যে দেখা যাইবে, ইচ্ছা-সাপেক্ষ কার্য্যগুলি সংজ্ঞা-বহির্ভূত মস্তিষ্ক-ক্রিয়া দ্বারা সম্পাদিত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ পদচারণা ক্রিয়াকে আইস আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি। আমরা এখানে কিম্বা ওখানে মনে কর যাইতে ইচ্ছা করিতেছি—এবম্বিধ ব্যাপার-সকলে "উদ্দেশ্য-বিষয় ইচ্ছা করা, আর উদ্দেশ্য সাধনের উপায়কে ইচ্ছা করা একই কথা"—আমরা প্রতি পদক্ষেপে তো এরূপ ভাবিয়া কাজ করি না যে "এক্ষণে আমরা দক্ষিণ পদ—এক্ষণে আমরা বাম পদ অমুক স্থলে ক্ষেপণ করিব।" আমাদের মাংসপেশীর যেন কোন অপরিজ্ঞাত নেতা এই সকল খুঁটরা কাজ সকল সম্পাদন করিয়া থাকে—আমরা যখন চলিতে থাকি—তখন আমাদিগের পদদ্বয়কে এ দিকে কিম্বা ওদিকে চালাইতে হইবে—সে বিষয়ে আমরা বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে সংজ্ঞাহীন থাকি। যে পথে আমরা চলিতেছি যদি তাহা আমাদের জানা-শুনা পথ হয়—তাহা হইলে সে পথের প্রত্যেক ঘোর-ফেরে আমরা সংস্কার বশত ঠিক মোড় লই, অথচ সেই সময় সমস্ত ক্ষণ অন্য কোন বিষয়ের চিন্তাতে হয় তো আমরা ব্যাপৃত থাকি। এই রূপ পদচারণা ব্যতীত পঠন, সীবন, লিখন কোন সঙ্গীত-যন্ত্র বাদন প্রভৃতির ন্যায় অন্যান্য কার্য্যেও একবার শিক্ষা লাভ হইলে—সে সকল কার্য্যের যান্ত্রিক অংশগুলি শীঘ্রই আমরা সংজ্ঞা-সাপেক্ষ উদ্যম ব্যতীত সম্পন্ন করিতে সমর্থ হই।" ডাক্তার কার্পেণ্টর ও মিস্ কব্, সংজ্ঞা-বিহীন মস্তিষ্কক্রিয়ার এই যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রথমতঃ মস্তিষ্কক্রিয়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ-স্থল। Professor Ferrier সাহেবের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে, যে শারীরিক গতি-বিধি

তদস্থ উপমস্তিষ্কের উপর নির্ভর করে—তাহার উপর চূড়ান্ত মস্তিষ্কের অব্যবহিত আধিপত্য নাই। চূড়ান্ত-মস্তিষ্ক যন্ত্র দিয়া ইচ্ছা প্রবাহিত হইয়া ঐ উপমস্তিষ্ককে চালিত করিলে—তবে আমাদিগের শারীরিক গতিক্রিয়া সম্পাদিত হয়—প্রথম প্রথম যত দিন না অভ্যাস দ্বারা সহজ হইয়া আইসে, ততদিন যতক্ষণ কোন গতিক্রিয়া হইতে থাকে, ততক্ষণই ইচ্ছা শক্তিকে সমানরূপে তাহাতে প্রযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়—কিন্তু অভ্যাস-নিয়মে উপমস্তিষ্ক যখন কার্য্যোন্মুখ ও পুনরাবৃত্তি-প্রবণ হইয়া পড়ে, তখন ইচ্ছা উপমস্তিষ্ককে একবার চালিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়—তখন গতিক্রিয়া যন্ত্রের ন্যায় আপনা-আপনি হইতে থাকে—সেই গতিক্রিয়া বন্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে তখন আবার ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করিতে হয়—অতএব দেখা যাইতেছে পদচারণা প্রভৃতি অভ্যস্ত গতিক্রিয়া সকল প্রবর্ত্তিত করিবার সময় ও বন্ধ করিবার সময় ইচ্ছা-শক্তির সজ্ঞান উদ্যমের আবশ্যক হয়

Unconscious cerebration বাক্যটি অতি অস্পষ্ট, যে সকল দৃষ্টান্ত মিস্ কব্ দিয়াছেন তাহাতে ইহার অর্থ কখন কখন সংজ্ঞা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়া বুঝায়, আবার কখন কখন ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়া বুঝায়। সমস্ত স্বপ্ন-ব্যাপারই যে সংজ্ঞা-সাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে উহার সমস্তই ইচ্ছা-সাপেক্ষ কিনা, তাহাই বিবেচ্য। Unconscious cerebrationএর অর্থ যদি সংজ্ঞা-বহির্ভূত না হইয়া ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মস্তিষ্ক-ক্রিয়া হয়—তাহা হইলে জাগ্রদবস্থাতেও আমাদিগের মনে যত প্রকার ভাবোদয় হয়, তৎসমুদয়ই তো Unconscious cerebration এর মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

কোন কোন জড়বাদী বলেন যে, অচেতন অবস্থায় আমাদের অজ্ঞাতসারে যদি আমরা কোন মানসিক ক্রিয়ার পরিচয় পাই, যদি আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মস্তিষ্ক, মনন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সমর্থ এরূপ সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ?

আমাদের অজ্ঞাতসারে যে সকল মনন-ক্রিয়া হয় তাহার নাম ডাক্তার কার্পেণ্টর "Unconscious cerebration" অর্থাৎ "সংজ্ঞা-বহির্ভূত মস্তিষ্ক-ক্রিয়া রাখিয়াছেন। Miss Cobbe এই সংজ্ঞা-বহির্ভূত মস্তিষ্ক ক্রিয়ার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—দৃষ্টান্ত-প্রদর্শিত ক্রিয়া সকল বাস্তবিক সংজ্ঞা-বহির্ভূত কি না তাহা, প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মিস্ কব্ বলেন—"ইহাতো আমাদিগের সকলেরই সচরাচর ঘটিয়া থাকে যে, কোন একটি বিশেষ কথা, কবিতার কোন চরণ, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি—কিয়ৎকাল পরে যখন জ্ঞাতসারে কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাদিগকে খুঁজিতে আর চেষ্টা না করি, তখন তাহা হঠাৎ আমাদের স্মরণে আইসে। আমরা প্রথমে হয়তো তাহাদিগকে মনে আনি-

বার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হই কিন্তু কিছুতেই মনে আনিতে পারি না—মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করিয়াও যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হই না, তখন আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি—ক্রমে ক্রমে যখন আমাদের সমস্ত মন অন্য কোন বিষয়ে একেবারে মগ্ন হয়—তখন আমরা হঠাৎ বলিয়া উঠি "মনে প-ড়েছে—সে কথাটি কিম্বা কবিতার চরণটি এই"—এই প্রকার ঘটনা এত সচরাচর ও সর্ব্ব-জন-পরিচিত যে আমরা এই রূপ অবস্থায় প্রায় বলিয়া থাকি "যেতে দাও, ওতে যখন আর মন থাকিবে না, তখন আপনা আপনি কথাটা মনে আসিবে"।

কিন্তু এই দৃষ্টান্ত-গত মানসিক ক্রিয়া যে সম্পূর্ণ রূপে সংজ্ঞা-বহির্ভূত, তাহা এই দৃষ্টান্তে আমাদিগের মতে সপ্রমাণ হয় না। প্রথমতঃ একটা কোন কথা স্মরণ হইতেছে না বলিয়া মনে উদ্বেগ উপ-স্থিত হইলে তাহা স্মরণে শীঘ্র আইসে না। ভাবানুসঙ্গের নিয়মানুসারে আমাদিগের স্মরণ-ক্রিয়া সকল সম্পাদিত হয়। একটি কোন কথার সূত্র ধরিয়া আর একটি কোন কথা আমাদের মনে উদয় হয়, যখন আমরা কোন কথা মনে করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তখন আমাদের মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে বলিয়া যথার্থ সূত্রটি ধরিতে সমর্থ হই না—সুতরাং সে কথাটি সে সময় কিছুতেই মনে আইসে না—যখন আমরা অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করি—তখন আমাদিগের উদ্বেগ অনেকটা প্রশমিত হয়—কিন্তু অন্য বিষয়ে আমরা যতই মগ্ন হইয়া যাই না কেন, এক একবার মুহূর্ত্তের জন্যও পূর্ব্ব বিষয়ে মন ধাবিত হয়—এত অল্প কালের জন্য যে, পরে তাহা আমাদিগের আর স্ম-রণ থাকে না—পূর্ব্ব-বিষয়ে যে আবার ক্ষণ মাত্রও মন ধাবিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পরে আর মনে করিতে পারি না—আমরা মনে করি, বুঝি আমাদিগের বিনা মনোযোগেই সে কথা আমাদিগের মনে পড়িল—কিন্তু মনের ব্যস্ত অবস্থায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া চেষ্টা করিয়া যে বিস্মৃত কথার প্রকৃত সূত্রটি আমরা ধরিতে পারি নাই, মনের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমরা সে সূত্রটি ধরিতে পারি। অতএব এই মানসিক ক্রিয়া আমাদিগের সংজ্ঞা-সাপেক্ষ ভাবে না হইয়া সংজ্ঞা-বহির্ভূত ভাবে সম্পাদিত হয় কি না, তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আমাদিগের মনে যত প্রকার ব্যাপার উপস্থিত হয়, তাহা কতকটা আমা-দিগের আয়ত্তের মধ্যে এবং কতকটা আমা-দিগের আয়ত্তের বাহিরে—আমাদের অন্তরে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই বর্ত্তমান। আমা-দের মানসিক ক্রিয়া সকল কতকটা অবশ্য-ম্ভাবী নিয়মানুসারে যন্ত্রবৎ সম্পাদিত হয়—ইহাই প্রকৃতির কার্য্য এবং কতকটা আমা-দিগের ইচ্ছা দ্বারা নিয়মিত ও চালিত হয়—ইহাই পুরুষের কার্য্য। আমাদিগের মনে যত প্রকার ভাব ও চিন্তার উদয় হয়, তাহার অধিকাংশই একটি বিশেষ নিয়মানু-সারে হয়। তাহার নাম "অনুসঙ্গের নিয়ম।"

যাহা হউক যদিও ইহা সপ্রমাণ হয় যে unconscious cerebration বলিয়া কোন ব্যাপারের অস্তিত্ব আছে তাহাতেই বা কি ? তাহার সঙ্গে ইহাও তো প্রতিপন্ন হইতেছে যে আর একটি সংজ্ঞা-সাপেক্ষ, ইচ্ছা-সাপেক্ষ মস্তিষ্কক্রিয়ারও অস্তিত্ব আছে। এক দিকে যন্ত্র—আর এক দিকে যন্ত্রের নিয়ন্তা —এক দিকে প্রকৃতি—আর এক দিকে পুরুষ —এক দিকে মন—আর এক দিকে আত্মা।

কেবল "মস্তিষ্ক ক্রিয়া" দ্বারা আমাদিগের সকল আভ্যন্তরিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। ডাক্তার ফেরিয়ার মস্তিষ্ক ব্যাপারের তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "শারীরতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে মস্তিষ্কের এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে—মস্তিষ্ক কি ? না গতিকেন্দ্রসমূহ ও বোধকেন্দ্র-সমূহের জটিল যন্ত্র বিশেষ। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, মস্তিষ্কের কার্য্য ও মানসিক ক্রিয়া উভয়ই এক কথা বুঝায় এবং মানসিক ক্রিয়া সকলের আলোচনা মনস্তত্ত্বের অধিকারের মধ্যে আইসে। মানসিক ক্রিয়ার তত্ত্বানুসন্ধান-প্রণালী, শারীর তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী হইতে স্বতন্ত্র। কেবল মাত্র শারীর তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রণালী অনুসারে কোন ক্রমেই অহংজ্ঞানের ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। "মস্তিষ্ক বোধ সমূহে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়, সেই সকল পরিবর্ত্তনের অনুরূপ পরিবর্ত্তন কি করিয়া সংজ্ঞাতেও আবার উপস্থিত হয়, তাহা বুঝা সুকঠিন। যথা, নেত্রে নিপতিত আলোকের কম্পনে দৃষ্টি-বোধ রূপ সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহা সিদ্ধান্ত করা অতীব দুরূহ। কোন ইন্দ্রিয়বোধ মনোমধ্যে অনুভূত হইলে মস্তিষ্ক-কোষ মধ্যে যে সকল আণবিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—তাহা হয়তো ঠিক্ নির্ণয় করা যাইতে পারে—কিন্তু তদ্দ্বারা সেই অনুভব-ব্যাপারের আসল প্রকৃতি বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান বৃদ্ধি হয় না। উহার মধ্যে একটি—বাহ্যবিষয় সম্বন্ধীয়(objective) এবং আর একটি আভ্যন্তরিক বিষয়ী সম্বন্ধীয় (subjective)—অতএব বাহ্যবিষয়-সম্বন্ধীয় ব্যাপার-ঘটিত পরিভাষায়,আভ্যন্তরিক বিষয়ী-সম্বন্ধীয় ব্যাপার সকল ঠিক্ প্রকাশ করা যাইতে পারে না। আমরা এ কথা কখন বলিতে পারি না যে, শরীর ও মন উভয়ই এক পদার্থ কিম্বা এমনও বলিতে পারি না যে, একটি আর একটিতে বেমালুম মিশিয়া যাইতে পারে। তবে, Laycockএর ভাষায় অন্তত এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,মস্তিষ্ক ও মন উভয়ই উভয়ের অনুসঙ্গী (correlated) কিম্বা Bainএর ভাষায় বলিতে পারি যে, শারীরিক পরিবর্ত্তন ও মানসিক পরিবর্ত্তন সকল "দ্বিমুখী একতার" (double faced unity) বিষয়-সম্বন্ধীয় ও বিষয়ী-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন দিক্ মাত্র"

স্থূল কথা, আত্মা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয় বলিয়াই যে ইহা একেবারে অপরিজ্ঞেয়—জড়বাদীদিগের এই মতটি আমরা স্বীকার করিতে পারি না। আত্মপ্রত্যয়ই আত্মার

মুখ্য প্রমাণ। জড়বাদীগণ যদি সে প্রমাণ গ্রাহ্য না করেন, তবে তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য বলা যাইতে পারে, তাড়িৎ magnetism এবং উত্তাপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম পদার্থের সত্তা যে প্রকারে সপ্রমাণ হয় আত্মার অস্তিত্বও কি সেই একই প্রকারে সপ্রমাণ হয় না? তাড়িৎ প্রভৃতি পদার্থ ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য হইলেও অপরিজ্ঞেয় নহে, আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জড় জগতের উপর ঐ সকল পদার্থ যে ক্রিয়া প্রকটিত করে—তাহার দ্বারাই ঐ সকল পদার্থের সত্তা ও গুণ আমরা উপলব্ধি করি। প্রমাণের প্রণালী উভয় পক্ষেই সমান। যদি ঐ সকল সূক্ষ্ম পদার্থের পক্ষে এই প্রকার প্রমাণ গ্রাহ্য হয়, তবে অতীন্দ্রিয় আত্মার পক্ষে সেই একই প্রমাণ কেন না গ্রাহ্য হইবে। এই প্রণালী অনুসারে কতদূর প্রমাণ হইতে পারে, সে অবশ্য আলোচনার বিষয়—কিন্তু জড়বাদীরা যে বলেন, যে হেতু আত্মা ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, অতএব ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উহার অস্তিত্ব আদৌ সপ্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং উহা অপরিজ্ঞেয় ও চিরকাল অপরিজ্ঞেয় থাকিবে—উহাকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া উচিত—এই যে জড়বাদীগণের অন্ধ মত, ইহা আমরা কখনই গ্রাহ্য করিতে পারি না।

বঙ্গীয় গ্রন্থকার ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ইদানিন্তন আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বিষয়ে এত দূর শিথিলপ্রযত্ন হইয়া পড়িয়াছি যে অনেক সময়ে তজ্জন্য গ্রন্থকারদের তিরস্কার-ভাজনও হইতে হইয়াছে। কিন্তু আমাদের নিবেদন এই যে, কখন ভারতীর স্থানাভাব প্রযুক্ত কখনো আমাদের সময়াভাব প্রযুক্ত এবং কখন বা (সত্য কথা বলিতে কি,) গ্রন্থ সমূহের ঐকান্তিক হীনতা প্রযুক্ত আমরা ঐ কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে কতক অংশে কুতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু সময়ে সময়ে এমন সুন্দর পুস্তকও প্রাপ্ত হইয়াছি যে তাহার সুরভি পাঠকমণ্ডলে বিকীর্ণ করিতে উৎসাহ ও উল্লাস পর্য্যন্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ অবসর আমাদের অদৃষ্টে অতি অল্প সময়ই ঘটিয়াছে। বঙ্গসাহিত্য-উদ্যান আজ কাল নানা ফুল ফলে সুশোভিত সন্দেহ নাই। সংস্কৃত মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদ, ইংরাজি কাব্য নাটকের অনুকরণে উপন্যাস ও কাব্য, নাটক ও নাট্য-গীতি প্রভৃতি দেশী বিলাতী সগুণ নির্গুণ নানা প্রকার "ইত্যাদিতে" চারিদিক সমাকীর্ণ। গ্রন্থকার হইবার উগ্র লালসায় কেহ পৈতৃক বিভব বিনষ্ট করিতেছেন, কেহ বা বিদ্যালয়ে পাঠ পরিত্যাগ করিতেছেন, কেহ বা সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা দেখাইতেছেন, এবং কেহবা রোরুদ্যমান সন্তান সন্ততিকে প্রবঞ্চনা করিয়া যন্ত্রালয়ের ঋণ পরিশোধ করিতেছেন। অথচ গ্রন্থকার হইতেই হইবে। গ্রন্থকার না হইলে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই—

রাজ-কাছারিতে উত্তম পেশাদারীর সম্ভাবনা নাই, এমন কি, সময়ে সময়ে মনোমত বিবাহ হইবারও সম্ভাবনা নাই—সুতরাং গ্রন্থকার না হইলে আর উপায় নাই। স্বরস্বতী দেবীর উত্তেজনাতে না হউক, আবশ্যকতার উপরোধে বঙ্গ-যন্ত্রালয় অনন্ত প্রসব-বেদনায় অস্থির। ইহার ফল স্বরূপ দেখিতে পাই, কোথাও হিড়িম্ব।—কোথাও হিড়িম্বক। সময়ে সময়ে আমরা দু একখানি প্রকৃত প্রশংসার গ্রন্থ প্রাপ্ত হই কিন্তু তাহা বঙ্গদেশীয় সুন্দর বনের বন-ফুলের মত অতিশয় যৎসামান্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ম্মভেদী ঔপন্যাসিক কবিত্ব, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর গভীর উচ্ছ্বাস, হেমচন্দ্রের নূপুর-নিক্কন, নবীনচন্দ্রের ইংরাজি বীরভাব, ও আরও দু এক জন প্রশান্ত কবির জ্যোৎস্নাময় কল্পনা-লহরীর কথা যদি উল্লেখ না করি, তাহা হইলে বঙ্গসাহিত্যের বাস্তবিক অবস্থা কি? কেহ বা চর্ব্বিত চর্ব্বনের উপর চাকচিক্যের অবলেপন দিয়া, কেহ বা স্বকপোল কল্পিত বটতলা উচ্ছ্বাসের তুফান তুলিয়া গ্রন্থকার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইতে বাসনা করেন। সমালোচকেরই মহা বিভ্রাট: তিনি বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কখনই মিথ্যা চাটুবাক্যে অকিঞ্চিৎকর লেখকদিগকে স্ফীত করিতে চাহেন না, অথচ সত্য কথা বলিতে গেলে সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্রেরা ক্রোধের বিষে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকেন।

সুতরাং মধ্যে মধ্যে আমরা বাস্তবিক উত্তম ও সদ্ভাব সম্পন্ন গ্রন্থ পাইলে অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাহা সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হই। সুখের বিষয় এই যে এবারে আমরা যে সকল গ্রন্থ সমালোচনা করিতেছি তাহার সমালোচনায় আমাদের কতকটা ঐ রূপ আহ্লাদ হইতেছে।

১। অবসর সরোজিনী, নিভৃত নিবাস নিশীথ চিন্তা, অনলবিজলী, ভারত-গান এই কয় খানি পুস্তক শ্রীরামকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া কলিকাতা আল্‌বার্ট প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। বঙ্গসাহিত্য-সমাজে তিনি বিশেষ রূপে পরিচিত আছেন, এবং তিনিও যার পর নাই যত্ন ও প্রভূত পরিশ্রম সহকারে দেশীয় সাহিত্যের উপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। সকলেই সমস্বরে কাব্য বিষয়ে তাঁহার কল্পনার অরুণ বিকাশ, ভাষার স্ফটিক বিমলতা, ছন্দের মৃদুতরল গতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া আসিতেছে, এবং আমরাও সরল অন্তরে সে প্রশংসায় অনুমোদন করি। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ লেখক সম্বন্ধে আমাদিগের তিনটী বক্তব্য আছে—তাহা না বলিয়া নিরস্ত থাকিলে গ্রন্থকারের প্রতিই বোধ হয় অন্যায়াচরণ করা হইবে।

প্রথম। গ্রন্থকারের কবিতা পড়িয়া এমন বোধ হয় না যে তাঁহার মানস-প্রকৃতি কবিতার উপাদানে গঠিত। কবিতার বিমল উৎস তাঁর হৃদয়ে স্বতঃ উৎসারিত নহে,—তাঁহার মনশ্চক্ষু কবিতার অঞ্জনে রঞ্জিত নহে, তিনি প্রকৃতির অকৃত্রিম কবি নহেন। কিন্তু চেষ্টা ও যত্ন করিয়া তিনি যে সকল ভাব আধত্তীভূত করেন, তাহাতে তিনি সুন্দর রূপে কবিতার চাকচিক্য মাখাইতে পারেন, তাঁহাকে কবিতার স্বর্ণকার না বলিয়া গীল্‌টীকার বলিলে বিশেষ দোষ হয় না।

দ্বিতীয়। তাঁহার কল্পনা প্রায়ই মৃদু মধুর হইলেও সময়ে সময়ে তাহা অতি বিকটাকার ধারণ করে। আমরা একটি উদাহরণ দিয়া আমাদের মনোভাব প্রকাশ করিব। "অবসর সরোজিনীতে" "প্রিয়তমা হাসিল" বলিয়া একটি কবিতা আছে—তাহার ভাবার্থ এই—একজন প্রণয়ী তাঁহার প্রণয়িনীকে লইয়া সরসী-তীরে বসিয়া ছি-

লেন। প্রণয়িনী জলের দিকে চাহিবা মাত্রই প্রণয়ী ভাবিলেন সরোবরে "ইন্দীবর ফুটি বুঝি ফুটিল"—শুদ্ধ ভাবিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি হাত বাড়াইয়া তাহা তুলিতে পর্য্যন্ত জলে হাত ডুবাইলেন।—তাহা দেখিয়া ইন্দীবর-নয়না হাসিয়া ফেলিলেন; কিন্তু হাসিবা মাত্রই কুন্দদন্তপাঁতি বিশিষ্ট প্রণয়িনীর ফুটন্ত দন্তাবলী সরসী জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়িল, অমনি উন্মত্ত প্রণয়ী পূর্ব্বের ভুল শুধরিয়া লইবার জন্য জল হইতে কুন্দফুলরাশি তুলিতে হাত বাড়াইলেন,—তখন প্রণয়িনী মনের সাধে আরও হাসিতে লাগিলেন। কিন্তু আনতমুখী প্রণয়িনীর প্রতিবিম্বিত নাসিকা দেখিয়া কেন যে তিনি জলের ভিতর হইতে শুক পক্ষী ধরিতে গেলেন না, অথবা প্রতিবিম্বিত ভ্রুযুগল দেখিয়া নিমজ্জিত মদনের নিকট হইতে ফুলধনু কাড়িয়া লইতে কেন যে চেষ্টা পাইলেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কারণ "ইন্দীবরই" হোক আর কুন্দফুলই হোক—উভয়েই স্বল্পকাল মধ্যে শুখাইয়া যাইবে, কিন্তু শুকপক্ষী হইলে তাহা হইতে পূর্ব্ব জন্মের অনেক জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা ছিল, আর ধনুক কাড়িয়া লইলে সংসারের বিস্তর মঙ্গল সাধন করিতে পারিতেন!

তৃতীয়। গ্রন্থকার কিঞ্চিৎ অকাতরে ইংরাজী কবি হইতে ভাব লুণ্ঠন করেন। স্থানে স্থানে দুএকটি ভাব দেখিতে পাইলে আমরা এ কথার উল্লেখই করিতাম না,—কিন্তু তাঁহার "নিভৃত নিবাস" নামক কাব্যের ৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কেবল অপহৃত "বমালে" পরিপূর্ণ। ইংরাজি কবি শেলীর Queen Mab নামক কবিতার আরম্ভের সহিত পাঠকগণ উক্তদশ পৃষ্ঠার তুলনা করিলেই আমাদের কথার সার্থকতা বুঝিতে পারিবেন।

কিন্তু যাহাই হউক, গ্রন্থকার যে পরিমাণে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত উপকারের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা তাঁহাকে সরল হৃদয়ে ধন্যবাদ দিতেছি।

সতীত্ব রক্ষিণী কাব্য। শ্রী অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা।

লেখক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে "দুর্ভাগ্যক্রমে আমি জন্ম গ্রহণ করিবার কতিপয় দিবস পরেই সূতিকাগারে অন্ধ হই।" লেখকের বয়স এক্ষণে ১৮ বৎসর, অদ্যাপি তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ, সুতরাং একজন প্রায় আজন্ম অন্ধ বালক এরূপ একখানি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন ইহাই যথেষ্ট প্রশংসার কথা।

সন্তোষ প্রতিমা। বিডেন্ প্রেসে মুদ্রিত; মূল্য এক পয়সা।

ইহা এক খানি সাপ্তাহিক সাহিত্য সম্পর্কীয় পত্রিকা। কতকগুলি সুকুমারমতি বালক এই পত্রিকার অনুষ্ঠাতা। "বীণা পাণি" নামক ক্ষুদ্র অথচ সুকোমল কবিতাটি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী। ভরসা করি ইহা শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিতকায় ও বর্দ্ধিতপ্রভ হইয়া বঙ্গাকাশকে উজ্জ্বল করিবে।

অরুন্ধতী বা বন্দী বরাঙ্গনা। সঙ্গীত রূপক। শ্রী রাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি অনেক অংশে প্রীতিপ্রদ হইয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে কোথাও ভাব বা কল্পনার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গ নাই—সত্য বটে, কিন্তু ইহার নির্দ্দোষ মৃদু গতিতেই ইহার সৌন্দর্য্য। ভাদ্রমাসের "উচ্ছ্বাসময়ী" গঙ্গা অপেক্ষা বৈশাখের সঙ্কীর্ণ গঙ্গায় কোন কোন বিষয়ে রমণীয়তা আছে।

উদয়নাচার্য্য।

আমরা এই প্রবন্ধে ভারতীয় সাহিত্য-জগতের একটী অমূল্য-রত্ন-দ্রষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব; এ মহাত্মা কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য। ইনি একজন মেদিনীর শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থকার হইলেও ইহাঁর জীবন-বৃত্তান্ত আবিষ্কার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। উদয়নাচার্য্যকে লইয়া অনেকে দুই চারি কথা বলিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে তাঁহার জীবনী আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন কি না জানি না। একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন "তিনি একটী ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্য-গগনে আলোকিত হইতেছেন। কিন্তু কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্রই তাহার ব্যাস নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার নাম একটী আলোকের বিন্দু; কিন্তু সেই বিন্দুতে পার্থিব কোন পদার্থ আছে কি না তাহা আমরা নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না। তাঁহার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সম্বন্ধে সাহিত্য-গগন একেবারে শূন্য; এমন কি তিনি কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন তাহাও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের একটী অনিশ্চিত পদার্থ হইয়া রহিয়াছে। (১) আমরাও যে মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের জীবনী অবিকল আবিষ্কার করিতে পারিব—তাহা বলি না। কিন্তু একটী বিষয় বারংবার আন্দোলিত হইলে তাহার তমসাচ্ছন্ন সোপানাবলী অনেক পরিমাণে আলোকিত হইয়া আইসে; তাই, আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিতেছি। এমন হইতে পারে যে, আমরা ইহাতে অনেক স্থলে স্খলিতপদ হইব। কিন্তু যখন বিলুপ্ত পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বঙ্গেশ্বরের শীর্ষস্থানীয় বুধমণ্ডলীও এই আশঙ্কা হইতে একেবারে অব্যাহতি পান নাই তখন আমাদের ভয় কি?

"শঙ্কর দিগ্বিজয়" নামক সংস্কৃত মহাকাব্য-প্রণেতা "বিদ্বজ্জন-কুঞ্জর" মাধবাচার্য্যের মতে "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" কার

(১) "He shines like one of the fixed stars in India's literary firmament, but no telescope can discover any appreciable diameter; his name is a point of light, but we detect therein nothing that belongs to our earth or material existence. The details of his life are a blank, and the very century in which he flourished is an unsettled question in Hindu literary history."—Preface to the Kusumanjali, Edited by Professor Cowell.

কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর, উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (২) শঙ্করদিগ্বিজয়ে উল্লেখ আছে যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ ও তৎপরাজয়-সমর্থ উদয়নাচার্য্য, শঙ্কর কর্ত্তৃক পরাভূত হয়েন। (৩) যদি মাধবাচার্য্যের এই বাক্য প্রমাদশূন্য হইত তবে মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্যের সময় লইয়া কোন গোলে পড়িতে হইত না; কেননা উল্লিখিত মহাত্মাদের এক জনের সময় নিরূপণ করিতে পারিলেই সকলের আবির্ভাব-কাল পাওয়া যাইত। কিন্তু তল্লিখিত সমকালবর্ত্তী মহাত্মাদের প্রায় অনেকেই এক সময়ে বর্ত্তমান থাকা দূরে থাকুক, দুই এক শতাব্দীর মধ্যেও বর্ত্তমান ছিলেন না। এমন কি, বাণভট্ট শ্রীহর্ষ হইতে প্রায় ৪।৫ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক। (৪) মাধবাচার্য্য এক জন সুপ্রসিদ্ধ কৃতবিদ্য লোক হইয়াও (৫) এই রূপ কাল-ভ্রম করিলেন কেন? ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে মাধবাচার্য্যের সময়ে এদেশে কোন সময়নির্ণায়ক ইতিহাস ছিল না। সুতরাং তখনকার লোক স্বীয় জন্মের পঞ্চাশৎ বৎসরের পূর্ব্বকার লোকের (যিনি ভিন্নদেশনিবাসী এবং যাঁহার সম্বন্ধে বৃদ্ধদের নিকট কোন জনশ্রুতি শুনা যায় নাই) এবং সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের আবির্ভাব-কালের পার্থক্য বুঝিতে পারিত না এবং দেশে ঐতিহাসিক চর্চ্চা না থাকাতে কেহ তাহা জানিবার জন্য বড় যত্নও করিত না। মনে কর আমরা যদি পাশ্চাত্য মহাত্মাদের নিকট পুনরায় ঐতিহাসিক চর্চ্চার মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতাম তবে মহাত্মা রামমোহন রায় এবং পরমভাগবৎ চৈতন্যদেব ইহাঁরা কে পূর্ব্বের লোক এবং কে পরের লোক তাহা লইয়া এখন আমাদের মুহুর্মুহু সন্দেহ উপস্থিত হইত। এ কথায় শুধু পুরাতত্ত্বচর্চ্চা-বিসর্জ্জিত হিন্দু সন্তানগণকে দোষ দিই না। যাঁহারা সংপ্রতি পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষাগুরু সেই পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিশারদ বুধমণ্ডলীও সময়ে সময়ে এসম্বন্ধে এমন লজ্জাকর ভ্রমে পতিত হই-

(২) ঐতিহাসিক রহস্য, ২য় ভাগ "বাণভট্ট" নামক প্রস্তাব এবং বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা ও ৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৩) ১৫ শ "শঙ্কর দিগ্বিজয়" ১৫৭ শ্লোক।

(৪) ঐতিহাসিক রহস্যের "শ্রীহর্ষ" ও "বাণভট্ট" নামক প্রস্তাব মিলাইয়া দেখ।

৫ মাধবাচার্য্য সংস্কৃত সাহিত্য জগতে অপরিচিত নন। ইনি "বেদার্থ প্রকাশ" নামক প্রসিদ্ধ বেদ ব্যাখ্যা এবং শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে "শঙ্করদিগ্বিজয়" নামে ষোড়শ সর্গে এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে মাধবাচার্য্য খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। See Wilsons—Mackenzie catalogue Vol 1 P CXI 2 Colebrooke's Essays Vol 1 P 100.

তেছেন যে তাহা দেখিয়া আমাদেরও হাসি পায়। মহাভারত হইতে রামায়ণ অনেক প্রাচীনতম গ্রন্থ একথা সহস্র সহস্র বর্ষ হইতে সর্ব্ববাদিসম্মত রূপে পরিগণিত হইয়া সমস্ত আর্য্য সন্তানের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে কিন্তু কোন শাস্ত্রদর্শী পাশ্চাত্য মহোদয় ৬ নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া এখন তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন!!! সুতরাং যখন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে আধুনিক পুরাবৃত্তস্পর্দ্ধী মহাত্মাগণও নিতান্ত স্খলিতপদ হইতেছেন, তখন সেই ঐতিহাসিক চর্চ্চারহিত অর্ব্বাচীন পরম পণ্ডিত মাধবাচার্য্যকে এ সম্বন্ধে একটুকু দোষ দিই না। পরন্তু এ দেশীয়দের একটী চিরন্তন অভ্যাস যে, সময়ের সামঞ্জস্য থাকুক আর না থাকুক তাঁহারা কয়েকটী দেবকল্প মহাত্মাকে একস্থানে সমাসীন দেখিতে বড় ভাল বাসেন। ভোজপ্রবন্ধ দেখ এক সভায় ভবভূতি, দণ্ডী, কালিদাস এমন কি মল্লিনাথকেও উপস্থিত দেখিবে। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ দেখ দেখিতে পাইবে দশরথের সভায় ব্যাস, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তথায় ব্যাসনন্দন শুকদেবের প্রসঙ্গ পর্য্যন্ত আলোচিত হইতেছে। যখন এইরূপ অসম্ভাব্য বিষয়গুলি গ্রথিত রহিয়াছে তখন যে এদেশে শঙ্করাচার্য্য, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি একস্থলে উপস্থিত ছিলেন,—এরূপ উপন্যাস সেকালের লোকসমাজে প্রচলিত থাকিবে তাহা আশ্চর্য্য নহে।

"শঙ্করদিগ্বিজয়" প্রণেতা এবম্ভূত কোন লোকপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ন্যায় একজন পরম ধার্ম্মিক একটী মিথ্যা উপন্যাস প্রস্তুত করিয়া কেবল শঙ্করের মানবৃদ্ধির জন্য তাহা গ্রথিত করিবেন, একথা আমরা একটুকু বিশ্বাস করি না। মাধবাচার্য্য শঙ্করদিগ্বিজয়ের আর এক স্থলে প্রায় দেড় সহস্র বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাসদেবের সহিত শঙ্করাচার্য্যের শাস্ত্রালাপ করাইয়াছেন,—এই অদ্ভুত উপাখ্যানটীও যে এইরূপ কোন লোকপ্রবাদ হইতে গৃহীত তাহার কোন ভুল নাই, তবে মাধবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিতেন, অনেক স্থলে ভক্তি-অন্ধ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অস্বাভাবিক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন শঙ্করদেবকে রুদ্রের অবতার করিয়াছেন ৭ নরূরূপী ব্রহ্মা ও ভারতীকে ৮ তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত করাইয়াছেন—এ সকল উক্তি মাধবাচার্য্যের স্বকৃত কি দেশপ্রচলিত কিংবদন্তী হইতে গৃহীত আমাদের বলিবার সাধ্য নাই। তবে ভক্তিঅন্ধ ভক্ত কবি তাঁহার উপাস্য গুরুকে দেশকল্পিত উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া তদবলম্বনে অথবা স্বীয় কল্পনাবলে দেবতা

৬ J. Talboys Wheeler

৭ শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ ব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং। তয়োর্ব্বিবাদে সংপ্রাপ্তে কিংকরঃ কিংকরোম্যহং।

৮ মণ্ডনমিশ্র ও তাঁহার স্ত্রী সারস্বানী।

সাজাইলে কাব্য গ্রন্থের পক্ষে তাহাতে কোন দোষ স্পর্শিতে পারে না; কেন না শঙ্করদিগ্বিজয়" জীবনচরিত বা ইতিহাস নহে;—উহা কাব্য। আমরা মূল বিষয় ছাড়িয়া একটুক তফাত আসিয়া পড়িলাম অতএব এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া এখন প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করা যাউক।

এখন কথা এই "খণ্ডনকার কবীন্দ্র শ্রীহর্ষ, বাণ, ময়ূর উদয়নাচার্য্য এবং শঙ্করাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন" এই কথা প্রমাদরহিত কি প্রমাদপূর্ণ আমরাও একবার তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি। পাঠকগণ মনে করিতে পারেন আমরা এই প্রবন্ধে উদয়নাচার্য্যের বিষয় লিখিব; তবে আবার কেন শ্রীহর্ষ, বাণ প্রভৃতির বিষয় লিখিতেছি? একথায় আমাদের এইমাত্র বক্তব্য মহাত্মা মাধবাচার্য্যের লিখানুসারে অনেকের দৃঢ় সংস্কার আছে যে উদয়ন, বাণ শ্রীহর্ষ প্রভৃতি শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। যদি আমরা কেবল মুখের কথায় তাঁহার নাম এক জন ভারতবিখ্যাত মহোদয়ের মস্তকে উড়াইয়া দিই তবে আমাদের কথায় কেহই কর্ণপাত করিবেন না। আর ঐ সকল মহাত্মাদের বিষয় আলোচনা করিলে উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধেও অনেক সত্য আবিষ্কার হইবে। সেই জন্যই আমরা শ্রীহর্ষ বাণভট্ট, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সম্বন্ধে কিছু বলিয়া তার পর উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি।

(শ্রীহর্ষ)

ভারতীয় সাহিত্য-সংসারে দুই জন শ্রীহর্ষ বিরাজমান ছিলেন। এক জন রত্নাবলী নামক প্রসিদ্ধ নাটকপ্রণেতা কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ। অপর জন নৈষধ-কাব্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষ। মাধবাচার্য্য* নৈষধ-প্রণেতা শ্রীহর্ষকেই শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক লোক বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন: কেন না তিনি "খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ" এই রূপ বলিয়াছেন। নৈষধকার শ্রীহর্ষ তাঁহার নৈষধচরিতে লিখিয়াছেন যে তিনি "অর্ণব বর্ণন কাব্য" "নব সাহসাঙ্ক চরিত" "খণ্ডন খণ্ড খাদ্য" "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—

" সংদৃব্ধার্ণববর্ণনস্য নবমস্তস্য বারং সীম্নহাকাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। " ১

" দ্বাবিংশো নবসাহসাঙ্কচরিতে চম্পূ কৃতোঽয়ং মহাকাব্যে তস্য কৃতৌ নলীয় চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ। " ২

" ষষ্ঠঃ খণ্ডনখণ্ডতোঽপি সহজাৎ ক্ষোদক্ষমেতন্মহাকাব্যেঽয়ং ব্যগলন্নলস্য চরিতে সর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ।" ৩

" গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তিভণিতিভ্রাত র্য্যয়ং তন্মহাকাব্যে [চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽগমৎ সপ্তমঃ। " ৪

নৈষধ চরিতের আর এক স্থলে শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়-স্থলে লিখিত আছে যে তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীরঃ এবং মাতার নাম মামল্ল দেবী। তিনি কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট

সম্মানসূচক তাম্বূলদ্বয় ও আসন লাভ করিয়াছিলেন—

"শ্রীহর্ষঃ কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কার-হীরঃসুতং শ্রীহীরঃ সুষুবে জিতেন্দ্রিয়চয়ং মামল্লদেবী চ যং।" ১

"তাম্বূলদ্বয়মাসনংচ লভতে যঃ কায়-কুব্জেশ্বরাৎ।" ২

প্রবন্ধকোষপ্রণেতা জৈনলিখ রাজ-শেখর বলেন শ্রীহীরসুত বারানশী নগ-রীতে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানকার রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তনয় মহারাজ জয়ন্ত-চন্দ্রের আজ্ঞায় "নৈষধ চরিত" প্রণয়ন করেন। জয়ন্ত পঞ্চাল নামে বিখ্যাত। শাস্ত্রদর্শী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে জয়ন্তচন্দ্রের নামান্তর জয়চন্দ্র এবং ইনি ১১৬৮ এবং ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কানাকুব্জ ও বারা-নসীর অধিপতি ছিলেন। বাবু রামদাস সেন বলেন—রাজশেখরের বিবরণ প্রামা-ণিক বোধ হইতেছে; কেননা তাহার স-হিত শ্রীহর্ষের নিজ পরিচয়ের ঐক্য আছে (৯) রামদাস বাবু আরো বলেন "পূর্ব্বেই লিখিয়াছি চাঁদ কবি শ্রীহর্ষের সম সাময়িক। চাঁদ কবি শ্রীহর্ষের মান বৃদ্ধির জন্য তাঁহার নাম পৃথ্বীরাজ চৌহান রা-জের প্রস্তাবনায় কালিদাসের পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে "নরের প্রধান কবি, সার কবি শ্রীহর্ষ" বলিয়াছেন। শ্রীহর্ষ, কুমার-পাল, হেমচন্দ্র, চাঁদ সকলেই খৃষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন (১০) প্রবন্ধচিন্তামণিরও ঐ মত। সুতরাং ডাক্তার রাজেন্দ্র, রামদাস বাবু প্রবন্ধচিন্তা-মণি প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে "প্রবন্ধ কোষের" বাক্যে আস্থাবান হইয়া নৈষধ-চরিত-প্রণেতা শ্রীহর্ষ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইনিই কাণ্যকুব্জেশ্বর জয়ন্তচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন এরূপ বলিতেছেন।

অনেকের মত (১১) এই যে আদিশূর অমঙ্গল শান্তির জন্য যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ (১২) আনয়ন করেন তাহার এক জনের নাম শ্রীহর্ষ সেই শ্রীহর্ষই "নৈষধচরিত" নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। এ সম্বন্ধে জনৈক মহাত্মার মত এই:—"আদিশূর যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাঁহারা সকলেই সুপণ্ডিত; তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ

(৯) ঐতিহাসিক রহস্যের "শ্রীহর্ষ" প্রস্তাব দেখ।

(১০) বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা।

১১ See Dr. Rajendra Lal Mitra's paper on Mahendra Pala in the journal of the Asiatic Society of Bengal. ঐতিহাসিক রহস্যের "শ্রীহর্ষ" নামক প্র-স্তাব, "বঙ্গদর্শন তৃতীয় খণ্ড ২৪—২৯ পৃষ্ঠা। এবং "সম্বন্ধ নির্ণয়" ২১৩ পৃষ্ঠা।

১২ ভট্ট নারায়ণো দক্ষঃ বেদগর্ভোঽথ ছা-ন্দড়ঃ।

অথ শ্রীহর্ষ নামাচ কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।১
শাণ্ডিল্য গোত্রজ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽথ কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোঽথ ছান্দড়ঃ। ২
ভরদ্বাজ কুলশ্রেষ্ঠঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽথ সাবর্ণো যথাবেদ ইতিস্মৃতঃ। ৩

"বেণীসংহার নাটকের রচয়িতা সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ যে, নৈষধকার হইবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। তিনি গৌড়ে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগর দেখিয়া ছিলেন, ইহা সম্ভব; সুতরাং নৈষধ লিখকের কয়েকটী পরিচায়ক লক্ষণ বঙ্গীয় ভরদ্বাজকুলপিতা শ্রীহর্ষে আছে। আর বাঙ্গালার আদি কবি বিদ্যাপতি তৎকৃত সংস্কৃত পুরুষপরীক্ষা গ্রন্থে শ্রীহর্ষকে বাঙ্গলা দেশের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৩) ইহাতে জানা যায় ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বকার লোকেরাও শ্রীহর্ষকে কবি বলিয়া জানিত। তার পর, এই শ্রীহর্ষকে আদিশূরের সমকালীন বলিলে ইনি দশম খৃষ্টাব্দের লোক ছিলেন; কেননা আদিশূর সম্ভবতঃ ৯৯৫ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ১৪ ভোজরাজকৃত "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে" নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং নৈষধ ভোজরাজের (খৃঃ ১০৪২ অব্দের) পূর্ব্বেও রচিত হইয়াছে; অতএব তাহাকে আদিশূরের সমসাময়িক বলিলে দোষ হয় না। আর চীন পর্য্যটক হুয়েন্থ সঙের লেখায় সপ্তম শতাব্দিতে এক সাহসাঙ্ক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। বিশ্বপ্রকাশ রচয়িতা মহেশ্বরের মতে খৃঃ দশম শতাব্দির মধ্য বা শেষ ভাগে এক সাহসাঙ্ক গাধিপুরে (কান্যকুব্জে) রাজত্ব করিতেন। ১৫ দশম শতাব্দীর নৃপতি সাহসাঙ্কের চরিত

১৩ পুরুষপরীক্ষা বিদ্যাপতি কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। উহা ১৮১৫ খৃঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়োগ অনুসারে শ্রীহর্ষ প্রসাদ রায় কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হয় (Calcutta Review Vol XIII P. 189.) ঐ অনুবাদে শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে এই লিখা আছে:—

গৌড়দেশে শ্রীহর্ষ নামা এক পণ্ডিত তিনি অতিশয় কবি ছিলেন। এক সময়ে নল চরিত্র নামে কাব্য রচনা করিয়া * * * পশ্চাৎ শ্রীহর্ষ সেই কাব্য লইয়া পণ্ডিত সমাজের উদ্দেশে বারানসী গেলেন। সেখানে গিয়া কোক নামা পণ্ডিতকে স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। মেধাবী কথা—পুরুষ পরীক্ষা।

১৪ আদিশূরের রাজত্বকাল—কিতীশ বংশাবলীর মতে ৯৯৯ শকে বা ১০৭৭ খৃষ্টাব্দে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। কুলাচার্য্য গ্রন্থের মতে ৯৫৪ শকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে আনয়ন করেন; ঘটককারিকা অনুসারে ৯৯৪ শকের ১০৭২ খৃষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গে আসিয়াছিলেন। সম্বন্ধ নির্ণয় কিতীশ বংশাবলীর ২৯৯ অব্দকে সংবৎ ধরিয়া ৮৬৩ বা ৮৬৪ শকে ৯৪১।৪২ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমন ঠিক করিয়াছেন। কায়স্থ কৌস্তুভের মতে আদিশূর কর্ত্তৃক ৩৮০ বঙ্গাব্দে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ গৌড়ে আনীত হয়। আদিশূরের রাজ্যারম্ভ লঘুভারতের মতে ৯৫১ শক বা ১০২৯ খৃঃ অঃ। অধ্যাপক লাসেনের মতে ১০৩০ খৃঃ অঃ। ডাক্তার বুকাননের মতে ১০৬৫ খৃঃ অঃ। বাঙ্কবের মতে ৯৫০ শক বা ৯০২৮ খৃষ্টাব্দ।

১৫ A Prince named Sahasanka must have occupied the throne of Kanouj about the middle of the 10th century as Maheswara the auther of Viswaprakasa in the year 1111, makes himself sixth in descent from the

(১০ম শতাব্দীর ?। বঙ্গীয় শ্রীহর্ষ লিখিবেন বিচিত্র কি ? ১৬ অতঃপর চাঁদকবি নৈষধ প্রণেতা শ্রীহর্ষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"সরস্বতীং পঠদ্যা শ্রীহর্ষসারং
নলেনায়কণ্ঠে নিহিত হৃদাহারং।" ১৭

দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের ১৮ লোক চাঁদ কবি যে খৃঃ দশম শতাব্দীতে বর্ত্তমান শ্রীহর্ষের কথা উল্লেখ করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।"

যে সকল যুক্তি অনুসরণ করিয়া ডাক্তার বুলার প্রভৃতি নৈষধপ্রণেতা শ্রীহর্ষকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন; আমরা পরকীয় যুক্তি সকলে এমন কোন একটা প্রমাণ দেখিতে পাইলাম না যাহার বলে উল্লিখিত মত সকল খণ্ডাইয়া আমরা শ্রীহর্ষকে খৃঃ দশম শতাব্দীর নৃপতি আদিশূরের সমকালবর্ত্তী বলিতে পারি। পরকীয় যুক্তিতে যে সকল প্রমাণ প্রকটিত হইয়াছে তাহার মধ্যে "সরস্বতী কণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে" এই কথাটী বলবান ছিল। কিন্তু এই প্রমাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান্ আছেন। রামদাস বাবু বলেন "আমার নিকট রত্নেশ্বরের টীকা সহিত সরস্বতী কণ্ঠাভরণ আছে কিন্তু তাহাতে নৈষধের প্রমাণ নাই। বুলার সাহেবও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কার গ্রন্থে দেখেন নাই, আফ্রেক্ট ও তাঁহার সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত গ্রন্থের তালিকায় একথা উল্লেখ করেন নাই,—কাজেই যদি অন্য কোন "সরস্বতীকণ্ঠাভরণে" নৈষধের শ্লোক থাকে তবে তাহা কোন আধুনিক পণ্ডিত দ্বারা সন্নিবেশিত বলিব—এজন্য উহা কৃত্রিম। ১৯ এখন দেখা যাইতেছে পরকীয় যুক্তিতে যেটী বলবৎ প্রমাণ ছিল তাহা বজায় রহিল না। ইহা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল যুক্তি প্রকটিত হইয়াছে তাহা অনুমানসিদ্ধ কথা; ও সকল আমরা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। প্রত্যুত উহার কোন কোন যুক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়, কেন না তিনিই বলিয়াছেন আদিশূর ৯৯৫ খৃষ্টাব্দের লোক এবং সাহসাঙ্ক যে একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন তাহাও বিশ্বাস করিয়াছেন; ইহাও একরূপ ঠিক কথা যে যখন শ্রীহর্ষ আদিশূরের আহ্বানে গৌড়ে আসেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৮০ অশীতি বৎসরের উপরে ছিল ২০ সুতরাং যখন সাহসাঙ্কের জীবনী লিখিবার প্রকৃত সময় হয়—অর্থাৎ সাহসাঙ্ক রাজত্ব ছাড়িয়াছেন ও তাহার জীবনের ঘটনা শেষ হয়; হয়তো আদিশূর আনীত শ্রীহর্ষ তখন

physician of that monarch, Asiatic Researches Vol XV P 469.

১৬ বঙ্গদর্শন ৩য় খণ্ড, ২৩। ২৪। ২৫ পৃ

১৭ নরের প্রধান সার কবি শ্রীহর্ষ, যিনি নলরাজার কণ্ঠে হৃদয় হার দিয়াছেন।

১৮ চাঁদ কবি পৃথুরাজের সমসাময়িক, পৃথুরাজ ১১৯২ খৃঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরির সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন।

১৯ "বঙ্গদর্শন" তৃতীয় খণ্ড ৮৪ পৃষ্ঠা।

২০ সম্বন্ধ নির্ণয় মতে এসময় শ্রীহর্ষের বয়ঃক্রম ৯০ বৎসর ছিল ১৬৩ পৃষ্ঠা।

পরলোক প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন অথবা চলৎ-শক্তি-রহিত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন সুতরাং "রাম না জন্মিতে রামায়ণের" ন্যায় তিনি সাহসাঙ্কের জীবনচরিত লিখিয়া ছিলেন! বাস্তবিক ন্যায়পথে চলিয়া যদি নৈষধকার শ্রীহর্ষের সময় পর্য্যালোচনা করা যায় তবে তাঁহাকে আদিশূরের সময়ের অনেক পরকীয় লোক বলিতে হইবে। অতএব ডাক্তার বুলার, রামদাস বাবু প্রভৃতি যে নৈষধকার শ্রীহর্ষকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়াছেন একথাই আমাদের নিকট অধিক সারবান বলিয়া বোধ হয়।

পরন্তু আদিশূর-আহূত ভরদ্বাজ গোত্রীয় হর্ষবর্দ্ধন শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এপর্য্যন্ত একটী মহাভ্রম করিয়া আসিতেছেন। নৈষধকার শ্রীহর্ষ নিজ পরিচয়স্থলে তাঁহাকে শ্রীহীরের পুত্র বলিয়াছেন, অথচ আদিশূর-আনীত শ্রীহর্ষের পিতা ক্ষিতীশাদি পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বিপ্র মেধাতিথি ছিলেন। ২১ সম্বন্ধ নির্ণয়ে লিখিত আছে "নৈষধে মুকুটালঙ্কারহীর" লিখা আছে সুতরাং মেধাতিথি নামটী মুকুটালঙ্কারহীরের নামান্তর কহিতে হইবে, একথা, আমরা একটুকও স্বীকার করিতে পারি না কেননা শ্রীহীরের নামান্তর যদি মেধাতিথি হইত, তবে নিশ্চয়ই তাহার কোন প্রমাণ থাকিত; যখন কোথাও নাই তখন স্বীকার করিতে হইবে যে ভরদ্বাজগোত্রীয় মেধাতিথিনন্দন শ্রীহর্ষই আদিশূর-আনীত পঞ্চ বিপ্রের অন্যতম বিপ্র, শ্রীহর্ষ। আর শ্রীহীরের পুত্রই নৈষধকার—শ্রীহর্ষ। ইহাঁরা উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কারণ এক জনের দুই পিতা থাকা অসম্ভব ও অলৌকিক ব্যাপার। সুতরাং এতদিন পুরাতত্ত্ববিশারদ মহোদয়গণ যে নৈষধকার হীরসুত শ্রীহর্ষকে আদিশূর-আহূত মেধাতিথি-নন্দন শ্রীহর্ষের সহিত অভেদ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে বঙ্গীয় কবি সাজাইয়াছিলেন তাহার মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে ২২। ইহা দুঃখের বিষয় বটে; কেননা নৈষধকার শ্রীহর্ষ যদি বাস্তবিকই বঙ্গীয় কবি হইতেন তবে আমরাও গৌরবান্বিত হইতাম। পুরাতত্ত্বলিখকগণ অথবা আদিশূরের পুরোহিত শ্রীহর্ষকে নৈষধ-প্রণেতা কল্পনা করিয়া এক গোলমাল বাঁধাইয়াছেন। বাস্তবিক নৈষধকার শ্রীহর্ষ যে আদিশূরের অন্যতম পুরোহিত হইতে অনেক পরকীয় স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং নৈষধকার যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক তাহার কোন ভুল নাই।

কেহ বলিতে পারেন, যদি নৈষধপ্রণেতা শ্রীহর্ষ গৌড়ীয় নৃপতিগণের সহিত কিয়ৎ

২১ "সম্বন্ধ নির্ণয় ২১৩ পৃষ্ঠা।
শ্রীক্ষিতীশস্তিথির্মেধা বীতরাগ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড় মণ্ডলে।

২২ আমরা প্রস্তাব লিখিয়া শেষ করিয়াছি—এমন সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলাম বান্ধবের কোন লিখকও এ মতটীর উদ্ভাবনা করিয়াছেন। বান্ধব, তৃতীয় খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা। (১২৮৩)

কাল অতিবাহিত না করিতেন তবে তিনি গৌড়ীয় রাজাদের বিষয় এত পরিজ্ঞাত থাকিতেন না, কেননা তিনি "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" অর্থাৎ গৌড়ীয় রাজবংশের বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। বোধ হয় এই কথায় এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভিন্ন দেশীয় লোক কর্ত্তৃক এরূপ গৌড়ীয় রাজবংশের বিবরণ লিখা তত আশ্চর্য্য নহে। হয় তো তিনি কখন গৌড়ে পর্য্যটন করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। তখন তিনি গঙ্গাসাগর-সঙ্গম দেখিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট গৌড়ীয় রাজবংশের বিবরণ অবগত হইয়াছিলেন, সেই অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া নৈষধচরিতে গঙ্গা-সাগর-সঙ্গম বর্ণনা করিয়াছেন এবং "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। অথবা গৌড়ীয় রাজকুলের ন্যায় প্রসিদ্ধ রাজবংশের সমুদয় বিবরণ লোকমুখে অথবা অন্য উপায়ে অবগত হইয়া দুই এক শতাব্দীর পর "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" প্রণয়ন করিলেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং আদিশূর প্রভৃতির অনেক পরবর্ত্তী লোক যে গৌড় রাজধানীতে অবস্থিতি না করিয়াও দূর দেশ হইতে সেই রাজবংশীয় ইতিহাস প্রণয়ন করিবেন তাহাও বিচিত্র নহে। যদি আশ্চর্য্য হও তবে বল দেখি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যুগযুগান্তপরে সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া কিরূপে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিতেছেন? বলিতে পার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের গবেষণা-শক্তি আছে কিন্তু হিন্দু সন্তানদের যে গবেষণা-শক্তি নাই তাহা বলা যায় না; হিন্দু সন্তানদের সংগ্রহ-গ্রন্থ দেখ টীকা-গ্রন্থ দেখ বুঝিতে পারিবে হিন্দু সন্তানগণ কীদৃশ গবেষণা-শক্তি-সম্পন্ন; তাঁহাদের সেই অলৌকিক ক্ষমতার নিকট পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকে হীন-প্রভ বলিয়া বোধ হয়। তবে ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাঁহারা এ ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া তত আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু যখন হীরনন্দন শ্রীহর্ষ "সাহসাঙ্কচরিত" ও "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" নামক দুই খানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তখন তিনি ঐতিহাসিক মহিমা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই; অতএব তিনি গবেষণার বলে অনেক পূর্ব্বকার ঘটনা সংগ্রহ করিয়া "গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি" প্রণয়ন করিবেন তাহা একটুকুও অসম্ভব জ্ঞান করি না।

যদিও "গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি" এখন পাওয়া যায় না কিন্তু যুক্তির আশ্রয় লইলে শুধু এই গ্রন্থের নামটী দেখিয়াই বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তৎপ্রণেতা আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী লোক। কেননা তিনি যখন গৌড়ীয় রাজকুলের প্রশংসা লিখিয়াছেন তখন বোধ হয় তিনি আদিশূরের পরবর্ত্তী নৃপতিদের বৃত্তান্তও উহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কারণ, "রাজকুল" বলিলে উহার সীমা একটী রাজায় নিবদ্ধ থাকে না—"রাজকুল" শব্দে সমসাময়িক কিম্বা পুরুষপরম্পরাগত ধারাবাহিক কতকগুলি নৃপতিকে বুঝাইবে। আদি-

শূরের সময়, গৌড়দেশে আদিশূর ব্যতীত আর কোন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন না। আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী নৃপতিগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, পরম হিন্দু হীরনন্দন যে হিন্দুবিদ্বেষী বৌদ্ধদের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া তদীয় গ্রন্থে স্থান দিয়াছেন, বোধ হয় না। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে হীরনন্দন শ্রীহর্ষ তাঁহার গৌড়োর্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তিতে (২৩) অর্থাৎ গৌড়ীয় নৃপতি কুলের প্রশংসা বিষয়ক গ্রন্থে আদিশূর হইতে বল্লালসেন প্রভৃতি রাজাদের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব শুদ্ধ এই কথার বলেও তাঁহাকে আদিশূরের অনেক পরবর্ত্তী লোক বলা যাইতে পারে। এবং এই কথার বলে নৈষধকার শ্রীহর্ষকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিলে দোষ হয় না।

শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহার পরিসমাপ্তি করিলাম, এখন বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই এক পংক্তি বলিয়া উদয়নাচার্য্যের জীবনীর আরম্ভ করিব।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

পূর্ব্বকার প্রতিজ্ঞা-অনুসারে এক্ষণে উন্নতি-সপ্তকের সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কোথায় উদ্ভিদ-রাজ্য, কোথায় জীব-রাজ্য, কোথায় পৃথিবীর স্তর-সংস্থাপন, কোথায় সৌর জগৎ, সর্ব্বত্রই সপ্তক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় বটে, কিন্তু কোথায় সূর্য্য কোথায় নক্ষত্র কোথায় একটি ক্ষুদ্র বালুকণা সর্ব্বত্রই একই আকর্ষণের নিয়ম বলবৎ, ইহা অপেক্ষা কি আর আশ্চর্য্যের বিষয়! কিঞ্চিৎ পরেই দেখা যাইবে যে, আকর্ষণ-বিক্ষেপের পর্য্যায়-ক্রম আপনা-আপনিই সপ্তকে পরিণত হয়।

জগতের সমস্ত ব্যাপারই নিয়মের অধীন,—নিয়মের নিকট ক্ষুদ্র-বৃহৎ দূর-নিকট আত্ম-পর সকলই সমান। যে বস্তু যেস্থানে

২৩ "গৌড়" "উর্ব্বী, ঈশ" (পৃথিবী-পতি) "কুল" "প্রশস্তি" (প্রশংসা) অর্থাৎ গৌড়ের নৃপতিকুলের প্রশংসা।

আছে, নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহা সে-স্থানে আছে ; সূর্য্য কেন ওস্থানে, পৃথিবী কেন এস্থানে, উদ্ভিদের মূল কেন নিম্নে, শাখা-প্রশাখা কেন ঊর্দ্ধে, মনুষ্যের চক্ষু কেন উচ্চ-স্থানে, রসনা কেন তাহার নিম্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর এই যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থিতি—যাহা লইয়া সমুদায় জগতের স্থিতি-ব্যাপার—নিয়মই তাহার মূল;—এ ত গেল আকাশে অবস্থিতি; এমনি আবার ঘটনা-সকলের কালে-অবস্থিতিও নিয়ম-সাপেক্ষ ; হিন্দুজাতির পতন কেন ঠিক এই সময়টিতে হইল, ফরাসিস্ রাজ্য-বিপ্লব কেন ঠিক অমুক সময়টিতে হইল, তাহার পূর্ব্বেই-বা না হইল কেন, তাহার পরেই-বা না হইল কেন ? নিয়মই ইহার মূল।

বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন দেশাংশে অবস্থিতির যে নিয়ম, তাহা স্থিতির নিয়ম এবং বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন কালাংশে অবস্থিতির যে নিয়ম তাহা গতির নিয়ম বলিয়া উক্ত হইতে পারে ; কিন্তু স্থিতি এবং গতি উভয়ই পরস্পরকে অপেক্ষা করে, উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে একেবারে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না;—বস্তু-সকল যখন অনেক দেশ-হইতে আসিয়া এক-দেশে মিলিত হয় তখন পরস্পরের গতি পরস্পর-কর্ত্তৃক প্রতিহত হইয়া বোধ হয় বুঝি-বা স্থগিত হইয়া গেল,কিন্তু বাস্তবিক তাহা হইতে পারে না ; অধুনাতন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা ইহা একেবারেই স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন গতি একদিকে রুদ্ধ হইলে তাহা আর এক দিকে আর এক বেশে আবির্ভূত হইবেই হইবে ; এক কথায় এই যে, চিন্তা-ব্যতিরেকে যেমন মন থাকিতে পারে না, গতি-ব্যতিরেকে তেমনি জড় বস্তু থাকিতে পারে না; অতএব আপেক্ষিক গতিরোধ-ভিন্ন স্থিতি-শব্দের আর কোন অর্থ হইতে পারে না গতি-শব্দেও আপেক্ষিক অনবস্থিতি-ভিন্ন ঐকান্তিক অনবস্থিতি বুঝায় না ; স্থিতি এবং গতি যখন এই রূপ পরস্পরাপেক্ষ,তখন ইহা নিঃসংশয় যে, বস্তু-সকলের স্থিতির নিয়ম—যাহা অসীম দেশ-হইতে প্রতি-দেশের এবং এক-দেশ হইতে অন্য-দেশের ভিন্নতা-সাধক সুতরাং সর্ব্বদেশব্যাপী, এবং তাহাদের গতির নিয়ম যাহা অসীম-কাল-হইতে প্রতি-মুহূর্ত্তের এবং এক-মুহূর্ত্ত-হইতে অন্য-মুহূর্ত্তের ভিন্নতা-সাধক সুতরাং সর্ব্বকালব্যাপী, সর্ব্বদেশব্যাপী এবং সর্ব্বকালব্যাপী এ-দুটি নিয়ম দুইটি স্বতন্ত্র নিয়ম নহে পরন্তু উহারা একই মূল-নিয়মের এপিট-ওপিট। বস্তু-সকলের অনেক দেশ-হইতে এক-দেশে মিলিত-হওয়া এবং এক-দেশ হইতে অনেক-দেশে ছটকিয়া পড়া, এ-দুটি ব্যাপার নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় জগতের সর্ব্বত্রই কোন-না-কোন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার প্রথমটিতে স্থিতির প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়টিতে গতির প্রাধান্য বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় ; নিশ্বাস-প্রশ্বাস যেমন শরীর-ঘটিত নিয়মের অধীন, ও-দুটি ব্যাপার সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ড-ঘটিত নিয়মের অধীন, বিধিমত ধরিতে গেলে উভয়-ব্যাপারই একই মূল নিয়মের

অধীন,—উন্নতির নিয়মই সেই মূল নিয়ম;—দেশকালাশ্রিত তাবৎ ব্যাপারই স্থিতি এবং গতি উভয়ের মধ্যে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করত উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন শাস্ত্রকারেরা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়মকে সমুদায় জগতের মূল নিয়ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন,—আমরা তাঁহাদের কথা শিরোধার্য্য করিয়া বেশির ভাগ এই-আর-একটি কথা বলি যে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিয়মই উন্নতির নিয়ম;—আমরা বলি, প্রলয়ের উত্তরকালীন যে নূতন সৃষ্টি তাহা পূর্ব্ব-সৃষ্টির নূতন সংস্করণ সুতরাং তাহা উন্নতি-সোপানের এক ধাপ উচ্চে অবস্থিত।

স্থিতি এবং গতি এই দুই মূল ব্যাপার বৈজ্ঞানিক ভাষায় আকর্ষণ-বিক্ষেপ, দার্শনিক ভাষায় স্থিতি-প্রলয়, সাংসারিক ভাষায় বন্ধন এবং বিশ্লেষণ, আর চলিত ভাষায় ভাঙন এবং গড়ন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; এতদুপলক্ষে যাহা মনে রাখা কর্ত্তব্য তাহা আর কিছু নয়—উচ্চতর স্থিতির জন্যই (উন্নতির জন্যই) গতি, উচ্চতর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার জন্যই বিক্ষেপ, উচ্চতর সৃষ্টির জন্যই প্রলয়, উচ্চতর বন্ধনের জন্যই বিশ্লেষণ, ভাল করিয়া গড়নের জন্যই ভাঙন,—এই। ভাবি জাগরণের সহিত সম্পর্ক-রহিত নিদ্রা, কিম্বা ভাবি নিদ্রার সহিত সম্পর্ক-রহিত জাগরণ, দুইই যেমন জীবনের বিরোধী—তেমনি ভাবি সৃষ্টির সহিত সম্বন্ধ-রহিত প্রলয় অথবা ভাবি প্রলয়ের সহিত সম্বন্ধ-রহিত সৃষ্টি দুইই জগৎসংসারের বিরোধী; এককথায় এই—স্থিতি-গতি বন্ধন-বিশ্লেষণ প্রভৃতি যে কিছু দ্বন্দ্ব-ব্যাপার সমস্তই আপেক্ষিক। জাগরণ, জীবন, বন্ধন, এ সমস্ত ব্যাপার স্থিতির দলে,—নিদ্রা, মৃত্যু, বিশ্লেষণ এ সমস্ত ব্যাপার প্রলয়ের দলে,—আর পুনর্জ্জাগরণ, পুনর্জ্জীবন, পুনর্ম্মিলন, এসমস্ত ব্যাপার সৃষ্টির দলে; এইরূপ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ব্যাপার—বন্ধন বিশ্লেষণ এবং পুনর্ম্মিলনের ব্যাপার—জগতের সকল ঘটনাতেই স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, সপ্তক-শ্রেণী যাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, বন্ধন এবং বিশ্লেষণই তাহার মূল বৃত্তান্ত—সে যে কিরূপ তাহা এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক প্রদর্শন করা যাইতেছে।

যে কোন বস্তু হউক্ না কেন—আর আর সমুদায় বস্তু-হইতে তাহাকে বিশ্লেষিত করিয়া না দেখিলে "এই একটি বস্তু" এরূপ করিয়া তাহাকে আমরা স্পষ্ট রূপে অবধারণ করিতে পারি না; তাহা কি একেবারেই স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র বস্তু—না আর আর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত, ইহা পরের কথা, আপাতত তাহাকে স্বতন্ত্র একটি বস্তু বলিয়া ত ধরা যাউক্ তাহার পরে তাহার সহিত কাহার কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অবধারণ করিবার চেষ্টা দেখা যাইবে; পরে যদি বুঝি যে, তাহা স্বতন্ত্র বস্তু নহে পরন্তু অন্য একটি ব্যাপক বস্তুর অন্তর্গত, তখন পূর্ব্ব-সিদ্ধান্তের ভ্রমাংশটুকু তদনুসারে সংশোধন করিয়া লওয়া যাইবে—এই

ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য সকল বস্তু-হইতে—সমুদায় জগৎ-হইতে—আপনাকে বিশ্লেষিত করিয়া পৃথক্-বস্তু-রূপে সমর্থন করা—আপনার স্পষ্ট অভিব্যক্তি সাধন করা—উন্নতির প্রথম প্রকরণ। কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে অন্যের সম্বন্ধেই আপনার অভিব্যক্তি-সাধন সম্ভবে, আপনার আপনিত্ব সাধন করিতে হইলে অন্যের অন্যত্ব সাধন করা সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক হয়—সুতরাং আপনাকে অন্য-হইতে সহস্র বিশ্লেষিত করিলেও অন্যের সহিত আপনার সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইবার নহে। অতএব অন্য-হইতে আপনাকে যে বিশ্লেষিত করা তাহা কতক দূর পর্য্যন্তই ভাল, তাহার ওদিকে গেলে তাহা স্বভাব-বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়া পড়ে; মিলনের আনন্দ স্পষ্ট-রূপে উপভোগ করিতে হইলে তৎপূর্ব্বে কিছু-কালের জন্য বিচ্ছেদের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক বটে কিন্তু তাহা বলিয়া এমন বিচ্ছেদ কাহারো স্পৃহনীয় হইতে পারে না—যাহার সহিত ভাবী মিলনের কোন সম্পর্কই নাই; বীণার তার হইতে সুর বাহির করিতে হইলে তাহাকে অঙ্গুলি-তাড়না-দ্বারা, যেমন প্রসারণ করিতে হয়, তেমনি আবার প্রসারণের পরেই সঙ্কুচন আসিবে এটির প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়,—কেননা প্রসারণের অনুচিত মাত্রাধিক্য হইলেই তার ছিঁড়িয়া গিয়া সমস্তই ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।

অতএব বিশ্লেষণের অর্থ আর কিছু নয়, কেবল আগমিষ্যৎ বন্ধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। প্রথম বয়সে মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই যে, সংসার-হইতে পৃথক্ থাকিয়া, নির্লিপ্ত থাকিয়া, সংসারের জন্য প্রস্তুত হওয়া; স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যা অর্থ প্রভৃতি পাথেয়-সম্বল উপার্জ্জন করা—আপনার উপকার সাধন করা;—অতএব এ-সময়ে অন্য-সমস্ত-হইতে আপনাকে বিশ্লেষিত করিয়া স্বকার্য্য-উদ্ধারে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বিশ্লেষণের মাত্রা-পূরণ হইলেই বন্ধনের পালা উপস্থিত হয়, এবং এমনি নির্ব্বিবাদে বন্ধন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে যে, বন্ধনকে বিশ্লেষণ-হইতে পর বলিয়া মনে হয় না।

মনুষ্য প্রথম-বয়সে আপনাকে সমুদায় জগৎ-হইতে ভিন্ন করিয়া প্রতিপাদন করে, পারত-পক্ষে অন্যের অধীনতা স্বীকার করিতে চায় না; সচরাচর লোকে এই ভাবের উপর ভর করিয়া কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত বিদ্যা এবং অর্থ-সম্পত্তি উপার্জ্জন-পূর্ব্বক আপনার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি সাধন করে; তাহার পরে সময়ের মাত্রা পূরণ হইলে যখন দম্পতি-প্রেম তাহার মনোমধ্যে প্রবেশ করে, তখন তাহার সে ভাবের একেবারেই ভাবান্তর হইয়া পড়ে,—অন্যের সহিত আপনার যোগের ভাব তখন স্পষ্টরূপে হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে; তখন দেখিতে পায় যে অন্যের সহিত জড়িতভাব আপনার স্বতন্ত্র ভাবের হন্তারক নহে, পরন্তু তাহার আরো পরিপোষক; ছায়া এবং আলোকের মিলন যেমন উভয়েরই

স্পষ্ট অভিব্যক্তির পোষকতা করে, দম্পতির মিলনও সেইরূপ।

প্রথমে ব্যক্তি-বিশ্লেষণ, তাহার পর দাম্পত্য-বন্ধন, তাহার পর সন্তান-সন্ততি বিশ্লেষণ; যদি বল যে, স্নেহবন্ধন কি বন্ধন নহে—কেমন করিয়া বলি তাহা বিশ্লেষণ! ইহার উত্তর এই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি বন্ধনের সহিত সম্পর্করহিত বিশ্লেষণ অথবা বিশ্লেষণের সহিত সম্পর্করহিত বন্ধন উভয়ই অসিদ্ধ; ব্যক্তি-বিশ্লেষণের কথা যাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি তাহার মধ্যে কি বন্ধনের ভাব কিছু মাত্র নাই? ব্যক্তি-বিশেষ যখন আর আর সমুদায় জগৎ হইতে বিশ্লেষিত হয়, তখন কি সমুদায় জগতের সঙ্গে সত্তা-সত্তাই তাহার কোন প্রকার যোগ থাকে না; জ্যোতিষ্ক জগতের সহিত যোগ থাকে না? না চন্দ্র সূর্য্যের সহিত যোগ থাকে না—না পৃথিবীর জল বায়ু মৃত্তিকার সহিত যোগ থাকে না—না রাজার সহিত যোগ থাকে না—না কৃষকের সহিত যোগে থাকে না—কাহার সহিত না তাহার যোগে থাকে? এমন কি কোন একটির অভাব হইলেই তাহার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না যে,আর আর সমুদায় জগৎ হইতে বিশ্লেষণের ভাবই তাহার ব্যক্তিত্বের মুখ্য উপাদান—সমুদায় জগতের সহিত তাহার বন্ধন আছে এবং তাহা ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুটও হইবে কিন্তু এখনকার এ সময়ে বন্ধনের ভাব আনুষঙ্গিক এবং বিশ্লেষণের ভাব মুখ্য-রূপ ধারণ করে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পিতা মাতার সহিত সন্তান-সন্ততির যে বন্ধন তাহা ত থাকিবেই কিন্তু পিতা মাতা হইতে তাহারা বহুধা-বিভিন্ন আকারে পরিণত হইয়া সৃষ্টির নূতনত্ব সম্পাদন করিবে এই দিকেই তাহাদের গতি; পিতামাতার বাৎসল্য-ভাবের মূলেও—সন্তানগণেতে আপনাদের গুণ ভিন্ন অন্যান্য নূতন-নূতন গুণের অভিব্যক্তি দেখিবার ইচ্ছা বিলক্ষণ কার্য্য করিতে থাকে; এরূপ যখন—তখন বিশ্লেষণই এখানকার প্রধান অঙ্গ তাহার আর সন্দেহ নাই।

এক মূল পরিবার হইতে যখন নানা শাখা-পরিবার বহুধা-বিভিন্ন হইয়া পরিণত হয়, তখন সৌহার্দ্দ-বন্ধনই তাহাদের সেই ভিন্নতার প্রতিবিধান করে; তাহারা এক আদর্শে গঠিত সুতরাং তাহারা সহস্র ভিন্ন হইলেও তাহাদের মধ্যেকার মূলগত ঐক্যটি বিলুপ্ত হইবার নহে; উক্ত আদর্শটি প্রত্যেক ব্যক্তিতে যদিও বিভিন্ন আকারে প্রতিফলিত হয়, তথাপি তাহা গোড়ায় এক এবং সেই আদর্শের মধ্য দিয়াই পরস্পর পরস্পরের ভাব-গ্রহণে সমর্থ হয়। সেই আদর্শটিই তাহাদের সকলকে এক বন্ধনে বাঁধিয়া রাখে; এইরূপ আদর্শ-মূলক বন্ধনের ভাবই বন্ধুতার প্রাণ-স্বরূপ। জাতীয় বন্ধনের মূলে জাতীয় আদর্শ, পারিবারিক বন্ধনের মূলে পারিবারিক আদর্শ, দল-বন্ধনের মূলে দলীয় আদর্শ থাকা চাই, তাহারই উপর জাতীয় বন্ধুতা, পারি-

বারিক বন্ধুতা এবং দলীয় বন্ধুতা নির্ভর করে।

সৌহার্দ্দবন্ধনের মধ্যে যে একটি মূলের আদর্শ আছে তাহা শাখাগত ভিন্নতার মধ্যেই প্রতিভাত হয়; সেই ভিন্নতার মাত্রা বাহুল্য-বশত উক্ত আদর্শের একত্বটি কালক্রমে দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়িতে পারে; তাহা যাহাতে না হয় এজন্য শাখা-প্রশাখা যত বিস্তৃত হয় মূল আদর্শের প্রতি ততই বিশেষ রূপে প্রণিধান করা আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান সমাজ পিতৃ পুরুষদিগের আদর্শে গঠিত, কিন্তু গোড়ার সেই আদর্শ নানা প্রকার শাখা-সংস্কারের সহিত জড়িত হইয়া কালক্রমে তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে; তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য সেই আদর্শকে উক্ত শাখা-সংস্কার-সকল-হইতে বিশ্লেষিত করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি সমর্পণ করা আবশ্যক। উন্নতির আর এক নাম—অভিব্যক্তি; যাহা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাবে—জড়িত ভাবে—অবস্থিতি করে তাহাকে ব্যক্ত ভাবে পরিণত করাই উন্নতি। নিউটন বিজ্ঞানের যৎপরোনাস্তি উন্নতি করিয়াছেন ইহা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন তাহা-হইতে বাজে ডালপালা গুলি বাদ দিয়া সার সত্য-গুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন মাত্র। আমাদের দেশের এক জন পুরাতন জ্যোতির্বেত্তা তাঁহার গ্রন্থে তারাকর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা ত প্রত্যক্ষ-প্রমাণ; নিউটনের পূর্ব্বে ইউরোপ-দেশে ও-তত্ত্বটির একেবারেই যে কোথাও কোন উল্লেখ ছিল না ইহাও সম্ভব বোধ হয় না; কিন্তু নিউটন যেমন স্পষ্ট করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্ব-আচার্য্যদিগের মধ্যে কেহই তাহার দিকেও ঘেঁসিতে পারেন নাই—নিউটন তাঁহার পূর্ব্ব-আচার্য্যদিগের নিকট-হইতে ভক্তি পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা যেমন সত্য—ইহা তেমনি সত্য যে, তিনি যাহা কিছু করিয়াছেন সমস্তেরই পূর্ব্বাভাস তাঁহাদের স্থানে কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান ছিল; নিউটন যে-জায়গায় আকর্ষণ-বিক্ষেপ বলিয়াছেন, তাঁহার গ্রীকদেশীয় বৈজ্ঞানিক পূর্ব্ব-পুরুষেরা নয় সেই জায়গায় রাগ-দ্বেষ (Sympathy—Antipathy) বলিয়াছেন—তাহাতে কি আইসে যায়? এক জড়-বস্তু দূরস্থিত অন্য একটা জড়-বস্তুকে ধরিয়া টানিতেছে—আর শেষোক্ত বস্তু অনুরাগ বশতঃ পূর্ব্বোক্ত বস্তুর নিকটস্থ হইতেছে, একই কথা;—প্রথমত্ও মনের ধর্ম্ম রাগ-দ্বেষও মনের ধর্ম্ম, দুই ধর্ম্মই শুদ্ধ কেবল রূপকচ্ছলে জড়বস্তুতে প্রয়োগ করা হইতে পারে; কিন্তু সেই রূপক ভেদ করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে একই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব নিউটনের নূতন আবিষ্কার একেবারেই নূতন নহে; তবে কি—না পূর্ব্বে তাহা তমসাচ্ছন্ন অস্ফুট-ভাবে ছিল, তিনি তাহাকে সুব্যক্ত এবং জ্যোতির্ম্ময় ভাবে পরিণত করিয়াছেন—

ইহাতেই তাঁহার এত মহিমা। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রতি অবহেলা করিলে আমরা কখনই উন্নতি-লাভে সমর্থ হই না, পরন্তু সে-সকল বিষয়কে মাজিয়া ঘষিয়া জঞ্জাল-হইতে মুক্ত করাই উন্নতি-লাভের একমাত্র উপায়। মনে কর কোন ব্যক্তি আজ কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিল, কাল্ তাহার সহিত আর সম্পর্ক রহিল না—কাল শিল্প-কার্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল; পরশ্ব কৃষিকার্য্য গেল, শিল্পকার্য্য গেল, বাণিজ্য-ব্যবসায় শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, এইরূপ নিত্যই নূতন আরম্ভ, যাহার সহিত পুরাতনের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই তাহাতে মনুষ্য যত উন্নতি লাভ করে তাহা বুঝাই যাইতেছে; এ যেমন, তেমনি কোন সমাজ যদি পূর্ব্বের সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিয়া কেবল নূতন পথেই ধাবমান হয় তাহারো সেই দশা উপস্থিত হয়; যে আদর্শ-অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করা হয় সেই আদর্শ-অনুসারেই কার্য্যের উন্নতি-সাধন করিতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বের সঙ্গে পশ্চাতের মিল রাখা উন্নতি-সাধনের পক্ষে অতীব একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপার,—এমনি প্রয়োজনীয় যে তা নৈলেই নয়। আধুনিক বঙ্গ-সমাজের এখন নাকি বিকার-দশা উপস্থিত, তাই সমাজ-সংস্কার আর পূর্ব্ব-পুরুষদিগের প্রতি অভক্তি এ-দুই বিরোধী ব্যাপারকে অনেকে একাসনে বসাইতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না—সে যাহাই হউক—বড় বড় সমাজ-সংস্কারক-মাত্রেই পূর্ব্বপুরুষদিগের ভাব লইয়া তাঁহাদের অভীষ্ট কার্য্য আর-একরূপ উচ্চে অগ্রসর করিয়া দেন মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মঙ্গলই ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভক্তিকে মঙ্গল-দ্বারা নিয়মিত করা আবশ্যক; পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মন্দ-গুলি হইতে ভাল-গুলি বাছিয়া লওয়া আবশ্যক—আমাদের দেশের পূর্ব্বতন কোন মহর্ষি বলিয়াছেন "যানাস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরানি," আমাদের সুচরিত-গুলিই তোমা-কর্ত্তৃক উপাস্য, অন্য-গুলি নয়।

মূলের আদর্শকে শাখা-সংস্কার-সকলের জটিলতা হইতে বিশ্লেষিত করিয়া দেখা, উচ্চকে নীচ-হইতে, আত্মাকে শরীর-হইতে, পরমাত্মাকে জগৎ-হইতে, বিশ্লেষিত করিয়া দেখা, ভক্তির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক এ-জন্য বিশ্লেষণেরই এখানে সবিশেষ প্রধান্য স্বীকার করিতে হইবে। দম্পতি-বন্ধনের ফল যেমন সন্তান বিশ্লেষণ, সমাজ-বন্ধনের ফল সেইরূপ আদর্শ-বিশ্লেষণ; দম্পতি-বন্ধন হইতে যেমন সন্তান প্রসূত হয়, সমাজ-বন্ধন হইতে সেইরূপ উচ্চ-হইতে উচ্চতর আদর্শ (Idea) প্রসূত হইয়া বিজ্ঞানশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ভাষাশাস্ত্র, দর্শন-শাস্ত্র প্রভৃতি নানা আকারে পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মূলের সেই যে আদর্শ তাহা পদার্থটা কি? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞান-ধর্ম্ম-প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক-ভাবের অভিব্যক্তিই সমস্ত জগতের মূল আদর্শ, এবং সেই মূল আদর্শ

ব্যক্তি-বিশেষে, বংশ-বিশেষে, জাতি-বিশেষে প্রতিফলিত হইয়া বহুধা-বিচিত্র শাখা-আদর্শে পরিণত হয়; ইহাতে করিয়া শাখা-আদর্শ-সকলেতে মূল-গত একত্ব এবং শাখা-গত বৈচিত্র উভয়ের সংযোগ-সংঘটন হয়; এখন বক্তব্য এই যে, শাখাআদর্শ হইতে ক্রমশঃ মূল আদর্শের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করাই ভক্তি এবং মঙ্গলের পথ। আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তিই সমুদায় জগতের মূল আদর্শ, কিন্তু সে অভিব্যক্তি সমগ্ররূপে কোন দেশেই সম্ভবে না, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অংশেই সম্ভবে; এক কথায় এই যে, আধ্যাত্মিক ভাবের ঐকাংশিক অভিব্যক্তি ভিন্ন ঐকান্তিক অভিব্যক্তি সৃষ্টির কোন প্রদেশেই সম্ভবে না। একটা কোন সমাজ ধরা যাউক্—যেমন বঙ্গ-সমাজ;—বঙ্গ সমাজে আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি যে অংশে হইয়াছে তাহাই বঙ্গসমাজের সামাজিক আদর্শ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে; এবং বঙ্গ-সমাজের জন-সাধারণের মধ্যে যে-কিছু বন্ধুতার বন্ধন আছে তাহা কথিত সামাজিক আদর্শের উপরেই নির্ভর করে; বঙ্গ-সমাজের শাখা-আদর্শ-গুলির মধ্যে কোন্‌টি দেখিতে শুনিতে ভাল—সুরুচি সঙ্গত—সুন্দর, তাহার নির্ব্বাচন-কার্য্যে স্বভাবতই জন-সাধারণের প্রবৃত্তি যায়, এবং সেই সৌন্দর্য্য মূলক নির্ব্বাচনের গুণে কাল-ক্রমে নানা আদর্শের মধ্য হইতে বিশেষ কোন একটি আদর্শ বিশেষ মর্য্যাদা-ভাজন হইয়া দাঁড়ায়; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, সামাজিক সৌহার্দ্দ-বন্ধন সৌন্দর্য্য দ্বারাই নিয়মিত হয়। মূল আদর্শের শাখা-আদর্শ বলিয়া যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তাহাই সুন্দর-শব্দের বাচ্য;—মূল-আদর্শ অমূর্ত্ত—শাখা-আদর্শ তাহারই মূর্ত্তি-বিশেষ; অমূর্ত্ত আদর্শের মূর্ত্তিমান ভাবই সৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হয়;—কথা-বার্ত্তাতেই হউক্, আচার-ব্যবহারেই হউক্, আকার-অবয়বেই হউক্, ভাব-ভঙ্গিতেই হউক্, যাহাতে যে অংশে অমূর্ত্ত আদর্শ মূর্ত্তিমান হয় তাহা সেই অংশে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য্য-হইতে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে সেই অমূর্ত্ত আদর্শকে তাহার মূর্ত্তি-বিশেষ হইতে বিশ্লেষিত করিয়া তাহার প্রতি ভক্তি-সমর্পণ করা আবশ্যক——শাখা-সংস্কার-সকলের জটিলতা-হইতে সমাজের মূল পৈতৃক আদর্শ উদ্ধার করিয়া তৎপ্রতি ভক্তি-সমর্পণ করা আবশ্যক—ইহা ভিন্ন কোন সমাজেরই সামাজিক উন্নতির উপায়ান্তর নাই। সৌন্দর্য্য-হইতে মঙ্গলের দিকে উত্থান করা, এবং সৌন্দর্য্য-হইতে উচ্চতর সৌন্দর্য্যে উত্থান করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া—একই কথা;—সর্ব্বজগতে এক অদ্বিতীয় মূল আদর্শের মূর্ত্তিমান ভাবই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম সৌন্দর্য্য, ইহার কথা পরে আসিতেছে।

তাহার পরে আসিতেছে যে, সকল আদর্শই একই সার্ব্ব-ভৌমিক মূল-আদর্শের শাখা-প্রশাখা—সুতরাং প্রত্যেক শাখা-আদর্শের অভ্যন্তরেই মূল আদর্শ-

বর্ত্তমান, এবং মূল-আদর্শের মধ্যে সমস্ত শাখা-আদর্শ বর্ত্তমান; যে আদর্শ-অনুসারে জীবদেহে রক্ত-সঞ্চালন হইতেছে সেই আদর্শ-অনুসারে মহাকাশে গ্রহগণ সঞ্চরণ করিতেছে—প্রত্যেক আদর্শে সার্ব্বভৌমিক মূল-আদর্শ উপলব্ধি করিবার এই যে ভাব যাহা সমস্ত শাখা-আদর্শকে সার্ব্ব-ভৌমিক মূল-আদর্শ দ্বারা পরিবদ্ধ এবং পরিপূরিত দেখিতে চায়, ইহাই উন্নতি-সপ্তকের ষষ্ঠ ধাপ; এই ষষ্ঠ ধাপটিতে সর্ব্বভূতে পরমাত্মাকে এবং পরমাত্মাতে সর্ব্বভূতকে দর্শন করিবার ভাব, সার্ব্বলৌকিক বন্ধনের ভাব, অভিব্যক্ত হয়। সমস্ত কালের মধ্যে, সমস্ত আকাশের মধ্যে, অন্তর-বাহিরের মধ্যে, ভাব আবির্ভাবের মধ্যে, পরমাত্মা-জগতের মধ্যে কাহারো মধ্যে ব্যবধান নাই সকলের মধ্যে যোগ-সূত্র বহমান রহিয়াছে—সত্যের অনুমোদিত এই যোগের ভাবে উত্থান করা সাধনের চরম ফল।

যে ছয়টি ধাপ পরপর প্রদর্শিত হইল তাহা দুই থাকে বিভক্ত—প্রথম থাকটি নিম্নগামী অর্থাৎ কারণ-হইতে কার্য্যের দিকে তাহার লক্ষ্য—এবং দ্বিতীয় থাকটি ঊর্দ্ধগামী অর্থাৎ কার্য্য হইতে কারণের দিকে তাহার লক্ষ্য। সাংখ্য-ভাষায় প্রথম থাকটি অনুলোম-পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় থাকটি প্রতিলোম-পদ্ধতি বলিয়া উক্ত হয়। কারণ হইতে কার্য্যোৎপত্তি হইবার জন্য যে-টি চাই তা' এই—কার্য্যোৎপাদন-ক্ষম বিশ্লেষিত ব্যক্তিদ্বয়ের সম্মিলন, কেননা কেবলমাত্র বিশুদ্ধ-এক-হইতে কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না,—দুয়ের সম্মিলন-জনিত যে, এক, সেই-এক-হইতেই কার্য্য প্রসূত হয়; শুদ্ধ কেবল বীজ অথবা শুদ্ধ কেবল মৃত্তিকাদি—বৃক্ষোৎপত্তির কারণ নহে, পরন্তু উভয়ের সংযোগই বৃক্ষোৎপত্তির কারণ; শুদ্ধ কেবল আত্মা অথবা শুদ্ধ কেবল শরীর দর্শন-শ্রবণাদির কারণ নহে, পরন্তু উভয়ের সংযোগই তাহাদের কারণ; অতএব কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে প্রথমতঃ ব্যক্তি-দ্বয়ের বিশ্লেষণ দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি-দ্বয়ের বন্ধন এই দুইটি প্রকরণ নিতান্তই আবশ্যক; কাজেই প্রথম থাকটিকে তিনটি ধাপে বিভক্ত হইতে হইয়াছে—যথা

১ ব্যক্তি-বিশ্লেষণ

২ দাম্পত্য-বন্ধন

৩ সন্তান-বিশ্লেষণ

এই গেল অনুলোম-পদ্ধতি; প্রতিলোম-পদ্ধতি কি? না কার্য্যেতে কারণ-মূলক আদর্শের যে মূর্ত্তিমান-ভাব তাহা হইতে উক্ত আদর্শের সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে উত্থান করা, ইহাকেই বলে কার্য্য-হইতে কারণে উত্থান করা। সন্তান-উৎপাদনই অনুলোম-পদ্ধতির চরম তাৎপর্য্য, পিতা মাতার বিশেষ-গুণ-গুলি বিশেষ-বিশেষ দেশ-কাল-অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া সন্তানগণেতে বিশেষ-বিশেষ রূপে প্রতিফলিত হয়, সুতরাং বর্ত্তমান পদ্ধতির গতি বিশেষ হইতে বিশেষের দিকে; প্রতিলোম-পদ্ধতির গতি ঠিক তাহার বিপরীত দিকে—সাধারণ হইতে সার্ব্বভৌমিকের দিকে; প্রথমতঃ সমাজ-বন্ধনের লক্ষ্য সাধারণের

প্রতি—জন-সাধারণের প্রতি ; জন কি ? না যে ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে—(এখানকার পরিভাষা-মতে) বিশেষ হইতে বিশেষে পরিণত হইয়াছে ; সাধারণ কি ? না যাহা তাহাদিগকে এক-সঙ্গে ধারণ করিয়া রাখে—বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে না দেয়—এমনি সকল ঐক্যবন্ধনের আদর্শ ; দ্বিতীয়তঃ সমাজের উন্নতি-সাধন করিতে হইলে সেই আদর্শ-গুলিকে বাজে ডাল-পালা হইতে বিশ্লেষিত করিয়া লোকের চক্ষে ধারণ করা আবশ্যক ; প্রথম সমাজ-বন্ধন-কালে লোকেরা সাধারণ আদর্শ এবং তাহার বিশেষ বিশেষ অবয়ব উভয়কে স্থূল-দর্শিতা-হেতু একাকার দেখে ; বাল্মীকি রামের চরিত্র এরূপ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—যেন আধ্যাত্মিক আদর্শও যা রামও তা—দুয়ের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ নাই ;—আদর্শ এবং আদৃষ্টের মধ্যে এই রূপ যে একটি লপেট্-ভাব ইহা সৌন্দর্য্য-প্রধান—ইহা হইতেই কবিদিগের কাব্য উচ্ছ্বসিত হয় ; এখন যেমন সংবাদ-পত্র সমাজের নিয়ামক, পূর্ব্বে সেইরূপ কবিদিগের কাব্য এবং গান সমাজের নিয়ামক ছিল—কিন্তু এরূপ অবস্থা চিরকাল টেঁকিতে পারে না ; তাহার কারণ এই যে, লোকের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মধ্যে গুণ-বৈচিত্র্যেরও বৃদ্ধি হইতে থাকে—এবং সেই বৈচিত্র্যের আধিক্য প্রযুক্ত একত্বের আদর্শ-গুলি ঢাকা পড়িয়া যায় ; এই সময়ে ক্ষমতাবান্ ব্যক্তিরা উক্ত বৈচিত্র্যের মধ্য-হইতে সেই আদর্শ-গুলিকে উদ্ধার করিবার জন্য সচেষ্ট হন—এই সময়ে মনুর ন্যায় ব্যক্তিরা রাজ্য-শাসনের আদর্শ-গুলিকে তাহার বিশেষ-বিশেষ অবয়ব-সকল হইতে বিশ্লেষিত করিয়া শাস্ত্র-পদবীতে উত্তোলন করেন (শাস্ত্রের অর্থ আর কিছু নয় শাসন-প্রণালী,) ব্যাসের ন্যায় ব্যক্তিরা তত্ত্বজ্ঞানের আদর্শগুলিকে তাহার আশপাশের জটিলতা হইতে বিশ্লেষিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ সেই আদর্শগুলি সমুদায় জন-সাধারণের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে প্রবেশ করত প্রভূত বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব-সাধন করে—এইখানে পৌঁছিলেই জন-সমাজ রীতিমত একটা আড্ডায় পৌঁছে।

অতএব প্রতিলোম পদ্ধতিরও অবয়ব তিনটি, কি ? না কার্য্যেতে কারণ-ঘটিত আদর্শের মূর্ত্তিমান ভাব, কার্য্য হইতে উক্ত আদর্শের বিশ্লেষণ এবং কার্য্য-সকলেতে কারণের সর্ব্বময় ভাব; এই তিনটি ভাব নিম্ন-স্থিত তিনটি ধাপে পরিণত হয়, যথা—

১ আদর্শ-মূলক বন্ধন
২ আদর্শ-বিশ্লেষণ
৩ সার্ব্বভৌমিক বন্ধন

যেমন বীণা-তন্ত্রী অঙ্গুলি-তাড়িত হইলে তাহা এক-দিক্-হইতে অন্য-দিকে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে সেই রূপ জগৎ-সংসার অনুলোম-পদ্ধতি-হইতে প্রতিলোম পদ্ধতিতে এবং প্রতিলোম পদ্ধতি-হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করে ; অতএব নিম্নে উক্ত পদ্ধতিদ্বয় পার্শ্বাপার্শ্বি সন্নিবেশিত হইল, এবং তাহাদিগকে যথা

ক্রমে সা রে গা মা পা ধা উপাধি দ্বারা চিহ্নিত করা হইল, যথা

অনুলোম-পদ্ধতি	প্রতিলোম-পদ্ধতি
সা—ব্যক্তি-বিশ্লেষণ	মা—বন্ধুতা-বন্ধন
রে—দাম্পত্য-বন্ধন	পা—আদর্শ-বিশ্লেষণ
গা—সন্তান-বিশ্লেষণ	ধা—সার্ব্বভৌমিক বন্ধন

এখন সপ্তম-সুর-নিখাদ কি তাহা দেখা যাউক; প্রতিলোম-পদ্ধতি হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে আরোহণ করা চাই, অর্থাৎ প্রথম সপ্তকের মা-পা-ধা-হইতে দ্বিতীয় সপ্তকের সা-রে-গাতে উত্থান করা চাই, কিন্তু এই প্রকার প্রতিলোম-পদ্ধতি-হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে আরোহণ করিতে হইলে নিখাদ-সুরের মধ্যস্থতা আবশ্যক হয়। সার্ব্বভৌমিক বন্ধনের ভাব মনুষ্যের আত্মাতে অভিব্যক্ত হইলে তাহার ব্যক্তিত্বের হানি হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত সত্যের আলোকে তাহার স্বতন্ত্র-সত্তা পূর্ব্বাপেক্ষা আরো জাজ্বল্যরূপ ধারণ করে; সার্ব্বভৌমিক বন্ধনের সহিত উচ্চতর ব্যক্তি-বিশ্লেষণের যে সংশ্লিষ্ট ভাব তাহাই প্রতিলোম পদ্ধতি হইতে উচ্চতর অনুলোম-পদ্ধতিতে আরোহণ করিবার সোপান—তাহাই নিখাদ-সুর; পরব্রহ্মের মহান্ ভাবের প্রতি প্রতিলোম পদ্ধতির লক্ষ্য, জীবের আত্ম-প্রভাবের প্রতি অনুলোম-পদ্ধতির লক্ষ্য, উপরি-উক্ত সপ্তম সুরে উঠিলে দুই পদ্ধতির সন্ধিস্থল পাওয়া যায়,—সেই সন্ধিস্থল——যেখানে আত্মপ্রভাব এবং দেব-প্রসাদ পরস্পর পরস্পরের আকর্ষণে মিলিত হইয়া অভেদ বৎ প্রতীয়মান হয়; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ এইরূপ পাওয়া যাইতেছে

অনুলোম পদ্ধতি	প্রতিলোম পদ্ধতি
সা—ব্যক্তি-বিশ্লেষণ	মা—বন্ধুতা-বন্ধন
রে—দাম্পত্য-বন্ধন	পা—মূল-আদর্শ বিশ্লেষণ
গা—সন্তান-বিশ্লেষণ	ধা—সার্ব্বভৌমিক-বন্ধন

নি—উভয়-পদ্ধতির সন্ধিস্থান

অষ্টম সা—উচ্চতর ব্যক্তি-বিশ্লেষণ অর্থাৎ উচ্চতর অভিব্যক্তি-সাধন; এই সা হইতে আবার উচ্চতর রে গা মা পা প্রভৃতি চলিবে এবং তাহারও অষ্টম সা হইতে আরো উচ্চতর রে গা মা প্রভৃতি চলিবে—উন্নতি-সপ্তকের অনন্ত প্রবাহ কোন-কালেই অন্ত হইবার নহে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে বন্ধন-বিশ্লেষণের পর্য্যায়-ক্রম এবং অনুলোম-প্রতিলোম পদ্ধতির পর্য্যায়-ক্রম মিলিত হইয়া সপ্তক উৎপাদন করে; আর এক কথা এই যে তিনটি ত্রিত্ব মিলিয়া একটি সপ্তক হয়, যথা (১) অনুলোম-পদ্ধতির তিনটি ধাপ; (২) প্রতিলোম পদ্ধতির তিনটি ধাপ; (৩) অনুলোম পদ্ধতি, প্রতিলোম-পদ্ধতি;—এবং উভয়ের সন্ধিস্থল এই তিনটি ধাপ, এই তিনটি ত্রিত্ব।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

গত বৃহস্পতিবারে House of Commons-এ ভারতবর্ষ নিয়ে খুব বাদানুবাদ চোলেছিল, সে দিন ব্রাইট সিভিল সর্ভিস্ সম্বন্ধে ও গ্লাড্‌ষ্টোন তুলা-জাতের শুল্ক ও আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয়দের দরখাস্ত দাখিল করেন। ৪ টার সময় পার্লামেণ্ট খোলে; আমরা কতকগুলি বাঙ্গালী মিলে ৪টে না বাজ্‌তে বাজ্‌তে হৌসে গিয়ে উপস্থিত হলেম; তখনো হৌস খোলে নি, দর্শনার্থীরা হৌসের বাইরে একটা প্রকাণ্ড ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরের চার দিকে Burke, Fox, Chatham Walpole, প্রভৃতি রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষদের প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে রোয়েছে, প্রতি দরজার কাছে পাহারাওয়ালা পাকাচুলের পরচুলা-পরা, গাউন-ঝোলানো পার্লামেণ্টের কর্ম্মচারীরা হাতে দুই একটা খাতা পত্র নিয়ে আনাগোনা কোরছিলেন। তাঁদের মনে কি ছিল, আমি অবিশ্যি ঠিক কোরে বোল্‌তে পারিনে, কিন্তু তাঁদের সেই ভ্রূক্ষেপ-শূন্য মুখের ভাব দেখে আমার কল্পনা হোচ্ছিল, যেন তাঁরা মনে মনে দর্শনার্থীদের বোল্‌ছিলেন, "আমাদের দিকে একবার চেয়ে দেখ, আজকের কি হবে না হবে তাই দেখ্‌বার জন্যে তোমরাত দুয়ারের কাছে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছ, কিন্তু আমরা তা' সমস্ত জানি, এখন কিছু ভাংচিনে, ক্রমে ক্রমে সব টের পাবে।" তাঁদের দেখে আমার কি মনে পোড়ল জান? আমাদের দেশের গ্রেট্‌ন্যাশনেল্ থিয়েটরে যখন এঁপনো যবনিকা ওঠেনি, দর্শকেরা সব বোসে আছে, তখন ষ্টেজের সেই পাশের দরজা দিয়ে দুই একজন ষ্টেজ্‌সংক্রান্ত লোক একবার ষ্টেজ্ থেকে বেরোচ্ছেন, একবার ষ্টেজের মধ্যে ঢুকচেন, যেন তাঁরা দর্শকদের জানাতে চান "তোমরা ত এ ষ্টেজের মধ্যে ঢুক্‌তে পার না, এর ভিতরে কি হোচ্চে কিছুই জান না, ঐ বেঞ্চিগুলো পর্য্যন্তই তোমাদের অধিকারের সীমা।" এই রকম তাঁদেরও সেই মহা রহস্যময় মুখের ভাব। এই উইগ-গাউন্-পরা ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্টের ক্লার্ক্। এঁদের হাতের কাগজ পত্রগুলো দেখ্‌লে গা-টা কেঁপে ওঠে। চারটের সময় হৌস্ খুলল। আমাদের কাছে Speaker's galleryর টিকিট ছিল। House of Commons-এ ৫ শ্রেণীর গ্যালারী আছে,—Stranger's gallery, Speaker's gallery, Diplomatic gallery, Reporter's gallery, lady's gallery—হৌসের যে কোন মেম্বরের কাছ থেকে বৈদেশিক গ্যালারির টিকিট পাওয়া যায়, আর, বক্তার অনুগ্রহ হোলে তবে বক্তার গ্যালারির টিকিট পাওয়া যেতে পারে। diplomatic galleryটা কি পদার্থ তা ভাল

কোরে বোল্‌তে পারিনে, আমি যে-কবার হৌসে গিয়েছি, দুই এক জন ছাড়া diplomatic galleryতে লোক দেখ্‌তে পাই নি। Stranger's gallery থেকে বড় ভাল দেখা শুনো যায় না, তার সামনে Speaker's gallery, speaker's galleryর সুমুখে diplomatic gallery। আমরা গ্যালারিতে গিয়ে ত বোসলেম। পরচুলা-ধারী speaker মহাশয় গরুড় পক্ষীটির মত তাঁর সিংহাসনে গিয়ে বোস্‌লেন। হৌসের সভ্যেরা-সব আসন গ্রহণ কোরলেন। কাজ আরম্ভ হোল। হৌসের প্রথম কাজ প্রশ্নোত্তর করা। হৌসের পূর্ব্ব অধিবেশনে এক এক জন মেম্বর বোলে রাখেন যে আগামী বারে আমি অমুক অমুক বিষয়ে জিজ্ঞাসা কোরব, তার উত্তর দিতে হবে। একজন হয়ত জিজ্ঞাসা কোরলেন, অমুক জেলায় একজন মাজিস্ট্রেট অমুক আইন-বিরুদ্ধ কাজ কোরেছেন, সেক্রেটরী মহাশয় তার কি কোন সংবাদ পেয়েছেন, আর সে বিষয়ে কি কোন বিধান কোরে-ছেন? এবিষয়ে যিনি দায়ী, তিনি উঠে তার একটা কৈফিয়ৎ দিলেন। সেদিন O'donnel নামে একজন Irish member উঠে জিজ্ঞাসা কোরলেন যে, "Echo এবং আরো দুই একটি খবরের কাগজে জুলুদের প্রতি ইংরাজ সৈন্যদের অত্যাচারের যে বিবরণ বেরিয়েছে, সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট কি কোন সংবাদ পেয়েছেন? আর সে সকল অত্যাচার কি খৃষ্টানদের অনুচিত নয়?" অমনি গবর্ণমেণ্টের দিক থেকে সার্ মাইকেল্ হিকস্‌বিচ্ উঠে ওডোনেলকে খুব কড়া কড়া দুই এক কথা শুনিয়ে দিলেন, অমনি একে একে যত আইরিষ্ মেম্বর ছিলেন, সকলে উঠে তার কড়া কড়া উত্তর দিতে লাগ্‌লেন, এই রকম অনেক ক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি কোরে দুই পক্ষ শান্ত হোয়ে বোস-লেন। এইরূপ উত্তর প্রত্যুত্তরের ব্যাপার সমস্ত হোলে পর যখন বক্তৃতা করবার সময় এল, তখন হৌস থেকে অধিক অংশ মেম্বর উঠে চোলে গেলেন। দুই একটা বক্তৃতার পর ব্রাইট উঠে সিভিল সর্ভিসের রাশি রাশি দরখাস্ত হৌসে দাখিল কোর-লেন। বৃদ্ধ ব্রাইট্‌কে দেখ্‌লে অত্যন্ত ভক্তি হয়, তাঁর মুখে ঔদার্য্য ও দয়া যেন মাখানো; ব্রাইট্‌কে যখন আমি প্রথম দেখি, যখন আমি তাঁকে ব্রাইট্ বোলে চিনতেম না, তখন অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর মুখ থেকে আমি চোখ্ ফেরাতে পারি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রাইট্ সে দিন কিছু বক্তৃতা কর্‌লেন না। হৌসে অতি অল্প মেম্ব-রই অবশিষ্ট ছিলেন, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার আয়োজন কোর-ছিলেন, এমন সময়ে গ্লাডষ্টোন উঠ্‌লেন; গ্লাডষ্টোন্ ওঠবামাত্রেই সমস্ত ঘর একবারে ঘোর নিস্তব্ধ হোয়ে গেল, গ্লাডষ্টোনের স্বর শুনতে পেয়ে আস্তে আস্তে বাইরে থেকে দলে দলে মেম্বর আস্‌তে লাগ্‌লেন, দুই-দিকের বেঞ্চি পুরে গেল। তখন পূর্ণ উৎসের মত গ্লাডষ্টোনের বক্তৃতা উৎসা-রিত হোতে লাগ্‌ল, সে এমন চমৎকার যে কি বল্‌ব! কিছুমাত্র চীৎকার, তর্জ্জন গর্জ্জন

ছিল না, অথচ তাঁর প্রতি কথা, ঘরের যে-খানে যে কোন লোক বোসেছিল, সকলই একেবারে স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছিল। গ্ল্যাড-ষ্টোনের কি এক রকম দৃঢ় স্বরে বল্‌বার ধরণ আছে, তাঁর প্রতি কথা মনের ভিতর গিয়ে যেন জোর কোরে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়। একটা কথায় জোর দেবার সময় তিনি মুষ্টি-বদ্ধ কোরে একেবারে নুয়ে নুয়ে পড়েন, যেন প্রত্যেক কথা তিনি একেবারে নিংড়ে নিংড়ে বের কোরচেন। আর সেই রকম প্রতি জোর-দেওয়া কথা দরজা ভেঙ্গে চুরে যেন মনের ভিতর প্রবেশ করে। আইরিষ্ মেম্বর সলিভানের সঙ্গে গ্ল্যাডষ্টোনের বাগ্মিতার তফাৎ কি জান? সলিভান খুব হাত পা নেড়ে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে, হুটপাট কোরে বোলে যান, তাঁর বক্তৃতা মনে লাগে বটে, কিন্তু সে ভাব বড় বেশিক্ষণ থাকে না, তাঁর তর্জ্জন গর্জ্জনও যেমন থামে, শ্রোতাদের মনও অমনি জুড়িয়ে যায়। কিন্তু গ্ল্যাডষ্টোন্ অনর্গল বলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রতি কথা ওজন-করা, তার কোন অংশ অসম্পূর্ণ নয়, তিনি বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্বরে জোর দিয়ে বলেন না, কেন না সে-রকম বলপূর্ব্বক বোল্‌লে স্বভাবতই শ্রোতাদের মন তার বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়ায়, তিনি যে কথায় জোর দেওয়া আবশ্যক মনে করেন, সেই কথাতেই জোর দেন, তিনি খুব তেজের সঙ্গে বলেন বটে, কিন্তু চীৎকার কোরে বলেন না; মনে হয় যা' বোল্‌ছেন, তাতে তাঁর নিজের খুব আন্তরিক বিশ্বাস। গ্ল্যাডষ্টোনের বক্তৃতাও যেমন থামল, অমনি হৌস্ শূন্যপ্রায় হোয়ে গেল, চুদিকের বেঞ্চিতে ৬।৭ জনের বেশী আর লোক ছিল না। গ্ল্যাডষ্টোনের পর স্মলেট্ যখন বক্তৃতা আরম্ভ কোরলেন; তখন দুই দিকের বেঞ্চিতে লোক ছিল না বোল্লেও হয়, কিন্তু তিনি ক্ষান্ত হবার পাত্র নন, শূন্য হাউস্‌কে সম্বোধন কোরে তিনি অত্যন্ত দীর্ঘ এক বক্তৃতা কোরেন, সেই অবকাশে আমি অত্যন্ত দীর্ঘ এক নিদ্রা দিই; দুই একজন মেম্বর, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কেউ বা পরস্পর গল্প কোর্‌ছিলেন, কেউবা চোখের ওপর টুপি টেনে দিয়ে ডিস্‌রেলীর পদচ্যুতির পর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হবার স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন! হৌসে Irish 'member'দের ভারি যন্ত্রণা; সে বেচারীরা যখন বক্তৃতা কর্‌তে ওঠে, তখন হাউসে যে অরাজকতা উপস্থিত হয়, সে আর কি বল্‌ব! চারদিক থেকে ঘোরতর কোলাহল আরম্ভ হয়, অভদ্র মেম্বরেরা হাঁসের মত 'ইয়া ইয়া' কোরে চেঁচাতে থাকে, বিদ্রূপাত্মক hear hear শব্দে বক্তার স্বর ডুবে যায়, এই রকম বাধা পেয়ে বক্তা আর আত্মসম্বরণ কোর্‌তে পারেন না, খুব জ্বোলে ওঠেন, আর তিনি যতই রাগ কোরতে থাকেন ততই হাস্যা-স্পদ হন। আইরিষ মেম্বরেরা এই রকম জ্বালাতন হোয়ে আজকাল খুব প্রতিহিংসা পরায়ণ হোয়েছেন। হাউসে যে কোন কথা ওঠে, প্রায় সকল বিষয়েই তাঁরা বাধা দেন, আর প্রতি প্রস্তাবে এক জনের পর আর

একজন কোরে উঠে দীর্ঘকালব্যাপী বক্তৃতায় হাউস্‌কে বিব্রত কোরে তোলেন। আমি ঠিক কোরে বোলতে পারিনে, যে, আইরিষ মেম্বরেরা আগে থাকতেই ঐ রকম আচরণ কোরতেন বোলেই অন্যান্য মেম্বরেরা তাঁদের প্রতি ঐ রকম অত্যাচার করেন, কি, অন্যান্য মেম্বরদের কাছে অত্যাচার সোয়ে সোয়ে আইরিষ মেম্বরেরা এই রকম প্রতিহিংসা তুলতে আরম্ভ কোরেছেন। আমার স্বভাবতই আইরিষ মেম্বরদের প্রতি টান, সুতরাং স্বভাবতই আমার বিশ্বাস হয় যে, পূর্ব্বোক্তটাই বেশী সম্ভব। এর কারণ সহজেই নির্দ্দেশ করা যায়, মনে কর, আইরিষদের অনুগ্রহ কোরে পার্লামেণ্টে স্থান দেওয়া হোয়েছে, আইরিষরা সেই অনুগ্রহ পেয়েই যদি শান্ত ছেলেগুলির মত হোসে বোসে থাকত, তাদের অস্তিত্ব আছে কি না আছে যদি জানা না যেত, তা হোলে অনুগ্রহ-কর্ত্তারা সন্তুষ্ট থাকতেন, কিন্তু তারাও যদি অন্যান্য মেম্বরদের মত বাদানুবাদ কোর্ত্তে থাকে, নিজের মত প্রকাশ করে, অন্য লোকের মত প্রতিবাদ করে, তা হোলে সকলের চোটে ওঠা খুব স্বাভাবিক। ইণ্ডিয়া-কৌন্সিলে যদি এক দল ভারতবর্ষীয় মেম্বর থাকে, আর তারা যদি ভূতের মত বোসে না থাকে, সকল কথাতেই "হাঁ" না দিয়ে যায়, আর সঙ্কুচিত স্বরে কিছু বোলতে গিয়ে অমনি গবর্ণমেণ্টের নীরব চোক্ রাঙ্গানি দেখে থত মত খেয়ে যদি না বোসে পড়ে, কিম্বা গবর্ণমেণ্টের উৎসাহজনক পিট-থাবড়া খেয়ে আহ্লাদে যদি গোলে না পড়ে, তাহোলে তাদের কি দুর্দ্দশা হয় মনে কোরে দেখ দেখি। তাহোলে দুদিন বাদেই তাদের ঘাড়ে হাতটি দিয়ে বলা হত, "বেরোও বেরোও বাপুগণ!" ইংলণ্ডে সভাদেশে, সমস্ত য়ুরোপের চোখের সামনে এমন ঘেটতে পারে না; একবার যখন তাদের অধিকার দিয়েছে, তখন আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। তুমি নিজে রাজি হোয়ে তাদের সমান অধিকার দিলে, বোল্লে যে, তোমাতে আমাতে আর বিভিন্নতা রইল না, তবে আজ কেন খুঁৎ খুঁৎ কর? কিন্তু লোকে তা' ক'রে থাকে। আমাকে যদি কোন লেখক, তার লেখা শোনাতে আসে, আর বিশেষ কোরে বলে যে, "তুমি খুব স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ কোরো, আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।" তা শুনেই যে, আমি স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করি তা' নয়, কেন না, আমি মনে করি ও-ব্যক্তি অত কোরে বোলছে যখন, তখন ওর ধ্রুব বিশ্বাস যে, ওর লেখায় এমন কোন দোষ নেই, যা' আমি বের করতে পারি। আমি এখেনে দুজন ব্যক্তিকে বাঙ্গলা পড়াতেম, তাঁদের দুজনের মধ্যে যিনি একটু ভাল পড়তে পারতেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন, যে, আমাদের দুজনের মধ্যে কে শীঘ্র শিখতে পারে; আমি একটু ইতস্ততঃ করাতে তিনি বোল্লেন, "তোমার কিছু মাত্র ভয় নেই, আমাকে নিন্দে কোরলে আমার তিল মাত্র কষ্ট হবে না।" অত কোরে কেন বোল্লেন, জান? তিনি মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন যে, আমি তাঁর

প্রশংসা কোরবো। যিনি ভাল শিখতে পারতেন না, তিনি আমাকে ও-কথা জিজ্ঞাসাই কোরতেন না। এক দল বিজ্ঞ, বৃদ্ধ, তাঁদের সভায় আমাকে প্রবেশ কোরতে অনুমতি দিয়ে বোল্‌তে পারেন যে, আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোর্‌তে তোমাকে পূর্ণ অধিকার দিলেম, কিন্তু সমান ভাবে তর্ক বিতর্ক কোর্‌তে গেলে তাঁরা মনে মনে রাগ কোর্‌তে ত্রুটি করেন না। এর দুটো কারণ থাক্‌তে পারে; এক, তাঁরা যখন অধিকার দেন, তখন তাঁদের মনে মনে বিশ্বাস থাকে যে, বিজ্ঞতায় ও-বালকের চেয়ে আমরা এত শ্রেষ্ঠ যে, আমাদের কাছে ও ঠোঁট খুল্‌তে পারবে না; নয়, তাঁদের সকলের মত এই যে, বালকের কাছ থেকেও জ্ঞান শিক্ষা করা যায়, কিন্তু সে মতের চারা গাছটি তাঁদের মাথায় সবে জোন্মেছে মাত্র, তার ডাল পালা হৃদয় পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে নি; তাঁদের মত বটে যে, সকলকে সমভাবে দর্শন করা উচিত, কিন্তু সমভাবে দর্শন করা তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাঁদের মত যত ক্ষণ কার্য্য-ক্ষেত্রে না নাবে, তত ক্ষণ তাঁরা সকলের প্রতি সমান ব্যবহার কোরতে পারবেন, এই কল্পনার উপর বিশ্বাস কোরে তাঁরা দশ জনকে সমবেত কোরলেন, কিন্তু যেই তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার কোরতে আরম্ভ কোরলেন, অমনি তাঁরা দেখ্‌লেন তাঁদের বুকের ভিতরে লাগে। আমার স্পষ্ট বোধ হয়, ইংরাজ মেয়রদের সঙ্গে আইরিষ মেয়রদের এই রকম সম্পর্ক। পার্লামেণ্টের কথা তবে আজ এই পর্য্যন্ত থাক্‌।

এখন ইঙ্গ-বঙ্গ বোলে একটি অদ্ভুত নূতন জীবের বিবরণ বলি শোনো। "এই বেড়াল বনে গেলেই বন বেড়াল হয়।" তোমাদের সেই বন্ধু, যে "হংস মধ্যে বকো যথা" হোয়ে তোমাদের মধ্যে থাক্‌ত, যা'র বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাষ্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া কর্‌বার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে, তখন তার ফুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা, দেখে তোমরা আধখানা হোয়ে, পিছু হোটে হোটে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ বেতালের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি "Oberon" ফির্‌বে, যে তোমাদের প্রতিলোকের চোখে এমন একটি মায়া-রস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দ্দভ-মুখসিত "Bottom"-এর মতও দেখ্‌তে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হোয়ে যাবে।

বিলেতে নতুন এসেই বাঙ্গালীদের চোখে কোন্ জিনিষ ঠেকে, বিলিতি সমাজে নতুন মিশে প্রথমেই বাঙ্গালীদের কি রকম লাগে, সে সকল বিষয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আপাততঃ কিছু বোল্‌ব না। কেন না, এ সকল বিষয় আমার বিচার করবার অধিকার নেই। যাঁরা পূর্ব্বে

বিলেতে অনেক কাল ছিলেন, ও বিলেত যাঁরা খুব ভাল কোরে চেনেন, তাঁরা আমাকে সঙ্গে কোরে এনেছেন, ও তাঁদের সঙ্গেই আমি বাস কোরছি। বিলাতে আস্‌বার আগেই বিলেতের বিষয় তাঁদের কাছে অনেক শুনতে পেতেম, সুতরাং এখানে এসে খুব অল্প জিনিষ নিতান্ত নতুন মনে হোয়েছে, এখানকার লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে গিয়ে প্রতি পদে হুঁচট্ খেয়ে খেয়ে আচার ব্যবহার আমাকে শিখ্‌তে হয় নি। এখানকার সমাজের স্ফটিক-শালায় প্রবেশ কোরে, যখনি জল মনে কোরে কাপড় তুল্‌তে গিয়েছি, তখনি আমার সঙ্গী আমাকে চোখ টিপে বোলে দিয়েছেন "এ জল নয়, এ মেজে। সুতরাং আমাকে অপ্রস্তুত হোতে হয় নি। এখানকার চাকচিক্যময় সমাজের দেয়াল-ব্যাপী আয়না দেখে আমি দরজা মনে কোরে যেমন সেই দিকে যাবার উদ্যোগ কোরেছি, আমার সঙ্গী অমনি আমার কানে কানে বোলে দিয়েছেন যে, "এ দরজা নয়, এ দরজা নয়, এ দেয়াল!" সুতরাং মাথা ঠুকে ঠুকে আমাকে শিখ্‌তে হয় নি যে, সেটা দরজা নয়, দেয়াল। অন্ধকারে প্রথম এলে কিছু দেখা যায় না, অনেক ক্ষণ থাক্‌লে, অন্ধকার চোখে অনেকটা সোয়ে গেলে তার পরে চার দিকের জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু আমাকে সে রকম কোরে দেখ্‌তে হয়-নি, আমার সঙ্গেই আলো ছিল। আমি তাই ভাব্‌ছি যে, আমার নিজের অভিজ্ঞতার বিষয় আপাতত: তোমাদের কিছু বোল্‌ব না, এখানকার দুই এক জন বাঙ্গালীর মুখে তাঁদের যে রকম বিবরণ শুনেছি, তাই তোমাদের লিখ্‌ছি।

জাহাজে ত তাঁরা উঠ্‌লেন। যাত্রীদের সেবার জন্যে জাহাজে অনেক ইংরেজ চাকর থাকে, তাদের নিয়েই এঁদের প্রথম গোল বাধে। এঁরা অনেকে তাঁদের "সার্ সার্" (Sir বোলে সম্বোধন কোর্‌তেন, তাদের কোন কাজ কোর্‌তে হুকুম দিতে তাঁদের বাধো বাধো কোর্‌ত। জাহাজে তাঁরা অত্যন্ত সসঙ্কোচ ভাবে থাক্‌তেন। কোথায় কি কোর্ত্তে হবে যে বাপু, গোরা কাপ্তেন, গোরা মাঝি, পাছে রুখে দু কথা শুনিয়ে দেয়, নিতান্তই তাদের আশ্রয়ে আছি, কালো মানুষ দেখেও যে, টিকিট কিন্‌তে দিয়েছেন, এই তাঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ। তাঁরা বলেন, সকল বিষয়েই তাঁদের যে, ও রকম সঙ্কোচ বোধ হত, তার আর একটা কারণ ছিল—"এক জন ইংরাজ যাত্রীর চেয়ে আমাদের ওরকম সঙ্কোচের ত্রস্ত অবস্থা কেন হয়, জান? সেটা কেবল ভয়ে নয়, তার সঙ্গে কতকটা লজ্জাও আছে। আমাদের কপালে "নেটিব" বোলে একেবারে মার্কা মারা ছিল, আমরা যদি একটা কোন দস্তুর-বিরুদ্ধ কাজ করি, তা হোলে সাহেবরা হেসে উঠ্‌বেন, বলবেন ওটা অসভ্য, কিছু জানে না। তাই জন্যে যে কাজ কোর্ত্তে যাই, মনে হয়, পাছে এটা বেদস্তুর হোয়ে পড়ে, আর বেদস্তুর কাজ কোরলে তারা হট্ কোরে তাড়িয়েই বা দেয়, আর যদি বা তাড়িয়ে না দেয়, নেটিব

বোলে হেসেই না ওঠে ; " জাহাজে ইংরাজদের সঙ্গে মেশা বড় হোয়ে ওঠেনা । যে সাহেবেরা তখন জাহাজে থাকেন, তাঁরা টাটকা ভারতবর্ষ থেকে আস্‌চেন, সে " হজুর, ধর্ম্মাবতার " গণ কৃষ্ণবর্ণ দেখ্‌লে নাক তুলে, ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে চোলে যান, ও এই ঘোরতর তাচ্ছিল্যের স্পষ্ট লক্ষণগুলি সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ কোরে কৃষ্ণ-চর্ম্মের মনে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার কোরেছেন জেনে মনে মনে পরম সন্তোষ উপভোগ করেন । মাঝে মাঝে ভদ্র ইংরাজ দেখ্‌তে পাবে, যাঁরা হয়ত তোমাকে নিতান্ত সঙ্গীহীন দেখে তোমার সঙ্গে মিশ্‌তে চেষ্টা কোর্‌বেন, জান্‌বে তাঁরা যথার্থ ভদ্র, অর্থাৎ ভদ্র ও উচ্চ পরিবারের লোক, বংশাবলীক্রমে তাঁরা ভদ্রতার বীজ পেয়ে আস্‌চেন, তাঁরা এখানকার কোন অজ্ঞাত-কুল থেকে অখ্যাত নাম নিয়ে ভারতবর্ষে গিয়ে হঠাৎ ফেঁপে ফুলে ফেটে আট-খানা হোয়ে পড়েন নি । এখানকার গলিতে যে "জন জোন্স, টমাস্‌" গণ কিল্‌বিল্‌ কোর্‌চে, যাদের মা, বাপ, বোনকে, একটা কসাই, একটা দরজী, ও এক জন কয়লা-বিক্রেতা ছাড়া আর কেউ চেনে না, তারা ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে পদার্পণ করে, সে অঞ্চলে ঘরে ঘরে তাদের নাম রাষ্ট্র হোয়ে যায়, যে রাস্তায় তারা চাবুক হস্তে ঘোড়ায় চোড়ে যায় (হয়ত সে চাবুক কেবল মাত্র ঘোড়ার জন্যেই ব্যবহার হয় না) সে রাস্তা শুদ্ধ লোক শশব্যস্ত হোয়ে তাদের পথ ছেড়ে দেয়, তাদের এক একটা ইঙ্গিতে ভারতবর্ষের এক একটা রাজসিংহাসন কেঁপে ওঠে, এরকম অবস্থায় সে ছোকরাদের পেট উত্তরোত্তর ফুল্‌তে ফুল্‌তে যে, হস্তীর আকার ধারণ কোরবে, আমি ত তাতে বিশেষ অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পাইনে । তারা রক্ত মাংসের মানুষ বৈত নয়, যে দেশেই দেখ না কেন, ক্ষুদ্র যখনি মহান পদ পায়, তখনি সে চোক রাঙিয়ে, বুক ফুলিয়ে মহত্বের একটা আড়ম্বর, আস্ফালন কোরতে থাকে; এর অর্থ আর কিছু নয়, তারা মহত্বের শিক্ষা পায়নি । যে সাঁতার জানে না, তাকে জলে ছেড়ে দেও, সে অবিশ্রান্ত হাত পা ছুঁড়তে থাক্‌বে, তার কারণ, সে জানে না যে, ভেসে থাক্‌বার জন্যে অন্য কৌশল আছে । যে কোন-জন্মে ঘোড়া চালায় নি, তাকে ঘোড়া চালাতে দেও, ঘোড়া বিপথে গেলে সে চাবুক মেরে মেরেই তাকে জর্জ্জর কোরবে ; কেন না, সে জানে না যে, একটু লাগাম টেনে দিলেই তাকে সোজা পথে আনা যায় । কিন্তু ভদ্র ইংরেজদের দেখ, তাদের কি সুন্দর মন ! মাঝে মাঝে এক একটি ভদ্র সাহেবকে দেখা যায়, তাঁরা আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানদের ঘোরতর সংক্রামক রোগের মধ্যে থেকেও বিশুদ্ধ থাকেন, অপ্রতিহত প্রভুত্ব ও ক্ষমতা পেয়েও উদ্ধত গর্ব্বিত হোয়ে ওঠেন না । সমাজ-শৃঙ্খল ছিন্ন হোয়ে, সহস্র সহস্র সেবকদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে ভারতবর্ষে থাকা, উন্নত ও ভদ্র মনের এক প্রকার অগ্নি-পরীক্ষা । দূর হোক্‌গে—আমি কি

কথা বোলতে কি কথা পাড়লেম দেখ! যাহোক্, এতক্ষণে জাহাজ সাউদাম্পটনে এসে পৌঁচেছে, বঙ্গ যাত্রীরা বিলেতে এসে পৌঁছলেন। লণ্ডন উদ্দেশে চোল্লেন। ট্রেণ থেকে নাব্‌বার সময় একজন ইংরাজ গার্ড এসে উপস্থিত হোলো দরজা খুলে দিলে, অতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা কোল্লে, তাঁদের কি প্রয়োজন আছে, কি কোরে দিতে হবে। তাঁদের মোট নাবিয়ে দিলে, গাড়ি ডেকে দিলে; তাঁরা মনে মনে বোল্লেন "বাঃ! ইংরেজরা কি ভদ্র!" ইংরাজরা যে এত ভদ্র হোতে পারে, তা' তাঁদের জ্ঞান ছিল না; অবিশ্যি তার হস্তে একটি শিলিং গুঁজে দিতে হোল, কিন্তু তা হোক্, আমাদের দেশে শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে একটু আদর ও ভদ্রতা পাবার প্রত্যাশে রাজা রায় বাহাদুররা কত হাজার হাজার টাকা খরচ কোরচেন, তবুও ভাল কোরে কৃতকার্য্য হোতে পারচেন না; এ ভেবে এক জন নবাগত বঙ্গ যুবক এক জন যে-কোন শ্বেতাঙ্গের কাছ থেকে একটি মাত্র সেলাম পেতে, অকাতরে এক শিলিং ব্যয় কোর্ত্তে পারেন। যাহোক্ বিলেতে প্রথম পদার্পণ করবামাত্রেই তাঁরা এই অতি নতুন ও আশ্চর্য্য জ্ঞান লাভ করেন যে, ইংরাজরা কি ভদ্র! আমি যাঁদের বিষয় লিখছি, তাঁরা অনেক বৎসর বিলাতে আছেন, বিলেতের নানা প্রকার ছোট খাটো জিনিষ দেখে তাঁদের কি রকম মনে হোয়েছিল, তা' তাঁদের স্পষ্ট মনে নেই। যে সব বিষয় তাঁদের বিশেষ মনে লেগেছিল, তাই এখনো তাঁদের মনে আছে।

তাঁরা বিলেতে আস্‌বার পূর্ব্বে তাঁদের বিলিতি বন্ধুরা এখানে তাঁদের জন্যে ঘর ঠিক কোরে রেখেছিলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, ঘরে কার্পেট পাতা, দেয়ালে ছবি টাঙ্গানো, একটা বড় আয়না এক জায়গায় ঝোলানো রোয়েছে, কৌচ, কতক গুলি চৌকি, দুই একটা কাঁচের ফুলদানী, এক পাশে একটি ছোট পিয়ানো। কি সর্ব্বনাশ! তাঁদের বন্ধুদের ডেকে বোল্লেন, "আমরা কি এখেনে বড়-মানুষী কোর্ত্তে এসেছি? আমাদের বাপু বেশী টাকা কড়ি নেই, এরকম ঘরে থাকা আমাদের পোষাবে না!" তাঁদের বন্ধুরা অত্যন্ত আমোদ পেলেন, কারণ তখন তাঁরা একেবারে ভুলে গেছেন যে, বহুপূর্ব্বে তাঁদেরো এক দিন এই রকম দশা ঘোটেছিল; নবাগতদের নিতান্ত অল্পজীবী বাঙ্গালী মনে কোরে অত্যন্ত বিজ্ঞতার স্বরে সেই বন্ধুরা বোল্লেন, "এখানকার সকল ঘরই এই রকম!" তাঁরা বোল্লেন "বটে!" দেশের উপর বৈরাগ্যের এই তাঁদের প্রথম সূত্রপাত হোল। তাঁরা বলেন "আমাদের দেশে সেই একটা সেঁৎ-সেঁতে ঘরে একটা তক্তা ও তার উপরে একটা মাদুর পাতা, ইতস্ততঃ হুঁকোর বৈঠক রোয়েছে, কোমরে একটু খানি কাপড় জড়িয়ে জুতো জোড়া খুলে দুচার জনে মিলে শতরঞ্চ খেলা যাচ্চে, বাড়ির উঠোনে একটা গরু বাঁধা, দেয়ালে গোবর দেওয়া, বারান্দা থেকে ভিজে কা-

পড় শুকোচ্ছে, ইত্যাদি; সেখান থেকে এসে এ কার্পেট-মোড়া, চিত্রিত দেয়াল, চৌকি-টেবিল-সমাকুল ঘরে বাস কোরতে পাওয়া অনেক জন্মের অনেক তপস্যার ফল বোলে মনে হয়! তাঁরা বলেন, প্রথম প্রথম দিন কতক তাঁদের সে ঘর কেমন আপনার মত মনে হোত না, চৌকিতে বোস্‌তে, কৌচে শুতে, টেবিলে খেতে, কার্পেটে বিচরণ কোরতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হত। কৌচে বোস্‌তে হোলে অত্যন্ত আড়ষ্ট হোয়ে বোস্‌তেন, ভয় হোত, পাছে কৌচ ময়লা হোয়ে যায়, বা কোন প্রকার হানি হয়, তাঁদের মনে হোত, কৌচ-গুলো কেবল ঘর সাজাবার জন্যেই রেখে দেওয়া হোয়েছে, ও গুলো ব্যবহার কোরতে দিয়ে মাটি করা কখনই ঘরের কর্ত্তার অভিপ্রেত হোতে পারে না। ঘরে এসে প্রথম মনের ভাব ত এই, তার পরে আর একটি প্রধান কথা বলা বাকি আছে।

বিলেতে ছোটখাট বাড়িতে, "বাড়িওয়ালা" বোলে একটা জীবের অস্তিত্ব আছে হয়ত, কিন্তু যাঁরা বাড়িতে থাকেন, "বাড়িওয়ালী"-র সঙ্গেই তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক। ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া, কোন প্রকার বোঝা পড়া, আহারাদির বন্দোবস্ত করা, সে সমস্তই বাড়িওয়ালীর কাছে। আমার বন্ধুরা যখন প্রথম বাড়িতে পদার্পণ কোরলেন, দেখলেন এক বিবি এসে অতি বিনীত স্বরে তাঁদের "সুপ্রভাত" অভিবাদন কোরলে, তাঁরা নিতান্ত শশব্যস্ত হোয়ে তার ভদ্রতার যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়ে অতি আড়ষ্ট হোয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু যখন তাঁরা দেখ্‌লেন, তাঁদের অন্যান্য ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ তার সঙ্গে অতি অসঙ্কুচিত স্বরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, তখন আর তাঁদের বিস্ময়ের আদি অন্ত রইল না। মনে কর একটা জীবন্ত বিবি—জুতো-পরা, টুপি-পরা, গাউন-পরা! তখন সে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুদের উপর সেই নবাগত বঙ্গ যুবকের অত্যন্ত ভক্তির উদয় হোল, কোন্ কালে যে এই অসমসাহসিকদের মত তাঁদেরও বুকের পাটা জন্মাবে, তা তাঁদের সম্ভব বোধ হোল না। যা হোক্, এই নবাগতদের যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত কোরে দিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধুগণ স্ব স্ব আলয়ে গিয়ে সপ্তাহকাল ধোরে তাঁদের অজ্ঞতা নিয়ে অপর্য্যাপ্ত হাস্য কৌতুক কোরলেন। পূর্ব্বোক্ত গৃহকর্ত্রী প্রত্যহ নবাগতদের অতি বিনীত ভাবে, কি চাই না চাই জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে আস্‌ত। তাঁরা বলেন, এই উপলক্ষে তাঁদের অত্যন্ত আহ্লাদ হোত। তাঁদের মধ্যে একজন বলেন, প্রথম দিন যে দিন তিনি এই বিবিকে একটুখানি ধমকাতে পেরেছিলেন, সে দিন সমস্ত দিন তাঁর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল, জীবনের মধ্যে এই প্রথম একজন ইংরেজকে, একজন বিবিকে ধমকাতে পেরেছিলেন, অথচ সে দিন সূর্য্য পশ্চিম দিকে ওঠে নি, পর্ব্বত চলাফেরা কোরে বেড়ায়নি, বহ্নিও শীতলতা প্রাপ্ত হয় নি! কার্পেট-মোড়া ঘরে তাঁরা অত্যন্ত সুখে বাস কোরচেন। তাঁরা বলেন, "আমাদের দেশে আমার নিজের

ঘর বোলে একটা স্বতন্ত্র পদার্থ ছিল না; আমি যে ঘরে বোসতেম, সে ঘরে বাড়ির দশজনে যাতায়াত কচ্চে, আমি এক পাশে বোসে লিখচি, দাদা এক পাশে একখানা বই হাতে কোরে চুলচেন, আর এক দিকে মাদুর পেতে গুরু মশায় ভুলুকে উচ্চৈঃস্বরে সুর কোরে কোরে নামতা পড়াচ্চেন। এখানে আমার নিজের ঘর, আমার নিজের মনের মত কোরে সাজালেম, সুবিধামত কোরে বইগুলি এক দিকে সাজালেম. লেখবার সরঞ্জাম একদিকে গুছিয়ে রাখলেম, কোন ভয় নেই যে, এক দিন পাঁচটা ছেলে মিলে সে সমস্ত ওলটপালট কোরে দেবে; আর এক দিন ছুটোর সময় কালেজ থেকে এসে দেখব, তিনটে বই পাওয়া যাচ্চে না, অবশেষে অনেক খোঁজ খোঁজ কোরে দেখা যাবে বাড়ির ভিতরে মেজ মাসীমার কুলুঙ্গির উপর একখানা, দাদার বালিশের নীচে একখানা, আর এক খানি নিয়ে আমার ছোট ভাগ্নীটি তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহচরীদের ডেকে ছবি দেখতে মোরতর ব্যস্ত আছেন। এখানে তোমার নিজের ঘরে তুমি বোসে থাক, দরজাটি ভেজানো, সট্ কোরে না বোলে কোয়ে কেউ ঘরের মধ্যে এসে পড়ে না, ঘরে ঢোক্‌বার আগে দরজায় শব্দ করে, ছেলেপিলেগুলো চারদিকে চেঁচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দেয় নি, নিরিবিলি নিরালা, কোন হাঙ্গাম নেই।" স্বদেশের উপর ঘৃণা জন্মাবার সূত্রপাত এই রকম কোরে হয়! তার পরে একবার যখন তোমার মন বিগড়ে যায়, তখন তুমি খিটখিটে হোয়ে ওঠ, দেশের আর কিছুই ভাল লাগেনা, নানা প্রকার খুঁটিনাটি ধোরতে প্রবৃত্তি হয়। তার পরে যখন বিবিদের সমাজে মিশতে আরম্ভ কর, তখন দেশের উপর ঘৃণা বদ্ধমূল হোয়ে যায়। প্রায় দেখা যায়, আমাদের দেশের পুরুষরা এখানকার পুরুষ-সমাজে বড় মেশেন না; তার কতকগুলি কারণ আছে। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে এক-রকম বলিষ্ঠ স্ফূর্ত্তির ভাব থাকা চাই, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বাধো-বাধো নাকি সুরে ছুচারটে সসঙ্কোচ 'হাঁ না' দিয়ে গেলে চলেনা, খুব প্রাণখুলে কথা কওয়া চাই, পাঁচটা লোক দেখেই একেবারে অভিভূত হোয়ে পোড়েছি—এ রকম ভাব প্রকাশ না পায়; রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অবাধে তোমার স্বাধীন মত ব্যক্ত কোর্ব্বে, তোমাকে কেউ ঠাট্টা কোরলে তুমি অমনি সরমে মোরে গেওনা, তুমিও তোমার আলাপীর সঙ্গে ঠাট্টা কোরে মজা কোরে ঘর সরগরম কোর্‌বে, বহুদিনের পর তোমার পুরোণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলে "Hallow my old boy" বোলে খুব সরল সেক্‌হ্যাণ্ড কোরবে, আর খুব গড়গড় কোরে কথা কোয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের এ রকম ভাব প্রায় দেখা যায় না। বাঙ্গালী অভ্যাগত ডিনার-টেবিলে তাঁর পার্শ্বস্থ মহিলাটির কানে কানে অতি মৃদু ধীরস্বরে মিষ্টি মিষ্টি টুকরো টুকরো দুই একটি কথা আধ আধ গলানো সুরে কইতে পারেন, কোমল মধুর হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে, দুটো রস-গর্ভ বাক্য

বলতে পারেন, আর সে মহিলার সহবাসে তিনি যে, স্বর্গ-সুখ উপভোগ কোরচেন, তা তাঁর মাথার চুল থেকে বুট-জুতোর আগা পর্য্যন্ত প্রকাশ হোতে থাকে, সুতরাং বিবি-সমাজে বাঙ্গালীরা খুব পসার কোরে নিতে পারেন। এখানকার পুরুষ-সমাজে মিশতে গেলে অনেক পড়াশুনো থাকা চাই, নইলে অনেক কথায় অপ্রস্তুত হোতে হয়, একটা বড় কথা পোড়লে আমরা আমাদের পুরাতন চাণক্য ঋষির উপদেশ স্মরণ করি, অর্থাৎ "তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে!" কিন্তু পুরুষ সঙ্গীদের কথাবার্ত্তায় খুব যোগ না দিলে তেমন মেশামেশি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। মহিলাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে আমাদের বড় শিক্ষার দরকার করে না, সে বিষয় আমাদের অশিক্ষিত পটুত্ব। আমাদের দেশের ঘোমটাচ্ছন্ন-মুখচন্দ্র-শোভী অনালোকিত অন্তঃপুরে থেকে এখানকার রূপের মুক্ত জ্যোৎস্নায় এসে আমাদের মনচকোর প্রাণ খুলে গান গেয়ে ওঠে। একদিন আমাদের নবাগত বন্ধু যুবক তাঁর প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে গিয়েছেন। নিমন্ত্রণ সভায় বিদেশীর অত্যন্ত সমাদর। তিনি গৃহস্বামীর যুবতী কন্যা Miss অমুকের বাহুগ্রহণ কোরে আহারের টেবিলে গিয়ে বোস্‌লেন। মিসের প্রতি হাসি, প্রতি কথা তাঁর হৃদয়ের সমুদ্রে একটা বিপর্য্যয় তরঙ্গ তুলতে লাগল। আমরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে মুক্তভাবে মিশতে পাইনে, তার পরে নতুন নতুন এসে এখানকার স্ত্রীলোকদের ভাবও ঠিক বুঝতে পারিনে, আমরা কোন অপরিচিত মহিলার মুখ থেকে দুটো কথা শুনতে পেলে আহ্লাদে গোলে পড়ি, সামাজিকতার অনুরোধে তারা আমাদের মনোরঞ্জন করবার জন্যে যে সকল কথা বার্ত্তা হাস্যালাপ করে, আমরা তার ঠিক মর্ম্ম-গ্রহ কোরতে পারিনে, আমরা সহসা মনে করি, আমাদের ওপরেই এই মহিলাটির বিশেষ অনুকূল দৃষ্টি, নইলে এত হাসি, এত কথা কেন? যাহোক্, আমাদের বন্ধু যুবকটি তাঁর এই প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে এক জন মহিলা, বিশেষত একজন বিবির কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে মিষ্টহাসি ও মিষ্টালাপ পেয়ে অত্যন্ত উল্লসিত আছেন। তিনি মিস্‌কে ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত অনেক কথা বোল্লেন, বোল্লেন তাঁর বিলেত অত্যন্ত ভাল লাগে, ভারতবর্ষে ফিরে যেতে তাঁর ইচ্ছে করে না, ভারতবর্ষে অনেক প্রকার কুসংস্কার আছে; এ কথা বলার অভিপ্রায় এই যে, বিবিটির মনে বিশ্বাস হবে যে তিনি নিজে সমস্ত কুসংস্কার হোতে মুক্ত, শেষকালে দুই একটি মিথ্যে কথাও বোল্লেন; বোল্লেন, তিনি সুন্দর বনে বাঘ শিকার কোর্ত্তে গিয়েছিলেন, একবার নিতান্ত মোরতে মোরতে কেবল অসমসাহসিকতা কোরে বেঁচে গিয়েছিলেন। মিস্‌টি অতি সহজে বুঝতে পারলেন যে, এই যুবকের তাঁকে অতি ভাল লেগেছে, তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোলেন, ও তাঁর মিষ্টতম বাক্যবাণ যুবকের প্রাণে হান্‌তে লাগলেন। 'আহা কি গোছালো কথা! কোথায় আমাদের

দেশের মেয়েদের মুখের সেই নিতান্ত অলভ্য দুই একটি "হাঁ না," যা' এত মৃদু যে, ঘোমটার সীমার মধ্যেই মিলিয়ে যায়, আর কোথায় এখানকার বিম্বোষ্ঠ-নিসৃত অজস্র মধুধারা, যা' অযাচিত ভাবে মদিরার মত মাথার শিরায় শিরায় প্রবেশ করে!" প্রথম ডিনারের নিমন্ত্রণে আমাদের বঙ্গ যুবকের মনে এই কথা গুলি ওঠে। সেই দিনেই তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে চিঠিলেখা স্থগিত কোরলেন!

এখন তোমরা হয়ত বুঝতে পারচ, কি কি মস্‌লার সংযোগে বাঙ্গালী বোলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্গো-আঙ্গ্লিয়নি কিম্বা ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। আমি অতি সংক্ষেপে তার বর্ণনা কোরেছি, সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত কোরে লিখতে পারি নি। আমি তার বড় বড় দুই একটা কারণ দেখিয়েছি, কিন্তু এত সব ছোট ছোট বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে যে, সে সকল খুঁটি নাটি কোরে বর্ণনা কোর্ত্তে গেলে আমার পুঁথি বেড়ে যায়, আর তোমাদের ধৈর্য্যও কোমে যায়। সুতরাং এই খানেই সে সকল বর্ণনা সমাপ্ত করা যাক্। এখন মনে কর, এক বৎসর বিলেতে থেকে বাঙ্গালী তাঁর দেহের ও মনের প্রথম খোলষ পরিত্যাগ কোরেছেন, ও হ্যাট কোট পরিধান কোরে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হোয়েছেন, ও মনে মনে কল্পনা কোরচেন যে, এত দিনে তিনি গুটি-পোকাত্ব ত্যাগ কোরে প্রজাপতিত্বে উপস্থিত হোয়েছেন। এই অবস্থায় তাঁকে একবার আলোচনা কোরে দেখা যাক্। আমি দেখতে পাচ্চি, তুমি মহা চোটে উঠেছ; তুমি বোলচ, "বিলেতে গিয়ে বাঙ্গালীদের বর্ণনা কোরতে বসাও যা; আর গোলকুণ্ডায় গিয়ে খনীগর্ভের পাথুরে কয়লার বিষয় লেখাও তাই!" কিন্তু স্থির হও, আমি তোমাকে কারণ দেখাচ্ছি। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি, "বিলাতী বাঙ্গালীর চেয়ে নতুন দ্রব্য বিলেতে খুব কম আছে। ইংরাজ ও আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান যেমন দুই স্বতন্ত্র জাত, বাঙ্গালী ও ইঙ্গ-বঙ্গও তেমনি দুই স্বতন্ত্র জীব। এই জন্যে ইঙ্গ-বঙ্গদের বিষয়ে তোমাদের মত নতুন কথা ও নতুন খবর দিতে পারব, এমন বিলেতের আর খুব কম জিনিষের উপর দিতে পারব। ইঙ্গ-বঙ্গদের সংখ্যা এত সামান্য, যে, তুমি মনে কোরতে পার, আমি ব্যক্তি বিশেষদের উপর কটাক্ষ কোরে বোলছি কিন্তু তা' নয়; আমি ইঙ্গ-বঙ্গ দলের একটা সাধারণ আদর্শ কল্পনা কোরে নিয়েছি, আমার চার দিককার অভিজ্ঞতা থেকে স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের বিলেতে এলে কি কি পরিবর্ত্তন হয় তাই ঠিক কোরেছি, ও সেই গুলি সমষ্টি-বদ্ধ কোরে একটা সমগ্র চিত্র আঁকতে চেষ্টা কোরছি।

ভাসিয়ে দে তরী।

ভাসিয়ে দে তরী
তবে নীল সাগর পরি।
বহিছে মৃদুল বায়,
নাচিছে মৃদু লহরী।
ডুবেছে রবির কায়া,
আধো আলো আধো ছায়া,
আমরা দুটীতে মিলি যাই চল দিবি ধিরি।
একটী তারার দীপ
যেন কনকের টীপ
দূর-শৈল-ভুরু-মাঝে রয়েছে উজলি।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ,
মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ,
মরমের কথা এবে কহি এসো প্রাণ খুলি।

মনে আছে, কত জ্বালা
দুজনে সয়েছি বালা,
কত না ঝটিকা গেছে হৃদয়-কুসুম দলি!
কিসের ভাবনা আর,
ঘুচিল যাতনা ভার,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা জ্বালা সকলি এলেম ফেলি।
নাহি হেথা নিন্দা গ্লানি,
নাহি মিথ্যা কানাকানি,
নাহি তীব্র কটাক্ষের বিষময় হাসি।
সিন্ধুর উদার বুকে,
দুটিতে মনের সুখে,
সে দিকে তরঙ্গ নাগ, সে দিকে যাইব ভাসি।

ছিন্নমুকুল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ—প্রস্তাব।

আরো দশ বার দিন গেল, প্রমোদ কলিকাতায় যামিনীনাথের নিকট গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিলেন।

প্রমোদ কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে হিরণকুমার কনকের হস্তপ্রার্থী হইয়া প্রমোদকে এক পত্র লেখেন। বলা বাহুল্য, প্রমোদ সে পত্র পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু হিরণ কনককে রক্ষা করিয়াছে, হাজার হৌক তাঁর কাছে প্রমোদ ঋণী, এই ভাবিয়া সেই স্পর্দ্ধার মার্জ্জনা করিলেন এবং অভদ্রতা না করিয়া তাহার উত্তরও দিলেন। উত্তরে লিখিলেন "এখন শেষ নিশ্চিত উত্তর দিতে অক্ষম, কনককে জিজ্ঞাসা করিয়া পরে নিশ্চয় উত্তর দিব" কিন্তু সেই নিশ্চিত উত্তর প্রমোদ আজও দিলেন কালও দিলেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নিশ্চয়ই যখন প্রমোদ জানিতেন হিরণের সহিত কনকের বিবাহ দিবেন না—তখন হিরণকে

সেইরূপ স্পষ্ট লিখিয়া না দিয়া অন্যরূপ পত্র লিখিলেন কেন? তাহার কারণ—প্রমোদ যেমন বাল্য-বিবাহে ঘৃণা করিতেন—স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন—তেমনি বিবাহ সম্বন্ধেও তাঁহার সাধারণ হইতে ভিন্ন মত ছিল। বিশেষতঃ তাঁহার নিজের বাড়ীর নিজেই তিনি কর্ত্তা, সুতরাং সে সব বিষয়ে তাঁহার কাহারো মুখাপেক্ষা করিয়া কাজ করিতে হইত না। তাঁহার যেমন মত তিনি তেমনিই চলিতেন। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার মনে হইত—যে যাহারা বিবাহ করিবে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরই বিবাহ নির্ভর করে, সুতরাং তাঁহার মতে, হিরণের পত্রের একেবারে শেষ উত্তর দিতে হইলেই—অবশ্য কনককে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া তবে লেখা আবশ্যক। যদিও তিনি জানিতেন—সে জিজ্ঞাসা করা কেবল তাঁহার আপন মনকে বোঝাইবার জন্য। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার অনিচ্ছা জানিলে কখনই কনক হিরণকে বিবাহ করিতে চাহিবে না, যাহাই হৌক এক সময়ে কনককে জিজ্ঞাসা করিবার পর তাঁহাদের অনিচ্ছা হিরণকে লিখিয়া দিবেন মনে করিয়া—তখন হিরণকে ঐরূপ পত্র লিখিয়া দিলেন। কিন্তু হিরণকে লিখিবার পর হইতেই প্রমোদ সে কথা ভুলিয়া গেলেন। এদিকে কনক বাঁচিয়াছে শুনিয়া যামিনীনাথ প্রমোদের নিকট কনকের হস্ত প্রার্থনা করিলেন। যামিনীনাথের হস্তে কনক পড়িবে—ইহাতো কনকের সৌভাগ্যের কথা, অমন সুপাত্র কি আর মিলিবে? যামিনীনাথের প্রস্তাবে প্রমোদের আহ্লাদ ধরিল না। এই বিবাহ বিষয়ে কথা কহিতেই প্রমোদ কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া সমস্ত স্থির করিয়া শেষে আহ্লাদ-উৎফুল্ল হৃদয়ে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। এখন বিবাহের আগে কেবল একবার কনককে বলা মাত্র বাকী রহিল। তাহার মত পাইলেই শীঘ্র দিন স্থির করিয়া বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন, প্রমোদ যে কালে এ বিবাহে অত্যন্ত ইচ্ছুক সুতরাং কনকেরও যে এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইবে ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত রহিলেন।

বাড়ী আসিয়া আর সে রাত্রে কনককে কিছু বলা হইল না—পর দিন প্রাতেঃ বাহির বাটীতে তাঁহার বসিবার কক্ষে কনককে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কনক যখন সেই কক্ষে প্রবেশ করিল তখন প্রমোদ একটি টেবিলের উপরে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া অর্দ্ধশয়িত অবস্থায় ছিলেন, কি ভাবিতেছিলেন জানি না, কিন্তু চক্ষু সমধিক চঞ্চল ও সমুজ্জ্বল, প্রফুল্ল মূর্ত্তি সমধিক ঔৎসুক্যময়—প্রফুল্লতা-ব্যঞ্জক—তিনি যে কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কনক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল

দাদা, আমাকে ডাকিয়াছ?" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন।

"হাঁ ব'স্—তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে" কনক বসিয়া আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি কথা ব'ল।"

প্র। "একটু বড় সুখের কথা। আচ্ছা আন্দাজ কর দেখি" কনক অনেক ভাবিয়া বলিল "না পারিলাম না—তুমি ভাই ব'ল।"

প্র। "বলিলে কি পুরস্কার দিবি।"

ক। "যাহা চাও দিব—তুমিতো আগে বল" কনকের কৌতূহল দেখিয়া প্রমোদ অনেক ক্ষণ এ কথা ও কথা কহিয়া তাহাকে অনেক জ্বালাইয়া অবশেষে বলিলেন" একটি বেশ ভাল বরের সহিত তোর সম্বন্ধ করিয়াছি—শীঘ্র বিবাহ হইবে—কেমন সুসংবাদ কি না?" প্রমোদের সুসংবাদ শুনিয়া কনক চমকিত হইল—তাহার শোণিত বেগে বহিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া গেল। কনকের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া প্রমোদ ভাবিলেন "উহা লজ্জার চিহ্ন।" প্রমোদ একটু একটু করিয়া বরের নাম ধাম রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া চলিলেন, বরটি কেমন দেখিতে কেমন লেখাপড়া জানে—কেমন সৎস্বভাব, প্রমোদের কেমন হৃদয়-বন্ধু—এই সকল পরিচয় সবিশেষ প্রমোদ দিয়া চলিলেন। পরিচয় সমাপ্তে বলিলেন "কেমন?—শুনিয়া কেমন মনে হইল? বেশ বর নয়?"

যতক্ষণে সহর্ষে প্রমোদ তাঁহার ভাবী ভগিনীপতি যামিনী বাবুর পরিচয় দিতে ছিলেন, কনক ততক্ষণ অনামনে চিন্তানিবিষ্ট ছিল। তাহার একটি কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করে নাই। বিবাহ! ইহা সুসংবাদ! কি সর্ব্বনাশ, কনক অন্যের পত্নী হইতে চলিল, হিরণকে আর কখনো দেখিতে পাইবে না, হিরণের চিন্তা পর্য্যন্ত আর মনে স্থান দিবার অধিকার থাকিবে না, সে চিন্তা পর্য্যন্ত পাপ, উঃ কি ভয়ানক! বালিকার সমস্ত শোণিত চমকিয়া উঠিল। সমস্ত হৃদয় ভাবনায় আলোড়িত করিয়া তুলিল। বালিকা কখনো ভ্রাতার কথায় কথা কহে নাই, প্রমোদ যাহা বলেন তাহাই বেদবাক্যসদৃশ বলিয়া শীরোধার্য্য করে, কিন্তু আজ তাঁহার কথায় কনক কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না, যাতনা-কম্পিত স্বরে বলিল "দাদা, আমি বিবাহ করিব না" প্রমোদ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন না, ভাবিলেন বিবাহের কথায় প্রথমে তো স্ত্রীলোকেরা 'না' বলিয়াই থাকে, তাহাতে লজ্জা হয় বৈকি" তিনি হাসিয়া বলিলেন,

"কনক তার আর লজ্জা কি! আজ হোক কাল হোক বিয়ে তো হবেই, তবে আর লজ্জা করে কি হ'বে! কনক আবার বিষাদব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে বলিল "দাদা আমি বিবাহ করিব না" প্রমোদ দেখিলেন সে লজ্জার স্বর নহে—সে স্বরে কিছুমাত্র বেসুর নাই—তাহা সুস্পষ্ট গম্ভীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক। প্রমোদ বুঝিলেন কনক যথার্থই তাহার মনের কথা বলিতেছে। ইহাতে প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন, অথচ বিবাহের অনিচ্ছার বিশেষ কোন কারণ না পাইয়া ভাবিলেন বিবাহ হইলে প্রমোদকে ছাড়িয়া শ্বশুর বাড়ী যাইতে হইবে এই ভয়ে বুঝি কনকের বিবাহে আপত্তি। প্রমোদ বলিলেন "বিয়ে হলেই সব ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী যেতে হবে বোলে বুঝি তোর যত ভয়? তার ভয় কি? তোর যতদিন ইচ্ছা এখানে

থাকিস্—শেষে তোকে থাকিবার জন্য সাধাসাধি করিতে না হইলেই বাঁচি।"

কনক বলিল "না দাদা আমার এখন বিবাহ কেন?" প্রমোদ হাসিয়া বলিলেন, "চিরকাল আইবড় থাকিবি নাকি? অত লজ্জায় কাজ নেই। এখন বল দেখি তাহাকে দেখিতে চাস্ কি—না দেখিলেও হবে?' কনক আবার 'বিবাহ কেন' বলায় অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রমোদ আবার যামিনী বাবুর রূপ গুণের প্রশংসা করিয়া শেষে আরো বলিলেন যে তাহার বিবাহের পর সে যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই থাকিবে, সে ভয়েও তাহার বিবাহে কুণ্ঠিত হইতে হইবে না। এই সকল বলিয়া অনেক প্রকারে প্রমোদ কনককে বোঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও কনকের সম্মতি না পাইয়া প্রমোদ আশ্চর্য্য হইলেন। কনক কখনো তাঁহার মতে অমত প্রকাশ করে নাই—কখনো একটি সামান্য বিষয়েও কনকের নিকট হইতে তাঁহার প্রতিবাদ সহ্য করিতে হয় নাই—সেই জন্য বাল্যকাল হইতে আপন সম্মতিতে কনকের সম্মতি, আপন ইচ্ছাই কনকের ইচ্ছা তাঁহার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল—উহা যেন তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া বোধ হইত। বিপরীত হইলে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। কনককে আজ বিনা কারণে তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে, বিবাহে ঐরূপ নিতান্ত অনিচ্ছুক দেখিয়া প্রমোদ অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন, এবং শেষে কোন প্রকারে আপন মতে তাহাকে আনিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া রোষ গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "কেন? বিবাহ করিবে না কেন?" তাহার ইচ্ছা নাই, এই উত্তর ছাড়া ইহার উত্তর আর বালিকা কি দিবে। সে কোন উত্তরই খুজিয়া পাইল না। প্রমোদ আবার বলিলেন "কেন বিবাহ করিবে না আমাকে বুঝাইয়া দেও, তোমার আপত্তি কি সে?" বালিকাকে নিরুত্তর দেখিয়া প্রমোদ প্রতিবারে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া আরো উচ্চৈঃস্বরে ঐ এক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আরো দুই এক বারেও উত্তর না পাইয়া প্রমোদ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রমোদ স্বভাবতঃ উদ্ধত এবং চিত্তদমনে অপটু, যাহা যখন মনে আসিত সেই মনের বেগ অনুসারেই চলিতেন, ভগিনীকে এই প্রকার নিরুত্তর দেখিয়া সরোষে টেবিলে আঘাত করিয়া আবার বলিলেন" কেন বিবাহ করিবে না বল" বালিকা ভয়ে জড় সড় হইয়া পড়িল, তাহার মস্তক ঘুরতে লাগিল, কি উত্তর দেওয়া উচিত, কি অনুচিত তাহা ভাবিবার ক্ষমতাও রহিল না। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে আপনাআপনি আবার তাহার এই উত্তরটি উছলিয়া উঠিল "আমার বিবাহে ইচ্ছা নাই।"

প্র। "তোমার ইচ্ছা! বাঙ্গালির মেয়েদের আবার বিবাহে ইচ্ছা অনিচ্ছা কি? তোর ইচ্ছার উপর বিবাহের কি নির্ভর করিতেছে? আমার ইচ্ছাই কি যথেষ্ট না?"

বালিকা আর কোন উত্তর দিতে পা-

রিল না। সে উত্তর দিয়া ফেলিয়াছে তাহাতেই যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, শুষ্ক ওষ্ঠাধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল—বিশাল চক্ষুর শূন্য দৃষ্টি শূন্যেই সংলগ্ন হইল। তখন প্রমোদ আরো ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমার ইচ্ছাই যথেষ্ট, আমি যে তোর ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম সে অনুগ্রহ মাত্র। তোর ইচ্ছা শুনিতে চাই না আমার ইচ্ছাতেই তোর বিবাহ করিতে হইবে।" তখন বালিকা যেন কোন দৈব শক্তিতে উত্তেজিত হইয়া, যেন নিরাশার অপ্রতিহততেজে উত্তেজিত হইয়া বলিল "দাদা, অনিচ্ছায় বিবাহ করিতে নাই, ইহা কি তোমার কাছেই শিক্ষা পাই নাই! তুমি আজ আপন কথার ব্যতিক্রম করিবে?" প্রমোদ এই কথায় ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "হাঁ আমার সেই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল আজ পাইলাম বটে। আচ্ছা তোর বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই, আমারো তোকে আর খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা নাই। তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোর মুখ দেখিতে চাহি না, দূর হইয়া যা এই খাওয়া পরার কথাগুলি বালিকার বড়ই লাগিল, কথাগুলি হৃদয়ের স্তরে স্তরে বিদ্ধ হইল। সামান্য অন্ন বস্ত্রের কথা লইয়া প্রমোদ তাহাকে আজ মর্ম্ম-পীড়িত করিতে পারিলেন। বালিকা আর মনোবেগ শামলাইতে পারিল না। কষ্টে দুঃখে বালিকার মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িল। হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক, যন্ত্রণার অশ্রুতে হস্ত ভাসাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রমোদ নরম হইয়া পড়িলেন—তাঁহার মায়া হইল। প্রথম রাগের মাথায় অন্ন বস্ত্রের কথা বলিয়াই পরক্ষণে পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিলেন। তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া, কয়েক বার গৃহে পদচারণা পূর্ব্বক কনকের কাছে আসিয়া বলিলেন "কনক আর কাঁদিস নে। আপাততঃ এখনি আর তোর বিবাহের কথা তুলিব না—যা ঘরে যা" কনক আস্তে আস্তে সেখান হইতে উঠিয়া গেল। প্রমোদ রাগে দুঃখে অনুতাপে মুহ্যমান হইয়া বসিয়া রহিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ—মুক্ত কণ্ঠ।

সে দিন সমস্ত দিন কাঁদিয়াই কনকের কাটিয়া গেল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে নীরজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কনক সে দিনকার সমস্ত ঘটনাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। নীরজার প্রথম তাহা শুনিয়া একটু মমতা হইল, কিন্তু আবার প্রমোদের কাছে সকল শুনিয়া কনকের দোষ বুঝিতে পারিল, নীরজা তখন কনকের প্রতি বিরক্ত হইল। নীরজা—বালিকা, স্বামীর দোষ কিছুই দেখিতে পায় না নীরজা জানে তাহার স্বামী যাহা বলেন তাহা কখনই অন্যায় হইতে পারে না, স্বামী যাহা কহেন সকলি উচিত বাক্য, সকলি বেদবাক্য। স্বামীর মতের কেহ বিরুদ্ধ বলিলে সে বিরক্ত হইত সে তাহার উপর চটিয়া যাইত। কনক বিবাহ করিতে অস-

মত হইয়াছে বলিয়া সেও কনকের প্রতি বিরক্ত হইল। অবশ্য কনক দোষী, নহিলে স্বামী কখনই বিরক্ত হইতেন না, স্বামী কখনই অন্যায় রূপে কাহারো উপর বিরক্ত হন না, তবে এরূপ স্থলে নীরজা দোষীর দুঃখে সমদুঃখী হইবে কি করিয়া? সে প্রথমে বিবাহের জন্য কনককে কত বুঝাইল, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল "তুই ভাই বড় এক রোকা মেয়ে, সাধে কি উনি রেগেছেন? আপনার দোষেরি শাস্তি। নে বাবু যা ইচ্ছা কর, তিনি যখন পায়েন নি তখন আমিই কি তোকে পারিব, আমার চেষ্টা করাই বৃথা" বালিকা নীরজা আজ প্রৌঢ়ার ন্যায় কনককে বকিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। প্রমোদের কথায় অসম্মত হইল ইহাতেই বালিকার রাগ, প্রমোদের কথা লোকে কি রূপে না শুনিয়া থাকিতে পারে তাহা সে বুঝিতেও পারিত না। কনক একাকী সমস্ত দিন কাঁদিল। সমস্ত দিন রাগ করিয়া নীরজা আসিল না, সন্ধ্যাবেলা আর একবার নীরজা আসিয়া বলিল "কনক আমি তোর বিবাহের অনিচ্ছার কারণ জানি, তুই হিরণকে চাস? কিন্তু এ কথা জানিলে তোর দাদা তোর উপর আরো বিরক্ত হইবেন তা জানিস? আমি এই ভয়ে তাঁহার নিকট তোর মনের কথা এখনো বলি নাই। যে লোক তোর দাদার পরম শত্রু, কনক তাহাকে তুই কি করিয়া ভাল বাসিলি। এই কি তোর অসীম ভ্রাতৃস্নেহ? কনক এখনো বল যামিনীনাথকে বিবাহ করিবি আমি দৌড়িয়া তোর দাদাকে বলিয়া আসি" কনক বলিল "হিরণ দাদার শত্রু কখনই না, কেমন করিয়া তাঁহার এ ভুল বিশ্বাস জন্মিল?" শুনিয়া আবার নীরজা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "সকল জানিয়া শুনিয়া তবুও বলিবি তোর দাদার ভুল বিশ্বাস! তোর কাছে আজ কাল তোর দাদারি যত দোষ—আর তোকে কিছু বলিতে আসিব না—আমি চলিলাম, তোর যাহা ইচ্ছা কর" যে নীরজা কনককে এত ভাল বাসিত সেই আজ স্বামীর অসন্তুষ্টিবশত আপনিও কনকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া চলিয়া গেল। সে রাত্রে কনকের আর নিদ্রা আসিল না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া উষ্ণ মস্তিষ্ক শীতল করিতে কনক গঙ্গা তীরে আসিয়া, জলে পা রাখিয়া এ কটি সোপানে আসিয়া বসিল। যে দিন সুশীলার মৃত্যু হয় সে দিন এই খানে এই গঙ্গায় ডুবিয়া গিয়াছিল তাহা মনে পড়িল, মনে হইল আজ সেই খানে ডুবিলে তাহাকে রক্ষা করিবার আর কেহই নাই আজ আর হিরণকুমার তাহাকে রক্ষা করিতে আসিবেন না। বালিকা ভাবিতে ভাবিতে হস্তে মস্তক রক্ষা করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে আপন মনে মৃদু মৃদু গাহিতে গাহিতে প্রভাত-সমীরণে গঙ্গাবক্ষঃস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালাবিক্ষেপ দেখিতে লাগিল।

গাহিতে গাহিতে হঠাৎ একবার হস্ত হইতে মস্তক তুলিয়া অশ্রু মুছিতে গেল অমনি দেখিল নিকটে কে দাঁড়াইয়া।

কনক সেই মূর্ত্তি দেখিয়া চিনিল হিরণ-কুমার।

হিরণ শারীরিক অসুখ নিবন্ধন দুই মাসের ছুটী লইয়াছিলেন, সে ছুটির এখনো এক মাস বাকি আছে। কিন্তু সে ছুটীতে তিনি আর এলাহাবাদ ছাড়িয়া অন্য কোথাও যাইতে পারিতেছিলেন না। যত দিন বাকি আছে, তত দিন এলাহাবাদেই কাটাইবেন স্থির করিয়া এইখানে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন। কিন্তু সকালে বিকালে প্রায়ই তিনি নদীতে নৌকা করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেন। নদীতে বেড়াইতে তাঁহার বড় ভাল লাগিত। শরীরের জন্য আর কোথাও যাওয়ার তাঁহার আবশ্যক বোধ হইত না। হিরণকে দেখিয়া আহ্লাদে বিস্ময়ে সলজ্জ ভাবে কনক তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। অনেক ক্ষণ কাহারো মুখে কোন কথা ফুটিল না। অনেক ক্ষণ পরে হিরণ বলিলেন "আমি নৌকায় বেড়াইতে বেড়াইতে কতদিন তোমাকে দেখিয়া, এখানে আসিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু এরূপ স্থলে তোমার সহিত দেখা করা অন্যায় বিবেচনায় সে লোভ কষ্টে সম্বরণ করিয়া আসিয়াছি। আজও আসিবার আগে কতবার ঐ কথা ভাবিয়াছি ঠিক নাই কিন্তু আজ আর কোন মতে থাকিতে পারিলাম না। কনক, আমার অন্যায় মার্জ্জনা করিও আমি আর কখনো আসিব না—উঃ কত দিন তোমার সহিত দেখা হয় নাই" হিরণ যে আসিয়া অন্যায় করিয়াছেন কনকও এই কথা মনে মনে ভাবিতেছিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। হিরণ বলিলেন "কনক, তুমি বোট হইতে বাড়ী আসিবার পর হইতে আমার কি কষ্টে দিন অতিবাহিত হইতেছে বলিতে পারি না। সে কষ্ট আর সহ্য করিতে না পারিয়া আজ আমি তোমার নিকট আমার যাতনা খুলিয়া বলিতে আসিয়াছি, আমার এই অসম সাহস তুমি কি মাপ করিবে না! কনক, নিতান্ত অসহ্য না হইলে আমি আজ এরূপে কখনো আসিতাম না। আর আমি এরূপ ঘুরিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কনক, প্রথম সাক্ষাতে আমি আপনার মন আপনি বুঝি নাই। বুঝিলেও তখন আমার হৃদয়ের কথা তোমাকে বলিতে সাহসী হইতাম না। তোমাকে ছাড়িয়া অবধি আমি যাই যাই হইয়াছি, পৃথিবীতে আমার সুখ নাই, শয়নে স্বপনে সকল সময়েই তোমার ঐ কনক-প্রতিমা বই আমি আর কিছু দেখিতে পাই না। কনক, আমি তোমার কাছেই হৃদয় হারিয়েছি। হিরণ মনের বোকে এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা গুলি বলিয়া গিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য থামিলেন। বালিকা আর তাঁহার কথার কি উত্তর দিবে? সেই পদ্ম নেত্রের নীরব অশ্রুই তাহার কথার উত্তর দিল। হিরণ আবার বলিলেন "কনক আমার একটি কথার উত্তর দেও। তোমার একটি কথার উপর, আমার জীবন মরণ সমস্ত নির্ভর করিতেছে, কনক আমার এই অসীম ভাল বাসার কি প্রতিদান পাইব! কনক

মনে মনে বলিল আমার বুক চিরিয়া দেখাইবার হইলে ও কথা জিজ্ঞাসা করিতে না" কিন্তু তাহার মনের কথা মনেই মিশাইয়া গেল, মুখে ফুটিল না। হিরণ তাহার মৌনভাবে আশ্বাসিত হইয়া আবার বলিলেন "কনক, বল বল আর আশঙ্কায় ব্যাকুলতায় রাখিও না। তুমি নিজে হস্তারক না হইলে আমার সুখে বাধা দেবার আর কিছুই নাই। আমি তোমার হস্ত প্রার্থনা করিলে তোমার ভ্রাতা এখনি তাহা দিবেন ইহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। কনক আমি তোমাকে বাঁচাইয়াছি, কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমার হস্ত আমাকে দিতে কখনই তিনি কুণ্ঠিত হইবেন না,এখন তোমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর" এদিকে দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, গঙ্গাস্নানে আগমনকারী বৃদ্ধগণের কথোপকথনের রেশ আসিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে যেন ঈষৎ ধ্বনিত হইতে লাগিল, পাখীদের কলরবে, দূর-গ্রামস্থ লোকদের জাগ্রত কোলাহলের অস্পষ্ট গুণ গুণ শব্দে কনকের যেন মোহ ভাঙ্গিল। বালিকা দেখিল তাহাদের দুজনের এরূপ থাকা আর কোন মতে উচিত না—আর অধিক ক্ষণ হিরণ থাকিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা কিন্তু তথাপি বুঝিয়াও কনক তৎক্ষণাৎ হিরণকে যাও বলিতে পারিল না। এক দিকে ন্যায় অন্যায় বিবেচনা অপর দিকে মনের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, শেষে,ন্যায়ই জয়ী হইল, কনক বলিল "তুমি আর বিলম্ব করিও না" হিরণের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন আর অধিক ক্ষণ থাকা বাস্তবিকই তাঁহার উচিত নহে তিনি বলিলেন "আচ্ছা আমি যাই—আবার কবে দেখা হইবে জানি না—আর কখনো হইবে কি না তাহাও জানি না। কিন্তু যাইবার আগে আবার ঐ কথাটি জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি আমার কথায় উত্তর দেও—কনক বল তুমি কি আমাকে ভালবাস? কনক ক্ষণেক নীরব ভাবে থাকিয়া আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কতবার থামিয়া থামিয়া অবশেষে কষ্টে লজ্জা অতিক্রম করিয়া বলিল "বাসি।"

এই কথাটিতে হিরণের মাথার উপর দিয়া চকিতের মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন ঘুরিয়া গেল, হৃদয়ের দ্বারে শোণিত উচ্ছ্বাস যেন বেগে আসিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল, তখন কি বলিবেন, খুঁজিয়া না পাইয়া আহ্লাদে গদগদ কণ্ঠে হিরণ বলিলেন "তবে এখন চলিলাম।"

বলিয়া অদূরে তাঁহার জন্য যে নৌকা অপেক্ষা করিতেছিল তাহাতে গিয়া উঠিলেন।

নৌকায় উঠিয়া যতক্ষণ কনককে দেখা গেল সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রণয়ের আভাস ও অবসান।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত)

আমরা এত দিন পাঁচ ছয় জন সন্ন্যাসীতে একত্র হইয়া হিমালয়ের এই প্রশান্ত কন্দরে জ্যোৎস্নাময় শান্তির সুখ উপভোগ করিতেছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আমাদের শান্তিতে একটি বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছে। পুণ্যবতী নাম্নী আমাদের গুরুকন্যা সন্ন্যাসিনী হইয়া আমাদের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, সম্প্রতি স্বদেশ হইতে কি শোকের সংবাদ পাইয়া তাঁহার আর কষ্টের পরিসীমা নাই, তিনি আর আমাদের সঙ্গে একত্রে গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন না, আমাদের সঙ্গে রাত্রির উচ্ছ্বসিত দেব-স্তোত্রে সম্মিলিত হয়েন না, এমন কি, শয়ন আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিমালয়ের নিভৃত এক প্রান্তে বসিয়া দিবা নিশি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বীরশ্রেষ্ঠ নামে আমাদের গুরু এবং পুণ্যবতীর পিতা পুণ্যবতীকে এক দিন কঠোর তীব্র ধরণে ভয়ানক তিরস্কার করিলেন,—বলিলেন "তুমি গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন কর, তুমি বিবাহ করিয়া সংসারের অমৃতময় ফল উপভোগ কর, কণ্টকাকীর্ণ নীরস সন্ন্যাস ধর্ম্মে তোমার আবশ্যকতা কোথায়? আজও পর্য্যন্ত তুমি যদি পার্থিব সম্পর্কের অসারতা না বুঝিয়া থাক, সংসারের মায়ামোহের অকিঞ্চিৎকরতা না বুঝিয়া থাক, আত্মীয় জনের মমতার নির্ম্মমতা না বুঝিয়া থাক, প্রণয়-মরীচিকার প্রবঞ্চনা না বুঝিয়া থাক, ত সন্ন্যাস ধর্ম্মকে এই প্রচণ্ড হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান কর, অনুতপ্ত হৃদয়ে সংসারকেই আবার গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখো।" বীরশ্রেষ্ঠের তীব্র তিরস্কার শুনিয়া, পুণ্যবতীর স্বতঃউৎসারিত অশ্রুলহরী দেখিয়া, আমি আর সেখানে না থাকিতে পারিয়া অদূরে একটি প্রস্তরে আসিয়া নানা প্রকার ভাবিতে লাগিলাম। ভাবিলাম—হৃদয়ের দুর্ব্বলতা কি এতই ঘৃণাস্পদ? কিন্তু এই দুর্ব্বলতা না থাকিলে সংসারের অবস্থা আজ কি হইত? যদি পিতাপুত্রের সম্পর্ক কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞান দ্বারাই নিয়মিত হইত, যদি প্রণয়ী-প্রণয়িনীর সম্পর্ক কেবল স্বার্থপরতার বশীভূত হইত, যদি বন্ধু বান্ধবের সম্পর্ক কেবল বাধ্য-বাধকতার সঙ্কুচিত প্রণালীতেই আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে কি এত দিনে সমস্ত মানব-সমাজ ভগ্ন তরীর ন্যায় ঝটিকা-ক্ষোভিত সাগরের প্রবল

করমে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত না? যদি এক জনের চক্ষের জলে অন্যের হৃদয় দ্রবীভূত না হইত, যদি আত্মীয় জনের আমোদ উল্লাসে আত্মীয় জনের হৃদয় উল্লসিত না হইত, যদি এক জনের কাতর রোদনে অন্যের হৃদয়তন্ত্রে আঘাত না লাগিত;—এমন কি, যদি এক জনের করুণ কটাক্ষে অন্যের হৃদয় আপনাতে আত্মহারা না হইতে জানিত, তাহা হইলে এত দিনে কি মানব-সমাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট ধূমকেতুর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ভাবে শূন্যে শূন্যে তাড়িত-প্রতাড়িত হইত না? গৃহস্থের গৃহবন্ধনের কারণ, হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা; দেশে একতা-বন্ধনের কারণ, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা; পৃথিবীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে যে হৃদয়ে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিতে পারিতেছে তাহার কারণও এই দুর্ব্বলতা। আমি যদি আজ আপনার স্বার্থ বুঝিয়া তাহারি সাধনে মনোনিবেশ করি, তাহারি নিমিত্ত যদি সকল প্রকার বাধা-বাধকতার নিয়ম-প্রণালী অনুসরণ করি, তাহা হইলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও হইতে পারি, কতকটা নিঃসম্পর্ক হইলেও হইতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার সুখের উদ্দেশ্য কি সাধিত হইল? তাহাতে সমাজের আমি কি প্রয়োজনে আসিতে পারিলাম? আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি যে কবিরা যেমন বলেন যে দুর্ব্বলতাই নারী জাতির বল, তেমনি মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সমাজের বল। আজ যদি মানব-সমাজ এই দুর্ব্বলতা হইতে মুক্ত হয়, তাহা হইলে সমস্ত পৃথিবী কি দানব-সমাকীর্ণ এক শ্মশান-ক্ষেত্র রূপে সহসা পরিণত হইয়া উঠে না? তাড়িৎ-উত্তেজিত কলের মানুষের ন্যায় সকলে যদৃচ্ছাক্রমেই বিচরণ করিতে থাকে, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, সকলেই নিশ্চিন্ত, সকলেই জড়প্রকৃতি: দুর্ব্বলতাই সমাজের বল, দুর্ব্বলতাই মানব হৃদয়ের শোভা। এমন কি, এই সন্ন্যাস ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও উত্তেজক কি এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই নহে? যদি হৃদয় সবল থাকে, যদি হৃদয়, বুদ্ধি বিবেকের বশবর্ত্তী হইতে পারে, যদি ন্যায়-পরতার কঠোর নিয়ম দ্বারা হৃদয়ের তরঙ্গ-ভঙ্গকে আবদ্ধ রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলে সন্ন্যাস ধর্ম্মের আবশ্যকতা কোথায়? আমি স্বীকার করি যে এই দুর্ব্বলতার আতিশয্য নিজের ও সমাজের ঘোর অমঙ্গলকর এবং অসংযত হৃদয়-উচ্ছ্বাস সকল অনর্থের নিদানভূত,—কিন্তু অনেক বিজ্ঞ লোকেই সন্তপ্ত অশ্রুলহরি দেখিলেই, মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস শুনিলেই ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া তুলেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বীরশ্রেষ্ঠের উপর আমার কতকটা বিরাগ জন্মিল,—এবং পুণ্যবতীর মনের কথা জানিবার জন্য আমার কতকটা কৌতূহল উপস্থিত হইল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইলে যখন সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন, তখন সেই পর্ব্বত-শিখরস্থ হোমাগ্নির পার্শ্বে পুণ্যবতীকে একলা পাইয়া আমি তাঁহাকে তাঁহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে অশ্রু-

বিগলিত লোচনে বলিতে লাগিলেন—— আমি কুলীন-কন্যা, সুতরাং যৌবন কালেও অবিবাহিতা ছিলাম। ক্রমে প্রায় সমবয়স্ক সুরেন্দ্র নামক একটি ব্রাহ্মণ সন্তানের প্রেমে আমি মুগ্ধ হইয়া পড়ি। প্রথমেই তাঁর রূপ গুণে বিমোহিত হইয়া যখন তখন তাঁহার কথা ভাবি, ক্রমে তাঁহাকে বারংবার দেখিবার লালসা, ক্রমে আত্মীয়তা বন্ধনের অভিলাষ, তৎপরে ঘনিষ্ঠতার দারুণ তৃষ্ণা, পরিশেষে প্রণয়ের অধীর উন্মত্ততা স্বভাবের স্বাভাবিক প্রণালী ক্রমে আমার হৃদয় মনকে নূতন ভাবে গঠিত করিয়া তুলিল। আমি তাঁহার চিন্তাতেই আত্মবিসর্জ্জন করিলাম। অথচ আমার পিতা মাতার কঠোর আজ্ঞানুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিবার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে আমার সাহস হইত না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, হৃদয়ের দুর্ব্বলতাই সকল শক্তির অপেক্ষা বলীয়ান, সুতরাং পিতামাতার আজ্ঞার বিরুদ্ধে, সমাজের বদ্ধপ্রতিষ্ঠ কঠোরতার বিরুদ্ধে, আপনার স্বার্থের বিরুদ্ধে, আমি তাঁহাতেই লিপ্ত, তাঁহাতেই মিলিত, তাঁহাতেই নিমগ্ন, তাঁহাতেই আত্মহারা হইয়া পড়িলাম।

আমি।—কি!—তুমি আজ যৌবন-সুলভ অকিঞ্চিৎকর প্রণয়ের অশ্রুধারাতে এই মহান হিমাচলকে কলঙ্কিত করিতেছ?

পুণ্যবতী।—কলঙ্কিত?—যদি তুমি প্রকৃত প্রণয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম জানিতে, তাহা হইলে তুমি কখনই ও-কথা বলিতে না! হৃদয়ের যে ভাব এই হোমাগ্নিকে অতিক্রম করিয়া সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত উত্থিত হইতে পারে,—যাহার অচল অটলতার সঙ্গে তুলনা করিলে এই দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হিমাচলকে পর্য্যন্ত চঞ্চল বলিয়া জ্ঞান হয়, যাহার উদারতা এই অনন্ত প্রসারিত গগনমণ্ডল অপেক্ষাও প্রশস্ততর, সেই প্রণয়কে "অকিঞ্চিৎকর" বলিতে আমি কখনই স্বীকার করিব না।

আমি। প্রণয় যদি এতদূরই পৃথিবীর পার্থিব পদার্থের মধ্যে অপার্থিব, তবে কেন তুমি প্রণয় ছাড়িয়া এই হিমালয়ের কঠোর বক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ?

পুণ্যবতী। আমি সহজেই সমাজ পরিত্যাগ করি নাই। হৃদয়ের প্রতি হৃদয়ের অত্যাচার দেখিয়া, মৌখিক মমতার নির্ম্মমতা দেখিয়া, মানবের প্রণয়ের অপমান দেখিয়া, সমাজ পরিত্যাগ করিয়াছি। দেখিলাম, যে, হৃদয়ের বেগবান উচ্ছ্বাসের নিকট সমাজের ভয়, বিবেকের উপদেশ, পরিণামের অমঙ্গল আশঙ্কা পর্য্যন্ত ছিন্ন তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি হৃদয়ের দুর্ব্বলতার মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য সমাজ ছাড়িয়াছি। সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, এবং অবশেষে হিমালয়ের এক প্রান্তে অবস্থিতি করিতেছি।

আমি। কিন্তু তুমি তোমার প্রণয়ের প্রণয়ীকে পাইয়াও কেনই বা এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিলে? তোমার হৃদয়ের সুরেন্দ্র কি তোমাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন?

পুণ্যবতী। না, তিনি আমাকে স্পষ্টাক্ষরে প্রত্যাখ্যান করেন নাই বটে—কিন্তু আমি নিজের মন দিয়া তাঁহার মন বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আমার হৃদয়ের অণুবীক্ষণ দিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রতি শিরা দেখিতে পাইয়াছিলাম——সেই সকল দেখিয়া শুনিয়াই আমি সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি।

আমি। আমার এখন তবে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি তোমার আপনার কল্পনার দ্বারা প্রতারিত হইয়া, তুমিই তোমার প্রণয়ীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছ—তুমিই তোমার অনুভব ও অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া সুরেন্দ্রের সরল হৃদয়ে বিচ্ছেদের অগ্নি জ্বালিয়া আসিয়াছ। তোমার প্রণয়ী যখন স্পষ্টাক্ষরে কিছুই বলেন নাই, তখন স্বকপোল-কল্পিত বিরুদ্ধ অনুমান করিবার তোমার কোন অধিকারই নাই।

পুণ্যবতী। সুহৃদ্বর, তোমার কথার ভাবে সহসা বোধ হয়, যে তুমি কখনই প্রণয়ের অমোঘ প্রভাব অনুভব কর নাই। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা কখনই হইতে পারে না। তুমি যেরূপ গলদশ্রু লোচনে দেবীর আরাধনা কর, যেরূপ উন্মত্ত হৃদয়োচ্ছ্বাসে দেবীর স্তোত্র পাঠ কর, তাহাতে আমার কখনই বোধ হয় না, যে তুমি কখনও প্রণয়ের মধুর আস্বাদ গ্রহণ কর নাই। আমি মুক্তকণ্ঠে, উর্দ্ধকণ্ঠে বলিতে পারি যে পার্থিব প্রেমই অপার্থিব দেবভক্তির শিক্ষা-সোপান, এবং পার্থিব প্রেমের মধুরতাই দেবভক্তির প্রলোভন মাত্র।

আমি। আমার কথাগুলাই হোউক না কেন, কিন্তু তোমার মত আমি কখনই আকাশময় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিতাম না।

পুণ্যবতী। কিন্তু আমি বলিয়াছি, যে প্রণয়-বিষয়ে মনের দ্বারাই মন বোঝা যায়, এবং হৃদয়ের দ্বারাই হৃদয় বোঝা যায়। আমার প্রণয়ী যখন আমার প্রণয়ের প্রতি মনে মনে অবজ্ঞা করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রতি ব্যবহারে, প্রতি কথাতে, প্রতি কটাক্ষে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত এতদূর অনুভব করিতে পারিব, যে বাহিরের অন্য লোক ততটা করিতে সাহসও পাইবে না।

আমি। তোমার সমস্ত কথাগুলি আমাকে প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে।

পুণ্যবতী। প্রহেলিকা কিছুই নহে। সেই আমার প্রণয়ী যখন অন্য মনে অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন, যখন আমার হৃদয়ের অপমান করিয়া অন্যকে হৃদয় উৎসর্গ করিলেন, এবং আমার প্রেমকে অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া অন্যের প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, তখন আমি ব্যতীত কেহই আর তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল না—এমন কি, তিনি নিজেও তাঁহার নিজের ভাব বুঝিতে পারেন নাই।

আমি। অথচ তুমি তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ—ছিঃ ছিঃ কি নিষ্ঠুরতা!

পুণ্যবতী। কিছুই নিষ্ঠুরতা নহে। যখন দেখিলাম, ইন্দ্রাণীর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি আমার সঙ্গে ক্রমাগত ইন্দ্রাণীর কথা উত্থাপন করেন এবং পূর্ণ ইচ্ছার সহিত অনিচ্ছুক ভাবে ইন্দ্রাণীর কথা শুনিতেই ভাল বাসেন—যখন দেখিলাম, যে আমি সরল হৃদয়ে ইন্দ্রাণীর কোন নিন্দা করিলে তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছেন, ও তাহার সুখ্যাতি করিলে, প্রগাঢ় আগ্রহে আমাকেই অনামনস্কে আলিঙ্গন করিতেছেন—যখন দেখিলাম"ইন্দ্র" শব্দ উচ্চারণ করিলে ইন্দ্রাণীর কথা তাঁহার মনে আসিতেছে, ও মমতাময় ঔদাসোর সহিত ইন্দ্রাণীর কুশলবার্ত্তা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কথাগুলি অধরে অর্দ্ধ সংলগ্ন হইয়া থাকিতেছে,তখনই আমার প্রণয়ীর মনের ভাব জ্বলন্ত অক্ষরে আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া পড়িল। ক্রমে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইল,—কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতাতে আমার কি ক্ষতির সম্ভাবনা? হৃদয়ে হৃদয়ে বিজড়িত থাকিলে, মর্ম্মে মর্ম্মে গ্রথিত থাকিলে, গঙ্গা যমুনার মত দুই প্রাণ এক প্রাণগত থাকিলে সেই ঘনিষ্ঠতাতে আমার কি ক্ষতির সম্ভাবনা?—কিন্তু ক্ষতির সম্ভাবনা আমি আভাসেই অনুভব করিলাম। দেখিলাম, সেই ঘনিষ্ঠতার পর যখনই সুরেন্দ্র আমার নিকট আসিতেন, তখনই তাঁহার মুখে একটী গম্ভীর, একটী বিষণ্ণ, অথচ ঔদাসাময় ভাব দেখিতে পাইতাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি বলিতেন 'কি জানি আমার মন কেন অকারণে—এমন উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। শয়নে স্বপ্নে, আমোদে আহ্লাদে কিছুতেই যেন আমার তৃপ্তি নাই।' আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই দেখিতে পাইতাম, সুতরাং সুরেন্দ্রের উপর অভিমান না করিয়া তাঁহার দুঃখে সম-দুঃখী হইয়া থাকিতাম। ক্রমে যখন দেখিতে পাইলাম যে ইন্দ্রাণীর নামে, ইন্দ্রাণীর গলার স্বরে, ইন্দ্রাণী আসিতেছে দেখিয়া সেই ঔদাসা-রূপ ভস্মের মাঝারে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে,—সমস্ত ভস্মরাশি ক্ষণেকের জন্যও উজ্জ্বল হইয়া পড়ে, অথচ সুরেন্দ্র আবার সেই অগ্নি ভস্মেই লুকাইতে চেষ্টা করেন, ক্রমে যখন দেখিতে পাইলাম, এই রূপ অবস্থাতে তিনি এতদূর অনামনস্ক হইয়া পড়েন যে আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে তিনি কখন কখন অসম্বন্ধ কথা পর্য্যন্ত কহিয়া বসেন,—কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন যে, মনের তাঁর কিছুই স্থিরতা নাই—অথচ যখন দেখিলাম আমার অসাক্ষাতে তাঁহাদের দুজনের গল্পের ছেদ থাকে না, মাথা মুণ্ড কি গল্প করেন তার ঠিকানা নাই, কিন্তু তাহাতেই তাঁহাদের মুখে যে প্রমোদময় কেমন-কেমন ভাব, চক্ষে আবেশময় কেমন-কেমন চাউনী,—দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহারা কি এক কবিতাময়, স্বপ্নময়, জ্যোৎস্না-তরঙ্গে হৃদয়ের মলয়মারুতহিল্লোলে ভাসিতেছেন, অথচ আমাকে সেই স্থানে দেখিবামাত্রই সহসা যেন তাঁহাদের সুখের স্বপ্ন ভঙ্গ হইয়া যায়, সহসা যেন তাঁহাদের নন্দনকানন

মরুভূমিতে পরিণত হয়, সহসা যেন হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত উৎস আপনা আপনি শুখাইয়া যায়, সহসা যেন সেই কপট ঔদাসো সুরেন্দ্র আমাকে প্রতারিত করিতে যত্নবান হন, এবং বিফল-প্রযত্ন হইয়া কেবল অস্ফুট, বা অর্দ্ধস্ফুট কতকগুলি অসংলগ্ন কথার দ্বারাই আপনিই আপনাকে ধরা দেন, তখনই আমি আমার প্রতি তাঁহার প্রেমের অবসান অনুভব করিতে পারিতাম। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে আমার অভিমানের উদ্রেক হইতে লাগিল—প্রথমে সন্দেহ, পরে অভিমান। আমার অভিমান দেখিয়া সুরেন্দ্র আমাকে শত সহস্র প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, "ধ্রুব নক্ষত্রের মত আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা স্থিরই আছে,—আর ইন্দ্রাণীর সহিত ভালবাসা কেবল চোখের আত্মীয়তা মাত্র। ইন্দ্রাণী অতি শান্ত ও সুশীল, ইন্দ্রাণী তাঁহাকে অত্যন্ত যত্ন করেন, ইন্দ্রাণীর গুণে (রূপে নয়) কতকটা বিমুগ্ধ হওয়া অসম্ভব নয়,—কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ইন্দ্রাণীর সহিত সুরেন্দ্রের কেবল চোখের আত্মীয়তা মাত্র" —এই সকল ছলনাময় প্রলাপবাক্যে তিনি আমাকে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা পাইতেন, কিন্তু প্রণয়ের দেবতা এত দূর সর্ব্বজ্ঞ, ভালবাসাময় হৃদয় এ'দূর সর্ব্বদর্শী, যে সুরেন্দ্রের কথায় আমার যাতনা বাড়িত বই আর কমিত না। সুরেন্দ্র ক্রমে আমার প্রতি সমধিক যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন, নিজের পরিজ্ঞাত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিনি আমাকে সমধিক যত্ন প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন,—তাহাতেও আমার হৃদয়ের যাতনা বাড়িত বই আর কমিত না।

ক্রমে যতই তাঁহাদেরই ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল ততই দিন দিন আমার যাতনা, যাতনা হইতে অভিমান তীব্রতর হইতে লাগিল।

অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই যাতনা হৃদয়ের নিভৃত গহ্বরে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু প্রতিক্ষণেই উচ্ছ্বসিত অশ্রুতরঙ্গ দ্বারাই আমি আপনিই সুরেন্দ্রের কাছে ধরা পড়িলাম। নির্জ্জনে বসিয়া উঁহাদিগের নূতন ভালবাসার কথা ভাবি, উভয়ের সম্মুখে যাতনার আভাস পর্য্যন্ত ছলনাময় ঔদাস্যে ঢাকিয়া রাখি, কিন্তু সুরেন্দ্রকে একেলা নির্জ্জনে পাইলে আপনার প্রতিজ্ঞা বিরুদ্ধেও হৃদয়সাগর মথিত হইয়া অশ্রু তুফান যেন আপনা আপনি উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। কিন্তু সে অশ্রুধারার উত্তরে আমি সুরেন্দ্রের নিকট হইতে কি প্রতিদান পাইতাম? প্রথম প্রথম তিনি আমার অনলময় অশ্রুধারা দেখিয়া কতকটা কাতর হইতেন, ক্রমে গম্ভীর ভাবে আমাকে হৃদয়ের উদারতার বিষয়ে অজস্র উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, পরে তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইয়া আমার নির্দ্দোষী কল্পনাকে সকল দোষের দোষী সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আমার বিষণ্ণ মুখ, আমার গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস, আমার বিগলিত অশ্রুধারা দেখিয়া তিনি ক্রমাগতই বলি-

তেন যে 'ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার প্রণয়ই হয় নাই, সুতরাং তুমি যদি তোমার আপনার কল্পনার দোষে আপনি কষ্ট পাও, তাহা হইলে আমি তাহার কি করিব তুমি দেখাও, তুমি আমাকে বুঝাও যে আমি তোমা অপেক্ষাও ইন্দ্রাণীকে অধিক ভালবাসি।'——কিন্তু হে হৃদয়-দেবতা, তুমিই বল দেখি যে, হৃদয়ের দ্বারাই হৃদয় না বুঝিয়া ন্যায় শাস্ত্রের কূটতর্ক দ্বারা হৃদয়ের গতিবিধি কি সপ্রমাণ হইতে পারে? আমার কল্পনা সকল দোষে দোষী হইতে পারে—— কিন্তু যে কল্পনা-প্রভাবে আমি এক সময়ে মর্ত্যলোকে সুরেন্দ্রকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছি, যে কল্পনাপ্রভাবে সুরেন্দ্রের সহবাসকে আমি সপ্তম স্বর্গের শেষ পর্য্যন্ত মনে করিয়াছি, যে কল্পনাপ্রভাবে আমি সুরেন্দ্রের চরণযুগল অনন্দাশ্রুতে বিধৌত করিয়াছি, আজ কেনই বা সেই কল্পনা বিকৃত হইয়া সুরেন্দ্রের দোষ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে—আজ কেনই বা সেই কল্পনাপ্রভাবে আমি সুরেন্দ্রের চরণযুগল বিগলিত হৃদয়ের অশ্রুধারা দ্বারা প্লাবিত করিয়া তুলিতেছি—হৃদয়-দেব! তুমি এই হৃদয়ের অকস্মাৎ বিকারের কারণ অবশ্যই জান। বুদ্ধির বিশ্বাস আর মর্ম্মের বিশ্বাস——দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ। বুদ্ধি ও বিবেচনার দ্বারা একটী বিষয় স্থির সিদ্ধান্ত হইলেও হৃদয় তাহা অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া অগ্রাহ্য করে। তাহার কারণ এই—ন্যায়শাস্ত্রের প্রচলিত প্রণালী অনুসারে বুদ্ধি একটী বিশ্বাসে আসিয়া উপনীত হয়, কিন্তু হৃদয় কেবল অনুভব দ্বারাই, একটী স্থির বিশ্বাসে আসিয়া উপনীত হয়। বুদ্ধির অগম্য, বুদ্ধির অগ্রাহ্য যে সূক্ষ্ম প্রণালীতে মর্ম্মের বিশ্বাস আসিয়া পড়ে, তাহা কেবল মর্ম্মান্তিক অনুভব-সাপেক্ষ। সুতরাং সুরেন্দ্রের কথাতে প্রতারিত না হইয়া তাঁহার তিরস্কারে আমার নির্দ্দোষ কল্পনাকে দোষী না করিয়া এবং ন্যায় শাস্ত্রের জটিল অরণ্যে, আমার মর্ম্মগত বিশ্বাস না হারাইয়া আমি বৈরাগ্য-মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। জানিতাম যে, পদ্মানদীর কূলে একবার মাত্র একটী চিড় লাগিলে তাহা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং পরিশেষে, সেই রেখাবৎ চিড় মাত্র অবলম্বন করিয়া, সেই সমস্ত পুলিন-দেশ পদ্মার গভীর গহ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়। সেই রূপ ভালবাসাতে একবার মাত্র একটী চিড় উপস্থিত হইলে তাহা পূর্ণ না হইয়া উত্তরোত্তর বরং আরও বিস্ফারিত হইতেই থাকিবে। যখন দেখিলাম যে আমার প্রতি সুরেন্দ্রের ভালবাসার সেই চীড় পড়িয়াছে, যখন দেখিলাম যে কোন ওজর বা ছল করিয়া তিনি আমার নিকট হইতে ইন্দ্রাণীর কাছে যাইতে পারিলে আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সুখী মনে করেন, যখন দেখিলাম যে তিনি সংসারের গুটি কতক অবশ্য বক্তব্য স্থূল কথা কহিয়া "আর কি গল্প করিব" বলিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতেও কৃপণতা প্রদর্শন করেন, যখন

দেখিলাম যে এত প্রকাশ্য কৃপণতা সত্ত্বেও ইন্দ্রাণীর সঙ্গে বিজনে তাঁহার কথার আর পরিচ্ছেদ থাকে না, যখন ক্রমে ক্রমে আবার ইন্দ্রাণী বিষয়ে তাঁর সেই পূর্ব্বের কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত, সলজ্জ ভাব পর্য্যন্ত তিরোহিত হইতে লাগিল, তখন প্রেমের আশায়, সুখের আশায়, সোহাগের আশায়, একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া পিতার সহিত সন্ন্যাস-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম।

আমি। কেন তুমি সুরেন্দ্রের কাছে তোমার মনের দুঃখ ও যাতনা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিলে না?

পুণ্যবতী। হা অদৃষ্ট! তুমি কি জান না যে নদীর গতিরোধ বরং সহজ, তবুও নূতন প্রেমের গতিরোধ একেবারেই অসম্ভব। অরণ্যে রোদন করিলে তবুও ত রোদনের অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনা যাইতে পারে, কিন্তু সুরেন্দ্রের নিকট সে সময় রোদন করিলে বরং তাঁহার মনে বিরক্তির উদ্রেক হইবারই সম্ভাবনা। প্রথমে মমতা, পরে বোঝাবার চেষ্টা, তৎ পরে বিরক্তি, ক্রমে ঘৃণা, পরিশেষে কঠোর ঔদাস্য—প্রেমের অবনতির ও অবসানের এই নিদারুণ দৃশ্য পরম্পরা সম্যক রূপে দেখিবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার সহবাস পরিত্যাগ করিয়া হিমাচলে আসিয়াছি।"

এই কথা বলিতে বলিতে পুণ্যবতীর বিশাল বক্ষ দিয়া যে শ্রাবণধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমার হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হইয়া পড়িল, এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে দেখি রজনী প্রভাত হইয়াছে—হোমাগ্নি মলিন হইয়া আসিতেছে এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রাতঃস্তোত্রে দিক-মণ্ডল রোমাঞ্চিত হইতেছে। সুতরাং পুণ্যবতীকে ছাড়িয়া আমাকেও সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে দেব-আরাধনায় সম্মিলিত হইতে হইল।

শ্রী দাঃ

উদয়নাচার্য্য।

বাণভট্ট।

বাণভট্ট সংস্কৃত ভাষায় কাদম্বরী নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট গদ্য কাব্য প্রণয়ন করেন। বাণভট্ট গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই এজন্য উহার উত্তর ভাগ তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। বাণভট্ট "হর্ষচরিত" "চন্ত্রিকাশতক" প্রভৃতি আরো কএক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সার্ঙ্গধরপদ্ধতির[১] মতে বাণভট্ট ময়ূরভট্ট ও মাতঙ্গদিবাকর শ্রীহর্ষ রাজার সভ্য ছিলেন ১ মাধবাচার্য্যের মতে বাণ ও ময়ূর অবন্তি-দেশবাসী ছিলেন। ময়ূরভট্ট বাণের শ্বশুর ছিলেন। রামদাস বাবু বলেন—

বাণভট্ট হর্ষচরিত-প্রণেতা। কান্য-কুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বালসখিতা ছিল এজন্য তিনি হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অঃ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রা-জত্ব করিয়াছিলেন কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতনলিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রী-ষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যশাসন সময়ে কানাকুব্জে গমন করিয়া-ছিলেন। আবুরিহান কহেন এই হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ-অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানাকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কানাকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন এবং ইনিই হিয়াঙসিয়াঙের শ্রীহর্ষ শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পারিষদ সুতরাং তিনি খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। ২"

আমরা রামদাস বাবুর এই কথা অনা-দর করি না, কেন না ডাক্তার হল ৩ মুসলমান-ইতিহাসলেখক আবুরিহান ৪ প্রভৃতির মতের সহিত তাহার ঐক্য আছে। খৃঃ দশম শতাব্দীর পরার্দ্ধের লোক ত্রিলো-চনদাস ও নবম শতাব্দীর লোক দুর্গা মহোপাধ্যায় শ্রীপতিদত্ত বাণভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ৫ এই সকল কারণে আমাদের নিকট রামদাস বাবুর যুক্তি প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জর্ম্মান

১ অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ। শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমো বাণময়ূরকঃ।

২ ঐতিহাসিক রহস্য ২ ভাগ বাণভট্ট নামক প্রস্তাব দেখ।

৩ Dr. Holles Catalogue

৪ Aburihan. Translated by Whitney.

৫ ত্রিলোচন-কৃত "কাতন্ত্রপঞ্জিকা" এবং শ্রীপতিদত্ত-কৃত "কাতন্ত্রপরিশিষ্ট" দেখ।

ভাষায় কাদম্বরীর অনুবাদক শাস্ত্রদর্শী ভন্ বট্‌লার সাহেব বলেন, বাণভট্ট অষ্টম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ৬ "প্রাচ্য সাহিত্য" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা টমসন্ সাহেবও ভন বট্‌লারের মতের অনুমোদন করিয়াছেন ৭ কিন্তু পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের উদ্ভাবিত মত হইতে আমাদের নিকট রামদাস বাবুর মতই অধিক সারবান বোধ হয়, অতএব আমরাও রামদাস বাবুর মতের অনুমোদন করিয়া বলিতেছি যে, বাণভট্ট খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

ময়ূরভট্ট।

ময়ূর বাণভট্টের শ্বশুর ও সমকালীন লোক ছিলেন। সার্ঙ্গধর, জৈন গ্রন্থ ও সূর্য্যশতকের টীকাকার মধুসূদন প্রভৃতিও একথা স্বীকার করিয়াছেন। রামদাস বাবুও তাঁহাদের কথা অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং ময়ূরভট্টও খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ময়ূরভট্ট ও কান্যকুব্জাধিপতি শ্রীহর্ষ হর্ষবর্দ্ধনের সভা ছিলেন। কাহারও মতে ৮ কুল্লুক ভট্ট প্রভৃতির সমকালে এক ময়ূরভট্ট ছিলেন। বোধ হয় ইনি একজন স্বতন্ত্র ময়ূরভট্ট। ৯

৬ ভন্‌বট্‌লার কৃত Annotations of Kadambari দেখ।

৭ টমসন্ কৃত Oriental Literature দেখ।

৮ বান্ধব; তৃতীয় ভাগ, ৩৮১ পৃষ্ঠা

৯ আমাদের ময়ূরভট্ট সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

(শঙ্করাচার্য্য)

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল-উচ্ছেদক ও বেদ-ভাষ্যকার ভুবনবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অধিক লেখা বাহুল্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে অনেক প্রস্তাব বাহির হইয়াছে বিশেষতঃ তাঁহাকে লইয়া এক খানি মহা কাব্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতবাসী মাত্রই তাঁহাকে দেবতার অবতার বলিয়া জানেন। খণ্ডনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে শঙ্করের নাম উল্লেখ আছে। ১০ ইহাতে জানা যায় শঙ্কর নৈষধকার শ্রীহর্ষের (খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের) পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কাহারও মতে খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক ১১ ও কাহারও কাহারও মতে খৃঃ অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। ১২

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যক ভারতীতে মাধবাচার্য্যের কথার সত্যাসত্য বিচার জন্য যে যে

১০ See The Khandana (Calcutta Edition) p. 2

১১ See Professor Cowell's preface of the Kasumanjali, page X.

১২ (1) Colebrookes Essays Vol 1. page 332 Also Colebrooke's Preface to his translation of the Dayabhaga.

(2) Wilson's preface to his Sanskrit Dictionary 1 st Ed page XV11 and Wilsons Essays on the Religion of Hindus Vol 1. p. 201.

প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলাম তাহাতে দেখা যাইতেছে যে মাধবাচার্য্যের কথা প্রায় সর্ব্বাংশে প্রমাদপূর্ণ। এখন যদি তাঁহার কথাকে অবাস্তবিক বলি, বোধ হয় তাহা হইলে একেবারে হাস্যাস্পদ হইব না; কেননা পুরাতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণের যুক্তি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টরূপে দেখা যায় যে বাণভট্ট ও ময়ূরভট্ট হইতে শঙ্করাচার্য্য প্রায় ১৭০ বৎসরের পরসাময়িক লোক—আবার শঙ্করাচার্য্য হইতে শ্রীহর্ষ প্রায় ৩৭০ বৎসরের পরবর্ত্তী লোক—আবার ময়ূর ও বাণ হইতে শ্রীহর্ষ প্রায় ৫৪০ বৎসরের পরসাময়িক লোক। এখন স্পষ্ট রূপে দেখা যায় যে ময়ূর ও বাণ ব্যতীত মাধবাচার্য্য যাঁহাদিগকে সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন, তাহাতে প্রত্যেকের আবির্ভাব-কাল এত অন্তর যে তাহাদের কাহার সঙ্গেই কাহার কস্মিন কালেও দেখা হইতে পারে না। অতএব এখন যদি আমরা মাধবাচার্য্যের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া চলি তবে আমাদিগকে পদে পদে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে মাধবাচার্য্যের বাক্যের এই সার গ্রহণ করা যাইতে পারে যে তদুল্লিখিত সমকাল-আবির্ভূত মহাত্মাগণ সকলেই তাহা হইতে (খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে) পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা যে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ভারত বিখ্যাত মহাত্মার চিরস্মরণীয় নাম মুকুটস্থলে সংস্থাপিত করিয়া এই প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এখন ভারতীয় সাহিত্য সংসারের সেই অতুল মণি উদয়নাচার্য্যের সময় নিরূপণ করিবার জন্য কোন্ সোপানের অনুসরণ করিব? যদি মাধবাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর করি তবে উদয়নাচার্য্যকে কাহার সমসাময়িক বলিব? এখন যদি অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া একথার উত্তর দিই তবে দিশাহারা হইয়া অবশেষে "মাধবাচার্য্যের কথায় যখন কোনও সামঞ্জস্য নাই তখন গত্যন্তরেই তাঁহার কথা ছাড়িয়া সোপানান্তরের অনুসরণ করিতে হইবে" একথা না বলিয়া আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং আমরা এখন মাধবাচার্য্যের কথা ছাড়িয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছি:—

উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে অধ্যাপক কাউয়েল সাহেব যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম এই—কাউয়েল সাহেব বলেন "উদয়নাচার্য্যের সময় নিরূপণ করিতে হইলে আমরা প্রাচীন ন্যায়-শাস্ত্রের অনুশীলন করিলে কিছু জানিতে পারিব। ন্যায়ের অতি প্রাচীন সূত্র সমূহ গোতম অথবা অক্ষপাদ ঋষির কৃত; এই সূত্রের "ন্যায়ভাষ্য" নামক পক্ষিলস্বামী অথবা বাৎস্যায়ন নামক কোনৈক ব্রাহ্মণের[১৩] এক খানা টীকা আছে; এই "ন্যায় ভাষ্যের"

১৩ সুপ্রসিদ্ধ চানক্য পণ্ডিতেরই অপর নাম পক্ষিলস্বামী ও বাৎস্যায়ন:—
বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্য শ্চনকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃপক্ষিলস্বামী বিষ্ণু গুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ।
হেমচন্দ্রকৃত অভিধান-চিন্তামণি মর্ত্ত্য-কাণ্ড। চানক্য ন্যায় শাস্ত্রে পক্ষিল স্বামী ও বাৎস্যায়ন নাম ধারণ করেন (বান্ধব ১২৮৫ সন ১৫৪ পৃষ্ঠা।

উদ্যোতকর আচার্য্য ১৪ নামক এক ব্যক্তির "ন্যায়বার্ত্তিক" নামে এক খানা টীকা আছে। এই "ন্যায়বার্ত্তিকের" বাচস্পতিমিশ্র-কৃত একখানি টীকা আছে তাহার নাম "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা।" আবার এই "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার" "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক উদয়নাচার্য্য-কৃত এক খানি টীকা আছে। যখন উদয়ন, বাচস্পতি মিশ্রের "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার" "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের পরসাময়িক লোক। আবার মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে অনেক স্থলে কুসুমাঞ্জলি উদ্ধৃত করিয়াছেন সুতরাং ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে উদয়ন, মাধবাচার্য্যের পূর্ব্বসাময়িক।"

কাউয়েল সাহেব আরো বলেন—"বাচস্পতিমিশ্র শঙ্করাচার্য্যের "বেদান্তসূত্র-টীকার" "ভামতি ১৫ নাম্নী এক টীকা প্রণয়ন করেন; সুতরাং ইহাতে জানা যায় যে বাচস্পতিমিশ্র শঙ্করাচার্য্যের পরসাময়িক। এখন আমরা শঙ্করাচার্য্যের বিষয় জানি যে তিনি খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন এবং মাধবাচার্য্যের বিষয় জানি যে তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং আমরা বিশেষ ভ্রমের আশঙ্কা না করিয়া বাচস্পতিমিশ্রকে খৃষ্টীয় দশম এবং উদয়নাচার্য্যকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করিতে পারি।" ১৬

কাউয়েল সাহেবের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বোম্বাই হইতে পণ্ডিত কাশীনাথ তৈলঙ্গ ত্র্যম্বক যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই:—

"কাউয়েল সাহেব বলেন উদয়নাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক এক টীকা প্রণয়ন করেন কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে উদয়ন "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" লিখিয়াছেন তিনিই যে "কুসুমাঞ্জলি" প্রণেতা উদয়ন তাহার প্রমাণ কি? পক্ষান্তরে আমরা এক প্রকার প্রমাণ দিতে পারিব যে তাহাতে কাউয়েল সাহেবের সিদ্ধান্ত ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সে প্রমাণ এই:—

'কলিকাতার পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি বাচস্পতিমিশ্র-কৃত 'সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী'

১৪ ডাক্তার হল সাহেব উদ্যোতকর ও উদয়নাচার্য্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু কাউএল তাঁহার মত খণ্ডাইয়া অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে উদ্যোতকর ও উদয়ন ভিন্ন ব্যক্তি Cowlls Edition of Kusumanjali priface X.

১৫ "ভামতি" এবং "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা" এ দুই খানি টীকাই যে বাচস্পতিমিশ্র-কৃত ইহা ভামতির তালিকায় উল্লেখ আছে। Dr. Halls Catalogue. page 67

১৬ See Cowell's preface to the Kusumanjali

নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সেই পুস্তকের ভূমিকায় লেখা আছে যে বাচস্পতিমিশ্র শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের" খণ্ডনোদ্ধার নামক এক খানা উত্তর লিখিয়াছেন ১৭। পণ্ডিত মহাশয় কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। বাচস্পতিমিশ্র "ভামতি" নাম্নী যে টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কৃত পুস্তকের এক তালিকা আছে, এবং ডাক্তার হল ভামতিতে যে তালিকা আছে তাহা সমস্তই উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু তাহাতে খণ্ডনোদ্ধারের নাম দৃষ্ট হয় না। সুতরাং যদি ডাক্তার হল বাচস্পতিমিশ্রের তালিকা সমস্তই উদ্ধৃত করিয়া থাকেন তাহা হইলে পণ্ডিত মহাশয়ের কথার কিছুই গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের ন্যায় এক জন অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ লোক যে কিছু না জানিয়াই খণ্ডনোদ্ধারকে বাচস্পতিমিশ্র-কৃত বলিবেন ইহাও বিশ্বাস হয় না; সুতরাং আমাদের এই বিশ্বাস যে বাচস্পতিমিশ্র "খণ্ডনোদ্ধার" গ্রন্থ ভামতি লিখিবার পর প্রণয়ন করেন। যদি পণ্ডিত মহোদয়ের কথা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে এই দেখিতে পাওয়া যায় যে বাচস্পতিমিশ্র উদয়নের পরসাময়িক। কারণ খণ্ডন-প্রণেতা শ্রীহর্ষ উদয়নকে প্রশ্নের উত্তর-স্থলে এই প্রকার বলিয়াছেন "সেই জন্য তর্কস্থলে ইহা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয় যে তোমারই শ্লোক আমরা দুই একটী অক্ষর পরিবর্ত্তন করিয়া এস্থলে গ্রহণ করিতে পারি" ১৮ সে শ্লোক এই:—

"ব্যাঘাতো যদি শঙ্কাস্তি
নচেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা
তর্কশঙ্কাবধিঃ কুতঃ। ১

এই শ্লোকটী স্পষ্টতই কুসুমাঞ্জলির তৃতীয় স্তবকের সপ্তম শ্লোকের অনুরূপ মাত্র—

শঙ্কাচেদনুমাহন্তোব
নচেৎ শঙ্কা ততস্তরম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা
তর্কশঙ্কাবধির্মতঃ।" ১৯

১৭ খণ্ডনোদ্ধার সম্বন্ধে এক জন বলেন "আমরা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয়ে হস্তলিখিত গ্রন্থের মধ্যে বাচস্পতিমিশ্র-কৃত "খণ্ডনোদ্ধার" নামক এক খানি পুস্তক দেখিয়াছি, ইহাতে শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের আপত্তি-মীমাংসা-চেষ্টা আছে। যদি এই বাচস্পতিমিশ্র "ভামতি" কার হয়েন তাঁহার উদয়নের পরবর্ত্তী হইবারই সম্ভাবনা; কিন্তু তিনি ভামতিকার কি না, তাহার প্রমাণ নাই। (বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা)। বোধ হয় তর্কবাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থ খানি দেখিয়া ভামতি ও এই গ্রন্থের গ্রন্থকারের নামসাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি কল্পনা করিয়াছেন, বিশেষ কোন প্রমাণ না পাইয়া এরূপ কল্পনা করা তাঁহার ন্যায় এক জন প্রধান পণ্ডিতের অনুচিত।

১৮ এই অনুবাদের মূল শ্লোক এই—
"তন্মদস্মাভিরপ্যস্মিন্নর্থে ন খলু দুষ্পটা।
স্বল্পাবৈধর্ম্যমাত্রমক্ষরাণি কিয়ন্ত্যপি

১৯ Indian Antiquary, part X.

পণ্ডিত কালীনাথ ত্র্যম্বক তৈলঙ্গ মহোদয় মাধবাচার্য্য কাউয়েল সাহেবের মত অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া বাচস্পতিমিশ্রকে উদয়নাচার্য্যের পরবর্ত্তী লোক করিতে চাহেন; কিন্তু তাঁহার এ উদ্ভাবনা তত

Vol I, page 297 (1871) বঙ্গ দর্শনের একজন লেখকও প্রায় পণ্ডিত কালীনাথ তৈলঙ্গ ত্র্যম্বক মহোদয়ের মতের অনুসরণ করিয়া কাউয়েল সাহেবের কথায় কিছু প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইতিয়ান এণ্টিকুইরির অনুকরণ করিয়া যে কএকটী আপত্তি করিয়াছেন তাহা আর বারম্বার উদ্ধৃত করিবার দরকার নাই! তিনি "সরস্বতি কণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে এই কথায় বলে যে কয়েকটী আপত্তি করিয়াছেন তাহাও ধর্ত্তব্য নহে, কেননা রামদাস বাবু প্রভৃতির লেখানুসারে ও কথা কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহার চতুর্থ আপত্তিটী এই স্থলে গ্রহণ করিতেছি—

"মাধবাচার্য্যের স্বকৃত শঙ্করদিগ্বিজয় নামক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য ও শ্রীহর্ষকে সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন * * * গ্রন্থের অপর স্থলে লিখিত আছে সুরেশ্বর আচার্য্যকে শঙ্কর বলিতেছেন যে—'বাচস্পতিত্বমধিগম্য বসুন্ধরায়াং ভাষ্যং বিধাস্যসিতমাং মম ভাষ্যটীকাং' অর্থাৎ বাচস্পতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বসুন্ধরায় জন্ম গ্রহণ করিবে এবং আমার ভাষ্যের টীকা বিধান করিবে (১৩) 'শঙ্করদিগ্বিজয়' ১৩ শ্লোক। এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য উদয়ন ও শ্রীহর্ষকে শঙ্করের ন্যায় প্রাচীন লেখক ভাবিতেন এবং বাচস্পতিমিশ্রকে তৎপরবর্ত্তী জ্ঞান করিতেন। (বঙ্গদর্শন, ৩য় খণ্ড ২৯ পৃষ্ঠা)

যুক্তিসঙ্গত জ্ঞান করি না। কেন না আমরা যতদূর জানি তাহাতে খণ্ডনোদ্ধারে এমন কোন প্রমাণ নাই যে তাহার বলে 'ভামতি' কার বাচস্পতিমিশ্র ও খণ্ডনোদ্ধার-প্রণেতা বাচস্পতিমিশ্রকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যায়। তিনি কাউয়েল সাহেবের বেলায় অবাধে বলিতে পারিলেন "এখন জিজ্ঞাসা করি যে উদয়ন ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি লিখিয়াছেন সেই উদয়নই যে কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা তাহার প্রমাণ কি?" কিন্তু তিনিই আবার বিশেষ প্রমাণ না পাইয়াই ভামতি-প্রণেতা ও খণ্ডনোদ্ধারপ্রণেতাকে অভিন্ন লোক বলিয়া বিশ্বাস করিলেন!! এখন আমরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি তাঁহার এই কথার অকাট্য প্রমাণ কি? তিনি বলিতে পারেন তিনি তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রকাশিত সাঙ্খ্যতত্ত্ব কৌমুদীর ভূমিকায় এই কথা দেখিয়াছেন। কিন্তু যখন উক্ত ভূমিকায় সে কথার কোনও প্রমাণ প্রকটিত হয় নাই তখন শুধু সেই মুখের কথা এমন কি প্রামাণিক হইল এবং কাউয়েল সাহেবের কথা ইবা কেন উপেক্ষিত হইল? আমরাই একথার তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ হইলাম। ভামতিকার এবং খণ্ডনোদ্ধার-রচয়িতা যে অভিন্ন ব্যক্তি যদি একথায় কোন প্রমাণ থাকিত তবে তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাহা অবশ্যই উল্লেখ করিতেন, যখন কোন প্রমাণ লিখেন নাই তখন বলিতে হইবে যে একথার কোন বলবৎ প্রমাণ নাই। অতএব ত্র্যম্বক মহোদয়, যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া

মহাত্মা কাউয়েল সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহার একটুকও গুরুত্ব লক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কাউয়েল সাহেবের যুক্তিকে উপেক্ষা করিতে সাহসী হইলাম না। তবে ভামতিকার এবং খণ্ডনোদ্ধারকার যে অভিন্ন ব্যক্তি এসম্বন্ধে যদি কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে তবে এই বলিতে হয় যে খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ, উদয়নাচার্য্য এবং বাচস্পতিমিশ্র, ইহাঁরা তিন জনই খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীহর্ষ উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির শ্লোক খণ্ডনখণ্ডখাদ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের প্রতিবাদ করিয়া আবার বাচস্পতিমিশ্র খণ্ডনোদ্ধার প্রণয়ন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য আবার বাচস্পতিমিশ্রের ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকার " ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং এখন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীহর্ষ, উদয়ন এবং বাচস্পতি ইহাঁরা সকলেই সকলের গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন অতএব ইহাঁরা তিন জনই সমসাময়িক লোক। যদি এমত হয় তবে কাউয়েল সাহেব যে বাচস্পতিমিশ্রকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছিলেন তাহাতে প্রমাদ লক্ষিত হইতেছে কিন্তু তিনি উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন তাহা বজায়ই রহিল। বাচস্পতি মিশ্র নৈষধকার শ্রীহর্ষের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন কিনা এখনো তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না কিন্তু উদয়নাচার্য্য এবং শ্রীহর্ষ যে এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাহার প্রমাণ দিতেছি।

এখন আমরা উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে একটী সাধারণের সংস্কার-বহির্ভূত কথা বলিব; সুতরাং এ কথাটী একেবারে নূতন না হইলেও অনেকাংশে নূতন। বারেন্দ্র শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন আমাদের আদি পুরুষ কুলশাস্ত্রধাতা পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যই কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা এতদিন মনে করিয়াছিলাম, যে ভাদুড়ীগণ নিজ বংশকে সম্মানিত করিবার জন্যই এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথাটি লইয়া যতই চর্চ্চা করা যায় ততই দেখা যায় একথাটি অমূলক নহে। কুলশাস্ত্রবিশারদ দেবীবর ঘটক যেমন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণকে ছত্রিশ মেলে বিভাগ করেন; সেইরূপ দেবীবরের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত-মুকুট-ভূষণ কুলশাস্ত্রবিধাতা মহামহোপাধ্যায় উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে উত্তমাধমতা পর্য্যালোচনা করিয়া আট পটীতে বা শ্রেণীতে বিভাগ করেন। ২০ ইনি বারেন্দ্র বিপ্র সমাজে সামাজিক শক্তিতে অসামান্য প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্র সমাজ ইহার

২০ আট পটীর নাম ১ম নিরাবিল ২ ভুষর্ণা, ৩ রোহিলা ৪ ভবানীপুর ৫ বেণী ৬ আলেখানী ৭ কুতুবখানি ৮ জোনালী।

করতলস্থ ছিল। কাহারও মতে কুল্লুকভট্ট ময়ূরভট্ট ২১ ও মঙ্গল ওঝা প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় মহাত্মাগণ উদয়নাচার্য্যের সহকারী ছিলেন ২২।

কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ উদয়নাচার্য্যই যে বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ীদের আদি পুরুষ ছিলেন এ সম্বন্ধে যদিও খুব প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যায় না তথাচ ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, একথা কখনই অবাস্তবিক নহে। কেন না রাজসাহী পাবনা ঢাকা ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় এখনো উদয়নাচার্য্যের বংশধরগণ অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁদের সকলেই জানেন যে ইহাঁরা উদয়নাচার্য্যের বংশসম্ভূত। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা সুবিজ্ঞ তাঁহারা অনেকেই বলিয়া থাকেন ইহাঁদের আদি পুরুষ উদয়নাচার্য্যই কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অন্যান্য স্থানের বিষয় তত ভাল জানি না। ঢাকা জিলার অন্তর্গত খল্লি নামে এক গ্রাম আছে তথায় উদয়নাচার্য্যের অধস্তন পুরুষগণ বাস করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে শত শত বৎসর হইতে পুরুষপরম্পরা কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে ইহাঁরা কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা ও কুলশাস্ত্রধাতা পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যের সন্তান। ইহাঁরা উদয়নাচার্য্যের সন্তান বলিয়াই এদেশে বহুকাল হইতে বহুল সম্মান পাইয়া থাকেন। খল্লির ভট্টাচার্য্যেরা বহুকালের ধারাবাহিক পণ্ডিত। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পণ্ডিতের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থের শেষ ভাগে তাঁহার নিজকৃত একটী শ্লোক আছে। তাহাতে জানা যায় কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্যই তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ। খল্লির ভট্টাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন যে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যই যে তাঁহাদের আদি পুরুষ, একথা ঘটককারিকায়ও উল্লেখ আছে। ঘটকগণ উদয়নাচার্য্যকে সূর্য্যের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা কোন মহাত্মার নিকট একটী শ্লোক শুনিয়াছি তাহাতে জানা যায় যে কুসুমাঞ্জলিকার ও কুলশাস্ত্রধাতা উদয়নাচার্য্য অভিন্ন ব্যক্তিঃ—

সুধীন্দ্রোদয়নাচার্য্যো
বারেন্দ্রকাশ্যপোদ্ভবঃ।
কুসুমাঞ্জলিকারশ্চ
কুলশাস্ত্রবিশারদঃ॥

এই সকল কথার মূল কি যদিও আমরা ঠিক বলিতে পারি না এবং ঘটকদের কারিকা স্বচক্ষে এখনো দেখিতে পারি নাই তথাচ যে সকল মহাত্মাদের নিকট এই সকল কথা শুনিয়াছি তাঁহাদের কথা আমরা একটুও অবিশ্বাস করি না। বারেন্দ্রকুলের কাশ্যপ গোত্রীয় কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্যই যে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা তাহাতে অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই।

কুসুমাঞ্জলি প্রণেতা উদয়নাচার্য্য এবং

২১ বান্ধব তৃতীয় খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা। এ ময়ূরভট্ট অবশ্য বাণভট্টের শ্বশুর ও শ্রীহর্ষ রাজার সভা ময়ূরভট্ট হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

২২ বান্ধব ৩য় খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা।

কুলশাস্ত্রবিশারদ পরম পণ্ডিত উদয়নাচার্য্য সে অভিন্ন ব্যক্তি একথা সম্বন্ধ নির্ণয় প্রণেতাও শুনিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "কেহ কেহ বলেন কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীই কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী ঘটক নৃসিংহ লাহুড়ীর সমসাময়িক। ইহাঁর নিবাস নিশিন্দা গ্রাম জিলা রাজসাহী। সুতরাং ইহাঁকে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিতে হয়। কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে এতদপেক্ষা প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়। কুসুমাঞ্জলির প্রণেতা উদয়নাচার্য্যই কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র কুলের ভাদুড়ী গোষ্ঠী-সম্ভূত ২৩" সম্বন্ধ নির্ণয়ের এই কথার কোন সামঞ্জস্য নাই কেন না একবার তাঁহার সন্দেহ হইল, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য হইতে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা অনেক প্রাচীনতম লোক; আবার দুই ছত্র পরেই বলিলেন "কুসুমাঞ্জলি প্রণেতাই কাশ্যপ গোত্রীয় বারেন্দ্র কুলের ভাদুড়ী গোষ্ঠী সম্ভূত"। তিনি উদয়নাচার্য্যকে নৃসিংহ লাহুড়ীর সমসাময়িক লোক কল্পনা করিয়া তাহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন এটীও তাঁহার সম্পূর্ণ ভ্রম। সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা লোকমুখে এক এক অলৌকিক কিংবদন্তী শুনিয়া অনেক স্থলে একেবারে অস্বাভাবিক করিয়া ফেলিয়াছেন। যাহা হউক আমরা সম্বন্ধনির্ণয়ের ঐতিহাসিক সত্যের উপর বড় নির্ভর করিতে চাই না। উপরি উক্ত বিষয়ের সার গ্রহণ করিলে এইমাত্র জানা যায় যে সম্বন্ধনির্ণয়ের আন্তরিক বিশ্বাস কুলশাস্ত্রজ্ঞ উদয়ন ও কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়ন অভিন্ন ব্যক্তি কিন্তু তিনি কুলশাস্ত্রজ্ঞ উদয়নের একটী সময় নির্দ্দেশের কোন প্রমাণ না পাইয়া সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারেন নাই।

ক্রমশঃ

২৩ "সম্বন্ধ নির্ণয়" পরিশিষ্টের ১০ পৃষ্ঠা

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

ইঙ্গ-বঙ্গদের ভাল কোরে চিন্‌তে গেলে তাঁদের তিন রকম অবস্থায় দেখ্‌তে হয়। তাঁরা ইংরাজদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন, বাঙ্গালীদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন ও তাঁদের স্বজাত ইঙ্গ-বঙ্গদের সুমুখে কি রকম ব্যবহার করেন। তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তাঁরা বোল্‌বেন, "আমরা তিন জায়গায় সমান ব্যবহার করি, কেননা আমাদের একটা "principle" আছে।" কিন্তু সেটা একটা কথার কথা মাত্র, আমি সে কথা বড় বিশ্বাস করি নে।

একটি ইঙ্গ-বঙ্গকে এক জন ইংরেজের সম্মুখে দেখ, তাঁকে দেখ্‌লে তোমার চক্ষু জুড়িয়ে যাবে। কেমন নম্র ও বিনীত ভাব! ভদ্রতার ভারে প্রতিকথায় ঘাড় নুয়ে নুয়ে পোড়্‌ছে। মৃদু ধীর স্বরে কথাগুলি বেরোচ্ছে; তর্ক কর্‌বার সময় অতিশয় সাবধানে নরম কোরে প্রতিবাদ করেন ও প্রতিবাদ কোর্‌তে হোলো বোলে অপর্য্যাপ্ত দুঃখ প্রকাশ করেন, অসংখ্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাঁর অজস্র ভদ্রতা দেখে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী সন্তুষ্ট মনে প্রার্থনা কোর্ত্তে থাকেন যে, তিনি যেন জন্ম জন্ম এই রকম প্রতিবাদ করেন। কথা কোন্ আর না কোন্, এক জন ইংরেজের কাছে এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ চুপ কোরে বোসে থাক্‌লেও তাঁর প্রতি অঙ্গভঙ্গী, প্রতি মুখের ভাবে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ হোতে থাকে কিন্তু তাঁকেই আবার তাঁর স্বজাতিমণ্ডলে দেখ, দেখ্‌বে, তিনিই এক জন মহা তেরিয়া-মেজাজের লোক। বিলেতে যিনি তিন বৎসর আছেন, এক বৎসরের বিলেত-বাসীর কাছে তাঁর অত্যন্ত পায়া-ভারি! এই "তিন বৎসর" ও "এক বৎসরের" মধ্যে যদি কখনো তর্ক ওঠে, তা' হোলে তুমি "তিন বৎসরে"র প্রতাপটা একবার দেখ্‌তে পাও! তিনি প্রতি কথা এমন ভাবে, এমন স্বরে বলেন যে, যেন সেই কথাগুলি নিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বোঝা-পড়া হোয়ে একটা স্থির-সিদ্ধান্ত হোয়ে গেছে! যিনি প্রতিবাদ কোর্‌চেন, তাঁকে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন "ভ্রান্ত," কখনো বা মুখের ওপর বলেন, "মূর্খ"! তাঁর ভদ্রতা একটি গণ্ডীর মধ্যে বাস করে, তার বাইরে প্রায় পদার্পণ করে না। বাকি বিশেষের জন্যে তিনি তাঁর ভদ্রতার বিশেষ বিশেষ মাত্রা স্থির কোরে রেখেছেন। ইংলণ্ডে যারা জন্মেছে, তাদের জন্যে বিড় চামচের এক চামচ, ইংলণ্ডে যারা পাঁচ বৎসর আছে, তাদের জন্যে মাঝারী চামচের এক চামচ, ইংলণ্ডে যারা সম্প্রতি এসেছে, তাদের জন্যে চায়ের চামচের এক চামচ ও ইংলণ্ডে যারা মূলে যায় নি, তাদের জন্যে ফোঁটা দুই তিন ব্যবস্থা! ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের ন্যূনাধিক্য নিয়ে তাঁদের ভদ্রতার মাত্রার ন্যূনাধিক্য হয়। তাঁদের মাপা-জোকা ভদ্রতার পায়ে গড় করি, তাঁদের "Principle"-এর পায়ে গড় করি!

বিলেতে এলে লোকে "Principle" "Principle" কোরে মহা কোলাহল কোর্ত্তে থাকে, কিন্তু আমি ও-রকম বাক্যের আড়ম্বর সইতে পারিনে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে চাই, "বাস্তবিক কি তোমরা একটা স্থির মত বেঁধেছ? আর সে মতগুলি বাঁধ্‌বার আগে কেন যে সে গুলি গ্রহণ কোর্‌লে তা' কি বিচার কোরে দেখেছ?" তাঁরা সকলেই বোলে উঠ্‌বেন "হাঁ;" কিন্তু আমি হলপ্ কোরে বোল্‌তে পারি, তাঁদের মধ্যে শতকরা নিরেনব্বুই জন তা' করেন নি! ইংরেজরা তাঁদের যদি বলে যে, কাকে তাঁদের কান উড়িয়ে নিয়ে গেছে, তা' হোলে কানে হাত না দিয়ে তাঁরা কাকের পশ্চাতে পশ্চাতে ছোটেন! সে

দিন এক জন গল্প কোর্‌ছিলেন, যে তাঁকে আর এক জন বাঙ্গালী জিজ্ঞাসা কোরেছিলেন যে, "মশায়েরা কি কাজ করা হয়?" এই গল্প শুনবামাত্র আমাদের এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু নিদারুণ ঘৃণার সঙ্গে বোলে উঠ্‌লেন, "দেখুন্ দেখি, কি Barbarous!" আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেম, "কেন Barbarous বুঝিয়ে দিন ত মশায়!" তিনি কোন মতে বোঝাতে পার্‌লেন না, তাঁর ভাবটা এই যে, যেমন মিথ্যে কথা না বলা, চুরী না করা নীতি-শাস্ত্রের কতকগুলি মূল নিয়ম, তেমনি অন্য মানুষকে তার জীবিকার কথা জিজ্ঞাসা না করাও একটা মূল নিয়মের মধ্যে, তার জন্যে অন্য কারণ অনুসন্ধানের আবশ্যক করে না! আমি তাঁকে বল্লেম যে, "দেখুন মশায়, ইংরেজরা একটা জিনিষ মন্দ বলে বোলে আপনি অবিচারে অকাতরে সেটাকে মন্দ বোল্‌বেন না। কেন ইংরেজরা মন্দ বোল্‌চে, সেটা আগে বিচার কোরে দেখ্‌বেন, তার পরে যদি যুক্তি-সিদ্ধ মনে হয়, তা হোলে না হয় মন্দ বোল্‌বেন। চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা করা ইংরাজেরা যে, কেন মন্দ বলে তার অবিশ্যি, কারণ আছে; অল্প বেতনে আপনি হয়ত অতি সামান্য চাকরী কোরচেন, আপনাকে চাকরীর কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে আপনার হয়ত উত্তর দিতে সঙ্কোচ বোধ হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন barbarous বোলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন তখন এ সকল কারণ আপনি বিবেচনা করেন নি।" এর থেকে বেশ বুঝতে পারবে যে, যে ইঙ্গবঙ্গগণ আমাদের দেশীয়-সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার আছে বোলে নাসা কুঞ্চিত করেন, বিলেতে থেকে তাঁরা তাঁদের কোটের ও প্যাণ্টলুনের পকেট্ পুরে রাশি রাশি কুসংস্কার নিয়ে যান। কুসংস্কার আর কাকে বলে বল? যতক্ষণে তুমি তোমার বিশেষ সংস্কারের একটা সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পার, ততক্ষণ আমি তাকে কুসংস্কার বোল্‌ব। অতএব হে ইঙ্গ-বঙ্গ, তুমি ভারতবর্ষের প্রতি সামাজিক আচার ব্যবহারকে যে Prejudice বোলে ঘৃণা কর, সেই ঘৃণা করাটাই হয়ত এক প্রকার Prejudice। তুমি হয়ত জাননা যে তুমি কেন ঘৃণা কোরচ। তোমার হয়ত একটা দারুণ কুসংস্কার আছে, যে তুমি ব্যতীত তোমার স্বদেশ-জাত আর সমস্ত দ্রব্যই মন্দ। আমি এক এক সময় ভাবি, এক জন বুদ্ধিমান প্রাণীর মনে কি রকম বেশরে এ রকম অন্ধ কুসংস্কার জন্মাতে পারে। সে দিন এক জায়গায় আমাদের দেশের শ্রাদ্ধের কথা হোচ্ছিল, বাপ-মার মৃত্যুর পর আমরা হবিষ্য করি, বেশ ভূষা করিনে ইত্যাদি শুনে একজন ইঙ্গবঙ্গ যুবক অধীর ভাবে আমাকে বোলে উঠলেন, যে, "আপনি অবিশ্যি মশায়, এ সকল অনুষ্ঠান ভাল বলেন না।" আমি বল্লেম "কেন নয়? মৃত আত্মীয়ের জন্যে শোক প্রকাশ করাতে আমিত কোন দোষ দেখিনে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে শোক প্রকাশ করবার ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। ইংরাজেরা কালো কাপোড় পোরে

শোক প্রকাশ করে বেলে শাদা কাপড় পোড়ে শোক প্রকাশ করা অসভ্যতার লক্ষণ মনে কোরো না; আমি দেখ্‌ছি ইংরেজরা যদি আত্মীয়ের মৃত্যু উপলক্ষে হবিষ্যান্ন খেত, আর আমাদের দেশের লোকেরা না খেত, তা হলে হবিষ্যান্ন খায় না বোলে আমাদের দেশের লোকের ওপর তোমার দ্বিগুণতর ঘৃণা হোত, ও মনে কোরতে, হবিষ্যান্ন খায় না বোলেই আমাদের দেশের এই দুর্দ্দশা, আর হবিষ্যান্ন খেতে আরম্ভ কোরলেই আমাদের দেশ উন্নতির চরম-শিখরে উঠ্‌তে পারবে।" এর চেয়ে কুসংস্কার আর কি হোতে পারে। ইঙ্গ-বঙ্গরা বলেন, দেশে গিয়ে দেশের লোককে সন্তুষ্ট করবার জন্যে দেশের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন করা ভীরুতা, শুদ্ধ তাই নয়, তাঁদের মহামান্য Principle-এর বিরুদ্ধাচরণ। এ কথা শুন্‌তে বেশ, কিন্তু এই মহাবীরদের একবার জিজ্ঞাসা কর, তাঁরা বিলেতে কি করেন। তাঁরা ঘাড় নত কোরে ইংরাজদের কুসংস্কারের অনুসরণ করেন কি না? তাঁরা জানেন সে গুলি কুসংস্কার, তবু জেনে শুনে সে গুলি পালন করেন কি না? তুমি হয়ত জান, ইংরাজেরা এক টেবিলে তেরজন খাওয়া অত্যন্ত অলক্ষণ মনে করেন, তাঁদের বিশ্বাস, তা হোলে এক বৎসরের মধ্যে তাঁদের এক জনের মৃত্যু হবেই। একজন ইঙ্গবঙ্গ যখন নিমন্ত্রণ করেন, তখন কোন মতে তেরজন নিমন্ত্রণ করেন না, জিজ্ঞাসা কোরলে বলেন, "আমি নিজে অবিশ্যি বিশ্বাস করিনে, কিন্তু যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা পাছে কষ্ট পান, তাই জন্যে বাধ্য হোয়ে এ নিয়ম পালন কোরতে হয়।" খুব উদার হৃদয় বটে! কিন্তু দেশে গিয়ে এই উদারতা কোথায় থাকে? তুমি হয়ত একটি সামান্য দেশাচার পালন কোরলে তোমার বাপ মা ভাই বোন তোমার সমস্ত দেশের লোক অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, তখন কি তুমি তাঁদের সকলের মনে কষ্ট দিয়ে সেই দেশাচারের উপর তোমার বুট শুদ্ধ পদাঘাত কর না? এইরূপ পদাঘাত কোরতে পারলে বোলে কি সমস্ত বৎসরটা অত্যন্ত মনের আনন্দে থাক না? সে দিন একজন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি বালককে রবিবার দিনে রাস্তায় খেলা কোরতে যেতে বারণ কোর্‌ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করাতে বোল্লেন, "রাস্তার লোকেরা কি মনে কোরবে?" রাস্তার লোকের কুসংস্কারের অনুবর্ত্তন কোরে তিনি যদি রবিবারে খেলা না করেন, তবে রাম-নবমীর দিনে তিনি দেশে গোমাংস ভক্ষণ করেন কেন?—Principle!!!

কুসংস্কার মানুষকে কতদূর অন্ধ কোরে তোলে, তা' বাঙ্গলার অশিক্ষিত কৃষীদের মধ্যে অনুসন্ধান করবার আবশ্যক করে না, ঘোরতর সভ্যতাভিমানী বিলিতি বাঙ্গালীদের মধ্যে তা দেখ্‌তে পাবে। হঠাৎ বিলেতের আলো লেগে তাঁদের চোক একেবারে অন্ধ হোয়ে যায়। কিন্তু বিলেতের কি দেখে তাঁরা এত মুগ্ধ হোয়ে পড়েন? আমি অনুসন্ধান কোরে দেখেছি, কেবল বাহ্য-চাকচিক্য! এ বিষয়ে তাঁরা

ঠিক বালকের মত! এক খানি বই দেখ্‌লে তাঁরা তার সোনার জলের চিত্র করা বাঁধানো মলাট দেখে হাঁ কোরে থাকেন, তার ভিতরে কি লেখা আছে, তার বড় খবর রাখেন না! কতকগুলি বাঙ্গালী বলেন, "এখানকার মত ঘর ভাড়া দেবার প্রথা তাঁরা আমাদের দেশে প্রচলিত কোর্‌বেন!" তাঁদের সেই একটি মাত্র সাধ আছে! তাঁদের চোখে বিলেতের আর কিছু তেমন পড়ে নি, সেমন, বিলেতের ঘর ভাড়া দেবার প্রথা! আর এক জন বাঙ্গালী, তিনি আমাদের বাঙ্গলা সমাজ-সংস্কার কোর্‌তে চান, তাঁর প্রধান বাতিক, তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের নাচ শেখ্‌বার বন্দোবস্ত কোরে দেবেন; বিলেতের সমাজে মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নাচাটাই তাঁর চোখে অত্যন্ত ভাল লেগেছে, ও আমাদের সমাজে মেয়েদের না নাচাই তাঁর প্রধান অভাব বোলে মনে হয়, তিনি এখানকার সমাজ-সমুদ্র মন্থন কোরে ঐ নাচ টুকুই পেয়েছেন! এই রকম বিলেতের কতকগুলি ছোট-খাটো বিষয়ই তাঁদের চোখে পড়ে, তাঁরা বিশেষ কি কি কারণে বিলেতের ওপর এত অনুরক্ত ও আমাদের দেশের ওপর এত বিরক্ত হোয়ে ওঠেন, তা' যদি দেখ্‌তে যাও ত, দেখ্‌বে, সে সকল অতি সামান্য আমি পূর্ব্বেই তা' সংক্ষেপে বোলেছি। প্রথমতঃ এখানকার সুসজ্জিত, পরিষ্কার, পরিপাটী, নিরিবিলি বাসস্থানে স্বাধীন ভাবে বাস কর্‌বার বন্দোবস্ত। দ্বিতীয়তঃ এখানকার মহিলাদের সঙ্গে মেশামেশি; তাদের মৃদু হাসি, মিষ্টালাপ, শিষ্টাচার এক জন বঙ্গ-যুবকের মাথা অতি শীঘ্র ঘুরিয়ে দেয়। তিনি আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে এখানকার মেয়েদের তুলনা কোর্‌তে পারেন; দেখেন এখানকার মেয়েরা কেমন স্পষ্ট ও মিষ্ট কথা কয়, একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্‌লে তার উত্তর পাবার জন্যে বছর পাঁচেক অপেক্ষা কোর্‌তে হয় না, তাদের মুখের উপরও যেমন ঘোমটার আবরণ নেই, তেমনি তাদের প্রতি আচার ব্যবহারের উপরে এক প্রকার কষ্টকর সঙ্কোচের আবরণ নেই। এই রকম কতকগুলি সাধারণ বিষয়ে আমাদের দেশের ও এদেশের মেয়েদের অমিল দেখে তার পরে তিনি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয় নিয়ে ছেলে মানুষের মত খুঁৎ খুঁৎ কোর্‌তে থাকেন। যে বালকের মাটির পুতুল আছে, সে আর একটি বালকের কাঠের পুতুল দেখে প্রথমতঃ তার নিজের কাঠের পুতুল নেই বোলে কাঁদ্‌তে বসে, এই রকমে তার নিজের পুতুলের ওপর যখন একবার বৈরাগ্য জন্মায়, তখন সেই কাঠের পুতুলের কানে একটা মাকড়ি দেখে তার খুঁৎ খুঁৎ দ্বিগুণ বেড়ে ওঠে, তখন বিবেচনা করেনা যে, সেই কাঠের পুতুলের কানে যেমন একটা মাকড়ি আছে, তেমনি তার মাটির পুতুলের গলায় একটা হার আছে; তার মা এসে বলে, "আচ্ছা বাপু তোর পুতুলের হাতে একটা বালা পরিয়ে দিচ্ছি।" সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মাটিতে পা ছুঁড়্‌তে ছুড়্‌তে

চিৎকার কোরে বোলে ওঠে "না আমার মাকড়ি চাই !" তার মা বলে, "আচ্ছা বাপু, একটা মল দিচ্ছি নেবা হয় !" সে দ্বিগুণ পা ছুঁড়ে বোলে ওঠে, " না, আমাকে মাকড়ি দে !" ইঙ্গ-বঙ্গেরা কতকটা এই রকম করেন। এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ "মহা খুঁৎ খুঁৎ কোরছিলেন যে, আমাদের দেশের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পারে না, ও এখানকার মত visitorদের সঙ্গে দেখা কোরতে ও visit প্রত্যর্পণ কোরতে যায় না ! হরি হরি ! তুমি কি কোকে আশা কোরতে পার যে, আমাদের মেয়েরা পিয়ানো বাজাতে পার্ব্বে ? তা'হোলে একজন বাঙ্গালী এখানে এসে খুঁৎ খুঁৎ কোরতে পারে যে এদেশের মেয়েরা পান সাজতে পারে না। দেশে থাকতে একবার শুনেছিলেম যে আমাদের দেশের মেয়েদের উপর একজন বাঙ্গালীর অভক্তি জন্মাবার একটা প্রধান কারণ হোচ্চে এই, যে, "ইংরাজের মেয়েরা এমন সরেশ নেবুর আচার তৈরি কোরতে পারে যে, তার ভিতরে বিচি থাকে না, কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা ত তা পারে না !" এ গল্পটা আমার নিতান্ত জনশ্রুতি মনে হয় না। কেন না মানুষের স্বভাবই এই যে, সাধারণতঃ এক জনের ওপর চোটে গেলে তার পরে তার খুঁটিনাটি ধোরতে আরম্ভ করে। সে দিন একজন বাঙ্গালী এখানকার সঙ্গে তুলনা কোরে আমাদের দেশের ভোজের প্রথা যে নিতান্ত barbarous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বোলেন যে আমাদের দেশে খাবার সময় মাছি ভ্যান্ ভ্যান্ করে। আর আমাদের দেশের লোকেরা যে, barbarous তাই প্রমাণ করবার জন্যে বল্লেন যে, সেখেনে জুতো খুলে খেলে জুতো চুরী কোরে নিয়ে যায়। জানিনে হয়ত তাঁর বিশ্বাস, যে, মাছি যদি বিলেতে আস্‌ত, ত এত সভ্য হোয়ে যেত যে, খাবার সময় আর ভ্যান্ ভ্যান্ কোরত না ! আর তিনি হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন, যে এদেশের লোকেরা জুতো খুলে খায় না। খুলে খেলে এখানে চুরি যেত কি না, সে বিষয়ে বলা ভারি শক্ত, অতএব সে বিষয়ে কোন প্রকার তুলনা উত্থাপন না করাই শ্রেয় ! এই রকম ক্রমাগত প্রতি ছোট খাটো বিষয় নিয়ে এদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা কোরে কোরে তাঁদের চটা ভাব চটনমান যন্ত্রে blood heat ছাড়িয়ে ওঠে ! একজন ইঙ্গবঙ্গ তাঁর সহানুভাবক বন্ধুদের দ্বারা বেষ্টিত হোয়ে বোলছিলেন যে, যখন তিনি মনে করেন যে, দেশে ফিরে গেলে তাঁকে চারদিকে ঘিরে মেয়ে গুলো প্যান্ প্যান্ কোরে কাঁদতে আরম্ভ কোরবে, তখন আর তাঁর দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না ! অর্থাৎ তিনি চান্, যে, তাঁকে দেখ্‌বা মাত্রেই, dear darling বোলে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন কোরে তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে ! এইটুকু অভিনয়ের ওপর তাঁর দেশে ফিরে যাওয়া না যাওয়া নির্ভর কোরচে। তিনি তাঁর বাড়ির লোকদের ভালবাসার তত মূল্য দেখেন না, যত তাদের ভালবাসা অভিনয়ের ! তিনি

তাঁর স্বীয় পরিবারদের কত ভাল বাসেন, এঁর থেকে একবার বিবেচনা কোরে দেখ। তাঁদের একটি মাত্র আচারের পরিবর্ত্তন হোলে তিনি বাড়ি ফিরে যেতে পারেন না, না জানি সে কি পরিবর্ত্তন। সে পরিবর্ত্তনে হয়ত চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তের বন্দোবস্ত একেবারে উল্টে যেতে পারে, প্রকৃতির একটা মহা বিপ্লব বাধ্‌তে পারে! সে পরিবর্ত্তন কি? না, S. K. Nandi Esjr-এর স্ত্রী পরিবারেরা যদি তাঁকে দেখে আনন্দের অশ্রু বর্ষণ না কোরে ছুটে তাঁকে আলিঙ্গন কোর্ত্তে আসে!! আমি আগেই বোলেছি বিলেতের কতকগুলি বাহ্যিক ছোট খাটো বিষয় বাঙ্গালীর চোখে পড়ে। তাঁরা যখন সাহেব হোতে যান, তখন সাহেবদের ছোট খাটো আচার গুলি নকল কোর্ত্তে যান। ছোট খাটো বিষয়ে তাঁদের খুটিনাটি যদি দেখ, তবে একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে যাও। ডিনারের টেবিলে কাঁটা ছুরী উল্টে ধোরতে হবে, কি পাল্‌টে ধোরতে হবে, তাই জান্‌বার জন্যে তাঁদের প্রাণপণ যত্ন, অন্বেষণ ও "গবেষণা" দেখলে তোমার তাঁদের উপর ভক্তির উদয় হবে! কোটের কোন্ ছাঁটটা fashionable হোয়েছে, আজকাল nobilityরা আঁট প্যাণ্টলুন্ পরেন কি ঢল্‌কো প্যাণ্টলুন্ পরেন. waltg নাচেন কি Polka নাচেন, মাছের পর মাংস খান কি মাংসের পর মাছ খান, সে বিষয়ে তাঁরা অভ্রান্ত খবর রাখেন। তুমি যদি দস্তানা পরবার সময় আগে থাক্‌তে বুড়ো আঙ্গুল গলিয়ে দেও, তিনি তৎক্ষণাৎ বোলে দেবেন, ও রকম দস্তুর নয়। ঐ রকম ছোট খাটো বিষয়ে একজন বাঙ্গালী যত দস্তুর বেদস্তুর নিয়ে নাড়া চাড়া করেন, এমন একজন জনবুল্ করেন না! তুমি যদি মাছ খাবার সময় ছুরী ব্যবহার করো * তবে একজন ইংরাজ তাতে বড় আশ্চর্য্য হবেন না, কেন না, তিনি জানেন তুমি বিদেশী, কিন্তু এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ সেখানে উপস্থিত থাক্‌লে তাঁর শ্মেলিংসল্‌টের আবশ্যক হোয়ে পড়বে। তুমি যদি শেরী খাবার গ্ল্যাশে শ্যাম্পেন খাও তবে একজন ইঙ্গ বঙ্গ তোমার দিকে তিন দণ্ড হাঁ কোরে তাকিয়ে থাক্‌বেন, যেন এমন জানোয়ার তিনি কখনো দেখেন নি; যেন, একটা অভূতপূর্ব্ব নিদারুণ বিপ্লব বেধে গেল; যেন, তোমার এই একটি অজ্ঞতার জন্যে সমস্ত পৃথিবীর সুখ-শান্তি নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে! সন্ধে বেলায় তুমি যদি Morning coat পর, তা' হোলে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হোলে যাবজ্জীবন তোমাকে দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা দেন! এক জন বিলাত-ফেরতা কাউকে মটন দিয়ে রাই দিয়ে খেতে দেখ্‌লে † বোল্‌তেন "তবে কেন মাথা দিয়ে চল না?" তাঁর চক্ষে রাই দিয়ে মটন্ খাওয়াও যা,' আর মাথা দিয়ে হাঁটাও তাই! এই রকম সব ছোটখাটো বিষয়েই ইঙ্গ-বঙ্গদের যত দৃষ্টি। ছোট খাটো বিষয়ে

* ইংরাজরা মাছ খাবার সময় কেবল মাত্র কাঁটা ব্যবহার করেন।

† বিলাতী ঔদরিক-শাস্ত্রে রাই দিয়ে মটন্ খাওয়া নিষিদ্ধ।

এত খুঁটি নাটি কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তার একটা কারণ দেখাতে পারি। বাঙ্গালী হোয়ে সাহেবের মুখষ্ পোর্‌তে গেলে প্রতি পদে ভয় হয়, পাছে বাঙ্গালীত্ব বেরিয়ে পড়ে; সুতরাং প্রতি সামান্য বিষয়ে সাবধান হওয়া স্বাভাবিক। তোমার কুর্ত্তা ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কালো হোলেও হানি নেই, কেন না সে সব কাপড়ে ঢাকা থাকে, কিন্তু মুখটা এমন সাবধানে চুনকাম করা আবশ্যক যে, কোন জায়গায় কালো বেরিয়ে না থাকে। তুমি যদি সাহেব হোতে চাও, তবে সাহেবদের যত খানি বাইরে চর্ম্ম-চক্ষে দেখা যায়, তত খানি নকল কোরলেই যথেষ্ট। যে বাঙ্গালীরা বিলেতে আসেন নি, তাঁরা তোমার বাঁকানো ইংরিজি সুর, তোমার হ্যাট্ কোট্, ও তোমার উদগ্রস্ফূর্ত্তি দেখে তাক্ হোয়ে থাক্‌বেন। কিন্তু একটা মজা দেখেছি, ইঙ্গ-বঙ্গেরা পরস্পর আপনাদের চেনেন; তাঁরা দল-বহির্ভূত লোকদের কাছে যথেষ্ট আস্ফালন করেন বটে, কিন্তু তাঁদের পরস্পরের কাছে কিছু গোপন নেই, তাঁরা নিজে বেশ জানেন যে,

"কাকস্য পক্ষৌ যদি স্বর্ণযুক্তৌ,
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য;
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা,
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।"

সোনা দিয়ে বাঁধা হোক্ কাকটার ডানা,
মাণিক জড়ানো হোক্ তার পা দুখানা,
এক এক পক্ষে তার গজমুক্তা থাক্,
রাজ হংস নয় কভু তবুও সে কাক!

আমি আর একটি আশ্চর্য্য লক্ষ্য কোরে দেখেছি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজদের কাছে যত আপনাদের দেশের লোকের ও আচার ব্যবহারের নিন্দে করেন, এমন একজন ঘোর ভারতদ্বেষী অ্যাঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান করেন না। তিনি নিজে ইংরেজ কোরে কথা পাড়েন ও ভারতবর্ষের নানা প্রকার কুসংস্কার প্রভৃতি নিয়ে প্রাণ খুলে হাস্য পরিহাস করেন। তিনি গল্প করেন যে, আমাদের দেশে বল্লভাচার্য্যের দল বোলে এক প্রকার বৈষ্ণবের দল আছে, তাদের সমস্ত অনুষ্ঠান সবিস্তারে বর্ণনা কোর্ত্তে থাকেন, তিনি বলেন, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত অসভ্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তিনি ভারতবর্ষীয়দের "নেটিব নেটিব" কোরে সম্বোধন করেন, সভার লোকদের হাসাবার অভিপ্রায়ে নেটিব nautch girl রা কি রকম কোরে নাচে, অঙ্গভঙ্গী কোরে তার নকল করা হয় ও তাই দেখে সকলে হাস্‌লে পরম আনন্দ উপভোগ করেন! তাঁরা যখন ভারতবর্ষীয়দের নিন্দে কোর্ত্তে থাকেন, তখন তাঁরা মনে মনে কল্পনা করেন তাঁরা নিজে "নেটিব" দলের বহির্ভূত! তিনি হয়ত মনে করেন, তাঁর শ্রোতারা অন্যান্য ভারতবর্ষীয়দের সঙ্গে তুলনা কোরে তাঁকে পচা পুকুরের পদ্ম, কাঁটাবনের গোলাপ বোলে মাথায় কোরে নেবে। তাঁর বিশ্বাস, তিনি যখন ভারতবর্ষীয়দের 'প্রেজুডিসের' উপর কটাক্ষপাত কোরে অপর্য্যাপ্ত হাস্য-কৌতুক করেন, তখন সকলে তাঁকে অবিশ্যি সে সকল 'প্রেজুডিস্' হোতে মুক্ত বোলে

গঠন কোরবেন।' তাঁর নিতান্ত ইচ্ছে, তাঁকে কেউ ভারতবর্ষীয় দলের মধ্যে গণ্য না করে। আমার মনে আছে, আমি দেশে থাকতে একজন সুশিক্ষিত উড়িষ্যাবাসী আমার কাছে কথায় কথায় বোলে ছিলেন যে "উড়ে মেড়ারা বড় মূর্খ!" শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বোলে গিয়েছিল। আমার এক বন্ধু পূর্ব্বাঞ্চলে তাঁর জমীদারী দেখতে গিয়েছিলেন, একজন মুষলমান তাঁকে কথা-প্রসঙ্গে বোলেছিল "মশায়, নেড়েদের কখনো বিশ্বাস কোর্ব্বেন না!" এই উড়িষ্যাবাসীর মনোগত ভাব এই যে, "আমি মূর্খ নই।" আর এই মুষলমানটি জানাতে চান যে, তিনি বিশ্বাস-পাত্র। কেন না, নিজে মূর্খ হোলে এই উড়িষ্যাবাসী কখনো অন্যের মূর্খতা নিয়ে বিদ্রূপ কোর্ত্তেন না, আর এই মুষলমানটির যখন স্বজাতির অবিশ্বাসিতার ওপর এত ঘৃণা, তখন তিনি নিজে বিশ্বাসী না হোয়ে যান্ না! এই রকম দেখতে পাবে যে, সাহেব-সাজা বাঙ্গালীদের প্রতি-পদে ভয়, পাছে তাঁরা বাঙ্গালী বোলে ধরা পড়েন। এক জন বাঙ্গালী একবার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁর কৃষ্ণ চর্ম্ম দেখে আর এক জন ভারতবর্ষীয় এসে তাঁকে হিন্দুস্থানীতে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা করে, তিনি মহা খাপা হোয়ে তার কথার উত্তর না দিয়ে চোলে যান। কিন্তু এত রাগ করবার তাৎপর্য্য কি? তাঁর ইচ্ছে, তাঁকে দেখে কেউ মনে না কোর্তে পারে যে, তিনি হিন্দুস্থানী বোঝেন। আহা, যদি টেমসের জলে স্নান কোর্লে রংটা বদ্‌লাতো, তবে কি সুখেরই হোত! এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একটি "জাতীয়-সঙ্গীত" রামপ্রসাদী সুরে রচনা কোরেছেন; এই গানটার একটু অংশ পূর্ব্ব পত্রে লিখেছি, বাকি আর একটুকু মনে পড়েছে,এই জন্য আবার তার উল্লেখ কচ্চি। যদিও এটা কতকটা ঠাট্টার ভাবে লেখা হোয়েছে, কিন্তু আমার বোধ হয় এর ভিতরে অনেকটা সত্যি আছে। এ গীত যাঁর রচনা, তিনি রামপ্রসাদের মত শ্যামার উপাসক নন, তিনি গৌরীভক্ত। এই জন্যে গৌরীকে সম্বোধন কোরে বল্‌ছেন।

"মা; এবার মোলে সাহেব হব;
রাঙা চুলে হ্যাট্ বসিয়ে, পোড়া নেটিব নাম ঘোচাব!
শাদা হাতে হাত দিয়ে মা, বাগানে বেড়াতে যাব,
(আবার) কালো বদন দেখলে পরে "ডার্কি" বোলে মুখ ফেরাব!"

আমি পূর্ব্বেই বিলেতের Land lady (বাড়িওয়ালী) শ্রেণীর কথা উল্লেখ কোরেছি। তারা বাড়ির লোকদের আবশ্যক মত সেবা করে। অনেক ভাড়াটে থাকলে তারা চাকরাণী রাখে, এবং অনেক সময়ে তাদের আপনাদের মেয়ে বা অন্য আত্মীয়েরা তাদের সাহায্য করবার জন্যে থাকে। এই Land lady শ্রেণীরা আমাদের বিদেশী ইঙ্গ-বঙ্গদের প্রবাস-দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর করে, অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ সুন্দরী Land lady দেখে ঘর ভাড়া করেন। এতে তাঁদের সময় কাটাবার যথেষ্ট সুবিধে হয়।

বাড়িতে পদার্পণ কোরেই তাঁর ল্যাণ্ড্-লেডির যুবতী কন্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কোরে নেন, দু তিন দিনের মধ্যে তার একটি আদরের নাম-করণ করা হয়, সপ্তাহ অতীত হোলে তার নামে হয়ত একটা কবিতা রচনা কোরে তাকে উপহার দেন। কোন সন্ধ্যে বেলায় হয়ত রান্না ঘরে গিয়ে ল্যাণ্ড-লেডি, তার কন্যা, ও ঘরের দাসী-টিকে বিজ্ঞান, দর্শন ও মনতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটা বাঁধা গত শোনাতে থাকেন, তারা তাঁর লম্বা-চৌড়া কথা গুলো হজম কোর্ত্তে না পেরে হাঁ কোরে ভাবে, ইনি এক জন কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে হবেন। কিন্তু Kitchen অঞ্চলে তিনি তাঁর গম্ভীর পাণ্ডিত্যের জন্যে তত বিখ্যাত নন; তাঁর নিজের বাড়ির ও পাশাপাশি দুয়েকটি বাড়ির দাসী শ্রেণীর মধ্যে তাঁর রসিকতার অত্যন্ত নাম-ডাক শোনা যায়। এই রকম জন শ্রুতি যে, সেদিন সন্ধ্যে বেলায় সিঁড়ির কাছে তিনি বাড়ির Kitchen maid Pollyর দাড়ি ধোরে এমন একটি ঠাট্টা কোরে-ছিলেন যে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে ছুটে পা-লিয়ে যায়। সেদিন Land ladyর মেয়ে তাঁকে এক পেয়ালা চা এনে জিজ্ঞাসা করে-ছিল যে, চায়ে কি চিনি দিতে হবে? তিনি হেসে বোল্লেন, "না নেলি, তুমি যখন ছুঁয়ে দিয়েছ, তখন আর চিনি দেবার আবশ্যক দেখ্‌ছি নে!" তুমি হয়ত এত কথা বি-শ্বাস কর্‌চ না; কিন্তু আমি যথার্থ কোরে বোল্‌ছি এর একটি কথাও বাড়ানো নয়। ইঙ্গ-বঙ্গগণ বিলেতের এই দাসি-শ্রেণীদের বিমল-সংসর্গে দিন দিন উন্নতি লাভ কোর্ত্তে থাকেন। আচ্ছা, মেয়েদের সঙ্গে যদি মিশতে চাও, তবে ভদ্রলোকের মেয়েদের সঙ্গে মেশ না কেন? কিন্তু কতকগুলি কারণ আছে, যে জন্যে ভদ্র-লোকের মেয়ে-দের সঙ্গে তত মেশা হয় না। বাঙ্গালী-দের উদ্যমের অভাব ও আলস্য বিলেতে এসেও ভাল কোরে ঘোচে না। তারা যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে শ্রম স্বীকার কোরে এক জনের বাড়ি গিয়ে দেখা কোরে দুদণ্ড কথা কোয়ে আস্‌বে তা' বড় হোয়ে ওঠে না। তার পরে আবার অনেক পড়া শুনো কোরে দেখা শুনো কোর্ত্তে যাবার বড় সময় পেয়ে ওঠেন না। তা' ছাড়া আমি দেখেছি, এক জন ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে ভদ্র স্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা, ও তাদের সঙ্গে নানা সামাজিক ভদ্র-তার নিয়ম পালন কোরে চলা অনেক বাঙ্গালীর পুষিয়ে ওঠে না; অনেকের দে-খেছি, এক জন ভদ্র স্ত্রীর কাছে সঙ্কোচে মুখ ফোটে না, কিন্তু এক জন নীচ-শ্রেণীর মেয়ের কাছে তার অনর্গল কথা ফুটতে থাকে। কিন্তু সকলের চেয়ে প্র-ধান কারণ এই যে, ভদ্র লোকের স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁরা তেমন মনের মত স্বাধীন ব্যব-হার কোর্ত্তে পারেন না, ওরকম নিরামিষ মেশামেশি তাঁদের বড় মনঃপুত নয়। দাসীদের সঙ্গে তাঁরা বেশ অসঙ্কোচে অভদ্রতাচরণ কোর্ত্তে পারেন। আসল কথা কি জান? শাদা চামড়ার গুণে তাঁরা দাসীদের যথেষ্ট নীচ শ্রেণীর লোক বোলে

কল্পনা কোর্ত্তে পারেন না ; এক জন বিবি দাসীকে তাঁরা ঠিক দাসী বোলে মনে কোর্ত্তে পারেন না। একটা শাড়ি পরা, ঝাঁটাহস্ত কালো মুখ দেখলে তবে তাঁদের দাসীর ভাব ঠিক মনে আসে। আমি জানি, এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ তাঁর বাড়ির দাসীদের মেঝদিদি সেজদিদি বোলে ডাকতেন ; শুনলে কি গা জ্বোলে ওঠে না ? তাঁর বাড়িতে হয়ত তাঁর নিজের মেজদিদি সেজদিদি আছেন ; যখন কতকগুলো নীচ শ্রেণীর দাসীকে সেই নামে ডাকচেন, তখন হয়ত তাঁর বিকৃত মনে একটু লজ্জা, একটু কষ্ট, একটু সঙ্কোচও উপস্থিত হচ্চে না। হা দুর্ভাগ্য ! ছেলেবেলা থেকে যাঁদের দেখে আস্‌ছি যাঁদের ভাল বাসা পেয়ে আস্‌চি, বিলেতে এমন কি জিনিষ থাকতে পারে যা' দেখে তাঁদের ভুলে যাব, তাঁদের ওপর থেকে ভালবাসা চোলে যাবে, শুদ্ধ তাই নয় তাঁদের ওপর ঘৃণা জন্মাবে। এই কতকগুলি নীচ শ্রেণীর দাসী, কতকগুলি হীন-স্বভাব ল্যাণ্ড-লেডির সঙ্গে বৎসর দুয়ের হীন আমোদে কাটিয়ে যদি তুমি তোমার স্ত্রীর ভালবাসা, তোমার বোনের স্নেহ ভুলে যেতে পার, কত বৎসরের স্মৃতি মুছে ফেলতে পার, বাড়ির সমস্ত টান ছিঁড়ে ফেলতে পার, তবে তুমি কি না কোরতে পার বল দেখি ?

আমি এক জনকে জানি, তিনি তাঁর "মেজদিদি, সেজদিদি," বর্গকে এত মান্য কোরে চোল্‌তেন যে, তাঁর কৃষ্ণবর্ণ গুরু জনকে তার অর্দ্ধেক মান্য কোরলে, তাঁরা তাঁকে কুলের প্রদীপ ছেলে বোলে মাথায় কোরে রাখ্‌তেন। তাঁর ঘরে বা তাঁর পাশের ঘরে যদি এই দাসীদের মধ্যে কেউ উপস্থিত থাকৃত, তাহোলে তিনি সসম্ভ্রম সঙ্কোচে শশব্যস্ত হোয়ে পোড়তেন। সে রকম অবস্থায় যদি তাঁর কোন ইঙ্গ-বঙ্গ বন্ধু গান কোরতেন বা হাস্য পরিহাস কোরতেন তা' হোলে তিনি অমনি মহা অপ্রতিভ হোয়ে বোলে উঠ্‌তেন, "আরে চুপ কর, চুপ কর, মিস্ এমিলি কি মনে কোর্ব্বেন ?" বিলেতে এসে এঁরা এই রকম কতকগুলি নীচ শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে মিশে বিবিদের সঙ্গে আলাপ কোরচি মনে কোরে মহা পরিতোষ লাভ করেন। আমার মনে আছে, দেশে থাকৃতে একবার এক ব্যক্তি বিলেত থেকে ফিরে গেলে পর, আমরা তাঁকে খাওয়াই, খাবার সময় তিনি নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন, "এই আমি প্রথম খাচ্চি, যে দিন আমার খাবার টেবিলে কোন লেডি নেই।" শুনে আমি একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিলেম, আমি জান্‌তেম যে, কোন ভদ্র বিবি একজন অস্ত্রীক পুরুষের বাড়িতে দেখা কোরতে বা খেতে আসেন না। তবে এ ব্যক্তি বলে কি ? এ বিলেতে যত দিন ছিল, নিমন্ত্রণ খেয়ে কাটিয়েছিল না কি ? যা হোক্, তখন মনে কোরেছিলেম এ ব্যক্তি বিলেত থেকে আস্‌চে, অবিশ্যি সেখেনে এমন কিছু দস্তুর আছে, যা' আমি ঠিক জানিনে। ওমা, এখেনে এসে সব বুঝতে পারচি, ব্যাপার

খানা কি? এই সমস্ত ল্যাণ্ডলেডিবর্গের সঙ্গে প্রত্যহ আহার করা হোত, আর দেশে গিয়ে নিরীহ বঙ্গ-বাসীদের নিকট "প্রত্যহ মিবিদের সঙ্গে খেয়েছি" বোলে ঁাক করা হত। এক জন ইঙ্গ-বঙ্গ একবার তাঁর কতকগুলি বন্ধুদের নিমন্ত্রণ কোরেছিলেন, খাবার টেবিলে কতকগুলি ল্যাণ্ডলেডি ও দাসী উপবিষ্ট ছিল, তাদের এক জনের ময়লা কাপড় দেখে নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা তাকে কাপড় বোদলে আস্‌তে অনুরোধ কোরেছিলেন, শুনে সে বোল্লে, "যাকে ভালবাসা যায়, তাকে ময়লা কাপড়েও ভালবাসা যায়!" যে দাসী এ রকম কোরে উত্তর দিতে পারে তা'কে কতদূর স্পর্দ্ধা দেওয়া হোয়েছে মনে কোরে দেখ। এ সকল দেখে এখানকার ইংরাজদের আমাদের বাঙ্গালীদের উপরে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে দিন মিশেস্ উড্রো (পূজনীয় মৃত উড্রো সাহেবের বিধবা পত্নী) আমাকে বোলছিলেন, "শোনা যায়, এখানকার বাঙ্গালীরা অত্যন্ত ছোট লোকদের সঙ্গে মেশে ও একত্র খায়। একবার মনে কোরে দেখ দেখি, কতকগুলো বেহারা ও দরোয়ানের সঙ্গে তোমরা একাসনে বোসে খাচ্চ, সে কি বিশ্রী দেখায়!" শুনে লজ্জায় আমার শির একেবারে নত হোয়ে গেল! হে ইঙ্গ-বঙ্গ, যদি ইংরাজদের মুখ থেকে এ বিষয়ে উপদেশ না শুনলে তোমাদের চৈতন্য না জন্মায়, তবে Thackeray এ বিষয়ে কি বলেন শোন।

It may safely be asserted that the persons who joke with servants or barmaids at lodgings are not men of a high intellectual or moral capacity. To chuck a still-room maid under the chin, or to send Molly the cook grinning, are not, to say the lest of them, dignified act of any gentleman."

অতএব যাঁরা ভদ্র-সমাজে মিশতে চান ও ভদ্র বোলে আত্মপরিচয় দিতে চান, তাঁরা যেন কতকগুলো রাঁধুনি ঘর-ঝাঁটুনী দাসীদের সঙ্গে অযোগ্য ঘনিষ্ঠতা না করেন। বিলেতের Kitchen রাজ্যে যাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কোরছেন, তাঁরা যেন দেশে গিয়ে না বলেন যে, বিলেত থেকে শিক্ষা পেয়ে এলেম। এইরূপ নীচ শ্রেণীর মেয়েদের উপরে ভালবাসা দেখিয়ে রুটি ও কয়লাওয়ালা যুবক বেচারীদের মনে ঈর্ষা জন্মিয়ে কষ্ট দেওয়া কি সদয়-হৃদয় ভদ্রলোকের কাজ? শোনা যায়, এখেনে যখন অল্প স্বল্প বাঙ্গালীর আমদানি ছিল, তখন এখানকার সমাজে তাঁদের অত্যন্ত মান ছিল। অনেক ভদ্রলোক আলাপ না থাকলেও তাঁদের নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠিয়ে দিতেন। এখানকার অনেক Lord ও Dukeগণ তাঁদের সান্ধ্য-সমাগমে আহ্বান কোর্ত্তেন। এখানকার ধনীলোকদের নিমন্ত্রণ-সভায় তাঁদের সমাদরের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন সে সব নেই। এখন তুমি বিলেতে এলে তোমার ভাড়া-করা ক্ষুদ্র ঘরটিতে দিন-রাত বোসে

থাক, ডাক্তারি ও আইনের কেতাবের লম্বা লম্বা পরিচ্ছেদগুলো গলাধঃকরণ কর, Polly, Molly ও Nelly বর্ণের সঙ্গে রসিকতার আদান প্রদান কর ও রাত্রি আড়াইটার পর বিছানায় গিয়ে নিদ্রা দাও। যদি তুমি স্বভাবত মিশুক্ লোক হও, তবে জোগাড় জাগাড় কোরে দুচারটে পরিবারের সঙ্গে কোন উপায়ে আলাপ কোরে নেও, কিন্তু পূর্ব্বকার মত সে রকম সমাদর আর নাই, ও ক্রমে ক্রমে হয়ত এমন দিন আস্‌তে পারে, যে দিন ভারতবর্ষের ইংরাজদের মত এখানকার ইংরাজেরাও আমাদের ঘৃণার চক্ষে দেখবেন, কিন্তু যদি সে দিন আসে,তবে ইংরাজদের দোষ দিও না। অনেক ভারতবর্ষীয় এখেনে এসে যে রকম অন্যায় ব্যবহার কোরে গেছেন, তা' আমি লিখ্‌তে চাইনে। ভারতবর্ষীয়দের সংখ্যা এখানে অত্যন্ত অল্প বোলে সে সকল কথা অধিক লোকের কানে ওঠে না ; কিন্তু যখন ক্রমেই ভারতবর্ষ থেকে এখেনে যুবকদের যাতায়াত বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌ল, যখন ক্রমেই তাঁদের দল পুষ্ট হোতে চোল্‌ল, তখন তাঁদের গুণাগুণ প্রকাশ হবার সম্ভাবনা বাড়তে লাগ্‌ল। এখন যেন তাঁরা মনে করেন যে তাঁরা যে সকল অন্যায়াচরণ কোর্ব্বেন তা'তে যে, কেবল মাত্র তাঁদের যশোহানি হবে তা' নয়, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরে কলঙ্ক আনয়ন কোরবেন।

এইবার ইঙ্গ-বঙ্গদের একটি অতি সাধারণ ও বিশেষ গুণ তোমাকে বলছি। এখানে যাঁরা যাঁরা আসেন, প্রায় কেউ কবুল করেন না, যে, তাঁরা বিবাহিত। যুবতী কুমারী-সমাজে বিবাহিতদের দাম অত্যন্ত অল্প। অবিবাহিত না হোলে কোন যুবতীর উপরে তুমি ভালবাসা দেখাতে পার না, সুতরাং বিলাতের অর্দ্ধেক আমোদ ভোগ কোর্ত্তে পার না। অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে এখানকার অবিবাহিতদের সঙ্গে মিশে অনেক যথেচ্ছাচার করা যায়, কিন্তু বিবাহিত বোলে জান্‌লে তোমার অবিবাহিত সঙ্গীরা তোমাকে ও-রকম অনিয়ম কোরতে দেয় না ; সুতরাং অবিবাহিত বোলে পরিচয় দিলে অনেক লাভ আছে। অনেকে, শুনেছি,ব্রাহ্মণ না হোলেও এখানে ব্রাহ্মণ বোলে আত্মপরিচয় দেন, কিন্তু এ মিথ্যা-ব্যবহারের একটা ভাল কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

যা' হোক্; এই সকল ত ইঙ্গ-বঙ্গদের আচরণ। অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ দেখ্‌তে পাবে তাঁরা হয় ত আমার এই বর্ণনার বহির্গত। কিন্তু সাধারণতঃ ইঙ্গ বঙ্গত্বের লক্ষণগুলি আমি যত দূর জানি, তা' লিখেছি। আমার নিতান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালীরা বিলেতে আস্‌বেন, তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন। বাঙ্গালীদের নামে যথেষ্ট কলঙ্ক আছে, কিন্তু তাঁরা যেন সে কলঙ্ক আর না বাড়ান, তাঁরা যেন সে কলঙ্ক এ সাত-সমুদ্র পারে আর রাষ্ট্র না করেন। জোন্মে অবধি শত শত নিন্দা, গ্লানি, অপমান নতশিরে সহ্য কোরে আস্‌চি, এই দূর-দেশে এসে একটু মাথা তো-

লবার অবকাশ পাওয়া যায়, এখানকার লোকেরা আমাদের অনেকটা সমান ভাবে ব্যবহার করে বোলেই আমাদের পদাঘাত-জর্জ্জরিত-মন একটু বল পেয়ে আত্মনির্ভর স্বাধীনতা-প্রিয়তা প্রভৃতি অনেক গুলি পৌরুষিক গুণ শিক্ষা করবার সুবিধে পায়; কিন্তু এখানেও দলে দলে এসে তোমরা যদি হীন ও নীচ ব্যবহার কোরতে আরম্ভ কর, এখানকার লোকের মনেও বাঙ্গালীদের ওপর ঘৃণা জন্মিয়ে দেও, তা' হোলে এখেনেও তোমাদের কপালে সেই উপেক্ষা, সেই নিদারুণ ঘৃণা আছে! যে পথে যাবে, বাঙ্গালী বোলে তোমাদের দিকে সকলে আঙ্গুল বাড়াবে, যে সভায় যাবে, সভাস্থ লোকেরা তোমাদের দিকে তাচ্ছিল্যের ভ্রূ-কুঞ্চিত-কটাক্ষ বর্ষণ কোরবে। বিলেতের কুহক গুলি আজো থাকতে তোমাদের চক্ষে ধোরলেম, যখন বিলেতে আসবে, তখন সাবধানে পদ-ক্ষেপ কোরো! ইঙ্গ-বঙ্গদের দোষ গুলিই আমি বিস্তৃত কোরে বর্ণনা কোরলেম, কেন না লোকে গুণের চেয়ে দোষ গুলিই অতি শীঘ্র ও সহজে অনুকরণ করে।

যাহোক্, বাঙ্গালীরা বিলাতের কামরূপে রূপান্তর ধারণ কোরে দেশে ফিরে চোল্লেন। এখন তাঁদের একটা ভয় হোচ্চে, পাছে বিলেতে আসবার আগে তাঁদের যে সকল বন্ধু ছিলেন, তাঁরা কাছে ঘেঁসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে আসেন। দেশে গিয়ে তাই তাঁদের বিশেষ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ কোরতে হয়। কারো বা অত্যন্ত ভাবনা হোচ্চে, দেশে গিয়ে কাকাকে কি কোরে প্রণাম কোরব? কারো বা তাঁর স্ত্রীর ঘোমটাচ্ছন্ন মুখ কল্পনায় এসে আপাদ-মস্তক জ্বোলতে আরম্ভ কোরেছে! 'যা' হোক্, দেশেত পৌঁছলেন। তাঁর স্ত্রীকে যথাসাধ্য পালিশ ও বার্ণিষ কোরে "নেটিব" কাকেদের দল ছেড়ে ইংরেজ ময়ূরের দলে মিশতে চোল্লেন। আগে কে জানত বল যে, সেখানে গিয়ে অত ঠোকর খাবেন! ভারতীতে "ভারতবর্ষীয় ইংরাজ" বোলে প্রবন্ধের এক জায়গায় লেখা আছে;—

"আমরা বিলাতে যে, এই সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই, তাহা আশ্চর্য্য নহে। এদেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি; ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এমন ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনাকে আপনারা স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজী তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় তাহাই ত্যাজ্য! হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফোটে, আমরা দেখিতে পাই, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া অবশেষে আমাদের চৈতন্য হয়!"

ভারতবর্ষে গিয়ে ইঙ্গ-বঙ্গদের কি রকম অবস্থা হয় সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতাও

নেই, বক্তব্যও নেই। কিন্তু কিছু কাল ভারতবর্ষে থেকে তার পরে ইংলণ্ডে এলে কি রকম ভাব হয় তা' আমি অনেকের দেখেছি। তাঁদের ইংলণ্ড আর তেমন ভাল লাগে না; অনেক সময়ে তাঁরা ভেবে পান না, ইংলণ্ড বোদলেছে, কি তাঁরা বোদলেছেন! আগে ইংলণ্ডের অতি সামান্য সামান্য জিনিষ যা' কিছু ভাল লাগত এখন আর তা' ভাল লাগে না। এখন ইংলণ্ডের শীত ইংলণ্ডের বর্ষা তাঁদের ভাল লাগচে না, এখন তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে যেতে হোলে দুঃখিত হন না। তাঁরা বলেন, আগে তাঁদের ইংলণ্ডের straw-berry ফল অত্যন্ত ভাল লাগত, এমন কি, তাঁরা যত রকম ফল খেয়েছেন, তার মধ্যে straw-berryই তাঁদের সকলের চেয়ে স্বাদু মনে হোত। কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যে straw-berryর স্বাদ বোদলে গেল না কি! এখন দেখছেন straw-berryর চেয়ে অসংখ্য দিশি ফল তাঁদের ভাল লাগে। আগে Down-shire-এর ক্ষীর তাঁদের এত ভাল লাগত যে, তার আর কথা নেই, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখন দেখছেন আমাদের দেশের ক্ষীর তার চেয়ে ঢের ভাল লাগে। প্রথম বারে বিলেতের মুখ যে রকম দেখাচ্ছিল, এবারে ঠিক সে রকম দেখাচ্ছে না। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কিন্তু এর ভিতরে আমি তত আশ্চর্য্য কিছু দেখছিনে। এ রকম হবার কতকগুলি কারণ আছে। প্রধান কারণ হোচ্চে, বিলেত থেকে গিয়ে বিলেত ফেরতেরা সম্পূর্ণ বিলিতি চালে চলেন তাঁদের গৃহসজ্জা বিলিতি রকমের, বিলিতি বস্ত্র পরিধান, দণ্ড গোষ্পদ সেবা করেন, তাঁদের স্ত্রী পরিবারদের ইংরিজি ভাবের আচার ব্যবহার; সুতরাং বিলেতের বাহ্য চাকচিক্য চোখে সোয়ে গেলে এখেনে আর তেমন কিছু জিনিষ থাকে না, যা' দেখে তাঁদের ধাঁধা লেগে যায়। তা' ছাড়া তাঁরা ভারতবর্ষে গিয়ে স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারী হোয়ে পড়েন, রোজগার কোর্ত্তে আরম্ভ করেন, ভারতবর্ষের মাটিতে তাঁদের শিকড় একরকম বোসে যায়। ভারতবর্ষীয়দের একটু বয়স হোলেই তাঁদের মন কেমন শিথিল হোয়ে যায়, তখন তাঁরা পায়ের ওপর পা দিয়ে টানা পাখার বাতাস খেয়ে কোন প্রকারে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত থাকেন। বিলেতে আমোদ ও বিলাস ভোগ কোর্ত্তে গেলেও অনেক উদ্যমের আবশ্যক করে। এখনে এঘর থেকে ওঘরে যেতে হোলে গাড়ি ডাকে না, হাত পা নাড়তে চাড়তে দশটা চাকরের ওপর নির্ভর কোরলে চলে না: কেন না এখানে গাড়ি ভাড়া অত্যন্ত বেশী, আর চাকরের মাইনে মাসে সাড়ে তিন-টাকা নয়। এখানে একটা থিয়েটার দেখতে যাও; সন্ধ্যে বেলা বৃষ্টি পোড়ছে, পথে কাদা, একটা ছাতা ঘাড়ে কোরে মাইল কতক ছুটোছুটি কোরে তবে ঠিক সময় পৌঁছতে পার্ব্বে, যখন রক্তের তেজ থাকে, তখন এ সকল পেরে ওঠা যায়। যখন ছোট্ট নৌকাটির মত হাল্কা থাকা যায়,

তখন পালে একটু বাতাস লাগ্‌লেই, জলে একটু তরঙ্গ উঠ্‌লেই টল্‌মল্‌ কোরতে থাকা যায়, কিন্তু যখন স্ত্রী, পুত্র, কাজ, কর্ম্ম নিয়ে ভারগ্রস্ত হোয়ে পড়া যায়, তখন আর, একটি অবলার একটি দীর্ঘ নিশ্বাসে উল্টে পোড়তে হয় না, ও একটি অশ্রু জল-ধারায় নৌকা ডুবি হয় না।

আমার চিঠি ক্রমেই বেড়ে যাচ্চে। আমার স্কন্ধে যখন উপদেশ-দানেচ্ছা চাপে, তখন আমি ঝট কোরে কলম থামাতে পারিনে; কিন্তু আর এক অক্ষরও লিখ-চিনে, এই খানেই থামা যাক্। কিন্তু আর একটি কথা না বোলে থাকতে পারচিনে। দেশ থেকে—আমার কোন মানা বন্ধু-শিখ-রিণীচ্ছন্দে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিয়ে-ছেন, সেইটে তোমাকে না শুনিয়ে নিশ্চিন্ত হোতে পারচিনেম। সেইটে শোনা শেষ হোলেই নিষ্কৃতি পাবে।

"বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,
অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বলে কিছু হয় না,
বিনা ছাটটা কোটটা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
পিতা মাতা ভ্রাতা নব-শিশু অনাথা ছট্ কোরে,
বিরাজে জাহাজে মসি মলিন কোর্ত্তা সুট্ পোরে,
সিগারে উদ্গারে মুহু মুহু মহা ধূম লহরী,
স্বপ-স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
ফিমেলে ফীমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফি রিতে,
কি তাহে, উৎসাহে মগন তিনি সাহেব গিরিতে।
বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।
ফিরে এসে দেশে গল-কলর (collar) বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগ-তনু দেখে বড় চটে,
মহা-আড়ী সাড়ী নিরখি, চুলদাড়ী সব ছিঁড়ে,
ছুটা-লাপে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।

এ কবিতাটি যদি সংস্কৃত ছন্দে না পোড়তে পার, তাহোলে এর মস্তক ভক্ষণ করা হবে। অতএব, নিতান্ত অক্ষম হোলে বরঞ্চ একজন ভট্টাচার্য্যের কাছে পড়িয়ে-নিও, তা' যদি না পার, তবে এ কবিতাটি তুমি না হয় পোড় না। ইতি

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এক্ষণে উন্নতি-সপ্তকের ধাপ-গুলি এক-একটি করিয়া আলোচনা করা যাউক। উহার সাতটি ধাপে পৃথক পৃথক সাতটি নিয়মের আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম ধাপে স্বাতন্ত্র্যের নিয়ম, দ্বিতীয় ধাপে দ্বন্দ্বের নিয়ম, তৃতীয় ধাপে আবৃত্তির নিয়ম, চতুর্থ ধাপে সঙ্ঘের নিয়ম, পঞ্চম ধাপে উৎকর্ষের নিয়ম, ষষ্ঠ ধাপে পরিণতির নিয়ম সপ্তম ধাপে সংক্রান্তির (Transition) নিয়ম অধিষ্ঠান করে।

প্রথম, স্বাতন্ত্র্যের নিয়ম; স্বাতন্ত্র্য-সাধন ভিন্ন অস্তিত্ব-সাধনই হইতে পারে না; আপনাকে যদি অন্য-সমস্ত-হইতে ভিন্ন বলিয়া না জানা যায় তবে আপনার অস্তিত্বই ঠিক্ করিতে পারা যায় না; যে বস্তু অন্য কোন বস্তু হইতে কোন অংশে ভিন্ন নহে তাহার আবার অস্তিত্ব কিরূপ? যদি দুই বস্তু এমন হয় যে, একটি যেখানে আছে অন্যটিও ঠিক্ সেইখানে আছে—তাহার এক চুলও এদিক্ ওদিক্ নহে, অর্থাৎ শর্করা-মিশ্রিত জলের মধ্যে যেমন যেখানে জল সেই খানে শর্করা দুগ্ধের মধ্যে তেমনি যদি স্থানের নৈরন্তর্য্য হয়, এবং দুগ্ধের যদি অবিকল একই প্রকার গুণ হয়, তবে দুই বস্তুর মধ্য হইতে একটার অস্তিত্ব লোপ পাইয়া যায়,—জলেতে দ্রবীভূত শর্করার সমস্ত গুণ যদি ঠিক জলের মত হয় তবে মধ্য-হইতে শর্করার অস্তিত্বটুকু লোপ পাইয়া যায়; উপরের দৃষ্টান্তে জল এবং শর্করা বাস্তবিকই যে একই স্থানে স্থিতি করে তাহা নহে, জলের ছিদ্রে ছিদ্রে শর্করার পরমাণু স্থিতি করে, কিন্তু যদি মনে করা যায় উল্লিখিত শর্করা এবং জল অবিকল একই স্থানে স্থিতি করিতেছে, উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র স্থান ভেদ নাই—গুণ-ভেদও নাই—কোন প্রকারেরই কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, তাহা হইলে যে জল সেই জলই থাকে—যতটুকু জল ততটুকু জলই থাকে, মধ্য হইতে শর্করার অস্তিত্বটি উড়িয়া যায়। অতএব কোন বস্তুর অস্তিত্ব সাধন করিতে হইলে—বস্তুর বস্তুত্ব সাধন করিতে হইলে—অন্য-সকল বস্তু-হইতে তাহার স্বাতন্ত্র্য-সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক; স্বাতন্ত্র্য-সাধন ভিন্ন অস্তিত্ব-সাধনই হয় না—উন্নতি-সাধন কিরূপে হইবে।

আমাদের দেশের কোন কোন নব্য-সম্প্রদায় বাঙ্গালি-জাতিকে ঠিক্ ইংরাজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে চা'ন, বাঙ্গালি জাতির স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করিতে চা'ন, জাতীয় অস্তিত্ব লোপ করিতে চা'ন, অথচ বলিতে

ছাড়েন না যে বাঙ্গালি-জাতির উন্নতিই তাঁহাদের একমাত্র অভীষ্ট। ইঁহাদের যুক্তি এই যে, বাঙ্গালিও মনুষ্য, ইংরাজও মনুষ্য, ইংরাজ বাঙ্গালির মধ্যে প্রভেদ করা অনুদারতার লক্ষণ; ইঁহাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি পক্ষপাত-বর্জ্জিত গোঁড়ামি-বর্জ্জিত সেই ব্যক্তিই উদার-শব্দের বাচ্য, এবং যাহাতে পক্ষপাতিত্ব অথবা গোঁড়ামি দেখা যায় তাহাকেই অনুদার বলা যুক্তি-সঙ্গত; অতএব যাঁহারা সাধারণের গোঁড়া তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে আপনাদিগকে উদার বলিয়া স্থির করিতেছেন; শুদ্ধ কি কেবল বিশেষের গোঁড়াই গোঁড়া, সাধারণের গোঁড়া কি গোঁড়া নহে? —যাঁহারা বিশেষের গোঁড়া তাঁহারা স্পষ্ট-বক্তা, তাঁহারা বাকজাল দ্বারা আপনাদের গোঁড়ামি ঢাকা দিয়া রাখেন না, কিন্তু যাঁহারা সাধারণের গোঁড়া তাঁহারা কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী প্রভৃতি বিজ্ঞাপন-দ্বারা আপনাদিগকে উদার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টিত হন—কিন্তু সে তাঁহাদের ভুল। সাধারণের প্রতি দৃষ্টি রাখা যেমন কর্ত্তব্য, বিশেষের প্রতি দৃষ্টি রাখাও তেমনি কর্ত্তব্য। সকল মনুষ্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখিবে—এ যেমন একটি কথা, প্রত্যেক মনুষ্যকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিবে এও তেমনি একটি কথা; যাঁহারা সাধারণের গোঁড়া তাঁহারা শেষোক্ত কথাটি একবার অমান্য করিয়া দেখুন তাহা হইলেই তাঁহাদের চৈতন্য হইবে,—তাঁহাদের বিষয়-সম্পত্তিকে সাধারণের বিষয় সম্পত্তি জ্ঞান করুন, তাঁহাদের গৃহকে সাধারণের পান্থশালা জ্ঞান করুন, তাঁহাদের শরীর মনকে সাধারণের শরীর-মন জ্ঞান করুন, এবং তদনুসারে কার্য্য করুন, অর্থাৎ তাঁহার ধন সম্পত্তি যাহার ইচ্ছা হয় লউক, তাঁহার গৃহে যাহার ইচ্ছা হয় বাস করুক, তাঁহার শরীর মনকে যে যত খাটাইতে পারে খাটাইক তাহাতে তিনি কোন বাধা দিবেন না—তবেই আমরা বলিব যে, পৃথিবীর মধ্যে সাধারণী যদি কেহ থাকে—ইনিই তিনি। মনুষ্যে মনুষ্যে বৈষম্য আছে—সাধারণীদিগের তাহা পদে পদে মানিয়া চলিতে হইতেছে—তবে যে তাঁহারা আত্ম-পরের মধ্যে স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে স্বদেশ-বিদেশের মধ্যে বৈষম্য যত-কিছু সমস্তই একেবারে উড়াইয়া দেন, তাহাতে তাঁহাদের উদারতা প্রকাশ পায় না, ব্যাপকতাই প্রকাশ পায়। যাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে উদার তাঁহারা সাধারণীও নহেন বিশেষীও নহেন—তাঁহারা যখন গৃহের কার্য্য করেন তখন গৃহের স্বতন্ত্র যে একটি মর্য্যাদা তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, যখন দেশের কার্য্য করেন তখন দেশের স্বতন্ত্র যে একটি মর্য্যাদা তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, যখন বিশুদ্ধ সত্যের আলোচনা করেন তখন গৃহ-নির্বিশেষ দেশ-নির্বিশেষ ব্যাপক সত্যের স্বতন্ত্র যে একটি মর্য্যাদা তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন, এবং সেই ব্যাপক সত্যকে যখন দেশ-কাল-বিশেষে প্রয়োগ করেন তখন সত্যের ব্যাপকতা, দেশের দৈশিকতা, কালের কালিকতা তিনের কি

রূপে সামঞ্জস্য করিবেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন—উনি বিশেষের পক্ষ হইয়া সাধারণের বিরুদ্ধে যষ্টি-হস্ত হন না, সাধারণের পক্ষ হইয়াও বিশেষের বিরুদ্ধে ব্যাপকতা করিয়া বেড়ান না—ইনিই বাস্তবিক উদার নামের যোগ্য।

আপনারই হউক আর আপন জাতিরই হউক্ বিশেষত্ব সাধন করা, স্বাতন্ত্র্য সাধন করা, উন্নতির প্রথম সোপান। আপনাকে কিংবা স্বজাতিকে বিশেষ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, তবেই অন্যের সঙ্গে আদান প্রদান চালাইবার যোগ্যতা জন্মে। ব্যক্তির যেমন দেখা গেল কার্য্যেরও অবিকল সেইরূপ গতি—রীতিমত কার্য্য করিতে হইলে সেই কার্য্যকে অন্যান্য কার্য্য হইতে বিশেষিত করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা সর্ব্বপ্রথমে আবশ্যক; একটা বিশেষ কার্য্য ধরা যাউক—যেমন বিদ্যাশিক্ষা;—যাঁহারা একেবারে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে যা'ন তাঁহারা কোন বিদ্যাই শিখিতে পারেন না; বিদ্যার্থী ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে বিশেষ কোন একটি বিদ্যা যাহা তাঁহার পক্ষে সুসাধ্য তাহাই তিনি সর্ব্বাগ্রে অভ্যাস করেন, তাহা হইলে উত্তরবর্ত্তী আর একটি বিদ্যা যাহা পূর্ব্বে তাঁহার পক্ষে নিতান্ত দুঃসাধ্য ছিল তাহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইবে, এমনি করিয়া সুসাধ্য হইতে ক্রমে ক্রমে দুঃসাধ্যে আরোহণ করিলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য বিষয় সকলও কালক্রমে সুসাধ্য হইয়া উঠে; যাঁহারা আত্মচেষ্টায় মহোচ্চ পদ লাভ করেন তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় মাড়াইয়া উচ্চ উচ্চ বিষয়ে প্রবেশ করেন; মনুষ্যের উন্নতিই হউক্, জ্ঞানের উন্নতিই হউক্, আর কাজের উন্নতিই হউক্ বিশেষের প্রতি মনোযোগী হওয়া সর্ব্ব-প্রথমে আবশ্যক; জ্ঞানোন্নতির পক্ষে প্রথম আবশ্যক এই যে, একটি কোন বিদ্যাকে অন্যান্য বিদ্যা হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার প্রতি মনোনিবেশ করা, আত্মোন্নতির পক্ষে প্রথম আবশ্যক এই যে, অন্য হইতে আপনার যথাসম্ভব স্বাতন্ত্র্য সাধন করা, দেশোন্নতির পক্ষে প্রথম আবশ্যক এই যে, অন্যান্য দেশ হইতে আপনার দেশের স্বাতন্ত্র্য সাধন করা ইত্যাদি।

ইহার পরে আসিতেছে দ্বন্দ্বের নিয়ম;—উপরে দেখা গেল যে, বিশেষের দিকে অধিক ঝোঁক দিলেই শুধু যে পক্ষপাতিতা হয় তাহা নহে, সাধারণের দিকে অধিক ঝোঁক দিলেও সেই দোষে দূষিত হইতে হয়; সাধারণ এবং বিশেষ দুয়ের মধ্যে সাম্য রক্ষা করিবার যে নিয়ম তাহাই দ্বন্দ্বের নিয়ম বলিয়া উক্ত হয়। শুদ্ধ কেবল সাধারণ তত্ত্ব জানিলে হয় না তাহাকে বিষয়-বিশেষে কিরূপে প্রয়োগ করিতে হয় তাহা জানা চাই—নহিলে ন্যায়-বিচারে সামর্থ্য জন্মে না—ধর্ম্মবুদ্ধি পেলিতে পায় না। সাধারণ মনুষ্যের হিতসাধন করা কর্ত্তব্য ইহা আমি জানি কিন্তু স্বদেশের হিতসাধন করিতে হয় ইহা আমি জানি না—এরূপ জানা ব্যাপকতার পক্ষে সবি-

শেষ প্রয়োজনীয় হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনের পক্ষে কিছুমাত্র উপকারে আইসে না। এক দিকে সাধারণ, অপর দিকে বিশেষ দুইকে এক বন্ধনে ধরিয়া রাখাতেই ধর্ম্ম নামের যাথার্থ্য হইয়াছে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিশেষ এই একটি প্রভেদ দেখা যায় যে, সাধারণের প্রতি পুরুষেরা এবং বিশেষের প্রতি স্ত্রীরা স্বভাবতঃ উন্মুখ; পুরুষকে স্ত্রী—বিশেষের দিকে (অর্থাৎ জন-সাধারণ হইতে গৃহের দিকে) টানিয়া রাখে, স্ত্রীকে পুরুষ—সাধারণের দিকে (অর্থাৎ গার্হস্থ্য ক্রিয়া-কর্ম্ম ব্যতীত সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্মের দিকে) টানিয়া রাখে; এইরূপে সাধারণ বিশেষের মধ্যে সাম্য সংস্থাপিত হয়। কোন কারণ বশতঃ যদি স্ত্রী পুরুষের বিবাহ না ঘটে তাহা হইলেও স্ত্রীলোকেরা ঘর কন্নার খুঁটিনাটি লইয়া কালযাপন করে, পুরুষেরা জনসাধারণ-ঘটিত ব্যাপক বিষয় সকলেই ব্যাপৃত থাকে। নিউটন প্রচলিত অর্থে বিবাহ করেন নাই বটে—কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যা তাঁহার প্রেয়সী ভার্য্যা-স্বরূপ ছিল, রাফেএল আপনিই বলিয়াছেন যে, তিনি চিত্র-লেখার সহিত বিবাহ-সূত্রে গ্রথিত হইয়াছেন।

সাধারণের ব্যাপ্তি-ভাব এবং বিশেষের সংকোচ ভাব উভয়ের মধ্যে যোগ স্থাপন করা প্রকৃতির একটি মর্ম্মগত ভাব—প্রকৃতির যে কিছু ব্যাপার সকলেতেই উহার কোন না কোন প্রকার নিদর্শন আছেই আছে; আলোক পদার্থ একবার সংকুচিত একবার বিস্ফারিত হইতেছে; পৃথিবী একবার কেন্দ্রাতিগ বলের বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্য-হইতে দূরে গমন করিতেছে, একবার কেন্দ্রী মুগ-শক্তির বশবর্ত্তী হইয়া সূর্য্যের নিকটস্থ হইতেছে; একবার সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া আকাশে পরিব্যাপ্ত হইতেছে, একবার আকাশে ঘনীভূত হইয়া তথা-হইতে ভূতলে নিপতিত হইতেছে—প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাই এইরূপ যমকচ্ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে চলিতেছে;—এমন কি, ছন্দের নিয়মও যা ছন্দের নিয়মও তা, একই কথা। যাঁহাতক ক্রিয়া তাঁহাতক প্রতিক্রিয়া—যাঁহাতক সংকোচের ভাব তাঁহাতক ব্যাপ্তির ভাব তাহার সঙ্গে লাগিয়াই আছে; নক্ষত্র-কুজ্ঝটিকা ঘনীভূত হইয়া যে মাত্র সূর্য্যাকারে পরিণত হয়, অমনি উত্তাপের প্রভাবে তাহা হইতে উষ্মা বিনির্গত হইয়া সুদূরে পরিব্যাপ্ত হয়; ঐ উষ্মা হইতেই যখন গ্রহগণ বিনির্ম্মিত হইয়াছে, তখন উহার লঘুতম অংশ দূরতম দেশে এবং গুরুতম অংশ নিকটতম দেশে প্রক্ষিপ্ত হইবেই ত, এজন্য সূর্য্য হইতে যে গ্রহ যত দূরে স্থিতি করে সে গ্রহ তত লঘু উপাদানে বিনির্ম্মিত দেখিতে পাওয়া যায়। কতক গুলি পরমাণু পুঞ্জীভূত হইয়া মৃগনাভি হইয়াছে, এটি যেমন সংকোচের ভাব জ্ঞাপন করিতেছে, তেমনি আবার তাহা-হইতে পরমাণু পুঞ্জ নিয়তই উদ্গীরিত হইয়া সৌরভে দিক্‌দিগন্তর আমোদিত করিতেছে, এটি তেমনি ব্যাপ্তির ভাব জ্ঞাপন করিতেছে; কিন্তু সে পরমাণুগণ কত সূক্ষ্ম তাহা একবার ভাবিয়া দেখ;

যদি এক খণ্ড মৃগনাভি হইতে বৎসর বৎসর ধরিয়া ঐরূপ করিয়া রাশি রাশি পরমাণু বহিষ্কৃত হয়, তথাপি তাহার গুরুত্বের এক চুলও হানি হয় না,—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। গন্ধহীন বস্তু হইতেও অলক্ষিত রূপে পরমাণু-রাশি উদ্গীরিত হয়, নতুবা এ কথার কোন অর্থ থাকিত না যে, কালে সকল বস্তুই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—ক্ষয় প্রাপ্ত না হইবে কেন, পরমাণু সকল এক দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইলে তাহারা আর এক দিক্ দিয়া পলাইবার চেষ্টা পাইবে ইহা ত ধরাই আছে, ক্রিয়া মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইবেই হইবে প্রকৃতির ইহা একটি মূল নিয়ম—এবং তাহাই এখানকার অভিধানে ছন্দের নিয়ম অথবা চন্দের নিয়ম বলিয়া লক্ষিত হইয়াছে। ইহার পরে আসিতেছে আবৃত্তির নিয়ম—সন্তানগণেতে পিতা মাতার জীবন পুনরাবর্ত্তিত হয় কাল-ক্রমে তাহারা পিতা মাতার পদবীতে দণ্ডায়মান হয়; পরদিন পূর্ব্বদিনের পদবীতে দণ্ডায়মান হয়, ঋতু মাস সম্বৎসর পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করে, ইহার যে একটি নিয়ম তাহাই এখানে আবৃত্তির নিয়ম বলিয়া সংজ্ঞিত হইতেছে। ইহারই বিষয় অতঃপর আলোচনা করা যাইবে।

ছিন্নমুকুল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ—রোষ।

কনকের সেই "বাসি" কথাটি নিশাকালের বীণা-ঝঙ্কারবৎ হিরণের কর্ণে লাগিয়া রহিল। অমন মিষ্ট কথা হিরণ আর কখনো শোনেন নাই, শুনিবেনও না। হিরণকুমার আবার সেই দিনেই কনকের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়া প্রমোদকে এক পত্র লিখিলেন। প্রমোদ যে তাঁহার সহিত কনকের বিবাহে আপত্তি করিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। হিরণের পত্র পাইয়া প্রমোদের আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। একে পূর্ব্ব দিন সেই কনকের সহিত মনান্তর হওয়া পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন না; তার পর সেই অবস্থায় এই চিঠি পড়িয়া তাঁহার ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাঁহার বন্ধুর সহিত কনকের বিবাহ দিতে পারিলেন না, আর হিরণ কোথাকার কে? তাহার কথা আবার কনককে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে? তাহার সহিত কনকের বিবাহের কথা! হিরণের স্পর্দ্ধা তাঁহার মার্জ্জনীয় বোধ হইল না। কনকের সহিত হিরণের বিবাহ অসম্ভব ইহা তিনি তখনি স্পষ্ট করিয়া হিরণকে লিখিতে বসিলেন। কিন্তু বিবাহ না দিবার কি কারণ দিবেন? হিরণকে

কি লিখিবেন যে তুমি আমার শত্রু সেই জন্য কনকের রক্ষাকারী হইলেও আমি তাহাকে তোমায় দিব না? একথা তো আর লেখা যায় না, তবে কি কারণ দিবেন? কারণ কনকের বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই। প্রমোদ তাহাই লিখিবেন ভাবিয়া কনককে ডাকিলেন, তিনি জানিতেন যে কনক কখনই বিবাহ করিতে সম্মত হইবে না। তবে, কাল বিবাহের জন্য পীড়াপিড়ী করিয়া কনককে কষ্ট দিয়াছেন, রাগে যাহা ইচ্ছা বলিয়াছেন, আজ এক জনের বিবাহ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতেছেন বলিয়া একটু সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছায় কনককে ডাকিলেন। আজ আবার না জানি কি হইবে ভাবিয়া বালিকা ভয়ে ভয়ে সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। যখন দেখিল প্রমোদেরই মুখে রাগের লক্ষণ কিছুই নাই তখন সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। প্রমোদ হিরণের পত্র খানি দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখ কনক, হিরণ আবার তোমার সহিত বিবাহ প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু আমরা এ প্রস্তাবে অসম্মত তাহাই এখন উত্তরে লিখিতে বসিয়াছি, কেমন আজ সন্তুষ্ট হইলে তো, আজ তো আমি তোমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে বলিলাম না।" এই বলিয়া হিরণের সেই পত্র খানি কনককে পড়িতে দিলেন, পত্র খানি কনক পড়িতে গেল। একবার তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল কিন্তু হাত ঠিক রাখিয়া পড়িতে পারিল না, আপনা আপনি হাতটি যেন নীচু হইয়া পড়িল, কনকের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ওষ্ঠে ভালে রক্ত পদ্মে নীহারবৎ শোভিত হইল; বালিকা মৌনে সেই চিঠিখানি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এক বর্ণও পড়িতে পারিল না। প্রমোদ তাহার ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "বিবাহের প্রস্তাব পড়িতেও বুঝি কষ্ট হয়? তবে দাও—"বলিয়া চিঠিখানি তাহার হাত হইতে লইয়া তাহার উত্তর লিখিতে বসিলেন, কনক সেইরূপই দাঁড়াইয়া রহিল। লিখিতে লিখিতে একবার মুখ তুলিয়া প্রমোদ বলিলেন "তবে লিখিয়া দিই তোমার বিবাহে অনিচ্ছা। কেমন তা' হ'লে সন্তুষ্ট হবে তো? এই কথায় কনককে যেরূপ হর্ষোৎফুল্ল দেখিতে আশা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন সেই মুখ অধিকতর গম্ভীর, আরক্তিম চক্ষু দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত, অথচ তাহাতে অশ্রুর চিহ্ন মাত্রও নাই। তিনি আশ্চর্য্য হইলেন; বলিলেন "কনক আজ তোমার ওরূপ ভাব হইল কেন? আজ তো আমি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনুরোধ করিতেছি না।" বালিকা কিছুই উত্তর করিল না, কেবল তাহার ওষ্ঠাধরে লজ্জার ঈষৎ মৃদু, অথচ অস্ফুট হাসির ন্যায় শুষ্ক, হাসির রেখা পড়িল; হাসির আদর্শে ওষ্ঠাধর ঈষৎ কুঞ্চিত হইল মাত্র। কনককে কাল হইতে আজ পরিবর্ত্তিত দেখিয়া প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইলেন, নানা সন্দেহে তাঁহার মন আন্দোলিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক, তুমি কি ভাবিতেছ এ বিবাহে আ-

মার ইচ্ছা আছে, কেবল তোমার ইচ্ছার অনুরোধে আমার এরূপ পত্র লেখা? সেই ভাবিয়া কি সুখী হইয়াও হইতে পারিতেছ না? না, তাহা ভাবিয়া কষ্ট পাইও না। কাল যদিও তোমার অনুমতিতে আমি কষ্ট পাইয়াছিলাম কিন্তু আজ এ বিবাহে আমারো অনিচ্ছা।"

এই আশ্বাস বাক্যেও কনককে কোন কথা কহিতে না দেখিয়া প্রমোদ অবাক হইয়া রহিলেন। কাল বিবাহের কথায় কনক অত দুঃখিত হইয়াছিল, আজ সেই বিবাহে প্রমোদকেও অসম্মত দেখিয়া কোথায় কনকের আহ্লাদ ধরিবে না—না আজ তাহার একি বিপরীত ভাব! প্রমোদের আশ্বাস বাক্যেও কেন কনক কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইতেছে? আজ কি কনকের তবে বিবাহে ইচ্ছাই আছে? প্রমোদ বলিলেন "কনক তোমারি মনের কথা আমি লিখিতেছি—বিবাহে ইচ্ছা নাই ইহা তোমারি কথা, তবুও তুমি স্পষ্ট করিয়া আর একবার বল বিবাহ করিবে না, তাহা হইলে আমার পক্ষে লিখিবার আরো সুবিধা হইবে।" কিন্তু কনক পাষাণ-প্রতিমাবৎ নিরুত্তর; চক্ষে স্থির দৃষ্টি, তাহাতে পলক নাই, জ্যোতি নাই, আহ্লাদ নাই, বিষাদ নাই, বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ, হৃদয়ের রক্ত-স্রোত বহিতেছে কি না সন্দেহ।

কনকের ভাব দেখিয়া প্রমোদ এবার একটু বিরক্তিক ভাবে বলিলেন "কনক, কথা কও না, চুপ করিয়া রহিলে যে?"

কনক কি যেন বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু কথা আটকিয়া গেল, বলিতে পারিল না। প্রমোদ উত্তরের আশায় অনেক ক্ষণ মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া বলিলেন—

"কনক তুমি দেখছি আমাকে পাগল ক'রে তুলবে? এই কাল অত দৃঢ় ভাবে বিবাহে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে আর আজ কথা কইতে কি হ'ল, বিবাহ করিবে নাকি? আমাকে উত্তর দেও।"

উত্তর অভাবে প্রমোদকে ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া অতি কষ্টে লজ্জা চাপিয়া বালিকা ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে যেন মুখ খুলিল, কিন্তু এবারও বলিতে গিয়াই থামিয়া গেল, কোন মতে আর কথা মুখের বাহির হইল না। তাহার আর কিছু বলিবারও আবশ্যকও রহিল না; বার বার তাহার ঐরূপ ভাব দেখিয়া প্রমোদ বুঝিলেন তাহার বিবাহে ইচ্ছা আছে; নহিলে, কথা কহিতে সঙ্কুচিত হইবার তো আর কোন কারণই দেখিলেন না। কাল কনক কোন মতেই যামিনীনাথের সহিত বিবাহে সম্মত হইল না, আর আজ তাহার হিরণকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা? প্রমোদের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি এখন বুঝিলেন এই কারণেই তবে কনক কাল বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। হিরণকে তাঁহার কণ্টক স্বরূপ মনে হইল, মনে মনে তাহারি উপর ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। হিরণ না হইয়া অন্য কাহাকেও যদি আজ কনক বিবাহ করিতে চাহিত তাহা হইলে প্রমোদ সেই সম্মতির অন্য কোন কারণ দেখিতে পাইতেন, মনে করিতেন কাল

বিবাহে কনক অসম্মত হওয়াতে প্রমোদ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাই কনক আজ বিবাহে সম্মত হইল। কিন্তু হিরণ বলিয়া প্রমোদের একথা মনে আসিল না। তিনি রোষ-কম্পিত স্বরে বলিলেন—

"তুমি জান এ বিবাহে আমার বিশেষ অনিচ্ছা।"

বালিকা মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না"।

প্র। "এখন তো জানিলে এখন কি করিতে প্রস্তুত আছ? উত্তর না পাইয়া আবার বলিলেন—

"তুমি বিবাহ করিতে পার, আমি কিছুই বলিব না—কিন্তু তাহা হইলে তোমাতে আমাতে এই পর্য্যন্ত সম্পর্ক শেষ হইল—একথা যেন মনে থাকে।" প্রমোদ হিরণকে মনে মনে শত শত অভিসম্পাত দিতে দিতে ক্রোধ ভরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

হিরণকে—তাঁহার চিরশত্রু হিরণকে কনক ভাল বাসিল! হিরণের জন্যই তাহার বন্ধুকে বিবাহ করিতে চাহিল না, হিরণের জন্যই তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল, তাঁহার মনোরথ ব্যর্থ করিল! বার বার হিরণ হইতেই কি তিনি আঘাত পাইতেছেন না? তাঁহার শত্রুতা করিতেই হিরণের জন্ম।

প্রমোদ তখনি হিরণের চিঠির উত্তর লিখিয়া দিলেন যে বিবাহ হইবে না।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দলিত কলি।

পর দিন সন্ধ্যাকালে কনক গঙ্গাতীরে বসিয়া নদী-জলের সহিত অশ্রু-জল মিশাইতে মিশাইতে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিল। গান গাওয়া কেমন কনকের অভ্যাস সে সর্ব্বদাই আপন মনে গুণ গুণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। আজ গাহিতেছিল—

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়েছে, সখি,
এখনো তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা একি?
জানি এ অভাগী ভালে সুখ নাই কোন কালে,
দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি,
এত যে যতন করি এ অগ্নি নিভাতে নারি,
প্রেমের এ দাবানল জ্বলি ওঠে থাকি থাকি।"

গুণ গুণ করিয়া বালিকা কিছু পরে থামিল। সোপানের সীমানা পার্শ্বে যে খানে জলে কতকগুলি ক্ষুদ্র গাছ গাছড়া লতা পাতা জন্মিয়াছিল, সেই খানে হাত বাড়াইয়া তাহা হইতে একটি ডাল ভাঙ্গিয়া লইল। ডালটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া জলে ফেলিয়া দিতে দিতে, সেই ভাসমান অংশ দেখিতে দেখিতে আপন মনে কত কি ভাবিতে লাগিল। কনকও এক দিন এই ক্ষুদ্র তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল, কেন কনকের মত অভাগিনীকে হিরণকুমার তখন বাঁচাইলেন? "হিরণকুমার কেন তুমি বাঁচাইয়াছিলে? বাঁচাইলেই বা কি করিয়া বলিব? যে প্রাণ দিয়াছিলে তাহা তো আপনিই আবার কাড়িয়া লইয়াছ, কেবল যাতনা বই কনকের জন্য আর কিছুই রাখ নাই। কেবল যাতনার জন্য কি জল হইতে না তুলিলেই ভাল ছিল না। এরূপ জ্বলন্ত আগুণে পোড়া অপেক্ষা কি

জলে ডুবে মরা ভাল ছিল না? না, না, বাঁচাইয়াছিলে বেশ করিয়াছ নহিলে এত যাতনা কে সহিত? নহিলে—নহিলে এত সুখই বা কে ভোগ করিত? নহিলে হিরণ-কুমার, তোমাকে দেখিবার সুখ কোথায় পাইতাম? এর পর এখন আজীবন কষ্ট পাই সেও ভাল।"

কনকের ভাবনা সহসা ভঙ্গ হইল। সহসা হিরণকুমার কনকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হিরণের মূর্ত্তি আজ বিষাদ-ময়, প্রশস্ত ললাট ঘর্ম্মসিক্ত, চক্ষু আরক্তিম এবং ঈষৎ স্ফীত, মনে হয় অল্প ক্ষণ পূর্ব্বে যেন বিষম কষ্টের কান্না কাঁদিয়াছেন। সেই দুঃখের সময় সেই যাতনা-পীড়িত মনের অবস্থায় সহসা হিরণকে দেখিতে পাইয়া বালিকার মনের ভাব কিরূপ হইল, বালিকা কিরূপ শান্তি পাইল, তাহা বলিবার নহে। নিমেষে যেন মন্ত্র-বলে তাহার সকল দুঃখ দূর হইল। কিন্তু আবার অমনি সেই এক সময়েই তাহার মনে আসিল, এই সময় কি তাহাদের এরূপ সাক্ষাৎ দূষণীয় নহে? বাল্য কাল হইতে কনক যেরূপ শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিল তাহাতে তাহার এইরূপ সাক্ষাৎ অনুচিত বলিয়া বোধ হইল। কনক সেই জন্য মনের স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলিল "আজ আবার তুমি আসিলে কেন? আমাদের এরূপ সাক্ষাৎ———"

হিরণ বিষাদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কনক আমার হৃদয় পুড়িতেছে এখন উচিত অনুচিত আমার জ্ঞান নাই। কিন্তু কনক যাহাতে তোমার এক বিন্দুও হানি হয় এমন বিন্দু আমা হইতে কখনই ঘটিবে না। চিরকাল পুড়িয়া মরি সেও স্বীকার তবু আমা হইতে তোমার তিল মাত্রও অপকার হইতে দিব না, কেহ আমাকে দেখিবার আগে আমি এখনি চলিয়া যাইব। কাল তো প্রতিজ্ঞাই করিয়াছিলাম যদি কখনো বিবাহ হয় তো আবার দেখিব নহিলে কালকের দেখাই শেষ। কিন্তু যখন প্রতিজ্ঞা করি, তখন আমার হৃদয় আশাপূর্ণ ছিল, তখন জানিতাম না যে তগ্ন হৃদয়ে এইরূপ আবার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতে আসিব। কনক আজ একটিবার জন্মশোধ তোমাকে দেখিতে আসিলাম। এ ইচ্ছাকে আমি কোন মতে দমন করিতে পারিলাম না। আমি অপরাধী কিন্তু অভাগা বলিয়া দোষ মাপ করিও।"

কনক ইহার আর কি উত্তর করিবে? সেই বালিকার হৃদয়তো আর পাষাণ-নির্ম্মিত নহে। হিরণ বলিলেন "কনক, সরলে, তোমার ভ্রাতার চিঠি পাইয়া অবধি আমাতে আর আমি নেই, তাঁহার এ বিবাহে অসম্মতির কারণ কি?" কনক অনেক ক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া শেষে বিষাদ-গম্ভীর স্বরে সজলনেত্রে উত্তর করিল "তিনি তোমাকে তাঁহার শত্রু মনে করেন।"

হি। "আমি তাঁহার শত্রু! কিসে এরূপ তাঁহার মনে হইল? আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহার ভ্রম দূর করিব।"

ক। "সে ভুল বিশ্বাস তাঁহার যাইবে বোধ হয় না।"

হিরণকুমার যাতনা-কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন "তবে কনক, আমার কনক কি আমার কখনই হইবে না?" কাহারো আর কথা কহিবার শক্তি রহিল না দু'জনে সেই নীরব সন্ধ্যাকালে নীরব অশ্রুবারি গঙ্গাবারিতে ঢালিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ কেহই কোন কথা কহিলেন না. কিন্তু পরস্পর দু'জনেই পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। কিছু পরে হিরণকুমার বলিলেন—

"কনক আমরা মনে মনে দু'জনকে দু'জনে ভালবাসিয়াছি—হৃদয়ে হৃদয়ে আমাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, কনক, তোমার ভ্রাতার মতের বিরুদ্ধে কি আমাদের বিবাহ হয় না?

ক। উঃ! ও কথা মুখে আনিও না। তা'কি ক'রে হবে? আর তা'হ'লে কি দাদা আমার মুখ দেখিবেন।"

হিরণকুমার ভগ্ন হৃদয়ে বলিলেন "তুমি আমার মত আমাকে পাইতে ব্যগ্র নহ বলিয়া ওকথা বলিতে পারিলে, আমার মত ভালবাস না বলিয়া ওকথা বলিতে পারিলে, তোমাকে না পাইলে আমি চির কাল পুড়িয়া মরিব চিরকালের জন্য আমার সুখ বিনষ্ট হইবে, ইহা জানিয়াও তোমার ভ্রাতার একটু মনঃক্ষোভের ভয়ে তুমি আমাকে চিরকাল অসুখী করিতে ও প্রস্তুত। সরলে, তোমার নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃস্নেহ-কি জ্বলন্ত! কনক, আমি যদি তোমার ভাই হইতাম, তাহা হইলে এইরূপ স্বর্গীয় ভাল বাসা আমার হইত!"

হিরণের কথায় কনক নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল, হিরণের প্রত্যেক কথা গুলি তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। "কনক হিরণকে তেমন ভাল বাসে না—এই কথা আজ হিরণকুমার নিজে বলিলেন! তা' যদি হইত তাহা হইলে কনকের এত কষ্ট পাইতে হইত না। কনকের কাহার জন্য এত কষ্ট? কাহার জন্য এত জ্বালা? কাহাকে হৃদয় দিয়াছে বলিয়া ভ্রাতার কথায় অসম্মত হইয়া ভ্রাতাকে কষ্ট দিল? কাহার জন্য আজ ভ্রাতার সহিত পর্য্যন্ত মনোবিচ্ছেদ ঘটিল? হিরণের অপেক্ষা প্রমোদকে ভাল বাসিলে কি তাহা হইত? ভ্রাতার অমতে কেবল কনক বিবাহ করিতে চাহে নাই বলিয়া কি হিরণের ঐরূপ ভাবা উচিত ছিল? বিবাহ না হইলে যে কনক চিরকাল জীবন্তে মরিবে তাহা কি হিরণের জ্ঞান হইল না? হিরণ আজ তাহাকে দোষী করিলেন! কনকের যতই কষ্ট হউক না, ন্যায়ের বিপরীতে কি করিয়া কাজ করিবে? ভ্রাতৃস্নেহ হইতে কনকের প্রণয় যতই বলবৎ হউক না ভ্রাতার অমতে কাজ করিয়া তাহাকে কষ্ট দিবে কি করিয়া? হিরণ কেন এসকল বুঝিলেন না?" হিরণ তুমি বড় নিষ্ঠুর! বালিকার এই দগ্ধ হৃদয়ে আরো জ্বালা দিলে। কনক যদি দেখাইতে পারিত তো দেখিতে সে তোমার অধিক তোমাকে ভাল বাসে কি না। কিন্তু কনক বালিকা, কথা কহিতে জানে না, প্রকাশে অক্ষম, তাই তুমি আজ ও কথা বলিয়া তাহাকে যাতনা দিতে পারিলে!

হিরণ আবার বলিলেন—"তবে, কনক, সরলে, আমি চলিলাম আজ অবধি সকল সুখে বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম, তোমার জন্যই সকল জলাঞ্জলি দিব। আর আমার সংসারে কাজ কি; অর্থে কাজ কি? তোমাকে যদি না পাইলাম তবে আমার আর কিসে কাজ? আমি ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষী নহি, আমি পদ-মর্য্যাদার জন্যও লালায়িত নহি। তোমাকে বিবাহ করিয়া কল্পনার মরুভূমেও যে নন্দনকানন সৃজন করেছিলেম, তুমিই স্বহস্তে যদি তাহাতে দাবানল জ্বালালে, তা হ'লে আমার এই শূন্য উদ্দেশ্যহীন জীবনে প্রয়োজন কি? আমি সংসার ছাড়িব, দেশে দেশে বনে বনে সন্ন্যাসীবেশে ভ্রমণ করিব, তাহাতে যদি তোমাকে ভুলিতে পারি তো ভুলিব, নহিলে তোমারি মূর্ত্তি আজীবন ধ্যান করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। সরলে, তুমি অভাগাকে ভুলিয়া যাও, যদি কখনো মনে আসে মনে স্থান দিও না। আমার ভাবনা তোমাকে তিল মাত্রও যেন ব্যথা না দেয়। যদি জানিতে পারি আমাকে ভুলিয়া তুমি সুখে আছ, ভ্রাতার মতে বিবাহ করিয়া সাংসারিক সুখে প্রফুল্ল আছ, তাহা হইলে বনে জঙ্গলে অতি দীন ভাবে থাকিয়াও আমি সুখী হইতে পারিব। চলিলাম আর কখনো এই অভাগাকে দেখিতে পাইবে না।"

হিরণের অন্তিম কথাও কনকের কর্ণে প্রবেশ করিল না, কনক তখন আপনাতে আপনি ছিল না। যখন কনকের চমক ভাঙ্গিল যখন বালিকা কনকের আজ কথা ফুটিল যখন বালিকা বলিতে গেল "হিরণকুমার, আমার নিজের কষ্ট আমি আজীবন সহিতে পারি, কিন্তু তোমার কষ্ট কি করিয়া সহিব? তোমার কনক তোমার জন্য সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত"। তখন মস্তক তুলিয়া কনক দেখিল সেখানে হিরণকুমার নাই, পিছনে সেই আজন্ম-পরিচিত পথ ঘাট ও বৃক্ষাবলী, সম্মুখে সেই অনন্ত কাল-প্রবাহিনী গঙ্গা। কনকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। বোধ হইল তাহার চরণতলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্য্যন্ত যেন গহ্বর হইয়া গিয়াছে, কনক শূন্য অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। অজস্র অশ্রুধারা কনকের কপোল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে মর্ম্মভেদী কষ্টে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কনক দ্রুতপদে ঘাট হইতে উঠিয়া খানিক দূর আসিল, কিন্তু আর অধিক দূর আসিতে পারিল না, ক্ষুদ্র বালিকা আর কত পারিবে? তীরে একটি গাছ তলায় আসিয়া আশ্রয় জন্য একটি শাখা ধরিল, ক্রমে হস্ত পদ শিথিল হইয়া সেই বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

নিন্দা-তত্ত্ব।

নিন্দা কা'কে বলে জিজ্ঞাসা কোর্‌লেই লোকে বলে, পরের নামে দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে। লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু লোকে তাই মনে করে না। কে এমন আছে বল দেখি যে,সে তার জীবনের প্রতিদিনই পরের নামে দোষারোপ না করে? পর যত দিন দোষ কোর্‌তে ক্ষান্ত না হবে, তত দিন দোষারোপের মুখ বন্ধ হবে না। যে হিসেবে সকল মানুষই স্বার্থপর, সে হিসেবে সকল মানুষই নিন্দুক। প্রতি মানুষের জীবনের সমস্ত কাজ তুমি রাশীকৃত কোরে পরীক্ষা কোরে দেখ, দেখ্‌বে, যে খনিতে জোন্মেছে তার গায়ে তা'র মাটি লেগে থাক্‌বেই থাক্‌বে। স্বার্থ যখন স্বার্থপরতার সাধারণ সীমা ছাপিয়ে ওঠে, তখনি আমরা তাকে স্বার্থপরতা বলি। নিন্দাও ঠিক তাই।

যদি বল যে, মিথ্যা দোষারোপ করাকেই নিন্দা বলে, তা হোলে নিন্দার অর্থ অসম্পূর্ণ থেকে যায়! মিথ্যা নিন্দা নিন্দার একটা অংশ মাত্র। কে না জানে, এমন অনেক সময় আসে, যখন পর-নিন্দা শোন্‌বার কষ্ট আমাদের নীরবে ধৈর্য্য ধোরে সহ্য কোর্ত্তে হয়, কেন না আমাদের কোন কথা বলবার থাকে না, নিন্দুক ব্যক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে বোল্‌চে "সত্য কথা বল্‌চি, তা'র আর কি!" কিন্তু সে সহস্র সত্য কথা বলুক না কেন, তবুও নিন্দুক বোলে তা'র উপর কেমন এক প্রকার ঘৃণা জন্মে।

কিন্তু কেন? সত্যি কথা বোল্‌চে, তবু কেন তা'কে নিন্দুক বল? তার একটা কারণ আছে। সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, আমরা উদ্দেশ্য বুঝে নিন্দার নিন্দা করি। সকলেই স্বীকার করেন পরের প্রশংসা করা মাত্রকেই খোষামোদ বলে না। যখন কারো সদ্‌গুণ দেখে আমাদের উচ্ছ্বসিত হৃদয় থেকে প্রশংসা বেরোয় তখন, অধিকাংশ তা'কে কেউ খোষামোদ বলে না। কিন্তু যখন তুমি তোমার নিজের স্বার্থ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রশংসা কর, সে প্রশংসা সত্য হোলেও তা'কে খোষামোদ বলে। নিন্দার সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা গুলি খাটে। তুমি এক জনের কুকার্য্য দেখে ঘৃণায় অভিভূত হোয়ে যদি বজ্র কণ্ঠে তা'র বিরুদ্ধে তোমার স্বর উত্থাপন কর, তা' হোলে নিন্দিত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ তোমাকে নিন্দুক বোল্‌বে না। কিন্তু যখন দেখ্‌ছি নিন্দা কোর্‌তে আমোদ পাচ্চ বোলে তুমি নিন্দা কোর্‌চো, কাল যদি পৃথিবীতে সমস্ত কুকার্য্য রহিত হয় তা'হোলে তোমার জীবনের সুখের একটা উপাদান বিনষ্ট হয়, তা'হোলে তুমিও হয়ত অকাতরে তা'দের সঙ্গে সহমরণে যাবার আয়োজন কোর্ত্তে পার, তখন তুমি

যুধিষ্ঠিরের চেয়ে সত্যবাদী হওনা কেন, নিন্দুক বোলে আমি তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা রহিত করি। যখন তুমি সত্য কথা বলবার জন্য নিন্দা কর না, কেবল নিন্দা করবার জন্য সত্য কথা বল, তখন তোমার সে সত্য কথা নীতির বাজারে মিথ্যা কথার সমান দরেই প্রায় বিক্রি হবে। অতএব নিন্দার যদি একটা বাঁধাবাঁধি ব্যাখ্যা স্থির কোর্ত্তে যাও, তা'হোলে বলা যেতে পারে যে, বিনা উদ্দেশ্যে বা হীন উদ্দেশ্যে পরের নামে সত্য বা মিথ্যা দোষারোপ করাকে নিন্দা বলে।

পরের নামে দোষারোপ কোর্ত্তে ও পরের নিন্দা শুনতে সাধারণতঃ লোকের কেন অত ভাল লাগে? এক এক সময়ে ভেবে দেখতে গেলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। মানুষের মনে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা সর্ব্বদাই জেগে রোয়েছে। বীভৎস-আবর্জ্জনা-রাশি দেখতে ত আমাদের আমোদ বোধ হয় না, তবে পরের নিন্দে শুনতে কেন অত তৃপ্তি? অনেক দূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান কোরে এর মূল দেখতে গেলে আত্ম-শ্লাঘায় গিয়ে পৌঁছিতে হয়। নিন্দে শুনলে অলক্ষিত ভাবে আমাদের মনে হয় যে, আমি হোলে এ কাজটা কোরতেম না, কিম্বা আমি যে দোষ কোরে থাকি, অমুক লোকেরও তা' আছে, অমুক লোকের চেয়ে আমি ভাল কিম্বা আমি একলাই কেবল দোষী নই, এই দুটো কথা অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে এক প্রকার গর্ব্ব-মিশ্রিত তৃপ্তি জন্মিয়ে দেয়। সকল মানুষের মনেই সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার ভাব রোয়েছে বটে, কিন্তু শিক্ষা ও চর্চ্চায় যে তার উন্নতি হয়, সে বিষয়ে ত আর কোন সন্দেহ নেই। 'তুমি হয়ত চর্ম্ম-চক্ষে একটা কুশ্রী জিনিষ দেখতে পার না, কিন্তু তোমার হয়ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা এত দূর প্রস্ফুটিত হয় নি, যে কুগুণ বা কুনীতির মত একটা নিরাকার পদার্থের অসৌন্দর্য্য বা কুশ্রীত্ব তোমার মনে তেমন আঘাত দেয়। সুশিক্ষার গুণে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা যখন তোমার মনে যথেষ্ট বিকসিত হবে, তখন একটা কদাচরণের কথা শুনলে ঘৃণায় তোমার গা শিউরে উঠবে কিম্বা লজ্জা ও সঙ্কোচে তোমার মাথা হেট হোয়ে যাবে বটে কিন্তু সেই কথা শুনে তোমার আমোদ বোধ হবে না, বা সেই কথা নিয়ে অবকাশের সময় বৈঠক খানায় বোসে দশ জনের কাছে দশটা রসিকতা ও হাসা পরিহাস কোর্ত্তে রুচি হবে না। কিন্তু সৌন্দর্য্যের ভাব কজন লোকের মনে এমন প্রস্ফুটিত?

নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে আমাদের কেমন একটা টাম্ আছে। একটা নিন্দা শুনলে আমরা প্রায় তা'র প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিনে, আসল কথা হোচ্চে জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে চাইনে। বোধ হয় আমাদের মনে-মনে এক প্রকার সূক্ষ্ম ভয় থাকে, পাছে তার ভাল প্রমাণ না থাকে। নিন্দা বিশ্বাস করবার দিকে সাধারণের এত অনুরাগ যে, চণ্ডীমণ্ডপের বিচারালয়ে নিন্দিত ব্যক্তি অপেক্ষা নিন্দুকের সাক্ষী অধিকতর প্রামাণ্য বোলে গৃহীত হয়। তুমি রাধামাধ-

বের নামে আমার কাছে একটা দোষো-ত্থাপন কোর্‌লে, আমি কোন প্রমাণ না জিজ্ঞাসা কোরেও তা' বিশ্বাস কোরলেম, তা'র পরে রাধামাধব যদি বোল্‌তে আসে যে, আমি কোন দোষ করি নি, তা' হোলে আমি হয়ত প্রমাণ না পেলে তা' ঝট্ কোরে বিশ্বাস করিনে। নিন্দিত ব্যক্তির অত্যন্ত সঙ্কটের অবস্থা। আমরা সহজেই মনে করি, যে, দোষী ব্যক্তি ত স্বভাবতঃ আপনার দোষ ক্ষালন কর্ত্তে চেষ্টা পা-বেই। সুতরাং আমরা তা'র কথায় কান দিই নে। অনেক সময়ে "দোষ করিনি" ছাড়া আমাদের আর কিছু বক্তব্য থাকে না, আমরা অনেক সময়ে বিশেষ কতক গুলি গোপনীয় কারণে নির্দ্দোষিতার প্রমাণ থাক্‌তেও তা' আমরা প্রমাণ কোর্ত্তে পারিনে। এরকম অবস্থায় দায়ে পোড়ে "দশচক্রে ভগবান ভূত" হোয়ে পড়েন। আমরা যে, নিন্দা বিশ্বাস কোর্ত্তে ভাল বাসি তা'র আর একটা প্রমাণ এই যে, মনে কর হরিহর রামধনের নামে তোমার কাছে একটা নিন্দা কোরেছে, তুমি সেটা বিশ্বাস কোরেছ ও সেই অবধি পরম আমোদে আছ, এবং দু দশ জন বন্ধুর কাছে গল্প কো-রেছ; আমি যদি আজ এসে তোমাকে বলি যে, হরিহর লোকটা অত্যন্ত নিষ্কুক, তার কথা বিশ্বাস কর্বার যোগ্য নয়, তা' হোলে তুমি কোন মতে তা' বিশ্বাস কর না, তুমি বল "না, না, তা' কি হয়? লো-কটা কি একেবারে খাঁটি মিথ্যে কথা বো-ল্‌তে পারে?" কি আশ্চর্য্য! হরিহরের মুখে তুমি যখন রামধনের নিন্দের কথা শুনেছিলে, তখন ত তুমি প্রশংসনীয় উদা-রতার সঙ্গে বল নি যে, "না, না, তা' কি হয়! সে লোকটা কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে?" একটা নিন্দা তুমি অতি সহজে গলাধঃকরণ কোর্‌লে, কিন্তু আর একটা সেই শ্রেণীর নিন্দেই কেন তোমার গলায় হঠাৎ বাধ্‌ল? এর কারণ অবশ্য সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌চেন। তিনি পরম আনন্দে একটি সুস্বাদ নিন্দা উপভোগ কোর্‌ছি-লেন, আর তুমি কি না আর একটি নীরস নিন্দা তাঁর হাতে দিয়ে সেটি তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিতে চাও? যে নিন্দুকের মুখ থেকে তিনি অমৃত পান করেন, তাকে তুমি আর যা' খুসী বোলে নিন্দে কর, কিন্তু মিথ্যেবাদী বোলে খবরদার নিন্দে কোরনা, তা'হোলে তুমিই মিথ্যাবাদী হোয়ে দাঁ-ড়াবে।

বিশ্বাস পরায়ণতা মনের সুস্থ ও স্বাভা-বিক অবস্থা। যাঁরা পরনিন্দা শুন্‌লে অতি সহজেই তা বিশ্বাস করেন, তাঁদের হয়ত তুমি বিশ্বাস-পরায়ণ বোল্‌বে। আমি ত ঠিক তার উল্টো বলি। যেমন তুমি যখন বল, আমি চারদিক অন্ধকার দেখ্‌ছি, তখন তার অর্থ বোঝায়, আমি কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে, অর্থাৎ অন্ধকার দেখা, কিছু না দেখার ভাষান্তর মাত্র, তেমনি নিন্দা-বিশ্বা-সিতা, অবিশ্বাসিতার অন্য একটি নাম। তুমি দেখ্‌তে পাবে, সন্দিগ্ধ ও কুটিল-হৃদ-য়েরাই নিন্দা নিয়ে লেনা-দেনা কোরে থাকেন। তুমি যথার্থ সরল ও অসন্দিগ্ধ-

চিত্ত ব্যক্তির কাছে কারো নিন্দা উত্থাপন কর, তিনি বোলে উঠ্‌বেন "না, না, এমনো কি মানুষে কোর্‌তে পারে।" মানুষের চরিত্রের উপর তাঁর এত বিশ্বাস যে, তিনি, কেহ যে খারাপ কাজ কোরেছে, তা' শীঘ্র বিশ্বাস কোর্ত্তে পারেন না। মনে কর তোমার এক পরিচিত ব্যক্তি অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁকে তুমি প্রত্যহ দুই সন্ধ্যে দেবপূজা কোর্ত্তে দেখ, আমি তোমাকে এক দিন কানে কানে ফুস্‌ ফুস্‌ কোরে বল্লেম যে, চক্রবর্ত্তী মশায় বৃহস্পতিবারে গোমাংস খেয়েছেন, অমনি তুমি তা' বিশ্বাস কোর্‌লে; তুমি কতদূর সন্দিগ্ধ হৃদয় বল দেখি! তুমি প্রত্যহ নিজের চক্ষে তাঁর ধার্ম্মিকতার প্রমাণ পাচ্ছ, আর এক দিন একটা কানে কানে কথা শুনেই সে সমস্ত তুমি অবিশ্বাস কোর্‌লে? চণ্ডীমণ্ডপে গুটি পাঁচেক বৃদ্ধ গৃহস্বামী বোসে ধূম-সেবন কোর্‌চেন, চানকোর শ্লোক পাঠ কোরে ও বয়ঃপ্রাপ্তি অবধি চণ্ডীমণ্ডপের তাম্রকূট-ধূমাচ্ছন্ন ও নস্য-গন্ধী পর-চর্চ্চা শুনে সংসারের বিষয়ে তাঁদের অভিজ্ঞতা অসাধারণ পক্কতা প্রাপ্ত হোয়েছে; রামশঙ্কর খুড়ো তাঁদের এসে বোল্লেন যে, মণ্ডলদের বাড়ির ছোট বৌ সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ কোরেছে, তাঁরা অতি অল্প পরিশ্রমে সমস্ত সিদ্ধান্ত কোরে মহা বিজ্ঞভাবে বোল্লেন যে, "কিছু আশ্চর্য্য নয়, কারণ, "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" তাইত বলি, নিন্দা বিশ্বাস করা সন্দিগ্ধ-হৃদয়ের লক্ষণ। তবে কেউ কেউ আছেন, যাঁরা দূর অপেক্ষা নিকট, অনুপস্থিত অপেক্ষা উপস্থিত, ও নিজের চোখের দেখা অপেক্ষা পরের মুখের কথা অধিক বিশ্বাস করেন। এখন তুমি তাঁকে একটি খবর দেও, তা' বিশ্বাস কোর্ত্তে তাঁর যত পরিশ্রম ও সময় ব্যয় হবে, দু ঘণ্টা পরে আর এক জন ঠিক তার বিপরীত খবর দিলে, তা' বিশ্বাস কোর্ত্তে তাঁর তার চেয়ে কিছু অধিক হবে না। এমন লোকের শিশু-প্রকৃতির একটা ঘোরতর ভ্রমের ফল। এ দলের সম্বন্ধে আমার অধিক কিছু বক্তব্য নেই। নিন্দা অবিশ্বাস কর্ব্বার ঝোঁক অনেকটা শিক্ষা ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। এ বিষয়ে বিশেষ অভ্যাস ও বিবেচনা আবশ্যক। যে নিন্দা শুন্‌লে তোমার মনে কষ্ট হয়, তা' তুমি না বিশ্বাস কোর্ত্তেও পার, কিম্বা যে নিন্দায় তোমার কষ্ট বা সুখ কিছুই না জন্মায়, তা' তুমি বিশেষ প্রমাণ না পেলে অবিশ্বাস কোর্ত্তে পার, কিন্তু স্বার্থ-জড়িত কতকগুলি বিশেষ কারণে যে নিন্দা শুন্‌লে তোমার আমোদ জন্মা'বার সম্ভাবনা, তা' বিশেষ প্রমাণ না পেয়ে বিশ্বাস না করা শিক্ষিত মনের লক্ষণ। আর এক অবস্থায় আমরা নিন্দা অতি সহজে বিশ্বাস করি। আমরা একজন লোককে খারাপ বোলে জানি, তা'র নামে একটা নিন্দা শুন্‌বা মাত্রেই আমরা অনায়াসে বিশ্বাস করি, আমরা মনে করি এটা কিছুই অসম্ভব নয়। সুতরাং আমরা তা'র আর প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিনে কিন্তু শিক্ষিত-মনা ব্যক্তিরা তখন বলেন, যে, "সমস্ত সম্ভব ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে না।"

একটা জিনিষ সম্ভব হোতে পারে কিন্তু সত্য নাও হোতে পারে। এক ব্যক্তি এসে যখন আমাদের কাছে একটা প্রিয়-নিন্দা উত্থাপন কোরে বলে যে "এই রকম ত সকলে বল্‌চে!" তখন আমরা আর কিছু বিচার করি নে, মনে করি "সকলে বোল্‌চে," এর চেয়ে সুদৃঢ় প্রমাণ আর কিছুই হোতে পারে না! কিন্তু এই "সকলে বোল্‌চে" কথাটি অত্যন্ত শূন্য-গর্ভ। একজন তোমাকে এসে বোল্লেন, সকলে বোল্‌চে অমুকে অমুক কাজ কোরেচে। সেখেনে "সকলে" অর্থে তিনি যে ব্যক্তির মুখে শুনেছেন, তুমি তাঁর খুড়ো ধোরে আমাকে বোল্লে যে, সকলে অমুক কথা বোল্‌চে। আমি অকাতরে বিশ্বাস করি যে, যখন "সকলে বোল্‌চে" তখন অবিশ্যি সত্যি! আমাকে একজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করে যে, "তুমি যে বোল্‌চ "সকলে বোল্‌চে," আচ্ছা, কে কে বোলচে বল দেখি?" আমি ভেবে ভেবে এক জনের বেশী নাম কোর্‌তে পারিনে, অবশেষে অপ্রস্তুত হোয়ে আমি তোমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি—"ওহে, কে কে বোল্‌চে বল দেখি?" তুমিও তথৈবচ। মূল অন্বেষণ কোর্ত্তে যতদূর পর্য্যন্ত যাওনা কেন, দেখ্‌বে তোমার চেয়ে এবিষয়ে কারু জ্ঞান অধিক নয়। "সকলে বোল্‌চে" কথাটা একটা সংক্রামক পীড়া। প্রথমতঃ এক জনের মুখ থেকে কথাটা বেরোয়, তা'র পরে দিবসান্তে সকলেরই মুখে শুন্‌তে পাবে "সকলে বোল্‌চে।" সকাল বেলায় যে কথাটি সম্পূর্ণ অলীক ছিল, সন্ধ্যে বেলায় সেটা সম্পূর্ণ সত্য হোয়ে দাঁড়ায়। আমি একটা বিশেষ নিয়ম কোরেছি যে, "সকলে বোল্‌চে" কথাটা যখনি শুনব, তখনি জিজ্ঞাসা কোর্‌ব "কে কে বোল্‌চে?"

শিক্ষিত ব্যক্তিরা যখন একটা নিন্দা শোনেন তখন অনেক রকম বিচার করেন। আমরা তিন রকম ব্যক্তির কাছে নিন্দা শুনি; (১) বিখ্যাত নিন্দুক, অর্থাৎ যা'দের আমরা নিন্দুক বোলে জানি। (২) যা'দের বিষয়ে আমরা কিছুই অবগত নই। (৩) যাদের আমরা সত্যবাদী বোলে জানি। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের মুখ থেকে যখন শিক্ষিত-মনা ব্যক্তি কোন নিন্দা শোনেন তখন তা' অবিশ্বাস কোর্ত্তে তাঁর বড় পরিশ্রম হয় না। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখ থেকে যখন শোনেন তখন তাঁর একটা ভাবনা আসে; হয়ত মনে করেন যে, "এ লোকটার কথা অবিশ্বাস কর্ব্বার আমার কি অধিকার আছে?" কিন্তু এ ভাবনা কোন কাজের নয়, কেন না তখন আমাদের দুটো বিরোধী কর্ত্তব্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর এক জনের সচ্চরিত্রে অবিশ্বাস কর্ব্বার আমার কি অধিকার আছে? এ রকম অবস্থায় তিনি বিশ্বাসও করেন না, অবিশ্বাসও করেন না। বিশ্বাস ও অবিশ্বাস দুইয়েরি অধিকার বহির্ভূত একটি দাঁড়াবার স্থান আছে। তিনি তখন সে নিন্দুককে বলেন যে, তোমার কথা সত্য হোতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ প্রমাণ না পাব ততক্ষণ তা' বিশ্বাস কোর্ব্বনা।" কিন্তু তৃতীয়োক্ত ব্যক্তির মুখে যখন তিনি নিন্দা শোনেন তখন তিনি যে

সকল যুক্তি অবলম্বন করেন সে বিষয় পরে বল্‌চি।

যা'কে তিনি নিন্দুক বোলে জানেন তা'র মুখ থেকে কোন নিন্দা শুন্‌লে তিনি এই সকল বিবেচনা করেন যে, "প্রথমতঃ এ-ব্যক্তির কোন অভিসন্ধি থাক্‌তে পারে, কিম্বা নিন্দার অভ্যাস থাকা বশতঃ নিন্দা কোর্‌চে। দ্বিতীয়তঃ. একটা সত্য কথার কিয়দংশ বাদ দিলে তা' মিথ্যে হোয়ে দাঁড়ায়; তুমি আমাকে এসে বোল্লে যে, অমুক মদ খেয়েছে, কিন্তু তুমি হয়ত বাদ দিলে যে, তা'কে ডাক্তারেরা মদ খেতে পরামর্শ দিয়েছিল; তুমি সত্য কথা বোল্লে বটে কিন্তু এ মিথ্যার রূপান্তর মাত্র, অতএব একটা কথার সমগ্র না শুন্‌লে সে বিষয়ে বিচার করা যায় না।

যাঁকে তিনি সত্যবাদী বোলে জানেন তাঁর কাছ থেকে যখন তিনি কোন নিন্দা শোনেন, তখন তিনি প্রথমতঃ মনে করেন, "ইনি হয়ত একটা গুজব শুনে তা'ই বিশ্বাস কোরেচেন। বিশ্বাস কর্ব্বার কি কারণ ছিল, জানিনা, কিন্তু হয়ত সে কারণ গুলি ভ্রমাত্মক।" দ্বিতীয়তঃ, ইনি হয়ত কতকগুলি কার্য্য দেখে একটা নিজের অনুমান কোরে নিয়েছেন, সে কার্য্যগুলি সমস্ত সত্য হোতে পারে কিন্তু সে অনুমানটা হয় তো সমস্তই অমূলক।" তৃতীয়তঃ "তিনি হয়ত তাঁর নিজের কতকগুলি বিশেষ সংস্কার বশতঃ একটা কাজ এমন খারাপ চক্ষে দেখ্‌চেন যে, তার তিল প্রমাণ দোষ স্বভাবতই তাঁর সুমুখে তাল-প্রমাণ আকার ধারণ কোর্‌চে। চতুর্থতঃ, অনেক সময় অনেক জিনিষ যা' আমাদের কল্পনায় সত্য বোলে প্রতিভাত হয়, তা' আসলে সত্য নয়। মনে কর, এক জন হিন্দু এক দিন রবিবারে গির্জ্জে দেখতে গিয়েছেন, সেই দিনকার বক্তৃতায় যাজ্ঞী সাহেব দৈবক্রমে Heathen দের বিরুদ্ধে দুই এক কথা উল্লেখ কোরেছিলেন। সেই হিন্দু কল্পনা কোরলেন যে, পাদ্রী তাঁর প্রতি লক্ষ্য কোরেই ঐ বক্তৃতাটি করেন। এই কল্পনায় তাঁকে এমন অভিভূত কোরে তুল্লে যে, তাঁর মনে হোল, যেন, বক্তা একবার তাঁর দিকে বিশেষ কোরে চেয়ে দেখ্‌লেন ও সেই সময়েই Heathen কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বল্লেন। সেই হিন্দুটি সত্যবাদী হোতে পারেন, পাদ্রী যে, সে দিন হীদেনদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা ক'রেছিলেন সে বিষয়ে আমি তিল মাত্র সন্দেহ করিনে, কিন্তু তিনি যে তাঁর দিকে চেয়ে হীদেন কথাটি বিশেষ জোর দিয়ে বোলেছিলেন, সে বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ রোয়ে গেল! এই রকম কত শত বিচার কর্ব্বার জিনিষ রোয়েছে। আমার কাছে একবার একজন আমার এক পরিচিত ব্যক্তির নামে নিন্দা করেন, আমি তা' বিশ্বাস না করা'তে তিনি বলেন যে, তিনি সেই ব্যক্তির এক বাড়ির লোকের কাছে শুনেছেন। আমি তাঁকে বল্লেম, "তা'তে বিশেষ কিছুই প্রমাণ হোচ্চে না। বাড়ির লোক বোলেছে বোলে বিশ্বাস কর্‌বার একটা প্রধান প্রমাণ

দেখাচ্ছ এই যে, বাড়ির লোক কখনো তার আত্মীয়ের নামে নিন্দা করে না। আচ্ছা ভাল। কিন্তু যখন দেখছ, এক একটা "বাড়ির লোক" তার "বাড়ির লোকের" নামে নিন্দা কোরছে, তখন তার বাড়ির লোকত্ব পর-লোকত্ব প্রাপ্ত হোয়েছে! খুব সম্ভব, নিন্দিত ব্যক্তির সঙ্গে তা'র কোন কারণে মনান্তর হোয়েছে, তা' যদি হোয়ে থাকে তবে তা'র নামে অলীক অপবাদ রটা'তে আটক কি? বাড়ির লোক তার আত্মীয়ের নিন্দা করে, তখন তাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা কম বিশ্বাস করি। অনেক লোক আছেন, তাঁরা পরের অনিষ্ট কোর্ব্ব বোলে নিন্দে করেন না। তাঁরা ভদ্রলোক, তাঁরা পরের মনে কষ্ট দিতে চান না। তাঁরা যখন নিন্দা করেন তখন তার ফল বিবেচনা কোরে দেখেন না। তাঁরা কৃষ্ণকান্ত বাবুর নামে একটা নিন্দা শুনেছেন, তাই জহরীলালের কাছে গল্প কোরে বোল্লেন "ওহে, শোনা গেল, কৃষ্ণকান্ত বাবু অমুক কাজ কোরেছেন।" জহরীলালের সঙ্গে কৃষ্ণকান্তের কোন আলাপ পরিচয় যোগাযোগ নেই, সুতরাং হঠাৎ তাঁদের মনে ঠেক্‌তে পারে না যে, এ নিন্দার কোন দোষ আছে। দৈবক্রমে দুরতঃ তার একটা কুফল ঘোট্‌তে পারে, তা' তাঁরা ভেবে উঠ্‌তে পারেন না। তা'ছাড়া অনাবশ্যক কারু নিন্দা কোর্ব্ব না, এমনো একটা নিয়ম তাঁরা বাঁধেন নি। যখন দশ জন বন্ধু দশ রকম কথা কোচ্চ, তখন জিব অত্যন্ত পিছল হোয়ে ওঠে, মনের কপাট আল্‌গা হোয়ে যায়, তখন বিশেষ একটা হানি না দেখ্‌লে একটা মজার কথা সাম্‌লে রাখা তাঁদের পক্ষে দায় হোয়ে ওঠে। তখন তাঁদের মনে করা উচিত যে, তাঁরা যদি শোনেন যে, নিতান্ত অপরিচিত রাস্তার লোকের কাছে এক জন তাঁদের নিন্দা কোরেছে, তা'হোলে তাঁরা রোষে একেবারে অধীর হোয়ে ওঠেন কি না? তখন তাঁরা কেন, মনকে বোঝান না যে, "আমরা কেইবা? আমাদের এক মুহূর্ত্তের একটা কাজ একটা মানুষ কতক্ষণই বা মনে রাখ্‌তে পার্ব্বে বল? আমরা আমাদের নিজের মনে সর্ব্বদাই এমন জাগ্রত রোয়েছি যে অন্য একটা অপরিচিত বা অল্প পরিচিত মানুষ আমাদের বিষয় কত কম ভাবে, তা' আমরা ঠিক মনে কোর্ত্তে পারি নে!" তখন তাঁরা কেন ভাবেন না যে, "এক জন অপরিচিত ব্যক্তি আমার দোষ জান্‌লেই বা তাতে কি ক্ষতি?"

খবর দেবার বাতিক অনেক লোকের আছে। একটা নতুন খবর দিতে পার্‌লে এক জন যত গর্ব্ব অনুভব করেন, এক জন লেখক তাঁর মনের মত রচনা শেষ কোরে ততটা অনুভব করেন না। খবর দেবার অতৃপ্ত পিপাসা তাঁদের একটা রোগ। এঁদের অনুগ্রহেই নিন্দার বাজারে যথেষ্ট মালের আমদানি হয়। এক জনের ঘরের খবর ফাঁকি দিয়ে জান্‌তে পার্‌লে লোকের ভারি আমোদ হয়। তুমি পর্দ্দার আড়ালে খেম্‌টা নাচ্চো, তুমি মনে কোরচ আমি দেখতে পাচ্চি নে, অথচ আমি দেখে নিচ্চি

তাতে আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি হয়। একটা কাজ যতই দুষ্কর্ম্মের ও গোপনীয়, তা'র প্রকাশ বক্তার ও শ্রোতার মনে ততই আমোদ হয়। এক জন লোক একটা কোর্ত্তে গেল, কিন্তু আর একটা হোয়ে পোড়ল; সে মনে কোরচে এ কাজটা গোপন রইল, অথচ সেটা প্রকাশ হোয়ে পোড়ল, তা'তে আমাদের ভারি একটা মজা মনে হয়! হাস্য রসের বিষয়ে এমার্সণ্ বোলেছেন যে, "সমুদয় কৌতুক ও প্রহসনের মূল ও সার হচ্চে, উদ্দেশ্যের অসম্পূর্ণতা—যা' সিদ্ধ হ'বার কথা ছিল তা'র অসিদ্ধি; বিশেষত এক ব্যক্তি যখন সিদ্ধ হ'বার বিষয়ে উচ্চৈঃস্বরে আশা প্রকাশ কোর্‌চে তখন তা'র নিরাশ হওয়া। বুদ্ধির অসামর্থ্য, আশার হতসিদ্ধি, ও একটা কার্য্য-সূত্রের হঠাৎ মাঝখানে ছেদ হওয়ার নাম, comedy।" গুপ্ত নিন্দা শুনতে আমাদের এই জন্যেই ভাল লাগে। একেত নিন্দা, তা'তে আবার গুপ্ত! এই জন্যেই যা'রা লোকের পরিবার সংক্রান্ত কোন খবর দিতে পারে, তা'রা আপনাকে কৃত-কৃতার্থ ও পূর্ব্ব জন্মের অনেক পুণ্যের অধিকারী মনে করে।

অনেকের বাড়িয়ে বলা স্বভাবসিদ্ধ। অনেক সময়ে তারা নিজে বুঝ্‌তে পারে না যে, তারা বাড়িয়ে বোল্‌চে। আমি জানি, গোবিন্দ বাবুর বাড়িয়ে বলা একটা বদ্ধমূল রোগ। তাঁতে আমাতে দুজনে মিলে যা' দেখেছি, তা'ও আমার সাক্ষাতেই আর এক জনের কাছে এমন বাড়িয়ে বলেন যে, আমি আশ্চর্য্য হোয়ে যাই। তিনি যা'কে পণ্ডিত বোলে প্রশংসা কোর্ত্তে চান, তা'কে বলেন তা'র মত পণ্ডিত ভারতবর্ষে নেই, এই রকম কোরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিনি নিদেন ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চাশ জনকে ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতের যশ অর্পণ কোরেছেন। তাঁর প্রধান রোগ হোচ্চে (অনেক ঐতিহাসিকের এই রোগটি আছে।), যে একটা সত্য ঘটনা বলা তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়, সেই কথাটি বোলে শ্রোতার মনে তার অভিপ্রেত একটি ফল জন্মিয়ে দেওয়াই তাঁর মুখ্য অভিপ্রায়। যদি তিনি অসংলগ্ন দুই একটা কথা দৈবাৎ শুনতে পান, তা' হোলে নিজের টাক থেকে দু চারটে কথা যোগ কোরে সেটা সংলগ্ন কোরে দেন, কেননা জানেন, নৈলে শ্রোতাদের মনে কোন ফল হবে না। যদি তিনি জানতে পারেন, একটা ঘটনা একটু মুচ্‌ড়ে, ইতস্ততঃ একটু ছেঁটে ছুঁটে দিলে শ্রোতাদের মনে অধিকতর ফল হবে, তা' হোলে সে পরিশ্রম-টুকু স্বীকার কোর্ত্তে তিনি কিছুমাত্র অসম্মত নন। সর্ব্বদাই তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে হাঁ করিয়ে রাখা, তাঁর জীবনের প্রধান চেষ্টা। "ভয়ানক" "অসাধারণ" "আশ্চর্য্য", এই সকল বিশেষণে তাঁর তহবিল পূর্ণ রোয়েছে। এঁরা যে সকল নিন্দা ও মিথ্যে কথা বলেন, তার উদ্দেশ্য হোচ্চে, দশ জনকে তাক কোরে দেওয়া। এদের দল সংখ্যায় কম নয়।

এই রূপ যেমন শ্রেণীর নিন্দক

আছে, নিন্দা করবার প্রথাও তেমনি শত সহস্র। এক দল নিন্দুক আছে, নিন্দা করাই যে, তা'দের উদ্দেশ্য তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু আর এক দল আছে, নিন্দা করা যেন তাদের বাসনা নয় এই রকম প্রকাশ পেতে থাকে। বলা বাহুল্য যে, শেষোক্ত দলই অধিকতর ফুল-জনক। তাঁদের নিন্দা করবার পদ্ধতি নানাবিধ। তাঁদের নিন্দের দুচারটে নমুনা দিই।

অনেক সময়ে নীরবে নিন্দা করা যায়। পাঁচ জনে এক জনের খুব প্রশংসা কোরচে, তুমি সেখানে এমন রহস্যপূর্ণ ভাবে চুপ কোরে বোসে আছো, কিম্বা তোমার ঠোঁটের এক কোণে এমন এক রত্তি হাসি উঁকি মারচে, যে খানিক ক্ষণ তোমার এই রকম ভাবগতিক দেখে তা'র মুখের কথা মুখে মোরে আসে, তা'রা মনে করে তুমি না জানি তা'র নামে কি একটা গুপ্ত সংবাদ জান, তোমাকে পীড়াপীড়ি আরম্ভ কোরলে তুমি বল যে, "নাঃ, কিছু না।" এমন স্বরে বল যে, তার অর্থ এই হোয়ে দাঁড়ায় যে, "সে অনেক কথা।" আর এক রকম নিন্দে আছে, তা'কে বাজে নিন্দে বা উপরি নিন্দে বলা যেতে পারে। সে হোচ্চে, পাঁচ কথা বোলতে বোলতে এক কথা বলা। রামধন বাবুর কাল রাত্রে অত্যন্ত কাশী হোয়েছিল, এই গল্পটি বলবার সময় একটু সুবিধে, অবকাশ ও ছিদ্র পেলেই, সুদক্ষ নিন্দুক যেন বিশেষ কোন কথা-নয় এমনি ভাবে হরকুমার যে মদ-খায় সেই কথাটা সংক্ষেপে বোলে যান। গানের পক্ষে যেমন তান, গল্পের পক্ষে এরকম নিন্দাও তাই। যেমন গানের সুর ও তাল বজায় রেখে দুই একটা বাজে তান দিলে হানি নেই, গানের সুর বিগড়ে বা তাল মাটি কোরে একটা অসংলগ্ন তান দিলে শ্রোতাদের কানে তাল শোনায় না, তেমনি গল্পের তাল বজায় রেখে ঠিক জায়গায় একটা উপরি কথা তুললে শ্রোতাদের মন্দ লাগে না; এরকম স্থলে বক্তার নিন্দুক বোলে বদনাম রটে না; মনে হয় পাঁচ কথা বোলতে এক কথা দৈবাৎ বেরিয়ে পোড়ল। বেকনে আছে, যে, এক এক জন বাজে কথায় চিঠি পুরিয়ে কাজের কথা পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে লেখেন। অনেক নিন্দুকও তাই করেন, সমস্ত কথার মধ্যে যে নিন্দাটা তাঁর বিশেষ বলা উদ্দেশ্য সেইটেকে তিনি এমন অপ্রাধান্য দিয়ে বলেন যে, মনে হয় যেন, সেটা বলবার জন্যে তাঁর বিশেষ মাথা-ব্যথা পড়েনি। আবার অনেকে ভান করেন যেন, দৈবাৎ তিনি এক কথা বোলে ফেল্লেন, আধ খানা বোলেই জিব কামড়ান, তার পরে পাড়াপীড়ির পর অতি আস্তে আস্তে সব বের কোরে ফেলেন। লোকে বোলবে তিনি ইচ্ছে কোরে পারত-পক্ষে কারু নিন্দে করেন নি। কেউ বা, যেন তিনি মনে কোরচেন যে তুমিত জানই, এমনি ভাবে তোমার কাছে একটা কথা বোলে ফেলেন; তার পরে যখন শোনেন যে, তুমি জানতে না, তখন ঘোরতর অনু-

তাপ আফশোষ কোর্ত্তে আরম্ভ করেন। আবার অনেকে নিন্দে করবার সময় এই রকম ভাব দেখান যে, যেন "সকলেই একথা জানে, তুমি জাননা, এতারি আশ্চর্য্য!" এ সকল নিন্দে নিন্দের নামে সংসারে গণ্য হয় না। সংসারে আর এক প্রকারের নিন্দা আছে, তা'কে আত্ম-নিন্দা বোল্‌তে গেলে সকল সময়ে বিনয় বোঝায় না। অধিকাংশ আত্ম-নিন্দা গর্ব্ব থেকে উত্থিত হয়। তুমি সমস্ত সমাজকে উপেক্ষা কোরে বোল্‌তে থাক যে, আমি পৃথিবীর নিন্দা গ্রাহ্য করিনে! আমি অমুক অমুক পাপাচরণ কোরেছি, এখন সমাজ! তুমি আমার কি কোর্ত্তে পার কর। সমাজের উপর মহা খাপা! কেন? না সমাজের শক্তি আছে বোলে। পাপাচরণ কোর্‌লে সমাজ বল-পূর্ব্বক শাসন করেন বোলে। সমাজের দুই একটি আদুরে ছেলে ছাড়া আর কেউ বিপথে গেলে সমাজ তাকে স্নেহের স্বরে উপদেশ দেন না, তা'কে কান ধোরে সিধা পথে আনেন। আদরের ও স্নেহের দানা দেখিয়ে তিনি ছিন্ন-রজ্জু ঘোড়াকে আস্তা-বলে ফেরাতে চেষ্টা করেন না, তাঁর নিয়ম হোচ্চে চাবুকের ভয় দেখানো। কিন্তু এক একটা মানুষ আছে, যাদের মন্দ কাজ না কোর্ত্তে অনুরোধ কর, শুন্‌বে, কিন্তু আদেশ কর, অমনি তা'র বিরুদ্ধে তারা কোমর বেঁধে দাঁড়াবে। আত্ম-নিন্দুক দলেরা অধিকাংশ এই শ্রেণীর লোক। বায়রণ তা'র একটি বিখ্যাত আদর্শ। পর-নিন্দুকদের মত আত্ম-নিন্দুকদের সকল কথাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। আত্মনিন্দা যখন গর্ব্ব থেকে উত্থিত হোচ্চে, তখনো তা' অনেক পীড়াপীড়িতে দায়ে পোড়ে স্বীকার করা হয়, তখন যে তার অনেক কথা বাড়ানো থাকা সম্ভব, তা' বলাই বাহুল্য। এই রকম সমাজের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ করে তা'রা দুর্দ্দান্ত বলিষ্ঠ-হৃদয় লোক। কিন্তু একটা দেখা যায়, এক ব্যক্তির সমাজ বিদ্রোহিতা যতই বল-বান হোক না কেন, তবু এইটুকু আত্ম-শ্লাঘা ও নিন্দা-ভীরুতা তার মনে অবশিষ্ট থাকবে যে, কতকগুলি ছোট-খাট দোষ সে সমাজের কাছে কোন মতেই প্রকাশ কোর্ত্তে রাজি হবে না। একজন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কোর্ত্তে পার্ব্বে যে, সে ডাকাতী কোরেছে, কিন্তু চুরী কোরেছে স্বীকার কোর্ত্তে সে কুণ্ঠিত হবে। কিন্তু এমন যদি কেউ থাকে যে, তার হৃদয়ের-বীভৎসতম স্থান পর্য্যন্ত লোকের চক্ষে অনাবৃত কোরে দিতে পারে, এমন কোন পাপ পৃথিবীতে নেই যা' সে প্রকাশ্য ভাবে আপনার স্কন্ধে না নিতে পারে, তবে সে নরকের এক পশু। পাপ যে করে সে বিকৃত-চরিত্র, কিন্তু যে প্রকাশ্য রে পাপ করে সে সে বিশেষণের অনধিকারী। আত্ম-নিন্দা ও বিনয় কেউ যেন এ পদার্থ মনে না করেন। বাঙ্গলা এক মহাকাব্যে মহাকবি রামের মুখে অনেক স্থলে "ভিখারী" বোলে আত্ম-পরিচয় বসিয়েছেন। যেমন "ভিখারী রাঘব; দূতি, বিদিত জগতে!" বোধ হয় কবি রামকে বিনয়ী কর্‌বার অভিলাষে

এই রকম কোরে থাক্‌বেন, কিন্তু আমরা একে বিনয় বোল্‌তে পারিনে। "আমি দরিদ্র" একথা বিনয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু আমি ভিক্ষা কোরে জীবিকা নির্ব্বাহ করি একথা বিনয়ের কথা নয়। দারিদ্র্য দোষের নয়, কিন্তু পরমুখাপেক্ষী হোয়ে ভিক্ষা কোরে জীবন ধারণ কর্ব্বার রুচি মনের একটা বিকৃত অবস্থা। কেউ কখনো আমি মিথ্যাবাদী বা আমি জুয়াচোর বোলে বিনয় প্রকাশ করে না।

আত্ম-নিন্দার ছলে অনেক সময়ে আমরা আত্ম প্রশংসা করি। একজন নানা প্রকার ভূমিকা ক'রে বোল্লেন, যে "দেখুন মহাশয়, আমার একটা ভারি দোষ আছে, আমি তা' কোন মতেই ছাড়াতে পারিনে, আমার যা' মনে আসে আমি তা' স্পষ্ট না বোলে থাকতে পারিনে, আমি যা' বলি তা' মুখের সামনে বলি।" এ'কে বিনীত ভাবে অহঙ্কার করা বলে।

আমরা আর এক সময়ে আত্ম-নিন্দা করি। আমরা যখন মনে মনে জানি আমাদের একটা গুণ আছে, আমরা তখন কখনো কখনো আমাদের সেই গুণ নেই বোলে বাইরে প্রকাশ করি; তা'র তাৎপর্য্য এই যে শ্রোতা আমার কথার বিরুদ্ধে নিজের মত ব্যক্ত করুক, সেইটে আমাদের শোনবার ইচ্ছে। আমরা এক এক জনকে দেখেছি, তাঁরা বন্ধু-মণ্ডলীতে "লোকটা ত বড় খেলাপালা!" এই প্রশংসাটুকু পাবার জন্য আপনার কতকগুলি ছোটখাটো দোষের কথা হাস্‌তে হাস্‌তে উল্লেখ করেন, তাঁর নিন্দার মূল্যে প্রশংসা ক্রয় কোর্ত্তে চান।

এই রকম যত আত্ম-নিন্দা দেখা যায় প্রায় দেখবে যে, বিনয়ের জমী থেকে তা'র চারা ওঠেনি। গর্ব্বই তার মূল। পরনিন্দার মূলেও গর্ব্ব, আত্ম নিন্দার মূলেও গর্ব্ব। পরনিন্দাও যেমন দোষ, আত্ম নিন্দাও তেমনি। পরহত্যা ও আত্মহত্যার মধ্যে নীতিশাস্ত্রে যেমন কম তফাৎ লেখে, পরনিন্দা ও আত্ম-নিন্দার মধ্যেও তাই।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

সখি রে! আবার তারে কেন বল দেখিনু!
কেন রে আপনা ভুলে, চকল আঁখিটি তুলে,
আবার সে মুখ পানে চমকিয়ে চাহিনু?
না বুঝিয়ে, না ভাবিয়ে কেন পুনঃ দেখিনু!

বিষাদ-আনত মুখে, দুটি হাত দিয়ে বুকে,
উদাসীর ঘোর ব্রত যারি তরে করিনু—
মরমের প্রেমোচ্ছ্বাস, সুখের সাধের আশ,
মরম-অতলস্পর্শে আট'কিয়ে রাখিনু—

কঠোর প্রতিজ্ঞা ভরে, সখীরে যাহারি তরে,
নয়ন-লহরী-উৎস পাথরেতে চাপিনু—
কিছুই না করি ভয়, গভীর যাতনাময়—
বৈরাগ্য-সাগর-গর্ভে অনায়াসে ঝাঁপিনু,
আবার কেন লো সখি, পুনঃ তারে দেখিনু—
আবার সে মুখ-পানে কেন ফিরে চাহিনু ?
দেখিয়াই সখি ওলো, পলকেই একি হ'ল,
পলকেই হৃদি প্রাণ সিহরিল কেন লো,
মরমের স্তরে স্তরে, কাঁপিয়া উঠিল যে রে
অচল অটল গিরি ভূকম্পনে যেন লো,
অশ্রু উৎস পরকাশি, পড়িল পাথর খসি
না মানি বারণ বাধা, সে লহরী ছুটিল,
গণ্ড দেশ ভাসাইয়ে, বক্ষঃস্থল ভিজাইয়ে
অধীর উত্তপ্ত স্রোতে মহীতল প্লাবিল—
সখি রে, প্রতিজ্ঞা মম, অনলে তূলের সম,
ছাই ভস্ম হ'য়ে বুঝি গেল ওলো গেল লো,
ওই রে পলক তরে, সে চারু চন্দ্রমা হেরে,
বৈরাগোরি ব্রত বুঝি উদ্‌যাপন হ'ল লো !
হ'ক না তা উদ্‌যাপন, কেনই সে দৃঢ় পণ,
কেনই পরাণ মন পাথরেতে বাঁধিব ?
যাক্ সে কঠোর ব্রত—শ্মশানেতে পরিণত
মানস-কুসুমকুঞ্জ কেনই বা করিব ?
চন্দ্র হাসে, তারা হাসে,হাসি সূর্য্য পরকাশে,
হাসিয়ে কুসুম-কলি কত ভাবে ফুটিছে,
জগৎ সুষমাময়, মাতিয়ে মলয় বয়,
হরষে তরঙ্গ তুলি, তরঙ্গিনী ছুটিছে,
আমি তবে কি লাগিয়ে, সুখ সাধ পাসরিয়ে
অনন্ত বিষাদ মসি মরমেতে ছাইব ?
বজ্র-দগ্ধ তরু প্রায়, অঙ্গার আকীর্ণ গায়,
প্রান্তরের এক ধারে শূন্য ভাবে রহিব ?
—কখনো কখনো নয়, বিসর্জ্জিব সমুদয়
তবুও তাহারে ভুলে কখনো না থাকিব.
কিসেরি প্রতিজ্ঞা ব্রত ? উন্মত্ত প্রলাপ যত,—
আমি তার সে আমার তাই ভেবে রহিব,
শুধায়ে সজল আঁখি, মরমে মরম ঢাকি
প্রকাশো পাথর,মূর্ত্তি হোয়ে দিন কাটাব,
প্রণয়ের কথা গুলি, হৃদয়ে রাখিব তুলি
মরম নিভৃত-কুঞ্জে ধ্যানে তাই ভাবিব—
চন্দ্রমা-তারকা পরে, সে প্রতিমা স্তরে স্তরে
স্বপ্নময় কল্পনার তুলিকাতে আঁকিব,
প্রদোষ-জলদ মাঝে, হেরিব সে মূর্ত্তি রাজে
আবার নয়ন মুদি যোগে তারে রূপিব !

* * *
* * *

আবার আবার ওই উন্মত্ত বাসনা ?
আবার আবার কিরে, কিরে ঘুরে ঘুরে ফিরে
পড়িব অনল কুণ্ডে সহিতে যাতনা ?
যাক্ প্রেম রসাতল, ভস্ম হোক মর্ম্মস্থল
ভালবাসা সুখ-আশা কাজ কি আমার ?
অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ওরে, বল দেখি তুই মোরে
সাজে কি আমার আর সাধের বিকার ?
না হইতে আশা পূর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন চূর্ণ চূর্ণ
হয় নে কি হৃদি মোর বজ্র ভীম বলে ?
তুই (ও) কি যাতনা মম, নেহারি পিশাচ সম
হাসিস্ নে উচ্চ হাসি দাঁড়ায়ে বিরলে ।
তুই (ও) কি ঈর্ষার ভরে, কুটিল কুচক্র ক'রে
আশার আলেয়া আলো সম্মুখেতে এনে—
প্রলোভনে প্রলোভনে, আকর্ষিয়ে প্রতিক্ষণে
নিরাশা-গরল হ্রদে ফেলিসনে টেনে ?
তুই কি মরুর পরে মরীচিকা রূপ ধরে
আগ্নেয় বালুকা গর্ভে করিস্‌নে পাত ?
তুই কি আমার, হায়, (প্রলয় ঝটিকা প্রায়)

করিস্ নে আশালতা ভূমে ভূপতিত !
মিছে তবে কেন আর সে যাতনা সহিব,
অনন্ত অনল কুণ্ডে কেন মিছে পুড়িব,
সাধ কোরে আপনার কেন চিতা সাজাব,
মরমের শিরে শিরে কেন বিষ মাখাব ?
কঠোর বৈরাগ্য ব্রতে পুনঃ মন বাঁধিব,
আঁখি অশ্রু ফেলে যদি—আঁখি ছিঁড়ে ফেলিব,
থাকে প্রাণ, থাক্ প্রাণ, প্রাণি আশা ভোজিব,
বিদায় সুখের কাছে জন্ম শোধ লইনু
সাধের প্রতিমা আজ বিসর্জ্জন করিনু !

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

অবসর-সরোজিনী—কাব্য, দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত। আলবার্ট প্রেস। মূল্য ১।০ আনা।

শুনিতে পাই, আমাদের গত বারের সমালোচনায় গ্রন্থকার মহাশয়ের সূক্ষ্ম শরীরে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছে—এবং সেই বেদনায় অস্থির হইয়া তাঁহার লেখনী পুনঃ পুনঃ প্রচণ্ড ভাবে আস্ফালন করিতেছেন, কিন্তু গ্রন্থকার মহাশয় আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন—অনর্থক তাঁহার মনে কষ্ট দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল না। সত্যের অনুরোধে—কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমরা দুই চারিটি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আর একটি কথা, গ্রন্থকার হইলে অনেক সহ্য করিতে হয়—অত সূক্ষ্মদর্শী হইলে চলে না। যাহোক এবার গ্রন্থকার মহাশয়ের সুরুচির নমুনা স্বরূপ একটি স্থল উদ্ধৃত করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

"জলদে-বিজলী" নামক প্রবন্ধে লিখিতেছেন,

"প্রাণময়ী কাছে এল হৃদয় জুড়ায়ে গেল,
হৃদয়ে বসিল মোর হৃদয়ের ধন !
. . . . .
সে আমার হৃদি পরে, আমি তার হৃদি ধ'রে,
নয়ন যুগল মুদি হয়েছি তন্ময় !"

নব-প্রবন্ধ—শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস প্রণীত। ভারত-মিহির যন্ত্র। মূল্য ৵০ আনা।

এই গদ্য গ্রন্থ খানি সাহিত্য সমাজের আদরণীয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ গুলি যেমন সরল ও সুন্দর ভাষায় লিখিত, ভাব গুলিও তেমনি গভীর ও প্রীতিপদ। আমাদের বোধ হয় ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পক্ষে এই পুস্তক খানি উপযুক্ত।

উদয়নাচার্য্য।

বান্ধবের এক জন লেখকের কথায় জানা যায়, কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়ন ও কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। কেননা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাউএল সাহেবের মতে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। বান্ধবের লেখক বলেন বারেন্দ্র কাশ্যপ ভাদুড়ী কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্য ১২৫০ শকের (১১৭২ খৃষ্টাব্দের) সমকালে বর্ত্তমান থাকিয়া বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করেন (৪৬) ইহাতে বোধ হয় বান্ধবের লেখকেরও বিশ্বাস কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ও কুলশাস্ত্র-ধাতা—এ উভয় উদয়নাচার্য্যই অভিন্ন ব্যক্তি ও এক সময়ের লোক। কেননা তাঁহার প্রবন্ধটী সম্বন্ধ-নির্ণয়ের সমালোচনের জন্য লেখা হইয়াছে, তিনি সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা উভয় উদয়নাচার্য্যকে অভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন, একথায় যদি তাঁহার কোন সন্দেহ থাকিত তবে তিনি অবশ্য উহার ও প্রতিবাদ করিতেন।

বঙ্গদর্শনের সম্পাদক কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্যকে বঙ্গদেশবাসী বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (৪৭)

আমরাও নিম্নলিখিত যুক্তির বলে বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় উদয়নাচার্য্যকে সমসাময়িক লোক দেখিতেছি:—

(১) সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কুল্লূক ভট্টের নাম উল্লেখ করিয়াছেন(৪৮) রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি খ্রীঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। কুল্লূক ভট্টের লিখানুসারে জানা যায়, তিনি বল্লালসেনের উত্তরবর্ত্তী ছিলেন (৪৯)। প্রাচীন প্রথা অনুসারে যদি কুল্লূকভট্টকে বল্লালের পরে ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক বলি তবে বোধ হয় বড় দোষ হয় না। এরূপ হইলে কুল্লূকভট্ট খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সম্বন্ধ-

৪৬ "বান্ধব" তৃতীয় খণ্ড ৩৮১ পৃষ্ঠা।

৪৭ বঙ্গদর্শন, তৃতীয় খণ্ড ৪৮৮ পৃষ্ঠা।

৪৮ রঘুনন্দন কৃত উদ্বাহ তত্ত্বে কন্যাদান প্রকরণ দেখ।

৪৯ গৌড়ে নন্দনবাসি নাস্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাংকুলে শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোভবৎ॥ কাশ্যাদুত্তরবাহিজহ্নু-তনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ॥ মীমাংসে বলসেবিতাদি সুহৃদস্তর্কঃ সমস্তাঃস্থ মে॥ বেদান্তাঃ পরমাত্মবোধগুরবো যূয়ং ময়োপাসিতাঃ। জ্ঞাতা ব্যাকরণানি বাল-সখিতা যুষ্মাভিরভার্থয়ে॥ প্রাপ্তোঽয়ং সময়োমমুক্ত বিরতৌ সাহায্য মালম্বতাং॥

কুল্লূক ভট্ট।

নির্ণয় কুলূকভট্টকে ত্রয়োদশ শকের লোক মনে করেন; কিন্তু প্রমাণ নাই;— বান্ধবের লেখক উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে ১১৭২ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়াছেন এবং কুলূকভট্টকে তাহার সমসাময়িক লোক বলিয়াছেন সুতরাং তাঁহারও এই মত। কুলূকভট্ট উদয়নাচার্য্যের সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধীয় সহকারী ছিলেন সুতরাং সাময়িক লোক; কাউয়েলের মতে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতাও দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং যখন এই উভয় উদয়নাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি হইলে আশ্চর্য্য কি?

(২) খলির ভট্টাচার্য্যদের বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কুল-শাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্য হইতে তৎ-কুলজাত বর্ত্তমান অধস্তন পুরুষ পর্য্যন্ত ২০ পুরুষ হইয়াছে (৫০) যদি উদয়নাচার্য্যকে খ্রীঃদ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলা যায়, তবে তদ্বংশীয় প্রত্যেক পুরুষের জীবিত কাল গড় পরতা ৩৪½ বৎসর ধরিতে হয়। খলির ভট্টাচার্য্যদের-ন্যায় সবল, দীর্ঘায়ু ও বয়োধিক পরি-গত বংশ সম্বন্ধে গড় হিসাবে ৩৪½ বৎসর

(৫০) আদি পুরুষ।
১ উদয়নাচার্য্য।
২ পশুপতি আচার্য্য।
৩ যগাই আচার্য্য।
৪ টীকাই আচার্য্য।
৫ বলাই আচার্য্য।
৬ ছেরম্ব আচার্য্য।
৭ সহস্রাক্ষ আচার্য্য।
৮ রামানন্দ আচার্য্য।
৯ শ্রীরাম ভট্টাচার্য্য।
১০ বীরেশ্বর তর্কালঙ্কার।
১১ জয়হরি পঞ্চানন।
১২ রামচন্দ্র তর্কবাগীশ।
১৩ হরিনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার।
১৪ রামজীবন তর্কসিদ্ধান্ত।
১৫ রামকিশোর ভট্টাচার্য্য।
১৬ ভুবনমোহন তর্কভূষণ।
ইত্যাদি ২০ পুরুষ।

আমরা উদয়নাচার্য্য হইতে একটী বংশাবলীর এক শাখা মাত্র প্রদান করি-লাম। উদয়নাচার্য্যের ছয় পুত্রের মধ্যে পশুপতি আচার্য্য কুলশ্রেষ্ঠ, আর পাঁচটী পতিত। কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচা-র্য্যের অধঃস্তন পুরুষগণ এখন নিম্নলিখিত স্থান সমূহে অবস্থিতি করিতেছেন;— রাজসাহী জিলায়;—ত্রাহিপুরের রাজ-বংশ। ফলিদা কুসুমীর ভাদুড়ী, ছবীশ-পুরের খাঁ। ময়মনসিংহ জিলায়— সুসঙ্গের সিংহবংশ, মুক্তাগাছা। ঢাকা জিলায়—খলি। পাবনা জিলায়— বাজসা, ঝাইকান্দা, ভারজা বাগমারা নাকালিয়া ইত্যাদি*। সুসঙ্গের মহা-রাজা প্রভৃতি এখন উদয়নাচার্য্যের বংশে কুলশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত।

* এই সকল স্থান ব্যতীতও অনেক স্থানে উদয়নের সন্তানগণ অবস্থিতি করিতেছেন।

(৫১) জীবন কাল হওয়া একটুকু আশ্চর্য্য নহে। উদয়নাচার্য্যের বংশাবলীতে অন্যান্য স্থানের কোন শাখায় ২৩ পুরুষ হইয়াছে, তাহা হইলে সেই শাখায় জীবন কাল প্রত্যেক পুরুষে গড় হিসাবে ২৯½ বৎসর হইয়াছে। সুতরাং তাহুড়ী বংশীয় উদয়নাচার্য্যের বংশাবলী অনুসারে ও তাঁহাকে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিলে দোষ হয় না। ইনি এবং কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা যে এক সময়ে বর্ত্তমান, এ যুক্তিও তাহা বলিয়া দিতেছে সুতরাং ইহাদের উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিলে তাহা অস্বাভাবিক হয় না।

(৩য়) ভট্টরাঘব নামক এক ব্যক্তি তাঁহার "ন্যায়সার বিজয়" গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র ও উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভট্টরাঘব ১২৫২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (৫২) ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্য ভাগের লোক দ্বাদশ শতাব্দির শেষভাগের লোক উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। এ প্রমাণেও কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা ও কুল-শাস্ত্র-বিশারদ উদয়নাচার্য্যকে পৃথক সময়ের লোক বোধ হয় না।

যখন লৌকিক বিশ্বাস কিংবদন্তী যুক্তি ও সময় এ সকল দ্বারা দেখা যাইতেছে যে কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা উদয়নাচার্য্য এবং বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় কুল-শাস্ত্রধাতা পণ্ডিতসিংহ উদয়নাচার্য্যকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিলে কোন দোষ হয় না তখন আমরা অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতেছি ইহারা উভয়ে অভিন্ন লোক ও খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কেন না যে কুলশাস্ত্রবিধাতা অসামান্য বিদ্যাবত্তা ও অলৌকিক প্রতিভা-বলে সমাজ-নীতিতে সমস্ত বারেন্দ্র সমাজের নরেন্দ্র হইয়া ছিলেন, যাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও অলৌকিক গুণে মোহিত হইয়া কুল্লুকভট্টের ন্যায় ভারতবিখ্যাত শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী ও যাঁহার শক্তি সমর্থন জন্য সহকারিতা স্বীকার করিয়া ছিলেন সেই গৌতমকল্প উদয়নাচার্য্য যে কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করিবেন তাহাতে আমরা একটুকও আশ্চর্য্য হই না। আমাদের বিবেচনায় তিনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র।

আমরা ভাণ্ডার বুলার রামদাস বাবু প্রভৃতির মত সমর্থন করিয়া খণ্ডনখণ্ড খাদ্য প্রণেতা শ্রীহর্ষকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়াছি এখন উদয়নাচার্য্যকেও খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দির

৫১ ন্যূনকল্পে ১৬ বৎসর ও উর্দ্ধে ৩০ বৎসর প্রত্যেক পুরুষের গড় হিসাবে জীবন কাল ধরিবার প্রথা দেখা যায় কিন্তু এরূপ গণনা অনেক স্থলেই প্রমাদ-রহিত হয় না। গতিকেই আমরা এই সিদ্ধান্তকে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমরা উদয়নাচার্য্যের বংশেই দেখিতেছি এক শাখায় গড় হিসাবে ৩৪½ বৎসর হইল অন্য শাখায় ২৯ বৎসর হইল। অন্যান্য বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ইহা হইতেও কম হইবার সম্ভব।

(৫২) Dr. Hall's Catalogue P. 26.

শেষ ভাগের লোক বলিলাম। কেহ মনে করিতে পারেন যখন শ্রীহর্ষ খণ্ডন গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তখন উদয়ন তাহা অপেক্ষা অবশ্যই পূর্ব্ব সাময়িক লোক। এ কথায় আমরা এইমাত্র বলিব উদয়নাচার্য্য ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ ঠিক এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; তবে উদয়নের কুসুমাঞ্জলি শ্রীহর্ষের গ্রন্থাদির কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। যদিও লোকে সমকালবর্ত্তী লোকের লিখিত বিষয় উদ্ধৃত করিতে কিছু সঙ্কুচিত হয় তথাচ যে উদয়নাচার্য্যের শক্তিতে তৎকালিন সমাজ পরিচালিত হইত—যিনি সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে মহারাজ হইতেও অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন, যাঁহার সমাজ-নীতিজ্ঞতা, অগাধ বিদ্যা, অলৌকিক প্রতিভা এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হইয়া শীর্ষস্থানীয় সুধীসমণ্ডলীও পরম মান্য করিতেন সেই ঋষিকল্প উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থের বিষয় তৎসাময়িক লোকেরা উদ্ধৃত করাতে অপমানিত হওয়া দূরে থাকুক আপনাকে আরো সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেন। আমরাও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহাত্মাদের লিখিত বিষয় পরম সমাদরে গ্রহণ করিতে পারি কিন্তু কোন ক্ষুদ্র লেখকের লেখা উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হই। সুতরাং খণ্ডনখণ্ডখাদ্যপ্রণেতা শ্রীহর্ষ দূরবাসী হইলেও সমাজপূজনীয় দেশবিখ্যাত বুধকেশরী উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। কেননা উদয়নাচার্য্য যেরূপ দেশবিখ্যাত ছিলেন তাহাতে তাঁহার গ্রন্থ দেশমধ্যে প্রচারিত হইতে একটুকও বিলম্ব হয় নাই। অদ্য একজন প্রসিদ্ধ লোকের, যে গ্রন্থ খানি প্রচারিত হইতে ৫০ বৎসর লাগে উদয়নাচার্য্যের ন্যায় সমাজ-বিখ্যাত লোকের সেইরূপ এক খানি গ্রন্থ প্রচারিত হইতে পাঁচ বৎসর লাগে বিনা সন্দেহ।

বাস্তবিক উদয়নাচার্য্য খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক তাহার কোন সন্দেহ নাই। কাউয়েল যে কথাটী সন্দেহ করিয়া বলিয়াছিলেন এখন আমরা দেখিতেছি তাহা প্রায় ঠিক। যদিও মাধবাচার্য্যের কথা প্রমাণ-রহিত না কিন্তু এখন দেখা যায় যে শ্রীহর্ষ ও উদয়ন আর ময়ূর ও বাণ ইহারা দুই জন করিয়া এক এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

পাঠকগণ দেখুন আমরা যদি পূর্ব্বে শ্রীহর্ষের একটী সময় নির্ণয় না করিয়া লইতাম তবে তাঁহাকে উদয়নের সমকালবর্ত্তী করিবার জন্য আবার কত কথা বলিতে হইত, সেকথা না বলিলেই চলিত না। উদয়নাচার্য্য দুইবার পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম পক্ষে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি এবং কদ্রপতি এই চারি পুত্র হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ব্বে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে সুতরাং উদয়নাচার্য্যের পাঁচ পুত্র ছিল (৫৩) উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী

(৫৩) বাল্মিকের লেখক ছয় পুত্রের কথা বলিয়াছেন অথচ পাঁচপুত্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

নাম্নী এক কন্যা ছিল। ঘটককারিকার মতে উদয়ন প্রথম পক্ষের-চারি পুত্রকে উপেক্ষা করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র পশুপতিকে কুলশ্রেষ্ঠ করিয়া যান।

উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নাম্নীকন্যাকে বল্লভাচার্য্য বিবাহ করেন। এই লীলাবতী পরম বিদ্যাবতী ছিলেন। কথিত আছে তিনি পতিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অশ্রু-মসী দ্বারা করুণ রসাশ্রিত এক সংস্কৃত কবিতা গ্রন্থ লিখেন। শুনা যায় ঐ গ্রন্থের অনুলিপি এখনো খলির ভট্টাচার্য্যদের নিকট আছে।

সম্বন্ধনির্ণয়ের মতে উদয়নাচার্য্যের নিবাস রাজসাহীর অন্তর্গত নিশিন্দাগ্রামে ছিল। আবার খলির ভট্টাচার্য্যেরা বলিয়া থাকেন মাণিকগঞ্জ বিভাগের অন্তর্গত বালীয়াটী গ্রামে উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল, ঐ গ্রামে এখনো একটী উচ্চ স্থান আছে লোকে উহাকে "ভাদুড়ীর ভিটা" বলে ভৌগোলিক চক্ষে দেখিলে মাণিক গঞ্জ অঞ্চলকে ৪। ৫ শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থান বলা যায় না, প্রাচীন মানচিত্র দেখিলে দেখা যায় ঐ স্থানটী বিল ও নদীর সমষ্টি মাত্র তবে সাভার ভাওয়াল প্রভৃতি স্থান অনেক প্রাচীন। সাভারের নিকট অরণ্যমধ্যে একটী পুরীর চিহ্ন পাওয়া যায়, তথায় স্থানে স্থানে অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, লোকে উহাকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরী বলিয়া থাকে, এরূপ জনপ্রবাদ আছে, ঐ সকল স্থানে পূর্ব্বে দেবাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে যাহা হউক এখন কথা এই যদি সাভার প্রভৃতি স্থানে উদয়নাচার্য্যের নিবাস হইত, তবে আমরা একথা অনেক বিশ্বাস করিতে পারিতাম। কিন্তু বালীয়াটী যে উদয়নাচার্য্যের নিবাস ছিল আমরা একথা একটুকও বিশ্বাস করি না; তবে এই হইতে পারে উদয়নাচার্য্যের বংশধর কোন পুরুষ প্রথম আসিয়া বালীয়াটী নিবাস স্থাপন করেন পশ্চাৎ তথা হইতে ক্রমে খলি গিয়াছেন এই জন্য তাহাদিগকে "বালীয়াটীর ভাদুড়ী" বলে। উদয়নাচার্য্যের নিবাস যে রাজসাহীর অন্তর্গত নিশিন্দা গ্রামে ছিল এই কথাই অধিক প্রত্যয় হয়।

সম্বন্ধনির্ণয় উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে কতক গুলি ভ্রম করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে এসম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—শান্তিপুর নিবাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা মধু মৈত্রেয় বিবাহ করেন। তন্নিবন্ধন তিনি সমাজচ্যুত হয়েন। এই কথা রাজা কংশনারায়ণের কর্ণগোচর হয়। তিনি ইহা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ উদয়নাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সাহায্যে মধুমৈত্রেয়ের কুল রক্ষা করেন এবং স্বেচ্ছাক্রমে নিজকন্যা মধুমৈত্রকে সমর্পন করিয়া কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় শ্রেণীতে অবতরণ করিলেন। এদিকে উদয়নাচার্য্যও তাঁহার কন্যা লীলাবতীকে মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিবাহ দেন। মণ্ডনমিশ্র জলবিন্দুস্পর্শে ছিটকাপ হয়েন। এই লীলাবতীর গর্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি. রুদ্রপতি, এবং পশুপতি এই পাঁচ পুত্র হয়। (৫৫)

(৫৫) সম্বন্ধনির্ণয় ২৩৪। ২৩৫। ২৩৬।

এ কথায় বান্ধবের লেখক এইরূপ উত্তর দিয়াছেন।

প্রথম রাজা কংশনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না। উদয়নাচার্য্য ১২৫০শকের সমকালে বর্ত্তমান থাকিয়া বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। উদয়নের অধস্তন নবম পুরুষ কৃষ্ণভাদুড়ী (৫৬)। এই কৃষ্ণ ভাদুড়ী কংশনারায়ণের ভগিনীকে বিবাহ করেন। পক্ষান্তরে মধুমৈত্রের অধস্তন ৫ম পুরুষ-জাত দুর্লভ মৈত্র কংশনারায়-ণের সমসাময়িক। উদয়ন এবং কুলুক ভট্ট উভয়ে সমসাময়িক ***** কুলুক ভট্টের ভ্রাতা পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের বংশে অধস্তন ১০ কি ১১ পুরুষে রাজা কংশনারায়ণের জন্ম হইয়াছিল।

*** উদয়নাচার্য্য লাহুড়ি-কুলোদ্ভব বল-ভাচার্য্যকে লীলাবতী নাম্নী কন্যা সমর্পন করেন। ভূপতি ভবানীপতি রুদ্রাণী-পতি গৌরীপতি ও উমাপতি এই ছয় জন উদয়নাচার্য্যের পুত্র, দৌহিত্র নহে।

বান্ধবের এই লেখকের যুক্তি ঠিক হইয়াছে। কিন্তু বিষয়গত কিছু ভ্রম আছে। তিনি উদয়নাচার্য্যের ছয় পুত্রের কথা লিখিলেন কিন্তু পাঁচটীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় পশুপতির নামটী ক্রমক্রমে লিখেন নাই। এইরূপ আরও দুই একটী ভ্রম আছে কিন্তু আমাদের তাহা উল্লেখ করিয়া বিশেষ ফল নাই।

কুলীনের সহিত কুলীনের অথবা কাপের সহিত কাপের সম্বন্ধ বন্ধন কালে উভয় পক্ষে কুলময়ী কন্যার আদান প্রদান বিষয়ক মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক যে বাগ্‌দান হয় তাহার নাম "করণ"। সম্বন্ধ নির্ণয়ের মতে এই করণের সৃষ্টি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ কুলজ্ঞ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। (৫৭)

কেহ বলিয়া থাকেন পঞ্জাব দেশে উদয়নাচার্য্যের একটী সমাধিমন্দির আছে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ যদি থাকিত তাহা অবশ্য আবিষ্কার করিতেন। আর যদি সমাধি-মন্দির বাস্তবিকই থাকে, তবে তাহা এই উদয়নাচার্য্যের কি অন্য কোন উদয়না চার্য্যের তাহা আমরা জানি না।

উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী শুনা যায় যে ইনি বৌদ্ধদিগকে প্রবোধ দিবার জন্যই কুসুমাঞ্জলি প্রণয়ন করেন। কোন সময়ে উদয়নাচার্য্যের সহিত এক-দল নাস্তিকের ঈশ্বর লইয়া তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয় কিন্তু কাহারও কথাতেই কেহ আস্থাবান না হওয়াতে এই মীমাংসা হইল যে একটী অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিয়া সেই জ্বলন্ত হুতাসনে উদয়নাচার্য্য এবং নাস্তিক-গণ প্রবেশ করিবেন, যদি ঈশ্বর থাকেন তবে উদয়নাচার্য্য সশরীরে রক্ষা পাইবেন

(৫৬) কৃষ্ণ (বা রামকৃষ্ণ) শ্রীরাম এবং রামকৃষ্ণ ইহারা তিন ভ্রাতা উদয়নের অধস্তন নবম পুরুষ ইহা খনির বংশা-বলীতে ও উল্লেখ আছে।

(৫৭) সম্বন্ধ নির্ণয় ২৩৬ পৃষ্ঠা

নাস্তিকগণ ভস্ম হইয়া যাইবে। আর যদি ঈশ্বর না থাকেন তবে উদয়নাচার্য্য ভস্ম হইয়া যাইবেন—নাস্তিকগণ জীবিত থাকিবে এই পণ করিয়া সকলেই জ্বলন্ত অনলে ঝম্প প্রদান করিলেন; ক্ষণকাল মধ্যে নাস্তিকগণ ভস্ম হইয়া গেল, উদয়ন বিনা-ক্লেশে দিব্য শরীরে প্রজ্বলিত অনল মধ্যে বসিয়া রহিলেন। উদয়নাচার্য্যেরই জয় হইল বটে কিন্তু বিনাকারণে নাস্তিকগণকে বধ করিলেন বলিয়া তাঁহার (উদয়নাচার্য্যের) অন্তরে এক বিষম ভাবনা প্রবেশ করিল, এই মহা পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা, তাহা, জানিবার বাসনায় উদয়ন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের আদেশ লইবার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় পৌছিবা মাত্র জগন্নাথের মন্দির-দ্বার অর্গলিত হইয়া গেল। উদয়নাচার্য্য জগন্নাথকে অনেক স্তব করিলেন, কিন্তু কিছুতেই দ্বারোদ্ঘাটিত হইল না। পরিশেষে এই দৈববাণী হইল "উদয়নাচার্য্য যে মহাপাপ করিয়াছে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই কিন্তু উদয়ন যদি তুষানলে প্রাণত্যাগ করে তবেই এই ঘোর পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবে। জগন্নাথের এই দৈববাণী শুনিয়া মহাত্মা উদয়নাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রেই তুষানলের অনুষ্ঠান করিলেন। পরে অম্লান বদনে প্রজ্বলিত হুতাসেন ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

আমরা এই অদ্ভুত কিম্বদন্তী লইয়া অধিক আলোচনা করিব না। আমরা উহাতে অভ্রান্ত চক্ষে এই সত্য দেখিতে পাই যে উদয়নাচার্য্য শ্রীক্ষেত্রে পার্থিব-লীলা সংবরণ করেন। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দির ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বিনির্ম্মিত হয়। অনেকে অনুমান করেন, নরকট কেশরী নৃপতির সময়ে এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ-কালকেও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্যের আবির্ভাব সময়ের একটী সমসাময়িক ঘটনা বলিতে হইবে। বোধ হয় ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইবার কতিপয় বৎসর পরেই মহাত্মা উদয়ন পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমরা এই স্থলেই মহাত্মা উদয়নাচার্য্যের জীবনী একরূপ পরিসমাপ্ত করিলাম। অতঃপর উদয়ন-সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটককারিকা এবং বারেন্দ্র কুলের কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী গোষ্ঠী-সম্ভূত কুলশাস্ত্রবিশারদ উদয়নাচার্য্যই যে কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা তৎসম্বন্ধে আরো কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অবসর অনুসারে একটী পরিশিষ্ট অধ্যায় লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমি বিলিতি মেয়েদের একটু নিন্দে কোরে লিখেছিলুম বোলে বুঝি সেটা ভাল লেগেছে। কিন্তু আমি সেটা কেবল এক শ্রেণীর মেয়েদের একটা ভাগ দেখিয়েছিলুম মাত্র, তাঁরা হোচ্চেন fashionable মেয়ে, তাঁদের দোরস্ত কোর্ত্তে হোলে দিন দুই আমাদের দিশী শাশুড়ির ও ঘরের বিধবা ননদের হাতে তাঁদের রাখ্‌তে হয়। তাঁরা হোচ্চেন বড় মানুষের মেয়ে কিম্বা বড় মানুষের স্ত্রী, তাঁদের চাকর আছে, কাজ কর্ম্ম কোর্ত্তে হয় না, এক জন house-keeper আছে, সে বাড়ির সমস্ত ঘরকন্না তদারক করে, এক জন nurse আছে, সে ছেলেদের মানুষ করে, এক জন governess আছেন (governess ভদ্র লোকের মেয়েদের থেকে নেওয়া হয়) তিনি ছেলে পিলেদের পড়া শুনো দেখেন ও অন্যান্য নানাবিধ তদারক করেন; তবে আর তাঁর পরিশ্রম কর্ত্তার কি রইল বল, কেবল একটা ঘোরতর পরিশ্রম বাকি আছে, সেইটে তাঁর দিনের মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধান পরিশ্রম, অর্থাৎ সাজসজ্জা করা; কিন্তু তার জন্য তাঁর lady's maid আছে, সুতরাং এমন সাধের পরিশ্রমটাও সমস্তটা তাঁকে নিজের হাতে কোর্ত্তে হয় না, সকাল থেকে সন্ধ্যে-পর্য্যন্ত দিনটা তাঁর হাতে আস্ত পোড়ে রোয়েছে, সকাল বেলায় বিছানায় পোড়ে, দরজা জানালা বন্ধ-কোরে সূর্য্যের আলোক আস্‌তে না দিয়ে দিনটাকে কতকটা সংক্ষেপ করেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে breakfast খান ও এগারোটার আগে শয়ন-গৃহ থেকে বেরোলে যথেষ্ট ভোরে উঠেছেন মনে করেন। তার পরে সাজসজ্জা; সে বিষয়ে তোমাকে কোন প্রকার খবর দিতে পার্‌ছিনে। শোনা যায় খুব সম্প্রতি বিলেতে স্নানটা fashion হয়েছে, কিন্তু এ fashion টা খুব কম দূর ব্যাপ্ত হোয়েছে। সিমন্তিনীরা, হাতের যত টুকু বেরিয়ে থাকে-মুখটি ও গলাটি দিনের মধ্যে অনেকবার অতি যত্নে ধুয়ে থাকেন, বাকি অঙ্গ পরিষ্কার করবার তাঁরা তত আবশ্যক দেখেন না, কেননা মনোহরণের প্রধান সিঁধ মুখটিতে কোন প্রকার মোর্‌চে না পোড়লেই হোল। মাসে দুবার একটা sponge-bath নিলেই তাঁরা যথেষ্ট মনে করেন; Sponge-bath-এর অর্থ হোচ্চে, একটা ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে গা সাফ্ করে ফেলা অর্থাৎ একটা ভিজে গামছা দিয়ে গা মোছা আর কি। আমি একটা ইংরেজ পরিবারের মধ্যে বাস কর্ত্তে গিয়েছিলেম, তাঁরা আমি স্নান করি শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য

-ছোঁয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের কোন প্রকার স্নানের সরঞ্জাম ছিল না, সমস্ত আমার জন্যে ধার কোরে আন্‌তে হয়েছিল, এমন বিপদ! যা'হোক্ আমাদের বিলাসিনী স্নান কোর্‌লেন কি না ধোল্‌তে পারিনে, তা'র পরে তাঁর সাজ-সজ্জার বিষয়ে আমি নিতান্তই অনভিজ্ঞ। কাপড়ের এখানে একটু ফিতে, ওখানে একটু পাড়, কোথাও একটু এলো-মেলো করে দেওয়া, কোথাও একটু পিন্ দিয়ে আট্‌কে রাখা। কত প্রকার টুক্‌রো টুক্‌রো জিনিষ পত্র এঁটে সেঁটে, মুখে কত প্রকার রং চং লেপে মনোদুর্গ আক্রমণের জন্য যথাযোগ্য যুদ্ধ-সজ্জা সমাপ্ত হয়। তার পরে এই রকম বাহারে সাজসজ্জায় এক বাণ্ডিল রূপের মত drawing-room-এর (অভ্যর্থনা-শালার) কৌচে গিয়ে বস্‌লেন; বাড়িতে লোক দেখা কোর্ত্তে এলে তাদের সঙ্গে আলাপচারী করা হচ্চে তাঁর কাজ, অনেক লোক একসঙ্গে এসে তাঁর কর্ত্তব্য হোচ্চে. তাঁর বাক্য ও হাসির অমৃত সকলকে সমান ভাবে বিতরণ করা, বিশেষ কারো সঙ্গে বেশী কথা কওয়া বা বিশেষ কাউকে বেশী যত্ন করা কোনমতে উচিত নয়; একাগুটা অত্যন্ত দুরূহ, বোধ হয় অনেক অভ্যেসে দুরস্ত হয়: আমি লক্ষ্য করে দেখি তাঁরা কি কোরে এ কাজ সিদ্ধ করেন, আমি দেখেছি তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা কন, তার পরে শেষ করেই সকলের দিকে চেয়ে একবার হাসেন, কখনো বা তাঁরা এক জনের মুখের দিকে চেয়ে একটা কথা আরম্ভ করেন, তার পর বল্‌তে বল্‌তে এক এক বার করে সকলের মুখের দিকে চেয়ে নেন, কখন বা, তাস খেল-বার সময় যে রকম করে চট্ পট্ তাস বিতরণ করে, তেমনি তাঁরা আগন্তুকদের একে একে করে একটি একটি কথার টুকরো ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেন, এমন তাড়া তাড়ি ও এমন সহজে করেন যে, তাঁদের হাতে যে অনেক কথার তাস গোছানো রয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। একজনকে বল্লেন, lovely morning, is n't it? তার পরেই তাড়াতাড়ি আর এক জনের মুখের দিকে চেয়ে বোল্লেন, কাল রাত্তিরে সঙ্গীতশালায় মাডাম্ নীল্‌সন্ গান করেছিলেন, "it was exquisite!" যতগুলি মহিলা Visitor বসেছিলেন সকলে ঐ কথায় এক একটা বিশেষণ যোগ কত্তে লাগ্‌লেন; একজন বল্লেন "oh charming" একজন বল্লেন "Superb" একজন বল্লেন "Something unearthly" আর একজন বাকী ছিলেন, তিনি বল্লেন "Is n't it?" এই রকম সর্ব্বদিকব্যাপী কথাবার্ত্তা চল্‌তে থাকে। আমার ত বোধ হয়, এ এক রকম সকাল বেলা উঠে কথোপকথনের মুগুর ভাঁজা। যা' হোক্ এই রকম মাঝে মাঝে visitor আনাগোনা কোর্‌চে। বাকী সময় তিনি কি করেন? Mudie's Library তে তিনি Subscribe করেন, সেখেন থেকে অনবরত নভেলগুলো তাঁর ওখেনে যাতায়াত কর্ত্তে থাকে। সেগুলো অনবরত গলাধঃকরণ কর্‌চেন। তা'ছাড়া flirt করা আছে।

Flirt করা কি জান? ভালবাসার অভিনয় করা। দুই পক্ষেই জান্‌চেন যে, কেউ ভালবাস্‌চেন না, অথচ মিষ্টি হাসি ও মিষ্টি কথার অজস্র আদান প্রদান চল্‌চে; অভিনেত্রী হয়ত একটা অলীক ছুঁতো নিয়ে একটু অলীক অভিমান কোর্‌লেন, অভিনেতা অমনি একটু সান্ত্বনার অভিনয় কর্‌লেন; একটা হয়ত রসিকতার কথা বল্লেন, অমনি অভিনেত্রী তাঁর তুষার-হস্তে ক্ষুদ্র-মুষ্টি উদ্যত করে আদর মাখা রাগের অভিনয় কোরে বলেন, "oh, you naughty, wicked, provoking man!" naughty man অত্যন্ত তৃপ্তি-সূচক হাস্য কর্‌লেন। এই রকম রসিকতা হাসি তামাসা ও মিষ্টি কথার ক্ষণস্থায়ী গোলাগুলি বর্ষণের নাম Flirt করা। এতে অনেকটা সময় বেশ আমোদে কেটে যায়। তা'ছাড়া (যদি তিনি miss হন) love making আছে। flirt করার সঙ্গে হয়ত তার অল্প তফাৎ আছে। তবে এটা flirt করার চেয়ে আর একটু গম্ভীর ও স্থায়ী পদার্থ (যদিও সকল সময়ে স্থায়ী হয় কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত বল্‌তে পারিনে)। অনেক চোখের জল ও নিশ্বেস খরচ কর্ত্তে হয়, সহচরীদের কাছথেকে অনেক রহস্যপূর্ণ চাটা ও চোক টেপাটেপি খেতে হয়, ও দিনের মধ্যে দশবার করে blush কোর্ত্তে হয়। অজস্র নভেল পোড়ে মনটা এমন romantic হয়ে দাঁড়ায় যে, একটু অবসর পেলেই ভাল বাসায় পড়তে ইচ্ছে করে, খাঁটি heroine-এর মত লম্বা চৌড়ো কাজ কোর্ত্তে ও লম্বা চৌড়ো কথা কইতে সাধ যায়। সুতরাং নভেল-পড়া মেয়েদের ভালবাসায় পড়া অত্যন্ত আমোদের অবস্থা। চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌তে হয় বটে; কিন্তু অনেক দিন থেকে তাঁদের বড় সাধ ছিল যে, একদিন এই রকম চোখের-জল ও নিশ্বেস ফেল্‌বার উপযুক্ত অবসর পান। এই রকম visitor অভ্যর্থনা করা, visit প্রত্যর্পণ করা, নতুন নভেল পড়া, নতুন fashion সৃষ্টি ও নতুন fashion-এর অনুবর্ত্তন করা, flirt এবং love করা হোচ্চে তাঁদের কাজ। এই রকম ফড়িঙের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি কোরে তাঁদের জীবনের বসন্তকাল কাটে। এঁরাই হোচ্চেন fashionable মেয়ের দল। আমি দেশে থাক্‌তে এখানকার মেয়েদের যে রকম মনে কোরেছিলুম, এখেনে এসে তা'র সঙ্গে ঢের তফাৎ দেখ্‌ছি। আমাদের দেশে যেমন ছেলেবেলা থেকে মেয়েদের বিয়ের জন্যে প্রস্তুত করে; লেখা পড়া শেখায় না, কেননা মেয়েদের আফিসে যেতে হবে না; এখেনেও তেম্‌নি মার্ষি দরে বিকোবার জন্য মেয়েদের ছেলেবেলা থেকে পালিষ কর্ত্তে থাকে; বিয়ের জন্যে যতদূর লেখা পড়া শেখা দরকার ততদূর শেখায়, তা'র বেশী শেখায় না, কেননা তা'দের ত আপিসে যেতে হবে না! একটু গান গাওয়া একটু

পিয়ানো বাজানো, ভাল কোরে নাচা, খানিকটা French, একটু বোনা ও সেলাই করা জান্‌লে একটি মেয়েকে বিয়ের দোকানের জানলায় সাজিয়ে রাখ্‌বার উপযুক্ত বেশ একটি রং চোঙে পুতুল গোড়ে তোলা হয়। এ বিষয়ে একটা দিশি পুতুল ও একটা বিলিতি পুতুলের যত টুকু তফাৎ, আমাদের দেশের ও এ-দেশের মেয়ের মধ্যে ঠিক ততটুকু তফাৎ মাত্র। দিশি পুতুলের অত সাজ্‌গোজ রংচঙের আবশ্যক করে না, আমাদের দিশি মেয়েদের পিয়ানো ও অন্যান্য টুকিটাকি শেখ্‌বার আবশ্যক করে না, বিলিতি পুতুলের কিছু বাহার আবশ্যক করে, বিলিতি মেয়েদেরও অল্প স্বল্প লেখা পড়া শিখ্‌তে হয়, কিন্তু দুইই দোকানে বিক্রি হবার জন্যে তৈরি হয়। এখেনেও পুরুষেরাই হর্ত্তা কর্ত্তা, স্ত্রীরা তাঁদের সম্পত্তি; যেমন গাড়ি চালা-বার জন্যে ঘোড়া আবশ্যক করে, তেম্‌নি সংসার চালাবার জন্যে একটা স্ত্রীর দর-কার, স্ত্রী একটি আবশ্যক জিনিষ পত্রের মধ্যে। স্ত্রীকে আজ্ঞা করা, স্ত্রীর মনের মুখে লাগাম লাগিয়ে নিজের ইচ্ছে মত চালিয়ে বেড়ানো স্বামীরা ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট অধিকার মনে করেন। Fashionable মেয়ে ছাড়া বিলেতে আরো অনেক রকম মেয়ে আছে, নইলে বিলেতে সংসার চল্‌তোনা। মধ্যবিৎ গৃহ-স্থদের মেয়ের কতকটা মেছনত কর্ত্তে হয়, অতটা বাবুয়ানা করলে চলে না। সকালে উঠে একবার kitchen তদারক কর্ত্তে যেতে হয়, kitchen পরিষ্কার আছে কিনা, জিনিষ পত্র যথাপরিমিত আনা হয়েছে কিনা, যথাস্থানে রাখা হয়েছে কিনা, ইত্যাদি দেখা শুনা করেন; রান্না ও খাবার জন্য জিনিষ আনতে হুকুম দিতে হয়, পয়সা বাঁচাবার জন্য নানা প্রকার গিন্নিপনার চাতুরী খেলাতে হয়, কালকের মাংসের হাড় গোড় কিছু যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহলে বন্দোবস্ত কোরে তা'র থেকে আজকের স্যুপ চালিয়ে নেন, পর্শু দিনকার বাসী রাঁধা মাংস যদি খাওয়া দাওয়ার পর খানিকটা বাকী থাকে তা' হলে সেটাকে রূপান্তরিত কোরে আজকের টেবিলে আনবার সুবিধে করে দেন, এই রকম নানা প্রকার বন্দো-বস্ত কর্ত্তে হয়। তার পরে ছেলেদের জন্য মোজা কাপড় চোপড় নিজের হাতে তৈরি করেন, এমন কি নিজেরও অনেক কাপড় নিজে তৈরি করেন। এঁদের সকলের ভাগ্যে নভেল পড়া ঘোটে ওঠে-না; বড় জোর খবরের কাগজ পড়েন, তাও সকলে পড়েন না দেখেছি; অনে-কের পড়াশুনার মধ্যে কেবল চিঠি পড়া ও চিঠি লেখা, দোকানদারদের বিল পড়া ও হিসাব লেখা। খানিকটা লেখাপড়ার চর্চ্চা না থাক্‌লে লেখাপড়ায় রুচি জন্মায় না। তাঁরা বলেন, Politics এবং অন্যান্য গ্রাম্যারি বিষয় নিয়ে পুরুষরা নাড়াচাড়া করুন; আমাদের কর্ত্তব্য কাজ স্বতন্ত্র।" তাই জন্যে তাঁরা লেখাপড়া চর্চ্চা করেন না; যেন পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে নিতান্ত সঙ্কু-

চিত বোলেই তাঁরা লেখাপড়া করেন না, যেন নিতান্ত অনধিকার প্রবেশ হয় বোলেই তিনি প্রায় তাঁর স্বামীর Library তে পদার্পণ করেন না; কিন্তু আমি এর মধ্যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য কিছু দেখতে পাইনে, আসল কথাটা হচ্চে, ইচ্ছে নেই, লাইব্রেরি যদি Ball-room হোত, তা' হোলে তাঁরা অধিকার অনধিকার নিয়ে বড় মাথা ঘোরাতেন না, আর Politics যদি নভেলের ভায়রা-ভাই হোত, তা' হোলে তাঁরা পুরুষের পাত থেকে Politics নিয়ে দুহাতে করে গিল্‌তেন। দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা ভূষণ বোলে গণ্য, এই জন্যে দুর্ব্বলতা মেয়েদের একটা গর্ব্বের বিষয়; মেয়েরা দুপা চোলে একেবারে এলিয়ে পোড়্‌লে আমাদের চোকে সে কেমন একটু ভাল লাগে, আমার বোধ হয়, তার কারণ, ওরকম দেখ্‌লে আমাদের আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়, আশ্রয় দেবার প্রবৃত্তি কতকটা গর্ব্ব থেকে হয়; নিজের শক্তি খাটাবার একটা অবসর পেলুম বোলে বেশ একটু তৃপ্তি হয়, বিশেষতঃ বেশ একটি সুন্দর পদার্থ যার দিকে আমাদের স্বভাবতঃ মনের টান, সে আমাদের আশ্রয়ে আমাদের ছায়ায় লতার মত জড়িয়ে থাকুক্ তা' আমাদের ইচ্ছে করে, এই জন্যে মেয়েদের দুর্ব্বলতা আমাদের ভাল লাগে, তাই জন্যে আমরা তা'র মধ্যে একটু সৌন্দর্য্য দেখি, সুতরাং অনেক মেয়ে শ্রান্ত না হোলেও এলিয়ে পড়েন, যিনি দশটা কাজ সহজে কোর্ত্তে পারেন, তিনি দেড় খানা কাজ কোরেই হাঁপাতে থাকেন। বুদ্ধি বিদ্যার বিষয়েও এই রকম; মেয়েরা জাঁক কোরে বলেন, "আমরা বাপু, ওসব politics, Science বুঝিনে শুঝিনে। বিদ্যার অভাব, বুদ্ধির খর্ব্বতা একটা প্রকাশ্য জাঁকের বিষয় হোয়ে ওঠে! পুরুষরা অমনি অতি স্নেহপূর্ণ আদর কোরে তাঁদের বলেন "হাঁ, ঠাকরুণরা, তোমরা ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক, ছেলে পিলে মানুষ কর, ওসকল শুষ্ক কাষ্ঠের বোঝা তোমাদের বইতে হবে না," ভাবটা, যেন, তোমাদের একটা মহা কষ্ট থেকে উদ্ধার কর্‌লেম! কিন্তু বিদ্যা-চর্চ্চা রহিত কোরলে একটা ভার থেকে মুক্ত করা হয় না, একটা অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়! এখানকার মধ্যবিৎ শ্রেণীর মেয়েরা বিদ্যাচর্চ্চার দিকে ততটা মনোযোগ দেন না, তাঁদের স্বামীরাও তার জন্যে বড় দুঃখিত নন, তাঁদের জীবন হোচ্চে কতক গুলি ছোট খাটো কাজের সমষ্টি। যা'হোক, সমস্ত দিন এই রকম ছেলেদের দেখা শুনা করে, কাপড় বুনে, visitor দের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কোয়ে কেটে যায়। সন্ধ্যেবেলায় স্বামী কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এলেন, স্ত্রীর কাছ থেকে একটি আদরের চুম্বন উপার্জ্জন কোর্‌লেন, (পরিবার বিশেষে যে তা'র অন্যথা হয় তা বলাই বাহুল্য) ঘরে তাঁর জন্যে আগুন জ্বালানো আছে, খাবার সাজানো আছে। সন্ধ্যে বেলায় স্ত্রী হয়ত একটা সেলাই নিয়ে বোসলেন, স্বামী তাঁকে একটি নভেল টেঁচিয়ে পোড়ে শোনাতে

লাগ্‌লেম, সুমুখে আগুন জ্বোল্‌চে, ঘরটি বেশ গরম, বাইরে হয়ত বৃষ্টি হোচ্চে, জানলা দরজাগুলি বন্ধ। হয়ত স্ত্রী পিয়ানো বাজিয়ে স্বামীকে খানিকটা গান শোনালেন; কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, Courtship-এর সময় স্ত্রীর গলা অত্যন্ত ভাল লাগ্‌ত, কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রীর গান শুনতে খুব কম লোকের আগ্রহ হয়, রোজ রোজ সেই একই রকম গলা, একই ধাঁচের গান শুনে খুব কম লোকেরই অরুচি না জন্মায়; গিন্নির গলা নেমন্তন্নের দিন কাজে লাগে, দশ-জন বন্ধু বান্ধবকে ডিনারে নেমন্তন্ন কর্‌লে যেমন টেবিল সাজাবার জন্যে অনেক জিনিষ সিন্দুক থেকে বেরোতে থাকে যা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, তেমনি সেদিন স্ত্রীরও গলা বেরোয়। এখান-কার মধ্যবিৎ শ্রেণীর গিন্নিরা এই রকম শাদাসিদে, যদিও তাঁরা ভাল ক'রে লেখা-পড়া শেখেননি, তবু তাঁরা অনেক বিষয় জানেন, এবং তাঁদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরি-ষ্কার; এদেশে কথায় বার্ত্তায় জ্ঞানলাভ করা যায়, তাঁরা অন্তঃপুরে বদ্ধ নন, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কন, আত্মীয় সভায় একটা কোন উচ্চ বিষয় নিয়ে চর্চ্চা হোলে তাঁরা শোনেন ও নিজের বক্তব্য বোল্‌তে পারেন, এই রকম কোরে অনেক জান্‌তে পারেন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একটা বিষয়ের কতদিক দেখেন ও কি রকম চক্ষে দেখেন, তা বেশ বুঝতে পারেন। সুতরাং একটা কথা উঠলে তিনি ভাল কোরে কইতে পারেন, কতকগুলো ছেলেমানুষী আকাশ থেকে-পড়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না ও বুঝতে না পেরে তাঁকে হাঁকোরে থাকতে হয় না, বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে খুব সহজ ভাবে গল্প স্বল্প কোর্ত্তে পারেন, নিমন্ত্রণ সভায় মুখ ভার কোরে বা লজ্জায় অব-সন্ন হোয়ে থাকেন না, পরিচিতদের সঙ্গে অন্যায় ঘেঁসা ঘেঁসি নেই, কিম্বা তাদের কাছথেকে নিতান্ত অসামাজিক দূরেও থাকেন না। লোক-সমাজে মুখটি খুব হাসি খুসি, প্রসন্ন; যদিও নিজে খুব রসিকা নন, কিন্তু হাসি তামাসা বেশ উপভোগ কোর্ত্তে পারেন, একটা কিছু ভাল লাগলে মন খুলে প্রশংসা করেন, একটা কিছু মজার কথা শুন্‌লে প্রাণ খুলে হাসা করেন। ঠোঁট্ বন্ধ কোরে থাকা ও লজ্জায় ম্রিয়মান হোয়ে পড়া এখানকার মেয়েদের আচরণের আদর্শ নয়। মনে কোরে দেখ দেখি, একটি নিমন্ত্রণ সভায় ৩০টি মেয়ে ঘাড় হেঁট কোরে চুপচাপ বোসে আছেন, সে সভায় পুরুষদের কি দুরবস্থা, ক্রমে ক্রমে তাঁদেরও মুখবন্ধ হোয়ে আসে, মনের ভিতর এক রকম অসোয়াস্তি উপস্থিত হয়, ও ধোমটা থাক্‌লে ধোমটা দিতে ইচ্ছে করে। লজ্জায় চুপচাপ কোরে থাকা অত্যন্ত অসামাজিক গুণ। তুমিত কতকগুলো বাঘের মধ্যে পড়নি, আপনার জাত, মানুষ, বিশেষতঃ ভদ্রলোক, কোন অভদ্র কুচরিত্র দলের মধ্যে গিয়ে পড়নি, তবে বেশ মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোরবে না ত কি? লজ্জা দুদণ্ড দেখ্‌তে বেশ মন্দ লাগে না,

হয়ত তার মধ্যে বেশ কবিত্বমাখা মাধুর্য্য দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু দিনরাত লক্ষার সঙ্গে কারবার করা অত্যন্ত যন্ত্রণা, দু তিন ঘণ্টা পরিশ্রম কোরে একটা কথার উত্তর পেলেম, একবার সওয়া গেল, কিন্তু দিন রাত যদি ঐ রকম একটা কথা শোন্‌বার জন্যে গলদ্ঘর্ম্ম হোতে হয়, তা হোলেত বাঁচা যায় না! তুমি যদি আমার সঙ্গে মন খুলে আমোদ প্রমোদ না কর তা হোলে দায়ে পোড়ে তোমার সংসর্গ ছেড়ে আমাকে অন্য সংসর্গ খুঁজ্‌তে হয়। বিয়ের মন্ত্র কিছু ভালবাসা জন্মাবার মন্ত্র নয়, বিয়ে হোলেই ভালবাসা হয় না, ভালবাসাও নেই, অথচ আমার স্ত্রী যদি আমাকে কথায় বার্ত্তায় আমোদে না রাখ্‌তে পারেন, তা হোলে আমি আমার সেই মূক সঙ্গিনী ছেড়ে কি অন্যত্র আমোদের সন্ধান কোর্‌ব না? আমার তাই বোধ হয় মেয়েদের একটা অস্বাভাবিক লজ্জা ও সঙ্কোচ চোলে যাওয়া ভাল, যৌবনের একটা স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের ও মনোবৃত্তির স্বাভাবিক বিস্তার শিক্ষা ও অভ্যাসের চাপে না পিষে ফেলা ভাল।

আমি দিন কতক আমার শিক্ষকের পরিবারের মধ্যে বাস কোরেছিলুম। সে বড় অদ্ভুত পরিবার। Mr. B — মধ্যবিত্ত লোক। তিনি লাটিন ও গ্রীক খুব ভাল রকম জানেন। তাঁর ছেলে পিলে কেউ নেই, তিনি তাঁর স্ত্রী, আমি আর একটা দাসী এই চার জন মাত্র একটি বাড়িতে থাকতুম। Mr.—আধবুড়ো লোক, অত্যন্ত অন্ধকার মূর্ত্তি, দিনরাত খুঁৎ খুঁৎ খিট্ খিট্ করেন, নিচের তলায় রান্না-ঘরের পাশে একটি ছোটো জান্‌লাওয়ালা দরজা-বন্ধ অন্ধকারঘরে থাকেন, একেত সূর্য্য-কিরণ সে ঘরে সহজেই প্রবেশ কোত্তে পারে না, তা'তে জানলার ওপর একটা পর্দা ফেলা, চারদিকে পুরোণো ছেঁড়া ধুলো মাখা নানাপ্রকার আকারের ভীষণদর্শন গ্রীক লাটিন বইয়ে দেয়াল ঢাকা, ঘরে প্রবেশ কোরলে এক রকম বদ্ধ হাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এই ঘরটা হোচ্চে তাঁর Study, এইখানে তিনি বিরক্ত মুখে পড়েন ও পড়ান। তাঁর মুখ সর্ব্বদাই বিরক্ত, আঁট বুট জুতো পোরতে বিলম্ব হোচ্চে, বুট জুতোর ওপর মহা চোটে উঠলেন, যেতে যেতে দেয়ালের পেরেকে তাঁর পকেট আট্‌কে গেল, রেগে ভুরু কুঁচ্‌কে ঠোঁট নাড়তে লাগলেন; তিনি যেমন খুঁৎ খুঁতে মানুষ, তাঁর পক্ষে তেমনি খুঁৎ খুঁৎতের কারণ প্রতিপদে জোটে, আস্‌তে যেতে তিনি চৌকাঠে হুচট খান, অনেক টানাটানিতে তাঁর দেরাজ খোলে না, যদি বা খোলে, তবু যে জিনিষ খুঁজছিলেন তা'পান না, এক এক দিন সকালে তাঁর Study তে এসে দেখি, তিনি অকারণে বোসে বোসে ভ্রূকুটি করে উ-আ কোরচেন, ঘরে একটি লোক নেই। কিন্তু B— আসলে ভালমানুষ, তিনি খুঁৎ খুঁতে বটে কিন্তু রাগী নন, তিনি খিট খিট করেন কিন্তু ধম্‌কান না। নিদেন তিনি মানুষের ওপর কখন রাগ প্রকাশ করেন না, Tiny বলে তাঁর একটা কুকুর আছে, তার ওপরেই

তাঁর যত আক্রোশ, সে একটু নোড়লে চোড়লে তাকে ধম্‌কাতে থাকেন, আর দিনরাত তাকে লাথিয়ে লাথিয়ে একাকার করেন। তাঁকে আমি প্রায় হাসতে দেখিনি। তাঁর কাপড় চোপড় ছেঁড়া অপরিষ্কার। মানুষটা এই রকম। তিনি এককালে পাদ্রি ছিলেন; আমি নিশ্চয় বোল্‌তে পারি, প্রতি রবিবারে তাঁর বক্তৃতায় তিনি শ্রোতাদের নরকের বিভীষিকা দেখাতেন। Mr.—র এত কাজের ভিড়, এত লোককে তাঁর পড়াতে হোত যে, এক এক দিন তিনি ডিনার খেতে অবকাশ পেতেন না। এক একদিন তিনি বিছানা থেকে উঠে অবধি রাত্রি এগারোটা পর্য্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এমন অবস্থায় খিট খিটে হোয়ে ওঠা কিছু আশ্চর্য্য নয়। Mrs B— খুব ভাল মানুষ, অর্থাৎ রাগী উদ্ধত লোক নন, এককালে বোধ হয় ভাল দেখ্‌তে ছিলেন, যত বয়স, তার চেয়ে তাঁকে বড় দেখায়, চোখে চসমা পরেন, সাজ গোজের বড় আড়ম্বর নেই। নিজে রাঁধেন, বাড়ির কাজকর্ম্ম করেন, (ছেলে পিলে নেই, সুতরাং কাজকর্ম্ম বড় বেশি নয়) আমাকে খুব যত্ন কোরতেন, খুব অল্প দিনেতেই বোঝা যায় যে, Mr ওMrs-এর মধ্যে বড় ভাল বাসা নেই, কিন্তু তাই বোলে যে, দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া ঝাঁটি হয় তা'নয়, নিঃশব্দে সংসার চোলে যাচ্চে। Mrs B— কখনো Mr .B—র Study তে যান না, সমস্ত দিনের মধ্যে খাবার সময় ছাড়া দুজনের মধ্যে আর দেখা শুনা হয় না, খাবার সময়ে দুজনে চুপচাপ বসে থাকেন, খেতে খেতে আমার সঙ্গে গল্প করেন, কিন্তু দুজনে পরস্পর গল্প করেন না; Mr. B—র আলুর দরকার হয়েছে, তিনি গোঁ গোঁ কর্‌তে কর্‌তে Mrs B—কে বোল্লেন "Some Potatoes" (please কথাটা বোল্লেন না কিম্বা শোনা গেল না) Mrs. B—বোলে উঠ্‌লেন "I wish you were a little more polite" Mr. B—বোল্লেন "I did say "please" Mr. B—বোল্লেন "I didn't hear it" Mr. B. বোল্লেন "It was no fault of mine that you did'nt!" কথাটা সমস্তটা ভাল কোরে শোনা গেল না, এই খেনেই দুই পক্ষ চুপকরে রইলেন। মাঝের থেকে আমি অত্যন্ত অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতেম। একদিন আমি ডিনারে যেতে একটু দেরী করেছিলেম, গিয়ে দেখি, Mrs B. Mr. B.কে ধম্‌কাচ্চেন,অপরাধের মধ্যে Mr.B. মাংসের সঙ্গে একটু বেশী আলু নিয়েছিলেন, আমাকে দেখে Mrs B. ক্ষান্ত হোলেন, Mr.B. সাহস পেয়ে প্রতিহিংসা তোল্‌বার জন্যে দ্বিগুণ কোরে আলু নিতে লাগ্‌লেন, Mr.B. তাঁর দিকে একটি নিরুপায় মর্ম্মভেদী কটাক্ষপাত কোর্‌লেন। দুই পক্ষই দুই পক্ষকে dear বা darling বোলে ভুলেও সম্বোধন করেন না, কিম্বা কারো christian নাম ধোরে ডাকেন না, পরস্পর পরস্পরকে

Mr. B—ও Mrs B—বোলে ডাকেন। আমার সঙ্গে Mrs B. হয়ত বেশ কথা বার্ত্তা কচ্চেন, এমন সময় Mr. B. এলেন, অমনি সমস্ত চুপচাপ। দুই পক্ষেই এই রকম। একদিন Mr. B. আমাকে Piano শোনাচ্চেন, এমন সময় Mr. B. এসে উপস্থিত হোলেন, বোল্লেন, "when are you going to stop?" Mrs. B. বোলেন "I thought you had gone out" পিয়ানো থাম্‌ল। তা'র পরে আমি যখনি পিয়ানো শুনতে চাইতেম, Mrs বোল্‌তেন, "that horrible man" যখন বাড়িতে না থাক্‌বেন তখন শোনাব, আমি ভারি অপ্রস্তুতে পোড়ে যেতুম। দুজনে এই রকম অমিল, অথচ সংসার বেশ চোলে যাচ্চে; Mrs B. রাঁধচেন, বাড়চেন, কাজকর্ম্ম কোর্‌চেন Mr. B রোজগার কোরে টাকা এনে দিচ্চেন, দুজনে কখন প্রকৃত ঝগড়া হয় না, কেবল কখন কখন দুই একবার দুই একটা কথা কাটাকাটি হোত, তা' এত মৃদুস্বরে যে, পাশের ঘরের লোকের কান পর্য্যন্ত পৌঁছোয় না। যা হোক্ আমি সে খানে দিন কতক থেকে বিব্রত হোয়ে সে অশান্তির মধ্যে থেকে চোলে এসে বেঁচেছি।

ছিন্ন মুকুল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মেঘে বিজলি।

ইহার কয়েক দিন পরে হিরণকুমার কনককে একখানি পত্র লিখিতেছিলেন। অনেক কষ্টে, পত্রখানি সাঙ্গ করিয়া অশ্রুজল মুছিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সে অশ্রু শুকাইল, মুখে নিরাশার দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ভাব প্রকটিত হইল। হিরণকুমার আবার কতকগুলি কাগজ পত্র লইয়া লিখিতে বসিলেন, বিষয় সম্পত্তির উইল করিয়া তাহা বাক্সে রাখিলেন; যাহাকে যাহাকে পত্র লিখিবার ছিল লিখিয়া সমস্ত পত্রগুলি ডাকে পাঠালেন। সঙ্গে যে সকল জিনিস পত্র ছিল, চাকরদের ডাকিয়া তাহা দিলেন, চাকরেরা তাহার কে কোনটি লইবে তর্ক-বিতর্ক আরম্ভ করিল, হিরণকুমার অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। খানিক বসিয়া বসিয়া শুইলেন; ক্রমে সন্ধ্যা হইল, হিরণকুমার উঠিলেন না, রাত্রি নয়টা বাজিল, হিরণকুমার উঠিলেন না, বেগতিক দেখিয়া একজন ভৃত্য আসিয়া আহারের খবর দিল। এতক্ষণ হিরণকুমার ঘুমাইতেছিলেন কি না জানিনা, কিন্তু ভৃত্যের কথায় মুখ উঠাইয়া একবার তাহার পানে চাহিলেন। তাঁহার সেই পাংশুবর্ণ যাতনা-ব্যঞ্জক মুখ, তাঁহার সেই ভয়ানক দৃঢ়

সঙ্কল্প-বিশিষ্ট অথচ অন্তিম কালের ন্যায় অসরল দৃষ্টি দেখিয়া ভৃত্য চমকিয়া উঠিল, আশ্চর্য্য হইয়া মৌনে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, হিরণকুমার আবার মুখ নত করিয়া শুইলেন। ভৃত্য আর একবার বলিল, 'আহার প্রস্তুত।'

হিরণকুমার কোন উত্তরই করিলেন না, মুখ তুলিয়া চাহিলেনও না। ভৃত্য আবার বলিল, "খাবার কি এখানে আন্‌ব ?" তখন হিরণকুমার বিরক্তভাবে বলিলেন, 'আমার ক্ষিদে নেই, আজ খা'ব না।' ভৃত্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল, আর কথা কহিতে সাহস করিল না।

হিরণকুমার বিছানা হইতে উঠিলেন, উঠিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে চৌকিতে বসিয়া দীপালোকে আবার কয়েকখানি পত্র লিখিতে লাগিলেন, মনে পড়িল, তাঁহার আরো দুই এক খানি পত্র লেখা আবশ্যক। এই সময় একজন ভৃত্য আসিয়া একটি পিস্তল দেখাইয়া বলিল,

'এইটি আপনি একদিন সাবধানে রাখতে বলেছিলেন, আস্‌বার সময় সঙ্গে এনেছিলেম, এটা কি করব ?'

ভৃত্য এই বলিয়া পিস্তলটি টেবিলে রাখিল। হিরণের মনে পড়িল, এক দিন একজন চোরের নিকট হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন ; এবং সেই পিস্তল পুলিসে দেখাইয়া চোরের সন্ধান করিবার অভিপ্রায়ে তাহা সাবধানে রাখিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ও অন্যান্য নানা ঘটনায়, এতদিন পর্য্যন্ত ওকথা আর মনে হয় নাই। হিরণ অজ্ঞাত ভাবে পিস্তলটি হস্তে উঠাইয়া লইলেন, এদিক ওদিক করিয়া দেখিতে লাগিলেন ; ভাবিলেন, ইহার একটি গুলিতেই তো আজ তাঁহার সমস্ত যাতনাই দূর হইতে পারে। সেই অসম্বরণীয় দেখিয়া ত্রস্তে তাহা আবার টেবিলে রাখিলেন। কিন্তু মনে হইল তাঁহার ভয় বৃথা, উহাতে গুলি নাই। ভাবিতে ভাবিতে আবার তাহা হস্তে লইলেন, সর্প যেমন ভূতিকের বংশী-ধ্বনি হইতে ফিরিতে অক্ষম, হিরণকুমার তেমনি সেই পিস্তল হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম হইলেন। এই সময় এক জন অপরিচিত লোকের সহিত একটি ভৃত্য এই গৃহে আসিয়া হিরণকে বলিল,

'কদিন হ'তে এই লোকটি চাকরীর উমেদারীতে আস্‌ছে আমাদেরও তো কিছুদিন হ'তে আর একজন চাকরের আবশ্যক হয়েছে, এ'কে কি রাখবেন ?'

হিরণকুমার এ কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তিনি তখন পিস্তল দেখিতে ব্যস্ত ছিলেন, দেখিতে দেখিতে পিস্তলের এক প্রান্তে মুদ্রাঙ্কণ অক্ষর দেখিলেন, পড়িয়া তাঁহার মুখ বিস্ময়-পূর্ণ হইল ; দেখিলেন ইংরাজি অক্ষরে লেখা 'যামিনী-নাথ রায়।' তিনি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, 'চোরের নিকট পিস্তল কাড়িয়া লইয়াছিলাম, ইহাতে যামিনী বাবুর নাম !' নবাগত উমেদার উত্তর-অপেক্ষায় সেই-খানে দাঁড়াইয়া ঐ সকল দেখিতে

ছিল। হিরণের বিস্ময়-প্রসূত কথাটি শুনিয়া সে আস্তে আস্তে হিরণের একটু কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; পিস্তলটি বিশেষ লক্ষ্যের সহিত দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "এতে যামিনী বাবুর নাম? আমাকে একবার দেখতে দেবেন?'

ইহাতে হিরণ কিছু বিস্মিত হইলেন, যামিনীকে তিনি যেরূপ মন্দ লোক বলিয়া জানিতেন তাহাতে এই কথায় তাঁহার মন সন্দিগ্ধ হইল; তিনি উমেদারের হস্তে পিস্তলটি দিয়া বলিলেন, "তোমার কথায় বোধ হইতেছে যে ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে?'

পিস্তলটি লইয়া সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বিশেষ রূপে দেখিতে লাগিল, সেই মুদ্রাঙ্কণ অক্ষর গুলি দেখিল, তাহার মুখ চক্ষু আরক্তিম হইল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "এ পিস্তল আমি চিনি, বাস্তবিকই এ যামিনী বাবুর পিস্তল।' হিরণ তাহার ভাবে, তাহার কথায় অবাক হইলেন; বলিলেন, "এ পিস্তল তবে চোরের হাতে পাইলাম কি করিয়া?'

ভৃ। "চোর! না সে চোর না—' বলিয়াই সে থামিল, কি একটি কথা বলিতে যেন সে ভয় পাইতেছিল। শেষে যখন তাহার কথায় অন্য সকল ভৃত্যকে প্রস্থান করিতে আদেশ করিয়া হিরণ শপথ করিলেন যে বলিলে কোন হানি হইবে না, তখন সে বলিল,

"মহাশয়, সে চোর না, যামিনী বাবুর একজন চাকর—'

হি। যামিনীর চাকর! সেকি পিস্তল চুরি করিয়াছিল?

ভৃ। "না, যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদ বাবুকে মারতে গিয়েছিল—

"যামিনী বাবুর হুকুমে প্রমোদকে মারিতে গিয়াছিল!' সহসা হিরণকুমারের মলিন-বিষাদ-গম্ভীর—মুখকান্তি জ্যোতিষ্মান হইল, তাঁহার নিকটে যেন একটি রুদ্ধ-দ্বার খুলিয়াগেল। তিনি কনকের কাছে শুনিয়াছিলেন প্রমোদের বিশ্বাস, হিরণ তাহাকে হত্যা করিতে গিয়াছিলেন, আজ সহসা তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন। হিরণ যামিনীকে মন্দ লোক বলিয়া জানিতেন; জানিতেন সে নীরজাকে বিবাহের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীর নিকট প্রমোদকে দোষী সাব্যস্ত করিতে গিয়াছিল। তাহার পর সেই যামিনীকেই প্রমোদ কনককে দিবার জন্য ব্যস্ত, যামিনীকেই বিবাহ করিতে চাহে নাই বলিয়া প্রমোদ কনকের উপর অসন্তুষ্ট;—তাহাও হিরণ শুনিয়াছিলেন। ভৃত্যের কথায় এখন তাঁহার মনে হইল নীরজাকে পাইবার জন্য যামিনী যে প্রমোদকে মারিতে যাইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? পরে আপন দোষ হিরণের উপর অর্পণ করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। হিরণ ভাবিলেন, যদি যথার্থই যামিনী দোষী হয় এবং তিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রমোদের ভ্রম ঘুচিতে পারে, হিরণ আবার সুখী হইতে পারেন; হিরণকুমার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"যামিনী প্রমোদকে মারিতে পাঠান কেন ?'

ভৃত্য। 'যদিও তা' তিনি আমাকে বলেন নাই, কিন্তু আমি তা' বলতে পারি।'

ছি। "কি ?'

ভৃত্য। "প্রমোদ-বাবুর সহিত নীরজার পাছে বিবাহ হয়, বোধ হয়, সেই ভয়ে—

ছি। "তিনিই যে মারিতে পাঠাইয়াছিলেন ইহা তুমি কি করিয়া জানিলে ?

ভৃত্য। "আমাকেই প্রথমে মারতে বলেন, কিন্তু আমি নারাজ হই। শেষে অন্য এক চাকর টাকার লোভে রাজি হয়েছিল।'

হিরণ। "রাজি হইয়াছিল কি করিয়া জানিলে" উত্তর দিতে ভৃত্য ভীত হইল; যাহা বলিবে তাহাতে তাহার আত্মীয় এক ব্যক্তির কোন হানি হইবে না—এই শপথ করাইয়া শেষে বলিল,

"যামিনী বাবুর চাকরের সঙ্গে আমার একজন বন্ধুও ঐ কাজের ভিতর ছিল, তার কাছে আমি সব শুনেছি।'

ছি। "মকদ্দমা হইলে তুমি যামিনীর দোষ সকল বলিতে স্বীকৃত আছ ? তাহার দোষ প্রমাণ করিতে পারিবে ?'

ভৃত্য সহর্ষে বলিল, "তা' আর পারব না ? যে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তার বিপক্ষে সাক্ষী দিয়ে শোধ তুলব না ? কিন্তু আমার বন্ধুর জন্যে ভয় হয়।

ছি। "না, না, তার কোন ভয় নাই—তার সাক্ষাই বিশেষ দরকারী। তুমি কেবল তার কাছে শুনেছ কই তো নয় ? তোমার বন্ধু যদি সব খুলেবলে তো তাকে মহারাণীর সাক্ষী (Queen's evidence) দাঁড় করিয়ে খালাস দেওয়ান যেতে পারে। তুমি যে প্রতিশোধের কথা বলছ—কেন যামিনী তোমার কি করেছে ?'

ভৃ। "কি করেছেন ? তাঁর জন্যই তো স্ত্রী পুত্র পরিবার ফেলে এই বিদেশে পালিয়ে আসতে হয়েছে। নিমকহারামের জন্য আমি কি পাপই না করেছি! যামিনী-বাবু যখন লোক দিয়ে নীরজাকে চুরি করিয়ে আবার ফন্দি করে নিজেকেই সাধু দাঁড় করাবার মতলব করেন, তখন আমিই তো দাঁড়ি সেজে সব ঠিক্ ঠাক্ করি। প্রমোদ বাবু যেদিন কানপুরের বনে নীরজার সঙ্গে দেখা করতে যান, সে দিন আমিই তো তাঁর পিছনে লুকিয়ে গিয়ে জেনে আসি যে সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে যাবেন, তাতেই তো পরের দিন চুরি হয়। তাঁর জন্য আমি কি না পাপ করেছি শেষে খুন করতে না পারায় তিনি আমার এই শাস্তি করলেন!'

বলিতে বলিতে তাহার প্রতিহিংসা স্পৃহা জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ তাহাকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,

"যামিনী বাবু তোমার কি শাস্তি করিয়াছেন তাহা তো বলিলে না।'

ভৃ। "মিথ্যা চুরির দাবিতে আমাকে দোষী করে কয়েদ করবার চেষ্টা

করছিলেন; সেই ভয়ে আমার এখানে পালিয়ে আসতে হয়েছে।'

ভৃত্যের কথায় হিরণের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল, তাঁহার সহসা নূতন আশার সঞ্চার হইল, তাঁহার হৃদয়ের দৃঢ়-সংকল্প যেন শিথিল হইল। তিনি সেই পিস্তল হস্তে লইয়া উঠিলেন, উমেদারি ভৃত্যকে বলিলেন, "যদি প্রতিশোধ দিতে হয় তো আমার সঙ্গে এস।'

বলিয়াই অমনি দ্রুতপদে বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; উমেদারও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। হিরণকুমার একেবারে রেল গাড়ীর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এতদূর আসিয়া তাঁহার যেন চমক ভাঙ্গিল, দেখিলেন তাহার সঙ্গে টাকা কিছুই নাই, কি করিয়া তবে আজই কলিকাতায় যাইবেন? তিনি মাথা ধরিয়া দাঁড়াইলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিদ্বন্দ্বী।

দেখিতে দেখিতে কলিকাতার রেল গাড়িও ছাড়িয়া দিল, তখন হিরণকুমার হতাশচিত্তে সেই প্লাট-ফর্ম্মে এপাশ ওপাশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সহসা কাহাকে কাছ দিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি চমকিত হইলেন? দেখিলেন, তিনি যে জন্য কলিকাতায় যাইতেছিলেন, সেই যামিনীবাবুই আজ এলাহাবাদে আসিয়াছেন। হিরণকুমার বিস্মিত ও আহ্লাদিত চিত্তে গমনশীল যামিনী বাবুর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভৃত্য যামিনী বাবুকে দেখিয়া কিছু দূরে সরিয়া গেল, হিরণকে দেখিয়া যামিনীও দাঁড়াইলেন। হিরণ বলিলেন,

'মহাশয়, আমি যে আপনার জন্য কলিকাতায় যাইতেছিলাম।'

যামিনী কিছু বিস্মিত ভাবে বলিলেন 'আমার জন্য? কেন আমার এত সৌভাগ্য কি নিমিত্ত?'

হিরণকুমার পিস্তল দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাকে ধন্যবাদ দিন, ইহার অনুগ্রহে।'

যামিনী অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আপনি কি বলিতেছেন?

হিরণ আবার পিস্তলটী দেখাইয়া বলিলেন, "চিনিতে পারেন কি? ইহা কাহার?'

যামিনী ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মহাশয়, রাস্তায় আপনি অপমান করিবেন না, নিকটেই প্রহরী আছে।

ছি। "যেদিন প্রমোদকে হত্যা করিবার আগে পিস্তলটি দিয়াছিলেন, সেদিন প্রহরীর ভয় হয় নাই?"

যামিনী চমকিয়া উঠিলেন, এতক্ষণে পিস্তলের অর্থ বুঝিলেন; কিন্তু যামিনী নিশ্চয় জানিতেন যে তাঁহার নামাঙ্কিত পিস্তল তিনি কখনই দেন নাই, সেই জন্য মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া বলিলেন "হিরণবাবু, আর সহ্য হয় না, তুমি নিতান্ত নরাধম, ভদ্র লোকের সহিত কথা কহিবারও অযোগ্য।"

হিরণ তাহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, "মহাশয় আপনি যে ভদ্র বলিয়া পরিচিত হইবারও অযোগ্য, দেখুন দেখি, পিস্তলে কাহার নাম।" হিরণকুমার তাঁহার কাছে পিস্তলটি ধরিলেন, নামটি পড়িয়া যামিনীর মুখের ভাব সহসা যেন পরিবর্ত্তিত হইল; দেখিলেন মনের ব্যগ্রতা বশতঃ বাস্তবিকই তাড়াতাড়িতে না দেখিয়া আপন নামাঙ্কিত পিস্তল দিয়াছিলেন; তাঁহার মস্তকে বজ্র পড়িল, সহসা যেন বাক্‌শক্তি-হীন হইলেন, তিনি অজ্ঞাতভাবে পিস্তল কাড়িয়া লইতে পিস্তলে হস্তার্পণ করিলেন, হিরণ ত্রস্তে তাহা সরাইয়া লইলেন, অমনি তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে যামিনী আত্মস্থ হইয়া বুঝিলেন এইস্থলে পিস্তল কাড়িতে গেলে যথার্থ দোষী বলিয়া প্রমাণ হইবেন অথচ কৃত কার্য্য হইবারও বড় সম্ভাবনা নাই। তিনি হৃদয়ের ভাব লুকাইয়া সরোষে বলিলেন, "একি, কি আশ্চর্য্য! এ চুরির পিস্তল আপনি পাইলেন কোথা?"

তাহার অতিরিক্ত সাহস দেখিয়া হিরণও একটু হাসিয়া বলিলেন, "চুরির জিনিস? সে সকল প্রমাণে যাহা হয় হইবে?"

যামিনী। "কি প্রমাণ? আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা তো প্রমাণ সাপেক্ষ, কিন্তু আপনার হস্তে চুরির জিনিস, আমি এখনি আপনাকে চোর বলিয়া ধরিব।"

হি। "প্রমাণ সাপেক্ষ বটে কিন্তু প্রমাণের অভাব নাই, আপনার আগেকার চাকর রামধন দাসকে মনে আছে কি? সে বর্ত্তমান।" হিরণ সেই ভৃত্যের জন্য একবার এদিক্ ওদিক চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু তখন আর তাহাকে নিকটে দেখিলেন না। কোথা হইতে প্রকাশ হইয়াছে যামিনী তখন সকল বুঝিলেন, দেখিলেন ইহার আশু উপায় না করিতে পারিলে তাঁহার সর্ব্বনাশ। যামিনী বলিলেন,

"যাকে চোর বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি, সে কিনা বলিতে পারে? কিন্তু তাহার মিথ্যা অপবাদে আমার কিছুই হইবে না, সেজন্য আমি কিছুমাত্র ভীত নহি।"

হি। "হাঁ তা ভীত হইবেন কেন? শুধু এ খুনের কথাতো নয় নীরজার হরণ বৃত্তান্তও প্রকাশ হইয়াছে" হিরণ আপন মনে বলিয়া উঠিলেন এসকল কথা আমার প্রমোদকে এখনি লেখা উচিত, বাটী গিয়াই লিখিব, যামিনী বুঝিলেন তবে এখনো প্রমোদ কিছুই শোনেন নাই, সঙ্কল্প করিলেন তবে আর কখনোই শুনিবেন না। যামিনী বলিলেন, "যদি নিতান্তই আপন মন্দ করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমার নামে মিথ্যা দোষ আনিবেন।"

বলিয়া ব্যগ্রচিত্তে ঐ বিপদ হইতে আশু রক্ষা পাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। যামিনী প্রমোদের নিকট এলাহাবাদে আসিয়া ছিলেন, কিন্তু আজ

আর দেখানে না গিয়া অন্যত্রে গমন করিলেন, যামিনীকে যাইতে দেখিয়া হিরণও বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। এই সময় উমেদার-ভৃত্য তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিল ?

"যামিনীবাবুকে আমার দেখা দেবার ইচ্ছা ছিল না, তাই দূরে ছিলেম। উঁহাকে বড় ভয় করে, আমি এখানে আছি জানলে, কি জানি চোর বলে পুলিসে যদি ধরিয়ে দেন। কিন্তু আপনার সঙ্গে কলিকাতায় গিয়ে আদালতে আমি নিশ্চয়ই সাক্ষী দেব তাতে সন্দেহ করবেন না।"

হিরণ। "আমি পরশু কলিকাতায় যাইব।'

ভৃ। তবে আমিও সেইদিন আসব, আজ মাসীর বাড়ী চল্লেম। শীঘ্র কলিকাতায় যাব শুনলে এ দুদিন আর মাসী আসতে দেবেন না।" এই বলিয়া ভৃত্য চলিয়াগেল। হিরণও বাড়ী গিয়া তখনি প্রমোদকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ভাবিলেন; কাল প্রমোদের উত্তর পাইয়া পরশু কলিকাতায় যাইবেন।

ভৃত্য পত্র হস্তে প্রমোদের বাটী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে, এলাহাবাদের প্রশস্ত পথ জনশূন্য বলিলেই হয়, কদাচিৎ দুটি একটি লোক চলিতেছে কি না দেখা যায় না, মাঝে মাঝে দুটি একটি মুক্ত-দোকানে মাত্র মনুষ্য জীবনের ব্যস্ততা এখনো উপলব্ধি হইতেছে, তাহা ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর নিষ্কৃতি পাইয়া কোন দোকানি দিব্য আরামে দেয়াল ঠেশ দিয়া তামাক টানিতেছিল, কেহ বা কোন খরিদদারের সহিত এখনো দাম চুক্তি করিতেছিল, কেহ বা দৈনিক লাভের তালিকায় দ্বিগুণ লাভ দেখিয়া মনের স্ফূর্তিতে কল্পনার সপ্তম-স্বর্গে উঠিতে উঠিতে বাদশাহের কন্যাকে বিবাহের আশা করিতেছিল। যাহা হউক প্রায় দোকানদারেরাই সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর কোন না কোন আমোদে নিযুক্ত। একটি দোকানে পাশা চলিতেছিল, ভৃত্যটি পাশা খেলার বিশেষ অনুরাগী, সে লোভ শামলাইতে না পারিয়া খেলা দেখিতে পত্র হস্তে সেই দোকানটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনি রাস্তার একদিক হইতে অপর একজন সেখানে আসিয়া হিন্দুস্থানীতে বলিল, "অঃ চাকরি করা কি অধর্ম্মের ভোগ, সমস্ত দিনেও তো একে একটু অবকাশ নেই, তাতে আবার একটু ত্রুটি হলেই সর্ব্বনাশ।" চাকরীর কথায় ভৃত্যের চিঠির কথা মনে পড়িল, খেলা হইতে চোখ উঠাইয়া নবাগতের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছ, দেখ দশটা বেজে গেছে এখনো আমার ছুটি নেই; এই দেখ চিটী নিয়ে চলেছি।'

নবাগত বলিল, "তুমিও চিঠি নিয়ে যাচ্ছ ? আমিও এইমাত্র চিঠি দিয়েই আসছি, বলব কি দুঃখের কথা, বাবুর জরুরী চিঠি, না দিলে আমার মাথা

থাকতো না, আবার এদিকে প্রমোদ-বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, কত কষ্টে যে দরজা খুলিয়ে দিয়ে এসেছি তা ভগবানই জানেন,' ভৃত্য বলিল, "সে কি কথা! আমিও যে প্রমোদ বাবুকে জরুরি চিঠি দিতে যাচ্ছি, যদি দরজা বন্ধ হয়ে থাকে তো কি হবে? তুমি কি ক'রে দিলে?"

সে ব্যক্তি বলিল, "ফটকের বাইরে যে দরোয়ান থাকে, সে আমার বন্ধু তা'কে বিশেষ করে ধরায় দরজা খুলে সেই চিঠি খানি একজন চাকরের হাতে দিলে তাই রক্ষে।'

ছিন্নের ভৃত্য বলিল, "তবে, কি আজ অন্য কারো চিঠি সে দরোয়ান প্রমোদ বাবুকে দিবে না?'

অপরিচিত বলিল,"না, তা দেবে না" এই কথায় ভৃত্য ভাবিয়া বলিল, "তবে কি করব, তবে কি ফিরেই যাব? কিন্তু বাবু বলেছেন, খুব জরুরি চিঠি—এক বার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়ে দেখেই আসি।

সে ব্যক্তি বলিল "সে যাওয়া মিছে, আমি তো এই আসছি। দশটার সময় তাঁদের দরজা বন্ধ হয়।"

ভৃত্য বলিল, "তবে আজ যাই, কাল আসব।' অপরিচিত বলিল,"একি বিশেষ দরকারী চিঠি? আজ কি না দিলেই নয়?'

ভৃ। "বাবু তো বলেছেন খুব দরকারী।" সে ব্যক্তি বলিল, "আহা! তবে অমনি ফিরে যাবে, তাতে তো তোমার মনিব রাগ করবেন?"

ভৃ। "তা এতে আমার কি দোষ? সে ব্যক্তি একটু দুঃখের স্বরে বলিল, "মনিবরা তা বুঝলে আর কি ভাবনা থাকত? তা, তাঁরা অত বুঝে দেখেন না। যত দোষ আমাদের গরীবদের উপর। এই আজ যদি আমি অত কষ্ট করে এই চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে না নিয়ে আসতেম, মনিব তাহলে নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করতেন।'

ভৃ। "তাকি রাগ করবেন? কিন্তু আমি কি করব বল? আমার তো আর তোমার মত সেখানে কেউ বন্ধু নেই।"

তাহার কথায় সে ব্যক্তির বড়ই সহানুভূতি হইল, সে বলিল?

"ভাই, তা তো বুঝছি। আহা! অমনি ফিরে যাবে, তোমার মনিব কতই রাগ করবেন। দাও তবে আমিই নিয়ে যাই, আর একবার বন্ধুটিকে বলে কয়ে চিঠি খানি প্রমোদ বাবুকে দিয়ে আসি।'

তাহার দয়া দেখিয়া ভৃত্য বড়ই আপ্যায়িত হইল, বড়ই আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "তা আমার জন্য আবার তুমি সেখানে যাবে? বন্ধু কি আবার তোমার কথা রাখবে?'

অপরিচিত। "আহা! তোমার মনিব কত তোমাকে বকবেন, তোমার কত কষ্ট হবে, সে জন্য আর আমি এই-টুক যেতে পারিনে? তুমিও চাকর, আমিও চাকর, আমরা একজন অন্য জনের জন্য এই টুক কষ্ট করব না? একটু বিশেষ ক'রে ধরলেই বন্ধু আমার কথা রাখবে এখন।'

তখন ভৃত্য আহ্লাদে চিঠিখানি

তাহার হস্তে দিল, তাহাকে তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। চিঠি লইয়া যে কাহারো কোন কাজে লাগিতে পারে ইহা সে বেচারীর বুদ্ধির অতীত। পত্র লইয়া অপরিচিত প্রমোদের বাড়ী অভিমুখে গমন করিল, দেখিয়া ভৃত্য ও বাড়ী ফিরিয়া আসিল। আসিয়া হিরণকে বলিল,

'প্রমোদ বাবুর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কত করে চিঠি খানি দিয়ে এসেছি।'

হি। "উত্তর কোথায় ?"

ভৃ। বাবুর সঙ্গে তো আমার "আর দেখা হয় নি, আমি বাবুর দরওয়ানের হাতে চিঠি দিয়েই চোলে এসেছি।"

পত্র খানি আজই প্রমোদ পাইয়াছেন জানিয়া হিরণ নিশ্চিন্ত হইলেন।

কিন্তু পত্র খানি কাহার হস্তগত হইল, তাহা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিত্যক্তা।

প্রমোদ আর কনককে তেমন ভাল বাসেন না, তাহার সহিত তেমন কথা কহেন না। স্বামী কনকের প্রতি অসন্তুষ্ট, নীরজাও আর কনককে দেখিতে পারেন না। কনক প্রমোদের কথা শুনিল না, কনক প্রমোদের বন্ধুকে বিবাহ-করিতে অসম্মত হইল, তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা জানিয়াও বিবাহে অসম্মত হইল, আবার শেষে কিনা প্রমোদের শত্রু হিরণকে বিবাহ করিতে চাহিল, কি আশ্চর্য্য! ভ্রাতার শত্রুকে যেকালে বিবাহ করিতে চাহিল, সেকালে কনকও শত্রু হইল বই আর কি? বাবা! এমন মেয়ে নীরজা আর কখনো দেখেন নাই; কি বুকের পাটা! অমন ভায়ের কাছে কেমন ক'রে ওসব কথা বোলে! নীরজা আর কনকের কাছে বসে না, কনকের সহিত কথা কহে না, দেখা হইলে মুখ ভার করিয়া চলিয়া যায়, কনক কথা কহিতে গেলে নীরজা মুখ ফিরাইয়া অর্দ্ধ উত্তর দিয়া কাজে যায়। একদিন নীরজার মুখ খানি একটু শুষ্ক দেখিয়া কনক সাহসে ভর করিয়া বলিল, 'নীরজা কেন ভাই তোর মুখ খানি অত শুকনো? কিছু অসুখ করেছে?'

নী। 'কি আর অসুখ করবে?'

ক। 'তবে তোমার মুখ অত শুকনো কেন?'

নী। 'আমার ঐ রকমই মুখ।'

ক। 'আমি কি, ভাই, তোমার মুখ আর কখন দেখি নি?'

নী। 'আমার মুখ আর কেন তুমি দেখবে? তোমার দাদার মুখই বা কেন তুমি দেখবে? তোমার হিরণের মুখ দেখগে।'

কনক কষ্টে লজ্জায় অপমানে নিরুত্তর হইয়া রহিল। সেই দিন নীরজার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন,

'নীরজা—আমার মনটা একে খারাপ হয়ে গেছে তা'তে তোমার ওরূপ বিষণ্ণমুখ দেখলে যে, ভাই, বুক ফেটে যায়। চল, দিন কতকের জন্য তোমার সহিত কোথাও বেড়াইয়া আসি, এখানে থাকলে দেখছি আমাদের এ বিষণ্ণতা ঘুচবে না।'

শুনিয়া নীরজার আহ্লাদ ধরিল না. কতদিন সে তাহার বাসস্থান অরণ্যটি দেখে নাই, সে ব্যগ্রভাবে বোটে করিয়া কানপুর যাইবার প্রস্তাব করিল। প্রমোদ তাহাতে আহ্লাদিত চিত্তে সম্মত হইলেন। ক্রমে তিন চারি দিনেই বেড়াইতে যাইবার সমস্ত উদ্যোগ হইয়া গেল।

সকলি প্রস্তুত। দ্রব্য সামগ্রী যা কিছু বোটে উঠিতে বাকী ছিল সকলি উঠিল, দাস দাসীর কোলাহল আরম্ভ হইল, আজ তাঁহাদের বোটে যাইবার দিন। কনককে একাকী ফেলিয়া আজ তাঁহারা বোটে যাইবেন। অন্য সময় হইলে তিন জনেই যাইতেন এখন কনক তাঁহাদের চক্ষুঃশূল, তা'কে লইয়া যাইবেন কি করিয়া? তা'কে একাকী কষ্ট ভোগ করিবার জন্য রাখিয়া তাঁহারা দুই জনেই বেড়াইতে চলিলেন।

কনক সেই সকাল হইতে একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বোটে জিনিসপত্র ওঠান দেখিতেছিল এবং কাঁদিতেছিল। যে ভ্রাতার জন্য আপনার জন্মের সুখ বিসর্জ্জন করিল, আপনা হইতে আপনার হৃদয়-সর্ব্বস্ব হরিণকে পর্য্যন্ত আজীবন কষ্টে ফেলিল, যে ভ্রাতার কষ্ট হইবে বলিয়া সে হরিণকে বিবাহ করিতেও অসম্মত হইল, সেই ভ্রাতার আচরণে কাঁদিবে না?

নীরজা আজ আহ্লাদে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ, তাঁহারা কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, আবার নীরজা সেই বাল্য কালের অরণ্যটি দেখিতে পাইবে; যেখানে প্রমোদকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই খানে আবার একত্রে বেড়াইতে পারিবে, যদি সন্ন্যাসী সেখানে থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহার সহিত দেখা হইবে, এই সকল আশায় নীরজার তো আনন্দের সীমা নাই, তাহার পর আবার তাঁহার জন্যই এ সকল হইতেছে, নীরজার আহ্লাদ দেখে কে? তাঁহার উল্লাস-পূর্ণ ঈষৎ-গর্ব্ব-ময় চলন ফেরন, তাঁহার ওষ্ঠাধরের বিকসিত-ভাব তাঁহার চঞ্চল-চক্ষুর কটাক্ষ-আস্ফালন, সকলেই তাঁহার উল্লাস-ভাবের সাক্ষী প্রদান করিতেছে।

বেলা দ্বিপ্রহরে, নীরজা বোটে উঠিতে যাইবার সময় সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আপন হস্তের পানের ডিবে দাসীকে দিয়া বলিল,

'যাদি, কনক, কি করছে রে'?

বোধ হয় কনককে ঐরূপ অবস্থায় একাকী রাখিয়া যাইতে নীরজার এক একবার মন কেমন করিতেছিল। নীরজা হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত খুঁজিয়া দেখিলে হয়তো দেখিতে পাইত যে সে এখনো কনককে একটু একটু ভালবাসে, নহিলে

একটু একটু অমন কষ্ট হইবে কেন? নীরজার এক একবার মনে হইতে লাগিল, আহা কনক যদি আগেকার মতই থাকিত, না বলিয়া যাইত তো বেশ হইত। নীরজার কথায় দাসী বলিল, "দিদিঠাকরুণ বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে জিনিসপত্র তোলা দেখছেন, আহা বৌঠাকরুণ তাঁকে সঙ্গে নিলে না কেন গা? আহা তাঁর মুখটি শুকিয়ে গেছে," শুনিয়া নীরজার একটু মমতা হইল। দাসী আবার বলিল, 'দেখ বৌঠাকরুণ, দিদিঠাকরুণ দিনকে দিন শুকিয়ে যাচ্চেন, তাই পাড়ার অনেকে অনেক বলে।'

নী। 'কি বলে?'

দাসী। 'বলে, ওমা অমন লক্ষ্মী বোনটি, যেমন রূপে তেমনি গুণে, মুখে যেন কথা নেই, তা ভাইটা বুঝি কষ্ট দেয় নইলে অমন শুকিয়ে যাচ্চে কেন? ভাইটা ছেলেবেলা হতে বড় দুরন্ত।'

শুনিয়া নীরজা জ্বলিয়া গেল। কনকের জন্য প্রমোদের এত জ্বালা, আবার তার উপর এই অপবাদ! কনক পোড়ারমুখী কি প্রমোদকে কষ্ট দিতেই জন্মিয়াছিল? কনকের জন্য স্বামীর অপবাদ শুনিয়া তাহার উপর নীরজার যে মমতাটুকুও হইয়াছিল তাহাও রহিল না, সে ক্রুদ্ধ হইয়া ভাবিল, বোটে গিয়াই ঐ কথা আগে স্বামীকে বলিয়া উহার একটা প্রতীকার বিধান করিবে।

ক্রমে ক্রমে তাঁহারা বোটে উঠিতে লাগিলেন, কনক দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। বোট ছাড়িয়া দিল, তাঁহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, কনক ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ছিন্নতন্ত্রী।

ক্রমে অপরাহ্ণ কাল উপস্থিত হইল। অল্প অল্প মেঘ করায়, বিকালেই সন্ধ্যা সন্ধ্যা বোধ হইতেছে। বাতাস বড় না থাকাতে নদী এখন প্রশান্ত, নিস্তব্ধ, তাহাতে তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস নাই। নিঃশব্দে জাহ্নবী নদী মুমূর্ষু ব্যক্তির জীবনাশার ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। সেই নদীর ধারে একটি বারাণ্ডায় বসিয়া কনক একখানি পত্র পড়িতেছিল। পত্রখানি ছিন্নের। কিছু পূর্ব্বে পত্রখানি কনক পাইয়াছে। কনকের মুখখানি কি মলিন, কি বিষণ্ণ, কি ভয়ানক যাতনাপীড়িত! দৃষ্টি যাতনাব্যঞ্জক, অথচ শূন্যময়, যেন কি দেখিতেছে কি পড়িতেছে সে কিছুই জানে না, কেবল যাহা পড়িতেছে তাহাতে একটি অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছে মাত্র। কনক চিঠিখানি দুই একবার মনে মনে পড়িল তাহাতে যেন ভাল করিয়া বুঝিতে না পারিয়া, আর একবার পড়িতে আরম্ভ করিল, পড়িল,

'কনক, সরলে, আমার কনক—

কিন্তু এ জীবনে আর তাহা হইল না, তবুও একবার তবুও এই শেষবার, তোমাকে আমার বলিয়া চিরজীবনের অতৃপ্ত সাধ মিটাইব। কনক, আমার হৃদয়ের কনক, সরলে, কোন সম্বো-

ধনেই আমার আশা মিটিতেছে না, পৃথিবীতে আমার ভালবাসার মত কোন সম্বোধনই খুঁজিয়া পাই না, আমার সর্ব্বস্বধন, আমি চলিলাম।

"হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্বোধন করিয়া গেলাম, তুমি কি আমার স্পর্দ্ধার দোষ লইবে? সরলে, অভাগা দুর্ভাগা দীন অসুখী বলিয়া, অপরাধীর মুক্ত কণ্ঠের এই শেষ উচ্ছ্বাসে দোষ লইও না। কনক, আমি তো মর্ম্মের নিভৃত বিজনে শত শতবার দিনে নিশীথে এইরূপ সম্বোধন করি, আজ মুক্তকণ্ঠে তোমাকে তাহা বলিলাম বলিয়া কি তুমি দোষ লইবে? আমার এই শেষ বিদায় বলিয়াও কি আমাকে ক্ষমা করিবে না? কনক তুমি মমতাময়ী, তুমি দেবী, তুমি এই অপরাধ কখনই লইবে না। অভাগার এই শেষ চিহ্ন বলিয়াও অন্তত মার্জ্জনা করিও। মুখে তোমাকে কখন সাহস করিয়া আমার বলিতে পারি নাই, পত্রে আজ জনমের মত সে সাধ মিটাইলাম, কনক ক্ষমা করিও। সরলে আমি ইহার মধ্যে এক দিন তোমার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ কামনায় গিয়াছিলাম, আমি যে তাঁহার শত্রু নহি, তাহা বলিবার অভিপ্রায়ে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমার সাক্ষাৎ-প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন, আমার সহিত তাঁহার আর দেখা হইল না, সুতরাং তোমাকে পাইবার আমার যে বিন্দুমাত্রও আশা ছিল, তাহাও অবসান হইল। এখন আমি দৃঢ়সঙ্কল্প; আমি চলিলাম। সমস্তই ঠিক, কাল প্রাতঃকালেই এস্থান হইতে চলিয়া যাইব। আমি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম তাহার উত্তরের আশায় এ কয়েক দিন আমাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল, উত্তর পাইয়াছি কাল চলিয়া যাইব। এ কয়েক দিন ধরিয়া তোমাকে ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। যত চেষ্টা করি তোমার সেই প্রসন্নমূর্ত্তি তোমার সেই মমতাময়ীদেবীমূর্ত্তি আরো জ্বলন্তরূপে দেখিতে পাই, তোমাকে দেখিবার সাধ আরো বৃদ্ধি হয়। সরলে, আমি তোমাকে ভুলিতেও আর চেষ্টা করিব না— তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি আমার দেবতা, তোমাকে পাইলাম না বলিয়া তোমাকে ভুলিব? আমার কনককে ভুলিব? না, না, চিরজীবন কষ্টে কাটুক, হৃদয় চিরজীবন যাতনায় দহিতে থাকুক, তবুও কনক তোমাকে ভুলিব না, মনে মনে আজীবন তোমাকে পূজা করিয়াই কাটাইব, ঐ মধুর প্রতিমা খানিই ধ্যান করিয়া জীবন কাটাইব।

সরলে! আমি যেদিন হইতে তোমাকে দেখিয়াছি সেই দিন হইতে এ হৃদয় তোমাতেই পূর্ণ, সেই দিন হইতে পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কেমন করিয়া সেই হৃদয়াঙ্কিত কনককে আজ আমি ভুলিব? এক দিন আশা ছিল তোমাকে পাইয়া সুখী হইব, সে আশা আর নাই, তবে

আর কি আশে আমি থাকিব, আমি চলিলাম, ঐ প্রতিমা খানি পূজিয়া পূজিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে চলিলাম। সরলে, অভাগা ছিরণের একমাত্র এই বারণ — একমাত্র এই প্রার্থনা,—তুমি সুখে থাক।"

কনক অভাগী—কনকের কেহই নাই কনক চির-দুঃখিনী। ভ্রাতার জন্য কনক চিরসুখ ত্যাগ করিল, ভাই তবুত কনককে ভাল বাসিল না। প্রাণের ছিরণ, হৃদয়-সর্ব্বস্ব ছিরণ, সেও আর কনককে ভাল বাসে না, নহিলে কেমন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া ছিরণ চলিয়া যাইতেছেন, কনককে এই ঘোর যাতনা-সমুদ্রে ভাসাইয়া কেমন করিয়া ছিরণ দেশত্যাগ করিবার কথা মনে আনিলেন? দেশে থাকিলে তবু কালে তাহাদের মিলন হইবার আশা থাকিত, তাহার ভ্রাতার কি ভ্রম আর কখনই ঘুচিত না? ভ্রাতার ভ্রম ঘুচুক আর নাই ঘুচুক সেই দূরকল্পিত আশাতেই কি তাহাদের কিছু সান্ত্বনা হইত না? ছিরণ কনককে তেমন ভাল বাসেন না, তাই তিনি কনককে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন, কনক তো এরূপ অবস্থায় তাহা পারিত না। যতই কষ্ট হৌক না কেন, ছিরণের সহিত এক দেশে আছে জানিতে পারিলেও কনক সুখী হইত। ছিরণই যখন তাহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন কনকের তখন আর বাঁচিয়া কি হইবে? কি আশে আর এই অসীম যাতনা সে সহ্য করিবে? সহসা এই সময় বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। সেই অল্প-অল্প মেঘরাশি গাঢ়তর হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল, বিকটগর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে গভীর ঝঞ্ঝনায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। কনক সেই নিবিড়-মেঘাচ্ছন্ন অবিশ্রান্ত-বৃষ্টি-বর্ষণ-শীল আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল। শূন্যময় দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া আপন মনে কাঁদিয়া উঠিল। আবার তখনি অশ্রু বারি মুছিয়া আপন মনে কি ভাবিতে লাগিল, কি যেন একটী কথা মনে আনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, সেই অন্ধকারময় আকাশ দেখিয়া কি একটি গান যে মনে আসিয়াও আসিতেছিল না—সহসা কনক গাহিয়া উঠিল—

আকাশের ঐ মেঘ এখনি তো ছুটিবে,
আবার জোছনা ভাতি এখনি তো ফুটিবে,
কিন্তু লো স্বজনি আর, হৃদয়ের এ আঁধার
এ জনমে অভাগীর কভু না ঘুচিবে।"

আবার সহসা বিকট গর্জ্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, কনকের দৃষ্টি ঝলসিয়া দূরে বজ্র গিয়া পড়িল। বালিকা কখনো উচ্চৈঃস্বরে গান গাহিত না, আজ অজ্ঞানের মত উচ্চৈঃস্বরে এই গানটি গাহিতে গাহিতে বজ্র ধরিবার আশায় ছুটিয়া বারাণ্ডা হইতে উঠিয়া গেল।

আজ ওরে বজ্র তোরে কখনো না ছাড়িব,
আটকি হৃদয়ে তোরে এ হৃদয় দহিব,
হৃদয়ে কি কাজ আর পুড়ে ছে'ক ছারখার
হৃদয় সর্ব্বস্ব ছেড়ে হৃদয় কেন রাখিব?'

উদ্যানে আসিয়া গাজাতীর দিয়া গাহিতে গাহিতে ছুটিয়াবাড়ীর সীমানা অতিক্রম করিল,

অনাথা উন্মাদিনী-বেশে সেই ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগে একাকিনী গান গাহিয়া গাহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঝড়বৃষ্টিতে দাসদাসীগণ কেহই কনককে বাটী ত্যাগ করিবার সময় দেখিতে পাইল না।

সম্পাদকের বৈঠক।

বৃদ্ধ কবি।

ভূপালী রাগিণী।

মন হোতে প্রেম যেতেছে শুকায়ে
জীবন হোতেছে শেষ,
শিথিল কপোল মলিন নয়ন
তুষার-ধবল কেশ!
পাশেতে আমার নীরবে পড়িয়া
অযতনে বীণাখানি,
বাজাবার বল নাইক এ হাতে
জড়িমা জড়িত বাণী!
গীতিময়ী মোর সহচরি বীণা!
হইল বিদায় নিতে;
আর কি পারিবি ঢালিবারে তুই
অমৃত আমার চিতে?
তবু একবার আর একবার
ত্যজিবার আগে প্রাণ,
মরিতে মরিতে গাহিয়া লইব
সাধের সে সব গান!
তুলিবে আমার সমাধী উপরে
তরুগণ শাখা তুলি,
বন দেবতারা গাইবে তখন
মরণের গান গুলি!

Translated from an English translation of the poem, by Talhaiarn the Welsh poet.

বেহাগ।

জাগি রহে চাঁদ আকাশে যখন
সারাটি রজনী!
শ্রান্ত জগত ঘুমে অচেতন
সারাটী রজনী!
অতি ধীরে ধীরে হৃদে কি লাগিয়া
মধুময় ভাব উঠেগো জাগিয়া
সারাটি রজনী!
ঘুমায়ে তোমারি দেখিগো স্বপন
সারাটি রজনী!
জাগিয়া তোমারি দেখিগো বদন
সারাটি রজনী!
ত্যজিবে যখন দেহ ধূলিময়
তখন কি সখি তোমার হৃদয়।
আমার ঘুমের শয়ন পরে
ভ্রমিয়া বেড়াবে প্রণয় ভরে।
সারাটি রজনী!

পূরবী।

পাতায় পাতায় দুলিছে শিশির
গাহিছে বিহগগণ,
কুসুমবন হোতে সুরভি হরিয়া
বহিতেছে সমীরণ!
সাঁঝের আকাশ মাঝারে এখনো
মৃদুল কিরণ জ্বলে!
সলিনীর সাথে বসিয়া তখন
কতনা ছলনে কাটাইনু ক্ষণ,
কে জানিত তবে বালিকা নিদয়
রেখেছিল ঢাকি কপট-হৃদয়
সরল হাসির তলে!
এইত সেথায় ভ্রমি, গো, যেথায়
থাকিত সে মোর কাছে,
প্রকৃতি জানেনা পরিবরতণ
সকলি তেমনি আছে!
তেমনি গোলাপ রূপ-হাসি-ময়
জ্বলিছে শিশির-ভরে,
যে হাসি-কিরণে আছিল প্রকৃতি
দ্বিগুণ দ্বিগুণ মধুর আকৃতি,
সে হাসি নাইক আর!

Translated from an English translation of an Irish Song.

পিল্।

বল, গো বালা, আমারি তুমি
হইবে চিরকাল!
আনিয়া দিব চরণ তলে
যা কিছু আছে সাগর জলে
পৃথিবী পরে আকাশ তলে,
অতুল মনি জাল!
শুনি আশার মোহন-রব
যা কিছু ভাল লাগিবে তব
আনিয়া দিব হও, গো, যদি
আমারি চিরকাল!
যেথায় মোরা বেড়াব দুটি,
কুসুমগুলি উঠিবে ফুটি,
নদীর জলে শুনিতে পাব
দেবতাদের বাণী!
তারকাগুলি দেখাবে যেন
প্রেমিকদেরি জগত হেন,
মধুর এক স্বপন সম
দেখাবে ধরা খানি!
আকাশ-ভেদী শিখর হোতে
পতন শীল নিঝর-স্রোতে
নাহিয়া যথা কানন-ভূমি
হরিত-বাসে সাজে,
চির-প্রবাহী সুখের ধারে
দোঁহার হৃদি হাসিবে হারে—
যেই সুখের মূল লুকানো
কলপনার মাঝে!
প্রেম দেবের কুহক জালে
হৃদয়ে যার অমৃত ঢালে,
সেই সে জনে করেন প্রেম
কত না সুখ-দান;
ভবন তাঁর স্বরগ পরে,
যেথায় তাঁর চরণ পড়ে
ধরার মাঝে স্বরগ শোভা
ধরে, গো, সেই খান!

Moore's Irish Melodies.

গিয়াছে সে দিন, যে দিন হৃদয়
রূপের মোহনে আছিল মাতি,
প্রাণের স্বপন আছিল যখন
প্রেম প্রেম শুধু দিবস রাতি!

শান্ত আশা এ হৃদয়ে আমার
এখন ফুটিতে পারে,
সুবিমলতর দিবস আমার
এখন উঠিতে পারে!
বালক কালের প্রেমের স্বপন—
মধুর যেমন উজ্জ্বল যেমন
তেমন কিছুই আসিবে না,
তেমন কিছুই আসিবে না!
সে দেবী প্রতিমা নারিব ভুলিতে
প্রথম প্রণয় আঁকিল যাহা,
স্মৃতি-মন্ত্র মোর উজ্জ্বল করিয়া
এখনো হৃদয়ে বিরাজে তাহা!
সে প্রতিমা সেই পরিমল সম
পলকে যা লয় পায়,
প্রভাত কালের স্বপন যেমন
পলকে মিশায়ে যায়।
অলস প্রবাহ জীবনে আমার
সে কিরণ কভু ভাসিবেনা আর
সে কিরণ কভু ভাসিবেনা,
সে কিরণ কভু ভাসিবেনা!

Moore's Irish Melodies.

রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার যাইবি কি তুই,
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
পাদপের ছায়া মাথার পরে,
পাখীরা গাইছে মধুর স্বরে
অথবা উড়িছে পাখা বিছায়ে
হরষে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার প্রেয়সী আমার
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
শিখর উঠেছে আকাশপরি,
ফেনময় স্রোত পড়িছে মরি,
সুরভি-কুঞ্জ ছায়া বিছায়ে
শোভিছে সে গিরি-কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি-কাননে?
ধবল শিখর কুসুমে ভরা
সরসে ঝরিছে নিঝর-ধারা
উছসে উঠিয়া সলিল-কণা
শীতলিছে গিরি কাননে!
রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার,
যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই,
রূপসী আমার, যাইবি কি তুই
ভ্রমিবারে গিরি কাননে?
সুখ দুখ যাহা দিলেন, বিধি,
কিছুই মানিতে চায়না হৃদি,
তোমারে ও প্রেমে লইয়া পাশে
ভ্রমি যদি গিরি-কাননে!

Burns.

সুশীলা আমার, জানালার পরে
দাঁড়াও একটিবার!
একবার আমি দেখিয়া লইব
মধুর হাসি তোমার!
কত দুখ-জ্বালা সহি অকাতরে
ভ্রমি, গো, দূর প্রবাসে
যদি লভি মোর হৃদয়-রতন—
সুশীলারে মোর পাশে!

কালিকে যখন নাচ গান কত
হতেছিল সভা পরে,
কিছুই শুনিনি, আছিনু মগন
তোমারি ভাবনা ভরে
আছিল কতনা বালিকা, রমণী,
রূপসী প্রমোদ-ছিয়া,
বিষাদে কহিনু 'তোমরাত নহ'
সুশীলা, আমার প্রিয়া !'
সুশীলে, কেমনে ভাঙ্গ' তার মন
ছরষে মরিতে পারে যেই জন
তোমারি তোমারি তরে !
সুশীলে, কেমনে ভ ঙ্গ' হিয়া তার
কিছু যে করেনি, এক দোষ যার
ভাল বাসে শুধু তোরে !
প্রণয়ে প্রণয় না যদি মিশাও
দয়া কোরো মোর প্রতি,
সুশীলার মন নহেত কখনো
নিরদয় এক রতি ! Burns.

'কোরনা ছলনা কোরনা ছলনা
যেওনা ফেলিয়া মোরে !
এতই যাতনা দুখিনী আমারে
দিতেছ কেমন কোরে ?
গাঁথিয়া রেখেছি পরাতে মালিকা
তোমার গলার পরে,
কোরনা, ছলনা কোরনা ছলনা,
যেওনা ফেলিয়া মোরে !
এতই যাতনা দুখিনী—বালারে
দিতেছ কেমন কোরে ?
যে শপথ তুমি বোলেছ আমারে
মনে কোরে দেখ তবে,
মনে ক'র সেই কুঞ্জ যেথায়
কহিলে আমারি হবে।
কোরনা ছলনা—কোরনা ছলনা
যেওনা ফেলিয়া মোরে,
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন কোরে ?'
এত বলি এক কাঁদিছে ললনা
ভাসিছে লোচন-লোরে
"কোরনা ছলনা—কোরনা ছলনা
যেওনা ফেলিয়া মোরে।
এতই যাতনা দুখিনী-বালারে
দিতেছ কেমন কোরে ?

Chappel

চপলারে আমি অনেক ভাবিয়া
দূরেতে রাখিয়া এলেম তারে,
রূপ-ফাঁদ ছোতে পালাইতে তার,
প্রণয়ে ডুবাতে মদিরা-ধারে।
এত দূরে এসে বুঝিনু এখন
এখনো ঘুচেনি প্রণয়-ঘোর,
মাথায় যদিও চোড়েছে মদিরা
প্রণয় রোয়েছে হৃদয়ে মোর ?
যুবতীর শেষে লইনু শরণ
মাগিনু সহায় তার,
অনেক ভাবি সে কহিল তখন
"চপলা নারীর সার।"
আমি কহিলাম 'সে কথা তোমার
কহিতে হবেনা মোরে —
দোষ যদি কিছু বলিবারে পারো
শুনি প্রণিধান কোরে।'
যুবতী কহিল 'তাও কভু হয় ?
যদি বলি দোষ আছে—
নামের আমার কুযশ হইবে
কহিনু তোমার কাছে।'

রাখ মোর কথা, সখা, ভুলে যাও তারে,
কি হবে রাখিয়া মনে চপলা বালারে ?
করিছ নয়ন কয় অশ্রু বরষিয়া,
এ অশ্রুর যোগ্য সে কি,বল, সখা, বল দেখি
ছি,ছি,ছি,সরমে তাহা ফেলগো মুছিয়া !
তুচ্ছ সে হৃদয় তরে-চপলতাময়
মহান্-হৃদয় তব করিতেছ ক্ষয় !
তার কটাক্ষের হাসি, তাহার ঘৃণার রাশি,
করিবে কি তার সাথে অশ্রু বিনিময় ?
মন অধিকার করা যার ব্যবসায়,
মন লোয়ে দলিবারে আমোদ যে পায়,
ছেলে খেলা করে লোয়ে পরের হৃদয়,
নিত্য-নব-অনুরাগী, বল, সখা, তার লাগি
তিল মাত্র দুখ পেতে লাজ নাহি হয় ?
মুছ, সখা, মন হোতে মূরতি তাহার,
মুছ, সখা, আঁখি হোতে অশ্রু-বারিধার !
যোগ্যতর পাত্রে তব মন কর দান,
সে প্রেমের নিরাশাও পবিত্র মহান্ !

না, সখা, মনের ব্যথা কোরনা গোপন !
যবে অশ্রু-জল, হায়, বহিবারে বাহিরায়
চাপিয়া রেখো না তাহা আমারি কারণ !
চিনি, সখা, চিনি তব ও দারুণ হাসি
ওর চেয়ে কত ভাল অশ্রু জল রাশি !
মাথা খাও, অভাগীরে কোরনা বঞ্চনা,
ছলবেশে আবরিয়া রেখোনা যন্ত্রণা।
মমতার অশ্রুজলে নিভাইব সে অনলে,
ভাল বাস যদি তবে রাখ এ প্রার্থনা !

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি
তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটেনা !
কখনো বা মৃদু হেসে, আদর করিতে এসে
সহসা সরমে বাধে, মন উঠে উঠেনা !
রোষের ছলনা করি, দূরে যাই চাই ফিরি,
চরণ বারণ তবে উঠে উঠে উঠেনা !
কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি
চাহি থাকে, লাজবাঁধ তবু টুটে টুটেনা !
যখন ঘুমায়ে থাকি, মুখ পানে মেলি আঁখি
চাহি থাকে, দেখি দেখি সাধ যেন মিটেনা!
সহসা উঠিলে জাগি, তখন কিসের লাগি
সরমেতে মোরে গিয়ে কথা যেন ফুটেনা !
লাজময়ি ! তোর চেয়ে দেখিনি লাজুক মেয়ে
প্রেম-বরিষার স্রোতে লাজ-বাঁধ টুটেনা !

দেশ।

বুঝেছি বুঝেছি সখা, ভেঙ্গেছে প্রণয়,
ও মিছা আদর তবে না করিলে নয় ?
ও শুধু বাড়ায় ব্যথা ,সে সব পুরানো কথা
মনে কোরে দেয় শুধু, ভাঙ্গে এ হৃদয় !,
প্রতি হাসি, প্রতি কথা, প্রতি ব্যবহার,
আমি যত বুঝি তব, কে বুঝিবে আর ?
প্রেম যদি ভুলে থাকো, সত্য কোরে বল
নাকো,
করিব না মুহূর্ত্তের তরে তিরস্কার।
আমিত বোলেই ছিনু ক্ষুদ্র আমি নারী,
তোমার ও প্রণয়ের নহি অধিকারী !
আর কারে ভাল বেসে, সুখী যদি হও
শেষে
তাই ভাল বেসো, নাথ, না করি বারণ !
মনে কোরে মোর কথা, মিছা পেয়োনা-
কো ব্যথা,
পুরানো প্রেমের কথা কোরো না স্মরণ।

এখন ত আর নাই কোন আশা
হইয়াছি অসহায়—
চপলা আমার মরমে মরমে
বাণ বিঁধিতেছে, হায়!
দলে মিশি তার ইন্দ্রিয় আমার
বিরোধী হোয়েছে মোর,
যুবতি আমার—বলিছে আমারে
রূপের অধীন ঘোর!

Lord Cantalupe.

প্রেমতত্ত্ব।

নিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে
তটিনী মিশিছে সাগর পরে,
পবনের সাথে মিশিছে পবন
চির-সুমধুর প্রণয় ভরে!
জগতে কেহই নাইক' একেলা,
সকলি বিধির নিয়ম-গুণে,
একের সহিত মিশিছে অপরে
আমি বা কেননা তোমার সনে?
দেখ, গিরি ঐ চুমিছে আকাশে,
ঢেউ পরে ঢেউ পড়িছে ঢলি,
সে কুল-বালারে কে বা না দোষিবে,
ভাইটিরে যদি যায় সে ভুলি!
রবি-কর দেখ চুমিছে ধরণী,
শশি-কর চুমে সাগর জল,
তুমি যদি মোরে না চুম', ললনা,
এসব চুম্বনে কি তবে ফল?

Shelley.

ললিনী।

লীলাময়ী ললিনী,
চপলিনী ললিনী,
শুধালে আমার কোরে
ভাল সে কি বাসে মোরে,
কচি দুটি হাত দিয়ে
ধরে গলা জড়াইয়ে,
হেসে হেসে একেবারে
ঢলে পড়ে পাগলিনী!
ভাল বাসে কি না, তবু
বলিতে চাহেনা কভু
নিরদয়া ললিনী!
যবে ছুঁদি তার কাছে,
প্রেমের নিশ্বাস যাচে
চায় সে এমন কোরে
বিপাকে ফেলিতে মোরে,
হাসে কত, কথা তবু কয়না!
এমন নির্দ্দোষ ধূর্ত্ত
চতুর সরল,
ঘোমটা তুলিয়া চায়
চাহনি চপল
উজ্জ্বল অসিত-তারা-নয়না!
অমনি চকিত এক হাসির ছটায়
ললিত কপোলে তার গোলাপ ফুটায়,
তখনি পলায় আর রয়না!

Tennyson.

কি করিব বল, সখা, তোমার লাগিয়া?
কি করিলে জুড়াইতে পারিব ও হিয়া?
এই পেতে দিনু বুক রাখ, সখা, রাখ মুখ,
ঘুমাওগো পরিশ্রান্ত, রহিব জাগিয়া!
খুলে বল, বল, সখা, কি দুঃখ তোমার?

অশ্রুজলে মিশাইব অশ্রুবারি-ধার !
এক দিন বোলেছিলে মোর ভালবাসা
পেলেই পূরিবে তব হৃদয়ের আশা !
বোলেছিলে সব তব করিছে নির্ভর
পৃথিবীর সুখ দুঃখ আমার উপর !
কই, সখা, প্রাণ মন কোরেছি ত সমর্পণ,
দিয়াছি ত যাহা কিছু আছিল আমার,
তবু শুকালো না কেন অশ্রু-বারি-ধার ?

ইংলণ্ডীয় রাজ্যতন্ত্র (Constitution)

যে ইংলণ্ড পৃথিবীর সকল অংশেই আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, কত শত বিভিন্ন রাজ্য সুনিয়মে শাসন করিতেছে, তাহার নিজের অভ্যন্তর রাজ্যপ্রণালী কিরূপে নির্ব্বাহিত হয়, তাহা সকলের বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয়দের আলোচনা করা আবশ্যক।

এই রাজ্যতন্ত্র রাজ-বিদ্রোহী লোকদিগের বিজয়ের ফল বা কোন বদান্য রাজার অনুগ্রহ-প্রদত্ত নহে। ইহা কোন সনন্দ বা রাজা ও প্রজাগণের পরস্পর সম্মতি পত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, ইহা বিশেষ বিশেষ সনন্দ ও মহাসভা-কৃত নিয়ম সকলের সমষ্টিও নহে, কারণ মহা-সনন্দের Magna charta র সময় হইতে একাল পর্য্যন্ত মহাসভা যে সকল নিয়ম ব্যবস্থাপন করিয়াছে, তাহা ইংলণ্ডের সমস্ত সাধারণ আইনের এক ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। বস্তুতঃ সেই সনন্দাদি পুরাতন অলিখিত নিয়মের সাব্যস্তকারী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের রাজ্য-তন্ত্র অভাব, অভি-প্রয়োজন, ভিন্নদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিজয়, স্বার্থপরতা, সুযোগ প্রভৃতি হইতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেমন যুবা-পুরুষের প্রধান প্রধান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নবোৎপন্ন নহে, সে গুলি তাহার বাল্যাবস্থাতেও ছিল, কেবল এক্ষণে অধিকতর পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে মাত্র, ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজ্য-তন্ত্রের প্রধান অংশগুলিও সেইরূপ। কোন বিপ্লব দ্বারা কখনো এদেশের নিয়মের মূল উচ্ছিন্ন হয় নাই ; সময়ে সময়ে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তাৎকালিক নিয়মের রক্ষার জন্য, কোন নূতন নিয়ম সংস্থাপন জন্য নহে।

মহাসভা (পার্লামেণ্ট)।

রাজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য সভা সর্ব্ব-প্রধান।

মহা সভা তিন ভাগে বিভক্ত। (১) রাজা বা রাজ্ঞী, (২) লর্ড, (৩) কমন্স।

পূর্ব্বে অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সনদের এক প্রধান জাতীয় সমাজ ছিল, তাহার নাম বিজ্ঞসমাজ (Witenagemot) এইসমাজ লোকদিগের নিমিত্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিত, প্রধান প্রধান বিষপ, আবট্ প্রতি জেলার প্রধান ভূম্যধিকারী এবং রাজ্যের অন্যান্য কুলীন ও বিজ্ঞলোক সেই সমাজের সভ্য ছিলেন। তাঁহারা কিরূপে নির্ব্বাচিত হইতেন, তাহা অবধারণ করা কঠিন। এই সমাজের সম্মতি ব্যতীত রাজা কোন কর বা নিয়ম স্থাপন করিতে পারিতেন না। বিজ্ঞসমাজের সভ্যগণ এই সমাজে আপন আপন মত দিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে প্রতিনিধি দ্বারা মত দেওয়া প্রথা ছিল না। নর্ম্মাণ অধিকারের পর (১০৬৬ খৃঃ অঃ) স্যাক্সনদের বিজ্ঞ-সমাজ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের স্বজাতীয় রাজ-নীতি বিষয়ক স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। নর্ম্মাণ রাজাদের যে একটি সভা ছিল, তাহার নিয়ম ব্যবস্থাপনের কোন ক্ষমতা ছিল না। ইহার নাম রাজ-সভা (Curia-regis), রাজা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই এই সভায় আহ্বান করিতেন। এই সভায় বিচার সম্বন্ধীয় অনেক কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। পরাক্রম-শালী নর্ম্মাণ রাজারা গত হইলে এই রাজসভা ক্রমশঃ বলবতী হইতে লাগিল। দ্বিতীয় হেনরী এই সভা রাজ্যের গুরুতর কার্য্য বিষয়ে পরামর্শ লইবার জন্য সর্ব্বদা আহ্বান করিতেন। কর ও ব্যবস্থা স্থাপন যে ব্যারণদিগের বিশেষ অধিকার তাহা ১২১৫ খৃষ্টাব্দে মহা-সনন্দের (Magna-charta) দ্বারা প্রথম স্বীকৃত ও সাব্যস্ত হয়। এই মহা-সনন্দ ইংলণ্ডীয় রাজ্যতন্ত্রের এক প্রধান অঙ্গ, এজন্য এস্থলে তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আবশ্যক।

দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র যন ১১৯৯ খৃঃঅব্দে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া আপন নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুর্ব্বলতা-দোষে প্রথমতঃ ফ্রান্সদেশ-স্থিত আপন রাজ্যের অধিকাংশ হারাইলেন। এই সময়ে তৃতীয় ইনোসেণ্ট রোমের পোপ ছিলেন। তিনি আপন বুদ্ধিবলে প্রায় ইয়ুরোপীয় সমস্ত রাজমণ্ডলীকে এরূপ বশে আনিয়াছিলেন, যে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন পোপ সেরূপ পারেন নাই। তিনি যনকে আপন বশে আনিবার জন্য প্রথমতঃ তাঁহাকে ধর্ম্ম-মণ্ডলী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তাঁহার স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভয় দেখান। পরে ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ্ ও ইংলণ্ডের লোকদিগের তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ ও তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে আজ্ঞা দেন। যন আপন প্রজা-গণের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্তির আশা না দেখিয়া পোপের বশীভূত হইলেন ও এক সনন্দে ইংলণ্ড ও আয়ার্লণ্ড, ঈশ্বর, সেণ্ট পীটর্, সেণ্টপল্, পোপ্ ইনোসেণ্ট ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে দান করিলেন ও পোপের অধীনে এই রাজ্য শাসন করিতে ও তাঁহাকে প্রতি বৎসর করস্বরূপ ১০০০ মার্ক দিতে স্বীকার করিলেন। এই যনের ঔদ্ধত্যে ব্যারণগণ সতত অপমানিত হইতেন ও সাম্পটো তাঁহাদের

কুল-মর্য্যাদা বিনষ্ট হইত। বলপূর্ব্বক কর গ্রহণ ও অন্যান্য নানা প্রকার অত্যাচারে সকলেই ইহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। যখন নিজ রাজ্যের স্বাধীনতা পোপকে দান করিয়া সকল লোকের এরূপ ঘৃণাস্পদ হইয়া উঠিলেন যে, প্রধান প্রধান ব্যারণেরা আপনাদিগের স্বত্ব পুনঃস্থাপন ও রক্ষার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রধারণ করিতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। লণ্ডনের প্রায় সকল লোক ও অনেক ছোট বড় ব্যারণ তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল। যখন যন্ দেখিলেন যে, তাঁহার পক্ষীয় লোক অতি অল্প, ও অধিকাংশ লোক তাঁহার বিপক্ষ, তখন নিরুপায় হইয়া রণিমিড নামক স্থানে মহা-সনন্দে স্বাক্ষর করিলেন। এই সনন্দ দ্বারা সকল পদস্থ লোকেরই স্বাধীনতা ও স্বত্ব প্রদত্ত বা সংরক্ষিত ও রক্ষিত হইল। এই সনন্দের নিম্নলিখিত কয়েকটি ধারাই প্রধান।

(১) কোন পাদরির পদ শূন্য হইলে পাদরীরা সেই পদে অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন। রাজা শুদ্ধ তাহাতে সম্মতি দিবেন। যদি না দেন, তথাপি সে নিয়োজন ব্যর্থ হইবে না।

(২) রাজ্যের প্রধান রাজ-সভার অনুমতি ব্যতীত রাজা কোন কর ব্যবস্থাপন করিতে পারিবেন না। রাজা রাজ্যের সকল বিশপ্, আর্‌ল ও প্রধান ব্যারণকে পৃথক পৃথক আজ্ঞাপত্র (Writ) দ্বারা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী-গণকে সরিফের সমন দ্বারা ঐ প্রধান রাজসভায় আহ্বান করিবেন।

(৩) লণ্ডন ও অন্যান্য নগরের স্বাধীনতা অক্ষত থাকিবেক ও প্রধান রাজ সভার অনুমতি ব্যতীত রাজা সেই সকল নগর হইতে কোন কর গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) এক প্রকার ওজন ও মাপ সমস্ত রাজ্যে চলিবেক।

(৫) বিদেশীয় বণিকেরা রাজার অনুমতি বিনা ইংলণ্ডে বাণিজ্য করিতে পারিবে।

(৬) কোন ব্যারণ ব্যারণগণের বিচার ব্যতীত, এবং কোন স্বাধীন ব্যক্তি (Freeman) দেশীয় ব্যবহারানুসারে বিচারিত না হইলে ধৃত, কারারুদ্ধ বা নিজের ভূমি হইতে বঞ্চিত, অথবা স্বাধীনতা বা অন্যকোন-প্রকার স্বত্ব ও অধিকার হইতে বিচ্যুত, নির্ব্বাসিত, বা প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে না।

প্রসিদ্ধ আর্‌ল অব লেস্‌টর্ তৃতীয় হেন্‌রীর সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া সমস্ত রাজ্যের এক প্রকার প্রভু হইয়াউঠিলেন। তিনি আপনার আধিপত্য দৃঢ়ীভূত করণার্থ ১২৬৫ খৃঃঅব্দের ২০এ জানুয়ারী লণ্ডনে এক নূতন প্রধান রাজসভা আহ্বান করেন। তিনি আপন পক্ষীয় ব্যারণ ব্যতীত অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদ্রি ও প্রতি জেলা (County) হইতে দুই দুইটি নাইট এবং প্রতি (Borough) হইতে দুই দুইটি প্রতিনিধি ঐ সভায় আহ্বান করেন। ইহার পূর্ব্বে কোন নগর বা জেলার সামান্য লোক প্রধান রাজ-

সভায় বসেন নাই। ইহাই হাউস্ অফ্ কমন্সের প্রথম বৈঠক।

ইহার পর প্রথম এডওয়ার্ড্ও মহাসভায় প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য প্রতি নগরে সমন্ পাঠাইয়া দেন। অনেকে মনে করেন যে, সাধারণ ব্যক্তিগণ Commons যখন প্রথম মহা সভায় প্রবেশ করেন, তখন ঐ সভা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল না। কিন্তু তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সময় যে, লর্ডস্ ও কমন্স এখনকার মত পৃথক পৃথক বৈঠক করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। প্রধান ব্যারণগণ ও বিষপেরা হাউস অফ লর্ডে ও নীচপদস্থ পাদরী ও নগর সকলের প্রতিনিধিগণ হাউস্ অফ্ কমন্সে বসিতেন।

ব্যারণেরা এক প্রকার জায়গীরদার বা ভূম্যধিকারী। নর্ম্যাণদিগের অধিকার অবধি এই জায়গীরদারী বন্দোবস্ত ইংলণ্ডে প্রচলিত। প্রথম উইলিয়ম প্রায় ইংলণ্ডের সমস্ত ভূমি বিভাগ করিয়া আপন সেনাধ্যক্ষ ও সঙ্গীগণকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। পূর্ব্বে যে সকল অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন ভূম্যধিকারী ছিলেন, তাঁহারা এই নূতন জায়গীরদারদিগের অধীনস্থ প্রজা হইয়া পড়েন। এই জায়গীরদারদিগকে ব্যারণ কহে। ইহাঁরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ ক্ষুদ্র ব্যারণ। ইহাদিগকে কেবল রাজার নাইট্-সর্ভিস্ Knight-Service করিতে হইত, অর্থাৎ রাজার জন্য আপন প্রজাগণের মধ্য হইতে কতকগুলি যোদ্ধাকে অস্ত্রাদিতে সম্পূর্ণরূপে সজ্জিত করিয়া বৎসরে ৪০ দিন রাখিতে হইত।

(২) প্রধান ব্যারণ। ইহাঁদিগকে ক্ষুদ্র ব্যারণদের ন্যায় যুদ্ধে সাহায্য করিতে হইত, তাহা ভিন্ন ইঁহারা রাজার সহিত রাজ-সভায় থাকিতেন। ইহারা আপন আপন প্রজাগণের ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমা সকল বিচার করিতেন। ক্ষুদ্র ব্যারণ আপন প্রজাদের কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। এই প্রধান ব্যারণ সকল রাজকীয় ব্যারণ নামে উক্ত হইতেন, ইহাঁরাই প্রথমে হাউস্ অফ লর্ডসের মেম্বর হন। বিষপেরা অনেক ব্যারণী বা জাগীরের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এজন্য ইহাঁরাও তাহার মেম্বর হন। ব্যারণেরা আপন জাগীর ও গড়বাড়ি হারাইলে আর লর্ডের সভায় বসিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা বা রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী * পার্লামেণ্ট বা মহাসভার এক অংশ। বস্তুতঃ তিনি এই সভার সর্ব্বপ্রধান। মহাসভা কেবল ব্যবস্থাদায়িনী নহে, ইহা রাজার

*পাঠকেরা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, আমরা এই প্রবন্ধে রাজ্ঞী ও রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী এই দুই কথা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। রাজার স্ত্রী রাজ্ঞী; কিন্তু যে মহিলা স্বয়ং রাজ্য শাসন করেন, তিনি রাজ্যকর্ত্রী রাজ্ঞী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রণা-দায়িনী সভা ও সর্ব্বপ্রধান বিচারাগারে (HIgh Court) যেমন রাজা সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছেন অনুমান করিয়া লইতে হয় মহাসভাতেও সেইরূপ। অর্থাৎ তিনি হাউস্ অফ্ লর্ডস ও হাউস্ অফ কমন্স উভয় স্থানেই সর্ব্বদা আছেন এরূপ মনে করিয়া লইতে হইবে। প্লাণ্টাজেনেট বংশীয় রাজাদিগের সময়ে এই রূপ নিয়ম ছিল যে, রাজাকে হাউস অফ্ লর্ডসে বসিতে হইত। ষষ্ঠ হেনরীর সময় এই নিয়ম হয় যে রাজা উপস্থিত না থাকিলেও হাউস অফ্ লর্ডসের কার্য্য চলিবে। দ্বিতীয় চার্লস্, দ্বিতীয় জেম্‌স, তৃতীয় উইলিয়ম ও অ্যান্ তথায় সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন। প্রথম জর্জ্জের সময়াবধি রাজারা আর তথাকার তর্ক বিতর্ককালে যান না; লর্ড চ্যান্সেলর রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ তথায় থাকেন।

রাজার অনেকগুলি বিশেষ অধিকার আছে।

(১) কেহ রাজার নামে ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে নালিস করিতে পারিবে না। তাঁহার উপর যদি কাহার কোন দাওয়া থাকে তাহা হইলে দরখাস্ত করিয়া প্রথমে রাজার অনুমতি লইয়া তাহা আদালতে আনিতে হয়। ঐ দরখাস্ত হোম-সেক্রেটরির নিকট পাঠাইতে হয়। ঐ দরখাস্তের নাম, পিটিসন্ অফ রাইটস্ (Petition of Rights)।

(২) রাজা কোন অন্যায় করিতে পারেন না, এবং আপন কর্ম্মের নিমিত্ত কাহারো নিকট দায়ী নহেন। কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে তাঁহার মন্ত্রীরা তজ্জন্য দায়ী।

(৩) রাজা কখন অপ্রাপ্তবয়স্ক নহেন।

(৪) রাজা কখনো মরেন না, কারণ এক রাজার মৃত্যু হইল তাঁহার উত্তরাধিকারী তৎক্ষণাৎ রাজা হন।

(৫) রাজা ইংলণ্ডের সমস্ত ভূমির একমাত্র অধিকারী Owner। সমস্ত ভূমি তাঁহা কর্ত্তৃক জাগির স্বরূপ অন্যান্য লোকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। রাজাই কেবল ভিন্ন রাজ্যে আপন প্রজার প্রতিনিধি। তিনিই কেবল যুদ্ধ-ঘোষণা ও সন্ধি করিতে পারেন। ইংলণ্ডের আইন অনুসারে কোন লোক ভিন্ন দেশের সৈন্য-দলে প্রবেশ করিতে পারে না: কিন্তু রাজা তাহা করিতে অনুমতি দিতে পারেন।

৭। তিনিই দেশের প্রধান মাজিস্ট্রেট, অন্য সকল মাজিস্ট্রেট তাঁহার দ্বারা নিয়োজিত।

৮। রাজাই কেবল ভিন্ন রাজ্যে প্রতিনিধি পাঠাইতে ও প্রতিনিধি পরিগ্রহ (receive) করিতে পারেন।

৯। রাজাই কেবল ভিন্ন রাজ্যের সহিত সন্ধি (Treaty) ও মিত্রতা করিতে পারেন। সন্ধি অর্থে বাঙ্গালায় সচরাচর যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপনা বুঝায়, কিন্তু এখানে দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; শান্তি-স্থাপনা ও পররাষ্ট্রের সহিত কোন একটি বিশেষ বন্দোবস্ত করা।

১০। তিনি ভিন্ন দেশীয় লোক-

দিগকে স্বরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন।

১১। তিনিই কেবল ক্ষমা সম্বন্ধীয় কোন বিল মহাসভায় আনিতে পারেন।

১২। মহাসভার কোন বিধি তাঁহার বিনা সম্মতিতে প্রচলিত হইতে পারে না। তৃতীয় উইলিয়মের সময় অবধি আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা উভয় house এর সম্মত বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন নাই।

১৩। রাজা সমস্ত সেনার প্রধান সেনাপতি।

১৪। তিনি যে কোন প্রজার দেশত্যাগ বারণ করিতে পারেন।

১৫। তিনি দেশের সর্ব্বপ্রধান জজ। অন্যান্য জজেরা তাঁহার প্রতিনিধি মাত্র।

১৬। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিকে মুক্ত করা রাজার অধিকারায়ত্ত।

১৭। মুদ্রা মুদ্রিত করা রাজার অধিকার, কিন্তু তিনি নিয়মাতিরিক্ত খাদ মিশাইতে পারেন না।

১৮। তিনি সকল দোষীদিগের ফরিয়াদী।

১৯। মর্য্যাদা-সূচক পদ, নূতন যন্ত্রাদির পেটণ্ট ও নগরের বিশেষ বিশেষ অধিকার তিনি দান করেন।

২০। রাজা Church of England এর মস্তক স্বরূপ। তিনি ঘোষণাপত্র দ্বারা উপবাস ও উপাসনার দিন নির্দ্দিষ্ট ও রবিবারে তাস খেলা ও দুষ্কর্মানুষ্ঠান নিবারণ করিতে পারেন।

২১। রাজা অন্য কোন ব্যক্তির সহিত কোন ভূম্যাদির সহাধিকারী হইতে পারেন না।

ইহা ভিন্ন রাজার আরো কতকগুলি অধিকার ও নিষেধ আছে, সে সকল উল্লেখ করা বাহুল্য। রাজার যে সকল বিশেষ অধিকার ও নিষেধ, সিংহাসনস্থা রাজ্ঞীর তাহাই। এই অধিকার ও নিষেধ সকল রক্ষা করিবার জন্য কঠিন আইন ধার্য্য হইয়াছে।

রাজা জারজ কন্যা ব্যতীত আর যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন। রাজ্ঞীর এই মাত্র বিশেষ অধিকার যে, তিনি বিবাহিতা হইলেও অন্যান্য বিবাহিতা স্ত্রীর ন্যায় নহেন, এক স্বাধীনা অবিবাহিতা স্ত্রীর স্বরূপ অর্থাৎ অবিবাহিতদিগের আইনানুসারে যে সকল অধিকার তাঁহারো তাহাই।

রাজা ও রাজ্ঞী উভয়ের শরীর-রক্ষার্থ কতকগুলি আইন আছে। রাজা বা রাজ্ঞীকে সংহার করিলে বা করিতে চেষ্টা করিলে রাজ-বিদ্রোহীর দণ্ড হয়। রাণী ব্যভিচার করিলে রাণী ও ব্যভিচারী উভয়েই রাজবিদ্রোহীর দণ্ড পায়। রাজ্ঞী রাণীর স্বামী সেই রাণীর প্রজা স্বরূপ, রাজ্যশাসনে তাঁহার বিশেষ অধিকার নাই। কেহ রাজ্যের উত্তরাধিকারী যুবরাজ Prince of wales বা তাঁহার পত্নী বা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী রাজবংশীয়া কোন

কন্যা ইঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বা উক্ত নারীদিগের কাহার সহিত ব্যভিচার করিলে রাজ-বিদ্রোহীর দণ্ড পায়। যে সকল রাজবংশীয় কন্যাগণের ভিন্ন দেশে বিবাহ হইয়াছে তাঁহাদের সন্তানগণ ব্যতীত, অন্য কোন রাজ-বংশীয় স্ত্রী বা পুরুষ রাজার অনুমতি বিনা বিবাহ করিতে পারিবে না। কিন্তু যাঁহাদের ২৫ বৎসর অধিক বয়স তাঁহারা বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বে Parish এ বিজ্ঞাপন করিয়া রাজার বিনা অনুমতিতে বিবাহ করিতে পারেন। কিন্তু এক বৎসর গত হইবার পূর্ব্বে Parliament সেই বিবাহ বন্ধ করিতে পারেন।

পূর্ব্বে রাজা সরকারী রাজস্ব হইতে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। ১৬৮৮ খৃঃ অব্দের বিপ্লবের পর সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সরকারী রাজস্ব হইতে রাজার বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথম জর্জ্জের সময় ঐ বৃত্তি প্রায় ১০০০,০০০ পাউণ্ড (১ পাউণ্ড প্রায় ১০ টাকা) ছিল। ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে রাজার বার্ষিক বৃত্তি ৯০০০০০ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হয়। রাজার মৌরুসী ভূমাদির আয় তাহার অধিক হইলে সেই উদ্বৃত্তাংশ সরকারী ধনাগারে যাইত।

রাজার বার্ষিক বৃত্তি হইতে জর্জ্জ ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থাপিত প্রতিনিধি প্রভৃতির বেতন দিতেন। মহারাণী বিক্টোরিয়া সিংহাসন গ্রহণ করিলে এই স্থির হয় যে, রাণীর সমস্ত মৌরুসী ভূমির আয় সরকারী ধনাগারে যাইবে এবং তথা হইতে মহারাণী আমরণ আপনার ব্যয়ের জন্য ৬০০০০ পাউণ্ড ও সাংসারিক ব্যয়ের নিমিত্ত ৩২৫০০০ মোট ৩৮৫০০০, পাউণ্ড এবং প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স প্রভৃতি রাজপরিবারস্থ রাজপুত্র ও রাজ-কন্যাগণ মহাসভা দ্বারা নির্দ্ধারিত বার্ষিক বৃত্তি পাইবেন। মহারাণীর মৌরুসী ভূমির আয় (যাহা সমস্তই সরকারী ধনাগারে যায়) এক্ষণে খরচ বাদে ৪১০০০০ পাউণ্ড। এখন কোন সরকারী কর্ম্মচারী মহারাণীর বৃত্তি হইতে বেতন পান না। মহারাণীর খরচ উপরি উক্ত ৩৮৫০০০ পাউণ্ডের অধিক হইলে মহাসভার গোচর করিতে হয়।

প্রিভি-কৌন্সিল।

প্রাচীন কালে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় রিচার্ডের অপ্রাপ্তবয়স্কতা কালে প্রধান রাজসভা হইতে কতকগুলি প্রধান লোক মনোনীত হইয়া একটি বিশেষ রাজ-সভা

স্থাপিত হয়। ইহা রাজার মন্ত্রী-সভার স্বরূপ ছিল, রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে রাজা সর্ব্বদা এই সভার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। এক্সচেকর (Exchequer) ও কিংসবেঞ্চ (Kings Bench) আদালতের জজেরাও এই এই বিশেষ রাজসভার সভ্য ছিলেন। পূর্ব্বে এই প্রিবি-কৌন্সিলের অনেক ক্ষমতা ছিল, এখন তত নাই, তথাপি ইহাকে রাজার এক প্রকার মন্ত্রি-সভা বলিতে হইবে। রাজার বিশেষ অধিকার সম্বন্ধীয় যে সকল কার্য্য মহাসভার দ্বারা নির্ব্বাহ হয় না, তাহা এই কৌন্সিলের দ্বারা হয়। Naturalized (অর্থাৎ বিদেশ হইতে আসিয়া যাহারা নিবাসী-শ্রেণীদের মধ্যে ভুক্ত হইয়া যায়) প্রজা ব্যতীত সকলেই প্রিভি-কৌন্সিলে সভ্য হইতে পারেন। মহাসভা বিশেষ বিধি দ্বারা কোন বিদেশীয় লোককেও ইহার অধিকার দিতে পারেন। প্রিভি-কৌন্সিলের লর্ড-প্রেসিডেণ্ট (যিনি সাধারণতঃ এক জন রাজ মন্ত্রী [Cabinet-minister]) বিশেষ রাজকীয় পত্র দ্বারা নিয়োজিত ও অন্য মেম্বরেরা কেবল রাজার দ্বারা মনোনীত হন। ইঁহাদের মর্য্যাদাসূচক উপাধি Right-honorable লর্ড প্রেসিডেণ্ট ইঁহাদিগকে সমন দ্বারা আহ্বান করেন। রাজার মৃত্যুর ছয় মাস পর পর্য্যন্ত ইঁহারা ঐ কৌন্সিলের সভ্য থাকেন। সচরাচর নূতন রাজা তাঁহাদিগকেই বাহাল রাখেন। রাজা ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারেন, কিন্তু ১৮০৫ খৃঃ অব্দ হইতে এমন কখন ঘটে নাই। লর্ড প্রেসিডেণ্ট প্রিভি-কৌন্সেলের সকল মীমাংসা (Decision) ও করণীয় কার্য্য বিষয় রাজার গোচর করেন। লর্ড প্রিভি-সীল, Lord-Privy-Seal (অর্থাৎ যাঁহার নিকট রাজার মোহর থাকে) যে সকল রাজকার্য্যে রাজার সম্মতি আবশ্যক, তাহা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়া তৎসম্বন্ধীয় লেখ্য-পত্রে সম্মতি-সূচক রাজকীয় মোহর মুদ্রিত করিয়া দেন। যদিচ রাজ্যের গুরুতর ব্যাপারে পরামর্শ লইবার জন্য রাজাকে প্রিভি-কৌন্সিল আহ্বান করিতে হয় তথাপি তিনি সেই কৌন্সিলের পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন।

হৃদয়-মন্থন।

(জনৈক সন্ন্যাসী-প্রেরিত।)

পুণ্যবতীর কথা শুনিয়া, তাঁহার সমস্ত হৃদয়-বৃত্তান্ত শুনিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়াছে। আমি অবকাশ ও অবসর পাইলেই নিভৃতে পুণ্যবতীর গল্প শুনিতে ভালবাসি। এবং যাহা শুনি তাহা তোমাদের লিখিয়া পাঠাইতেও উৎসুক হই। তোমরা সহজেই মনে করিতে পার যে আমি কঠোর সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, হিমালয়ের নিভৃত নির্জ্জনে অবরুদ্ধ থাকিয়া, দেবী মহামায়ার চরণে আত্ম-উৎসর্গ করিয়া পার্থিব ভাবনা-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিয়া অকিঞ্চিৎকর প্রেমের কথায় এতদূর সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। কিন্তু আমি আজ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, আমাদের অনেক সন্ন্যাসী-সঙ্গীর জীবন বৃত্তান্ত শুনিয়াই বলিতেছি, আমার পূর্ব্বপঠিত পুরাণ কাব্য সকল স্মরণ করিয়া বলিতেছি, যে পার্থিব প্রেম উপন্যাসের সামগ্রী নহে, তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নহে, বিজ্ঞতাভিমানীদের নাসিকা কুঞ্চনের সামগ্রী নহে। যদি কেহ মানব-হৃদয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে হৃদয়ের কেবল, দুইটা বৃত্তিই ইহকালের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া পরলোকের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্তও প্রসারিত হয়। সেই একটী বৃত্তি পার্থিব প্রেম, অপরটি—দেবভক্তি। মানুষের ইহকালের অন্য সকল আশা ভরসা ইহকালেই পরিসমাপ্ত হয়, কিন্তু প্রেম ও দেব-ভক্তির অনন্ত উল্লাস যেন অনন্ত কালেও অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। পার্থিব প্রেম এই পবিত্র-সলিলা জাহ্নবীর মত পবিত্র,—এই জাহ্নবীর মত ইহা মর্ত্তেও প্রবাহিত এবং এবং স্বর্গেও তরঙ্গিত। ইহার প্রকৃত উচ্ছাস এই জাহ্নবীর মত সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে উৎসারিত, ইহা দেব-ভক্তির পূর্ব্বশিক্ষা—দেবভক্তির প্রথম সোপান, দেবভক্তির তরুণ অরুণ আলোক, এবং দেবভক্তিই ইহার চরম উৎকর্ষ।

আমি পর দিন রাত্রিকালে সন্ধ্যা-সন্ধ্যা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগত হইলে আবার সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নির পাশে পুণ্যবতীকে নির্জনে পাইয়া, পুণ্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তুমি কি সুরেন্দ্রের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হইয়াই তবে সন্ন্যাসিনী হইয়াছ?

পু। না, আমি সুরেন্দ্রের একেবারে তাচ্ছিল্যের পাত্র হই নাই।

আ। তবে কি তিনি ইন্দ্রানীতে অনুরক্ত হইয়াও, তোমার প্রতি অনুরাগ দেখাইতেন?

পু। অনুরাগ দেখাইতেন কি? তিনি বরং সমধিক যত্নে, সমধিক স্নেহে আমাকে সমাদর করিতেন। পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার মনে কষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবনাতে সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন।

আ। তবে তুমি আরও কি চাও? আদর যত্ন, মমতা, স্নেহ পাইয়াও, কি তুমি সুরেন্দ্রের নিন্দা করিতে পার?

পু। জননী যোগমায়াই জানেন যে সুরেন্দ্রের নিন্দা আমার উদ্দেশ্য নহে। আদর, যত্ন, মমতা ও স্নেহের জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইতে পারি বটে, কিন্তু প্রেমের লালসা প্রেম বই আর কিছুতেই মিটিতে পারে না। প্রেম প্রেমই চাহে—প্রেমের প্রতিদান স্নেহ হইতে পারে না। তুমি যদি আজ কর্ত্তব্য জ্ঞানের বশীভূত হইয়া, তোমার প্রণয়িনীকে সপ্ত রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী কর, তুমি যদি আজ কৃতজ্ঞতার অনুরোধে, আদর যত্নের প্রতিদানে, তোমার প্রণয়িনীকে স্বর্গ-রাজ্যের ইন্দ্রানী পর্য্যন্ত কর, তাহাহইলেই বা তুমি তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক লালসার কি তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিলে? পারিজাত কুসুম পারিজাত কুসুমই বটে, কিন্তু এক জন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির নিকটে কর্ম্মনাশা-নদীর এক গণ্ডূষ জল যতদূর আদরণীয়, তাহার নিকটে তোমার পারিজাত পুষ্প পর্য্যন্ত ততদূর আদরণীয় কখনই হইতে পারে না।

আ। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির নিকটে পারিজাতের মর্য্যাদা না থাকিতে পারে, কিন্তু স্নেহাতুর ব্যক্তি ও প্রেমাতুর ব্যক্তির চূড়ান্ত লালসা কি একই নয়?

পু। আমি তোমাকে ঠিক বুঝাইয়া দিতে পারিতেছি না। আমি মনোবিজ্ঞানের "ক" অক্ষর পর্য্যন্ত জানি না, কেবল মর্ম্মের স্তরে স্তরে এই মাত্র জানি যে স্নেহের প্রার্থী স্নেহেতেই পরিতৃপ্ত কিন্তু প্রেমের ভিখারী প্রেম ব্যতীত আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। কাহাকে স্নেহ বলে, কাহাকে যত্ন ও আদর বলে, আর কাহাকে প্রেম বলে তা আমি বিনা আয়াসে বুঝিয়া লইতে পারি কিন্তু বুঝাইতে পারি না। আমি যখন দেখিলাম যে সুরেন্দ্র আমাকে দেখিবা মাত্রই আর আনন্দে উথলিত হয়েন না, চক্ষুর যুগল তারা আর ভাবে ঢলিয়া পড়ে না, জড়িমা-জড়িত কথায় আর হৃদয়ের পূর্ণ ভাব অপরিস্ফুট

ভাষার প্রকাশ করিতে চাহেন না, আমাকে স্পর্শমাত্রেই আর লোমাঞ্চিতকায় হয়েন না, অকিঞ্চিৎকর গল্পের 'মধু মাখা ছাই পাঁশে' আর দ্রুতগতি সময়কে উপহাসে উড়াইয়া দিতে চাহেন না, অথচ যত্নের বা আদরের বা সোহাগের লেশ মাত্র ত্রুটী প্রদর্শন করেন না, তখনি জানিলাম যে আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, পুণ্যবতীর পূর্ব্ব জন্মের সকল পুণ্যে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে এবং পরকালের অপার্থিব সম্মিলনের আশাও উন্মূলিত হইয়াছে।

এই কথা বলিতে বলিতে সেই প্রজ্বলিত হোমাগ্নির পার্শ্বে সাধ্বী সতী পুণ্যবতী অবসন্ন হইয়া ক্রমে ভূশায়ী হইলেন। শোকের তীব্র উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হইয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্নের মত হইয়া পড়িলেন। এমন সময় ধীরানন্দ নামে আমাদের যুবক-সন্ন্যাসী-সঙ্গী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কন্দরে ঘুমাইতে যাইবে না ?

আ। না, এখন যা'ইব না। পুণ্যবতীর কথাতে আমি হতজ্ঞান হইয়াছি। প্রেমের অনুরূপ আদর যত্ন ও সোহাগ পাইয়াও পুণ্যবতী পার্থিব প্রেমের নিরাশায় কেমন করিয়া যৌবনে যোগিনী হইলেন ? স্নেহেতে ও প্রেমেতে এমন কি জাতিগত প্রভেদ আছে যে একটির অবর্ত্তমানে আর একটি কথার কথা মাত্র বোধ হইতে পারে ?

ধী। ছা উন্মাদ ! পুণ্যবতী সরল হৃদয়েই তাহার মনের কথা তোমার কাছে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রেম ও স্নেহ নিতান্ত স্বতন্ত্র জাতীয় পদার্থ নহে সত্য বটে, কিন্তু এই উভয়েই আবার যে প্রভেদ আছে তাহা। প্রণয়ী-ব্যতীত আর সহজে কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না।

আ। কিন্তু প্রণয়ী আপনার ভ্রমেই সর্ব্বদা ভ্রান্ত। প্রণয়ীর কথায় বিশ্বাস কি ?

ধী। প্রণয়ীর কথায় বিশ্বাস না করিবার কোন কারণ নাই, তবে অঙ্কশাস্ত্রের প্রতিমা স্বরূপ এবং গত বৎসরের 'নূতন পঞ্জিকা' স্বরূপ অনর্থক বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতের বা স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক জন প্রকৃত প্রণয়ীর কথা না মিলিতে পারে কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে ইহা বলিতে পারি যে একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির হৃদয়োচ্ছ্বাসের মত একজন প্রকৃত প্রণয়ী ব্যক্তির হৃদয়োচ্ছ্বাস আপনা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে। কপটতা বা আড়ম্বর সংসারের ভূষণ, কিন্তু তাহা ধার্ম্মিক বা প্রণয়ীর চক্ষে নিতান্ত হেয়। ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র স্বার্থসাধক উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ইতর প্রণয়ীর কথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু উদ্দেশ্যহীন স্বার্থহীন আত্ম-বিসর্জ্জন-কারী প্রকৃত প্রণয়ীর কথাই আমি বলিতেছি।

আ। একজন প্রকৃত প্রণয়ীর কথা নিতান্ত বিশ্বাস করিলেও, কে অস্বীকার করিবে যে সাধারণ সামাজিকতা, উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা, শ্রেষ্ঠতর গুণ বা সম্পর্কের উত্তরে ভক্তি, রক্তের টান বা চক্ষের মিলনে স্নেহ, প্রণয় এবং 'বিনা সূতায় হার গাঁথা' স্বরূপ প্রেম —এই কয়টী বৃত্তিই হৃদয়ে হৃদয়ে

দৃঢ় বন্ধনের সর্ব্ব প্রধান রজ্জু। কিন্তু সামাজিকতা তো নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ও স্বার্থপরতাধীন। ইহা পার্থিব অপেক্ষাও পার্থিবতর। একে ত এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী, পৃথিবীর মধ্যে জনপদ, জনপদের মধ্যে সমাজ, সেই সমাজের অকিঞ্চিৎকর অনুরোধে যে সামাজিকতা, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের পদার্থ। আর কৃতজ্ঞতা—তাহাতে উপকৃত ব্যক্তিরই উপর সমস্ত ভূধর-ভার অর্পিত হয়। কিন্তু তাহার সঙ্গে উপকারী ব্যক্তির আর কি স্বার্থহীন সম্বন্ধ থাকে? অর্থাৎ, উপকৃত ও উপকারী ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের কি মর্ম্মান্তিক সম্পর্ক থাকিবার সম্ভাবনা? ভক্তির কথা যদি উল্লেখ কর, তো একথা কে না স্বীকার করিবে যে ভক্তিতে ভক্তেরই সমস্ত প্রকৃতি নিয়মিত হইয়া পড়ে। যিনি সেই ভক্তির ভাজন তিনি হয় ত সম্পূর্ণ রূপে নিঃসম্পর্কীয় হইয়া থাকিতে পারেন। তাহাতে হৃদয়ে হৃদয়ে যে অকাট্য বন্ধন সম্পাদিত হইতে পারে এ কথা আমি স্বীকার করি না। এখন অবশিষ্ট রহিল কেবল স্নেহ, প্রণয় ও প্রেম। এই তিনটীই সর্ব্বাপেক্ষা উভয়-দেশ ব্যাপী, এই তিনটীই হৃদয়বন্ধনের সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তম রজ্জু, এই তিনটীই সাধারণত ভালবাসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই তিনটীর মধ্যে যে সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা কতক অনুভব করিতে পারিলেও বুঝিতে পারি না যে অবস্থা বিশেষ একটি আর একটির স্থানীয় হইতে পারে না।

ধী। কিন্তু সেই প্রভিন্ন পদার্থের প্রভেদ নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সহজ নহে।

আ। কিন্তু প্রভেদের একটী আদর্শ তো চির বিদ্যমানই আছে—যেমন পিতা পুত্রে স্নেহের সম্পর্ক, বন্ধুতে বন্ধুতে প্রণয়ের সম্পর্ক এবং স্বামী স্ত্রীতে প্রেমের সম্পর্ক।

ধী। কিন্তু স্নেহের সম্পর্ক যে সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে সকল দেশব্যাপী, তাহা আমি স্বীকার করি না। কারণ, স্নেহ নিম্নগামী, ইহা উত্তরোত্তর পুরুষ পরম্পরাক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু উজানে বহিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে জানে না। এই নিম্নগামীত্বই স্নেহের একটি বিশেষ লক্ষণ। সংসার আশ্রমে অনেকবার আমি শুনিয়াছি, শত শত পিতা মাতা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে আমাদের পুত্র কন্যারা আমাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের পৌত্র দৌহিত্রদিগকে অধিকতর ভালবাসে। কিন্তু তাঁহারা ভাবেন না যে তাঁহারাও স্নেহের ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়াই আসিতেছেন। কিন্তু সে যাহাই হউক, স্নেহ প্রণয় ও প্রেম অপেক্ষা দৃঢ়তম রজ্জু আর কিছুই নাই। সাধারণত, অথবা অধিকাংশ স্থলে ইহারা উভয়-দেশ-ব্যাপী। কূপ-

প্রের কঠোর ব্যবহারে, বা বন্ধুর নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতায় বা ঔদাস্যের নির্ম্মম-পীড়নে অনেক স্থলে স্নেহ প্রণয় ও প্রেমের হৃদয়বিদারক অবমাননা দেখিয়াছি সত্য বটে, কিন্তু সে সকল প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত মাত্র। মনুষ্য যদি কোথাও হৃদয়ে হৃদয়ে সম্মিলন দেখিতে পাও, নিশ্চয় জানিবে যে সে স্থানে হয় স্নেহ, না হয় প্রণয় না হয় প্রেম অবশ্যই আছে——এক কথায়, ভালবাসার সম্পর্ক অবশ্যই আছে। এই স্নেহ কখনো ভক্তির সহিত, কখনো কৃতজ্ঞতার সহিত, কখনো আশার সহিত মিশ্রিত হইয়া রৌদ্রস্পৃষ্ট স্ফটিকের ন্যায় নানা বর্ণে ও নানা গুণে প্রতিভাত হয়। ভালবাসা-রূপ এক বৃক্ষে এই স্নেহ, প্রণয় ও প্রেমরূপ তিন প্রকারের পুষ্প বিকসিত হয় এবং সংসার-ক্ষেত্রে এই বৃক্ষ রোপিত না-হইলে সমস্ত সংসারই প্রায় মরুভূমিতে পরিণত হইত।

আ। যদি ঐ তিনটিই এক বৃক্ষের পুষ্প হইল, তাহা হইলে স্নেহ ও প্রণয়ের অপেক্ষা প্রেমের এত মহিমা কীর্ত্তন সর্ব্বত্রই কেন দেখা যায়! পিতা পুত্রের সম্পর্ক, বন্ধুযুগলের সম্পর্ক কি দাম্পত্য সম্পর্ক অপেক্ষা এতই হীনতর যে কেবল প্রেমের কথাতেই সাহিত্য-সাগর, ক্রমাগত তরঙ্গিত হইতে থাকিবে।

ধী। তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। আমি প্রণয়ের কথা এখন উল্লেখ করিব না,—কারণ, প্রণয়, স্নেহ ও প্রেমের মধ্যগত,—ইহাতে কতকটা স্নেহের ও কতকটা প্রেমের প্রকৃতি সম্মিলিত আছে, ইহা প্রয়াগ তীর্থের মত গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল। যে বন্ধুত্বে স্নেহের সঙ্কীর্ণতা ও প্রেমের উদারতা নাই, "দুজনে একজন এবং একজনে দুজন" ভাবের পরিস্ফুট বিকাশ নাই, আমি সে অকিঞ্চিৎকর বন্ধুত্বের, সে অঙ্ক-শাস্ত্র গত প্রণয়ের কথা কহিতেছি না। আমি উচ্চ আদর্শের বন্ধুত্ব, প্রকৃত প্রণয়ের কথাই বলিতেছি।

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

কনক কানন, গীতিনাট্য। শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত, কলিকাতা। মূল্য চারি আনা মাত্র।

অপ্সররাজ-কন্যা শৈলসুন্দরী এক দিন সখীগণ সঙ্গে সাগরে জলক্রীড়া করিতে যান, দূর হইতে তাঁহারা সেখানে একখানি তরী দেখিতে পান। সেই তরীতে সুরনাথ নামক রাজপুত্রকে

দেখিয়া শৈলসুন্দরীর মনে প্রণয় সঞ্চার হয়। পরে কিছু দিন কষ্ট ভোগ করিয়া পরস্পরের মিলন হয়। এই অপূর্ব প্রণয় লইয়া পুস্তক খানি রচিত হইয়াছে। পুস্তকের গল্পের ভাগটী যদিও অতি অল্প তথাপি গ্রন্থকার তাহা বেশ সাজাইয়াছেন, পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি

কবিতা-কল্প-লতিকা। শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত। রাজকীয় যন্ত্রে শ্রীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, লেখকের ভাবুকতা ও কল্পনা যে সুন্দর তাহা আমরা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি। পুস্তক খানির স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রসের যে অবতারণা আছে তাহাও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। আমরা আশা ও ভরসার সহিত গ্রন্থকারের উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া আসিতেছি।

শ্মশান-ভ্রমণ। শ্রীমতী নবীনকালী দেবী প্রণীত। ভবানীপুর ওরিএণ্টাল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন দ্বারা মুদ্রিত ভাদ্র ১২৮৬। মূল্য দুই আনা মাত্র। ইহা এক খানি পদ্য গ্রন্থ। শ্মশান ভ্রমণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি ছোট ছোট পদ্য একত্র করিয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশিত, এ পুস্তক খানির সকল কবিতাগুলি যদিও সুন্দর হয় নাই, তথাপি স্ত্রীলোকের লেখা বলিয়া ইহা প্রশংসনীয়। উদ্‌ভ্রান্ত স্বপ্ন দর্শন নামক প্রথম কবিতাটি সুন্দর হইয়াছে। আজ কাল স্ত্রীলোক গ্রন্থকর্ত্রীদের প্রাচুর্য্য দেখিয়া ভরসা হয় যে একটি আশার সঞ্চার হইতেছে তাহা কালে ফলবতী হইবে সন্দেহ নাই।

বিশ্ববিষ চিকিৎসা। শ্রীহরিমোহন সেন-গুপ্ত প্রণীত, প্রথম ভাগ। কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি উক্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় যেমন সাধারণ-হিতকর তেমনি প্রীতিপ্রদ, ইহাতে বিষাক্ত প্রায় সমস্ত হিংস্রক প্রাণীর বিষের উপযুক্ত ঔষধের বর্ণনা, ব্যবস্থা ও নির্ণয় আছে। পুস্তক খানি এত যত্নে রচিত হইয়াছে ও ইহাতে এত জ্ঞাতব্য কথার বিস্তৃত বিবরণ আছে যে ইহা সকলেরই একবার পাঠ করা উচিত।

প্রমাদিনী। উপন্যাস, প্রথম খণ্ড শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত। নূতন বীডন যন্ত্র। মূল্য ।০ আনা মাত্র। এই ভগ্নাংশ উপন্যাসের আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। এই হস্তলিপি ও ছাপার অক্ষর সম্বলিত পুস্তক খানি ছাপাইতে গ্রন্থকার কেন যে কষ্ট স্বীকার করিলেন তাহা মনোবিজ্ঞানের একটি কূট প্রহেলিকা।

ছিন্নমুকুল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ—অন্ধকারে তারকা।

রাত্রি অবসান প্রায়, ঝটিকাও প্রায় নিবৃত্তি হইয়াছে, আকাশও তেমন অন্ধকার নাই।

সমস্ত নিশার পর্য্যটনে অবসন্ন হইয়া, গাছে, শাখায়, কণ্টকে, দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া, দীনবেশে আলুলায়িত কুন্তলে উন্মাদিনী বালিকা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরস্থ একটি মুক্ত অট্টালিকা-দ্বারে প্রবেশ করিল। দ্বার মুক্ত পাইয়া বরাবর একটি কক্ষে প্রবেশ করিল, সেই খানে কাহারে দেখিয়া বালিকা সহসা অস্ফুট চীৎকার করত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কনক যাহাকে দেখিয়াছিল সে হিরণকুমার। হিরণকুমার এই বাড়ীতে থাকিতেন। এই কক্ষে একটি চৌকিতে তিনি বসিয়াছিলেন। সমস্ত রাত তিনিও চক্ষের পাতা বোজান নাই, যতক্ষণ ঝড় বৃষ্টি হইতেছিল বারান্দায় বসিয়া সেই আঁধার ঝটিকাময় নিশার সহিত আপন অদৃষ্টের তুলনা করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে কেবল একবার তাঁহার সে চিন্তা ভাঙ্গিতে হইয়াছিল। কতকগুলি "পুলিসের লোক" জন কয়েক দস্যুকে ধৃত করিয়া তাঁহার নিকট আনিয়াছিল। সে সকল বৃত্তান্ত অন্য পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইবে। তাহার পর ঝড় অবসানে তিনি গৃহে গিয়া চৌকিতে বসিয়াছেন মাত্র এই সময় সহসা কনককে এই অবস্থায় দেখিয়া তিনিও আশ্চর্য্য হইলেন। কনক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তিনিও অজ্ঞানবৎ তখনি তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া পালঙ্কে শয়ন করাইলেন ও তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে কনকের মোহ ভাঙ্গিল. হিরণকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল,

"তুমি কে? দেবতা? আমি যে তোমাকে ধ্যানে দেখেছি। আমি কি গান গাহিতেছিলাম, মনে করিয়া দেও তো, আমি গাহিব।"

হিরণ দেখিলেন, কনক উন্মাদিনী। তাহার কথা শুনিয়া তাহার সেই মোহময় আলুথালু বেশ দেখিয়া হিরণের বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

বলিলেন, "কনক আমার, আমি যে তোমার হিরণকুমার, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?

উন্মাদিনী বলিল, "হিরণকুমার! কই তোমার মুখ আমাকে ভাল করে দেখাও দেখি।" কনক শয্যা হইতে উঠিয়া বসিল, হিরণকুমারের মুখপানে অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাহার হাতখানি সহস্তে লইয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিল, "ঠিক বলেছ তুমিই হিরণকুমার; হিরণ, একটি গান কর না।

আমি গা'ব? তুমি শুনবে? বালিকা গাহিল,

"আঁধার নিশীথে একা আমি অভাগিনী—

না একি! তুমি দেবতা! কই আমার হিরণ? হিরণ কোথায় গেলেন? হিরণ—হিরণ—বিদেশ—বিদেশ—কি?

বালিকা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শয্যা হইতে উঠিয়া হিরণের পদ গ্রহণ করিয়া বলিল,

"দেব, আমি তোমার পূজা করিব, আমাকে বর দেও. আমার হিরণ কোথা?" হিরণকুমার তাহাকে উঠাইয়া রোদন করিতে করিতে বলিলেন,

"কনক, আমি যে তোমার হিরণ, কেন কনক তুমি উন্মাদিনী হইলে?"

কনক বলিল, "তুমি দেবতা, তুমিও কাঁদ, সকলেই কি কাঁদে, তবে আমিও কাঁদি। বালিকা হিরণের গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হিরণ তাহাকে শোয়াইবার জন্য হাত ধরিয়া বিছানায় বসাইয়া বলিলেন' "কনক, শোও দেখি।"

নিদ্রায় শান্তি পাইয়া যদি কনকের জ্ঞান জন্মে, সেই জন্য তাহাকে ঘুম পাড়াইতে হিরণ ব্যস্ত হইলেন।

কনক বলিল "তুমি বসে থাকবে, আমি শোব কেন? তুমি দেবতা তুমি আগে শোও।"

হিরণ নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "তুমি না শুইলে দেবতা রাগ করবে, তোমার কি ভয় হইতেছে না।"

ক। "রাগ করবে? তবে আমি পালাই।" বলিয়া বালিকা আপন আলু চুল লইয়া খেলিতে খেলিতে গুণ গুণ করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিছানা হইতে উঠিল। হিরণ বিপদে পড়িয়া বলিলেন "না, না, রাগ করব না, তুমি শোও দেখি।" বালিকা তাঁহার কথা না শুনিয়া আপন মনে হাসিয়া উঠিয়া উল্লাসে করতালি দিয়া বলিল;

"মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, সেই সুর! তোমার সেতার কই, বাজাও আমি গাই,

ধরি সুর তানে মরমের গানে,
অবাধে, লো সই, গাহিব আজ
প্রাণ যারে চায়, মিলিবে লো তায়
লোকের কথায় পড়িবে বাজ।

হিরণ সেতার বাজাইতে জানিতেন, তাঁহার সেই ঘরেই সেতার ছিল; তিনি বলিলেন, "তুমি যদি শোও, তা' হলে আমি সেতার বাজাব। হিরণকুমার তাঁহার সেতারটি আনিলেন। বালিকা সেতার শুনিতে বড় ভাল বাসিত, সে তাহা শুনিবার আশায় বিছানায় আসিয়া শয়ন করিল, বাজনার মধুর তানে কনককে ঘুম পাড়াইবার জন্য হিরণ আস্তে আস্তে সেতার বাজাইতে লাগিলেন। বালিকা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,

"কই, কই, তোমার সে হাসি কই, তুমি আজ হাসবে না? তুমি যে আমার হিরণকুমার, একটিবার হাস দেখি।"

উন্মাদিনীর কথায় হিরণকুমারের ওষ্ঠা-

ধর ঈষৎ বিষাদময় হাসির রেখায় অঙ্কিত হইল, তাহা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বালিকার চক্ষু বুজিয়া আসিল, ক্রমে ক্রমে সেই পদ্মনেত্র নিমীলিত হইল, বালিকা ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার সেই ঈষদ্ভিন্ন ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসির রেখা শোভিত হইয়াই রহিল।

হিরণকুমার তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত চিত্তে সেতার রাখিয়া সেই সুষুপ্ত-মুখ-কান্তি দেখিতে লাগিলেন। পাছে নিদ্রাভঙ্গ হয় সেই ভয়ে হিরণকুমার প্রতিক্ষণে ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। প্রত্যেক বায়ুর শব্দে হিরণের ভয় হইতে লাগিল বালিকা উঠিয়া পড়িবে। তিনি ভয়ে ভয়ে যাহাতে তাহার ঘুম না ভাঙ্গে তাহা দেখিতে লাগিলেন। এই সময় সহসা মনুষ্য-পদ-শব্দ হইল, হিরণ অমনি ভয়ে ভয়ে সেই দিকে কাণ পাতিলেন। পাছে এ গৃহে কেহ আসিয়া কনকের নিদ্রা ভঙ্গ করে—এই তাঁর ভয়। পদ-শব্দ আরো সুস্পষ্ট হইল, বুঝিলেন গৃহমধ্যে এখনি কেহ প্রবেশ করিবে। তিনি তাহা নিবারণ করিতে অতি ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহ হইতে উঠিয়া গেলেন।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ—নৌকা-যাত্রা।

এদিকে প্রমোদ ও নীরজা ঝড়ের উপক্রম দেখিয়া তীরে বোট লাগাইতে কহিলেন। কিন্তু বোট না লাগাইতে লাগাইতেই প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল, মাঝিরা অতিশয় যত্ন করিয়াও শীঘ্র তীরে বোট লাগাইতে পারিল না। ঝড়ের অপ্রতিহত প্রভাবে বোট ক্রমাগত, উজানে তাঁহাদের বাটীর দিকেই যাইতে লাগিল; মাঝিরা ক্রমে হাল ছাড়িয়া দিবার উদ্যোগ করিল। প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল, এক একবার কেবল বিদ্যুতের আলোকে গঙ্গার রুদ্র মূর্ত্তি, ও ছোট ছোট চূর্ণিত নৌকাগুলির ভাসমান ভগ্নাংশ দৃষ্ট হইতে লাগিল। নীরজা প্রমোদের ভয়-বিহ্বল বক্ষে মস্তক রাখিয়া অজ্ঞান প্রায় হইয়া পড়িলেন। প্রমোদ নিরাশায় বলে বলিষ্ঠ হইয়া মাঝিদিগকে উচ্চৈঃস্বরে বোট বাহিতে আজ্ঞা দিতে লাগিলেন।

এদিকে বোট বায়ুভরেই প্রধাবিত হইয়া কখনো নীচে কখনো উচ্চে, কখনো যেন পাতালে কখনো যেন পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের বাটী আর বহুদূর নাই কিন্তু বোটও আর তিষ্ঠায় না। বাতাসের একটি প্রবল ঝঙ্কারে বোটের মাস্তুল ভাঙ্গিয়া কোথায় উড়িয়া গেল, পরে বোট খানিও তরঙ্গপ্রভাবে তীরে ধাক্কা খাইয়া বিচূর্ণ হইল।

সুখের বিষয় এই যে প্রমোদ নীরজাকে বক্ষে লইয়া কূলে লাফাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন। অজ্ঞান প্রায় নীরজা-বক্ষে তিনি কিনারাধ কিনারায় বাটী অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু একে সেই বৃষ্টিধারাযুক্ত বাতাসের প্রবল আঘাত, তাহাতে আবার

উন্মূলিত বৃক্ষশাখা প্রভৃতি পদে ঠেকিয়া প্রতিপদে তাঁহার গমনে বাধা দিতে লাগিল। তিনি সত্বর অগ্রসর হইতে না পারিয়া মূর্চ্ছাপন্ন নীরজাকে লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সহসা কিছু দূরে বৃক্ষের অন্তরালে ক্ষীণ-দীপালোক দৃষ্ট হইল, আশার আশ্বাসে তীর ছাড়িয়া বৃক্ষ কণ্টকাদির আঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দ্রুতপদে তিনি সেই দিকে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর আসিলে সেই আলোকটিও তাঁহার চক্ষের অগোচর হইল; তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। নীরজাকে লইয়া তিনি কোথায় যান? বৃক্ষতলে দাঁড়াইবার যো নাই, প্রতিক্ষণে ঝড়ের বেগে শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তিনি নিরাশ চিত্তে অজ্ঞান প্রায় চলিতে লাগিলেন। সহসা সেই ঝড়-বৃষ্টিগর্জ্জনের মধ্যে কোন মনুষ্যের কাতর-চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। সহসা সেই সময় বিদ্যুতালোকে তিনি দেখিলেন, "এক জন মনুষ্য তাঁহার নিকট দিয়া অতি দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। আর একবার বিদ্যুৎ হাসিল, তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে কিছু দূরে এক ধবলাকার পদার্থ। ভগ্ন-অট্টালিকা হইবে আশা করিয়া সেই দিকে আসিলেন, কিন্তু সেখানে আসিয়া বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একজন মৃতপ্রায় মনুষ্য কষ্ট-ব্যঞ্জক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিতেছে।

প্রমোদ বুঝিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তাহারি চীৎকার তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। এবং যে ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট দিয়া পলায়ন করিতে দেখিলেন, ভাবিলেন, সেই ইহাকে আহত করিয়া গিয়াছে।

মূর্চ্ছাপন্ন নীরজা বক্ষে, সম্মুখে মুমূর্ষু ব্যক্তি, হয়তো যত্ন করিলে সে এখনো বাঁচিতে পারে, প্রমোদ যে কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় আর এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, সে আসিয়া প্রমোদকে এবং ভূ-পতিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় আপনারা বিপদে পড়েছেন? আমি চীৎকার শুনেই দৌড়ে এসেছি, কাছেই এই গাছের আড়ালে আমার কুটীর, সেইখানে চলুন।"

তাহাকে দেখিয়া প্রমোদ যেন প্রাণ পাইলেন; বলিলেন, "আমি বিপদে পড়িয়া আসিতে আসিতে এই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে দেখিলাম, কিন্তু আমার ক্রোড়ে এই অজ্ঞান স্ত্রীলোক, সুতরাং এই মুমূর্ষুর যত্ন করিতে অক্ষম, তুমি তবে উহাকে লইয়া কুটীরে চল।"

সে বলিল, "আপনি তবে যান, আমি ইহাকে লইয়া যাইতেছি।"

নীরজাকে লইয়া প্রমোদ তখন সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির কুটীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, গৃহপার্শ্বে একটি অগ্নিপাত্র, তিনি তাহার নিকটে একটি মাদুরে নীরজাকে শয়ন করাইয়া উত্তাপ দিতে দিতে ক্রমে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল।

এদিকে অপর ব্যক্তি সেই আহত

ব্যক্তিকে কুটীরে আনিয়া দেখিল, একটি পিস্তলের গুলি তাহার স্কন্ধ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু বুঝিল তাহা সাংঘাতিক হইবে না—যত্নে সে বাঁচিতেও পারে। তাহাকে একটি মাদুরে শয়ন করাইয়া, কুটীর-স্বামী ক্ষতস্থান বন্ধনের পর তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে নীরজাও সজ্ঞান হইয়া বসিল। তখন প্রমোদ সুস্থির হইয়া আহত ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নীরজাও বসিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র সহসা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, প্রমোদও সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিলেন। চিনিয়া নীরজা পিতার নিকট আসিয়া ব্যাকুলভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহাদের যত্নে সন্ন্যাসী অনেক শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার কথা কহিবার সামর্থ্য জন্মিল। তখন তিনি অতিব্যগ্রে বলিয়া উঠিলেন,

তোমরা একজন কেহ এখনি পুলিসে যাও। নহিলে আজ এখনি হত্যাকাণ্ড হইয়া যাইবে।"

সকলে আশ্চর্য্য ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল, যেন তাঁহার কথার অর্থ বুঝিতে অক্ষম। পিতাকে কথা কহিতে দেখিয়া আহ্লাদে নীরজা তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। সন্ন্যাসীও আহ্লাদে অভিভূত হইয়া কথা কহিতে অক্ষম হইলেন। সন্ন্যাসীকে ঈষৎ সুস্থ দেখিয়া কুটীর-স্বামী বলিল "মহাশয়, আর কিছুই ভয় নাই, গুলি বের হয়ে গেছে। অল্প দিনেই আরাম হবেন। কিন্তু কি ক'রে এ রকম হোলো?" কুটীর-স্বামীর প্রতি এবার প্রমোদের দৃষ্টি পড়িল, তিনি তাহাকেও চিনিতে পারিলেন, তাঁহাতে আশ্চর্য্য হইলেন, দেখিলেন সে যামিনীর পূর্ব্ব-ভৃত্য, যখন তাঁহারা কানপুর বেড়াইতে যান সে তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছিল। নীরজাও তাহাকে চিনিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে বলিয়া উঠিল "আমি কি ঠিক দেখিতেছি? তুমি কি সেই নৌকার দয়াবান দাঁড়ি নও? তুমিই কি আমায় অসীম বিপদ মধ্যে প্রথমে আশ্বাস দাও নাই?"

নীরজা পিতার গলদেশ ছাড়িয়া উঠিল; কুটীর-স্বামী সন্ন্যাসীর মুখে ঔষধ দিতে দিতে বলিল, "হাঁ আমিই সেই দাঁড়ি।" পরে সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মহাশয় আর তো কিছুই ভয় নাই। আপনি কি করে এমন বিপদে পড়িলেন, সেইটি এখন বলুন।"

সন্ন্যাসী আরো কিছু সামর্থ্য পাইয়া বলিলেন, "আমি প্রয়োজন বশত প্রয়াগে একটি দেবালয়ে আসিতেছিলাম। আসিতে আসিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, কি করি পথে একটি ভগ্ন দেবালয় মধ্যে আশ্রয় লইলাম। অনেকক্ষণ হইল, ঝড় থামিল না, কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম তিন চারি জন মনুষ্য সেই দেবালয়ের দিকে আসিতেছে। বিদ্যুতালোকে তাহাদিগকে দেখিয়াই আমার দুষ্ট লোক বলিয়া বোধ হইল। ক্রমে তাহারা দেবালয়ের নিকটেই

আসিল কিন্তু গৃহমধ্যে না চকিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া কি কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিল—'

সকলেই উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কি কথা শুনলেন ?"

স। "আমি সকল কথা শুনিতে পাই নাই। কিন্তু কথার মধ্যে মধ্যে দুই একটা যা শুনিলাম তা'তে তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া চমকিয়া উঠিলাম—"

ব্যগ্রে আবার সকলে জিজ্ঞাসা করিল "কি বুঝিলেন ?"

স। "বুঝিলাম হিরণকুমার বলিয়া এক ব্যক্তিকে বধ করিতে যাইবার অগ্রে তাহারা কয় জনে মিলিয়া আর একজন সঙ্গীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অনেক ক্ষণ হইল সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তি না আসায় ঝড় বৃষ্টিতে আর অধিক ক্ষণ অপেক্ষা করিতে না পারিয়া একজন বলিল, "আর কতক্ষণ এরূপে এখানে থাকিব ? চল যাওয়া যাক।" আমার মনে হইল এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল।"

অন্য সকলে। 'তা'র পর।'

স। "তা'র পর, তাহারা গিয়াছে ভাবিয়া আমি ঐ অভিসন্ধির কথা গুলি প্রকাশের অভিপ্রায়ে ব্যগ্রভাবে মন্দির হইতে বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, দস্যুদের মধ্যে একজন তখনো যায় নাই, কেবল মাত্র সেই যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সে বুঝিল আমি তাহাদের সকল কথা শুনিয়াছি, অমনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িল, আমি পড়িয়া গেলেম, পরে কি হইল জানি না। যাহা হৌক, এখনি এ অভিসন্ধির কথা পুলিসে সংবাদ দেওয়া আবশ্যক।"

প্রমোদ বলিলেন, "অস্তবিকই, তা' না হ'লে এ হত্যাকাণ্ড থামাইবার আর উপায় নাই।"

কুটীর-স্বামী এই কথায় সেই ঝড়-বৃষ্টিতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পুলিসে সংবাদ দিতে চলিল।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পাপের ফল।

কিছু পরে গৃহস্বামী কুটীরে প্রত্যাগমন করিল; তাহার মুখ-চক্ষু ক্রোধ-পরিতৃপ্তি-জনিত-হর্ষ-বিকম্পিত। সে আসিয়া প্রমোদকে বলিল, "মশায়, খুনীদের মধ্যে যে প্রধান সেও ধরা পড়েছে। তিনি কে শুনবেন ?—তিনি আপনার বন্ধু যামিনী বাবু, আমার আগেকার মনিব।"

শুনিয়া প্রমোদ ও নীরজা অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, সন্ন্যাসী একটু শান্তি পাইয়া তখন অল্প ঘুমাইতেছিলেন, তিনি একথা শুনিতে পাইলেন না। প্রমোদের কিন্তু ও কথায় বিশ্বাস হইল না, তথাপি তিনি আশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যামিনীবাবু ইহার মধ্যে কি করিয়া আসিবেন ? তিনি তো কলিকাতায়।"

সে বলিল, "মশায়, সবটা শুনুন তো; আমি পুলিসে খবর দিলেই অমনি জনকতক পুলিসের লোক এসে হিরণবাবুর বাড়ীর

দুই পাশে লুকিয়ে রইল, আমিও তাদের সঙ্গে রইলাম।"

প্রমোদ বলিলেন, "একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করি, হিরণকুমারটা কে? সেকি এখানকার কোন বাসেন্দা?

গৃহ। "না, তিনি আলিপুরের ডিপুটি মেজিস্ট্রেট, অল্পদিন হ'ল এখানে এ সেছেন।"

প্রমোদ বুঝিলেন, সে কোন্ হিরণকুমার কিন্তু কিছুই বলিলেন না। গৃহস্বামী আবার বলিল,

"আমরা লুকিয়ে আছি, কিছু পরে চার-জন লোক আস্তে আস্তে এসে সদর দরজা হতে কিছু দূরে একটি পাঁচীলের কাছে দাঁড়াল, আর একজন দরজা খোলা দেখে আস্তে আস্তে ভিতরে ঢুকলো। তখনি আমরা সেই পাঁচ জনকেই ধ'রে ফেললাম, তা'র ভিতর দেখি—যামিনী বাবু একজন।'

প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন, "তিনি তবে সেই সময় আর কোন কারণ বশত হিরণের নিকট যাইতেছিলেন, এক সঙ্গে ধরা পড়ে ঐ দলে মিশিয়ে গিয়াছেন।"

প্রমোদের অবিশ্বাস বাক্যে সে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আপনি যামিনী বাবুকে দোষী মনে করছেন না। কিন্তু তাঁর স্বভাব জানলে আর ওরূপ ভাবতেন না। তিনিই তো আমার এই দশা করেছেন, তাঁর ভয়েই তো আমায় দেশ পরিবার ছেড়ে এই অব-স্থায় থাকতে হয়েছে। আমার অপরাধের মধ্যে তাঁর কথায় আপনাকে মারতে রাজি হই নি।"

তখন রামধন নীরজার অপহরণের কথা, প্রমোদের হত্যা-সংকল্পের কথা, যাহা যাহা হিরণকুমারকে ইতিপূর্ব্বে বলি-য়াছিল সমস্তই বলিল। বলিতে বলিতে তাহার মুখ চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। শুনিয়া নীরজার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইয়া আসিল, প্রমোদ যদিও কিছু বিস্মিত হইলেন কিন্তু অপ্রত্যয় ভাবে বলিলেন, "যামিনী যে আমার হত্যা মানস করিয়াছিলেন, ইহা তো হইতেই পারে না, আমি আসল হত্যাকারীকে পিস্তল হস্তে স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

গৃহ। "তাতো হ'তেই পারে, যামিনী বাবু তো আর নিজে মারতে যান নি।"

প্র। "না না আমি কোন ভদ্র লো-ককে পিস্তলহস্তে ছুটিয়া আপন বাড়ী ঢুকতে দেখিয়াছি, সে ব্যক্তি তো আর যামিনীর চাকর নয়।"

গৃহস্বামী শুনিয়া বলিল, "বুঝেছি আপনি কাকে দেখেছেন? বোধ করি হিরণ বাবুকে দেখে থাকবেন।"

প্রমোদ আশ্চর্য্যে বলিলেন, "তাহা তুমি কি প্রকারে বুঝিলে?"

সে বলিল "আমার বন্ধুর কাছে আগে শুনেছিলাম যে একটি ভদ্রলোক সে পিস্তল কেড়ে নিয়েছিলেন, তার পর সেদিন হিরণ বাবুর নিকট শুনলাম, তিনিই সেই ভদ্র লোক।" রামধন হিরণের বাড়ী গিয়া যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তখন সেই সকল ব'লল।

প্রমোদ বলিলেন, "হিরণ তো ওরূপ

বলিতেই পারে তাহার কথায় বিশ্বাস কি? তোমার বন্ধুর মুখে কি শুনিয়াছ?" ভৃত্য প্রথমে তাহা বলিতে অস্বীকৃত হইল, শেষে, পাছে প্রমোদ শুনিলে বন্ধুর কোন হানি হয়, কিন্তু প্রমোদের সাহস-বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া বলিল,

"আমার বন্ধু যামিনী বাবুর একজন চাকর। আমি মারতে নারাজ হ'লে, টাকার লোভে সে এবং আর একজন রাজি হয়ে আপনাকে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক না হওয়াতে দু'বারই তাদের চেষ্টা মিছে হয়। তখন আপনি তাদের ধরতে যাওয়ায় তারা ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়।"

প্র। "তাহা তো আমি জানি, আমি দু'জনকে পলাইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাহারা যে যামিনীর ভৃত্য তাহা আমি বিশ্বাস করিব কেন?"

গৃহস্বামী। "শুনুন না মশায়। পিস্তলের শব্দ শুনেও তারা পালাচ্ছিল দেখে চোর কিম্বা দুষ্ট লোক মনে করে পথে একজন ভদ্রলোক তাদের ধরতে যান, তখন জানতাম না ভদ্রলোকটি কে, কিন্তু আপনাকে তো বলেছি, যে তার পর দেখছি ভদ্রলোকটি হিরণ বাবু। হিরণ বাবুকে দেখে তখন দু'জন দুই দিকে পালাল। যে ব্যক্তির হাতে পিস্তল ছিল, হিরণ বাবু দৌড়ে তার উপর এসে পড়ে তার হাত ধরতে গেলেন ভাগ্যে হাতের বদলে হিরণ বাবু পিস্তল ধরেছিলেন, তাই সে ব্যক্তি পিস্তল ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে পালাল। হিরণ বাবু তাকে আর ধরতে না পেরে চ'লে গেলেন। এই সকল কথা পরদিন আমার বন্ধুটি আমোদ করে আমাকে বলেছিল। আপনি বোধ হয় হিরণ-বাবুকেই পিস্তল হাতে দেখে থাকবেন।"

শুনিয়া প্রমোদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, তথাপি সম্পূর্ণ রূপে যামিনীকে দোষী ভাবিতে পারিলেন না। পরে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান করিতে স্থির করিলেন। এই সময় এক জন বৃদ্ধা এই কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা সেই ভৃত্যের মাসী। সে কিছু দূরে পর পারে, একটি দেবালয় দর্শনে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিবার সময় ঝড় বৃষ্টি পাইয়া ভিজিতে ভিজিতে অবশেষে গৃহে আসিল। এখানে অনেক লোক জন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার বোনপোর নিকট শুনিল ইঁহারা ঝড় বৃষ্টিতে কাতর হইয়া এই কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন। তখন বৃদ্ধা আস্তে আস্তে আসিয়া অগ্নির নিকট বসিয়া হস্তপদ সেঁকিতে সেঁকিতে অর্দ্ধেক আপন মনে অর্দ্ধেক প্রকাশ্যে বলিল,

"তা বাপু বেশ—এই ঝড় বৃষ্টি—এ সময়ে কি পথ চলা যায় বাপু! তোমরা এসেছ বেশ করেছ—বাবা! কি এক রোখা মেয়ে গা?"

প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? কে বাপু?"

নীরজা ভাবিল, বৃদ্ধা তাহাকে ভাবিয়াই বলিতেছে, ঈষৎ ক্রুদ্ধ ঈষৎ অপ্রস্তুত ভাবে সে বলিল, "কেন বাপু আমি কি

করিয়াছি, আমাকে কিসে একরোকা দেখিলে ?"

বৃদ্ধা। "তুমি কেন গো ? আজ এই দুপোরের সময় নৌকা হতে কত কষ্টে বেঁচে যখন নদীর ধার দিয়ে বাড়ী আসছিলেম তখন একটি পাগল মেয়ে,—আহা ! এমন সুন্দর মেয়ে কেউ কখনো দেখেনি —একেবারে উন্মত্ত হয়ে দেখি ছুটে ছুটে বেড়াচ্চে। আহা ! এক রাশি চুল সব এলোথেলো, বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে সব সোটা সোটা হয়ে পড়েছে, তা দিয়ে আবার ঝর ঝর জল ঝরছে।"

প্রমোদ ও নীরজা দু'জনেই একত্রে বলিয়া উঠিলেন, "আহা কাদের মেয়ে গা ?"

বৃদ্ধা। "ওগো, কাদের মেয়ে জানি না, কেবল গান গায়। আমি শুধালাম, 'তুমি কাকে খুজছ গা ?' তা' সে বল্লে,

'হিরণ হিরণ সোনার বরণ,
ঘাঁরি হাতে বাঁচন মরণ।"

এই কথায় প্রমোদ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "এ তো আমাদের কনক নয় ? তাহার বয়স কত গো ?"

বৃদ্ধা। "এই বাপু চৌদ্দ পনের বৎসর।'

এই কথা শুনিয়া নীরজা ও প্রমোদ যেন বজ্রাহত হইলেন ; অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত প্রমোদ নীরজাকে বলিলেন "তুমি এইখানে থাক। আমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এ কনক, আমি তাকে খুঁজে আনিগে।"

নীরজা বলিল, "কনক যদি এতক্ষণে আর যাবের মত জলেই বা পড়ে গিয়ে থাকে ?"

বৃদ্ধা। ওগো সে মেয়েটি জলে পড়েনি গো, আমি তাকে বল্লেম 'আমার সঙ্গে আসবে', তা সে অমনি গান গাইতে গাইতে ঐ সব বাড়ীর ভিতর ঢুকলো, তার পর কি হয়েছে জানি না।"

বৃদ্ধা প্রমোদের সহিত কুটীরের বাহিরে আসিয়া সেই বাড়ী অঙ্গুলি দ্বারা চিনাইয়া দিল। তখন বিদ্যুতের মত প্রমোদ সেই কুটীর হইতে বাহির হইয়া সুদূরে সেই বাড়ীর নিকট দৌড়িলেন। উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে উঠিলেন। কিন্তু হিরণ মনুষ্য-পদ-শব্দ পাইয়াই কক্ষের বাহিরে আসিলেন। প্রমোদ উন্মত্তের ন্যায় হিরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কনক কোথায় ?' কথার গোলে পাছে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে হিরণকুমার তাহাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "এই কক্ষে, কিন্তু চুপ ! চুপ ! কনক ঘুমাইতেছে, গোল করিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে,এখন ও ঘরে যেয়োনা।' প্রমোদ তাহার কথা অগ্রাহ্য করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। হিরণকুমার ব্যাকুল-ভাবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। কনকের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া প্রমোদ মনের ব্যগ্রতা ভরে ডাকিলেন, "দিদি আমার, কনক।" হিরণ তাহা শুনিয়া মৃদুস্বরে ব্যাকুল ভাবে বলিলেন, "চুপ ! চুপ ! এখনি কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" প্রমোদ সে কথা না শুনিয়া

আবার কনকের গলদেশ বেষ্টন করিয়া ডাকিলেন, "দিদি আমার, কনক ওঠ ওঠ আমার সহিত একটিবার কথা কও"

কনক কাঁদিয়া উঠিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া।

নিদ্রার মত মনের ব্যাধির পরম ঔষধ আর কিছুই নাই। কিছুক্ষণ ঘোর নিদ্রা মগ্ন থাকায় কনক যখন জাগিল, তখন যেন তাহার ভ্রংশ-বুদ্ধি কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। কিন্তু সহসা প্রমোদকে সেই আদরের ভাবে কথা কহিতে দেখিয়া, সম্মুখে হিরণকুমারকে ম্লান বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া, সে যেন কিছুই বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মুখে আনন্দ বিভাসিত হইল। তাহাকে জাগ্রত দেখিয়া প্রমোদ আহ্লাদে বলিলেন, "কনক, আমি তোমার কাছে কত অপরাধে অপরাধী, কনক, দিদিটি আমার, আমি সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব; হিরণ যাহাই হৌক আমি তোর সঙ্গে বিবাহ দিবই দিব

অমনি সমস্ত ঘটনা কনকের মনে পড়িয়া গেল, ভ্রাতার নিষ্ঠুরতা, হিরণের পর্য্যন্ত নিষ্ঠুরতা মনে পড়িল। কতদিন পরে তাহার ভাই তাহাকে আদর করিয়া ডাকিলেন, আবার হিরণকুমার তাহার শয্যার পাশেই রহিয়াছেন, কনকের হঠাৎ এত আহ্লাদ আর সহ্য হইল না, কনক আবার অন্ধকার দেখিল, মস্তক আবার ঘুরিয়া আসিল, হৃদয়ে রক্তের প্রবাহ ভীষণ বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; কনক বলিল, "দাদা, ওরূপ আদরের কথা আমি যে তোমার মুখে অনেক দিন শুনি নি, আমার ভাগ্যে যে আর এরূপ সুখ কখনো হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি—"

কনকের উপধান অশ্রুসিক্ত হইয়া প্রমোদের হাত ভিজিতে লাগিল। আবার একবার ঈষৎ লজ্জা ঈষৎ অভিমান, ঈষৎ বিষাদে অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে হিরণকুমারের পানে চাহিল, অস্ফুট স্বরে বলিল,

"হিরণকুমার, এ জনমে আর হৃদয়ের সাধ পূরিল না—কিন্তু ঈশ্বর-উপাসনার যদি ফল থাকে, বিশুদ্ধ প্রেমের যদি পুরস্কার থাকে, তা হলে মরণে আমার দুঃখ নেই, তা' হলে পরলোকে আমাদের মিলন হবেই হবে' অতি কষ্টে এ কথা গুলি কহিয়াই কনক থামিল। কনকের কথার মর্ম্ম যেন হিরণকুমার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, যাতনা-ব্যঞ্জক শূন্য দৃষ্টিতে কেবল তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন মাত্র। প্রমোদ আর কান্না সামলাইতে পারিলেন না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। কনক আবার কথা কহিবার ইচ্ছায় মুখ খুলিল, অতি ধীরে ধীরে, অতি কষ্টে বলিল—"হিরণকুমার, আর যে দেখতেও পাচ্চিনে, একটিবার কাছে স'রে এস, শেষবার ভাল করে—"

এইটুক বলিয়াই কনক আবার ঢলিয়া পড়িল; আর কথা কহিল না। প্রমোদ বলিলেন, "দিদি আমার, অমন করিতেছ

কেন? কনকের যন্ত্রণা বুঝিতে পারিয়া প্রমোদ কাঁদিয়া উঠিলেন; হিরণকুমার পাগলের মত প্রমোদকে বলিলেন, "চুপ! চুপ! কনকের ঘুম আসিতেছে, তুমি ঘুম ভাঙ্গাইও না।"

হিরণ আস্তে আস্তে কাছে বসিয়া শিশুর ন্যায় তাহাকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। কনক আর একবার কষ্টে চক্ষু খুলিয়া হিরণকে দেখিল, তাহার ওষ্ঠাধর মৃদু হাসো শোভিত হইল, মুখখানি একটি অপূর্ব্ব সুখের ভাবে পরিপ্লুত হইল, কনকের আবার চক্ষু মুদিয়া আসিল, ভ্রাতার হস্তে মস্তক রাখিয়া কনক অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল, না ফুটিতেই মুকুল ঝরিয়া পড়িল; দীপ জ্বলিয়াই নির্ব্বাণ হইল।

প্রমোদ বুঝিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, হিরণকুমার আবার বালকের মত বলিলেন, "কাঁদিও না, কনকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইবে।" হিরণের আশাই পূর্ণ হইল, কনকের ঘুম আর কখনই ভাঙ্গিল না; কুসুম-কলিকা ছিন্ন হইল।

উপসংহার।

আরো কয়েক বৎসর অতীত হইল। এই অল্প কালের মধ্যেই ধ্বংশ-শীল জগতের ক্ষতিগ্রস্ত ভাগ কত পূরিয়া উঠিল। কত দরিদ্র ধনবান হইল, কত পলাতক রাজা আবার আপন রাজ্যে অধিবেশন করিল। যে স্থান শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল তাহা আবার পুনর্জ্জীবিত হইল। এই অল্প কালের মধ্যে কত মাতার পুত্র-শোকের লাঘব হইয়া আসিল; কত বন্ধু বন্ধুর শোক ভুলিলেন, কত পত্নীব্রত স্বামী, যাঁহারা একদিন স্ত্রীর নিকট শপথ করিয়া বলিয়াছিলেন, স্ত্রীর মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদেরও প্রাণ বিয়োগ হইবে, যাঁহারা স্ত্রীর মৃত্যু কল্পনামাত্র করিতে শিহরিয়া উঠিতেন, তাঁহারা আবার দ্বিতীয়বার স্ত্রী-গ্রহণ করিয়া সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রমোদও এই অল্পকাল মধ্যে কনককে ভুলিলেন, কেবল মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্নের ন্যায় কখনো কখনো কনকের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইত মাত্র। প্রমোদের এখন একটি কন্যা ও একটি পুত্র হইয়াছিল, তাহাদের দেখিয়া কখনো কখনো প্রমোদের শৈশব কাল মনে পড়িত, কখনো কখনো কনকের কথা মনে পড়িয়া একটু কষ্ট হইত, কিন্তু আবার নীরজার মুখপানে চাহিলেই সকল ভুলিয়া যাইতেন।

কনকের মৃত্যুর পর হইতে হিরণের উপর আর প্রমোদের বিশেষ ভাব রহিল না। হিরণের তিনি বিশেষ বন্ধু হইয়া পড়িলেন, হৃদয়ের সহিত তাঁহার দুঃখে সমদুঃখী হইতেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে যে ব্যক্তির বিন্দুমাত্র দয়া পাইলেও হিরণ চিরসুখী হইতে পারিতেন, এখন তাহার কাছ হইতে সহস্র মমতা পাইয়াও তাঁহার দুঃখের ভার কিছুমাত্রও কমিল না। অনেক ক্ষতি কালে পূরণ হয় বটে, কিন্তু সকল রূপ ক্ষতি কাল পূরণ করিতে পারে

না—মানুষ কত যাতনা কাল নিভাইতে পারে না। কত কত সমুদ্র লোপ হইয়াছে কালে তাহার চিহ্নমাত্রও নাই, কত মহানগরী ধ্বংস হইয়াছে এখন তাহার নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে, কত পর্ব্বতশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহা আর ওঠে নাই, হিরণেরো ভগ্ন-হৃদয় আর জোড়া লাগিল না; তাঁহার হৃদয়-আগুণ আর নিভিল না।

একদিন প্রত্যূষে প্রমোদ উদ্যানে বেড়াইতে বেড়াইতে নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন জলের অব্যবহিত উপরের সোপানে এক ব্যক্তি শয়ান, মাঝে মাঝে সোপান-প্রতিহত জলরাশি উচ্ছ্বলিত হইয়া তাহার অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িতেছে, সে ব্যক্তির তাহাতে চেতনা নাই, যেন গভীর নিদ্রাভিভূত। প্রমোদ নিকটে আসিলেন, শোকবিহ্বল চিত্তে দেখিলেন, সে ব্যক্তি হিরণকুমার—দেখিলেন হিরণকুমার মৃতবৎ। প্রমোদ নিকটে আসিয়া তাহাকে সোপানে হইতে উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, আস্তে আস্তে তখন হিরণকুমার একবার চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তাঁহার অশ্রুপূর্ণ নেত্র প্রমোদের চক্ষুতে সংলগ্ন করিয়া অতিম কালের যাতনাকম্পিত স্বরে বলিলেন, "আমায় উঠাইও না—আমি এইখানেই মরিব, এই খানেই শুনিয়াছিলাম, কনক আমায় ভালবাসে।"

বলিতে বলিতে হিরণ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল; প্রমোদ বিষাদ-আকুল চিত্তে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হিরণের এই শেষ কথাগুলি অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার মনে ছিল।

সমাপ্ত।

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আমাদের ব্রাইটনের বাড়িটি সমুদ্রের কাছে একটি নিরালা জায়গায়, এক সার ২০। ২৫ টি বাড়ি, বাড়িগুলির নাম হোচ্চে midina villas। villa শুনলে তোমাদের হঠাৎ মনে হবে বাগান-বাড়ি; আমি লণ্ডন থেকে যখন প্রথম শুনলুম যে, আমরা মেদিনা ভিলায় বাস কোর্ত্তে যাচ্চি, তখন কত কি কল্পনা কোরেছিলুম তা'র ঠিক নেই, বাগান, গাছ, পাতা, ফল, ফুল, মাঠ, সরোবর ইত্যাদি ইত্যাদি। বাড়িতে এসে যে দিকে চেয়ে দেখি, সেই দিকেই বাড়ি ঘর রাস্তা গাড়ি ঘোড়া, "ভিলা"র মধ্যে আমাদের বাড়ির সামনে দু চার হাত জমীতে দু চারটে গাছ পোঁতা আছে। বাড়ির দরজায় একটা লোহার কড়া (knocker) লাগানো আছে, সেইটেতে ঠক্ ঠক্ কোর্‌লেম, আমাদের land lady এসে দরজা খুলে দিলে। আমাদের দেশের

তুলনায় এখানকার ঘরগুলো লম্বা চোড়া ও উঁচুতে ঢের ছোট। ছোট ছোট ঘর গুলো চারদিকে জানলা বন্ধ, একটু বাতাস আস্‌বার যো নেই, কেবল জানলা গুলো সমস্ত উঁচের বোলে আলো আসে। শীতের পক্ষে এরকম ছোট খাটো ঘর গুলো খুব ভাল, একটু আগুন জ্বাল্‌লেই সমস্ত বেশ গরম হোয়ে ওঠে; কিন্তু তা' হোক্,— যে দিন মনে কর মেঘে চার দিক অন্ধকার হোয়ে গেছে, টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি পোড়্‌ছে, তিন চার দিন ধোরে মেঘ বৃষ্টি অন্ধকারের এক মুহূর্ত্ত বিরাম নেই, সে দিন এই ছোট্ট অন্ধকার ঘরটার এক কোণে বোসে আমার মনটা অত্যন্ত বিগড়ে যায়, কোন মতে সময় কাটে না; এক, দুই, তিন কোরে গুণে গুণে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে। খালি আমি বোলে নয়, আমার ইংরেজ আলাপীরা বলেন, সে রকম দিনে তাঁদের অত্যন্ত swear করার প্রবৃত্তি জন্মায়, (swear করা রোগটা সম্পূর্ণ য়ুরোপীয়, সুতরাং ওর বাঙ্গালা কোন নাম নেই), মনের ভাবটা অধার্ম্মিক হোয়ে ওঠে। ঘর গুলো যদি আরো একটু দরাজ হোত, তা হোলেও মনের এরকম খুঁৎ খুঁতে ভাব অনেকটা দূর হোত। ছোট হোক্ ঘর গুলো যথেষ্ট সাজানো; ছবি, টেবিল, চৌকি, কৌচ, ফুলদানি, পিয়ানো ইত্যাদি গৃহ-সজ্জা। প্রায় প্রতি ঘরে এক একটা বড় বড় আয়না আছে, যেতে শুতে বোসতে নিজের মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সুশ্রী মানুষের পক্ষে এ রকম মন্দ নয়, কিন্তু প্রতি পদে এই কালো মূর্ত্তি দেখ্‌লে আয়না গুলো ভেঙ্গে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে; যত মনে করি সাহেব হোয়েছি, নেটিবত্ব যতই ভুলে যেতে চেষ্টা করি, ততই যে ঘরে যাই, চার দিক থেকে আয়নাগুলো আমাদের কালো মুখ প্রকাশ কোরে যেন ভেংচোতে থাকে; এক এক সময় জ্বালাতন হোয়ে উঠ্‌তে হয়। এখানকার বাড়ি গুলো আমাদের দেশের কোঠা বাড়ির মত তেমন মজবুৎ নয়, বাড়ির অধিকাংশ কাঠের; আমাদের দেশে এরকম বাড়ি হোলে বোধ হয় উয়ে হজম কোরে ফেলে, বাতাসের ফুঁয়ে উড়ে যায়। যা' হোক্ এখানকার ঘর দুয়ারগুলি বেশ পরিষ্কার কোরে রাখে; বাড়ির ভিতরে প্রবেশ কোর্‌লে আর কোথাও এক তিল ধূলো দেখ্‌বার জো নেই, মেজের সর্ব্বাঙ্গ কার্পেট প্রভৃতি দিয়ে মোড়া, সিঁড়িগুলি পরিষ্কার তক্ তক্ কোরচে, কোথাও একটুখানি দাগ নেই। আমাদের দেশের পরিষ্কারের সঙ্গে এখানকার পরিষ্কারের অনেকটা তফাৎ আছে। শিল্পজ্ঞান সৌন্দর্য্যজ্ঞান থেকে এখানকার লোকদের পরিষ্কার-ভাবের জন্ম, আমাদের পরিষ্কার-ভাব বোলে যেন একটা স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে। চোকে দেখ্‌তে খারাপ হোলে এরা সইতে পারে না। প্রতি সামান্য বিষয়ে এদের ভাল দেখ্‌তে হওয়াটা প্রধান আবশ্যক। প্রতি পদে এরা সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা করে। এখানকার পুরুষেরা টুপি খুলে সম্মান প্রদর্শন করে,

কিন্তু এমন কোরে খোলে, যা'তে সেই সামান্য টুপি খোলাতেও শ্রী প্রকাশ পায়। বিশেষতঃ এখানকার মেয়েরা প্রতি হাত পা নাড়ায় শ্রীর প্রতি লক্ষ্য করে। কিছু নেবার জন্যে হাত বাড়ালে এমন কোরে বাড়ায়, যাতে সুন্দর দেখায়, খাবার সময়ে এতটুকু মুখ মোছে, যা'তে খারাপ না দেখায়, পাছে লম্বা পদক্ষেপ হয় বোলে বিবিদের এক রকম নতুন ফেসানের কাপড় উঠেছে তা'তে তা'দের হাঁটুর কাছটা বাঁধা থাকে, এমন কি আমি সম্প্রতি দুই একটা কাগজে দেখ্‌তে পাই, একজন কাপড়ওয়ালা খুব ভাল দেখ্‌তে mourning dressএর বিজ্ঞাপন দিয়েছে, শোক-বস্ত্রও সুশ্রী দেখ্‌তে হওয়া আবশ্যক। দোকান থেকে যা কিছু জিনিষ আসে, তা' সুশ্রী কোরে মোড়া থাকে, দোকানদারেরা এরকম কোরে মোড়ার খরচটা অপ্রয়োজনীয় মনে করে না, যা' দুদণ্ডের বেশী ব্যবহার কোর্ত্তে হবে না তা'ও সুন্দর দেখ্‌তে হওয়া আবশ্যক; এই রকম প্রতি পদে এদের শিল্প চর্চ্চার উন্নতি হয়। প্রথম হয়ত এই রকম সুশ্রী অঙ্গ-চালনা প্রভৃতি অভ্যাস-সাধ্য, কিন্তু ক্রমে সেটা স্বাভাবিক হোয়ে যায়, ও বংশাবলী ক্রমে সংক্রামিত হোতে থাকে। এরকম শিল্প-চর্চ্চার ভাব খুব ভাল তা'র আর সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র পরিষ্কারের ভাব থাকাও আবশ্যক। এখানকার লোকেরা খাবার পরে আঁচায় না, কেননা আঁচানো জল মুখ থেকে পোড়্‌চে, সে অতি কুশ্রী দেখায়, শ্রী হানি হয় বোলে পরিষ্কার হওয়া হয় না। এখানে যে রকম কাশী সর্দ্দির প্রাদুর্ভাব, তা'তে ঘরে একটা পিকদানি থাকা নিতান্ত আবশ্যক কিন্তু সে অতি কুশ্রী পদার্থ বোলে ঘরে রাখা হয় না, রুমালে সমস্ত কাজ চলে; আমাদের দেশের যে রকম পরিষ্কার-ভাব তা'তে আমরা বরঞ্চ ঘরে একটা পিকদানি রাখ্‌তে পারি, কিন্তু জামার পকেটে এরকম একটা বীভৎস পদার্থ রাখ্‌তে ঘৃণা হয়। কিন্তু এখানে চোখেরি আদিপত্য। রুমাল কেউ দেখ্‌তে পাবে না তা' হোলেই হোল। চুলটি বেশ পরিষ্কার কোরে আচড়ানো থাক্‌বে, মুখটি ও হাত দুটি বেশ সাফ থাক্‌বে, তা' হোলেই লোকে সন্তুষ্ট থাকে, স্নান করবার বিশেষ আবশ্যক নেই। এখানে জামার উপরে অন্যান্য অনেক কাপড় পরে বোলে জামার সমস্তটা দেখা যায় না, খালি বুকের ও হাতের কাছে একটু বেরিয়ে থাকে; একরকম জামা আছে, তার যতটুকু বেরিয়ে থাকে ততটুকু জোড়া দেওয়া, সে টুকু খুলে ধোবার বাড়ি দেওয়া যায়; তাতে সুবিধে হোচ্চে যে, ময়লা হোয়ে গেলে জামা বদ্‌লাবার কোন আবশ্যক করে না, সেই জোড়া টুকরো গুলো বদ্‌লালেই হোল। এখানকার দাসীদের কোমরে এক apron বাঁধা থাকে, সেইটি দিয়ে তাঁরা না পোঁছেন এমন পদার্থ নেই; খাবার কাঁচের প্লেট যে দেখ্‌ছ ঝক্‌ ঝক্‌ কোর্‌চে, সেটিও সেই সর্ব্ব-পাবক apron টি দিয়ে মোছা হোয়েছে, কিন্তু তা'তে কি হানি, দেখ্‌তে তো কিছু খারাপ

দেখাচ্ছে না। এখানকার লোকেরা কিছু অপরিষ্কার নয়, আমাদের দেশে যা'কে "নোংরা" বলে, তাই। আমাদের দেশের পরিষ্কার ও এখানকার পরিষ্কারের একটা মিলন হোলেই বেশ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মিলন হয়। জল দেখ্‌তে হওয়ার প্রতি আমাদের অত্যন্ত কম লক্ষ্য; কিন্তু তার প্রধান কারণ আমরা গরীব। শিল্পের দিকে মনোযোগ দেবার আমাদের অবসর নেই। এখানে পরিষ্কার ভাবের যে অভাব আমরা দেখ্‌তে পাই, সে অনেকটা শীতের জন্যে। আমরা যে কোন জিনিষ হোক্‌না কেন, জল দিয়ে পরিষ্কার না হোলে পরিষ্কার মনে করিনে। এখানে অত জল নিয়ে নাড়াচাড়া পোষায় না। তা' ছাড়া শীতের জন্য এখানকার জিনিষপত্র শীঘ্র "নোংরা" হোয়ে ওঠে না। আমাদের দেশে প্রায় সর্ব্বদা গা খোলা থাকে, তা' ছাড়া গর্ম্মিতে এমন অপরিষ্কার হোয়ে উঠ্‌তে হয়, যে, না নাইলে তিষ্ঠোবার জো নেই। এখানে শীতে ও গায়ের আবরণ থাকাতে শরীর তত অপরিষ্কার হয় না। এখানে জিনিষ পত্র পোচে ওঠে না, এই রকম পরিষ্কারের পক্ষে নানা বিষয়ে সুবিধে। আমাদের দেশে যে রকম পরিষ্কারের ভাব আছে, তেমনি পরিষ্কার হওয়ার বিষয়ে অনেক কুসংস্কারও আছে। মনে কর আমাদের দেশের পুষ্করিণীতে কিনা ধোয়, কি না ফেলে? সে তৈলাক্ত অপরিষ্কার জলকুণ্ডে স্নান কোরলে আবার স্নান করবার আবশ্যক হয়। তেল মেখে জলে দুটো ডুব দিলেই আমরা গা সাফ হোল মনে করি। আমরা নিজের শরীর ও' খাওয়া দাওয়া সংক্রান্ত জিনিষের বিষয়ে বিশেষ পরিষ্কার থাকি, কিন্তু ঘর দুয়ার যথোচিত পরিষ্কার করিনে। আমাদের চারদিক এই রকম অপরিষ্কার থাকে বোলে আমাদের স্বাস্থ্যও খারাপ। যা'হোক্, এবিষয়ে আর অধিক বক্তৃতা দেব না। অন্যান্য দুই এক কথা বলি।

আমাদের দুই একটি কোরে আলাপী হোতে লাগল, ডাক্তার M একজন আধবুড়ো চিকিৎসা ব্যবসায়ী। তিনি একজন প্রকৃত ইংরাজ, ইংলণ্ডের বহির্ভূত কোন জিনিষ তাঁর পছন্দসই নয়। তাঁর কাছে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডই সমস্তপৃথিবী, তাঁর কল্পনা কখনো Dover Channel পার হয় নি। আমাদের তিনি অত্যন্ত কৃপাচক্ষে দেখতেন, বোধ হয় তার প্রধান কারণ, আমাদের ইংলণ্ডে জন্ম হয় নি। তাঁর কল্পনার এমন অভাব যে, তিনি মনে কোর্ত্তে পারেন না, যারা Ten commendments মানে না, তাদের মিথ্যে কথা বোলতে কি কোরে সঙ্কোচ হোতে পারে? অখৃষ্ট লোকদের নীতির বিরুদ্ধে এই তাঁর প্রধান যুক্তি। যে ইংরাজ নয়, যে খৃষ্টান নয়, এমন একটা অপূর্ব্ব-সৃষ্টি দেখ্‌লে তাঁর কল্পনা অত্যন্ত বিহ্বল হোয়ে পড়ে, তা'র মনুষ্যত্ব কি কোরে থাকতে পারে ভেবে পান না। তাঁর motto হোচ্ছে Gladly he would learn and gladly teach, কিন্তু আমি দেখলুম তাঁর learn করবার ঢের আছে, কিন্তু teach

করবার মত সম্বল খুব কম। তাঁর স্বদেশীয় সাহিত্যের বিষয়ে তিনি আশ্চর্য্য কম জানেন; কতকগুলি মাসিক পত্রিকা পোড়ে তিনি প্রতি মাসে দুই চারিটি কোরে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ করেন। ক্রমশঃ জানতে পারলুম, তিনি আমাদের মনে মনে uneducated বোলে জানেন, কেন না তিনি কল্পনা কোরতে পারেন না একজন Indian কি কোরে educated হোতে পারে? এখানকার বিবিরা শীতকালে হাত গরম রাখবার জন্যে এক রকম গোলাকার পদার্থের মধ্যে হাত গুঁজে রাখে তা'কে muff বলে, প্রথম বিলেতে এসে সেই অপূর্ব্ব পদার্থ-যখন দেখি, তখন Dr M কে সে দ্রব্যটা কি জিজ্ঞাসা করি। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি আকাশ থেকে পোড়লেন muff পদার্থটা আমি জানিনে শুনে তিনি হেসে খুন। এর চেয়ে education-এর অভাব কি হোতে পারে বল? muff বোলে একটা সামান্য পদার্থ, যা, বিলেতের একটা সামান্য অশিক্ষিত চাষা পর্য্যন্ত দেখ্‌লে বোলে দিতে পারে তা' আমি জানিনে! এমন ভয়ঙ্কর ভোঁতা কল্পনা আমি আর কখনো দেখিনি। কিন্তু আমি এখানকার অনেক লোকের রোগ দেখিছি, তারা আশা করেন, আমরা তাঁদের সমাজের প্রতি ছোট খাটো বিষয় জানব। একদিন একটা নাচে গিয়েছিলুম, একজন বিবি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, বধূটিকে (Bride) তোমার কি রকম লাগ্‌ছে? আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম, নব-বধূটি কে? অতগুলি মেয়ের মধ্যে একজন নব-বধূ কোথায় আছেন তা' আমি কিছুই জানতুম না। শুনে সে বিবিটি একেবারে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন, তিনি বোল্লেন তা'র মাথায় orange blossom দেখে চিন্‌তে পারনি? আমার অপ্রস্তুত হবার কোন কথা ছিল না, কিন্তু বিবিটি যে রকম আশ্চর্য্য হোয়ে উঠেছিলেন তাতে আমাকে খানিকটা অপ্রস্তুত হোতে হোল। থতমত খেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কোরলুম ওঁর স্বামী সঙ্গে এয়েছেন? বিবিটি একটু বিরক্ত হোয়ে বোল্লেন "স্বামী আসেন নি! নব-বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী নেই!" আমি ভয় পেয়ে ভাব্‌লেম, আর অধিক প্রশ্ন করা শ্রেয় নয়। বিবিটি ভাব্‌লেন, "কোথাকার একটা নিউজিলাণ্ডের সঙ্গে কথা কচ্চি। এ orange blossom দেখে bride চিন্‌তে পারে না, আবার জিজ্ঞাসা করে, brideএর সঙ্গে স্বামী এয়েছে কি না! shocking!!" তাঁরা মনে করেন, এত সামান্য বিষয় আমাদের আত্ম-প্রত্যয় থেকে জানা উচিত। এই রকম এখানকার অনেক লোকের ভাব দেখিছি। যা হোক Dr Mএর কাছে এই রকম অনেক বিষয়ে আমার education-এর অভাব প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি সহজেই মনে কোরেছিলেন, যে ব্যক্তি muff কাকে বলে জানে না সে যে shakespeare পোড়েছে সে একেবারে "absurd!"

দুই মিস্‌k-র সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁরা এখানকার পাদ্রির মেয়ে। পাড়ার পরিবারদের দেখাশুনো, sunday school-

এর বন্দোবস্ত করা, working menদের জন্যে Temperence সভা স্থাপন ও তাদের আমোদ দেবার জন্যে সেখেনে গিয়ে গান বাজনা করা এই সকল কাজে তাঁরা দিন রাত্রি ব্যস্ত আছেন। বিদেশী বোলে আমাদের তাঁরা অত্যন্ত যত্ন কোর্ত্তেন। নগরে কোথাও আমোদ উৎসব হোলে আমাদের খবর দিতেন, আমাদের সঙ্গে কোরে নিয়ে যেতেন, অবসর পেলে সকালে কিম্বা সন্ধ্যে বেলায় এসে আমাদের সঙ্গে গল্প কোর্ত্তেন, ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে গান শেখাতেন, এক এক দিন তাঁদের সঙ্গে রাস্তায় বেড়াতে যেতুম। এই রকম আমাদের যথেষ্ট যত্ন ও আদর কোর্ত্তেন। বড় miss k—অত্যন্ত ভাল মানুষ ও গম্ভীর। একটা কথার উত্তর দিতে কেমন থতমত খেতেন। "হা—না—তা হবে—জানিনে" এই রকম তাঁর উত্তর। এক এক সময় কি বোলবেন ভেবে পেতেন না, এক এক সময় একটা কথা বোলতে বোলতে মাঝ খানে থেমে পোড়তেন, আর কথা জোগাত না, সুতরাং বাকি টুকু আমাদের কল্পনার ওপর রেখে দিতেন। তাঁকে কোন বিষয়ে তাঁর মত জিজ্ঞাসা কোরলে তিনি বিব্রত হোয়ে পোড়তেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যেত-আজ কি বৃষ্টি হবে মনে হোচ্চে? তিনি বোলতেন, কি কোরে বলব! তিনি বুঝতেন না সে বিষয়ে আমরা তাঁর মুখ থেকে একথা অভ্রান্ত বেদবাক্য শুনতে চাচ্চিনে, তিনি কি আন্দাজ করেন তাই জানতে চাচ্চি। কিন্তু তিনি আন্দাজ কোর্ত্তে নিতান্ত নারাজ। ছোট miss k'র মত প্রশান্ত প্রফুল্লতার ভাব আর দেখি নি। একটি মূর্ত্তিমান সন্তোষের ভাব। দেখে মনে হয় কোন কালে তাঁর মনের কোন খানে এক তিল আঁচড় পড়েনি। খুব ভাল মানুষ, সর্ব্বদাই হাসি খুসি গল্প। কাপড় চোপড়ের আড়ম্বর নেই—কোন প্রকার ভাণ নেই; অত্যন্ত সাদাসিদে।

ডাক্তার m এর বাড়িতে এক দিন আমাদের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ হোল। এখানকার নেমন্তন্নে আমাদের দেশের মত খাওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, গান বাজনা আমোদ প্রমোদের জন্যই দশ জনকে ডাকা হয়। আমরা সন্ধ্যের সময় গিয়ে হাজির হোলুম। একটি ছোট ঘরে অনেকগুলি মহিলা ও পুরুষের সমাগম হোয়েছে। ঘরে প্রবেশ কোরে কর্ত্তা গিন্নিকে আমাদের সম্মান জানালুম। সমাগত লোকদের সঙ্গে যথাযোগ্য অভিবাদন সম্ভাষণ ও আলাপ হোল। ঘরে জায়গার এত টানাটানি ও লোক এত বেশী যে চৌকির অত্যন্ত অভাব হোয়েছিল; অধিকাংশ পুরুষে মিলে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছিলুম। নতুন কোন অভ্যাগত মহিলা এলে গিন্নি কিম্বা কর্ত্তা তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ কোরে দিচ্চেন, আলাপ হবা মাত্র তাঁর পাশে গিয়ে একবার বস্‌চি কিম্বা দাঁড়াচ্চি ও দুই একটা কোরে কথা বার্ত্তা আরম্ভ কোর্‌চি, প্রায় weather নিয়ে কথা আরম্ভ হয়; মহিলাটি বোল্লেন 'Dreadful weather'। সে বিষয়ে তাঁর

সঙ্গে আমারা সম্পূর্ণ মতের ঐক্য হোল। তা'র পরে তিনি অনুমান কোল্লেন যে আমাদের পক্ষে অর্থাৎ Indianদের পক্ষে এমন weather বিশেষ trying ও আশা কোল্লেন, আকাশ শীঘ্র পরিষ্কার হোয়ে যাবে, ইত্যাদি। তার পরে এই সূত্রে নানা কথা উঠল আর কি। সভার মধ্যে দুই জন সুন্দরী উপস্থিত ছিলেন, বলা বাহুল্য যে, তাঁরা জানতেন তাঁরা সুন্দরী। বিলেতে স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-অনভিজ্ঞা যুবতী দেখবার যো নেই। এখেনে সৌন্দর্য্যের পুজো হয়; এখেনে রূপ কোন মনে গুপ্ত থাকতে পারে না, রূপাভিমানে সুপ্ত থাকতে পারে না; চার দিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তা'কে জাগিয়ে তোলে; রূপের আলো দেখবামাত্র ভক্তদের পতঙ্গ হৃদয় চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে ঘিরে ফেলে ও রূপসী যে দিকে যান, সেই ফড়িঙ্গের দল তার চতুর্দ্দিকে লাফিয়ে চোলতে থাকে। Ball room এ তাঁর দর অত্যন্ত চড়া; নাচে তাঁর সাহচর্য্য সুখ পাবার জন্যে দরখাস্তের পর দরখাস্ত আসচে; তাঁর রুমাল কুড়িয়ে দেবার জন্যে শত শত হাত প্রস্তুত, তাঁর ছিল মাত্র কাজ কোরে দেবার জন্য শত শত কায়মনোবাক্য দিবারাত্রি নিযুক্ত। রূপবান্ পুরুষদেরও যথোচিত আদর আছে, তারা এখানকার drawing room-এর darling হোয়ে ওঠে, যুবতীরা তা'দের আদর দিয়ে দিয়ে অনর্থ কোরে তোলে। আমি দেখ্‌ছি, একথা শুনে তোমার এখানে আসতে অত্যন্ত লোভ হবে। তোমার মত সুপুরুষ এখানকার মত রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়-রাজ্যে এত ভাঙ্গচুর লোক্‌সান্ কোরতে পার যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হোয়ে ওঠে, তা'হোলে চতুর্দ্দিক থেকে

"————ঘন
নিশ্বাস প্রলয় বায়ু, অশ্রুবারি ধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব—"

তুলে দেও। তা হোলে তোমার হৃদয়টিকেও খরচের খাতায় লিখতে হয়; এত নিশ্বাস-প্রলয়-বায়ুতে ও অশ্রুবারিধারা-আসারে তিনি যদি টিঁকে থাকতে পারেন, তা হোলে তেমন মন spiritএ ডুবিয়ে যত্ন পূর্ব্বক preserve কোরে British museum-এ রেখে দেওয়া উচিত, তেমন মন ফরমাস দিলে পাওয়া যায় না। বিলেতে রূপের চেয়ে recommendation letter খুব কম আছে। এ রকম অবস্থায় রূপ কখনো লুকিয়ে থাকতে পারে না। যা' হোক্ নিমন্ত্রণ সভায় miss H. দুই রূপসী-শ্রেষ্ঠ ছিলেন; কিন্তু তাঁরা দুজনেই কেমন চুপচাপ গম্ভীর হোয়েছিলেন। বড় যে মেশামেশি হাসি খুসী তা' ছিল না। ছোট মিস্ একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বোস্‌লেন, আর বড় মিস্ দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার কোর্‌লেন। আমার বোধ হয়, তা'র কারণ আমরা দুই এক জন ছাড়া ঘরে আর কেউ যুবক ছিল না। তরুণ-নেত্র তাঁদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন উপভোগ কোরতে পারে, এমন ত আর চন্দ্রমা-চক্ষু

পারে না। যা হোক আমরা দুই এক জন তাঁদের আমোদ রাখ্‌বার জন্যে নিযুক্ত হলুম। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি কথোপকথন-শাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যা'কে উজ্জ্বল (Bright) বলে তা' নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না, ও আকারে, ইঙ্গিতে, কথার আভাসে আমি রূপসীকে জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোর-নেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণ চাতক তাঁর বাক্য-ধারা পান কোরে স্বর্গ-সুখ ভোগ কোর্‌চে। বরঞ্চ এক এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথা-বার্ত্তা শুনে তার উল্টো স্থির করেন। এ রকম অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়; কেন না আমার হৃদয় বাস্তবিক অত্যন্ত "gallant," যদিও আমার বাইরের ভাব দেখ্‌লে লোকের মন ঠিক তা'র উল্টো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হবে। গৃহ-কর্ত্তা এক জন সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞতাভিমানিনী প্রৌঢ়া মহিলাকে বাজাতে অনুরোধ কোর্‌লেন. তিনি এই অনুরোধের জন্যে এতক্ষণ আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন। গৃহের মহিলাদের মধ্যে তাঁর বয়স সব চেয়ে বেশী, এই জন্যে তিনি সব চেয়ে বেশী সাজ গোজ কোরে এসেছিলেন, তাঁর দু হাতের দশ আঙুলে যত আংটি ছিল, সভাস্থ সকল লোকের আঙুলের আংটির সমষ্টি তার অর্দ্ধেক হবে—কিন্তু হাজার সাজ সজ্জা করুন, তিনি বেশ জান্‌তেন যে, তাঁর রূপের বাজার সম্পূর্ণ দেউলে হোয়ে গেছে, সুতরাং তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা কোরছিলেন, কখন তাঁর বাজাবার অবসর আস্‌বে। আমি যদি নিমন্ত্রণ-কর্ত্তা হোতুম আর আগে থাক্‌তে না জান্‌তুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাতে পারেন, তা হোলে তাঁর দশ আঙুলের বিশটা আংটি দেখে আমি বুঝ্‌তে পার্‌তুম যে, তিনি পিয়ানো বাজাবেন বোলে বাড়ি থেকে স্থির সংকল্প কোরে এসেছেন। যখন একজন কোন বিখ্যাত বাজিয়ে আপনার কেরামতী দেখাবার জন্যে বাজাতে বসে, তখন তা' আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হোয়ে ওঠে। আমি এখানকার গান বা বাজনার টপ্পা বা খেয়াল বেশ বুঝ্‌তে পারি, এক একটা খুব ভাল লাগে, কিন্তু কালোয়াতি-কোলাহলে এক একবার আমাকে অত্যন্ত অধীর কোরে তোলে। তাঁর বাজনা সাঙ্গ হোলে পর গৃহকর্ত্রী আমাকে গান গাবার জন্যে অনুরোধ আরম্ভ কোরলেন। আমি বড় মুস্কিলে পোড়লুম। আমি জান্‌তুম, আমাদের দেশের গানের ওপর যে তাঁদের বড় অনুরাগ আছে তা' নয়; তবে আমাকে গান কোর্‌তে বল্‌বার তাৎপর্য্য কি? গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রী দুজনেই আমার গান পূর্ব্বে শুনেছিলেন, সে গান গুলো তাঁদের অত্যন্ত হাস্য-জনক লেগেছিল, তাঁদের তাতে এত আমোদ বোধ হোয়েছিল, যে, বাড়িতে গিয়েই কর্ত্তা গিন্নিতে মিলে পরামর্শ কোর্‌লেন যে, আগামী নেমন্তন্নে এই কালো Indian টাকে চীৎকার করাতে হবে, তা হোলে অভ্যাগত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে সে ভারি একটা "treat" হবে! আমি মনে

মনে সে সমস্তই জানি, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কি করি বল? যদি বা ভদ্রতার খাতিরও লঙ্ঘন কোর্ত্তে পার্তেম, কিন্তু পাশ থেকে যখন সুন্দরী miss H তাঁর মিষ্টতম আদরের স্বরে বোল্লেন "yes do give us a song Mr T.! তখন Mr T. বাক্য ব্যয় না কোরে গান গাওয়ার ভূমিকা স্বরূপ দুই একটি আরম্ভ-সূচক কাশী-ধ্বনি কোর্‌লেন। সমস্ত সভা শান্ত হোল। আমি ভাব্‌তে লাগলুম, কি গান গাব। আমি নিজে যে গানগুলি ভাল বাসি, সে গুলিকে এমন উলুবনে ছড়াতে কেমন প্রাণে লাগে; সে গান গুলি শুনে যে সকলে হাস্‌বে, তা' আমি সহ্য কোর্ত্তে পার্ত্তুম না। একটা গান ত আরম্ভ কোর্‌লেম। এমন শোচনীয় অবস্থায় আমি আমার জীবনে আর কখনো পড়িনি; কোন প্রকারে কোরে গোটাকতক সুর ও কথার সমষ্টি গলার ভিতর থেকে বের কোরেছিলেম আর কি। সভাস্থ miss ও missess দের এত হাসি পেয়েছিল, যে সে স্রোতের উচ্ছ্বাসে ভদ্রতার বাঁধ টলমল কোর্‌ছিল; কোন মতে তাঁরা হাসি গোপন কোর্ত্তে পার্‌ছিলেন না, কেউ কেউ হাসিকে কাশির রূপান্তরে পরিণত কোর্‌লেন, কেউ কেউ হাত থেকে কি যেন পোড়ে গেছে ভাণ কোরে ঘাড় নিচু কোরে হাসি লুকোতে চেষ্টা কোর্‌লেন, এক জন কোন উপায় না দেখে তাঁর পার্শ্বস্থ সহচরীর পিঠের পেছনে মুখ লুকোলেন; যাঁরা কতকটা শান্ত থাক্‌তে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে চোখে চোখে টেলিগ্রাফ চোলছিল। সেই সঙ্গীত-শাস্ত্র বিশারদ প্রৌঢ়াটির মুখে এমন একটু মৃদু ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের হাসি লেগেছিল যে, সে দেখে শরীরে রক্ত জল হোয়ে আসে। এই রকম অবস্থায় আমার মত ভাল মানুষ যে কি দুরবস্থায় পোড়েছিল, তা' তোমরা বেশ কল্পনা কোর্ত্তে পার্‌চ। গান যখন সাঙ্গ হোল তখন আমার মুখ কান লাল হোয়ে উঠেছে, কেবল কালো রঙ্‌বোলে কেউ দেখ্‌তে পায় নি। চারদিক থেকে একটা প্রশংসার কোলাহল উঠ্‌ল, কিন্তু অত হাসির পর আমি আর সে দিকে বড় কর্ণপাত কোর্‌লেম না। ছোট miss H. আমাকে গানটা ইংরিজিতে অনুবাদ কোরে বোল্‌তে অনুরোধ কোরলেন আমি অনুবাদ কোরলেম, গানটা হোচ্চে "প্রেমের কথা আর বোল না।" তিনি অনুবাদটা শুনে আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা কোর্‌লেন, তোমাদের দেশে প্রেমের স্বাধীনতা আছে নাকি? ভারতবর্ষের লোকেরা হ্যাট্ কোট্ পরে কিনা, জোন্মে অবধি ইংরিজি কয় কিনা ও শীতকালে কখনো বরফের ওপরে skate করে কিনা যিনি জান্‌তেন না, তিনি এ খবরটি কোথা থেকে পেয়েছেন! আমি ত মুস্কিলে পোড়ে গেলুম, নত শিরে দুই একটা, আঁয়োঁ কোর্‌লুম আর কি! যা হোক্ সেই সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে দুবার গান কোর্‌তে হোয়েছিল। এই রকম গান বাজানা গল্পস্বল্প চোলতে লাগল; কতকগুলি রোমের ভগ্নাবশেষের ফোটগ্রাফ ছিল, সেই গুলি নিয়ে

গৃহকর্ত্রী কতকগুলি অভ্যাগতকে জড় কোরে দেখাতে লাগলেন; ডাক্তার M. একটি Telephone কিনে এসেছেন, সেইটি নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত কোরচেন। পাশের ঘরে টেবিলে খাবার সাজানো আছে। এক একবার গৃহকর্ত্রী এসে এক একজন পুরুষের কানে কানে বোলে যাচ্চেন, miss অথবা missess অমুক কে supper স্থানে নিয়ে যাও; তিনি গিয়ে সেই মহিলার কাছে তাঁকে খাবার ঘরে নিয়ে যাবার অনুমতি প্রার্থনা কোরলেন ও তাঁর বাহুগ্রহণ কোরে তাঁকে পাশের ঘরে আহার স্থলে নিয়ে গেলেন। এ রকম সভায় সকলে মিলে একেবারে খেতে যায় না, তার কারণ তা' হোলে আমোদ প্রমোদের স্রোত অনেকটা বন্ধ হোয়ে যায়। একে একে সকলের খাওয়া হোয়ে যায়। এই রকম এক সঙ্গে পুরুষ মহিলা সকলে মিলে গান বাজনা গল্প আমোদ প্রমোদ আহারাদিতে একটা সন্ধ্যা কাটানো গেল।

আমরা একটা কোন বিশেষ অনুষ্ঠান বা উৎসবের সময়েই লোক জন একত্রে ডেকে খাওয়া দাওয়া করি। আমাদের মধ্যে পরস্পর মিলনের উপলক্ষ্য খুব কম। তা' ছাড়া, যাঁদের সভার অধিষ্ঠাত্রী করা উচিত, সেই মহিলারাই আমাদের নিমন্ত্রণ সভায় উপস্থিত থাকেন না। খাওয়া দাওয়াই হোচ্চে আমাদের প্রধান আমোদ, তা' ছাড়া, আর বাকী যে সব আমোদ, যেমন বাইনাচ, যাত্রা, গান, প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্যে। কিন্তু ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির চেয়ে উচ্চতর আমোদ যে মানুষ পরস্পরে সমভাবে মিলে মেশামেশি করা, পরস্পর পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে নিজের সমস্ত গুণ প্রকাশ করা, পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা, সে সকল আমাদের মধ্যে নেই। কতকগুলো নীচ শ্রেণীর আড়াটে মেয়ে বা এক রাত্তিরের জন্যে ধার করা গাইয়ে যখন জঘন্য অঙ্গ-ভঙ্গী কোরচে, বা ভাবসম্পর্ক-শূন্য রাগিণী ভাঁজচে, তখন আমরা এক দল নিমন্ত্রিত লোক হাঁ কোরে তাকিয়ে থাকি, ও "বাহবা বাহবা" করি। কিন্তু পরস্পরকে আমোদ দেবার জন্যে আমরা সকলে মিলে গান বাজনা আমোদ প্রমোদ করিনে। এই রকম কেনা বা ভাড়া করা আমোদ আমরা নাট্যশালা বা রঙ্গভূমিতে প্রত্যাশা করি কিন্তু যখন এক জন বন্ধুর বাড়িতে জড় হোয়েছি, তখন সকল ভদ্রলোকে মিলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা ও সদ্ভাবের চর্চ্চা করাই উচিত। আমরা যখন বাইনাচ দেখা, গান শোনা বা ঐ রকম কোন আমোদের জন্যে একত্র হই, তখন মনে হয় কতকগুলো লোক একটা নাট্য গৃহে গেছে, কেবল প্রভেদের মধ্যে সেখেনে টিকিট কিনতে হয় না। সে রকম নিমন্ত্রণ-সভায় গেলে, মানুষ যে সামাজিক জীব, সে কেবল কতগুলো প্রাণী আঁচড়া আঁচড়ি না কোরে একত্রে রোয়েছে দেখে বোধ হয়। পরস্পরকে আমোদের জন্যে পরস্পরের উপর নির্ভর কোরতে হয় না। একজন গান কোরচে

বা নাচচে আমরা সকলে মিলে শুনচি বা দেখ্‌চি, যদি নিজের নিজের বাড়িতে বোসে শোনা বা দেখা যেত, তা হোলে আমরা পরিশ্রম স্বীকার কোরে এক জায়গায় জড় হোতেম না। মেয়ে পুরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাইত স্বাভাবিক। মেয়েরাত মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তাঁদের সমাজের এক অংশ কোরে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেশা মেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজ-বিরুদ্ধ, রোমাঞ্চ জনক ব্যাপার কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা' অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রোয়েছে, আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বাঁধা আছে। এক দল বুদ্ধিমান বিবেচনা-শক্তি-বিশিষ্ট জীবকে কত শত শতাব্দী ধোরে নির্দ্দয় লোকাচারের শাসন, পীড়ন, দমন, বন্ধন কোরে কোরে পোষা জন্তুর চেয়ে নির্জ্জীব, দশীভূত, সঙ্কুচিত সঙ্কীর্ণ-মন কোরে তোলা হোয়েছে, সে একবার ভাল কোরে কল্পনা কোরে দেখ্‌তে গেলে সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। কোন এক জন মানুষের ওপর আর এক জন মানুষের এরকম সম্পূর্ণ একাধিপত্য করা, এক জন বুদ্ধি ও হৃদয়-বিশিষ্ট মানুষকে, জন্তুর মত, এমন কি, তা'র চেয়ে অধম, একটা ব্যবহার্য্য জড় পদার্থের মত সম্পূর্ণ রূপে নিজের প্রয়োজনের জিনিষ কোরে তোলা, যদি তার এক তিল সুখের জন্যে তোমার এক তিল সুখের ব্যাঘাত হয়, তা' হোলে সে টুঁটি উচ্ছিন্ন কোরে দেওয়া, যদি তোমার ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্যে তা'কে চিরস্থায়ী কষ্ট পেতে হয়, তবে তা'ও অম্লান বদনে তার স্কন্ধে স্থাপন করা, এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্দ্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হোলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা' বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। আমরা অনেক জিনিষ না দেখ্‌লে দূর থেকে কল্পনা কোর্ত্তে পারিনে, এমন কি বিশ্বাস কোর্ত্তে পারিনে। এখেনে যতগুলি ভারতবর্ষীয় এয়েছেন, সর্ব্ব প্রথমেই তাঁদের চোখে কি ঠেকেছে? এখানকার সমাজের সুখ ও উন্নতি-সাধনে মহিলাদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা। যাঁরা স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন, এ খেনে এসে নিশ্চয়ই তাঁদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হোয়েছে। *

* স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথা-বার্ত্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপযাত্রীদের চর্ম্ম-চক্ষে কি যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়; ইংলণ্ডের জল বায়ু স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের পুরাবৃত্ত স্বতন্ত্র, ইংলণ্ডের জনসমাজের রুচি স্বতন্ত্র,—আমাদের দেশের জল বায়ু, পুরাবৃত্ত, জনসমাজের রুচি

এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা শিক্ষার যে কত সাহায্য করে তার ঠিক নেই। মুখে মুখে কথাবার্ত্তায় মেয়ে পুরুষদের মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে যায়। বিনা কষ্টে ও অলক্ষিত ভাবে মনের একটা শিক্ষা হোতে থাকে। একটা বিষয়ে নানা লোকের মত শুনতে পাওয়া যায়; কি রকম কোরে মত গঠিত কোর্ত্তে হয়, কি রকম কোরে মত ব্যক্ত কোর্ত্তে হয়

স্বতন্ত্র,—ইংলণ্ডীয় প্রকৃতির উপর ইংলণ্ডের সমাজ প্রতিষ্ঠিত, আমাদের দেশীয় প্রকৃতির উপর আমাদের দেশীয় সমাজ প্রতিষ্ঠিত,—ইউরোপযাত্রী বঙ্গ যুবকদের এজ্ঞানটি সহসা বিলুপ্ত হইয়া যায়। লেখককে যদি জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি আমাদের দেশীয় প্রকৃতিকে সমূলে উন্মূলন করিয়া তাহার স্থানে ইংলণ্ডীয় প্রকৃতিকে সিংহাসনস্থ করিতে চাও" তাহা শুনিবামাত্র তিনি হয় ত শিহরিয়া উঠিয়া তৎক্ষণাৎ স্পষ্টাক্ষরে "না" বলিবেন;—আমাদের দেশের আচার ব্যবহার সভ্যতা যাহা কিছু সমস্তই আমাদের দেশীয় প্রকৃতির গর্ভজাত সন্তান-সন্ততি, অগ্রে সেই প্রকৃতিকে উন্মূলন না করিয়া তিনি কিরূপে তাহার সেই সন্তান সন্ততিগুলির উচ্ছেদ-কামনাকে মনে স্থান দিতে পারেন? অনতিপূর্ব্বে বহুতর ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-সমারোহের মধ্যে তিনি যখন এক জনের মুখে দেশীয় স্ত্রীলোকোচিত মাধুর্য্য ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কেন এত ভাব লাগিয়াছিল? তখন ত বহির্চারিণী, বহুভাষিণী, ব্যাপিকা সমাজ-রাজ্ঞী অপেক্ষা অন্তঃপুরচারিণী মৃদুভাষিণী লজ্জাশীলা গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে ভাল লাগিয়াছিল, এখন কি তাঁহার সে ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে? তাহা ত বোধ হয় না,—তিনি এক দিকে অধিক ঝোঁক দেওয়াতে লেখনীর বেগ সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ইহাই সম্ভব মনে হয়। শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীদিগের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত তাহা হইলে আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা ত নহে—যেমন স্বাধীনতা চাই তাহার সঙ্গে তেমনি শোভন, লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুলি গুণ থাকা চাই, তবেই তাঁহারা স্ত্রীলোকের আদর্শ রূপে বরণীয় হইতে পারেন; নচেৎ স্ত্রী-স্বাধীনতার আর এক নাম স্বৈরচারিতা, ব্যাপিকতা, প্রগল্‌ভতা, হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃত কথা এই যে আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অপ্রতুল রহিয়াছে তাহার সঙ্গে কি-মাত্রা স্ত্রী-স্বাধীনতা ভালোয় ভালোয় টেঁকিয়া থাকিতে পারে তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে; ইংলণ্ডের আর আর স্বাধীনতার সঙ্গে ইংলণ্ডোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা ইংলণ্ডেই শোভা পায়; তেমনি যদি আমাদের দেশের আর আর স্বাধীনতার সঙ্গে আমাদের দেশোচিত স্ত্রী-স্বাধীনতা নৈসর্গিক শোভায় সমুত্থিত হয় তবেই ভাল নইলে—মাথাটা খুব প্রকাণ্ড ধড় খানি ছোটোখাটো অথবা মাথায় হ্যাট্ গায়ে জামা পায়ে চটি এইরূপ এক বিস্তৃত কিমাকার স্বাধীনতা সকলের সহিত খাপ ছাড়া হইয়া দিন কতক মিথ্যা দাপাদাপি করিয়া বেড়াইলে তাহাতে কাহার যে কি উপকার হইবে তাহা ত বুঝা যায় না। "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন" এরূপ যদি কেউ মনে করেন তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা আত্মার স্বাধীনতাও নহে, দেশের স্বাধী-

ও কি রকম কোরে মতের প্রতিবাদ কোর্ত্তে হয়, সে বিষয় প্রতি মুহূর্ত্তে অভ্যাস হোতে থাকে। সমাজে মিশতে গেলে নানা বিরোধী মতের একটা সঙ্ঘাত উপস্থিত হয়, সুতরাং একটা বিষয়ের চারদিক দেখতে পাওয়া যায়, যদি দৈবাৎ বিবেচনা না কোরে একটা মত স্থির কর, অমনি সে মত চারদিক থেকে হুঁচট খেতে থাকে, সুতরাং তোমাকে অনেকটা সাবধান হোতে

নহাও নহে, কেবল পরপুরুষগণের সহিত স্ত্রী-লোকগণের আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা, ইহা কতদূর প্রকৃত রূপে স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ-স্থল। স্ত্রীরা যেমন গৃহকর্ম্মের উপযুক্ত, পুরুষেরা সেইরূপ বহির্ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিবার উপযুক্ত; স্ত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল গৃহাভ্যন্তরে থাকিতে বাধ্য হন, এবং পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা অধিকাংশ কাল বাহিরে বিচরণ করিতে বাধ্য হন—অন্তঃপুরে থাকা স্ত্রীজনের পক্ষে সুবিধা বলিয়াই স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর-বাসের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ওরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়াছে একথা কোন কাজের কথা নহে; পুরুষেরা স্বার্থপর বলিয়া ছেলে-পিলে মানুষ করে না, রাঁধে বাড়ে না ইত্যাদি কথা যদি সত্য হয়, তবে এ কথাও কেননা সত্য হইবে যে, স্ত্রীরা স্বার্থপর বলিয়া আপিসে বেরোয় না, লাঙল চসে না, মোট বয় না, ইত্যাদি। অন্তঃপুর একটা কারাগার, অন্তঃপুরবাসিনীরা একটা বোবা জানোয়ার, পিতা-মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা দাসত্ব, এ সকল ইংরাজি বাঁধি বোল ইংরাজের মুখেই শোভা পায়, বিশেষতঃ সেই সব মানোয়ারীই বল আর জানোয়ারই বল তাঁহাদের মুখে—যাঁহারা নারিকেলের ছোবড়া ভক্ষণ করিয়া তাহার অবশিষ্ট অংশকে আঁটি মনে করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি আপন পিঙ্গল-নয়নে কল্পনার দূরবীক্ষণ প্রয়োগ করিয়া আমাদের অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে কেবল শাসন-

---

ভয়ে জড়সড় হইয়া সকল কার্য্য করিতে দেখে, যাহারা দেখে যে পতিকে রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ানোতে পতির প্রতি পত্নীর ভালবাসা প্রকাশ পায় না, পত্নীর প্রতি পতির নির্দ্দয় শাসনই প্রকাশ পায়; কুলরমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না সে কেবল পতির শাসন-ভয়ে, পতির প্রতি ভাল বাসা তাহার কারণ নহে, এমন কি যাহারা পুত্রের ভূমিষ্ঠ প্রণামে পিতৃভক্তি দেখে না—দাসত্ব মাত্রই দেখে; তাহারা আমাদের দেশীয় সভ্যতার ছোবড়া টুকুই সার পদার্থ সুতরাং সেই মহার্হ সভ্যতাকে নিতান্ত অসার পদার্থ মনে করিবে ইহা ত ধরাই আছে; কিন্তু তাহার প্রকৃত সার পদার্থ যে তাহার ভিতরকার শাঁস ইহা যদি একজন বাঙ্গালিরও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় তবে সে বড় রহস্য; একজন বাঙ্গালিকে যদি শিখাইতে হয় যে অন্তঃপুর গৃহিণীগণের কারাগার নহে কিন্তু তাঁহাদের সাধের নিকেতন, পিতা-মাতার প্রতি পুত্রের নম্র ব্যবহার ভক্তি এবং ভালবাসার নিদর্শন, তাহার মধ্যে কঠোরতা কিছু মাত্র নাই; স্ত্রীলোকেরা যে, যে সে পুরুষের সঙ্গে মিলিয়া-মিসিয়া আমোদ করে না সে কেবল এই জন্যে যে, তাহাদের পবিত্র গার্হস্থ্য ভাব আমোদ প্রমোদ অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক যত্নের ধন, এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিতে হয়, তবে সুতন একটা বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি না করিলে আর চলে না। সং

হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, রাজনীতি সম্বন্ধীয় খবর দেখতে দেখতে মুখে মুখে সমস্ত দেশময় রাষ্ট্র হোয়ে যায়। একটা নতুন বই যদি ভাল হোয়ে থাকে, তবে মুখে মুখে তা'র বিজ্ঞাপন প্রচার হয় ও দেশের মেয়ে পুরুষ সকলেই সে বইয়ের অস্তিত্ব জানতে পারে। এই রকম কোরে চার দিকের বাতাসে যেন জ্ঞান ছড়িয়ে যায়, নিশ্বেসের সঙ্গে যেন জ্ঞান লাভ করা যায়। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান। সভায় তাদের সম্মানের আর সীমা নেই। যাঁদের সঙ্গতি ও যোগ্যতা আছে, সকলেই গুণীদের নিমন্ত্রণ কোর্ত্তে চান। এখানকার নিমন্ত্রণ-সভার তাঁরা ("Lion") সিংহ। মহা মহা কুলীন ব্যক্তিদের ঘরে তাঁরা পদধূলি দিলে শত শত duchess countessরা আপনাদের কৃতার্থ মনে করেন। এখানে গুণের আদর দেখলে আশ্চর্য্য হোয়ে যেতে হয়। আমাদের দেশের গুণীলোকদের যখন মনে করি, তখন মনে হয়, তাঁরা যদি ইংলণ্ডে জন্মাতেন, তা' হোলে তাঁদের পক্ষে ভাল হোত। স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের কাছে থেকে প্রশংসা ও মমতা পাবার জন্যে আপনার আপনার গুণের চর্চ্চা কোর্ত্তে থাকে। সবশুদ্ধ জড়িয়ে এখানকার মেশামেশির ভাব অতি সুন্দর। সে না দেখলে ভাল বোঝবার যো নেই। বাইনাচ দেখে গান শুনে ও লুচি সন্দেশ হজম বা বদ-হজম কোরে যে ফল হয়, তা'র চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা' আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে যথেষ্ট বর্ণনা কোরতে পারিনে।

এখানে আবার মিলনের উপলক্ষ্য কত প্রকার আছে, তার সংখ্যা নেই। ডিনার, বল্, Conversazione, চা-সভা, lawn-parties, Excursions, Picnics, ইত্যাদি। Thackeray বলেন "English Society has this eminent advantage over all other—that is if there be any Society left in the wretched distracted old European continent—that it is above all others a dinner-giving Society." অবসর পেলে এক সঙ্গে বন্ধু বান্ধবদের জড় কোরে আহারাদি করা ও আমোদ প্রমোদ কোরে কাটানো এখানকার পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজের মধ্যে। ডিনার সভার বর্ণনা কোর্ত্তে বসা বাহুল্য। ডাক্তার M-এর বাড়িতে যে partyর কথা পূর্ব্বে উল্লেখ কোরেছি, তার সঙ্গে ডিনার-পার্টির প্রভেদ কেবল দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে (এ ম্লেচ্ছদের দেশে ভক্ষণটা আবার দক্ষিণ বাম উভয় হস্তের ব্যাপার)। আমি এক বার এখানকার একটি বোট-যাত্রা ও picnic-partyর মধ্যে ছিলুম। এখানকার একটি রবিবারিক সভার সভ্যেরা এই বোট-যাত্রার উদ্‌যোগী। এই সভার সভ্য ও সভ্যারা sabath পালনের বিরোধী। তাই জন্যে তাঁরা রবিবারে একত্র হোয়ে নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ করেন। এই রবিবারিক সভার সভ্য আমাদের এক বাঙ্গালী মিত্র ম—মহাশয় আমাদের অনুগ্রহ কোরে

টিকিট দেন। লণ্ডন থেকে বেলোগে কোরে টেম্‌সের ধারের এক গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেম। গিয়ে দেখলুম টেম্‌সে একটা প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধা রোয়েছে, আর প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন রবিবার-বিদ্রোহী মেয়ে পুরুষে একত্র হোয়েছে। দিনটা অন্ধকার, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর যাঁদের যাঁদের আসবার কথা ছিল, তাঁরা সকলে আসেন নি। আমার নিজের বড় এ পার্টিতে যোগ দেবার ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু ম-মহাশয় নাছোড় বান্দা; তিনি আমাকে বিশেষ কোরে লোভ দেখালেন যে, সেখেনে অনেক সুন্দরী-সমাগম হোচ্চে। শুনে আমি একটু যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক সাজগোজ কোরে যথা-সময়ে হাজির হোলুম। গিয়ে দেখি, বোটে কেবল একটি মহিলা আছেন, যাঁকে দূর থেকে দেখলে হঠাৎ সুন্দরী বোলে ভ্রম হয়, আর বাকী মহিলাদের (তাঁদের প্রতি আমি অসম্মান করচিনে) কাউকেই আমার চোখে দর্শন-যোগ্য বোলে ঠেকে নি। যে একটি মাত্র রূপসী ছিলেন, তাঁর চার দিকে এমন একটি ঘন ব্যূহ বদ্ধ হোয়েছিল, যে, তা' ভেদ করবার চেষ্টা করা আমার মত ক্ষীণ প্রাণীর পক্ষে দুরাশা। সুতরাং আমি সে টক্‌ আঙ্গুর ফল পরিত্যাগ কোরে ম—মহাশয়ের কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলুম। কিন্তু কৈফিয়ৎ সন্তোষ-জনক হোক্‌ আর না হোক্‌ ফলে সমানই কথা। আমরা অনেক ভারতবর্ষীয় একত্র হোয়েছিলুম। বোধ হয় ম—মহাশয় সকলকেই সুন্দরীর লোভ দেখিয়েছিলেন, কেন না সকলেই প্রায় বাহারে সাজগোজ কোরে গিয়েছিলেন। অনেকেই গলায় লাল ফাঁসি (neck tie) বেঁধে এয়েছিলেন, অন্যের গলায় ফাঁসি লাগানো তাঁদের আন্তরিক অভিপ্রায়; আর ম—মহাশয় স্বয়ং তাঁর (neck-tie-এ একটি তলবারের আকারের পিন গুঁজে এয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে এক জন তাঁকে ঠাট্টা কোরে, জিজ্ঞাসা কোরলেন, "দেশের সমস্ত tie-এ যে তলবারের আঘাত করা হোয়েছে, ওটা কি তারি বাহা-লক্ষণ?" তিনি হেসে বোল্লেন "তা' নয় গো, বুকের কাছে একটা কটাক্ষের ছুরি বিঁধেছে, ওটা তারি চিহ্ন। দেশে থাকতে বিঁধেছিল, কি এখানে এসে বিঁধেছে, তা' কিছু বোল্লেন না। ম—মহাশয়ের হাসি তামাসার বিরাম নেই; সে দিন তিনি নৌকার সমস্ত লোকের সঙ্গে সমস্ত দিন ঠাট্টা ও গল্প কোরে কাটিয়েছিলেন। একবার তিনি সমস্ত মহিলাদের হাত দেখে গুণতে আরম্ভ কোরেছিলেন, তখন তিনি এত হাস্যজনক কথা বোলেছিলেন, ও বোট শুদ্ধ মহিলাদের এত প্রচুর পরিমাণে হাসিয়েছিলেন, যে, সত্যি কথা বোলতে কি, তাঁর উপর আমার মনে মনে একটু খানি দ্বেষের উদ্রেক হোয়েছিল; বোট শুদ্ধ মেয়ে যখন হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছিলেন, তখন আমি এবং আর দুই চারটি পুরুষ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে দাঁড়িয়েছিলেম। যথা-সময়ে বোট ছেড়ে ছিলো। নদী এত ছোট যে, আমাদের দেশের খালের কাছা কাছি পৌঁছোয়। জায়গায় জায়গায় নদীর ধারের

দৃশ্য মন্দ নয়, কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে যে বিশেষ সুন্দর দেখতে তা নয়। নৌকোর মধ্যে আমাদের আলাপ পরিচয় গল্প স্বল্প চোল্‌তে লাগল। এক জন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের এক জন দিশি লোকের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্ক উঠল। আমাদের সঙ্গে এক জনের আলাপ হোল, তিনি তাঁদের ইংরিজি সাহিত্যের কথা তুললেন; তাঁর বেশীর কবিতা অত্যন্ত ভাল লাগে; সে বিষয়ে আমার সঙ্গে তাঁর মতের সম্পূর্ণ মিল হোল দেখে তিনি ভারি খুসী হোলেন; তিনি আমাকে বিশেষ কোরে তাঁর বাড়ি যেতে অনুরোধ কোরলেন, ও বোল্লেন সেখানে গিয়ে আমরা দুজনে সাহিত্য আলোচনা কোরব। ইনি ইংরিজি সাহিত্য ও তাঁর নিজের দেশের রাজনীতি ভাল রকম কোরে চর্চ্চা কোরেছেন, কিন্তু যেই ভারতবর্ষের কথা উঠল, অমনি তাঁর অজ্ঞতা বেরিয়ে পোড়ল। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরলেন, কোন্ রাজার অধীনে? আমি অবাক্ হোয়ে বোল্লুম—ব্রিটিষ গবর্মেণ্টের। তিনি বল্লেন, "তা' আমি জানি, কিন্তু আমি বোলচি, কোন্ ভারতবর্ষীয় রাজার অধীনে!" কি ভয়ানক! কলকাতার বিষয়ে এঁর জ্ঞান এই রকম! তিনি অপ্রস্তুত হোয়ে বোল্লেন, "আমার অজ্ঞতা মাপ কোর্ব্বেন; ভারতবর্ষের বিষয়ে আমাদের ঢের জানা উচিত, কিন্তু লজ্জার সঙ্গে স্বীকার কোরচি আমি এ বিষয়ে খুব কম জানি। এই রকম বোটের ছাঁতের উপর আমাদের কথা-বার্ত্তা চোল্‌তে লাগল; আমাদের মাথার উপরে একটা কাপড়ের আচ্ছাদন আছে; বোটের ঘরের মধ্যে আহারের আয়োজন হোচ্চে, সেখেনে স্থান নেই। মাঝে মাঝে টিপ্ টিপ্ কোরে বৃষ্টি হোচ্চে, কাপড়ের আচ্ছাদনে সেটা নিবারণ কোরচে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘোরতর বাতাস ও বৃষ্টি হোতে আরম্ভ হোল, যে কিছুতে নিবারণ হবার যো নেই। যে দিকে বৃষ্টির ছাঁট পৌঁহুচ্চে না, সেই দিকে মেয়েদের রেখে আমরা আর এক পাশে এসে ছাতা খুলে দাঁড়ালুম। ওমা-দেখি আমাদের দিশি বন্ধু ক—মহাশয় সেই মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, আমি তাঁকে যথেষ্ট ঠাট্টা কোরে নিয়েছিলেম, তিনি বার বার কোরে বোল্লেন, বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া ছাড়া তাঁর অন্য অভিসন্ধি ছিল না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত আমি তা' বিশ্বাস করিনে। আমি তাঁকে তখনি শাসিয়ে রেখেছিলেম যে, দেশে একথা রাষ্ট্র কোরে দেব—তিনি তখন বিশ্বাস করেন নি; তুমি এক কাজ কোর ত; বিকেলে সেই ঘরটাতে যখন তোমাদের পাশার বৈঠক বোস্‌বে, তখন তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে এই কথাটা ঘরের চারদিকে বিস্তার কোরে দিও। কিম্বা তা' যদি না কর ত, বিশ্বম্ভর দাদাকে এই কথাটা অতি গোপনে বোলো ও কাউকে বোল্‌তে বিশেষ কোরে বারণ কোরো, তা' হোলেই সপ্তাহের মধ্যে সকলের কানেই উঠ্‌বে। যাহোক সে দিন আমরা বৃষ্টিতে তিন চার বার কোরে ভিজেছিলেম। এই রকম ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আমরা আমাদের গমা স্থানে গিয়ে পৌঁছ-

লেম। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু আকাশে মেঘ আছে ও জমি ভিজে। মাঠে নেবে আমাদের খাওয়া দাওয়া করবার কথা ছিল, কিন্তু আকাশের ভাবগতিক দেখে তা আর হোল না। খাবার সময়ে দেখি, আহারের অত্যন্ত বিস্তৃত আয়োজন। আমাদের party-র যিনি প্রধান, তিনি আমার অল্প খাওয়া দেখে বোল্লেন যে, আমার picnic-এর উপযুক্ত ক্ষিধে নেই; কিন্তু তাঁর খাওয়ার পরিমাণ থেকে যদি picnic-এর ক্ষিধের পরিমাণ অনুমান কোরে নিতে হয়, তাহোলে, আমি যদি গাছের পাতা ও হস্তকী খেয়ে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে সহস্রবৎসর উপরে পা ও নিচে মাথা রেখে ঋকোদর ও অগস্ত্য মুনির আরাধনা করি তবু আমার picnicএর উপযুক্ত ক্ষিধে হয় না। খাওয়া দাওয়ার পর আমরা নৌকা থেকে নেবে বেড়াতে বেরোলেম; কোন কোন প্রণয়ী-যুগল একটি ছোট নৌকা নিয়ে দাঁড় বেয়ে চোল্লেন, কেউ বা হাতে হাতে ধোরে নিরিবিলি কানে কানে কথা কইতে কইতে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। আমাদের সঙ্গে একজন ফোটগ্রাফ্‌ওয়ালা তার ফোটগ্রাফের সরঞ্জাম সঙ্গে কোরে এসেছিল, আমরা সমস্ত দল মাঠে দাঁড়ালেম, আমাদের ফোটগ্রাফ নেওয়া হোল, সে যন্ত্রে এক সেকেণ্ডের মধ্যে ফোটগ্রাফ নেওয়া যায়, সুতরাং একটু আধটু নোড়লে চেড়লেও বড় একটা হানি হয় না। সহসা ম—মহাশয়ের খেয়ালে গেল যে আমরা যতগুলি রঙ্কমূর্ত্তি আছি, একত্রে সকলের ছবি নেওয়া হবে। আমাদের মধ্যে দুই একটি জন-বুষের পুষ্যি বাছুর ছিলেন, তাঁরা এ প্রস্তাবে ইতস্ততঃ কোরতে লাগলেন পাছে কৃষ্ণমূর্ত্তির দলের মধ্যে তাঁরাও পড়েন, কিন্তু এরকম একটা "invidious distinction" করা তাঁদের মনঃপুত নয়; কিন্তু ম—মশায় ছাড়বার পাত্র নন; তিনি ধোরে বেঁধে দাঁড় করিয়ে আমাদের ছবি নেওয়ালেন। যা হোক্ ছবি নেওয়া প্রভৃতি সাঙ্গ হোলে পর নৌকা লণ্ডন অভিমুখে ছাড়া হোল। তখন ভগবান মরীচিমালী তাঁহার সহস্র রশ্মি সংযমন পূর্ব্বক অস্তাচল-চূড়াবলম্বী কনক-জলধর-পটল-শয়নে বিশ্রান্ত মস্তক বিন্যাস পূর্ব্বক অরুণ-বর্ণ নিদ্রাতুর লোচন মুদ্রিত করিলেন; বিহগকুল স্ব স্ব নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, গাভীবৃন্দ হম্বারব করিতে করিতে গোপালের অনুবর্ত্তন করিয়া গোষ্ঠাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। আমরা লণ্ডনের অভিমুখে যাত্রা কোরলেম। আমরা এক গাড়িতে কতকগুলি দিশিলোক ছিলেম, ও আমাদের সঙ্গে একজন ইংরেজ পুরুষ ও ইংরেজ মহিলা ছিলেন। ম—মহাশয় আমাদের সঙ্গে ছিলেন, সুতরাং আমাদের হাসি তামাসার আর অন্ত ছিল না। এইখানে তোমাকে একটা ঘোরতর গুপ্ত খবর দিচ্চি, খবরদার আর কাউকে বোল না। গাড়িতে আমাদের চ—মহাশয়ের রকম সকম যদি দেখতে তবে অবাক হোয়ে যেতে। মিসু ড—য়ের সঙ্গে তিনি যে রকম ফিস্ ফিস্ কোরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ কোরে দিলেন, মাঝে মাঝে তাঁর মুখের পরে যে

রকম ভাবপূর্ণ দৃষ্টিপাত কোর্ত্তে লাগলেন ও ঠিক তাঁর পাশে যে রকম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোরে নিলেন যে তাতে ক—মহাশয় ম—মহাশয় ও র—মহাশয়ের মধ্যে একটা রহস্য-পূর্ণ চোক-টেপাটেপি পোড়ে গেল ও ম—মহাশয় বাঙ্গলায় বোলে উঠ্‌লেন, "দুই ডাক্তারে মিলে দুজনের মনের উপর surgery প্র্যাক্‌টিস কোরচেন নাকি ?" ক—মহাশয় ডাক্তার এবং মস্ ড—ও ডাক্তার।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভারতীর ৩ ভাগ ৬ সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠারম্ভ।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, প্রথমতঃ বস্তুগণের স্বাতন্ত্র্য এবং দ্বিতীয়তঃ তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এ দুটি ব্যাপার প্রকৃতির পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হইতে কার্য্য-প্রবাহ যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সর্ব্বত্রই (কোথাও বা সুব্যক্ত ভাবে কোথাও বা গূঢ় ভাবে) আবৃত্তি-চক্রের আকার ধারণ করে। রাত্রি দিনের আবৃত্তি জগতের যাবতীয় আবৃত্তির আদর্শ-স্বরূপ। ২৪ ঘণ্টা পরিমাণ দিন-রাত্রি ত আছেই, তদ্ব্যতীত মাসিক রাত্রি-দিন—শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, বার্ষিক রাত্রি দিন—রাত্রি-প্রধান শীতের ছয় মাস এবং দিবা-প্রধান অবশিষ্ট ছয় মাস, তদুত্তরে সূর্য্যের বার্ষিক দিন রাত্রি, অর্থাৎ আমাদের এই সূর্য্য তাহার নিজের সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করাতে-করিয়া আমাদের সূর্য্যের যে এক সূর্য্যোচিত বৎসর উদ্‌গালিত হয় তাহাকে দুই ভাগ করিলে যে দিন-রাত্রি হয় সেই দিন রাত্রি; ধর যেন তাহা এক যুগ পরিমাণ; তাহা হইলে তাহার উপরকার সূর্য্যের রাত্রি দিন তেমন যে কত শত যুগ পরিমাণ তাহা হয় ত কাহারো কল্পনাতেও আসিতে পারে না, এই রূপ পৃথিবীর রাত্রি দিন হইতে ব্রহ্মার রাত্রি দিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ প্রসারিত বিশাল হইতে বিশালতর চক্র-পরম্পরা ক্রমাগত আবর্ত্তিত হইতেছে, এবং সকলের মধ্যে এমনি বলবৎ বন্ধন যে ব্রহ্মার দিন রাত্রি অর্থাৎ আদি-সূর্য্যের দিন রাত্রি কত কল্প পরে সাঙ্গ হইবে তাহার ঠিক্ নাই অথচ সূর্য্য এবং তদা সূর্য্যের দিন-রাত্রি অবধি করিয়া ২৪ ঘণ্টা পরিমাণ আমাদের এই নিতান্ত শিশুপম দিন-রাত্রিগুলি পর্য্যন্ত সমস্তই সেই এক

অনির্ব্বচনীয় বিশাল দিন রাত্রির হস্ত ধারণ করিয়া স্ব স্ব প্রধান-পথে চলিতেছে।

ব্রহ্মাণ্ডের যে এক আবর্ত্ত-চক্র উপরে প্রদর্শিত হইল সেই আবর্ত্তে সকলই আবর্ত্তিত হইতেছে। সে আবর্ত্ত এমনি যে তাহার টানে পড়িয়া সকল বস্তুই চক্রায়মান হইয়া চলিয়াছে ও যেখানে যে কেহ একবার পদার্পণ করিয়াছে দ্বিতীয়বার কস্মিন্ কালেও আর সে সেখানে ফিরিয়া আসিতেছে না ইহা অকাট্য বচন। পূর্ব্বে যেরূপ ঘটিয়াছে ফিরিয়া ঘুরিয়া তাহাই যে ঘটিবে এমন নহে—কিন্তু পূর্ব্ব-ঘটনার সদৃশাকার দ্বিতীয় তৃতীয় ঘটনাবলী পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। সমুদ্র-গর্ভ হইতে পর্ব্বত সকল ক্রমে ক্রমে মস্তকোত্তোলন করিয়া আকাশাভিমুখে উত্থান করিতেছে,আবার জল বায়ুর অবিশ্রাম্য সংঘর্ষণে কালক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইতেছে, আবার নূতন স্থানে নূতন পর্ব্বত পূর্ব্ববৎ গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে; বীজ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া বৃক্ষাকারে আকাশে উত্থান করিতেছে আবার বীজাকারে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছে, পুনরায় আবার নূতন নূতন বৃক্ষাকারে আকাশে উত্থান করিতেছে; এইরূপ প্রকৃতির সকল ব্যাপারই চক্রাবর্ত্তনের ব্যাপার, কিন্তু সে আবর্ত্তনের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন নাই; এক স্থানে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় দ্বিতীয় স্থানে তাহার বীজ নিপতিত হয়, এবং তাহা হইতে পুনর্ব্বার যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা যদিও জাতিতে এক তথাপি তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ব্ব-বৃক্ষ হইতে কোন না কোন অংশে ভিন্ন হইতেই চায়, শুদ্ধ কেবল তাহা নয়, ঐরূপ ব্যক্তিভেদ বংশ-পরম্পরা-ক্রমে সুদীর্ঘ কাল চলিতে থাকা হেতু তাহা অবশেষে জাতিভেদে পরিণত হয়; তাহার সাক্ষী আর্য্যবংশের ইউরোপীয় এবং ভারতবর্ষীয় শাখাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কেবল ব্যক্তিভেদ মাত্র ছিল, সেই ব্যক্তিভেদ এখন, এমনি এক জাতিভেদে পরিণত হইয়াছে যে উভয়কে এক বংশজাত বলিয়া মনে করাই সুকঠিন।

নূতন ঘটনা যাহা কিছু হয় তাহা কোন না কোন অংশে পুরাতনের আবৃত্তি হইতেই চায়, কিন্তু সর্ব্বাংশে নহে। যেমন এক বৃক্ষের বীজ হইতে আর এক বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে তাহাতে সেই উক্ত বৃক্ষ পূর্ব্বোক্তের পুনরাবৃত্তি ইহা সত্য কিন্তু ব্যক্তি-অংশে একটি আর একটি হইতে অনেক বিভিন্ন। দুই মুহূর্ত্তে জগতের কোন বস্তুরই না আছে একস্থানে অবস্থিতি, না আছে এক ভাবে অবস্থিতি,—সুতরাং জগতে এক মুহূর্ত্তে যেরূপ কার্য্য হয় তাহার পর মুহূর্ত্তে অবিকল একই প্রকার কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না; তেমনি আবার একেবারে সৃষ্টি ছাড়া নূতন ব্যাপারও হইতে পারে না। নূতন এবং পুরাতনের মধ্যে কালের যেরূপ একটি সোপান-পঙ্‌ক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অনতিক্রমণীয়—আজিকে মনে কর সমস্ত দিন বাদলা বৃষ্টি হইবার কথা ও কাল নিশ্চিত আকাশ পরিষ্কার হইয়া যাইবার

কথা এমত স্থলে আজিকের দিনটা যতক্ষণ না ফুরায় ততক্ষণ আকাশের নূতন ভাব দর্শনের প্রত্যাশা করা বৃথা, পুনশ্চ মনে কর আজি বৈশাখ-মাসের সবে আরম্ভ,কাল পৌষমাসের শীতভোগের প্রত্যাশা করা যায় পর নাই দুরাশা; এই রূপ এক যুগ পরে যে নূতন ভাব আবির্ভূত হইবে, এক বর্ষের মধ্যে সে ভাবটি প্রত্যাশা করা নিতান্তই দুরভিসন্ধি। এই প্রকার যুক্তি অনুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে যতটুকু নূতন ভাব এখনকার পক্ষে সম্ভব-পর সেই টুকু মাত্রে যত্ন সমর্পণ করা সমাজ-সংস্কারকের কর্ত্তব্য, নচেৎ বামন হইয়া চাঁদে হাত বাড়ানো মাত্রই সার। কোন কিছুই পূর্ব্বতন কোন-কিছু-হইতে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন হইতে পারেও না পারিবেও না, ইহা স্থির নিশ্চয়। প্রস্কার এক দিন ফুরাইলে নূতন যে কিছু ঘটিবে তাহাকেই যদি নূতন বল, তবে সে দিনও ফুরাইবে না, নূতনও কোন কালে কেহ দেখিতে পাইবে না; সে কথা ছাড়িয়া দেও. আমাদের এই সূর্য্য তাহার নিজের সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবী যেরূপ নূতন আকার ধারণ করিবে, তাহাকেই যদি নূতন বল তবে তাহার সহিত আজিকার কালের সহিত কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই বলিলে বিশেষ কিছুই অত্যুক্তি হয় না।

আবৃত্তি-নিয়মের মূলে দুই শক্তির অধিষ্ঠান—কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ। জগৎ যদিও প্রভূত পরিবর্ত্তনের স্রোতে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে তথাপি কেন্দ্রানুগ শক্তি তাহাকে পুরাতনের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে এবং জগৎ যদিও মূলেতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তথাপি কেন্দ্রাতিগ শক্তি তাহাকে প্রত্যহ নূতন নূতনের দিকে চালনা করিতেছে।

ফলিত-জ্যোতিষের মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে তবে উপরি-উক্ত আবৃত্তির নিয়মানুসারে তাহার এক প্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। ব্যক্তি-বিশেষ জন্মিবামাত্র তাহার উপর সমুদায় জগতের শক্তি-প্রভাব অলক্ষিত রূপে কার্য্য করিতে থাকে; সে শক্তি-প্রভাব যদিও প্রতি-মুহূর্ত্তে নূতন বেশ ধারণ করে,যেমন কখনো উত্তাপের প্রভাব কখন শীতের ইত্যাদি, তথাপি গ্রহাদি সকলের সদৃশ স্থানে পুনরাবৃত্তি হইলে তাহাদের শক্তি-প্রভাব যে সদৃশ-রূপে কার্য্য করিবে ইহা বিচিত্র নহে; অমুক মাসে বীজ বপন করিলে প্রচুররূপে শস্য উৎপন্ন হইবে, অমুক মাসে বীজ বপন করিলে তেমন হইবে না, ইহা গণনা করিয়া বলা যেমন পরীক্ষার উপর নির্ভর করে, সেই রূপ গ্রহাদির অমুক অবস্থায় যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে তাহার প্রকৃতি এবং সুতরাং ফলাফল অমুক প্রকার হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে, না হইলেও না হইতে পারে, কিন্তু একেবারে যে হইতে পারেই না এরূপ কথা বলপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে না।

তাহার পরে আসিতেছে সঙ্ঘের নিয়ম। জগৎ যেরূপ বিচিত্র শক্তির ব্যাপার, তাহাতে কখনই এরূপ সম্ভবে না যে জগতে

কেবল পূর্ব্বের আবৃত্তি এবং পুনরাবৃত্তি ক্রমাগতই সমান-ভাবে চলিতে থাকিবে; পূর্ব্বের অভ্যাসাধীন ভাবকে যদি আনুপূর্ব্বিক ভাব বলা যায় এবং বর্ত্তমানের সংসর্গাধীন ভাবকে যদি আনুষঙ্গিক ভাব বলা যায়, তবে এই রূপ দাঁড়ায় যে আনুপূর্ব্বিক ভাব দ্বারা মনুষ্যের স্বভাব আপনাতে বদ্ধমূল হয় এবং আনুষঙ্গিক ভাবেতে করিয়া মনুষ্যের স্বভাব পরিবর্ত্তন হয়।

ক্রমশঃ

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল।*

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ শিরসি মালিখ মালিখ মালিখ"

বররুচিঃ।

কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার এবং সংস্কৃত কবিকুলের প্রধান রত্ন। প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে তিনি উজ্জয়িনীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ১ এই দুই সহস্র বর্ষ মধ্যে কতই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সকল কালের গর্ভে তমোলীন রহিয়াছে। কত কবি, কত বীর কত রাজা কালের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। কিন্তু কালিদাস যে এতকাল জগতের পাঠকবৃন্দকে তৃপ্ত ও মোহিত করিয়া আসিতেছেন, ও দিন দিন দেশ বিদেশে তাঁহার যশোবৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে তিনি এক জন প্রধান কবি সন্দেহ নাই। অতএব আমরা যে এমন মহাত্মার গ্রন্থ-সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা বলিয়া যে আমরা নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইব, ইহা সহৃদয়তা-বিরুদ্ধ এবং কাপুরুষের কার্য্য। আমরা পাঠক মহাশয়কে পূর্ব্বেই বলিতেছি যে, আমরা যদি তাঁহার মতের বিরুদ্ধ কিছু বলি তাহা কখন অসদভিপ্রায়ে নহে।

* এই প্রস্তাবের অনেক স্থলে এমন সমস্ত মত দৃষ্ট হইতেছে যে তাহাতে আমরা কিছুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। লেখক এই প্রস্তাবে অনেকটা স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বর্ত্তমান শিক্ষিত-দলের মধ্যে কাহারও কাহারও কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল সম্বন্ধে এইরূপই অভিপ্রায় দেখা যায়। আমরা পাঠকগণকে কেবল এই রুচিবৈচিত্র প্রদর্শন করিবার জন্য এই প্রস্তাবটি ভারতীতে গ্রহণ করিলাম। ভবিষ্যতে কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুন্তল সম্বন্ধে আমাদের কি অভিপ্রায় তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। সং

১ আমরা মোটামোটী এইরূপ বলিলাম। কালিদাস কোন সময়ে আবির্ভূত হন ও কোন বিক্রমাদিত্যের সভা অলঙ্কৃত করেন তাহার বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

"Nothing extenuate nor set down aught in malice."

কালিদাস আমাদের দেশের রত্ন, আমরাই তাঁহার দোষগুণ বিচার করিতে অধিকারী। আমরা যদি কোন দোষ দেখাই তাহাতে নিন্দা নাই। কিন্তু কোন বিদেশীয় ভর্ম্মাণ পণ্ডিত আসিয়া আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিবেন তাহা আমরা সহ্য করিতে চাহি না।

এই প্রস্তাবে আমরা প্রথমতঃ অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিশেষ সমালোচনা করিব, কারণ ইহা দ্বারা কালিদাসের নাম বিদেশে প্রখ্যাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ তিনি কীদৃশ নাটককার ছিলেন ও তাঁহার কবিত্ব শক্তি কি রূপ ছিল তাহার বিচার করিব।

এখানে আমাদের পাঠক মহাশয়ের নিকট একটী অনুরোধ আছে—তিনি যেন ভাষার প্রতি মমতাশূন্য হইয়া আমাদের মতের বিচার করেন। সংস্কৃত ভাষার স্বভাবত এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে ভাবের চমৎকারিত্ব না থাকিলেও পাঠকের মনে শব্দ-মাধুরীর দ্বারা কুহক লাগাইয়া দেয়—তখন তাঁহার ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকে না—ভাষাতে মুগ্ধ হইয়া মনে করেন ভাবও চমৎকার—আমরা তাহার দুই চারিটী উদাহরণ দিতে বাধ্য হইলাম—

"স গন্ধবদ্দুর্গ্রহগ্রহান্ কটুকীটান্ দশতঃ সতঃ কচিৎ।

"সুহৃদে তরুকোটরস্থিতঃ পটুচঞ্চুপুটকোটিকুট্টনৈঃ॥ নৈষধ

"নবপলাশপলাশবনং পুরঃ স্ফুটপরাগপরাগতপঙ্কজম্।

"মৃদুলতান্তলতান্তমলোকয়ৎ স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ॥ মাঘ

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুরক্রীড়ৎকোকিলকাকলীকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।

নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণপ্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী,
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী,
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে॥

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।

গীতগোবিন্দ।

সংস্কৃত ভাষায় এরূপ কবিতা ভূরি ভূরি আছে, কিন্তু এ সকলেতে বাস্তবিক চমৎকার ভাব কিছুই নাই কিন্তু হয় ত অনেকেই এ সকল শ্লোককে পরমাদরণীয় মনে করেন, বিশেষতঃ নৈষধের বা মাঘের নিন্দা করিলে প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলী একেবারে খড়্গহস্ত হইবেন। এ সকল কেবল শব্দচিত্র—কেবল ললিত-পদ-বিন্যাস দ্বারা আমাদের কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে। অতএব যদি সংস্কৃত কবিদের সাধারণতঃ ভাষার এত ক্ষমতা তবে কালিদাসের ভাষার ক্ষমতা যে কতদূর তাহা বলিতে পারি না—কালিদাসের ভাষা পাঠ করিলে মনে হয়

প্রক্ষ্যোতনং মু হরিচন্দনপল্লবানাং নিষ্পীড়িতেন্দুকরকন্দলজোমু সেকঃ।

আত্মপ্রতীতিতরোঃপরিতর্পণোমে স-
ঞ্জীবনৌদধিরসোঽনু ভবঃ প্রসিক্তঃ ॥

যখন কোন সুন্দরীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হয় তখন তাহার বেশ ভূষার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয় সেইরূপ ভাবের বিচার করিবার সময় তাঁহার প্রতি নিরপেক্ষ হওয়া কর্ত্তব্য।

এক্ষণে আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিচার আরম্ভ করি। নাটকের উপকরণ চারিটী সামগ্রী—আখ্যায়িকা (plot) বাক্যিগণ, ভাব (sentiment) এবং ভাষা বা রচনা। এই কয়েকটী বস্তু যে পরিমাণে উত্তম হইবে নাটকের উপাদেয়তাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। অভিজ্ঞান শকুন্তলে এ গুলি কতদূর চমৎকার হইয়াছে দেখা যাক।

সকলেই অবগত আছেন যে মহাভারতের আদিপর্ব্বে যে শকুন্তলোপাখ্যান আছে তাহা অবলম্বন করিয়া কালিদাস স্বীয় নাটক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন উপাখ্যান অনেকাংশে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপ, অঙ্গুরীয় দর্শন, মারীচাশ্রমে রাজার সহিত শকুন্তলার মিলন প্রভৃতি মহাভারতে নাই। কালিদাস এ সকল ঘটনা মূল উপাখ্যানে সংযোজন করিয়াছেন ২। এরূপ করাতে নাটক অতি মনোহর হইয়াছে বটে কিন্তু "অভিজ্ঞান শকুন্তল যে অলৌকিক পদার্থ" এবং "মনুষ্যের ক্ষমতায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না" এরূপ আমরা স্বীকার করিতে পারি না ৩। মিলটন বাইবেলের কয়েকটী কথা অবলম্বন করিয়া কি অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছেন। দান্তে তাঁহার আশ্চর্য্য কল্পনাশক্তির সহায়ে জগদ্বিখ্যাত "দিভাইনা কর্ম্মিদিয়া" লিখিয়াছেন। সেক্সপেয়ার এবং স্কট অতি সামান্য গল্প অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। সেক্সপেয়ার বলিয়াছেন

"The poet's eye in a fine frensy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And, as, imagination bodies forth the forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name.

অতএব আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি কালিদাস ইহা অপেক্ষা আখ্যায়িকা আরও চমৎকারিণী করিতে না পারিলেন তাহা

২ এরূপ ঘটনা না থাকিলে নাটক হয় না কালিদাস তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন।

৩ কালিদাসের প্রশংসার জন্য সকলেই গেটের প্রণীত কবিতা উদ্ধৃত করেন। কিন্তু সে স্তুতিবাদ কোন কাজের নহে কারণ গেটে সর উইলিয়ম জোন্‌সের গ্রন্থের জর্ম্মাণ অনুবাদ পাঠ করেন। ইহা দ্বারা মূলের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিশ্চয় লুপ্ত হইয়াছিল। তবে যে গেটে এত প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার কারণ যে ভারতবর্ষে যে এমন বস্তু আছে ইহা তিনি কখন আশা করেন নাই।

হইলে তিনি উচ্চশ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না।

আমরা বলিয়াছি যে শকুন্তলার আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব কিছু নাই। তাহার বিচার করিলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই নাটকের ঘটনা সকল সামান্য, যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে। কারণ একজন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া তপোবনে এক পরমাসুন্দরী বালা দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হইল ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই। সকলেরই এরূপ হওয়া সম্ভব, তাহাতে আবার সে কালের রাজারা বহুবিবাহ এবং অন্যায় প্রেমকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। পরে রাজা সেই যুবতীকে গান্ধর্ব্য মতে বিবাহ করিলেন এবং শীঘ্রই নবোঢ়াকে রাজবাটীতে লইয়া যাইবেন স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতেও কিছু মনোহারিত্ব নাই। পরে দুর্ব্বাসার শাপ-প্রভাবে রাজার স্মৃতিরোধ হইল এবং সেই জন্য তিনি পরিণীতা ভার্য্যাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিছুকাল পরে অভিজ্ঞান-দর্শনে স্মৃতি লাভ করিয়া বিস্তর অনুতাপ করেন এবং সৌভাগ্য বশত মারীচের সম্বর্দ্ধনা করিতে গিয়া প্রিয়তমার সহিত মিলন হইল। ইহাতেও বিশেষ চমৎকারিত্ব কিছু নাই। যদ্যপি এমন হইত যে কোন ইয়াগোর ন্যায় সয়তানের দুরভিসন্ধিতে রাজার প্রেমময় মন কলুষিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি শকুন্তলাকে অবমাননার সহিত দূরীকৃতা করিলেন, পরে সমস্ত অবগত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া শকুন্তলাকে পাইলেন তাহা হইলে কিঞ্চিৎ নূতনের পরিচয় পাওয়া যাইত। কারণ রাজার মনকে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়া ও পরে ক্রমশঃ যথার্থ ঘটনা সকল প্রকাশ করা ইহাতে অনেক কৌশলের আবশ্যক হইত। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ সংযোজনা করাতে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে মূল উপাখ্যান অপেক্ষা নাটক ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু একটী দোষ ঘটিয়াছে। যখন আমরা জানিলাম যে দুর্ব্বাসার শাপবলে এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল তখন আমাদের তাদৃশ ঔৎসুক্য হওয়া সম্ভব তাদৃশ হইল না। কারণ ঋষিরা প্রায় দেবতা বলিলেই হয়, এমন কি কেহ কেহ দেবতা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী। তাঁহারা যাহা বলিবেন তাহা বিধাতার আজ্ঞার ন্যায় কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না; অতএব অদৃষ্টে আছে বলিয়া যেমন লোকে শোক সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করে আমরাও তেমনি শকুন্তলার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে বলিয়া ক্ষান্ত হই এবং আমাদের ঔৎসুক্য হ্রাস হয়।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের আখ্যায়িকা সম্বন্ধে আরও একটী দোষ আছে। ইহাতে ঘটনাবাহুল্য একবারে নাই কেবল একটী শাদাসিধা প্রণয়োপাখ্যান। রত্নাবলী, তদনুকরণে রচিত৪ মালবিকাগ্নিমিত্র, এবং

৪ এই নাটক যে কালিদাস কর্ত্তৃক বিরচিত নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। যদি যথার্থই কালিদাস ইহার গ্রন্থকর্ত্তা হন তাহা

মৃচ্ছকটিক প্রেমোপাখ্যান বটে কিন্তু নানাবিধ ঘটনার দ্বারা এমন সুসজ্জিত যে অভিজ্ঞান শকুন্তলের অপেক্ষা উহাদের উপাখ্যান মনোহর এবং কুতূহলজনক। শকুন্তলা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে অবশেষে কি ঘটিবে। পরে যখন দুর্বাসার শাপ পর্য্যন্ত পাঠ করাগেল তখনই সমস্ত রহস্য একবারে ভিন্ন হইল। আমাদের কৌতূহল নষ্ট হইয়া গেল ৪। রাজা যে প্রত্যাখ্যান করিবেন পুরে স্মৃতিলাভ করিবেন এবং প্রিয়তমার সহিত পুনর্ম্মিলন হইবে এ সমস্তই বুঝিতে পারিলাম ৫। কালিদাস যে চতুর্থ অঙ্কের প্রবেশকে দুর্বাসার শাপের বর্ণনা করিয়াছেন ইহা অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রধান দোষ: ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে কালিদাসের নাটকীয় শক্তি তাদৃশী চমৎকারিণী ছিল না।

আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব থাকা আবশ্যক এবং উপসংহারের ৬ প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নানাবিধ ঘটনা সংযোজনা করিলে পাঠকের মনে ঔৎসুক্য জন্মে। চমৎকারিত্ব থাকিবে বলিয়া যে ঘটনা সকল ইন্দ্রজালের ন্যায় হইবে এমন নহে। কবি যত দূর স্বভাবের অনুকরণ করিবেন ততই নাটক মনোহর হইবে কিন্তু তাহারই মধ্যে কল্পনা প্রভাবে ঘটনা সকল এরূপ সংযোজন করা আবশ্যক যে পূর্ব্বাপর পাঠ বা দর্শন করিলে কোন অংশ অসংলগ্ন বা অসম্ভব বোধ হইবে না। ঘটনা সকল পরস্পর-সাপেক্ষ এবং ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে। তাহাদের ক্রমাভিব্যক্তিই ৭ নাটকের প্রধান গুণ। ক্রমাভিব্যক্তি কাহাকে বলে তাহা অদ্বিতীয় কবি সেক্‌স্‌পিয়ারের গ্রন্থ সকল পাঠ করিলে সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়। হেমলেট যে পিতৃআজ্ঞা পালন করিয়া স্বয়ংহত হইবেন এরূপ প্রথমে কখনই মনে হয় না, কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা স্পষ্টই সম্ভব, এমন কি আবশ্যক হইয়া উঠিল। ওথেলো যে প্রিয়তমার প্রাণ বিনাশ করিবেন তাহা ঘটনার দ্বারা ও ইয়াগোর দুরভিসন্ধিতে কেমন সম্ভব হইয়া উঠিল।

হইলে সে কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলের রচয়িতা নন। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভবর নামক জর্ম্মান পণ্ডিত বলেন যে মালবিকাগ্নি মিত্র কালিদাস-রচিত এবং এই স্থির করিয়া কালিদাসের আধুনিকতার প্রমাণ করিয়াছেন।

৫ মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী, মালবিকাগ্নিমিত্রে এরূপ দোষ নাই। শেষ পর্য্যন্ত আমাদের ঔৎসুক্য প্রবল থাকে। এবং উপসংহার নানাবিধ ঘটনার দ্বারায় সম্পাদিত হইয়াছে। এখানে আমাদের বলা কর্ত্তব্য যে কালিদাস বস্তু সঙ্কলন করিতে বিশেষ নিপুণ ছিলেন না। তাহার অন্য কাব্য ও নাটকে আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব নাই। ফলতঃ কালিদাস plot নির্ম্মাণ বিষয়ে অপারগ ছিলেন।

৬ এ প্রস্তাবে উপসংহার শব্দের ইংরাজীতে অর্থ catastrophe অথবা denouement.

৭ যাহাকে ইংরাজীতে gradual development of the plot বলে।

মেক্‌বেথকে আমরা প্রথমতঃ একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ প্রভুভক্ত লোক বলিয়া জানি, কিন্তু কি আশ্চর্য্য কৌশলে কবি তাহাকে ভয়ানক নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইলেন। এইরূপ বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। সহৃদয় পাঠক মাত্রেই জানেন যে কিসে কবির ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয় স্বীকার করিবেন যে সেরূপ ক্ষমতার পরিচয় কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তলে দেন নাই। অতএব এ নাটককে আমরা অলৌকিক বস্তু বলিতে পারি না। ইহাতে বাস্তবিক চমৎকারিত্ব কিছুই নাই কেবল ভাষের ও রচনার গুণে বোধ হয় মাত্র। কিন্তু পাঠক যদি অলৌকিক শব্দের অন্য অর্থ গ্রহণ করেন তাহা হইলে দুর্ব্বাসার শাপকে অলৌকিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কেহ এরূপ স্বীকার করিবেন না।

এক্ষণে আমরা ঐ নাটকের ব্যক্তিদিগের স্বভাব কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহা দেখি। এ নাটকে রাজা দুষ্মন্ত, শকুন্তলা এবং মহর্ষি কণ্ব এই তিন জন প্রধান ব্যক্তি। ইহাঁদের বিষয় কিঞ্চিৎ সবিস্তরে বলা যাক।

রাজা দুষ্মন্ত একজন ধীরললিত নায়ক। তাঁহাতে উদাত্ত গুণও কিছু লক্ষিত হয়। তিনি আত্মশ্লাঘাবর্জ্জিত বিনয়ী ধর্ম্মভীরু এবং ক্রূরতাশূন্য এই সকল পরিচয় আমরা অতি স্পষ্টরূপে পাই[৮]। বস্তুতঃ দুষ্মন্ত যে একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তাহা নহে কিন্তু প্রাচীন কালে সচরাচর রাজারা যেরূপ ছিলেন তাহা কালিদাস চিত্রপটের ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্তের ঋষিদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাঁহারা নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেছেন কিনা ইহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল; এবং যখন তপোবনের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন সূতকে বলিলেন "তপোবননিবাসিনাং উপরোধো মাভূৎ এতাবত্তোব রথং স্থাপয়।" দুষ্মন্ত অতিশয় বিনীতস্বভাব; তিনি বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আভরণ ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া গেলেন কারণ "বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম।" (তাঁহার বিনয়ের পরিচয় সপ্তম অঙ্কেও যথেষ্ট আছে, তিনি মাতলির প্রশংসা শুনিয়া যেন বিরক্ত হইতেছেন ও আপনাকে ইন্দ্রের অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র মনে করেন না।) তপোবন প্রবেশ-কালে তাঁহার মন শারদীয় আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। অল্পকাল পরে তাঁহার দক্ষিণ বাহু স্পন্দন হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল কিন্তু তিনি যেন তাচ্ছিল্য করিয়াই বলিলেন "অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র।" এই কথার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। পরে তাঁহার বিশুদ্ধ

৮ সাহিত্য দর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের যে লক্ষণ আছে দুষ্মন্ত সেরূপ নহেন, সেই জন্য তাঁহাকে ধীরললিত বলা গেল, যথা "নিশ্চিন্তোমৃদুরনিশং কলাপরোধীরললিতঃ স্যাৎ"। কিন্তু ধীরোদাত্ত যথা 'রামযুধিষ্ঠিরাদি'। আলঙ্কারিকদিগের মতে নাটকের নায়ক ধীরোদাত্ত হওয়া আবশ্যক।

গম্ভীর চিত্তে কিরূপে প্রগাঢ় প্রেম জন্মিল, তাহা কালিদাস উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন। প্রথম প্রবেশ করিয়া রাজা যখন শকুন্তলা ও তৎসখীদ্বয়কে জলসেচন করিতে দেখিলেন তখনই যে একবারে লঘুপ্রকৃতির ন্যায় মন্মথ-বাণে আবিদ্ধ হইলেন তাহা নহে, তিনি দেখিয়া বলিলেন "আহো মধুরমাসাং দর্শনম্।" এই প্রশংসা-বাক্যে বিস্ময় বুঝাইতেছে কিন্তু প্রেমের কোন লক্ষণ নাই—সুন্দরী কিশোরবয়স্কা বালা দেখিয়া কাহার না চক্ষুঃপ্রীতি জন্মে ও হৃদয় আহ্লাদিত হয়। প্রথমে রাজারও সেইরূপ হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে করুণার উদয় হইল। তিনি মহর্ষি কণ্বকে অসাধুদর্শী মনে করিলেন, কারণ তিনি শকুন্তলাকে তপঃকার্য্যে নিযুক্তা করিয়াছেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে রাজার মনে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও স্পষ্ট রূপে প্রেমের ভাব উদিত হয় নাই। আমরা জানি যে "pity melts the soul to love" ইহার পর রাজা সতৃষ্ণ নয়নে শকুন্তলার প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন "কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্"। এখন তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। তিনি "লোভনীয় কুসুমকে" কি রূপে লাভ করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে শকুন্তলা যদি মহর্ষির অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা হয় তাহা হইলে তিনি বিবাহ করিতে পারেন। ইহা দুষ্মন্ত রাজার প্রকৃতি-অনুযায়ী, তিনি ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মনে ক্রূর বা অসদভিপ্রায় নাই। তিনি অসৎ প্রেমের কথা ঘুণাক্ষরেও মনে করেন নাই, শকুন্তলাকে বিবাহ দ্বারা লাভ করিবেন কিন্তু অনুরাগ তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে শকুন্তলাকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ স্থির করিলেন, ও মুগ্ধ হইয়া ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিতেছেন "অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।" এরূপ গর্ব্বও এখানে অতি সুন্দর, কারণ যখন লোকে প্রেমে মত্ত হয় তখন তাহাদের আত্ম অভিমান বৃদ্ধি হয়। ক্রমে রাজা আত্মপ্রকাশ করিলেন ও নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। রাজার কথোপকথন অতি মনোহর এবং স্ত্রীদিগের প্রতি সম্মানসূচক। আমরা প্রথম অঙ্ক পাঠ করিলে উপরোক্ত ভাব সকল অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। কিন্তু রাজার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় গুণ লক্ষিত হয় না। সমস্ত নাটক পাঠ করিলে প্রথম অঙ্কে যে সকল গুণ দেখিলাম সেই সকল পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা যখন তাঁহার প্রণয়-ব্যাপার মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন তখন তাঁহার সেই গম্ভীর স্নেহময় স্বভাব প্রকটিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন

"কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।

অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে॥"

আবার মৃদুহাস্য করিয়া বলিতেছেন।

" এবমাত্মাভিপ্রায় সম্ভাবিতেষ্টজনচিত্ত বৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্বাতে।" ইত্যাদি

ইহাতে যেন আমরা রাজা চিন্তামগ্ন ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া এক দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন তাহা চিত্রপটের ন্যায় দেখিতেছি। পঞ্চম অঙ্কে রাজার চরিত্র সেইরূপ ধর্ম্মভীরু বিনীত এবং ক্রূরতাশূন্য। তাঁহার স্মৃতি লোপ হইয়াছে কি করেন আপনাকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। আর শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন তাঁহার প্রকৃতি এরূপ লঘু নহে ৯। এ অঙ্কে ঋষিদের সহিত কথাবার্ত্তাতে তাঁহার সেই বিনয় ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অঙ্কে তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও সেই প্রশান্তা সরলা স্নেহযুক্তা প্রকৃতি। অতএব দেখা যাইতেছে যে তাঁহার স্বভাব যেরূপ বর্ণনা করা কালিদাসের অভিপ্রেত তাহা উত্তম হইয়াছে কিন্তু আমাদের বিশেষ মনোজ্ঞ নহে। রামের চরিত্র পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় যেমন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া যায়, রাবণের পরাক্রম ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা যেমন বিস্মিত হই; যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠতা দেখিলে আমাদের মনে যেমন ভক্তির উদয় হয়; এরূপ কোন ভাব দুষ্মন্ত-চরিত্র-পাঠে আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না। অতএব দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র বর্ণনাতে কোন দোষ ঘটে নাই বটে কিন্তু কালিদাসের ক্ষমতার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। দুষ্মন্ত রাজার ন্যায় ব্যক্তি সংস্কৃত নাটকে বিস্তর দেখা যায়।

এখন আমরা শকুন্তলার চরিত্রের প্রতি নিরীক্ষণ করি। আমরা বলিয়াছি যে রাজার চরিত্র সম্বন্ধে কালিদাসের কোন দোষ ঘটে নাই কিন্তু শকুন্তলার স্বভাব বর্ণনাতে তাঁহার ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে। শকুন্তলা অতি সরলস্বভাবা ও স্নেহময়ী, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি লঘু। ফুৎকারের ভরে যেমন তৃণখণ্ড উড়িয়া যায় শকুন্তলা সেইরূপ অল্পেতেই একবারে অধীরা হয় ইহা আমরা পরে দেখিব। রাজাকে দেখিবা মাত্র শকুন্তলার মনে তপোবন-বিরোধী এক ভাব উদিত হইল। ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখিতেছি না কারণ ইহা অসম্ভব নহে এবং ইহা দ্বারা শকুন্তলার সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। সরলা বালার হৃদয় অতিশয় কোমল তাহাতে প্রেম শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। এখানে আমরা ফর্ডিনাণ্ড ও মিরাণ্ডার কি ঘটিয়াছিল তাহা স্মরণ করিব। মিরাণ্ডা ফর্ডিনাণ্ডকে দেখিয়াই একবারে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল। শকুন্তলার স্বভাব প্রায়

৯ রাজা যে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়াও তাহাকে গ্রহণ করেন নাই এরূপ ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অনেকে প্রতীহারীর ন্যায় বিস্মিত হইবেন কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য মনে করি না, কারণ তিনি প্রথমে অস্বীকার করিয়া কিরূপে আবার গ্রহণ করেন! আবার তিনি একজন মহান রাজা, তাঁহার এরূপ লঘুচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব প্রত্যাখ্যান করাই উচিত, ইহাতে প্রশংসা নাই, না করিলে বরঞ্চ দোষ পড়িত।

মিরাণ্ডার মত, পর্ডিটার মতও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ শকুন্তলা, মিরাণ্ডা, পর্ডিটা ইহাদের তিন জনেরই স্বভাব ও অবস্থা এক প্রকার। শকুন্তলা জন্মাবধি ঋষিদের কর্ত্তৃক তপোবনে প্রতিপালিতা; মিরাণ্ডাও শৈশবাবধি তাহার ঋষিকল্প পিতা প্রস্পেরো কর্ত্তৃক লালিতা, এবং পর্ডিটা অতি সরলচিত্ত রাখালদের গৃহে আজন্ম কাল বর্দ্ধিতা হইয়াছিল। আবার আরও একটী চমৎকার সৌসাদৃশ্য আছে, তিন জনেই উচ্চ বংশোদ্ভবা, কিন্তু তিন জনই হীনাবস্থায় পতিত। ইহাদের চরিত্রের মধ্যে যে সামান্য প্রভেদ আছে তাহা প্রত্যেকের অবস্থানুরূপ। মিরাণ্ডা তাহার পিতা ও এক অদ্ভুত ভৃত্য ব্যতীত আর জগতের কাহাকেও দেখে নাই এ জন্য তাহার সরলতাও বালিকাস্বভাব শকুন্তলা অপেক্ষা অধিক। পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সহিত পলায়ন করিল, কিন্তু আবশ্যক হইলে শকুন্তলাও করিত, কারণ যখন পিতৃআজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়া রাজাকে পতিত্বে বরণ করিল তখন যে পলায়ন করিবে ইহা ত সামান্য কথা। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ইহাদের স্বভাব এক প্রকারের। কিন্তু কালিদাস এমন মুগ্ধা সরলা বালার বর্ণনা যাহা করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় নহে, এমন কি শকুন্তলার স্বভাববিরুদ্ধ। প্রথম অঙ্কে শকুন্তলাকে মুগ্ধা সরলা স্নেহময়ী দেখা যায়, চতুর্থ অঙ্কে যখন শকুন্তলা সকলের নিকট বিদায় লইতেছে তখন অবিকল সেই স্বভাব এবং পঞ্চম অঙ্কেও সেই রূপ; ইহাতে কবির যা অভিপ্রায় তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সে অভিপ্রায়-বিরুদ্ধ আচরণ অনেক স্থলে বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কে ১০ দৃষ্ট হইয়া থাকে। শকুন্তলা যখন রাজাকে ছাড়িয়া যাইতেছে তখন তাহার আচরণ সরলার ন্যায় নহে। কুশ দ্বারা চরণ ক্ষত হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিল এবং শাখাতে বল্কল লগ্ন হইয়াছে এই ছলে রাজার প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। এই সকল ব্যাপার চতুরা প্রগল্‌ভা রমণীর শোভা পায় কিন্তু শকুন্তলার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ। শকুন্তলা ও তাহার সখীগণ নানা গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রেম কি বস্তু তাহা কতক বুঝিয়াছিল, কিন্তু তাহা বলিয়া এরূপ পরিপক্কতা পাইয়াছে ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দুমহিলারা শালীনতার জন্য জগতে প্রসিদ্ধা। কালিদাসের বর্ণনাতে সেরূপ শালীনতা নাই। শকুন্তলা যেন লজ্জার মাথা খাইয়াছে। ১১

শকুন্তলার বর্ণনাতে আরও একটী মহৎ

১০ গৌড়ীয় গ্রন্থতে যেরূপ রাজার ও শকুন্তলার প্রেমালাপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা কালিদাসের রচিত এরূপ নিশ্চয় বলা যায় না। কালিদাস ঐরূপ বর্ণনা করিতে ভাল বাসেন। কিন্তু এরূপ বর্ণনা সুরুচি লোকের আদরণীয়া হইতে পারে না।

১১ ভবভূতি মালতীমাধবে যেরূপ মালতীর স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শকুন্তলা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ মনে হয়। মালতীর কথাবার্ত্তাতে শকুন্তলার মত উন্মত্ততা নাই। এবং শকুন্তলার অপেক্ষা মালতীর শালীনতা অধিক।

দোষ আছে। গোপনে শকুন্তলা রাজার পাণিগ্রহণ করিয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করিল। ইহা দ্বারা তাহার চরিত্র হেয় জ্ঞান হয়। সরলচিত্ত লোকেরা গুপ্তকার্য্য পাপ বলিয়া জ্ঞান করে; শকুন্তলা অসঙ্কুচিতচিত্তে যে এরূপ গুরুতর গুপ্তকার্য্য করিল ইহা স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং আজন্মকাল তপোবনে সাধুসঙ্গে থাকিয়া শকুন্তলা যে নীতিশিক্ষা পাইয়াছিল তাহারও বিরুদ্ধ। ইহাতে আমরা স্পষ্ট রূপে দেখিতেছি যে কালিদাস মানব হৃদয় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই। সেক্‌স্‌পেয়ার এরূপ দোষে লিপ্ত নহেন। মিরাণ্ডার মনে প্রেমের সঞ্চার প্রথমেই হইয়াছিল বটে কিন্তু পিতার আজ্ঞা পাইয়া তবে ফর্ডিন্যাণ্ডকে পতিত্বে বরণ করে; পর্ডিটা ফ্লোরিজেলের সঙ্গে পলায়ন করিয়াও বিবাহ করে নাই। ইহাদের প্রেমের ভাব শকুন্তলা অপেক্ষা কতদূর উন্নত এবং রমণীয় তাহা সহৃদয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। এখানে আমরা দেখিতেছি যে মিরাণ্ডা ও পর্ডিটার অপেক্ষা শকুন্তলার সাহস অধিক। ইহার কারণ যে শকুন্তলা প্রেমে একেবারে উন্মত্ত ও অধীরা হইয়াছিল ১২। ঐ উন্মত্ততা বশতঃ সে রাজার প্রেমে অসংকুচিতচিত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিল, ইহা নিতান্ত গর্হনীয় এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহি নহে। কালিদাসের প্রেম কি রূপ তাহা আমরা কিছু সবিস্তরে বলিব সে জন্য এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

ক্রমশঃ

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ।

সকলেই জানেন যে ভারতবর্ষই গণিত শাস্ত্রের জন্মভূমি, কিন্তু অনেকের এখনো এরূপ সংস্কার আছে যে, জ্যামিতি-বিদ্যার জন্মভূমি আমাদের এ দেশ নহে—গ্রীস্ দেশ; কথাটাই শুনিতে কেমন ঠেকে যে, যে দেশ—গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ণ, তত্ত্ববিদ্যা, প্রভৃতি সকল বিদ্যারই আদিম বাসস্থান, সে দেশে ভূমিমান বিদ্যা একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল; কিন্তু পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অধ্যবসায়কে ধন্য—তাঁহারা খুঁজিয়া পাইয়াছেন যে, বৈদিক যুগেও আমাদের দেশে জ্যামিতির অনুশীলন ছিল; জ্যামিতিক প্রণালী অনুসারে যজ্ঞকুণ্ডের ইষ্টক সাজাইবার ব্যবস্থা বৈদিক শাস্ত্রেও স্পষ্টা-

১২ অনেকে বলিবেন যে সেক্‌সপেয়ারের কোন কোন নায়িকা এই রূপ। জুলিয়েটের সহিত শকুন্তলার সাদৃশ্য আছে। জুলিয়েট এইরূপে ধৈর্য্যশূন্যা হইয়া কামনোবাকো রোমিওর ভাবনাতে মগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বক্তব্য যে জুলিয়েটের অবস্থা এবং শকুন্তলার অবস্থাতে অনেক প্রভেদ আছে। আর জুলিয়েট যখন নির্জ্জনে রোমিওর কথা আন্দোলন করিতেছিল তখন অতি গোপনে অলক্ষিত ভাবে রোমিও শুনিতে পাইয়া দুষ্মন্তের ন্যায় আত্ম প্রকাশ করে। কিন্তু শকুন্তলা আবার কামাতুরা জুলিয়েটকে জিনিয়াছে। কারণ রাজার নিকট লিপি পাঠাইতে উদ্যতা হইয়াছিল।

করে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অনেকের এরূপ বিশ্বাস এবং সে বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে যে, গ্রীক দেশীয় আদি তত্ত্ববিৎ পিথাগোরাস্ আমাদের এ দেশ হইতে তত্ত্বজ্ঞানের বীজ লইয়া গিয়া তাঁহার নিজ দেশে তিনিই সর্ব্ব-প্রথমে তাহার চাস আরম্ভ করেন; এই পিথাগোরাস্‌ই ইউক্লিডের জ্যামিতির প্রথম সর্গের ৪৭ সিদ্ধান্তের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত; এ দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ ৪৭ সিদ্ধান্তটিই বৈদিক কালীন যজ্ঞীয় ইষ্টক সাজাইবার সময় বিশেষ রূপে প্রয়োজন হইত; ইহাতে কি বুঝাইতেছে? পিথাগোরাস্ ইউক্লিডের সেই সিদ্ধান্তটিরই আবিষ্কর্ত্তা—বৈদিক সময়ে আমাদের দেশে যেটির অধিক-মাত্রা অনুশীলন ছিল; অবশ্য—তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এদেশ হইতে জ্যামিতি-বিদ্যার বীজ গুলিও সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন, নহিলে ওরূপ আশ্চর্য্য মিল ঘটিবার সম্ভাবনা কি? আর একটি কথা এই যে, পিথাগোরাস্ সংখ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন; সকলেই জানেন যে দশাঙ্ক-মূলক সংখ্যার লিখন-প্রণালী আমাদের দেশের একটি স্বজাত সামগ্রী; তাহার সাক্ষী—রোম দেশীয় সংখ্যা-লিখন-প্রণালী অদ্যাপি যাহা ঘড়ির অঙ্কে ব্যবহৃত হয় তাহা পঞ্চাঙ্ক-মূলক; দশাঙ্ক-মূলক সংখ্যা প্রণালীর যেমন শূন্য হইতে নয় পর্য্যন্ত সংখ্যা চিহ্ন ব্যতীত আর কোন নূতন সংখ্যা চিহ্ন প্রয়োজন হয় না, উহার সেরূপ নহে;—উহার প্রত্যেক দশকের আদিতে নূতন নূতন সংখ্যা-চিহ্ন সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশের দশাঙ্ক-মূলক সংখ্যা-প্রণালী দেখিয়া সংখ্যার প্রতি পিথাগোরাসের যে একটি অপূর্ব্ব ভক্তি জন্মিবে ইহা কিছুই বিচিত্র নহে; অতএব আপাততঃ ইহা একরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরা যাইতে পারে যে তত্ত্বজ্ঞান গণিত ও জ্যামিতি তিনেরই বীজ আমাদের দেশ হইতে গ্রীস্‌দেশে যায়, পরে তাহা সেখানকার নানা স্থানে নানা প্রকারে অঙ্কুরিত হইয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। পিথাগোরাসের শিষ্যানুশিষ্য প্লেটোর মতের সহিত আমাদের দেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের মত-সাদৃশ্য উহার আর একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

জ্যামিতি-বিদ্যা যদিও আমাদের দেশ হইতে গ্রীস্‌দেশে গিয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রীস্‌দেশে তাহার অনুশীলনের যেমন একটি অপূর্ব্ব প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে তেমনটি আমাদের দেশে কস্মিন্ কালেও হয় নাই; পুঙ্খানুপুঙ্খ যুক্তি-প্রণালী দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবার যে একটি পদ্ধতি, ইউক্লিডের জ্যামিতি তাহার একটি অনন্য-সাধারণ আদর্শ। ইহা সত্ত্বেও আমরা এটুকু বলিতে ছাড়িব না যে, ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তিমূল সম্পূর্ণরূপে দোষ-শূন্য নহে। ইউক্লিডের গোড়ার তত্ত্বগুলি যদি আমাদের দেশোচিত সহজ বুদ্ধি দ্বারা স্থিরীকৃত হইত তাহা হইলে ইউক্লিডের জ্যামিতি সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ হইত—ইহা অচিরাৎ প্রদর্শন করা যাইবে; সহজ বুদ্ধিতে যাহা সহজে

ধরা পড়ে, অত্যন্ত মার্জিত বুদ্ধিতে তাহা অনেক সময়ে এড়াইয়া যায়; এই কারণে ইউক্লিডের জ্যামিতির ভিত্তি-মূলে কতকগুলি দোষ পৌঁছিয়াছে;—আমরা ইউক্লিডের বিরোধী পক্ষ বলিয়া নহে পরন্তু আমরা তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া তাঁহার সেই দোষ গুলির সংশোধনে এতাধিক আয়াস পাইতেছি; আমাদের চেষ্টা কিঞ্চিৎ মাত্রও যদি সফল হয়, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ইউক্লিড প্রথমেই বিন্দু এবং রেখার এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন——যাহার স্থান মাত্র আছে কিন্তু আয়তন নাই তাহাকেই বিন্দু কহে, আর যাহার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ নাই তাহাকে রেখা কহে; কিন্তু এ দুটি কথা বুঝিতে হইলে অতীব মার্জিত বুদ্ধিকেও পরাস্ত মানিতে হয়; প্রথমতঃ আয়তনই জ্যামিতি-বিদ্যার যথা-সর্ব্বস্ব, আদবেই যাহার আয়তন নাই জ্যামিতি সম্বন্ধে তাহা কিছুই নহে, যাহা কিছুই নহে তাহার স্থান-নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, অতএব বিন্দুর আয়তন নাই অথচ তাহার স্থান আছে এ কথা যুক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; দ্বিতীয়তঃ আদবেই যাহার প্রস্থ নাই এরূপ দৈর্ঘ্য অসম্ভব; পুনশ্চ দৈর্ঘ্য কি, প্রস্থ কি, বেধ কি, তাহা জানিতে হইলে তিনটি সরল রেখা একটি বিন্দু হইতে আড় কোণে (right angle) ত্রিধা প্রসারিত হইয়াছে এটি অন্তত জানা চাই, সুতরাং সরল রেখা কি তাহা জানা চাই; এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, রেখার সংজ্ঞা আয়ত্ত করিতে গেলে সরল-রেখার সংজ্ঞা না জানিলে চলে না—কিন্তু রেখার সংজ্ঞা-নিরূপণের পূর্ব্বে সরল-রেখার সংজ্ঞা নিরূপণ আর শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া—একই ব্যাপার; সুতরাং ইউক্লিডের কৃত রেখার উক্ত সংজ্ঞা নাম-মাত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ইউক্লিড সরল-রেখার এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন—দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী যত রেখা হইতে পারে তাহাদের মধ্যে যে রেখা সর্ব্বাপেক্ষা ছোটো সেই রেখা সরল-রেখা বলিয়া উক্ত হয়; কিন্তু ইউক্লিডের এ সংজ্ঞাটি সংজ্ঞা-নামের উপযুক্ত নহে; তাহার সাক্ষী—যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা ইউক্লিড্‌কে স্বতন্ত্র এই একটি সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইয়াছে যে, ত্রিকোণের দুই ভুজ অপেক্ষা তাহার তৃতীয় ভুজ ছোটো, আর এক কথায় এই যে দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী সরল রেখাদ্বয়ের সমষ্টি-জাত ভগ্ন-রেখা অপেক্ষা উক্ত বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা ছোটো; দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী উক্তরূপ ভগ্ন-রেখা অপেক্ষা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা ছোটো ইহা যদি প্রমাণ-সাপেক্ষ হইল তবে দুই বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী বক্র-রেখা অপেক্ষা তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সরল-রেখা ছোটো ইহার প্রমাণ আবশ্যক না হয় কেন?

ইউক্লিড কোণের এইরূপ সংজ্ঞা করিয়াছেন যে, দুই যোগযুক্ত রেখার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অবনতিকে কোণ কহে, এই সংজ্ঞাই যদি ঠিক হয় তবে অবশ্য

সেই অবনতির ন্যূনাধিক্য-অনুসারে কোণ ছোটো কি বড় তাহা নিরূপিত হইবে, কিন্তু ফলে ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়,—অবনতির মাত্রাধিক্য হইলে কোণ বড় না হইয়া ছোটো হয় এবং উহার মাত্রা অল্প হইলে কোণ ছোটো না হইয়া বড় হয়, এইরূপ কোণের পরিমাণ-কালে তাহার সংজ্ঞার বিপর্য্যয় দশা উপস্থিত হয়।

সমান্তর রেখা ঘটিত ইউক্লিডের দ্বাদশ স্বতঃসিদ্ধ বচনটি স্বতঃসিদ্ধতা-হইতে বহুদূরে স্থিতি করে ইহা সকল জ্যামিতি গ্রন্থকর্ত্তারাই একবাক্যে স্বীকার করেন। ইউক্লিডের উক্ত কতকগুলি দোষ সংশোধন মানসে নূতন একটি পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক আমরা জ্যামিতির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতেছি।

সে নূতন পদ্ধতি এই যে, ইউক্লিড শুদ্ধ কেবল শূন্য আকাশের আয়তনই জ্যামিতির মধ্যে স্থানে দিয়াছেন, আমরা তাহাতেই বদ্ধ না থাকিয়া জড়বস্তু-গত আকাশের আয়তনও আমলে আনিব; ইহাতে কেহ যদি ইউক্লিডের পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে এই বলিয়া দোষ দেন যে, ভৌতিক বস্তুর আয়তন সকলকে আমলে আনা বাড়ার ভাগ—তাহাতে ফল কিছুই নাই, লাভের মধ্যে জ্যামিতির বিশুদ্ধতাটি নষ্ট করা হয়; তবে তাঁহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, শূন্য আকাশে বদ্ধ থাকাই যদি জ্যামিতির বিশুদ্ধতা হয় তবে তাহা ইউক্লিডের হস্তে বহুকালে যাবৎ মারা গিয়াছে; ইউক্লিড যখন তাঁহার প্রথম সর্গের চতুর্থ প্রস্তাবে একটা ত্রিকোণকে আর একটা ত্রিকোণের গাত্রসাৎ করিয়া বসাইতে বলিয়াছেন তখনই পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণকে জড়বস্তু স্বীকার করা হইয়াছে, যেহেতু শূন্য আকাশ-খণ্ডকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া কোন মতেই সম্ভবে না; —সুতরাং সেই প্রস্তাবের সিদ্ধান্তের উপর আর যতগুলি প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে সকলেরই বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়াছে; হইল-হইল তাহাতে ক্ষতি কি? জড় বস্তুগত আকাশ ও আকাশ শূন্যাকাশও আকাশ—আয়তন-সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে জাতিভেদের প্রসঙ্গই উঠিতে পারে না, তবে একটিকে আমলে আনিব আর একটিকে আমলে আনিব না এরূপ পক্ষ-পাতিতা কেন? আমরা উল্টা আরো বলি যে ঐরূপ পক্ষপাতিতাটাই দোষ।

ইউক্লিডের জ্যামিতির পাঁচটি পৃথক্ অবয়ব—সংজ্ঞা (Definition) স্বতঃসিদ্ধ বচন (Axiom) স্বতঃসাধ্য ক্রিয়াবিধি (Postulate) মীমাংস্য সিদ্ধান্ত (Theorem) সমস্যা (Problem); কিন্তু আমরা জ্যামিতি কর্ত্তাদিগের অনেকের মতানুগামী হইয়া সমস্যা অবয়বটি নিষ্প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করিতেছি। আকাশ-ঘটিত আয়তন সম্বন্ধে সত্য নির্ণয় করাই জ্যামিতির মুখ্য উদ্দেশ্য তাহার আনুষঙ্গিকরূপে কতকগুলি সমস্যা পূরণ যাহা আপাতত আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় তাহা যে একান্তই আবশ্যক তাহা নহে; মনে কর একটা প্রমেয় বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য একটা রেখাকে দুই সমান

ভাগে বিভক্ত করা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা হইলে সেই রেখাকে কল-কৌশল-দ্বারা ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিতে যে হইবে এমন কিছু নয়; শুদ্ধ কেবল মানিয়া লইলেই হইতে পারে যে, উক্ত রেখার অমুক স্থানটি তাহার মধ্যস্থল; অমুক রেখাকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত কর, ইহাও যা, আর মনে কর যেন উক্ত রেখা অমুক স্থানটিতে দুই সমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, ইহাও তা', একই কথা। এই কারণ বশতঃ জ্যামিতির প্রথম চারিটি অবয়ব শিরোধার্য্য করিয়া শেষের অবয়বটি পরিত্যাগ করিলাম।

প্রচলিত প্রথানুসারে উক্ত চারিটি অবয়বকে চারিটি পৃথক্ অধ্যায়ে সন্নিবেশ করিতে গেলে অনেক অসুবিধা ঘটে বলিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া তাহাদের পার্থক্য নির্দেশ করিবার জন্য নিম্ন লিখিত সঙ্কেতগুলি নির্দ্ধারণ করা গেল, (১) (২) এইরূপ ঘের দেওয়া সংখ্যাচিহ্ন সজ্ঞার স্থান-জ্ঞাপক, [১] [২] এইরূপ ঘের দেওয়া সংখ্যা-চিহ্ন স্বতঃসিদ্ধ বচনের স্থান জ্ঞাপক, $\left\{ ১ \right\}$ $\left\{ ২ \right\}$ এইরূপ ঘের দেওয়া সংখ্যাচিহ্ন স্বতঃসাধ্য ক্রিয়াবিধির স্থান জ্ঞাপক এবং ১। ২। এইরূপ বেষ্টন-রহিত সংখ্যা চিহ্ন মীমাংস্য সিদ্ধান্তের স্থান-জ্ঞাপক।

মন্তব্যচ্ছলে আমরা এখানে বলিয়া রাখিতে চাই যে, বীজগণিতের অন্ততঃ একটি-মাত্র অজ্ঞাত-বর্ণ সংযুক্ত সমীকরণ পর্য্যন্ত যাঁহারা শিখিয়াছেন তাঁহাদেরই শিক্ষোপযোগী করিয়া এই জ্যামিতি-খানি প্রস্তুত করা হইতেছে; এজন্য যে স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলি বীজগণিত এবং জ্যামিতি উভয়েরই সাধারণ, তাহা সরলা বোধে দেওয়া গেল না; যথা $\left.\begin{matrix} ক = খ \\ গ = খ \end{matrix}\right\}$ এরূপ স্থলে ক = গ হইবে ক+ঘ = খ+ঘ = গ+ঘ হইবে ইত্যাদি স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বগুলিকে উহা রাখা হইল।

প্রথম অধ্যায়।

বীজাধ্যায়।

(১) যে জড়বস্তুর আয়তন এত অল্প যে, তদপেক্ষা অল্পায়ত বস্তু ইন্দ্রিয়-মনের গ্রহণ-সাধ্য নহে তাহাকে বিন্দু কহে।

(২) যে কোন আকাশ-খণ্ডকে যে কোন জড়বস্তু সর্ব্বাংশে অধিকার করিয়া থাকে, তাহা সেই জড়বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান এবং যে কোন আকাশ খণ্ডকে যে কোন বস্তু ঐরূপে অধিকার করিয়া থাকিলেই থাকিতে পারে, তাহা সেই বস্তুর ব্যাপ্যস্থান বলিয়া উক্ত হয়। বিন্দুর স্থান বলিলেই বিন্দুর ব্যাপ্তিস্থান বুঝায়।

(৩) জড় বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান-বহির্ভূত সমস্ত আকাশ তাহার বহিরাকাশ বলিয়া উক্ত হয়।

(৪) বহুবিন্দু-সমন্বিত বস্তুগণের মধ্যে যাহা এরূপ যে, তাহার সীমা-প্রদেশ-ভিন্ন আর কোন প্রদেশ তাহার বহিরাকাশ স্পর্শ করে না তাহা পিণ্ড বলিয়া উক্ত হয়।

(৫) পিণ্ডের সীমা প্রদেশস্থিত যাবতীয় বিন্দু-সমষ্টিকে তল কহে।

(৬) সীমাবচ্ছিন্ন তলখণ্ডকে ক্ষেত্র কহে।

(৭) যে বস্তুর ব্যাপ্তিস্থান বিন্দুর প্রয়োগোপযোগী একটি-মাত্র পথ তাহাকে রেখা কহে। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, রেখা এত সরু যে, তদপেক্ষা সরু বস্তু ইন্দ্রিয়-মনের গ্রহণ-সাধ্য নহে।

(৮) বস্তুর ব্যাপ্তিস্থানকে তদাকাশ কহে, যেমন—রেখার ব্যাপ্তিস্থান রেখাকাশ, ক্ষেত্রের ব্যাপ্তিস্থান ক্ষেত্রাকাশ, পিণ্ডের ব্যাপ্তিস্থান পিণ্ডাকাশ ইত্যাদি।

(৯) যে রেখার দুই প্রান্ত স্থানের মধ্যে তাহার একটি বই আর ব্যাপ্যস্থান নাই তাহাকে সরল রেখা কহে।

{ ১ } সমদীর্ঘ সরল রেখাদ্বয়ের একটির প্রান্তদ্বয়েতে আর একটির প্রান্তদ্বয় যুগপৎ সংলগ্ন করা যাইতে পারে।

[১] অসমান সরল রেখাদ্বয়ের একটির প্রান্তদ্বয় আর একটির প্রান্তদ্বয়কে যুগপৎ স্পর্শ করিতে পারে না।

(১০) বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সরল-রেখা-ব্যবধানকে দূরত্ব কহে।

(১১) যে কোন বহুবিন্দু বস্তু যথেচ্ছা যথা তথা চালিত হইলেও তাহার কিছু মাত্র রূপান্তর ঘটে না তাহা দৃঢ় বস্তু বলিয়া উক্ত হয়; অদৃঢ় বস্তুর সহিত আপাততঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নাই এ জন্য যখন যে কোন বস্তু উল্লেখ করা যাইবে তাহাকে দৃঢ়-বস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে, দৃঢ় বস্তুর চলাচলি-বশতঃ তাহার কোন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না।

[২] সমদীর্ঘ (অবশ্য দৃঢ়) সরল রেখাদ্বয়ের একটির প্রান্তদ্বয় আর একটির প্রান্তদ্বয়ের সহিত সংলগ্ন হইলে উভয়ে পরস্পরের গাত্রসাৎ হইয়া যায়।

(১২) যে ক্ষেত্র এরূপ যে, তাহার যে কোন বিন্দুদ্বয় হউক তাহাদের মধ্যবর্ত্তী সরল রেখা সেই ক্ষেত্রের গাত্রসাৎ হইবেই হইবে তাহাকে সমতল ক্ষেত্র কহে। ক্ষেত্র বলিলেই সমতল ক্ষেত্র বুঝাইবে কেননা অসমতল ক্ষেত্রের সহিত আদবেই এখানকার কোন সম্পর্ক নাই।

ইতি বীজাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কোণাধ্যায়।

(১৩) কোন একটি বিন্দু হইতে দুই রেখা দুই দিকে প্রসারিত হইলে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী আকাশ-উন্মীলনকে কোণ কহে, এবং সেই রেখাদ্বয়কে সেই কোণের ভুজ কহে, এবং ভুজদ্বয়ের সন্ধিস্থলকে কোণের চূড়া কহে।

(১৪) কোণের ভুজদ্বয় একই সমতলস্থিত হইলে সে কোণ সামতলিক কোণ বলিয়া এবং সরল রেখা হইলে উহা সরল-ভুজ কোণ বলিয়া উক্ত হয়, সামতলিক সরল ভুজ কোণ ভিন্ন অন্য কোন কোণের

সহিত এপ্রকার কোন সম্পর্ক নাই এজন্য কোণের উল্লেখ মাত্রেই সামতালিক সরল-ভুজ কোণ বুঝাইবে। কোন কোণ নির্দেশ করিতে হইলে তাহার চূড়ার মধ্য দিয়া ভুজদ্বয়ের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত নির্দেশ করা বিধেয়; যথা—

ক খ গ কোণ কিম্বা গ খ ক কোণ বলিয়া এস্থলের কোণটি নির্দেশ করা বিধেয়।

[৩] দুই কোণ (অবশ্য দৃঢ় কোণ) যদি এরূপ হয় যে, উভয়ের চূড়া-দ্বয় একত্র সম্মিলিত করিয়া একটির ভুজদ্বয়ের কোন অংশ আর একটির ভুজদ্বয়ের সমাংশের গাত্রসাৎ করিয়া যুগপৎ বসানো যাইতে পারে তবেই উভয়ের আয়তন সমান নচেৎ নহে।

(১৫ যে কোণের ভুজদ্বয় একই সরল রেখার অন্তর্গত তাহাকে সমসূত্র কোণ কহে। যথা,

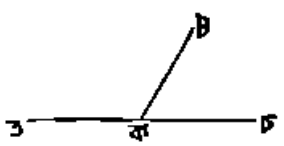

মনে কর তকচ এ-কটি সরল রেখা। তকট কোণের সহিত টকচ কোণ যোগ করিলে তকচ সমসূত্র কোণ ফলিত হয়; সুতরাং তকচ সমসূত্র কোণের একটি অংশ তকট-কোণ আর একটি অংশ টকচ-কোণ

(১৬) সমসূত্র কোণকে অর্দ্ধা অর্দ্ধি করিয়া বিভাগ করিলে তাহার অর্দ্ধাংশদ্বয়ের প্রত্যেকে আড় * কোণ বলিয়া উক্ত হয়। কেহ কেহ আড়কোণকে সমকোণ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তি সঙ্গত নহে, কেন না যে কোন কোণ হউক না কেন তাহা আর একটি কোণের সমান হইলেই তাহা শেষোক্তের সমকোণ বলিয়া উক্ত হইতে পারে।

মন্তব্য। কোন একটি সরল-রেখার কোন বিন্দু হইতে কোন একটি নির্দিষ্ট কোণ উৎপাদন করিয়া দ্বিতীয় একটি সরল রেখা টানা উল্লেখ করিতে হইলে, সংক্ষেপে অমুখ রেখার অমুক কোণে দ্বিতীয় রেখা টানা বলিলেই চলিতে পারে; আর সে কোণ যদি সমসূত্র কোণ কিংবা আড় কোণ হয়, তবে কোণ শব্দ উহা রাখিয়া দ্বিতীয় রেখাকে প্রথম রেখার সমসূত্রে টানা অথবা আড়ে টানা বলিলেই চলে যথা ক খ গ

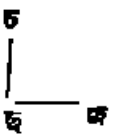

কখ রেখার সমসূত্রে খগ রেখা টানা হইয়াছে, ও চছ রেখার আড়ে ছজ রেখা

* সার্দ্ধ শব্দ হইতে সাড়ে শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ইহা কাহারো অবিদিত নাই; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে অর্দ্ধ শব্দ হইতে আড় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে; একটা সরল রেখা আর একটা সরল রেখার সমসূত্র কোণকে অর্দ্ধাংশে বিভাগ করিলে তবেই বলা গিয়া থাকে যে, একটি আর একটির আড়ে রহিয়াছে; অতএব আড় কোণের অর্থ আর কিছু নয়—অর্দ্ধ সমসূত্র কোণ। তাহার সাক্ষী—আড়-চক্ষে দেখা বলিলে এই রূপ অর্থ বুঝায় যে, সম্মুখ দিক্ হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া উক্ত দিকের অর্দ্ধ-সমসূত্র কোণে দৃষ্টিক্ষেপ করা।

টানা হইয়াছে, ইহাতে এই আসিতেছে যে, কথগ সমসূত্র কোণ, চছজ আড় কোণ।

২ কোন একটি সরল রেখার সমসূত্রে দ্বিতীয় সরল রেখা এবং তাহার সমসূত্রে তৃতীয় সরল রেখা ইত্যাদি ক্রমে রেখা টানিয়া প্রথম সরল রেখাটিকে যথেচ্ছা বর্দ্ধন করা যাইতে পারে।

(১৭) কোন একটি সরলরেখাকে যথেচ্ছা বর্দ্ধিত করিলে, তাহার যে কোন অংশ হউক তাহার ব্যাপ্তি স্থানকে সেই সরল রেখার সমসূত্র স্থান কহে।

১। সমসূত্র কোণ-দ্বয় মাত্রেরই আয়তন সমান।

ক ত থ খ গ চ ট ছ ঠ জ মনে কর কথগ কোণ এবং চছজ কোণ উভয়ই সমসূত্র কোণ তাহা হইলে (১৫ সংজ্ঞা অনুসারে) কথ, খগ এ দুই ভুজ,——তেমনি চছ, ছজ এ দুই ভুজ একই সরলরেখার অন্তর্গত।

মনে কর চছ রেখার ছট অংশ—কথ-রেখা খগ-রেখা এবং ছজ-রেখা তিনেরই অপেক্ষা ছোটো, ও মনে কর ছঠ-রেখা=ছট-রেখা=খত-রেখা=খথ-রেখা, তাহা হইলে অবশ্য সরল রেখা টঠ=সরল রেখা তথ সুতরাং (১স্বতঃ সাধ্য ক্রিয়া-বিধি অনুসারে) টঠ রেখার ট এবং ঠ প্রান্ত দ্বয়কে তথ রেখার ত এবং থ প্রান্ত দ্বয়ে যুগপৎ বসানো যাইতে পারে অতএব উহাদিগকে ঐরূপ করিয়া বসাও তাহা হইলে (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) টঠ রেখা তথ রেখার গাত্রসাৎ হইয়া যাইবে, এবং টঠ রেখার মধ্যস্থল ছ বিন্দু তথ রেখার মধ্যস্থল থ বিন্দুর সহিত মিলিত হইবে; তাহা হইলে কোণ-দ্বয়ের চূড়া-দ্বয় থ এবং ছ যেহেতু মিলিত হইয়াছে ও একটির ভুজদ্বয় ছট ছঠ আর একটির ভুজদ্বয় খত খথ-য়ের যুগপৎ গাত্র সাৎ হইয়া বসিয়াছে এ জন্য (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) কোণ দ্বয়ের আয়তন সমান। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হল।

উপসিদ্ধান্ত। উহা হইতে আসিতেছে এই যে, কোন সরল রেখার কোন বিন্দু হইতে তাহার সমসূত্রে দুই বিভিন্ন সরল রেখা দুই বিভিন্ন পথে টানা যাইতে পারে না; কেননা তাহা হইলে (২ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) সমসূত্র কোণ দ্বয়ের একটি বড় একটি ছোট হইবে, উপরের সিদ্ধান্ত অনুসারে যাহা একান্ত অসম্ভব।

দ্বিতীয় উপসিদ্ধান্ত। আড় কোণ যেহেতু সমসূত্র কোণের অর্দ্ধাংশ এজন্য আড় কোণ দ্বয় মাত্রই একটি আর একটির সমান।

২। দুই সরল রেখা পরস্পর কাটা কাটি করিলে তদুৎপন্ন যে কোন কোণদ্বয় পরস্পরের সম্মুখা-সম্মুখি হইয়া অবস্থিতি করে তাহাদের উভয়েরই আয়তন সমান

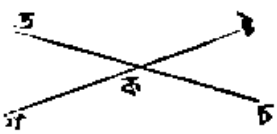

মনে কর দুই সরল রেখা তচ এবং গট ক স্থানে পরস্পর কাটাকাটি করিয়াছে তাহা হইলে তকট কোণ তাহার সম্মুখবর্ত্তী গকচ কোণের সমান হইবে; কেন না কত এবং কচ যেহেতু একই সরল রেখার অন্তর্গত এজন্য (১৫ সংজ্ঞা অনুসারে) কোণদ্বয়

তকট+টকচ=সমসূত্র কোণ

তেমনি গকচ+টকচ=সমসূত্র কোণ সুতরাং (১ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তকট+টকচ=গকচ+টকচ সুতরাং তকট=গকচ; অমনি করিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, তকগ=টকচ। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

ইতি কোণাধ্যায় সমাপ্ত।

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল।

এক্ষণে মহর্ষি কণ্বের স্বভাব কিরূপ তাহার বিচার করা যাক। কণ্বের স্বভাব অতি চমৎকার হইয়াছে। তিনি প্রশান্ত-চিত্ত এবং দয়ালু। দুর্বাসার মত উদ্ধত-স্বভাব নহেন। এবং কালিদাস যেমন বিক্রমোর্বশীতে বলিয়াছেন " বেদাভ্যাসজড়ঃ * * * বিষয়বিমুখবৃত্তকৌতূহলঃ " কণ্ব সে রূপ নহেন। সে রূপ হইলে তাঁহার সহিত আমাদের সহানুভূতি থাকিত না এবং তিনি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিতেন না। তিনি সাংসারিক লোকের অন্তঃকরণের ভাব সমস্ত বুঝিতে পারেন। তাঁহার হৃদয় ক্ষমাশীল এবং স্নেহরসে পরিপূর্ণ। লোকে বলিয়া থাকে "ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্" ইহা কণ্বের স্বভাবে স্পষ্ট রূপে প্রকটিত হইয়াছে। এজন্য আমাদের হৃদয় তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে পরিপ্লুত হয়। তিনি দৈববাণীর দ্বারা শকুন্তলার গর্ভের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, সে জন্য শকুন্তলাকে কোন ভর্ৎসনা করিলেন না, আর সৎপাত্রে কন্যাদান করিবেন ইহা তাঁহার চিরাভিপ্রেত। কালিদাস এখানে দৈববাণীর সংযোজনা করাতে বিশেষ কৌশল দেখাইয়াছেন। এরূপ না করিলে কণ্বের চরিত্রে দোষ পড়িত ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। কারণ মহাভারতের ন্যায় শকুন্তলা যদি স্বয়ং আসিয়া নির্লজ্জা হইয়া প্রণয়ের কথা বলিত ও মহর্ষি তাহার অনুমোদন করিতেন তাহা হইলে মহর্ষির প্রতি শ্রদ্ধা হইত না। কিন্তু যখন তিনি দৈববাক্য (১৩) দ্বারা অবগত হইলেন।

"দুষ্মন্তেনাহিতং তেজোদধানাং ভূতয়েঽভুবঃ।
অবেহি তনয়াং ব্রহ্মন্ অগ্নিগর্ভাং শমীমিব॥

তখন তাঁহার মনে আর সংশয় উপস্থিত হইল না এবং শকুন্তলার অপরাধ তিনি ক্ষমা করিলেন কারণ সে কথার জন্য শকুন্তলাকে কিছুই বলেন নাই। ইহাতে তাঁহার ক্ষমাশীলতার বিশেষ প্রমাণ পাইতেছি। তাঁহার কথা বার্তা ও আচরণ সমস্তই অতীব হৃদয়গ্রাহী। শকুন্তলার বিবাহের অনুমোদন করা, তাহাকে গদ্গদচিত্তে আশীর্বাদ করা, তাহার প্রতি স্নেহবশতঃ বিদায় দিবার সময় তাঁহার চিত্তবৈক্লব্য, শকুন্তলার প্রতি উপদেশ, রাজার প্রতি আদেশ এ সমস্ত অতিশয় রমণীয় এবং তাঁহার স্বভাবানুযায়ী। অব-

১৩ এক্ষণে আমরা দৈববাণীর কথা বিশ্বাস না করিতে পারি, কিন্তু সে কালে করিত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। হেমলেটে যে ভূতের কথোপকথন আছে তাহা আমরা অসম্ভব মনে করিতে পারি কিন্তু তখনকার লোকে বিশ্বাস করিত। যে সময়ের কথা পাঠ করা যায় সে সময়ের লোকের ন্যায় বিশ্বাস না করিলে নাটকের প্রকৃত রসাস্বাদ পাওয়া যায় না।

শেষে বিদায় দিয়া তিনি বিষণ্ণ ও হৃষ্ট হইয়া বলিতেছেন।

অর্থোঽয়ং কন্যা পরকীয় এব তামদ্য সংপ্রেষ্য পরিগ্রহীতুঃ।

জাতো মমায়ং বিশদঃ
প্রকামং প্রত্যর্পিতন্যাস ইবান্তরাত্মা॥

এই শ্লোকটী অতি মনোহর। বস্তুতঃ মহর্ষি কণ্বের চরিত্র শকুন্তলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এমন হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তি বোধ হয় কালিদাসের কোন নাটকে বা কাব্যে নাই।

আমরা অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রধান ব্যক্তিদের সমালোচনা করিলাম। এ নাটকে সমালোচনার যোগ্য লোক আর নাই। অনসূয়া ও প্রিয়ম্বদা ইহারা দুজনেই এক প্রকার; কে অনসূয়া কে প্রিয়ম্বদা তাহা আমরা শীঘ্র চিনিতে পারি না। দুজনেই চতুরা ও কৌতুকানুরক্তা, এবং শকুন্তলার প্রতি স্নেহ ও যত্ন উভয়েরই সমান। ইহাতে কালিদাসের এক দোষ দেখা যাইতেছে যে তাঁহার নাটকে ব্যক্তি ভেদ নাই (১৪) (ইহা আমরা পরে আরও ভাল করিয়া দেখিব, এখানে কেবল ইঙ্গিতচ্ছলে উল্লেখ করিলাম।) তবে যদি পাঠক নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন তাহা হইলে যেন অনসূয়াকে প্রিয়ম্বদা অপেক্ষা চতুরা বলিতে পারেন, কারণ সে অতি কৌশলের সহিত রাজাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু অনসূয়াকে কিঞ্চিৎ অশিষ্টা বলিতে হইবে কারণ সে রাজার কাছে শকুন্তলার উৎপত্তি বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিতা হয় নাই। আবার প্রিয়ম্বদাও সেইরূপ। সেও তৃতীয় অঙ্কে রাজার নিকট শকুন্তলার প্রণয়-বৃত্তান্ত স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছিল। অতএব দুই জনেই যেন এক মৃত্তিকার গঠন ইহাদের মধ্যে কোন তারতম্য নাই।

অভিজ্ঞান শকুন্তলের বিদূষক যথার্থই মৃৎপিণ্ডবুদ্ধি (১৫) তাহার বিষয় কিছু বক্তব্য নাই। পঞ্চম অঙ্কে ক্রুদ্ধ যুবক শার্ঙ্গরবের বর্ণনা যাহা আছে তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তাহাতে বক্তব্য বিষয় কিছু নাই। আর আর যে সকল ব্যক্তি আছে তাহাদের বিষয় আমরা উল্লেখ করিলাম না ও করিবার প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে শকুন্তলের ভাব ও রচনা কিরূপ তাহা বলিতে হইবে। কিন্তু সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এবং সকল পাঠকই তাহা অবগত আছেন, আমাদের বলিবার প্রয়োজন নাই, এখানে শকুন্তলের কোন্ কোন্ অংশ অতিশয় মনোজ্ঞ তাহা বলিব। চতুর্থ অঙ্কে যথেষ্ট চমৎকারিত্ব আছে। সকলে শকুন্তলাকে বেষ্টন করিয়া দুঃখিত চিত্তে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন; শকুন্তলার দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণা হওয়াতে তাহার গতি স্খলিতা হইতেছে; হরিণ হরিণী দর্ভ-কবল ফেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে; শকু-

১৪ Variety and discrimination of character.

১৫ শকুন্তলের ও বিক্রমোর্ব্বশীর বিদূষকের মৃৎপিণ্ডবুদ্ধিতা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের নহে। এ নাটকের বিদূষক অতিশয় ধূর্ত্ত ছিল, কিন্তু কালিদাসের বিদূষকগণ সেরূপ নহে।

স্তলার পালিত হরিণশাবক আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়াইয়াছে, অনসূয়া প্রিয়ম্বদা শোকে আকুল; মহর্ষি প্রশান্ত অথচ দুঃখিত, শার্ঙ্গরব কেবল শকুন্তলাকে ও মহর্ষিকে ত্বরা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে "বেলা অতীত হইল এবং বন্ধু জনের জলাশয়-তীর অবধি যাওয়া উচিত" এইরূপ বলিতেছে; কবে পুনর্দর্শন পাইব বলিয়া শকুন্তলার আশ্রম প্রতি দৃষ্টি-পাত; অবশেষে শকুন্তলার প্রস্থানের পর তৎসপত্নীদ্বয় তপোবনশূন্য জ্ঞান করিতেছে, এই সকল বিষয় আমাদের অতীব হৃদয়-গ্রাহী। এরূপ চমৎকার বস্তু প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ সংস্কৃত ভাষায় নাই। অভিজ্ঞান শকুন্তলে যাহা চমৎ-কারিত্ব আছে তাহা এই চতুর্থ অঙ্কে অন্যত্র নাই। অন্যান্য বর্ণনার মধ্যে রাজার অনু-তাপ (৬ষ্ঠ অঙ্কে) অতি চমৎকার। রাজা শোকে বিবর্ণ হইয়াছেন, বসন্তকালের উৎ-সব তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর; তিনি রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারেন না; এবং চিত্তবিনোদনার্থ শকুন্তলার আ-কৃতি চিত্রপটে লিখিতেছেন, এ সমস্ত যথার্থ স্বাভাবিক। রাজার মত ব্যক্তি এরূপ অব-স্থাপন্ন হইলে যাহা হওয়া উচিত ঘটনাতে তাহা সুচারুরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা চতুর্থ অঙ্ক ও তাহার পর ঘটনা-কে অতি উত্তম মনে করি সেই জন্য কিছু বিশেষ করিয়া বলিলাম। আর কোন স্থানে এরূপ মনোহারিত্ব নাই। তবে ভাষা ও ভাব সর্ব্বত্রই মনোহর। প্রথম অঙ্কে স্ত্রীলোকদের কথা বার্ত্তা হাস্য পরিহাস অতি চমৎকার কিন্তু তাহা তপস্বিনীর যোগ্য হয় নাই এই জন্য চমৎকার হইয়াও সে অংশ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী নহে কারণ ঔচিত্যবিরুদ্ধ।

আমরা এক্ষণে কালিদাসের ক্ষমতার বিচার করিব। প্রথমে দেখা যাক কালি-দাস কীদৃশ নাটককার ছিলেন। আমরা দেখিয়াছি শকুন্তলের আখ্যায়িকাতে চমৎ-কারিত্ব নাই। ব্যক্তিগণের মধ্যে একান্ত হৃদয়গ্রাহী কেহ নাই, কেবল মহর্ষি কণ্ব, কিন্তু তিনি প্রধান ব্যক্তি নহেন। অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিলে কালিদাসের নাটক-রচনা শক্তির উত্তম পরিচয় পাওয়া যায় না। নাটক কিরূপ হইলে যে কবির ক্ষমতা প্রকাশ পায় তাহা বুঝান অতি কঠিন, কিন্তু জগতের প্রধান নাটককারদের গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টই বোধগম্য হয়। মানব-হৃদয়ের গতি স্পষ্টরূপে কার্য্যের দ্বারা প্রকটিত করাই দৃশ্য কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাতেই কবির ক্ষ-মতা প্রকাশ পায়। যিনি স্বয়ং মানব হৃদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়াছেন এবং সেই সকল তত্ত্ব ব্যক্তিগণের কার্য্যে ও উক্তিতে আদর্শতলের ন্যায় প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন, তিনিই অদ্বিতীয় কবি, প্রগাঢ় দার্শনিক এবং অভ্রান্ত নীতিশিক্ষক। তাঁহার অভিজ্ঞতা এত অধিক যে কপিল ও গোতম তাঁহার নিকট শিশুতুল্য এবং উপদেশ লইবার পাত্র। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য তাঁহার নয়নোপান্তে অবস্থান করে; তিনি মনে করিলে স্বর্গের

সুখ ও মর্ত্যের মায়া, দেবতুল্য পবিত্রতা এবং সয়তানের নৃশংসতা সীতার ন্যায় সতীত্ব ও ১৬ গটরুডের ন্যায় ব্যভিচারিত্ব সমস্তই দেখাইতে পারেন। ইঁহার অপেক্ষা আর মহৎ শিক্ষক কে হইতে পারে? ধন্য বাল্মীকি, ধন্য সেকস্‌পেয়ার, ধন্য গেটে তোমাদের গ্রন্থ সকল কল্পান্তস্থায়ী, তোমাদের নাম প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে জগতের অসংখ্য লোকে স্মরণ করিয়া থাকে। তোমাদের শিক্ষা জগতে নবসূর্য্যোদয়ের সহিত নূতন বল প্রাপ্ত হয়। জগতের যত বয়োবৃদ্ধি হইতেছে ততই তোমাদের যশোবৃদ্ধি হইতেছে। তোমাদের ন্যায় লোক আর জন্মায় নাই ও বোধ হয় জন্মিবে না। তোমরাই অবতার সন্দেহ নাই। তোমাদিগকে নিভৃত হৃদয় কন্দরে নমস্কার করি।

এখানে যে মহাত্মাদিগের (১৭) নাম করিলাম, তাঁহারা মানব প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া বুঝিয়াছিলেন। ইহাঁদের গ্রন্থে মানবতত্ত্ব, নীতিশিক্ষা, ভাবের গভীরতা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অতএব ইঁহারা অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু কালিদাসের গ্রন্থে সে রূপ মানবতত্ত্ব ও ভাবের গভীরতা কোথায়? যাহা আছে সে সমস্ত অতি লঘু, প্রগাঢ় তত্ত্ব কালিদাসে নাই। ১৮ কালিদাস যে দুই খানি নাটক লিখিয়াছেন তাহা আদিরস-প্রধান। এই রসের অপকৃষ্টাংশ এ দুইখানি নাটকে বিশেষরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বস্তুতঃ কালিদাস প্রেমের অপভ্রংশ বর্ণনা করিতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন এ বিষয়ে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কিন্তু শান্ত, পবিত্র, দেবতুল্য, শারদ শশীর ন্যায় একেবারে হৃদয়গ্রাহী চক্ষু-প্রীতিপ্রদ ও নির্ম্মল প্রেমের বর্ণনা কালিদাস কুত্রাপি করেন নাই। তাঁহার নায়ক ও নায়িকা সকল মন্মথ-বাণে একেবারে জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে। তাহাদের মনে তখন অন্য কোন ভাব স্থান পায় না। কেবল একমাত্র ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করণেচ্ছাই তাহাদের হৃদয়কে গ্রাস করে। ইষ্টলাভ না হইলে তাহারা গাত্রের জ্বালায় কাতর হয়; তখন জগৎ বিষময়, আকাশ অন্ধকারময়, মলয়ানিল হুতাশনময়, এবং চন্দ্রকে তেজোময় জ্ঞান করে। তাহাদের মনের উপর তখন কোন ক্ষমতা থাকে না। যেমন এক জন অশিক্ষিত ও অশিষ্ট লোকের হওয়া সম্ভব কালিদাসের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সেইরূপ দেখা যায়। রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা উভয়েই প্রেমোন্মত্ততা বশতঃ

১৬ হেমলেটের মাতা

১৭ বাল্মীকি নাটক লেখেন নাই বটে কিন্তু নাটকের উপাদেয় বস্তু সকল রামায়ণে যথেষ্ট আছে।

১৮ এস্থলে বলা আবশ্যক যে সংস্কৃত নাটক কখন বিয়োগান্ত হয় না। এজন্য অন্তঃকরণের প্রবল চেষ্টা সকল সংস্কৃত নাটকে প্রকাশিত হয় না। ইহা কেবল নাটককারদিগের এক ভ্রান্তিমূলক নিয়মের ফল, যে অশুভ ঘটনার দ্বারা উপসংহার করিতে নাই। এজন্য tragedy নামক অলৌকিক পদার্থ সংস্কৃত ভাষায় নাই। এ অভাব অতিশয় শোচনীয়।

অধীর হইয়াছেন। উর্ব্বশী এবং পুরূরবা সেইরূপ, বরঞ্চ অধিক কাতর হইয়াছেন। (১৯) অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহারা সকলেই কেবল ইন্দ্রিয়ের বশ। ইহাদের প্রেমের ফল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, মনস্তৃপ্তি নহে। ইহাদের সমস্ত কার্য্যে ও কথাতে এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে, নির্ম্মল ভাব ইহাদের মনে আদৌ উদিত হয় না। দুষ্মন্ত যখন শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিতেছেন তখন বলিতেছেন,

"অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈঃ
অনাবিদ্ধং রত্নং মধুনবমনাস্বাদিতরসম্
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং,২০

এই সকল ভাব অতি চমৎকার, আমরা পাঠ করিয়া মুগ্ধ হই, কিন্তু ইহার পর রাজা যেন আর থাকিতে পারিলেন না, তিনি যেন মনে করিলেন এমন রত্ন যদি না পাই তাহা হইলে হা হতোঽস্মি। অতএব তিনি বলিতেছেন

ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধি।

এখানে ভোক্তারং শব্দ ব্যবহার করাতে আমাদের মনের ভাব একেবারে নষ্ট হইল এবং রাজাকে কামাতুর বলিয়া জানিলাম। এরূপ বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু অনাবশ্যক। পুরূরবাও মদনযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বিস্তর বলিতেছেন। তাঁহার কথা বার্ত্তাতে আসঙ্গলিপ্সা বলবতী দেখা যায়। বিক্রমোর্ব্বশীর আদ্যন্ত কেবল ঐ সকল ভাবে পরিপূর্ণ। শকুন্তলার স্থানে স্থানে রসান্তর আছে। বিক্রমোর্ব্বশীতে অন্য রস কিছুই নাই। কালিদাসের সর্ব্বত্র এইরূপ বর্ণনা আছে। (২১) এমন কি তিনি মহাদেব কে পর্য্যন্ত প্রায় কামাতুরের ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। যথা

পশুপতিরপি তান্যহানিকৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ।

আমরা এক্ষণে দেখিলাম যে কালিদাসের প্রেম অপকৃষ্ট পদার্থ। তাঁহার ব্যক্তিগণ সকলেই প্রেমে স্বার্থপর, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির উপায় ভাবিতেছে। তাহাদের প্রেম যেন জ্বলন্ত সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তাপ

---

১৯ মালবিকাগ্নিমিত্র যদি কালিদাসের হয় তাহা হইলে ইহাতেও দেখা যায় যে রাজা এবং মালবিকা উভয়েই কালিদাসের অন্যান্য নায়ক নায়িকার ন্যায়। কোন প্রভেদ নাই।

২০ ভবভূতির এ বিষয়ে মহৎগুণ আছে তিনি দুর্ব্বৃত্ত রাবণের মুখেও এরূপ ভাব দেন নাই। রাবণ সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,

"মুখংযদিকিমিন্দুনা যদি চলাকলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈ র্যদি তরঙ্গভঙ্গীভ্রুবৌ।
কিমাত্মভবধন্বনা যদি সুসংযতাঃ কুন্তলাঃ।
কিমস্য বহুডম্বরৈ র্যদিপুনরিয়ং কিং শ্রিয়া॥

এখানে "নজানে ভোক্তারং" ইত্যাদি কোন অশ্লীল ভাব নাই তাহা পাঠক মহাশয় দেখিবেন।

২১ মালবিকাগ্নিমিত্রে রাজার এই রূপ অবস্থা। তিনি বলিতেছেন

"শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে।'

এরূপ নানা স্থানে আছে।

দিয়া আত্মাকে শোষণ করে, চন্দ্রের ন্যায় শীত রশ্মি বিস্তার করিয়া হৃদয়কে সন্তর্পিত করে না। তাহাদের প্রণয়বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় যে সেরূপ প্রেম কখন স্থায়ী নহে, তাহাতে শীঘ্রই তৃপ্তি ও অরুচি জন্মায় কারণ এ প্রেম ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করে মনকে করে না। কিন্তু যে প্রণয় অন্তরাত্মাকে বশীকৃত এবং পরিতৃপ্ত করে, তাহাই প্রকৃত প্রণয়, তাহা পাঠ করিলে আমরা মুগ্ধ হই, আমাদের আত্মা যেন শীতল হয়, আমাদের মনের মলিন ভাব সকল বিশুদ্ধ হইয়া যায়, আমরা যেন মানব দেহে স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করি, মানবাত্মা যে ঈশ্বরের অংশ তাহা আমরা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি, কারণ আমরা তখন দেবগণের সহিত সহানুভূতি অনুভব করি। পাঠক মহাশয় যদি কালিদাসের কোন নায়িকার সহিত আয়েসার (২২) তুলনা করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর আমাদের হৃদয়াকর্ষণ করে, এবং কাহার প্রণয় বিশুদ্ধ ও দেবতুল্য। আয়েসা জগৎসিংহের সুখেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করে, কিসে জগৎসিংহ সুখী হইবে আয়েসা দিবানিশি তাহাই ভাবিতেছে, তাহার সমস্ত আত্মা যেন জগৎসিংহময় হইয়াছে—কিন্তু এতদূর হইয়াও সে জগৎসিংহের আসঙ্গলিপ্সা করে না, তাহার উন্নত মনে এতাদৃশ নীচ ভাব স্থান পায় না। আসঙ্গলিপ্সা যে প্রেমের এক উপাদান নয় আমরা এতদূর বলিতেছি না, কিন্তু তাহা বলবতী হইলে পবিত্র স্থায়ী প্রেম পশুতুল্য, ক্ষণিক হইয়া যায়। মানুষের যে সমস্ত পশু-সাধারণ প্রবৃত্তি আছে তাহা যত দমন করা যায় ততই আমরা দেবতা ও মানবের নিকট প্রশংসনীয় হই, এবং ততই আমাদের প্রকৃতি যে ক্রমোন্নতিশীলা তাহা সপ্রমাণ করি।

আবার যদি আমরা ভবভূতির (২৩) সহিত কালিদাসের তুলনা করি তাহা হইলে উভয়ের মনের ভাব কি রূপ তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইব। ভবভূতি প্রকৃত প্রেম যে কি পদার্থ তাহা উত্তম রূপে বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরচরিত পাঠ করিলে আমাদের মনে যেরূপ অলৌকিক আনন্দ হয় কালিদাস পাঠ করিলে সে রূপ কখনই হয় না—এখানে আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা

ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ,
অসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।

* * *

কিমস্যাঃ ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ।

---

২২ আইভান হোতে যে রেবেকা আছে তাহার সহিতও তুলনা করিতে পারেন।

২৩ আমরা এক্ষণে সেক্সপেয়ারের সহিত তুলনা না করিয়া ভবভূতির সহিত করিলাম, কারণ প্রায় সকলেই কালিদাসকে ভবভূতি অপেক্ষা বড় বলিয়া থাকেন, কিন্তু কালিদাসের রচনার চমৎকারিত্ব থাকিলে কি হয়, ভবভূতির ক্ষমতা অধিক ছিল। ইহা আমাদের দেখান উদ্দেশ্য।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাবস্থাসু যৎ
বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য, কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

"মানস্য স্ত্রীবকুসুমস্য বিকাশনানি সন্তর্পণানি সকলেন্দ্রিয়মোহনানি।
এতানি তানি বচনানি সরোরুহাক্ষ্যাঃ কর্ণামৃতানি মনসশ্চ রসায়নানি॥

ইহা দুষ্মন্ত, পুরূরবার (অগ্নিমিত্রের) ন্যায় মদনজ্বালা নহে। ইহা স্থায়ী, পবিত্র, দেবতুল্য প্রেম। বস্তুতঃ রাম ও সীতার প্রণয় যে রূপ চমৎকার সেরূপ কালিদাসে এবং অন্যান্য সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। ইহাদের প্রণয়ের মধ্যে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে পরস্পরের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ছিল। রাম ও সীতা পরস্পরকে ইন্দ্রিয়তর্পণ বলিয়া জানিতেন না তাহা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বিশেষ বোধ হইতেছে। রাম সীতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।

ত্বয়া সহ নিবৎস্যামি বনেষু মধুগন্ধিষু।
ইতি হারমতেবাসৌ স্নেহস্তস্যাঃ স তাদৃশঃ॥
অকিঞ্চিদপি কুর্ব্বাণঃ সৌখ্যৈর্দুঃখান্যপোহতি।
তৎ তস্য কিমপি দ্রব্যং যোহি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

ইহা যে কি চমৎকার প্রেম তাহা অনির্ব্বচনীয়। আবার আর এক স্থানে ভবভূতি বলিয়াছেন।

হৃদয়েনৈব জানাতি প্রীতিযোগং পরস্পরং।

আমরা কিছু বলিতে চাহি না পাঠক কেবল উভয়বিধ প্রেম ভাবিয়া দেখুন, তিনি নিশ্চয় আমাদের কথা স্বীকার করিবেন। আমাদের বোধ হয় যে এরূপ ভাব কালিদাসের মনে কখন উদয় (২৪) হয় নাই, কারণ তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি কামাতুর নেত্রে দৃষ্টি করিতেন। স্ত্রীলোক যে চমৎকার বস্তু ও তাহারা কত রকমে আমাদের জগৎকে সুখের স্থান করিয়াছে কালিদাস

২৪ কেহ কেহ বলিতে পারেন যে রাম সীতার প্রণয়ের সহিত দুষ্মন্ত প্রভৃতির প্রেমের তুলনা করা অনুচিত কারণ দুষ্মন্ত পুরূরবা প্রভৃতি রাজারা সকলেই রামের ন্যায় প্রেমিক এবং এক ভার্য্যাপরায়ণ ছিলেন না। তাঁহারা বহু স্ত্রী বিবাহ করিতেন, তাঁহাদের কেবল ইন্দ্রিয়-সুখই উদ্দেশ্য, যখন সুন্দরী রমণী দেখিলেন তখনই তাহাকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাম বিষ্ণু অবতার অবধি কেবল এক লক্ষ্মীর প্রতি অনুরক্ত এবং সেই জন্য ভবভূতি এরূপ বিশুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ আপত্তি করা বৃথা। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহাতে কালিদাসের নিজের মন কি ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি আপনার মনের ভাব যেরূপ সেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। নায়কদের বর্ণনা মনে করিলেই ভাল করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নয়। ভবভূতি রাবণকেও নিতান্ত কামাতুরের ন্যায় বর্ণনা করেন নাই তাহা আমরা দেখাইয়াছি যদিও রাবণ কেবল কামাতুর হইয়া সীতাহরণ করে।

তাহা জানিতেন না। তাঁহার মতে স্ত্রী-লোকেরা কি তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বাহূ হৌ চ মৃণালমাসারুমলং লাবণ্যলীলা জলং
শ্রোণীতীর্থশিলা চ নেত্রশফরং ধম্মিল্লশৈবালকম্।
কান্তায়াস্তনচক্রবাকযুগলং কন্দর্পবাণানলৈ
র্দগ্ধানামবগাহনায় বিধিনা রম্যঃ সরো নির্ম্মিতম্।

বাস্তবিক এইরূপ ভাব পাঠ করিলে কালিদাসের উপর আমাদের ঘৃণা হয়। (২৫) এবং যখন তিনি স্বীনাস্তরে বলিয়াছেন

অবিদিতসুখদুঃখং নির্গুণং বস্তু কিঞ্চিৎ
জড়মতিরিহ কশ্চিৎ মোক্ষ ইত্যাচচক্ষে।
মম তু মতমনঙ্গস্যেতারলাঘূর্ণন-
মদকলমদিরাক্ষীনীবিমোক্ষস্তু মোক্ষঃ॥

তখন তিনি জগতের প্রধান কবিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহেন। তাঁহার অন্তঃকরণ অত্যন্ত দূষিত। তাঁহার গ্রন্থ পাঠে কোন উপদেশ পাওয়া যায় না, এমন কি আমাদের মন ইহাতে দূষিত হইতে পারে। (২৬)

আমরা কালিদাসের ক্ষমতার বিচার করিতে গিয়া দেখিলাম যে কালিদাস কেবল একটী রস ও দুইটী ব্যক্তি বর্ণনা করিতে বিলক্ষণ পারিতেন। তিনি হোমর, সেক্সপেয়ার, মিল্টন্ ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের ন্যায় নানাবিধ রস বা নানাবিধ ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ২৭ আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে বায়রণের যেমন নাটকীয় শক্তি ছিল না কালিদাসেরও তেমনি ছিল না। ২৮ বায়রণ কেবল দুই

২৫ Contrast Milton P, Lost. Heavens last best gift my ever new deliget.

২৬ আমরা উক্ত সকল শ্লোককে কালিদাসের নীতিমালা এরূপ বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহার স্বভাব কখনই বিশুদ্ধ ছিল না তাহা স্পষ্ট বোধ হয়।

কালিদাসের কল্পনা আদিরসে পরিপূর্ণ এজন্য অনাবশ্যক স্থলেও অশ্লীল বর্ণনা করেন। যথা কুমারে হিমালয় বর্ণনা এবং অন্যান্য স্থানেও বিস্তর আছে কারণ আমরা যখন Ovid বা Anacreon পাঠ করি তখন উহাদের জীবন বৃত্তান্ত না জানিয়াও বলিতে পারি যে এক জন লম্পট ও আর এক জন মদ্যপায়ী ছিল। পরে সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হয় যখন আমরা অবগত হই যে ovid এর নির্বাসন ও Anacreon এর হঠাৎ মৃত্যু স্বীয় স্বীয় চরিত্রের পরিণাম মাত্র। যদি কালিদাসের কোন ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে আমাদের অনুমান দৃঢ়ীকৃত হইত।

২৭ অর্থাৎ ব্যক্তিভেদ এবং রসভেদ নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কালিদাসের গ্রন্থে variety নাই। এখানে সেই বিষয়ের আলোচনা করিতেছি।

২৮ আমরা নাটকীয় শক্তি প্রশস্ত অর্থে ব্যবহার করিলাম। এই শক্তি যে কেবল নাটকে থাকে এমন নহে, কাব্য মাত্রেই থাকা আবশ্যক। যেমন গদ্য রচনায় কবিত্ব শক্তি থাকে ইহাও সেই রূপ। ইহা কালিদাসের এক মহৎ দোষ যে তিনি সর্ব্বত্র প্রায় এক রূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন। এমন কি তাঁহার ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে এক রূপ আচরণ করেন। যথা শকুন্তলা এবং উর্ব্বশী

বাক্তি বর্ণনা করিতে পারিতেন, এক জন সাহসিক নিরানন্দ জগদ্দ্বেষী অথচ প্রেমিক পুরুষ, আর এক জন মুগ্ধা, কামাতুরা, প্রিয়-জন-পরায়ণা রমণী। বায়রণের যে গ্রন্থ পাঠ করা যায় কেবল এই দুই জন। অন্য রূপ স্বভাব বর্ণনা বায়রণে নাই। কালিদাসও তদ্রূপ। কি কুমারে, কি মেঘদূতে, কি অভিজ্ঞান শকুন্তলে, কি বিক্রমোর্ব্বশীতে (কি মালবিকাগ্নিমিত্রে) সর্ব্বত্রই আমরা চিরপরিচিত সেই দুই জনকে দেখিতে পাই অর্থাৎ এক কামার্ত্ত পুরুষ ও এক নির্লজ্জা রমণী। ইহাতে বোধ হইতেছে যে বায়রণ তাঁহার নিজের স্বভাব কাব্য সকলে প্রকাশিত করিয়াছেন, কালিদাসও সেই রূপ তাঁহার স্বার্থপর প্রেমোন্মত্ত লঘু প্রকৃতি স্বকীয় কাব্য সমূহে দেখাইয়াছেন। *

কালিদাসের বায়রণের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তাহা দেখিলাম কিন্তু বায়রণকে কোন কোন অংশে আমরা কালিদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি মনে করি, কারণ বায়রণ আমাদের অন্তঃকরণে নানারসের উদ্রেক করিতে পারেন কালিদাস তাহা পারেন না। বায়রণের কাব্য সমূহে যে রূপ ওজোগুণ আছে কালিদাসে সে রূপ প্রায় নাই। †

এই নিমিত্ত তিনি রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, শান্ত প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রস সকলের বর্ণনা করিতে পারেন না। আমরা, সবিস্তরে কবিতা সকল উদ্ধৃত করিয়া সময় নষ্ট করিব না। পাঠক মহাশয় যদি রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে উচ্চের সহিত রঘুর যুদ্ধ, চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্বিজয়, সপ্তমে রাজাগণের সহিত অজের যুদ্ধ, একাদশে পরশুরামের সহিত রামের যুদ্ধ, দ্বাদশে রাম রাবণের সমর—এই সকল অংশের সহিত ভবভূতির বীরচরিতের এবং উত্তর চরিতের পঞ্চম অঙ্কের তুলনা করেন তাহা হইলে দেখিবেন যে কালিদাসের বর্ণনা কেবল বীররসের বিড়ম্বনা মাত্র। এই রূপ অন্যান্য রসেরও উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে : ভয়ানক রসের বর্ণনা কালিদাসে অতি বিরল, যথা রঘুর দ্বিতীয় সর্গে কামধেনু কর্ত্তৃক দিলীপের ছলনা, পঞ্চম সর্গে মত্ত বারণের আগমন, কুমারের তৃতীয় সর্গে এ সকল স্থল কিছু বিশেষ রূপ ভয়াবহ বলিয়া বোধ হয় না। রৌদ্ররসের বর্ণনা কালিদাস ভাল করিতে পারেন না। কিন্তু কুমারের তৃতীয় সর্গে শিবের ক্রোধবর্ণনা অতি চমৎকার হইয়াছে। যথা

"তপঃপরামর্শবিরুদ্ধমন্যোঃ ক্রতুপ্রণষ্টস্য ক্য-
মুপস্থিতস্য।
স্ফুরন্নদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াৎ অক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ
কিল নিষ্পপাত ॥

এ শ্লোকে ভবভূতির ন্যায় ওজোগুণ

প্রথম অঙ্কে শাখাতে বস্ত্র লগ্ন হইয়াছে এই রূপ বলিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

* অতএব কালিদাস যে মানবপ্রকৃতির তত্ত্ব সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পারেন নাই তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে।

† (আমরা কুমারের তৃতীয় সর্গের কথা বলিতেছি না, ইহার পরে উল্লেখ করা যাইবে)।

নাই বটে কিন্তু তথাপি উত্তম হইয়াছে। আরও স্থলে স্থলে উত্তম বর্ণনা আছে।

"বাহপ্রতিষ্টম্ভবিরুদ্ধমন্থুঃ অন্তর্ণমাগন্ধ্ব-মসম্পৃণন্তিঃ।
রাজা স্বতেজোরিরধাত্তাস্তঃ ভোগীব মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্যাঃ॥

অর্থামমর্ষামিতি বাদিনং নৃপং সোহনবেক্ষ্য ভরতাগ্রজোযতঃ।
ক্ষত্রকোপদহনার্চ্চিষং ততঃ সন্দধে দৃশমুদগ্রতারকাম্॥

কিন্তু এরূপ বর্ণনা কালিদাসের সকল স্থানে নাই।

ক্রমশঃ

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র।

আর বারে আমি অন্য লোকদের মুখ থেকে তাঁদের বিলেতের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ কোরেছিলুম, তোমাদের উপকারার্থে তা' আমি সংক্ষেপে লিপি-বদ্ধ কোরে যথা সময়ে পাঠিয়েছি। আমার যা' কর্ত্তব্য তা' আমি কোরেছি, এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হোচ্চে, সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করা ও সে বিষয়ে তোমাদের মতামত ব্যক্ত কোরে, যত শীঘ্র পার, আমাকে একটা উত্তর লিখে পাঠানো। কেমন?

এর আগে তোমাদের যে সব চিঠি পাঠিয়েছি, তা'তে যখন যা' দেখেছি, লিখেছি, যখন যা' মনে হোয়েছে বোলেছি, এখন সেই গুলোকে আর একটু শৃঙ্খলবদ্ধ কোরে লিখ্‌তে চাই; এখেনে কি কি দেখে আমার মনে কি রকম সংস্কার হ'ল, আমি কি নতুন জ্ঞান লাভ কোর্‌লুম, আমার মনে কি নতুন মত গড়া হ'ল ও কি পুরোণো মত ভেঙ্গে গেল, তাই লিখ্‌তে চেষ্টা কোর্ব্ব। অতএব এবারকার চিঠির প্রধান নায়ক হোচ্চেন "আমি।" প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, আমি। সুতরাং খুব সম্ভব যে, এই চিঠির কাগজের চার পৃষ্ঠা-পূর্ণ অহমিকা পোড়্‌তে পোড়্‌তে অর্দ্ধ পথে তোমার গা ঝিমিয়ে আস্‌বে, চোখের দ্বার রুদ্ধ হোয়ে যাবে ও নাসা-রন্ধ্র হোতে একটা বেসুরো কোলাহল উত্থিত হোতে থাক্‌বে। "আমি" পদার্থের মত প্রিয় ও আমোদজনক আর কি হোতে পারে বল? কিন্তু আমরা সকল সময়ে বিবেচনা করিনে যে, "আমি" আমারই কাছে "আমি," কিন্তু তোমার কাছে তুমি বই আর কিছুই নয়। এই রকম সাত পাঁচ ভেবে "আমি" বোলে একটা বস্তুকে সহসা তোমাদের সভার মধ্যে নিয়ে গিয়ে বল পূর্ব্বক খাড়া কোরে তুল্‌তে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হোচ্চে। বিলেত সম্বন্ধে আমার নিজের যৎসামান্য অভিজ্ঞতার সারাংশ প্রকাশ কোর্ব্বে প্রস্তুত হো-

যেছি। এই খানে একটা কথা বোলে রাখি; কথাটা কিছু গম্ভীর ছাঁচের। অভিজ্ঞতা বোল্‌তে কি বোঝায়? কতকগুলি বিশেষ ঘটনার বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করা ও তা'র থেকে একটা সাধারণ মত প্রতিষ্ঠা কোরে নেওয়া। আমি অতি বিনীত ভাবে নিবেদন কোরচি যে, যে দিক থেকে দেখ, আমার অভিজ্ঞতার মূল্য বড় অধিক নয়। প্রথমত আমি এখেনে এত অধিক দিন নেই ও এত বিশেষ সুবিধে পাই নি, যা' থেকে এখানকার সমাজের অনেক দেখে শুনে নিতে পারি; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ ঘটনাবলী থেকে একটি যথার্থ সাধারণ মত তৈরি কোরে নিতে যতটা বুদ্ধির আবশ্যক, ততটা আপাততঃ আমার তহবিলে আছে কি না, সে বিষয়ে আমার নিজের ও আমার আলাপী বন্ধুবর্গের ঘোরতর সন্দেহ রোয়েছে। অতএব আমার এই আধ-সিদ্ধ অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জন-গুলো তোমাদের পাতে দিচ্চি, যদি রুচিজনক হয় ও তোমাদের পাক-যন্ত্রের হানি-জনক বিবেচনা না কর, তা' হোলে সেবা কোরো। এই খানে আমার উদ্যোগ-পর্ব্ব ও বিনয়-পর্ব্ব শেষ কোরে, প্রবন্ধের যথাশাস্ত্র মুখ-বন্ধ কোরে প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি।

আমরা লণ্ডনে দুই এক ঘণ্টা থেকেই ব্রাইটনে প্রস্থান করি। ব্রাইটন সমুদ্রের ধারে —একটা বড় সৌখীন (fashionable) সহর। দেখ্‌তে শুনতে আকারে ইঙ্গিতে লণ্ডনেরই মত, কেবল লণ্ডনের মত সে রকম অন্ধকার, মেঘাচ্ছন্ন, ভ্রূকুটী-কুটিল মুখ নয়। আমাদের একটি বাঙ্গালী পরিবার ব্রাইটনে বাস করেন, তাঁ'দের সেখেনে গিয়ে আশ্রয় নিলুম; দেখি যে আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পোরে ছেলে পিলে নিয়ে ঘরে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ কোরচেন; তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছেন, ও তাঁর দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁৎ খুঁৎ কোরচেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তাঁর বিলিতি বন্ধু miss— বলেন, যে, ঐ রকম ভাঁজ ভাঁজ কাপড়ে যে একটি সুন্দর শ্রী আছে, তা' আঁট্‌ সাঁট্‌ ছাঁটা ছোঁটা গাউনে পাওয়া যায় না, তাঁর দিশি বন্ধু miss—(একজন বিলিতি বাঙ্গালী) বলেন, যে, যে কাপড়টা পরা হোচ্চে, সেটা একেত সম্পূর্ণ দিশি নয় (অর্থাৎ ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে সাড়ি না), তার উপরে তা'তে যদি এক রত্তি শ্রী থাকত, তা' হোলেও না হয় ভদ্রসমাজে পরা যেত, কিন্তু তা' ও নেই। " এই রকম বিলিতি ও দিশি বন্ধুদের মধ্যে মতের আকাশ পাতাল তফাৎ দেখা যাচ্চে। আমিত আগেই বোলেছি, যে, বাঙ্গালী সাহেব হোয়ে উঠ্‌লে তিনি সাহেবের ঠাকুর দাদা হোয়ে ওঠেন; আপনার লোক পর হোয়ে গেলে সে যেমন পর হোয়ে যায়, এমন আর কেউ হয় না। যা হোক্‌, আমাদের দেবীর যে, এখনো অনেক গুলি "কুসংস্কার" আছে, দেখে আমরা তৃপ্তি লাভ কোর্‌লেম। এমন কি তিনি বোল্লেন, যে, বিলেতে এসে তাঁর " কুসংস্কার" গুলি আরো বদ্ধ-মূল হোচ্চে। কি সর্ব্বনাশ! দেশের উপর ভালবাসা আরো

বেড়েছে। কি আশ্চর্য্য! তিনি বোল্লেন ওঁর মনের এতদূর পর্য্যন্ত উন্নতি হয় নি যে, সার্ব্বভৌমিক ভাব তাঁর মনে বদ্ধমূল হোতে পারে, বরঞ্চ সে বিষয়ে তাঁর মন আরো সংকীর্ণ হোয়ে এসেছে। তোমরাই বল, বিলেতে এসেও এঁর যদি এই দুর্দ্দশা, তা হলে এঁর কি আর শোধরাবার উপায় আছে? ছেলে পিলেরা দেখলুম, অত্যন্ত খুসীতে আছে, তাদের স্ফূর্ত্তি ও উদাম দেখে কে? সমস্ত দিনের মধ্যে লাফালাফি ছুটোপাটির তিলেক বিশ্রাম নেই। এইমাত্র সু—এসে আমার লেখার সম্বন্ধে কত শত প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরছিল; জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিল, কি কোরে আমি এত বড় চিঠি বাড়িতে লিখি, সে এর অর্দ্ধেকও লিখ্‌তে পারে না, দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল, এত বড় চিঠি লেখ্‌বার আবশ্যক কি, ছোট কোরে লিখ্‌বার আবশ্যক কি, ছোট কোরে লিখ্‌লেত সেই একই কথা, তৃতীয় প্রশ্ন হ'ল, অত কষ্ট কোরে হাতে কোরে না লিখে যদি ছাপিয়ে পাঠিয়ে দেও তা হ'লে কি হানি, ছাপিয়ে পাঠালে তার মতে কত প্রকার সুবিধে তাই একে একে বোলতে লাগ্‌ল; তা'র পরে আমার চিঠি পোড়তে চেষ্টা কোর্ত্তে লাগল, তার পরে তার শেষ উপসংহার হোচ্চে যে আমার লেখা অত্যন্ত খিজি বিজি বাঁকা চোরা অপরিষ্কার। সে নিজে বুঝতে পারলে না বোলে বোধ হয়, মুক্ত কণ্ঠে এই মতটি ব্যক্ত কোরে টেবিলের চার দিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে আরম্ভ কোরলে। ইতি মধ্যে কখন বি—এসে আমার চৌকির পিছন দিক থেকে আমার কাঁধে চোড়ে বস্‌বার বন্দোবস্ত করচে, তা'কে কাঁধে চোড়তে দেখে সু—র ভেদ হোল, সেও কাঁধে চোড়বে, অবশেষে দুজনে আমার দুই কাঁধে চোড়ে বোসেছে, আমিত এই অবস্থায় লিখ্‌ছি। তোমরা এ কথা শুনে হয়ত অবাক হোয়ে গেছ, বিশেষতঃ তুমি যে শাসনভক্ত, তোমার চুল হয়ত দাঁড়িয়ে উঠেছে, "যেন তাদের প্রত্যেকের জীবন আছে," এ ছেলেদের পেলে তুমি দিন কতক পিটিয়ে মনের সাধ মেটাও।—না? দুরন্ত ছেলে তুমি দু চক্ষে দেখতে পার না। তুমি চাও, ছেলেরা গুরুলোকদের কাছে চুপ চাপ কোরে ঘাড়টি গুঁজে বোসে থাক্‌বে, কথা জিজ্ঞাসা কোরলে তবে কথা কবে, কথা কবার সময় গলার স্বর অত্যন্ত নিচু হবে, গুরুলোকদের সাক্ষাতে কোন প্রকার নিজের মত ব্যক্ত কোরবে না* তাঁদের অত্যন্ত ভক্তি

* এ জায়গাটা ভারি গোলমেলে,—ছোটো ছেলেরা ঘাড় গুঁজে ব'সে থাক্‌বে এটি আমাদের দেশের কোন্ পিতা বা কোন্ পিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি চক্ষে দেখিতে পারে? আর ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা বিনয় নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা না করিয়া ভদ্রসমাজে পুতলো বাজির ন্যায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবে—ইহাই বা কোন্ পিতা সভ্যতার চরম সীমা জ্ঞান করিতে পারে। আমাদের দেশের কোন্ পিতার মন এরূপ কঠিন তাহা জানি না যে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র তাঁহার কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া থাকিলে তিনি মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হ'ন—আহ্লাদের কারণ শুধু এই যে, পুত্রের উপর দেখ

ও মানা কোরবে-ইত্যাদি, এ যে শুধু ছেলে পিলেদের প্রতিই খাটবে তা নয়, গুরু লোকদের কাছে লঘু লোক মাত্রেরই এই সকল কর্ত্তব্য! তোমার মত হোচ্চে, "লালনে বহবোদোষাস্তাড়নে বহবোগুণাঃ. তস্মাৎ পুত্রঞ্চ ভৃত্যঞ্চ তাড়য়েন্নতু লালয়েৎ*।" যা হোক্, এই গুরুভক্তির বিষয়ে আমার অনেকটা মত পরিবর্ত্তন হোয়েছে, সে বিষয়ে তোমাদের একটু বিস্তৃত কোরে বোলচি। আমাদের সমাজের পথে ঘাটে ভালবাসার চেয়ে ভক্তির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাদের দেশে পরিবারের মধ্যে গুরুজনের সম্বন্ধে ভালবাসার সম্পর্ক যেন একেবারে নেই †; সমস্তই ভক্তি ও স্নেহ। বয়সের অতি সামান্য তারতম্যে, সম্পর্কের অতি সামান্য উঁচু নিচুতে ভক্তি ও স্নেহের সম্পর্ক স্থাপিত হয়; অন্য কথায় কাজ কি, আমাদের তা' ছাড়া আর কোন সম্পর্ক মূলে নেই, কেবল সমস্ত সন্তানদের মধ্যে কি রকম হয় বোলতে পারিনে। কিন্তু এ রকম ভক্তিকে ভক্তি নাম দিলে সে নামের অসদ্ব্যবহার করা হয়, এ এক রকম অস্বাভাবিক মনোবৃত্তি, এক রকম অস্বাভাবিক ভয়। বড়দের আমরা স্বভাবতই ভক্তি করি, তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দেখে আমরা স্বভাবতই তাঁদের উপর নির্ভর করি, কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে যে ভক্তি, যে নির্ভরের ভাব বদ্ধমূল, সে কি স্বাভাবিক? প্রতি পদে শিক্ষা, শাসন, ও অভ্যাসের প্রভাবেই কি তার জন্ম হয় না? ছেলে-

---

কেমন আমার প্রভুত্ব! এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করিতে হইতেছে—ইহাতে হাসিও পায় কান্নাও পায়। সং

* লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রে মিত্রবদাচরেৎ॥

† ভালবাসা ব্যতীত ভক্তি হ'তেই পারে না; ভক্তি হ'তে যদি ভালবাসা উঠাইয়া লওয়া যায় তবে শুষ্ক কেবল শাসন-ভয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে; ভালবাসা পাত্র-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে, দম্পতির ভালবাসা পুত্র-কন্যার প্রতি কিছু অর্পিতে পারে না; পুত্র-বাৎসল্য কিছু বন্ধুবর্গের প্রতি অর্পিতে পারে না, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দ কখনো গুরুজনের প্রতি অর্পিতে পারে না; দম্পতির ভালবাসাকে দম্পতি-প্রেম কহে, পুত্রকন্যার প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে স্নেহ কহে, বন্ধুবর্গের ভালবাসাকে বন্ধুতা। সখ্য, প্রণয় ইত্যাদি কহা যায়, উচ্চের প্রতি যে ভালবাসা তাহাকে ভক্তি কহে; অতএব ভক্তি ভালবাসা-হইতে স্বতন্ত্র একটি বস্তু নহে, তবে কি—না ভক্তির ভালবাসা গুরুর ভালবাসা নহে, স্নেহের ভালবাসা নহে, দম্পতি-প্রেমের ভালবাসা নহে, উহা অপেক্ষা আর একটু উচ্চ দরের ভালবাসা। যাঁহারা কেবল যাত্রার গীতেরই মর্ম্মজ্ঞ—উচ্চ অঙ্গের গীত তাঁহাদের কাছে গীতই নহে, তেমনি শুষ্ক যাঁহারা কেবল সখ্য-রসেরই মর্ম্মজ্ঞ—ভক্তি তাঁহাদের চক্ষে ভালবাসাই নহে; সখ্যকে ধরিয়া বাঁধিয়া ভক্তির সিংহাসনে বসাইলে তবেই তাঁহাদের মনঃপূত হয়; কিন্তু তাঁদের জানা উচিত যে, যাত্রার সুরে খেয়াল ধ্রুপদ গান করা আর ভক্তিভাজন ব্যক্তির সহিত সখ্যরসের আলাপ করা, উভয়ই সমান—বেসুরো বেতালা বেমানান;—সমজদার ব্যক্তি তাহা শুনিবা মাত্র কাণে হাত দেন। সং

বেলা থেকে প্রতি পদে আমাদের কাণে মন্ত্র দিতে হয় যে, পিতা দেবতুল্য, গুরু দেবতুল্য ; কেন, দেবতুল্য কেন ? দেব ভাবের কঠোর ও সুদূর সম্ভ্রম কেন তাঁদের ওপর অর্পণ করা হয় ? তাঁরা আমাদের ভালবাসার পিতা, ভালবাসার মাতা, ভালবাসার সঙ্গে আমরা তাঁদের মুক্ত আলিঙ্গনে দৌড়ে ঝাঁপিয়ে পোড়্‌ব †, না. যোড়হস্তে বিনীত ভাবে আমাদের মানুষ পিতার কাছে না গিয়ে আমাদের জাতের বহির্ভূক্ত কোন দেবতুল্য ব্যক্তির কাছে গিয়ে অতি সন্তর্পণে বোসে থাকবো, অতি মৃদুস্বরে কথা কব, অতি নত ভাবে আত্মনিবেদন কোর্‌ব ? যুক্তি দেখাতে গেলেই তাঁরা মনে করেন, তবে বুঝি এটাতে কোন প্রকার সন্দেহ আছে, এটা একটা স্থির সিদ্ধান্ত নয় ; অমনি তাঁরা চোক টেপা টিপি কোর্‌তে থাকেন ; অত্যন্ত অবিশ্বাসের ভাব দেখান ; মনে করেন, এবিষয়ে অনেক কথা ওঠানো যেতে পারে, অর্থাৎ আমি যদি বা না পারি, আমার চেয়ে আর কোন বুদ্ধিমান জীব হয়ত পারেন ; যুক্তিটা শুনেই যে আমি বোলে যাব হাঁ সত্যি, আবার দুদণ্ড বাদে যদি ওর একটা ভুল বেরিয়ে পড়ে তা' হোলে কি অপ্রস্তুত হোয়ে পোড়্‌ব ? পাঠকেরা যে লেখকের কথা পালন কোর্ত্তে চান, সে লেখকের পাঠকদের চেয়ে একটা স্বতন্ত্র প্রাণী হওয়া আবশ্যক ; পাঠকদের কাছে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিতে হবে যে, তিনি সব জানেন, তাঁর উপরে আর কারু কিছু বলবার কথা নেই, বলবার কথা থাক্‌লেই তিনি একেবারে মাটি হোয়ে গেলেন। তার মূল কারণ, ছেলেবেলা থেকে আমরা শাসনের বশ, যুক্তির রাম-রাজ্যে আমরা বাস করিনি। তুমি ঘর থেকে গোড়ে পিটে তৈরি কোরে আমাদের একটা অসন্দিগ্ধ আজ্ঞা দেও আমরা পালন কোরব, কিন্তু তোমার ঝুড়ি থেকে তোমার যুক্তির মাল মস্‌লা গুলি বের কোরে আমাদের সুমুখে একটি পরামর্শ তৈরি কর, সে কোন কাজে লাগ্‌বে না। কেননা আমরা ছেলে বেলা থেকে আমাদের গুরু লোকদের অভ্রান্ত বুদ্ধির উপর নির্ভর কোরচি, আমরা যেখেনেই আমাদের নিজের মত খাটাতে গিয়েছি সেই খেনেই তাঁরা ছেলে মানুষ বোলে আমাদের চুপ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো যুক্তি দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেন নি। ছেলে মানুষের কাছে যুক্তি প্রয়োগ করা তাঁরা বৃথা পরিশ্রম মনে করেন। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও এক কালে তাই মনে কোর্ত্তেন, তাঁরা শ্রম সংক্ষেপ করবার জন্যে সত্য কথা গুলিও মিথ্যার আকারে

† অবশ্য শৈশব কালে এই রূপ আচরণই স্বাভাবিক কিন্তু এক জন ষোল বর্ষ বয়স্ক পুত্র ওরূপ ব্যবহার করিলে সেটা অত্যন্ত বেতালা ও বেসুরো হয় কি না একবার ভাবিয়ে দেখা হউক—একটু যাহার বুদ্ধি হইয়াছে সে পুত্র শুধু শুধু কেনই বা ওরূপ করিবে, ষোল বর্ষের বালক পিতার নিকট পাঁচ বর্ষের শিশুর ভান করিয়া, অথবা দম্পতি-প্রেমোচিত অধীর ভালবাসার ভান করিয়া দৌড়া-দৌড়ি পিতাকে আলিঙ্গন করিলে সে যে কি এক অদ্ভুত দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত। সং

প্রচার কোরেচেন, ও যুক্তির বদলে বিভীষিকা দেখিয়ে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছেন। যদি বল, গুরু লোকেরা আমাদের চেয়ে জ্ঞানী, সুতরাং তাঁদের হাতে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে গচ্ছিত রাখা আমাদের পক্ষে ভাল। তা' যদি বল, তা হোলে ইংরাজদের কাছ থেকে কতকগুলি স্বাধীনতা পাবার জন্যে আমরা খবরের কাগজে দাপা দাপি কোরে মরি কেন? ইংরাজরা যে আমাদের চেয়ে জ্ঞানে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সম্পর্কে বড় কিম্বা বয়সে-বড়র চেয়ে গুণে-বড়র কাছে আত্ম-বিসর্জ্জন করা ঢের বেশী যুক্তিসিদ্ধ*। তবে কেন তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না কোরে আমরা নিজের হাতে কতকগুলি স্বাধীনতা নিতে চাই? তুমি বোলবে, যাঁদের আমাদের উপরে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাঁদের কাছে আমরা সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাবহ হোয়ে থাকব। তা' থাক না কেন? কিন্তু ফলে যে সমানই কথা। তোমার চড় মারবার অধিকার আছে বোলে যে চড় খাবে তার যে কিছু কম লাগবে তা'ত নয়। উদয়পুরের মহারাজ শত সহস্র যুক্তির বাণ বর্ষণ কোরলেন, আমি রণে অটল, কিন্তু যেই তিনি তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র বের কোরেছেন, যেই তিনি বোলেছেন যে, কার্লাইল ও কথাটা মানেন না, অমনি আমাকে রণে ভঙ্গ দিতে হয়। আমরা বড় লোকের নামের ঢেউ দেখ্‌লেই যুক্তির হাল ছেড়ে দিয়ে বোসে থাকি। কিন্তু এরকম না হওয়াই আশ্চর্য্য। আমাদের নীতিশাস্ত্রে গুরু লোকের কাছে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম বিসর্জ্জন করাই হোচ্চে পুণ্য*। ছোটদের পক্ষে গুরুদের আজ্ঞা পালন করা বাস্তবিকই ভাল, আমি ছোটদের গুরুদের বিপক্ষে বিদ্রোহ কোর্ত্তে বলচি নে, কিন্তু গুরুদের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন যে, তাঁরা যেন ছোটদের আজ্ঞা না করেন; হয় অনুরোধ করেন নয় কারণ প্রদর্শন করেন,

* একথাটি হৃদয়-শূন্য মস্তিষ্কের কথা। সম্পর্কের বড়র সঙ্গে হৃদয়ের যেমন যোগ, জ্ঞানে ও গুণে বড়র সঙ্গে সেরূপ হওয়া দুর্ঘট। সং

* মস্তিষ্কের গুরুলোককে আমি মস্তিষ্কের ভক্তি করিব হৃদয়ের গুরু লোককে হৃদয়ের ভক্তি করিব, একথাটি লেখক বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। কার্লাইলের মতের সহিত আমার মতের অনৈক্য হইলে আমি তাঁহার সহিত কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে তাঁহার মনে আঘাত লাগিবে কি না লাগিবে তাহা আমি একবার মনেও করিব না, কিন্তু গুরু জনের সহিত কোন বিষয়ের তর্ক করিবার সময় একেবারেই তাঁহার বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতে মনের প্রবৃত্তিই হইবে না,—ভালবাসার রীতিই এইরূপ। যদি বা গুরু জন অপেক্ষা কোন বিষয় আমি ভাল বুঝি তাই বলিয়া কি সেই ভাল-বোঝাটুকুর মূল্য এতই অধিক যে, "এ বুদ্ধির কাছে, কেবা কোথা আছে," যদি বুদ্ধি জারি করা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে তার দেশ কাল পাত্র আছে, তার প্রথা আছে,—তর্কের অনুরোধে গুরু জনের মনে পীড়া দিতেই হইবে, কোন মতে ছাড়া হইবে না, কোন দেশের কোন শাস্ত্রে এরূপ লেখে না। সং

যখন কারণ প্রদর্শন কোরেও ফল হোল না, তখন একটু খানি গুরুত্ব প্রয়োগ কোর্ত্তে পারেন। কেন না, অপরিমিত ভক্তির রাজ্যে যুক্তির অত্যন্ত হীন পদ; তিনি ক্রমে মুষ্‌ড়ে যেতে থাকেন যে, অবশেষে তাঁর আর মাথা তোলবার শক্তি থাকে না। দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের আবার একটা আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এই রকম ছেলে বেলা থেকে গুরুভারে অবনম্র হোয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হোচ্চে। ছেলে বেলা থেকে বলের অন্ধ দাসত্ব কোরে আস্‌চে সুতরাং বড় হোলে সে অবস্থা তার নতুন বা অরুচিজনক বোলে ঠেকে না, তা'র কাছে এ অবস্থা স্বাভাবিক হোয়ে গেছে। আজ্ঞা পালন কোরে কোরে তার এমন অবস্থা হোয়ে যায়, যে, আজ্ঞা কোরে বোল্লেই তবে সে একটা কথা গ্রাহ্য করে, বুঝিয়ে বোলতে গেলেই তবে বেঁকে দাঁড়ায়। এখনকার বিখ্যাত বাঙ্গলা লেখকদের লেখায় কেমন একটা আজ্ঞার ভাব দেখতে পাওয়া যায়, কথাগুলি অসন্দিগ্ধ, স্পষ্ট, জোর দেওয়া; পাঠকদের সঙ্গে সমান আসনে বোসে যে বিচার কোর্‌চেন তা মনে হয় না, কিম্বা কথা কোয়ে কোয়ে যে চিন্তা কোর্‌চেন তা'ও মনে হয় না; তাঁরা কতকটা গুরু মহাশয়ের মত কথা কন; মনে হয় হাতে একটা বেত আছে, চোখে একটা চস্‌মা আছে, মুখে একটা কঠোর স্বাতন্ত্র্যের ভাব বর্ত্তমান; ইরাংজিতে যাকে dogmatic বলে, তাঁদের লেখার আপাদ মস্তক সেই রকম। তা'তে তাঁদের দোষ নেই; নইলে পাঠকেরা তাঁদের কথা মানে না; পাঠকেরা যেই দেখেছেন, তুমি একটু ইতস্ততঃ কোরচ, কিম্বা একটা কথা খুব জোর দিয়ে বোলচ না, কিম্বা তোমার উচ্চ আসন থেকে এতদূর পর্য্যন্ত নেবে

---

* পুত্র বড় ও উপযুক্ত হইলে গুরুজনেরা কখনই তাহাকে বল-পূর্ব্বক পরিচালন করেন না। গুরু-জনেরা সত্য সত্যই কিছু এরূপ বোধশূন্য পাষাণ-অবতার নহেন যে, ছেলেপিলেদের উপর ক্ষমতা জারি করিবার জন্য তাহাদের উপর তাঁহারা প্রভুত্ব করেন; আর ছেলে পিলেরাও পেটে থেকে পোড়েই কিছু এতদূর বুদ্ধি-বিদ্যার বৃহস্পতি হয় না যে গুরুজনের কথা শুনিয়া চলিলে তাহাদের উপকার না হইয়া অপকার হয়—তাহার স্বাধীন বুদ্ধি খেলিতে পায় না—বুদ্ধিবৃত্তি দমনে থাকে, মন দমিয়া যায়, ইত্যাদি। প্রকৃত কথাটা এই, ছোট বালকদিগের পক্ষে শরীর চালনা ও সামান্য স্মরণ-শক্তি চালনাই যথেষ্ট, বালকদিগকে অতিশয় বুদ্ধি-চালনা শিক্ষা দিয়া তাহাদের অল্প বয়সেই প্রবীণ করিয়া তুলিলে তাহাদের মূলে আঘাত করা হয়। প্রকৃতি এইরূপ শিক্ষা দেন যে শরীরের স্ফূর্ত্তি প্রথমে, মনের স্ফূর্ত্তি তাহার পরে এবং বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি সবাকার শেষে হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়; এমন কি নিউটন রাফেএল প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরাও তাঁহাদের গুরুদিগকে দেবতুল্য (অর্থাৎ আপনা হইতে অনেক বড়) জ্ঞান করিতেন। আগে যাঁহারা শ্রদ্ধাবান ভক্তিমান আজ্ঞাকারী সাকুরেত না হয়; পরে তাহারা কখনই ওস্তাদ হইতে পারে না—ইহা বেদবাক্য। সং

এসেছ যে, তাঁদের সঙ্গে সমান ভাবে বিচার কোর্ত্তে প্রবৃত্ত হোয়েছ, তা' হোলেই তোমার কথা একেবারে অগ্রাহ্য হোয়ে দাঁড়ায়। তুমি যুক্তি না দেখিয়ে একটা কথা জোর কোরে বল', (অবিশ্যি তোমার একটু নাম থাকা দরকার), তাঁরা মনে করেন, "এটা বুঝি, একটা ধরা কথা, কেবল অজ্ঞতা বশতঃ আমরা জানিনে," তাঁরা অপ্রস্তুত হোয়ে সমস্বরে সবাই মিলে বোলে ওঠেন "হাঁ একথা সত্য, একথা সত্য" তাঁদের এর মধ্যে কোনটা স্বাভাবিক ঃ? আমাদের পরিবারে গুরুলোকদের পরে এই রকম একটা অস্বাভাবিক ভক্তির উদ্রেক কোরে দেওয়া হয়, গুরুলোকেরাও সেই অন্ধ-ভক্তির প্রভাবে বলীয়ান্ হোয়ে ছোটদের উপর যথেচ্ছ-ব্যবহার করেন। তাঁরা চান, তাঁদের সমস্ত মত, সমস্ত আজ্ঞা ছোটরা অবিচারে শিরোধার্য্য কোরে নেয়, সে বিষয়ে তারা তিলমাত্র দ্বিরুক্তি বা দ্বিধা না করে; যেন ছোটরা কতকগুলি কলের কাঠের পুতুল, তাদের মন নেই, তাদের মনোবৃত্তি নেই, তাদের ইচ্ছে নেই, তাদের বিচার-শক্তি নেই! সংসারে তোমার যত প্রকার বড় আছে (কেবল লম্বায় বড় ছাড়া) তা'দের কাছে তোমার বিবেচনা ও ইচ্ছে কিছুমাত্র খাটিয়ো না, সে গুলি আপাততঃ সঞ্চিত কোরে রেখে দেও, অবসর পেলে তোমার ছোটদের কাছে তা অন্ধভাবে খাটাতে পার্ব্বে; তা'তে সমাজের কোন আপত্তি নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা * পিতৃতুল্য, কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুত্রতুল্য;

ঃ গুরুজনের সঙ্গে সখ্যরসের আলাপ করা অস্বাভাবিক কি স্বাভাবিক ইহা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর—যিনি সর্ব্বতোভাবে তোমার ভাল চা'ন তাঁকে কোন রূপে কোন পীড়া দিতে তুমি চাও না; তুমি জান যে তোমার কোন বিষয়ে একটু কিছু ত্রুটি দেখিলে তাঁহার মনে যত লাগিবে এত আর কাহারো মনে লাগিবে না, এই জন্য তাঁর কাছে তুমি ভয় ভয় করিয়া চল; ইহা নিশ্চয় জানিও এরূপ ভয় ভালবাসা-হইতেই জন্মগ্রহণ করে; পুত্র যদি পিতাকে ভাল না বাসে তবেই সে তাহার পিতার মনে আঘাত দিতে কিছুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হয় না—সুতরাং সে-তাহার-ভয় কঠোর শাসন-ভয় হওয়া দূরে থাকুক তাহা অতি সুকোমল ভালবাসার ভয় সুতরাং অতি সন্তর্পণে রাখিবার সামগ্রী। বন্ধুবর্গের সহিত যখন আমরা সখ্যরসে মিলিত হই তখন আমরা অনেকটা অসংকোচ ভাবে চলাবলা করি,—কেন? না বন্ধুরা পিতার ন্যায় আমাদের মঙ্গলের জন্য একান্ত লালায়িত নহে; বন্ধুদিগের লক্ষ্য আমোদ প্রমোদের দিকে, পিতার লক্ষ্য প্রকৃত মঙ্গলের দিকে; আমোদ-প্রমোদের পক্ষে ঢিলাঢালা ভাব যেমন আবশ্যক, মঙ্গলের পক্ষে সংযত ভাব তেমনি আবশ্যক—বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে মনের শৈথিল্য স্বভাবত শোভা পায়, গুরুজন সন্নিধানে মনের সংযত ভাব স্বভাবতঃ শোভা পায়; তা' যদি না বল, তবে ভক্তি শব্দটাকে অভিধান হইতে উঠাইয়া দেও। সং

* ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শাস্ত্রের অভিপ্রায় এরূপ নয় যে এক আধ বৎসরের ছোটবড় ধর্ত্তব্য, এখানে এই ইংরাজি প্রবাদটি স্মরণ করা উচিত, Letter killeth but spirit giveth life। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে জন্মিতে দেখিয়াছে; পিতা মাতা

শুনে শুনে অভ্যেস হোয়ে গেছে বোলে ও আমাদের দেশে এই রকম একটা ভাব বর্ত্তমান আছে বোলে এর হাস্যজনকতা ঘুচে গিয়েছে; নইলে এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হোতে পারে? ভ্রাতা কি ভ্রাতার তুল্য হোতে পারে না? সংসারে কি পিতা পুত্র ছাড়া আর কোন প্রকার সম্পর্ক নেই? ভাই ভাইয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাব বোলে কি একটা ভাব বর্ত্তমান নেই? কোন প্র-

---

যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া আদর করে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাহাকে সেইরূপ আদর করিয়াছে, তাহার পাঠাদি শিক্ষার সহায়তা করিয়াছে, তাহার যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় তাহাতে সচেষ্ট হইয়াছে, বন্ধুবর্গ যেমন বন্ধুবর্গের সহিত আমোদ করিতে পারিলেই পরস্পরের মঙ্গলামঙ্গলের অতি অল্পই খোঁজ খবর রাখে—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাব সেরূপ নহে; কনিষ্ঠ ভ্রাতার যদি কোন অমঙ্গলের সূত্রপাত হয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অমনি তাহার প্রতিবিধানের জন্য সচেষ্ট হয়; এ সকল আমলে না আনিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলে যে, "তুমি কেবল বয়সেই জ্যেষ্ঠ" এরূপ কথাতে ভ্রাতৃভাব না ভ্রাতৃভাবের অভাব কোন্‌টি প্রকাশ পায়? ইংরাজরা যদি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হুট্ করিয়া উড়াইয়া দেয়, অথবা তাহার সহিত বয়োবিরুদ্ধ সখ্য ভাবের কথাবার্ত্তা কহিতে লজ্জা বোধ না করে, তাই বোলে আমাদেরও কি সেইরূপ না করিলেই নয়! ইংরাজদিগের সভ্যতার ছোবড়া ভক্ষণ করিতে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেও;—তাঁহারা দেখেন স্বাধীনতা, শেখেন পর-জাতির দাসত্ব; দেখেন civilization, শেখেন Devilization; দেখেন স্বদেশানুরাগ, শেখেন স্বদেশের প্রতি নির্ম্মমতা;

কারে কান ধোরে ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক কি পিতা পুত্রের সম্পর্কের সঙ্গে মেলাতে হবেই? এমন যন্ত্রণাও ত দেখি নি। তা' হোলে ত তুমি বোল্‌তে পার, হাতি মাথার তুল্য; কিন্তু আমি বলি ওরকম তুলনার স্পৃহাটি পরিত্যাগ কোরে হাতকে হাতের স্থানে ও মাথাকে মাথার স্থানে স্ব স্ব কাজে বজায় রাখা হোক্। প্রকৃতি যা'কোরে দিয়েছেন সেটাকে ভেঙ্গে চুরে মুচ্‌ড়ে একটা বিকৃতাকার কোরে তুল্‌না। আমাদের দেশের শাস্ত্র যেমন (শাস্ত্র বোধ হয় সকল দেশেই সমান) আজ্ঞা করে, বুঝিয়ে বলে না, ভয় দেখায়, কারণ দেখায় না, আমাদের গুরুলোকেরাও তাই করেন। তাঁরা প্রতিপদে কারণ না দেখিয়ে আজ্ঞা করেন, ছোট যদি একবার জিজ্ঞাসা করে, "কেন?" তা' হোলে তাঁরা চোক রাঙিয়ে বলেন "হাঁ, এত বড় আস্পর্দ্ধা!" এতে যে ছোটদের মনের একেবারে সর্ব্বনাশ করা হয়, তা' তাঁরা বোঝেন না। একটা ঘোড়া কিম্বা একটা গাধা কিম্বা এক পাল গরুকে অবিচারে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেন না তাতে বড় জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে তাদের মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিচার-শক্তি পরিস্ফু-

---

দেখেন স্বদেশীয় পরিচ্ছদ, স্বদেশীয় আচার ব্যবহার, স্বদেশীয় চাল-চলন, ইত্যাদি সকলের প্রতি ন্যায়-সঙ্গত পক্ষপাত, শেখেন কি? না স্বদেশীয় পরিচ্ছদের প্রতি স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি, স্বদেশীয় সুরীতি সকলের প্রতি ন্যায়-বিরুদ্ধ বিরাগ! সং

টনের কোন ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু কোন মানুষকে সে রকম কোর না, বিশেষতঃ তোমার নিজের ভাই, নিজের ছেলেকে। তুমি নিশ্চয় জেনো যে, ছেলেবেলা, যখন আমাদের মন খুব কোমল থাকে, তখন থেকে যদি আমরা ক্রমাগত যুক্তিবিহীন আজ্ঞা পালন কোরে আস্‌তে থাকি, বড় লোক বোলচেন বোলেই দ্বিরুক্তি না কোরে সব কথা আমাদের শিরোধার্য্য কোরে নিতে হয়, তা'হোলে বড় হোলেও আমাদের মনের সে অস্বাভাবিক অভ্যাস দূর হয় না, প্রশ্ন করার স্বভাবটা একবারে চোলে যায়, আর সে রকম মনে কুসংস্কার অতি শীঘ্র আপনার শিকড় বিস্তার কোর্ত্তে পারে *। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদের একবার দেখ না, তাঁরা অনেক পোড়েছেন, কিন্তু তবু নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ কোর্ত্তে তাঁদের কেমন সাহস হয় না; যদি মিল কিম্বা স্পেন্সেরের নাম কোরে তাঁদের নিতান্ত একটা আজগুবি কথা বল, দ্বিরুক্তিমাত্র না কোরে তা' তাঁরা মাথায় কোরে নেন; বিলিতি কেতাবে ইংরাজি ছাপার অক্ষরে যা' লেখা আছে, তা' তাঁরা আর বুঝে হজম কোর্ত্তে শ্রম স্বীকার করেন না, শুক পাখীর মত মুখস্থ কোরে যান, কেননা বিলিতি "authority"র উপর তাঁদের এমন অটল ভক্তি যে, বিচার না কোরেই ধোরে নেন যে, কথা গুলো সত্য হবেই! তা'তে আমি তাঁদের দোষ দিতে পারিনে; কেন না ছেলে বেলা থেকে তাঁদের মন এমনি ছাঁচে গড়া যে, বড় লোকের মুখের সামনে একটা প্রশ্ন কোর্ত্তে তাঁদের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করে, বড় লোক যা' বোলেছেন তা'র উপরে আর কথা নেই †।

* গুরুজনের প্রতি ভক্তি-অভক্তি ও শিক্ষারীতি-সুপ্রণালী কুপ্রণালী এ দুটি বিষয় স্বতন্ত্ররূপে বিচার্য্য। সং

† আমরা আমাদের নিজের জীবনের পরীক্ষাতে দেখিয়াছি যে, লেখক যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, যাঁহারা যথার্থ ভক্তির পাত্র তাঁহাদিগকে ভক্তি করিলে মনুষ্যের স্বাধীনতা রুদ্ধ হয় বই ফুল হয় না; শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজনের প্রতি, জননী জন্মভূমির প্রতি, মনুষ্যের প্রকৃত মহত্বের প্রতি যদি ভক্তি সমর্পণ না কর, তবে কাহাকে চটকলাগানো, মন-ভোলানো, বড় দেখানো যা' তা' তোমার চক্ষের সামনে পড়িলেই তা'রি কাছে ভক্তির অপব্যয় করিতে মন তোমার ধাবিত হইবে; আমি বিশেষ এক ব্যক্তিকে জানি, যাহার স্বদেশের প্রতি ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তি থাকাতেই সে এত গুলি মহা-প্রভুর দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে রক্ষা পাইয়াছে—(১) মিল প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অতিবাদ (২) রঙচঙে ইংরাজী সভ্যতা, (৩) হুটপেটে ইংরাজী চাল-চলন, (৪) সুরুচি-বিরুদ্ধ সংক্ষিপ্ত-সার ইংরাজী ঢঙের কোর্ত্তা—যাহা তাহারা নিজেই তাহাদের স্বদেশীয় বড় লোকদের প্রস্তর মূর্ত্তির গায়ে পরাইতে নারাজ, (৫) দেশীয় ভাষার প্রতি অবহেলা, ইত্যাদি। সার কথা এই যে গুরুভক্তি (অর্থাৎ শুভাকাঙ্ক্ষী উচ্চ উচ্চ লোকদের প্রতি ভক্তি) এবং সর্ব্বোচ্চ ধরিতে গেলে ঈশ্বর-ভক্তি স্বাধীনতার প্রাণ; স্বাধীনতা হইতে ভক্তিটিকে তফাৎ কর, অমনি তাহা স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইবে। সং

তবে দুই বড় লোকের মধ্যে যখন মতের অনৈক্য হয়, তখন আমরা চুপ কোরে অপেক্ষা কোর্ত্তে থাকি আর এক জন বড় লোক এসে তার কি মীমাংসা কোরে দেন। যেখানেই অন্ধ একাধিপত্য সেইখানেই খারাপ। যখন গুরুলোকেরা আপনার ইচ্ছা ও সংস্কার,এমন কি কুসংস্কারের বিরোধী হোলে বোলে ছোটর প্রতি ইচ্ছা অবিচারে দলন না কোর্ব্বেন,তখন অনেক উপকার হবে*। আমাদের দেশের অশুভের মূল ঐখান থেকে অনেকটা পোষণ পাচ্চে। এখানকার তুলনায় আমি সেইটি ভাল কোরে বুঝ্তে পেরেছি। সু—বি—দের দেখ, তাদের উদাম, উৎসাহ, অধীর বাল্য ভাব ও স্বাধীনতা-স্পৃহার সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেদের শুষ্ক, মলিন, গম্ভীর ধীর ভাব,† ও সম্পূর্ণরূপে পর-নির্ভরতার তুলনা কোরে দেখ, সে কি অনৈক্য! আমি ইংরেজের ছেলেদের সঙ্গে তুলনা কোরলুম না, পাছে তুমি বল তা'দের জাতিগত স্বভাবের সঙ্গে আমাদের জাতীয় স্বভাবের ভিন্নতা আছে। কিন্তু আমাদের দেশীয় ছেলেই যথোপযুক্ত স্বাধীনতার সঙ্গে পালিত হোলে তার কি রকম স্ফূর্ত্তি হয়, তা'র মনের স্বাস্থ্য কি রকম অক্ষুণ্ণ থাকে তাই দেখ। ছেলেদের স্বাভাবিক ভাব হোচ্চে প্রশ্ন করা, একটা জান্‌বার ইচ্ছে; এখানকার ছেলেরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কোরে কোরে সারা হয়। সু-আমাকে প্রশ্ন কোরে কোরে অস্থির কোরে তোলে; আকাশের তারা থেকে পৃথিবীর তৃণ পর্য্যন্ত এমন কোন পদার্থ নেই, বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি কোরে সে যার খবর না জান্‌তে চায়। আমি যখন টর্কিতে ছিলুম, তখন একটি ছেলে আমার সঙ্গে খুব ভাব কোরে নিয়েছিল; পৃথিবীর যা'কিছু দেখ্‌তো, তা'ই যেন তার ভারি আশ্চর্য্য লাগ্‌ত, প্রতিপদে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন কোরে আমাকে ভারি মুস্কিলে ফেলত; তার কৌতূহলের আর আদি অন্ত নেই। তা'ছাড়া এখানকার ছেলেদের এক রকম স্বাধীন ও পৌরুষের ভাব দেখলে অবাক্ হোয়ে যেতে হয়। তা'র প্রধান কারণ, এখানকার গুরুলোকেরা তাদের প্রতিপদে বাধা দেয় না, আর অনেকটা সমান সমান ভাবে রাখে। আমি এখানকার একটা প্রাইবেট স্কুল দেখেছিলেম; মাষ্টার ছেলেদের সঙ্গে ঠাট্টা-ঠুট্টি করেন, খেলা করেন; কত যে স্বাধীনতা দেন তা'র ঠিক নেই; অথচ তা'তে কিছু তা'দের "মাথা খাওয়া" হয় নি; পড়া শু-

* পুত্র পিতার অসম্মতিতে বিবাহ করাতে পিতা তাহাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিয়াছে—ইংলণ্ডে ত সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। সং

† রথ ছেলে-ছিন্ন অন্য কোন ছেলেকে আমি ত আজ পর্য্যন্ত শুষ্ক মলিন ধীর গম্ভীর দেখি নি। যে বয়সের যেটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম তাহা এখানেও যেমন বিলাতেও তেমনি—বিলাতে নয় ব্যাট বল্ খেলে আমাদের দেশে নয় গুলিডাণ্ডা খেলে, বিলাতে হাইড্ অ্যাণ্ড সীক্ খেলে আমাদের দেশে নয় লুকাচুরি খেলে—প্রভেদের এই পর্য্যন্ত সীমা। সং

লোতে তা'দের কিছুমাত্র ত্রুটি নেই ‡। এই ত গেল, ছেলেদের কথা। আর বড়রা যে ওকর সঙ্গে খুব কম সম্পর্ক রাখে তা' বলাই বাহুল্য। এখানে এমন স্বাধীন ভাব বর্ত্তমান, যে, প্রভু ভৃত্যের মধ্যেও সে রকম আকাশ পাতাল সম্পর্ক নেই *। এখানে চাকরকে গালাগালি দেওয়া ও মারাও যা, এক জন বাইরের লোককে গালাগালি দেওয়া ও মারাও তাই। আমাদের দেশের মত চাকরদের বেঁচে থাকা ছাড়া অন্য সমস্ত অধিকার মনিবদের হাতে নেই। চাকর কোন কাজ কোরে দিলে "Thank you," ও তা'কে কিছু আজ্ঞা করবার সময় "Please" বলা আবশ্যক †। একবার কল্পনা কোরে দেখ দেখি, আমরা চাকরদের বলচি, "অনুগ্রহ কোরে জল এনে দেও।" বা "মেহেরবানিকরকে পানি লেওয়াও।" ও জল এনে দিলে বলচি "বাধিত রইলুম।" তুমি হয়ত বলবে Thank you ও Please ও কেবল একটা মুখের কথা মাত্র। কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহার প্রতি পদে যে কথা দুটোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, জাতীয় হৃদয়ে তা'র কারণ নিশ্চয়ই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে হয়ত জোর কোরে তর্ক কোরিচি, তুমি হয়ত মান যে, হৃদয়ের মাটিতে শিকড় না থাক্‌লে একটা কথা তিন দিনে শুকিয়ে মারা যায়। এখানে মনিবরা টাকা দেন ও চাকরেরা কাজ কোরে দেয় উভয়ের মধ্যে কেবল এইটুকু বাধ্যবাধকতা আছে; তুমি টাকা না দিলে চাকর কাজ করবে না, চাকর কাজ না কোরলে তুমি টাকা দেবে না; কিন্তু একটু খানি কাজের

‡ আমাদের দেশের টোলে এই রূপ প্রথাতেই শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণকার ইংরাজী বিদ্যালয়ের routine business প্রণালীতে বালকদিগের মন দমিয়া যায় ইহা আমি সম্পূর্ণ শিরোধার্য্য করি। সং

* আমাদের দেশের পাড়াগাঁ অঞ্চলেও এই রূপ দেখা যায়—লেখক সহরে Lord-দের ঘরে স্বতন্ত্র রূপ প্রথা দেখিবেন ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। সং

† লেখক এই মাত্র বলিলেন চাকর মনিবে বেশী তফাৎ ভাব নাই, ইহাতে বুঝায় যে, তাহারা বাড়ির লোকেরই সামিল; আমাদের দেশের গৃহস্থ মানুষদের ঘরেও চাকর মনিবের মধ্যে ঐরূপ ভাব দৃষ্ট হয়—তাহার সাক্ষী চাকরাণীকে ঝি বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা; কিন্তু চাকরদের সঙ্গে পদে পদে সম্মানসূচক ব্যবহার করা—আস্তে পৃষ্ঠে কাষ্ঠ-সভ্যতার ভার বহন করা—আমাদের দেশের সহজ-সভ্য লোকদিগের পোষায় না; গর্দ্দভও ভার বহন করিতে ভার বোধ করে, আমরা মনুষ্য হইয়া যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপন স্কন্ধে আপনি ভার চাপাই তবে তা'র চেয়ে আমরা বড় কিসে? সং

‡ এ সকল কৃত্রিম সভ্যতার না আছে অর্থ, না আছে কিছু; আমাদের দেশে এরূপ মৌখিক ভদ্রতার যত কম আমদানি হয় ততই ভাল; মনে কর ছেলের জ্বর হয়েছে আর যেই তার বাপ একটা হাতপাখা তুলে নিয়ে তার গায়ে বাতাস দিতে লাগল অমনি ছেলে বোলে উঠ্‌লেন "thank you বাবা"—এরূপ কাষ্ঠ সভ্যতা কাষ্ঠ হৃদয়ের উপরেই গুণ করিতে পারে, সহজ হৃদয়কে আগুণ করিয়া তোলে। সং

ত্রুটি হোলে তা'কে ও তা'র অনুপস্থিত নির্দ্দোষ পিতা পিতামহ বেচারীদের সম্পর্ক-বিরুদ্ধ বিশেষণ প্রয়োগ করবার কি অধিকার আছে? এখানে চাকরদের মধ্যে দাসত্বের ভাব যে কত কম, তা' হয়ত তুমি না দেখ্‌লে ভাল কোরে বুঝতে পারবে না। আমি একটি পরিবার জানি, সেখানে মনিবরা রান্না ঘরে যেতে হলে রাঁধুনীর অনুমতি চেয়ে পাঠাতেন, পাছে তার কাজের মধ্যে intrude কোরলে সে বিরক্ত হোয়ে ওঠে! এর থেকে কতকটা বুঝতে পারবে। এই রকম এখানকার পরিবারে স্বাধীনতা মূর্ত্তিমান,কেউ কাউকে প্রভুভাবে আজ্ঞা করে না, ও কাউকে অন্ধ আজ্ঞা পালন কোর্ত্তে হয় না। এমন না হোলে একটা জাতির মধ্যে এত স্বাধীন ভাব কোথা থেকে আস্‌বে? কিম্বা হয়ত আমি উল্‌টো বলচি, একটা জাতির হৃদয়ে স্বভাবতঃ এতটা স্বাধীন ভাব না থাক্‌লে এমন কি কোরে হবে? যা'দের হৃদয়ে স্বাধীন ভাব নেই, তারা যেমন অম্লান বদনে নিজের গলায় দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে পারে একটু অবসর পেলেই পরের গলায়ও তেমনি অকাতরে দাসত্বের রজ্জু বাঁধতে ভাল বাসে। আমাদের সমাজের আপাদ মস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিল্‌টি কোরে আমরা বড় জোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারিনে, তা'র যা কুফলতা' থেকে যায়। আমি আগে মনে কোর্‌তুম যে, হিন্দুদের মনে একটা সহজ স্বাভাবিক ভাব আছে, কোন প্রকার অস্বাভাবিক বাঁধা বাঁধি, আইন কানুন নেই। কিন্তু কোন্ লজ্জায় আর তা' বোল্‌ব বল? হিন্দুদের মধ্যে অস্বাভাবিক আইন কানুন নেই? তাদের পরিবারের মধ্যে দেখ! আপনার ভাই বোন্ পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্রের মধ্যে কতটা বাঁধা বাঁধি আছে একবার দেখ! ভাইয়ের প্রতি কি রকম ব্যবহার কোর্ত্তে হবে তা' কোন্ দেশে শেখাতে হয় বল দেখি? তবে যদি বল যে, ভাইয়ের প্রতি পিতা বা পুত্রের মত ব্যবহার কোর্ত্তে হবে, তা' হ'লে শেখাবার খুব আবশ্যক করে বটে;* কোন মানুষের সহজ অবস্থায় আত্ম-

* মনে কর একটি বড় পুত্র এবং একটি ছোট পুত্র রাখিয়া পিতামাতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এখন ছোটটিকে তাহার পিতা যেমন যত্ন করিতেন তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহাকে সেইরূপ যত্ন না করিলে তাহার পক্ষে তাহা কর্ত্তব্য-বিরুদ্ধ, হৃদয়-বিরুদ্ধ ও নিন্দনীয় হয় কি না? পিতার অবর্ত্তমানে যাহা এইরূপ অবশ্যম্ভাবী—পিতা বর্ত্তমানে তাহা হইলে আরো ভাল হয় কি না? যে যাহাকে পুত্রের মত যত্ন করে তাহাকে সে পিতার মত ভক্তি করিবে কি না? ধাত্রীকে তাহার দুগ্ধ-পোষ্য শিশু স্বভাবতই মাতার মত এবং স্থল-বিশেষে তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে কি না? ধাত্রী পর হইয়াও যদি মাতার ন্যায় হইতে পারে তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আপনার হইয়া কেন না পিতৃতুল্য হইতে পারিবে? বড়র প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে না ত কাহার প্রতি করিবে? সং

প্রত্যয় থেকে ও কথা মনে আস্‌বার কোন সম্ভব নেই। গুরু লোকদের কাছে বেশী কথা কওয়া বা হাসা পর্য্যন্ত নিষেধ। কি ভয়ানক! যাঁদের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা * অনবরত থাকতে হবে, তা'দের সঙ্গে যদি মন খুলে কথা বার্ত্তা না কবে, প্রাণ খুলে না হাস্‌বে, তা'দের কাছেও যদি জিবের মুখে লাগাম লাগিয়ে, হাস্যোচ্ছ্বাসের মুখে পাথর চাপিয়ে, আর মুখের ওপর একটা সম্ভ্রমের মুখস্ পোরে দিন রাত্রি থাক্‌তে হয় তা' হোলে কোথায় গিয়ে আর বিশ্রাম পাবে†? ইনি দাদা, উনি কাকা, তিনি মামা, এ ছোট ভাই, ও ভাই-পো, সে ভাগে, কার কাছে ভাল কোরে মুখ খোলবার যোনেই *। কি করা যায়? বাড়ি থেকে বেরিয়ে বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে আড্ডা গাড়্‌তে হয়, সেখেনে পাঁচ জনে মিলে তামাক খাওয়া, দাবা খেলা, ও হাসি তামাসা করা যায়। এ দুর্দ্দশা কেন বল দেখি? আফিস থেকে এসে যেমন আফিসের কাপড় চোপড় ছেড়ে হাঁফ ছাড়া যায়, তেমনি বাড়িতে প্রবেশ করেই লৌকিক ব্যবহারের খোলষ পরিত্যাগ কোরে মনটাকে কেন একটুখানি হাত পা ছড়াতে দেওয়া হয় না? তখনো কেন আমি স্ত্রীর সঙ্গে চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ কোরে কথা কব, পাছে পাশের ঘর থেকে শ্বশুর ভাশুর বা ঐ রকম একটা কোন মান্যবর পরম পূজনীয় সম্পর্কের ব্যক্তি আমার স্ত্রীর গলা শুন্‌তে পায়? স্ত্রীর গলা বা হাসি শুন্‌লে কার কি সর্ব্বনাশ হয় বল দেখি? একেই কি সহজ-শোভন ভাব বলে? এর মধ্যে সহজ ভাব টা কোন্ খানে বল দেখি? বিলিতি-বাঙ্গালীরা যে দেশে ফিরে গিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করেন, ও বলেন, আমাদের দেশে "Home" নেই, বিলেতেই যথার্থ "Home" আছে; তাঁরা বোধ হয় তা'র এই অর্থ করেন যে, বিলাতের পরি-

* চব্বিশ ঘণ্টা গুরুলোকদের সঙ্গে থাকলে ছেলেরা দুদিনে বুড়িয়ে যায়—কোন ছেলেকে আজপর্য্যন্ত ওরূপ করিতে দেখি নাই। সং

† গুরুলোকেরা শিক্ষার স্থান, ভক্তি শ্রদ্ধার স্থান; বিশ্রামের স্থান বা বিনোদের স্থান নহেন; তাঁহারা যদি বিনোদের স্থান হইবেন, তবে সমবয়স্কেরা কি করিতে রহিয়াছে;—ক্ষুধার জন্য অন্ন রহিয়াছে, তৃষ্ণার জন্য জল রহিয়াছে, ইহা বিস্মৃত হইয়া ক্ষুধা পাইলে যে ব্যক্তি জল খায় ও তৃষ্ণা পাইলে ভাত খায়, সেই ব্যক্তিরই কর্ম্ম—বিনোদ ইচ্ছা হইলে গুরু-লোকের নিকট যাওয়া ও সদুপদেশ এবং উচ্চ সহবাসের ইচ্ছা হইলে সমবয়স্কদিগের নিকট যাওয়া; ভক্তি-ভাজন ব্যক্তির সম্মুখে মন স্বভাবতই প্রশান্ত সংযত ভাব ধারণ করে—মনঃসংযম যাহা অনেক শিক্ষার ফল তাহা আপনাআপনি হয়, এ কিছু কম কথা নহে। সং

* কেন মুখ খুলিবার জো নাই? অবশ্য মুখ খুলিবার জো আছে—কেবল এলোমেলো যা ইচ্ছা তাই বকিবার জো নাই। গুরুজনদিগের কথা বার্ত্তা, রীতি চরিত্র, দেখিয়া শুনিয়া বালকেরা কথা বার্ত্তা কহিতে বসিতে দাঁড়াইতে যত দিন না শেখে তত দিন তাহারা অসম্বদ্ধ প্রলাপ

বারে একটা স্বাধীন-উচ্ছ্বাসের ভাব আছে। বাপ মা, ভাই বোন, স্ত্রী পুত্রে মিলে হাসি, গল্প, গানে, অগ্নিকুণ্ডের চার ধার উচ্ছ্বাস-ময় কোরে তোলে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে একটা উল্লাস একটা

করিলে আদর বই ভর্ৎসনা লাভ করে না এবং বালকদের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চাপল্য হ্রাস পায় ও গুরুজনদিগের প্রতি ভক্তিভাবের উদয় হয়, ইহা সকল দেশেই সমান। সং

† এইরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিবার জন্য বিলাতে যাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এক জন সামান্য খ্রীষ্টান বাঙ্গালীর ঘরেও ঐরূপ স্বাধীন উচ্ছ্বাসের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সেরূপ উচ্ছ্বাস বাস্তবিক স্বাধীন উচ্ছ্বাস কিম্বা প্রবৃত্তির অন্ধ উত্তেজনা এইটির প্রতি একটু মনোযোগ করিলে ভাল হয়; দেশ কাল পাত্রোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া যে কার্য্য করা হয় তাহাই স্বাধীন নামের যোগ্য; স্বাধীন কিনা স্ববশ, কিন্তু স্ববশ দূরে থাকুক আমি যখন এরূপ অবশ হইয়া পড়িয়াছি যে গুরুজনের প্রতি একটুও দৃক্‌পাত নাই, আপনার সুখেই আপনি অচেতন, তখনকার সে মূঢ় ভাবকে স্বাধীনতা বলা আর পা-কে মাথা বলা—উভয়ই সমান; স্ত্রীর সহিত যেরূপ মন-খোলাখুলি করিয়া কথা-বার্ত্তা কহা যায় তাহা কি গুরুজনের শ্রুতি-যোগ্য, না গুরুজনেরা তাহা শুনেন ইহা কাহারো প্রার্থনীয়? স্ত্রী পুরুষদের নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কহিবার রীতি সকল দেশেই প্রচলিত আছে কেবল আমাদের দেশে নহে; ইহার কারণ এই যে, পতি-পত্নীর মধ্যে এরূপ অভেদ সম্বন্ধ যে উভয়ের মধ্যে গোপনীয় কিছুই নাই, সুতরাং পতি-পত্নী নির্জ্জনে যেরূপ কথা-বার্ত্তা কহে গুরু-জন-সমক্ষে তাহারা সেরূপ কথা বার্ত্তা কহিলে তাহাদের পতি-পত্নীত্ব ভূত-পেত্নীত্বে পরিণত হয়; পতি-পত্নী যখন গুরুজনসমক্ষে সর্ব্বান্তঃকরণে আলাপ করিতে পারে না, তখন সে জায়গায় আলাপ না করাই ত ভাল, যে জায়গায় আমি মন খুলিয়া হাসিতে না পারি সেখানে না হাসাইত ভাল, এই সকল সোজা বিষয়কে নানা রূপে বাঁকাইয়া তাহা কোন জন্মে যা' নয় তাই করিয়া তোলা বক্তৃতা-শক্তির অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। সং

‡ একটা গল্প মনে পড়িল,—এক জন সদ্যপ্রমারী দলের কবিরাজ রোগীকে দেখিতে আসিয়া তাহার ঘরের লোকদের জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কোন চিকিৎসককে কি দেখানো হইয়াছিল?" তাঁহারা বলিলেন "অমুক চিকিৎসককে দেখানো হইয়াছিল" কবিরাজ বলিলেন "তিনি কি বলিয়াছেন?" তাঁহারা বলিলেন তিনি বলিয়াছেন নাড়ীতে এখনো একটু বেগ আছে, আজকের দিন স্নানটা স্থগিত রাখিলে ভাল হয়" কবিরাজ ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আরে আমি কি বলচি ওকে অষ্ট-প্রহর জলে চুবিয়ে মেরে ফ্যাল্!—আর কি বল্লেন?" উত্তর "আর বলেছেন আজকের দিন ভাত না দিয়ে খই বাতাসা এমনি-সকল সামগ্রী খেতে দেওয়া হয়" কবিরাজ বলিলেন "আরে আমি কি

মেশামেশির ভাব দেখতে পাওয়া যায়। ‡ এক ঘরে শ্বশুর তাঁর দুই চারটি বৃদ্ধ বন্ধু জুটিয়ে তামাক খেতে খেতে এখনকার ছেলে পিলেদের অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে কলির দ্রুত উন্নতির আশঙ্কা কোরচেন, আর এক ঘরে বউ সাত হাত ঘোমটা টেনে তাঁর

শাশুড়ির কাছ থেকে নীরবে তাঁর দৈনিক তিরস্কার সেবন কোর্‌চেন, আর এক ঘরে স্বামী তাঁর দুই একটি যুবা বন্ধু জুটিয়ে

বলচি ওকে গাওে পিওে যা' তা' খাইয়ে ওকে একেবারে শেষ কোরে ফ্যাল্"। —ইত্যাদি। বিলাতি শাস্ত্র বোল্‌চেন—লোক জন মিলে মিসে আমোদ করা ভাল, আরে আমাদের শাস্ত্র কি বোল্‌চে—যে, দুজন লোককে এক ঠাঁই মিলে আমোদ কর্ত্তে দেখেচ কি আর অমনি মারো লাঠি : আমাদের দেশে কি, বন্ধুবর্গেরা একত্র মিলে মিসে আমোদ করে না, বাপ মার কাছে ছেলেরা বসিয়া কি কখন সুখের আস্বাদ পায় না, না স্ত্রী পুরুষেরা পরস্পরের সহবাসে সুখভোগ করে না, না ছেলে পিলেরা আপনাদের মধ্যে বাল্যক্রীড়া করিয়া সুখী হয় না ? অপরাধের মধ্যে পতি পত্নীরা পিতা মাতা শ্বশুর শাশুড়ীর সমক্ষে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে না, না করিল তাহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল—পতি-পত্নীর পরস্পর হৃদয়-বিনিময়ের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না বন্ধু জনগণের আমোদের কিছু ব্যাঘাত জন্মিল, না পিতা পুত্রের স্নেহ ভক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মিল,—যাহা ঠিক, যাহা স্বাভাবিক, যাহা সভ্যোচিত, যাহা শোভন তাহাই হইল—যাহা বেঠিক, বেচাল, অসভ্যোচিত, অশোভন তাহাই হইল না। অন্তঃপুরবাসিনীরা আপনাদের মধ্যে যেমন সখারসের আলাপ করিতে পারে পুরুষদের সঙ্গে কখনই তেমন পারে না ; যেখানে পাঁচ জন স্ত্রীলোকে মিলিয়া সখারসের আলাপে নিমগ্ন হয় সেখানে পুরুষ মানুষ গেলে তাহাদের আমোদে ব্যাঘাত পড়ে ; এজন্য সখায় সখায় সম্মিলনের জন্য বহির্বাটীর এবং সখীতে সখীতে সম্মিলনের জন্য অন্তঃপুর

নিন্দালাপ • কোর্‌চেন, এরকম চিত্র এখানকার কেউ কল্পনা কোরতে পারে না। আমাদের মুখ পোলবার জায়গা পরের কাছে। বউয়ের দুই চারটি সমবয়সী সই আছে, তা'দের কাছে অবসর মত স্বামীর

সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাতে পরিবারের স্ত্রীলোকদের এবং পুরুষদের সম্মিলনের কোন বাধা নাই, দুই এক স্থলে যা বাধা আছে তাহা দেশাচারের কোটায় ফেলিয়া দেওয়া উচিত (কোন দেশের দেশাচার একেবারেই কুসংস্কার-বিহীন ?) "বাধা নাই" কেবল নহে পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদের পুরুষদের মধ্যে সম্মিলন ঘটনার সময়ও নির্দ্ধারিত হইতে পারে, যেমন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ইত্যাদি ; স্ত্রীলোকেরা আপনাদের মধ্যে যেমন অসংকোচে সখারসের আলাপ করিতে পারে, পুরুষদের সঙ্গে তাহারা তেমনটি পারে না বলিয়া সখ্যালাপ-স্থলে এদেশে স্ত্রীলোকদের পুরুষদের একত্র সম্মিলনের প্রথা নাই। যদি কেবল অন্তঃপুরের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পুরুষেরা সন্ধ্যা-যাপন করে তবে তাহারা বাহিরের বন্ধুদিগের সঙ্গে মিলিয়া প্রকৃত পক্ষে সখারস উপভোগ করিবে কখন্ ? যদি বল যে সখারা এবং সখীরা সকলে একত্রে মিলিয়া বন্ধুতালাপ করিতে হানি কি ? তাহার এই উত্তর যে, তাহা হইলে ক্রমে এইরূপ দাঁড়াইবে যে, সখার সঙ্গে সখার কিংবা সখীর সঙ্গে সখীর বন্ধুতা অতি নিচু দরের বন্ধুতা—সখা-সখীর মধ্যে চখা-চখীর ভাবই আসল বন্ধুতা ! তাহার সাক্ষী—বল্-মজলিসে পর-পুরুষদের সঙ্গে নাচিবার জন্য ইয়োরোপবাসিনীদের মন কেমন নাচিয়া উঠে ! সং

• ইহাতে বুঝ ইতেছে এই যে, নিন্দালাপাই আমাদের একমাত্র আলাপ ও

ভালবাসার গল্প করে; শাশুড়ির কতকগুলি প্রৌঢ়া প্রতিবাসিনী আছে, সকলে মিলে পাড়ার অন্তঃপুরের সুস্বাদ গুপ্ত খবরের আলোচনা করা হয়, স্বামীর কতকগুলি যুবা বন্ধু আছে তা'দের সঙ্গে কালেজীয় অশাস্ত্র আলোচনা চলে, আর শ্বশুরের চণ্ডীমণ্ডপে পাড়ার কতকগুলি খুড়ো ও দাদা মহাশয়ের আমদানি হয়, ও ঐ সকল পাকাবুদ্ধিতে মিলে ইহকাল ও পরকালের অনেক কঠিন বিষয় মীমাংসা করেন। আমাদের পরিবার পরকে আপনার কোরে নিতে হয়, কেননা আপনার সকলে পর।† অসদ্ব্যবহার বা পাপ-কার্য্যে লোকের স্বাধীনতা যত কমাও, ততই ভাল, কিন্তু নির্দ্দোষ এমন কি উপকারজনক বিষয়ে স্বাধীনতা যতকম ছাঁটা যায় ততই ভাল। শ্বশুরে স্ত্রীর গলা শুনলে পৃথিবীর কি হানি ও সরকের কি শ্রীবৃদ্ধি হয় বল দেখি? আপনার লোক সকলে মিলে মিশে গল্প স্বল্প কোরলে উপকার ছাড়া অপকার কি হয় বল দেখি? অনেকে সমাজের অনেক রকম বড় বড় সংস্কারের কথা পাড়েন, আমি একটা ছোট খাটো পরামর্শ দিচ্চি

ইংরাজেরা সে রসে বঞ্চিত—gossiping শব্দের অর্থ তবে কি? বিবিদের সম্মিলনে নিন্দাবাদের ফোয়ারা কেমন খুলিয়া যায় তাহার একটি জাজ্বল্য মান ছবি লেখকের হস্ত দিয়া ভারতীতে পূর্ব্বে একবার বাহির হইয়া গিয়াছে।

† বিলাত হইতে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে।

শোন দেখি, আমাদের পরিবারের মধ্যে স্বাস্থ্যজনক স্বাধীনতা সঞ্চার কোরে দেও দেখি; টানাটানি বাঁধাবাঁধি শাসন ও পরনির্ভরতা কমিয়ে দেও দেখি। তুমি হয়ত ভারি চোটে উঠেছ, তুমি বলচ যে "তুমি বিলেতে গিয়েছ, বিলেতে কি দেখেছ শুনেছ, তাই বল, আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি; কিন্তু এরকম যদি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ কর, তাহোলে ত আর আমাদের ধৈর্য্য থাকে না!' কিন্তু তোমাকে এইখেনে বোলে রাখছি, আমি এ চিঠিতে টেম্‌স্‌টানেল ও ওয়েষ্টমিনিষ্টর হলের বর্ণনা কোর্ত্তে বসি নি। বিলেতের সমাজ আদি দেখে আমার কি মনে হোল ও আমার কি রকমে মত পরিবর্ত্তন ও গঠিত হোল তাই বোলব। আজ আমার যে মত তোমাদের বিস্তৃত কোরে লিখলুম, তা' এখানকার সমাজ দেখে আস্তে আস্তে আমার মনে বদ্ধমূল হোয়েছে। একটা সমাজের ভিতরে না থেকে বাইরে থেকে বাইরে থেকে তা' আলোচনা কোরলে তা'র অনেক বিষয় যথার্থ রূপে চোখে পড়ে, ভিতরে থাকলে খুবকম বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, সকলি স্বাভাবিক বোলে মনে হয়। আমার তাই একটি মহা সুবিধে, আর একটি সমাজের সঙ্গে তুলনা কোর্ত্তে পারচি। তোমার নিজের মতের সঙ্গে মিলিল না বোলে তুমি হয়ত বোলবে বিলেতে গিয়ে লোকটার মাতা ঘুরে গিয়েছে। এ কথা বোল্লে কোন যুক্তি না দেখিয়ে আমার সমস্ত কথাগুলো একতোপে

উড়িয়ে দিতে পার। কিন্তু আমি তো-
মাদের বিশেষ কোরে বোলচি বিলেতে
এসে কারু যদি মাথা না ঘুরে থাকে ত সে
তোমাদের এই বিনীত দাসের।

সাধের ভাষাণ।

(গাথা)

কেও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
সুধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে ওই,
আপনার মনে গাহিছেগান ?

মলিন বসন, মলিন ভূষণ
এলো চুল রাশি উড়িছে বায়,
শইবাল পরে শতদল সম,
মুখানির শোভা বেড়েছে তায়।

নীল উতপল জিনিয়া দীঘল
নীল আভাময় নয়ন দুটি,
শূনা ভাব ভরে. এদিকে ওদিকে,
চারিদিকে যেন বেড়ায় ছুটি।

কি যেন খুজিছে নিজেই জানেনা,
অথচ পরাণ কি যেন চায়,
চোখের সমুখে গিরি নদীবন,
দেখে ও যেন না দেখিছে তায়।

গরবে উথলি তটিনী ওইযে
আপনার মনে বহিয়ে যায়,
তীরে তীরে তার উন্মাদিনী. বালা
ঐ শুন—ঐ—কি গান গায়,

ভৈরবী।

"ভুলে যাও ভুলে যাও ভুলে যাও দুখিনীরে
নহিলে হবে না সুখী একটি দিনের তরে।
এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জ্বালা
যেখানে যেখানে আমি মোর সাথে সাথে ফিরে,
কি বেদনা লাগে প্রাণে কহিতে ভুলিবার কথা
কেবলি যাতনা জীর্ণ মরমি জানে সে ব্যথা,
হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ সুখে রবে
তাইভিক্ষা, হও সুখী ভুলে যাও অভাগীরে"
গাইতেছে বালা, জানে নাসে তবু
কি গান গাইছে ? কি মানে তার ?
স্মৃতি হ'তে সুধু আপনি উথলে
এছাড়া কিছুসে জানেনা আর।
গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা
কিছুতেই যেন খেয়াল নাই,
আপনার ভাবে আপনিই ভোর
ধরায় যা হয় হোকনা তাই।
প্রখর হয়েছে রবির উত্তাপ,
প্রহর তিনেক হয়েছে বেলা,
নদীর উবসে, কিরণের রাশি,
চমকিছে যেন দামিনী মালা।

ও পারে অদূরে, ছোট ছোট ছোট,
শ্যামল সুনীল পাহাড়গুলি,
কাছে ব'হছে বালিকার পানে,
অতীত শিখর মেঘেতে তুলি।

ঝর ঝর ঝর পড়িছে নিঝর,
কোথাও অমচ না যায় দেখা,
মাঝে মাঝে মাঝে, ভূধরের গায়,
ঝলসিছে শুধু রজত রেখা।

নদীর মধুর মৃদুল সুরেতে,
মিলিছে মধুর নিঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোন দিকে তার নাহিক কান।

প্রখর উত্তাপ, হয়েছে, হোক না,
বালিকার তায় আসিবে কিবা,
বহে যদি ঝড়, বজ্রক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা।

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে,
সহসা বালিকা থামিল কেন!
পরিচিত সুরে, কে গাহিছে গান,
কেন রে হৃদয় অবশ হেন?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে,
কি ভাবে হৃদি এ উঠিল পুরে,
কে গাইছে গান, কে গাইছে গান
সেই সে পুরান মোহিনী সুরে!

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা,
একিরে বালার, বিভল হৃদয়ে
একিরে সহসা একিরে ব্যথা।

নিজেই জানে না, কি ভাবে আকুল,
মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
নদীর ধ'রেতে গাছের তলায়,
রাখিল বালিকা শরীর তার।

তরঙ্গে তরঙ্গে, তরণীটি রঙ্গে
নেচে নেচে নেচে চলিয়ে যায়,
যুবক কেওই, দাঁড়াইয়ে হোথা
বালার বেহাগ গানের উত্তর গায়?

"কেন বা ভুলিব তোরে কে ভোলে হৃদয় ধনে,
শুনা এ হৃদয় লয়ে কি হবে বাঁচিয়ে প্রাণে।
আশাতে নিরাশ বলে, তোমারে কি যাব ভুলে,
সেতো নয়রে ভালবাসা সুখ আশা সঙ্গোপনে
চাহিব না ভালবাসা, রাখিব না সুখ আশা,
ভাল বেসেই সুখী আমি রব সখিমনে মনে,
প্রেমের প্রতিমা খানি, হৃদয় মন্দিরে আনি,
জীবন অঞ্জলি দিয়ে পূজিব লো সযতনে।"

ক্ষণেকে তরীটি, লাগিল তীরেতে,
যুবক একটি বিষাদ চেতা,
যে গাছের তলে, পড়েছিল বালা
আসিয়ে অমনি দাঁড়াল সেথা।
"সরলে আমার, এ কি তোর বেশ!
দেখেযে পরাণ ফাটিয়ে যায়"!
ফুটিল না আর, কথা বিনোদের,
নীরবে কেবল কাঁদিল হায়।
অবাক বালিকা, পাথর মূরতি
কথাও একটি নাহিক মুখে,
চাহিয়া রহিল, বিনোদের পানে
কি জানে কে জানে সুখে কি দুখে।
থেকে থেকে থেকে, নীরব নয়নে,
উথলি উঠিল শতেক ধারা,
ঝাঁপিয়া ধরিয়ে বিনোদের গলা,
কাঁদিয়া উঠিল আকুল পারা।

"চিনি যে তোমায়-সেই যে আমার,
এতদিন বল আছিলে কোথা,"
আবার অমনি, থামিল বালিকা,
সরিল নিশ্বার একটি কথা !

কি যেন বলিবে, সাধ আছে মনে
অথচ সকল গিয়েছে ভুলে,
আকুল পরাণে, চাহিল কেবল
সজল দুইটি নয়ন তুলে।

নীরব নয়নে, প্রেম তিরস্কার
বুঝিয়ে যুবক পাইল ব্যথা,
বালার হৃদয় বালা যা বোঝে না
যুবক বুঝিল নিগূঢ় কথা।

মুছায়ে সে ধীরে, নয়নের জল
বলিল যাতনা অস্ফুট স্বরে,
"শোন গো ললনে, কি জানিবে তুমি
কি দুখ পেয়েছি তোমার তরে।

যে দিন জানিনু, এ জগতে আর
তোমার সহিত হোল না বিয়ে,
সে দিন আমারে, ভুলিতে বলিলি
তুই লো যাতনা দলিত হিয়ে,
উঃ কি জ্বলনে, জ্বলে ওঠে প্রাণ,
যখনি সেকথা মনেতে পড়ে,
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়, মরম বাঁধুনি
তোর সে বিষণ্ণ মুখানি স্মরে।

জীবনের আশা, সুখের পিপাসা
সেই দিন হতে ছাড়িয়ে বালা,
সঙ্কল্প সঙ্কল্পিনু জীবন ত্যজিতে
এড়াতে সকলি যাতনা জ্বালা।
জয়পুর আর, মেবারের সনে
শুনিনু বেধেছে বিষম রণ,
সেনানী হইয়ে কামানের মুখে
যুঝিনু করিয়ে পরাণ পণ।

কিন্তু হা এ ভাগ্যে, মরনো যে নাই।
জানিনে জানিনে তখন বালা,
ভাবিনু নিশ্চিন্ত কামান আগুনে
জ্বলি শেষ হ'বে হৃদয় জ্বালা।

মরণ হেলনা সমরে আমার
দেখলো বাঁচিয়ে রয়েছি আমি,
কিন্তু কি যাতনা, জ্বলেছে হৃদয়ে
জানেন কেবল অন্তর্যামী।"

বলিয়া যুবক চকিত নয়নে
চাহিল তখন স্বরগ পানে,
বালিকা তা দেখি কাঁদিল অধীরে
না বুঝিয়ে কিছু কথার মানে।

বলিতে বলিতে দুখের কাহিনী
যুবারো নয়নে বহিল ধারা,
গভীর সুখের জাগন্ত স্বপনে
আপনে হইয়ে আপনা-হারা।

ধরিয়ে বালার সজল মুখানি
রাখিয়ে আপন বুকেতে মাথা,
সুধাইল যুবা "বলগো সরলে,
তুমি গো কেমনে আসিলে হেথা ?"
উত্তর না দিয়ে বলিল বালিকা
এক দিঠে তার মুখানি হেরে,
"বিনোদ তুমি যে বিনোদ আমার,
দিব না দিব না তোমায় ছেড়ে"
বলিয়ে ঈষৎ মাথাটি নাড়িয়ে
হাসিয়ে হাসিয়ে মধুর হাসি,
ধরিল যতনে, বিনোদের হাত
পাগল বালিকা হরষে ভাসি।

হরষে তাহার, উথলিত মন
কি করিবে কিছু ভেবে না পেয়ে,
নদী হতে গিরি, গিরি হতে পুন
আকাশের পানে দেখিল চেয়ে।

সহসা আবার কি ভাবে কে জানে
হাতটি তখনি ছাড়িয়ে ধীরে,
হরষে বিষাদে আধো আধো হাসি
ছুটিয়ে চলিল নদীর তীরে।

তীরের যেথায় একটি ধারেতে
বন ফুলে ফুলে পড়েছে ছেয়ে,
তুলিয়ে আনিল কত ফুল রাশি
বালিকা তখনি সেথায় যেয়ে।

নব নব নামে দীক্ষি ফুল গুলি
হরষে গাহিতে গাহিতে গান।
যুবার চরণে দিল উপহার
বিভল বালিকা বিভল প্রাণ।

"ফোটা ফুলগুলি আনিয়াছি তুলি
আঁখি দুটি মেলি, হের গো হের,
এইটি নলিনী, কাঁহাকে বলিনি
চুপি চুপি আমি, এনেছি ধর,
গোলাপটি অই, মোর হৃদি সই
সে যে তোমা বই, হবে না কারো,
হৃদিধনে ভুলে, তুলেছি বকুলে
সেঁউতির ফুলে, পর গো পর"
নয়নের জল, নয়নে শুকাল,
যুবক অশনি আহত হিয়া,
স্তম্ভিত ভাবে, রহিল দাঁড়ায়ে
বহেনা শোনিত হৃদয় দিয়া।

"এই সেই বালা, সেই সে মুরতি
অথচ বালিকা সে নয় যেন!
এত দিন পরে, পেনু যদি নিধি,
কে জানে কপালে ঘটিবে হেন"
তড়িতের মত, কি তীব্র বেদনা,
চমকিয়ে গেল যুবার বুকে,
ভাঙ্গি গেল মোহ, দাঁড়ায়ে রহিল
অভিভূত হয়ে বিষাদ দুখে।

ফুল রাশি লয়ে ছড়াল সে অঙ্গে
বালিকা অবোধ চেতনা হীন,
সুখে দুখে যুবা, তা দেখি কাঁদিল,
হরষে বিষাদে হইয়ে লীন।
কাঁদিল যুবক, কাঁদিল বালিকা,
সামালিয়ে পুনঃ নয়ন ধারা,
বলিয়া উঠিল সহসা যুবক
যাতনায় যেন পাগল পারা।

"কি বলিব আর বলার কি আছে?
শোনগো ললনে শোনগো তুমি,
সাক্ষী রবিশশী সাক্ষী দেবতারা
সাক্ষী এ পবিত্র জনম ভূমি।

আজ হতে তুমি আমার ললনে
আমিও সরলে হইনু তোর,
এখনি যে তোরে করিব বিবাহ
হইবি ধরম বনিতা মোর।

দেখি আজি এতে কেবা দেয় বাধা
আসুক সহস্র প্রলয় ঝড়,
মরমের চির অতৃপ্ত বাসনা
পুরাইব এত দিনের পর।

বলি হাত হতে খুলিয়ে অঙ্গুরী
পরাইয়ে দিল বালার হাতে।
অনিমেষ চোকে, দেখিয়ে দেখিয়ে
হাসিল পাগল বালিকা তাতে।

ক্ষণেকে দুজনে উঠি তরণীতে
তখনি দিল সে তরণী খুলি,
চলিল তরণী, তর তর রঙ্গে
নদীর বুকেতে লহরী তুলি।
যুবারো হৃদয়ে উঠিল লহরী
বিষাদ যাতনা সকল ভুলে,
গাহিল তখন হরষের গান
প্রমোদে হৃদয় পরাণ খুলে।
প্রণয় বিভল ঘুম ঘুম প্রাণে
হরষে যুবক গাহিল গান,
প্রতিধ্বনি দিল দূর হতে গিয়ি,
কাঁপিয়ে উঠিল তটিনী প্রাণ।

মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে, ঢেউ সাথে ঢলি
খেলেনা জোছনা রজত ধার।
মৃদুল পবন, বহেনাকো আর
গাছের একটি পাতা না নড়ে,
বহে কি না বহে, তটিনী কে জানে
ঢেউ তো একটি নাহিক পড়ে।
আঁধার আকাশ, স্তম্ভিত ধরা,
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটি ধার,
কি বিপ্লব কথা, নীরবে কহিছে
থাকে না বুঝি বা জগৎ আর।
এ কাল-নিশায়, নাহি ভুরু ক্ষেপি
ঝপ ঝপ ঐ চলেছে তরী,
প্রকৃতির ঘোর-নিস্তব্ধ-আকার
সে শবদে আরো ভীষণ করি।
সহসা অশনি কড় মড় মড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ, ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি।
বীর পরাক্রমে, এদিকে ও দিকে
মাতিয়ে বহিল পবনরাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।
নাহি যে তটিনী, প্রশান্ত মূরতি
সংহার মূরতি ধরেছে এবে।
সফেন তুফানে, আক্রমিছে বেলা,
ভেঙ্গেচুরে রেগে ফেলিছে সবে।
দুরবল তরী, তুফানে উঠিছে
আবার তুফানে পড়িছে কভু,
বিনোদের সাথে বালা সে তরীতে
কোন ভয় ডর নাহিক তবু।
হাসিলে দামিনী, হাসিছে বালিকা
উথলিলে ঢেউ উথলে হৃদি,
গরজিলে মেঘ হেরেই আকুল
কি ভয় কাছেতে বিনোদ যদি।
বায়ুর হুঙ্কারে উড়িছে তরণী
কোথা মাস্তুল, কোথায় হাল,
অটল গম্ভীর দাঁড়ায়ে বালিকা
উড়িছে পবনে চিকুর জাল।
হৃদয়ে তাহার, নারে প্রবেশিতে
বাহিরের দুঃখ বিষাদ কোন।
তাহারি আদেশে বহে যেন ঝড়
অধিষ্টাত্রী দেবী ঝড়েরি যেন।
"বহিছে ঝটিকা, ভীষণ তুফানে
গেল গেল আর রহেনা তরী,
আমরা দুজনে-দুজনে আমরা-
কি সুখ বালিকা যদি বা মরি"

বলিয়া বিনোদ বালিকার মাথা
রাখিয়া প্রণয়-পূরিত বুকে,
নাহি-ভুরুক্ষেপি, সে প্রলয় ঝড়ে
ভাসিল গাহিতে গাহিতে সুখে।

মল্লার।

"ঘোষে বজ্র কড় মড়, কাঁপে পৃথ্বী থর হর
প্রলয় বিপ্লবে কাঁপে সর্ব্ব চরাচর,
উন্মত্ত পবন ছোটে, তটিনী গরজি ওঠে
তরঙ্গ ছুটিছে যেন সচল ভূধর।
পাগলিনী শোন তবে, তোরে এই বুকে রেখে
বাহিরের ঝড় জ্বালা পশে না অন্তর,
তরী যায় যায় ডুবে, কি ভয় আমরা উভে
সুখের শয়নে রব, নদীর ভিতর।
আয় সখি হৃদে রাখি, তুমি দেখ আমি দেখি
বাহিরে প্রলয় ঝড় হোক্ যা হবার"

জ্যামিতির নূতন সংস্করণ।

সমান্তরাধ্যায়।

[৩] রেখা বা ক্ষেত্র বা অন্য যে কোন জ্যামিতিক বস্তু, এবং তাহার ব্যাপ্তি স্থান দুয়ের মধ্যে শুদ্ধ কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে কথিত জ্যামিতিক বস্তু এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হইতে পারে, কিন্তু তাহার ব্যাপ্তিস্থান স্থানান্তরিত হইতে পারে না, এই প্রভেদটি যদি ধরা না যায় তবে জ্যামিতির চক্ষে উভয়েই অবিকল সমান, এজন্য উভয়ের একটির সম্বন্ধে যাহা কিছু স্বিকৃত হয় অন্যটির সম্বন্ধে তাহাই খাটিতে চায়।

মন্তব্য। কথ রেখার ব্যাপ্তিস্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে সংক্ষেপে কথ স্থান বলিলেই চলিতে পারে। যদি এরূপ বলা আবশ্যক হয় যে, কথ সরল রেখাকে তাহার ব্যাপ্তিস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া গঘ-সরল-রেখাকে সেই স্থানে বসাও, তবে সংক্ষেপে এই মাত্র বলিলেই চলিতে পারে যে, কথ রেখাকে গঘ স্থানে বসাও, কেন না তাহা হইলেই বুঝাইবে যে, গঘ রেখা সে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। পুনশ্চ কোন রেখাকে যদি কোন রেখার গাত্রসাৎ করিয়া বসাইতে বলা হয় তবে তাহাতে ইহাই বুঝায় যে পূর্ব্বোক্ত রেখাকে শেষোক্ত রেখার স্থানে বসাইতে বলা হইতেছে।

(১৮) যে কোন রেখার দুই প্রান্ত দুই বিভিন্ন রেখার গাত্র স্পর্শ করিয়া রহে তাহা শেষোক্ত রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা বলিয়া উক্ত হয়।

(১৯) যদি কোন রেখাদ্বয়কে স্ব স্ব স্থানে অবিচলিত রাখিয়া উভয়কে তাহাদের যোজক রেখার সহিত এরূপ অচ্ছেদ্য ভাবে বদ্ধ করা যায় যে, তিন রেখায় মিলিয়া একটি দৃঢ় বস্তু রূপে পরিণত হয়, তবে উক্ত রেখাদ্বয় উক্ত যোজক রেখার সহিত দৃঢ় বদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়। (১১ সংজ্ঞা অনুসারে) ইহা হইতে আসিতেছে এই যে,

দৃঢ় বদ্ধ রেখাদ্বয়ের যতই চলাচলি হউক না কেন, তাহাদের অন্তর্গত কোন বিন্দুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্বের কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না।

{ ৩ } সরল রেখা-মাত্রই স্বীয় সমসূত্র পথের উপর দিয়া (অর্থাৎ তাহার কোন বিন্দু তাহার সমসূত্র স্থানের বাহিরে না পড়ে এরূপ করিয়া) যতদূর ইচ্ছা ততদূর চালিত হইতে পারে।

(২০) যে কোন অসমসূত্র সরল রেখাদ্বয় এরূপ যে, কোন যোজক রেখার সহিত তাহাদিগকে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া উভয়কে স্ব স্ব সমসূত্র-পথে যুগপৎ চালনা করা যাইতে পারে, তাহারা উভয়ে পরস্পরের সমান্তর বলিয়া উক্ত হয়।

৩। দুই সমান্তর রেখা পরস্পরের গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

ক————————খ মনে কর দুই
গ————————ঘ রেখা কখ এবং গঘ উভয়ে পরস্পরের সমান্তর তাহা হইলে উহারা কেহ কাহারো গাত্র স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারে না।

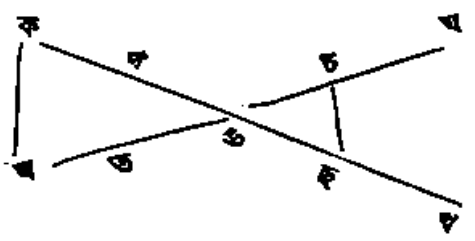

যদি বল যে দুই সমান্তর রেখা কখ, গঘ, ঙ-স্থানে পরস্পরের গাত্রস্পর্শ করিয়াছে তাহা হইতে পারে না, কেননা,—কখ এবং গঘ এই দুই সমান্তর রেখাদ্বয়কে কগ যোজক রেখার সহিত দৃঢ় বদ্ধ কর, তাহা হইলে কখ, গঘ উভয়ে যেহেতু সমান্তর এজন্য (২০ সংজ্ঞা অনুসারে) তাহাদিগকে যুগপৎ স্ব স্ব সমসূত্রে চালনা করা যাইতে পারে, মনে কর যে, কখ এবং গঘ স্ব স্ব সমসূত্র পথে চালিত হওয়াতে গঙ রেখাংশ চছ-স্থানে এবং কঙ রেখাংশ খছ স্থানে উপনীত হইয়াছে, তাহা হইলে ইতি পূর্ব্বে চ এবং ছ বিন্দু যখন ঙ-স্থানে ছিল তখন ও দুইটি বিন্দুর মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান ছিল না এখন তাহাদের মধ্যে চছ সরল রেখা-পরিমাণ ব্যবধান বর্ত্তিল, কিন্তু কখ এবং গঘ উভয়ে যেহেতু কগ-রেখার সহিত দৃঢ়বদ্ধ সুতরাং (১৯ সংজ্ঞানুসারে) কগ, কখ এবং গঘ তিন রেখায় মিলিয়া একটা দৃঢ় বস্তু এজন্য (১১ সংজ্ঞানুসারে) চ এবং ছ বিন্দুর মধ্যে ওরূপ দূরত্ব-বৃদ্ধি অসম্ভব। অতএব সমান্তর রেখাদ্বয় কখ, গঘ, কোন স্থানে পরস্পরের গাত্রস্পর্শ করিতে পারে না। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

৪। অসমসূত্র রেখাদ্বয়ের প্রত্যেকে তৃতীয় কোন রেখার সমান্তর হইলে তাহারা পরস্পর পরস্পরের সমান্তর।

ক————————খ মনে কর অসমসূত্র
গ————————ঘ সরল-রেখা কখ এবং চছ উভয়েই গঘ
চ————————ছ কিংবা জঝ রেখার
জ————————ঝ

সমান্তর তাহা হইলে কখ এবং চছ উভয়ে পরস্পর সমান্তর। কেননা গঘ কিম্বা জঝ রেখার সহিত কখ এবং চছ রেখা উভয়েই যেহেতু সমান্তর এজন্য (২০ সংজ্ঞানুসারে) উভয়ই গঘ কিংবা জঝ রেখার সমসূত্র গতির সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ স্ব স্ব সমসূত্রে চালিত হইতে পারে, সুতরাং (২০ সংজ্ঞানুসারে) উভয়ে পরস্পরের সমান্তর। অতএব মীমাংস্য বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

{ ৪ } সমান কোণদ্বয়ের একটির কোন ভুজ বা ভুজাংশ আর একটির ভুজ স্থানে বসাইয়া পূর্ব্বোক্তের দ্বিতীয় ভুজ বা ভুজাংশকে শেষোক্তের দ্বিতীয় ভুজ স্থানে বসানো যাইতে পারে।

৫। কোন সমান্তর রেখা-দ্বয়ের যোজক-রেখা যদি দ্বিতীয় কোন সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক-রেখার সমান হয় এবং যোজক রেখাদ্বয়ের একটির সন্নিহিত কোন কোণ যদি আর একটির সন্নিহিত কোন কোণের সমান হয় তবে সমান কোণদ্বয়ের সম্মুখ-বর্ত্তী কোণদ্বয় সমান হইবে।

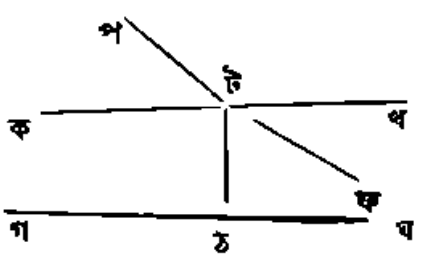

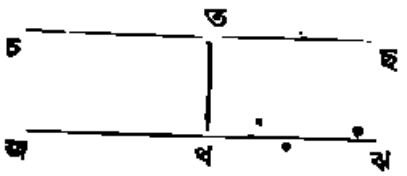

মনে কর টঠ সরলরেখা, কখ,গঘ সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক-রেখা এবং তথ সরল-রেখা চছ জঝ সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা, এবং টঠ রেখা এবং তাহার সন্নিহিত কোন একটি কোণ টঠঘ ক্রমান্বয়ে = তথ রেখা এবং তাহার সন্নিহিত কোন একটি কোণ তথঝ, তাহা হইলে তথঝ কোণের সম্মুখবর্ত্তী থতছ-কোণ = টঠঘ-কোণের সম্মুখবর্ত্তী ঠটথ কোণ।

যেহেতু সরলরেখা তথ = সরল রেখা টঠ এজন্য (১ স্বতঃসাধ্য ক্রিয়া-বিধি অনুসারে) একের প্রান্তদ্বয় ত এবং থ বিন্দুকে অন্যের প্রান্তদ্বয় ট এবং ঠ বিন্দু-স্থানে যুগপৎ বসানো যাইতে পারে অতএব ত এবং থ বিন্দুকে ট এবং ঠ বিন্দু স্থানে বসাও তাহা হইলে যেহেতু টঠ = তথ এজন্য (১ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) তথ সরল-রেখা টঠ সরল রেখা-স্থানে বসিবে, এবং যেহেতু তথঝ কোণ = টঠঘ কোণ, এজন্য (৪ স্বতঃসাধ্য ক্রিয়া বিধি অনুসারে) তথ রেখাকে টঠ স্থানে বসাইয়া থঝ রেখাকে ঠঘ স্থানে বসানো যাইতে পারে, অতএব ঐরূপ করিয়া বসাও, তাহা হইলে চছ-রেখা কখ স্থানে বসিবে, কেননা তাহা অন্য কোন্ স্থানে (যেমন পফ স্থানে) বসিতে পারে না; যদি মনে কর যে, তাহা পফ

স্থানে বসিয়াছে তবে অঝ এবং চছ সমান্তর রেখাদ্বয় যেহেতু গঘ এবং পফ স্থানে বসিয়াছে এজন্য (৩ স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) পফ স্থান গঘ-স্থানের সমান্তর, এবং কথ-রেখা যেহেতু গঘ-রেখার সমান্তর সুতরাং (৩স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) তাহা গঘ-স্থানের সমান্তর, অতএব কথ-রেখা এবং পফ স্থান এই দুই অসমসূত্র রেখাদ্বয়ের উভয়েই গঘ স্থানের সমান্তর সুতরাং (৪ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তাহারা পরস্পর সমান্তর, সুতরাং (৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) অসমসূত্র অবস্থায় তাহারা কেহ কাহারো গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না, অতএব চছ-রেখা কথ রেখার সমসূত্র স্থানে বসিবে, তাহা হইলে অবশ্য থতছ-কোণ ঠটথ-কোণ-স্থানে বসিবে সুতরাং থতছ কোণ = ঠটথ কোণ। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইবে।

৬। সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক রেখার দুই প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান, এবং উক্ত যোজক রেখাকে বর্দ্ধিত করিলে তাহার এক প্রান্তস্থিত বহিঃকোণ অপর প্রান্তস্থিত সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণের সমান হয়, ও তাহার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ দ্বয় একটি সমসূত্র কোণের সমান।

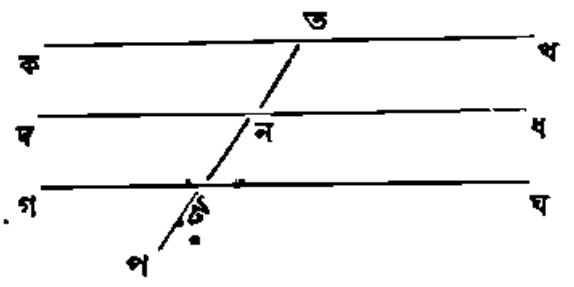

মনে কর দুই সরলরেখা কথ, গঘ উভয়ে পরস্পরের সমান্তর এবং তট তাহাদের একটি যোজক রেখা তাহা হইলে তট-রেখার ত-প্রান্তস্থিত কোণ থতট = তাহার ট-প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণ তটগ, এবং তট-রেখাকে প পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিলে তাহার ট-প্রান্তস্থিত বহিঃকোণ পটঘ = ত-প্রান্তস্থিত সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ পতথ এবং তাহার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ-দ্বয় তটঘ + টতথ = সমসূত্র কোণ। কেননা,—

মনে কর ন-বিন্দুটি তট-রেখার মধ্যস্থলবর্ত্তী সুতরাং নত = নট, আর সরল রেখা দনধ কথ-রেখার সহিত সমান্তর, সুতরাং (৪ সিদ্ধান্ত অনুসারে) উহা গঘ-রেখারও সহিত সমান্তর; তাহা হইলে যেহেতু (২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তনধ কোণ = দনট কোণ, এবং যেহেতু যোজক-রেখা নত = যোজক রেখা নট এজন্য (৫ সিদ্ধান্ত অনুসারে) তনধ-কোণের সম্মুখবর্ত্তী নতথ কোণ = দনট-কোণের সম্মুখবর্ত্তী নটগ কোণ; অতএব প্রমাণ হইল যে, তট রেখার পার্শ্বান্তরবর্ত্তী ত এবং ট প্রান্তস্থিত কোণদ্বয় সমান। পুনশ্চ (২ সিদ্ধান্ত অনুসারে) যেহেতু নটগ কোণ = পটঘ কোণ এবং এই মাত্র প্রমাণ করা হইল যে, নটগ কোণ = নতথ-কোণ, এজন্য নতথ কোণ = পটঘ কোণ; অতএব প্রমাণ হইল যে, ট প্রান্তস্থিত বহিঃকোণ = ত প্রান্তস্থিত তট রেখার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণ। পুনশ্চ যেহেতু পটঘ-কোণ + নটঘ কোণ = সমসূত্র কোণ ও পটঘ কোণ = নতথ কোণ এজন্য নতথ-কোণ + নটঘ কোণ = সমসূত্র কোণ। অত-

এর প্রমাণ হইল যে ৩ট রেখার সমপার্শ্ববর্ত্তী অন্তঃকোণদ্বয় সমান। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

৭। কোন একটি সমতল-স্থিত * রেখাদ্বয়ের কোন যোজক রেখার দুই প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণদ্বয় সমান হইলে উক্ত রেখাদ্বয় সমান্তর হইবে।

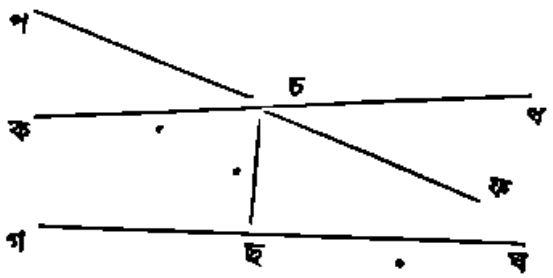

মনে কর একই সমতলস্থিত কখ এবং গঘ রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা চছ-র চ-প্রান্তস্থিত কোণ কচছ=ছ-প্রান্তস্থিত পার্শ্বান্তরবর্ত্তী কোণ চছঘ, তাহা হইলে রেখাদ্বয় কখ এবং গঘ সমান্তর হইবে। যদি বল যে চ-বিন্দুস্পর্শী কখ রেখা গঘ রেখার সমান্তর নহে তাহা হইতে পারে না, কেন না মনে কর যে ঐ একই সমতলস্থিত চ-বিন্দুস্পর্শী আর কোন রেখা—যেমন পফ রেখা— গঘ-রেখার সমান্তর তাহা হইলে (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) পচছ-কোণ=চছঘ-কোণ, কিন্তু এখানে ধরা হইয়াছে যে কচছ-কোণ=চছঘ কোণ সুতরাং পচছ কোণ=কচছ-কোণ কিনা বড় কোণ=ছোট কোণ, যাহা কোনমতেই সম্ভবে না, অতএব কখ-রেখা গঘ-রেখার সমান্তর-স্থান ভিন্ন আর কোন স্থানে বসিতে পারে না সুতরাং (৩স্বতঃসিদ্ধ বচন অনুসারে) উক্ত রেখাদ্বয় পরস্পরের সমান্তর। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

৮। যদি তিন-টি সরল রেখার প্রথমটি দ্বিতীয়টির সমান্তর হয় এবং যদি দ্বিতীয়টির কোন প্রান্ত হইতে উহার সমসূত্রে তৃতীয় একটি রেখা টানা যায় তবে সেই তৃতীয় রেখা প্রথম-রেখাটির সমান্তর হইবে

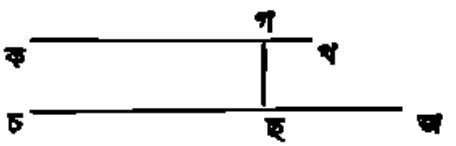

মনে কর চ ছ-রেখা ক খ-রেখার সমান্তর আর চছ-রেখার ছ প্রান্ত হইতে চছ-রেখার সমসূত্রে তৃতীয় একটি রেখা ছজ টানা হইয়াছে তাহা হইলে ছজ রেখা কখ রেখার সমান্তর ; কেন না,—

কখ রেখার মধ্যস্থিত কোন একটি বিন্দু গ হইতে ছ বিন্দু পর্য্যন্ত গছ-সরল রেখা টানো তাহা হইলে ছজ-রেখাকে যেহেতু চছ রেখার সমসূত্রে টানা হইয়াছে এজন্য চছগ-কোণ+গছজ-কোণ=সমসূত্র কোণ এবং কগখ-কোণ (যাহার ভূজদ্বয় গক এবং গখ রেখা কখ-রেখার অন্তর্গত সুতরাং)=সমসূত্র কোণ=কগছ-কোণ+খগছ কোণ ; আবার গছ যেহেতু সমান্তর রেখাদ্বয়ের যোজক রেখা এজন্য (৬ সিদ্ধান্ত অনুসারে) চছগ=খগছ কোণ ; অতএব সর্ব্বশুদ্ধ দাঁড়াইতেছে যে

* এখানকার সমান্তর রেখার সংজ্ঞা সমতল নির্ব্বিশেষে খাটে। ইউক্লিডের উক্ত সংজ্ঞা বিশেষ কোন একটি সমতলেই সংলগ্ন হয়।

কগছ+খগছ=চছগ+গছজ

ও

খগছ=চছগ

অতএব কগছ=গছজ

সুতরাং (৭ সিদ্ধান্ত অনুসারে) ছয় রেখা কখ রেখার সমান্তর। অতএব মীমাংসা বিষয় প্রমাণীকৃত হইল।

উপসিদ্ধান্ত। ইহা হইতে আসিতেছে এই যে সমান্তর রেখাদ্বয়কে যথেচ্ছা বর্দ্ধিত করিলে তাহাদের বৃদ্ধি-রেখাদ্বয়ও পরস্পর সমান্তর হইবে, সুতরাং (৩ সিদ্ধান্ত অনুসারে) সমান্তর রেখাদ্বয়কে সহস্র-বর্দ্ধিত করিলেও কেহ কাহারো গাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

ইতি সমান্তরাধ্যায়
সমাপ্ত।

হৃদয়-মন্থন।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।)

আ। আচ্ছা, প্রণয়ের কথা এখন উহা রাখিয়া স্নেহ ও প্রেমের কথাই এখন আলোচনা করা যাউক। আমি ত বহু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সম্পর্ক-বিশেষে ভাল বাসা, স্নেহ ও প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। নচেৎ উক্ত আদর্শের প্রকৃত প্রেমের সঙ্গে স্নেহের এমন কি বিশেষ জাতিগত, প্রকৃতিগত, আত্মাগত প্রভেদ আছে যাহাতে একটি প্রকৃত পক্ষে আর একটির স্থানীয় হইতে পারে না?

ধী। আপনি যে উচ্চ আদর্শের প্রকৃত প্রেমের কথা কহিতেছেন, আমিও সেই প্রেমের কথা কহিতেছি। আমার মনে হয় যে প্রেমের ওরূপ বিশেষণ দেওয়াতেই প্রেমের অবমাননা করা হয়! প্রেম প্রেমই—উহা আপনাপনিই আত্ম-মহিমা-প্রভাবেই উক্ত আদর্শের! আপনি যে ভয়ে প্রেমের পূর্ব্বে অতগুলি বিশেষণ প্রয়োগ করিতে ব্যাকুল হইয়াছেন, আমি সে ভয় রাখি না। কারণ আমি জানি যে পর্ব্বত বলিতে কেহ বল্মীক বুঝিবে না, এবং সমুদ্র বলিতে কেহ তড়াগ বুঝিবে না। আপনি যে পরিশ্রমে প্রেমের বিশেষণ গুলি অভিধান হইতে আহরণ করিতেছেন, আপনার সে পরিশ্রম অনর্থক; কারণ প্রেম বলিতে যদি আশাশূন্য হৃদয়-উৎসর্গ ও —স্বার্থশূন্য আত্মবিসর্জ্জনের এদিক ওদিক অন্য কিছু বুঝায়, ত সে প্রেম প্রেমই নহে, হয় তাহা জঘন্য ইন্দ্রিয়-লালসার নামান্তর মাত্র, নয় তাহা আত্মভাব গোপনের আড়ম্বর মাত্র।

আ। আমি তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তবে আমি কেবল চলিত ভাষার দুর্নিবার দুষ্প্রবৃত্তির উপর লক্ষ্য

রাখিয়া প্রেম-শব্দের অবমাননা করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম। কিন্তু একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করি যে, প্রেম-শব্দে ইন্দ্রিয়-লালসা কি কিছুই বুঝায় না? আমার বোধ হয় কতকটা বুঝায়। গ্রীক্‌দের প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটো বলিয়াছেন বটে যে, যে প্রেমে শরীরের নাম গন্ধও আছে, তাহা প্রেমই নয়,—কিন্তু প্লেটোই কি প্রকৃতির প্রকৃত কথা বলিয়াছেন?

ধী। আমি যতদূর দেখিয়াছি, শুনিয়াছি, ও বুঝিয়াছি, তাহাতে তোমার কথাও আমি মানি না, প্লেটোর কথাও আমি মানি না। প্লেটোর কথা স্বর্গের কাল্পনিকদের কথা, আর তোমার কথা পৃথিবীর ইতরদের কথা। যত দিন আত্মা শরীরগত, তত দিন প্রেমে শরীরের নাম-গন্ধ থাকিবেই থাকিবে—কিন্তু শরীরগত হইলেও আত্মা কখনই ইন্দ্রিয়-চালিত হইবে না। জবা পুষ্পের ভিতরে হীরকখণ্ড রাখিলেও তাহাতে লোহিত বর্ণের আভাস প্রতিফলিত হইবে, কিন্তু সেই জন্য এ কথা বলিতে পারা যায় না যে হীরকখণ্ড রক্তবর্ণ; অথবা যত দিন পর্য্যন্ত সে হীরকখণ্ড সেই জবাপুষ্পের ভিতরে আছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহাও বলা যায় না যে ঐ হীরকখণ্ড সম্পূর্ণ বিশদ বর্ণ। যতদিন শরীর আছে, ততদিন শরীরের সঙ্গে একেবারে নিঃসম্পর্ক হইয়া মনের কোন বৃত্তিরই চালনা হইতে পারে না। স্বয়ং রাম কেন সীতাহরণের পর অতদূর অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন? তিনি স্বয়ং দেবাবতার হইয়া কেন মর্ত্ত্যের মানুষের মত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন? ইহা কেবল এই শরীরের মাটির গুণ, পৃথিবীর হাওয়ার প্রভাব, আত্মার পার্থিব অবনতি! নহিলে প্রেম অবশ্যই স্বর্গের নন্দন-কাননের পারিজাত কুসুম, বৃত্তি সমূহের শিখরস্থ মণিখণ্ড, মানব প্রকৃতির নির্ম্মল কারী স্ফটিক, এবং পরকালের অনন্ত সুখের অঙ্গীকার স্বরূপ!

আ। তোমার মতে কি তাহা হইলে কৃষ্ণের প্রেম প্রেমই নহে?—যে প্রেমের মহিমা কীর্ত্তনে শ্রীমৎভাগবত, ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, গীত-গোবিন্দ পর্য্যন্ত কল্পনা-কাননের সুন্দরতম কুসুমে সুরঞ্জিত হইয়াছে, তুমি কি সে প্রেমকে প্রেম নামেই অভিহিত করিবে না?

ধী। না,—কৃষ্ণের প্রেম প্রেমই নহে,—যে প্রেমে ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা এত প্রবল, লীলাই যে প্রেমের জীবন এবং স্বার্থ-সাধনই যে প্রেমের আত্মা, সে প্রেম প্রেমই নহে। ইহা শ্রীমৎভাগবতকার ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণকার আপনারাই বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তাঁহারা কৃষ্ণের মর্ত্ত্যলীলা-সমূহকে প্রকৃতি-পুরুষ অথবা শ্রেয় ও প্রেয়জ্ঞান-রূপ অলঙ্কারের আড়ম্বরে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মতে দেবদেব মহাদেবের প্রেমই প্রেমের আদর্শস্থল, অথবা, তাহাই প্রেম। বল দেখি, পার্ব্বতীর দেহত্যাগের পর যখন সেই মহান যোগীন্দ্র সর্ব্বত্যাগী হইয়া হিমালয়ের নিভৃত স্থানে যোগ ধ্যানে আত্ম উৎসর্গ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রবৃত্তি, সমস্ত বাসনার

নির্ব্বাপন সাধন করিতে লাগিলেন, তখন কে না তাঁহাকে দেখিয়া বলিবে যে এইই প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি, এই প্রেমের অবয়ব।

আমি। কিন্তু মহাদেবেও কি ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ ছিল না। তাহা যদি না থাকিবে, তবে মদন-ভস্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে উমার স্পর্শে কেন তিনি বিচলিত হইলেন, কেন চন্দ্রোদয়ে প্রশান্ত সাগরের মত তাঁহার হৃদয়ও উথলিত হইয়া উঠিল এবং কেনই বা তিনি মুহুর্মুহু গিরিবালার ওষ্ঠাধরের প্রতি লালায়িত নয়নে চাহিতে লাগিলেন ?

ধী। আমি ঐ সকল কারণেই বলিয়াছিলাম যে মহাদেবের প্রেমই প্রেম। উহাতে কৃষ্ণের হীন প্রবৃত্তি-সমূহের অসংযত উদ্দাম লীলা-তরঙ্গ নাই, অথচ উহাতে গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর স্বপ্নময় কল্পনার অলীক শব্দাড়ম্বরের আভাসও নাই। কৃষ্ণের প্রেম মর্ত্ত্যলোকের মাটী, কিন্তু প্লেটোর প্রেম আকাশের কুসুম। কৃষ্ণের প্রেম পৃথিবীর পঙ্কিল বীভৎস, আর প্লেটোর প্রেম স্বর্গীয় স্বপ্নের উপচ্ছায়া। মহাদেবের প্রেমই প্রেম, কারণ সে প্রেমে ইন্দ্রিয়সম্পর্কও আছে, অথচ সে প্রেমে মদনভস্ম হইয়া যাইবারই কথা। যে প্রেমে মহাদেব গিরিবালিকার ওষ্ঠাধরের প্রতি তৃষিত নয়নে চাহিতে চাহিতেই নিজের তেজেই আবার কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, সে প্রেমে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই সম্মিলিত, সে প্রেমে শরীর ও আত্মা উভয়ই প্রভাবিত,সে প্রেমে কৃষ্ণের কেবল শরীর নাই এবং প্লেটোর কেবল আত্মা নাই। ইহাই মর্ত্ত্যলোকের অবিকৃত প্রেম।

আ। কিন্তু প্লেটোর প্রেম কি প্রেমের চরম উৎকর্ষ নয় ?

ধী। চরম উৎকর্ষ হইতে পারে, কিন্তু তাহা পৃথিবীর প্রেম নহে। শরীর না থাকিলে ওরূপ প্রেম সম্ভাবিত, শরীর থাকিতে ও প্রেম অসম্ভব। প্লেটো প্রেমের কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহা বরং পৃথিবীর পক্ষে অমঙ্গলকর, কারণ একজন ইংরাজি কবির সঙ্গে আমিও বলি যে "প্লে'টা, প্লেটো! তোমার কথাতে যত যুবক যুবতী পৃথিবীর বিকৃত প্রেমের পঙ্কে শেষে ডুবিয়া পড়িয়াছে এমন আর কাহারও কথাতে নহে। তুমিই তাহাদিগকে প্রথমে বিমল পথের প্রলোভন দেখাইয়া সমল পথে আনিয়াছ, এবং তাহাদিগকে ভ্রমের অন্ধকারে আত্ম-হারা করিয়া শেষে বিপদের শেষ সীমায় আনিয়া পরিত্যাগ ক'রয়াছ।" কিন্তু প্রেম ইন্দ্রিয়গতই হউক, বা কল্পনাগতই হউক, প্রকৃত প্রেমের বিশেষ একটি লক্ষণ এই যে ইহার আশা-ভরসা পরকাল পর্য্যন্ত প্রসারিত।

আ। কিন্তু স্নেহেও কি তাহাই নহে ? পুত্রবৎসল পিতাও কি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে এরূপ আশা করেন না যে পরকালে আবার সেই পুত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরম সুখে অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিবেন ?

ধী। আমি তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে মানি, কিন্তু একটি বিষয় এখানে অনুভব করা উচিত। পুত্রবৎসল পিতা পুত্রের অকাল মৃত্যু নিবন্ধন এইমাত্র আশা করেন যে পরকালে তাঁহার ইহকালের দুঃখের অবসান হইবে, কিন্তু প্রেমিকের আশা ঠিক সেরূপ নহে—প্রেমিক এরূপ আশা করেন না যে ইহ কালের সুখের অভাব পরকালে মোচন হইবে, প্রেমিক এইরূপই আশা করেন যে ইহকালের সুখ সুখের নমুনামাত্র, পরকালে উহার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইবে, অনন্ত কাল পর্য্যন্ত এই সুখের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং অনন্ত কালের কাল্পনিক অন্তে "আমি তুমি" আর "তুমি আমি" এমন মিশাইয়া যাইবে যে অভেদ-আত্মা শব্দের প্রকৃত অর্থ গোচর হইবে। স্নেহের আকাঙ্ক্ষা পরকালে অভাব পূরণ, প্রেমের আকাঙ্ক্ষা পরকালে উৎকর্ষ সাধন।

আ। হাঁ, পরকাল-সম্বন্ধে প্রেম ও স্নেহে তোমার উক্ত ভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু ইহকাল-সম্বন্ধে ঐ দুয়ের আত্মগত প্রভেদ কি আছে? দেখ, প্রেমের সামগ্রী ও স্নেহের সামগ্রী উভয়েই যত্নের সামগ্রী, প্রেমে ও স্নেহে উভয়েই মানুষ অন্ধ হইয়া পড়ে, প্রেমে ও স্নেহে মানুষ আদরের সামগ্রীর সহবাস প্রার্থনা করে, এবং সহবাসে আপনাকে পরম সুখী জ্ঞান করে, ও প্রেমে ও স্নেহে উভয়েই মানুষ আপন-হারা হইয়া পড়ে। কবিশ্রেষ্ঠ সেক্‌সপিয়ার বলিয়াছেন, যে উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি, কবি, আর প্রেমিক,—এই তিনই এক উপাদানে গঠিত, কারণ তিন জনই বিকৃত কল্পনাময়, কিন্তু তিনি কেন যে স্নেহময় মানুষকে তাহার অন্তর্গত করিলেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। আমি জানি এক সময়ে লক্ষ্মী তাঁহার বাহন পেচাকে বলিয়াছিলেন যে "পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহাকে সুন্দর দেখিবে, তাহার গলাতেই আমার এই অমূল্য মুক্তাহার পরাইয়া আসিবে।" পেচক সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া নিজ কোটরে আপন শাবককে দেখিয়া তাহার গলাতেই সেই দুর্লভ মুক্তাহার পরাইয়া দিল। সুতরাং প্রেমের অপেক্ষা স্নেহের মাতোয়ারা শক্তি যে কোন অংশে কম তাহা ত আমার বোধ হয় না।

ধী। আমি জানি যে অনেক স্থলে অনেক পুত্রবৎসল পিতা উপযুক্ত পুত্রের অকাল মৃত্যুতে সংসারে বিরাগী হইয়া সন্ন্যাসীবেশে শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং অনেক স্নেহময়ী মাতাও উহাতে প্রাণত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু তুমি যদি সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত শ্মশান ও মশান-ভূমি ভ্রমণ করিয়া দেখ, তুমি যদি অতলস্পর্শ সমুদ্রের তলপর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখ, তুমি যদি মহারণ্যের নিভৃত নিলয় পর্য্যন্ত অন্বেষণ করিয়া দেখ, ত দেখিতে পাইবে যে স্নেহের অপেক্ষাও প্রেমের অনুরোধে, প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় বা অত্যাচারে অধিকতর লোক আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা

করিতে যেমন দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে অসংখ্য লোক স্বীয় শোণিত-লহরী দ্বারা নিজ ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা রঞ্জিত করিয়া পরকালের অনন্ত আশা-সাগরে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে—প্রেমেও সেইরূপ অসংখ্য লোক হৃদয়ের রুধির দিয়া প্রেমের জ্বলন্ত নিশান সংরঞ্জিত করিয়া তাহা শূন্যে শূন্যে সংসার-সমক্ষে উড্ডীয়মান করিয়া অথবা মর্ম্মের নিভৃত বিজনে লুকাইয়া রাখিয়া, ভবিতব্যতার করাল তরঙ্গে আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছে। একজন পুত্রবৎসলা জননী পাঁচটী পুত্রের মধ্যে একটি পুত্রের অকাল মৃত্যুতে বাকী চারটী পুত্রের আশায় জীবন ধারণ করিতে পারে, একজন পুত্রবৎসল পিতা সকল পুত্রের নিধনেও একটী ভাবী পুত্রের স্বপ্নেও আপাততঃ দুঃখের সান্ত্বনা বিধান করিতে পারেন, কিন্তু এক জন প্রেমিকের আর সে রূপ জীবন ধারণের উপায় নাই, সে রূপ সান্ত্বনার আশা নাই। পুত্রের শোক পৌত্রে নিবারণ হইতে পারে, ভ্রাতার শোক ভগিনীতে শমিত হইতে পারে, কিন্তু প্রণয়িনীর শোক প্রণয়ী ব্যতীত আর কিছুতেই মিটিতে পারে না। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি হ্রদ, বা তড়াগ বা নদী বা সমুদ্রের জলে পিপাসা শান্তি করিতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণাতুর চাতক পক্ষী সেই আষাঢ়ের মেঘের জল ব্যতীত আর কিছুতেই, পরিতৃপ্ত হইতে পারে না।

আ। আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি স্নেহে ও প্রেমে সকল বিষয়েই মিল, আদরে, যত্নে এমন কি আত্ম-বিসর্জ্জনে পর্য্যন্ত সমস্ত মিল, তবে এক ইন্দ্রিয়-লালসা ব্যতীত এমন আর কি উপাদান আছে যাহাতে প্রেম কখনই স্নেহের স্থানীয় হইতে পারে না?

ধী। আমি এক কথায় তোমার সকল কথা বুঝাইতে পারি না। কিন্তু তুমি কেবল স্নেহের ও প্রেমের চুম্বন পরীক্ষা করিয়া দেখ। স্নেহের ও প্রেমের সামগ্রীকে চুম্বন করিতে আপনাপনি স্বতই ব্যাকুলতা জন্মে, কিন্তু সেই দুই চুম্বনের তারতম্য উপলব্ধি করিয়া দেখ। তুমি দেখিবে যে যেমন স্নেহের চুম্বনে বসন্ত কালের শিশিরের মত হৃদয় আপনাপনি প্রশান্ত ও পরিতৃপ্ত হইয়া আইসে, প্রেমের চুম্বনে দাবানলের মত হৃদয় তেমনি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, স্নেহের চুম্বন যেমন বর্ষার জলধারা, প্রেমের চুম্বন তেমনি বর্ষার বিদ্যুতাগ্নি, উভয়েই শরীর লোমাঞ্চিত হয় সত্য বটে, কিন্তু একটি তৃপ্তির প্রভাবে, অপরটি অতৃপ্তির প্রভাবে, একটি পূর্ণিমা-জ্যোৎস্নার প্রভাবে, অপরটি পর্ব্বতে অগ্ন্যুৎপাতের প্রভাবে, একটির চুম্বনে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে, অপরটির প্রভাবে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হয়।——কিন্তু কেন?—কারণ, স্নেহ স্নেহেতেই পরিসমাপ্ত, প্রেমে সকলই অপরিসমাপ্ত, স্নেহেতে পরিতৃপ্তি আছে, প্রেমেতে সকলই স্বপ্নময়, কল্পনাময়, আশাময়, অনির্দ্দিষ্ট সুখের বাসনাময়!

আ। কিন্তু সেই অনির্দ্দিষ্ট সুখটি কি? তাহা কি ইন্দ্রিয়গত নহে—মুক্তকণ্ঠে বলিতে গেলে শকুন্তলা কাদম্বরীর প্রেম কি বিদ্যাসুন্দরের "প্রেম" নহে?

ধী। না,—কখনই তাহা নহে? তুমি বলিতে পার যে এই পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া তুমি কি সুখের অনুবর্ত্তী হইয়াছ? তুমি কি কথায় বুঝাইতে পার যে তোমার চরম উদ্দেশ্য কি? তুমি বলিবে তোমার ইষ্ট দেবতার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্যই এত দূর কঠোর ত্যাগ-স্বীকার করিতেছ, কিন্তু তোমার কথায় তোমার উদ্দেশ্যের, তোমার সঙ্কল্পের প্রকৃত অর্থ আমাকে জলের মত কখনই বুঝাইতে পার না, কারণ তোমার উদ্দেশ্য অর্দ্ধস্ফুট কল্পনার—অথবা কবিতাময় স্বপ্নের নীহার-পরিপ্লুত।—প্রেমের উদ্দেশ্যও সেইরূপ, যাহাকে আমি ভালবাসি, তাহারি অনুবর্ত্তী হইতেছি, তাহার নিকটে অগ্রসর হইতেছি, তাহাতেই সম্মিলিত হইতে চাহিতেছি—ইহাই প্রেমের প্রকৃতি, প্রেমের জীবন, প্রেমের আশা, প্রেমের তৃপ্তি এবং প্রেমের অতৃপ্তি।

আ। প্রেমের উদ্দেশ্য যদি অনির্দ্দিষ্ট রহিল তবে স্নেহের উদ্দেশ্যও কি অনির্দ্দিষ্ট নহে?

ধী। না,—স্নেহের উদ্দেশ্য অনির্দ্দিষ্ট কখনই নহে। পিতা পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া ভাবেন যে "ইহা হইতেই আমার বংশ সপ্রাণ থাকিবে," মাতা প্রিয় পুত্রের মুখাবলোকন করিয়া বলেন যে "আসন্ন সময়ে এই পুত্রই আমার অন্ধের লাঠি, বিপন্নের আশ্রয়, এবং রুগ্নাবস্থায় অবলম্বন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে," কিন্তু প্রেমের আশা প্রেমেতেই সমাপ্ত।

আ। কিন্তু তুমি কি বল যে স্ত্রীপুরুষের প্রেমে পার্থিব আশার সম্পর্ক নাই? তুমি কি বল যে স্ত্রী আশা করেন না যে স্বামীর দ্বারাই তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধি হইবে, এবং স্বামীও কি আশা করেন না যে সেই স্ত্রীর দ্বারাই তিনি সংসারী ও গৃহস্থ হইয়া আমরণ সুখী হইবেন?

ধী। মুক্তকণ্ঠে ও বিষয়ে কথা কহিতে গেলে আমাকে বলিতেই হইবে যে স্ত্রীপুরুষের প্রেম সকল সময়ে ও সকল স্থলে প্রেমই নহে। স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক বলিলেই যে প্রেমের সম্পর্ক বুঝায়, তাহা আমি স্বীকার করি না। সন্মানের আশায়, ধনের আশায়, রূপ-লালসায়, এবং আমাদের দেশে পিণ্ড দানের অভিলাষে অনেকে বিবাহ করিয়া থাকেন, কিন্তু সে সকল বিবাহ ত বৈষয়িক বন্দোবস্ত মাত্র। জমীদারে প্রজাতে যে সম্পর্ক, ব্যবসাদারে ব্যাবসাদারে যে সম্পর্ক, সে বিবাহে সেই সম্পর্ক মাত্র। পিণ্ডার্থী প্রথম বিবাহে সন্তান সন্ততি না পাইলে দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন না, এবং সন্মানার্থী প্রথম বিবাহে আশানুরূপ সন্মান না পাইলে স্ত্রীকে পর্য্যন্ত নির্য্যাতন করিতে ত্রুটি করেন না। তুমি কি এই সকল বিবাহের কথা বলিতেছ?

আ। না,—আমি সে সকল বিবাহের কথা কল্পনাতেও আনি নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ বিবাহের কথাই বলিতেছি। এ বিবাহে যে প্রেমের সম্পর্ক ওতপ্রোত ভাবে সর্ব্ব দিকে প্রসা-

ধিত, তাহা ত তুমি আর অস্বীকার করিতে পার না ?

ধী। হাঁ, তাহাও আমি অস্বীকার করি। সরল ভাবে সকল কথা বলিতে গেলে অনেক স্বামীকে তাহাদিগের স্ত্রীর নিকটে প্রবঞ্চক সাব্যস্ত করা হয়, এবং কাল্পনিক ন্যায় শাস্ত্রের ন্যায়তন্ত্র প্রমাণ করা হয় বটে, কিন্তু এই বিজন হিমাচল প্রদেশে অত ঢাকাঢাকির বিশেষ আবশ্যকতা কোথায় ? আমি জানি যে একজন গৃহস্থ কর্ত্তব্য-জ্ঞানশীল সুচরিত্র মমতাময় স্বামীকে অনেক স্ত্রী প্রেমময় স্বামী ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, কিন্তু স্বামী গৃহস্থ হইলেও, কর্ত্তব্যজ্ঞানশীল হইলেও, সুচরিত্র হইলেও, মমতাময় হইলেও, প্রেমময় না হইতে পারেন। সংসারে এই প্রহেলিকাময় দৃশ্য তুমি সর্ব্বক্ষণ দেখিতে পাইবে। মমতাময় এবং আদর্শস্থ স্বামীরা স্ত্রীর মন রাখিয়া ভাবেন যে তাঁহাদের মত প্রেমময় স্বামী আর নাই, এবং স্ত্রীরাও ভাবেন যে তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে কায়মনোবাক্যে কত শিবপূজা করিয়াই ঐরূপ স্বামীর স্ত্রী হইতে পারিয়াছেন !

ক্রমশঃ।

ভট্টি।

আমরা এই প্রস্তাবে ভট্টিকাব্য প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কবি ভট্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। মহাত্মা ভট্টি, কাব্য জগতের শীর্ষস্থানীয় স্রষ্টা না হইলেও তাঁহার গ্রন্থ ভারতীয় সাহিত্য-সংসারের একটী অপার্থিব মহারত্ন। ভট্টিকাব্য পাঠে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় জটিল সংস্কৃত অতি বিশদ রূপে শিক্ষা লাভ করা যায়। এই গ্রন্থখানি ভালরূপ অভ্যাস থাকিলে মহোদধি-পরিবেষ্টিত সুদৃঢ় বৈয়াকরনিক দুর্গ উল্লঙ্ঘন করা বড় কষ্টকর ব্যাপার নহে। পরন্তু ভট্টিকাব্য ভারতীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চ মহাকাব্যের অন্যতম মহাকাব্য * বলিয়া পরিগণিত। ইহাতে মাঝে মাঝে রচনার বিচিত্রতা, ভাবের উৎকর্ষতা এবং কাব্যের অমৃতময়ী মধুরতা পরিলক্ষিত হয়। গুণগ্রাহী ভট্টি-পাঠকগণ অবশ্য জানেন যে, ভট্টি-কাব্যের ঐ উৎকৃষ্ট উপাদান গুলি কোন দেশীয় প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্য হইতে নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। তবে, এবম্প্রকার উৎকৃষ্টতম অংশ ভট্টিতে অতি বিরল। কিন্তু তথাচ আমরা ভট্টিকাব্য প্রণেতাকে ভূয়সী প্রশংসা করি ; কেননা যে উদ্দেশ্য সংসাধন জন্য এতদ্ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে তাহাতে, তন্মধ্যে কাব্যের স্বর্গীয় মাধুর্য্যের স্থান পাওয়া

* মহাকাব্যানি "রঘু, মাঘ, ভারবি, কুমার সম্ভব, ভট্টিরূপানি" [কোষ রত্নান্তর্গত অক্ষাভিধান টীকা, ৫ পৃষ্ঠা]

কখনি সম্ভবপর নহে। ঈদৃশ মহান প্রতিবন্ধক থাকিতেও যখন পণ্ডিত-প্রধান ভট্টি তদীয় গ্রন্থে অনেক পরিমাণে কাব্যের অমৃত-ধারা বিকীর্ণ করিয়াছেন তখন আমরা তাঁহাকে এক জন অসাধারণ দৈবশক্তিসম্পন্ন লেখক বলিয়া শতমুখে তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিব। যদি মহাত্মা ভট্টি ব্যাকরণের কাব্য-বিরোধী নিগড়ে নিরুদ্ধ না থাকিয়া একাগ্র চিত্তে কবিতা দেবীর উপাসনা করিতেন তবে তাঁহার কাব্য সর্ব্বথা প্রথম শ্রেণীর মহাকাব্যের উপযোগী হইত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক; বৈয়াকরণ-কেশরি ভট্টি ও যে একজন ভারতীয় আর্য্যকুলের গৌরবস্থানীয়, বোধ হয় তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিবেন না; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করা ও তদীয় জীবনী অবগত হওয়া হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারে কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি আর্য্যকুলতিলকদের সম্বন্ধে দুই একটী প্রস্তাব লিখা আছে কিন্তু ভট্টি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন মহোদয়ই একটীও কথা বলেন নাই। ইহা অবশ্য দুঃখের বিষয়। তাই আমরা এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ভট্টির জীবন-বৃত্তান্ত অন্যান্য শত শত আর্য্য-নৃপতি, ঋষি আচার্য্য ও পণ্ডিতমণ্ডলীর জীবনীর ন্যায় দেহ-বুদ্বুদের সহিত অতীত-কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহার জীবনী জানিবার জন্য বহু পরিশ্রম করিয়াছি কিন্তু আশানুরূপ কিছুই জানিতে পারিলাম না। আশা করি কোন সৌভাগ্যশালী লেখক এতদপেক্ষা বহু বৃত্তান্ত-ভূষিত ভট্টি-জীবন-বৃত্ত আবিষ্কার করিয়া আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন। আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে লিখিতেছি—

১ম। ভট্টি কাব্যের সর্ব্বশেষ শ্লোকে লিখিত আছে "শ্রীধরপুত্র নরেন্দ্র নামক নৃপতির পালিতা বলভী পুরীতে আমার দ্বারায় এই গ্রন্থ লিখিত হয়। তথাহি:—

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধর-সুনু-নরেন্দ্রপালিতায়াম্। ১
কীর্ত্তিরতো ভবতাদ্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপোযতঃ প্রজানাম্॥
(ভট্টি, ২২ সর্গ; ৩৫ শ্লো ২)

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকার আর কোন নিজ পরিচয় দেন নাই।

২য়। জয়মঙ্গল নামক ভট্টির টীকাকার তাঁহার টীকার সূচনা ও সমাপ্তি স্থলে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে জানা যায় শ্রীধরস্বামীর পুত্র ভট্টি

১ কোন কোন মুদ্রিত ও হস্তলিখিত পুস্তকে "শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্" এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে নৃপতির নাম নরেন্দ্র না হইয়া শ্রীধরসেন হয়; এবং নরেন্দ্র শব্দ শ্রীধরের (বাভিচার) বিশেষণ হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ পাঠান্তর আমাদের নিকট শুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না, কেন না জয়মঙ্গল এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

ময়েদং কাব্যং 'বিহিতং' কৃতং, শ্রীধর-সুনুনা নরেন্দ্রনাম্না নৃপেণ 'পালিতায়াং' রক্ষিতায়াং 'বলভ্যাং' বলভীনামপুর্য্যাং।

নামক কবি শ্রীরাম-কথাশ্রিত এই মহা কাব্য প্রণয়ন করেন; এই ভট্টি মহাবৈয়াকরণ * মুহাব্রাহ্মণ এবং বলভী-প্রবাসী ছিলেন।

সূচনা স্থলে :—

"শ্রীস্বামিসূনুঃ কবির্ভট্টিনামা
রামকথাশ্রয়-মহাকাব্যং চকার।"

সমাপ্তি স্থলে :———

"ইতি বলভীবাস্তব্যস্য শ্রীস্বামি
—সূনোর্ভট্টি মহাব্রাহ্মণস্য মহা
বৈয়াকরণস্য ———"

৩য়। ভট্টি-কাব্যের অপর টীকা মুগ্ধ-বোধিনী-প্রণেতা ভরতমল্লিক বলেন "ভর্তৃহরি নামক কবি শ্রীরামকথাশ্রিত এই মহাকাব্য প্রণয়ন করেন :—

"ভর্তৃহরির্নাম কবিঃ শ্রীরাম-
কথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।"

৪র্থ। এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস, আদিশূর-আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ব্রাহ্মণ বেণীসংহার নাটক প্রণেতা ভট্ট-নারায়ণ ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করেন। কিন্তু এ কথার কোনও প্রমাণ নাই এবং সম্ভবপরও নহে।

৫ম। আবার এদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন "মহাবৈয়াকরণ দুর্গসিংহই ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন।" কিন্তু একথা আমরা একটুকুও বিশ্বাস করি না। এদেশীয় পণ্ডিতগণ দুর্গসিংহ সম্বন্ধে যেরূপ অলৌকিক উপন্যাস বলিয়া থাকেন তাহাতে দুর্গসিংহকে একটী "কল্পতরু" বলিতে হয়। বাস্তবিক প্রমাণ এবং যুক্তিহীন এবম্ভূত কিংবদন্তীতে বিশ্বাস স্থাপন করা কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে।

৬ষ্ঠ। আমরা একজন শাস্ত্রপ্রবীণ মহাত্মার নিকট শুনিলাম "নরেন্দ্র-পদ-বিদ্বেষী একজন বিখ্যাত নৃপতি, রাজত্ব ছাড়িয়া, অন্য এক রাজার আশ্রমে থাকিয়া ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করেন" ১ এ কথার কোন মূল থাকুক কি না থাকুক আমরা একথাও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমরা ভট্টি-প্রণেতা সম্বন্ধে এরূপ অনেক অলৌকিক উপাখ্যান শুনিয়াছি। কিন্তু অনাবশ্যক বোধ হওয়াতে আর কিছু উদ্ধৃত করিলাম না।

আমরা এখন ভট্টিকাব্য-প্রণেতার নাম ভট্টি কি ভর্তৃহরি তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিচার করি। "ভট্টি-কাব্য" এই নাম দেখিয়া যদি [ভট্টির (ভট্টির কৃত)+কাব্য] এই অর্থ করিয়া লই তবে জয়মঙ্গলের নির্দ্দেশিত নামই যথার্থ বলিয়া প্রতীতি হয়, সুতরাং ভরতমল্লিকের কথার কোনও গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু ভরতমল্লিকের ন্যায় এক জন অসাধারণ পণ্ডিত যে কিছু প্রমাণ না পাইয়াই কল্পনা-বলে একটী মিথ্যা কথা লিখিবেন তাহাও আমরা বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারি না। যদিও আমরা উল্লিখিত ষষ্ঠ মতটী প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করি না তথাচ যদি

১ এই পণ্ডিত কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এরূপ লেখা দেখিয়াছেন কিন্তু কোন্ গ্রন্থে দেখিয়াছেন এখন স্মরণ নাই।

তাহার কোন মূল থাকে তবে তাহাও ভরতমল্লিকের কথারই এক অর্থে সমর্থন করিতেছে। কেন না সংবৎ-প্রবর্ত্তক প্রাতঃস্মরণীয় উজ্জয়িনী-অধিপতি বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার একান্ত দৃষ্ট হইবে। আমরা অতি সংক্ষেপে ভর্ত্তৃহরি নৃপতির উপন্যাস বলিয়া লই :—

ত্রিদিবে, ইন্দ্রের সুধর্ম্মা নামক সভায় এক দিন নৃত্য গীত হইতেছিল। তথায় ইন্দ্রের পুত্র গন্ধর্ব্বসেন একটী অপূর্ব্ব সুন্দরী অপ্সরার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে ছিলেন। ইহাতে ইন্দ্র অতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "রে কামুক পশু তুই এ সভা কলঙ্কিত করিলি। শীঘ্র গর্দ্দভ শরীর ধারণ করিয়া মর্ত্ত্য লোকে অবস্থিতি কর্।" কিন্তু কথা রহিল, ধাররাজ যে দিন গর্দ্দভ-শরীর ভস্ম করিবেন সেই দিন গন্ধর্ব্বসেন সশরীরে স্বর্গে আসিতে পারিবেন। এদিকে গন্ধর্ব্বসেন মর্ত্ত্যে অবতরণ করিলেন। এবং কয়েক ব্রাহ্মণের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া ধাররাজার কন্যাকে বিবাহ করার যোগাড় করিলেন। ধাররাজার কথা রহিল, যদি গন্ধর্ব্বসেন এক রাত্রির মধ্যে আড়ে দীর্ঘে চল্লিশ ক্রোশ এবং উচ্চে তিন ক্রোশ এক লৌহ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারেন তবেই জানিব তিনি ইন্দ্রের পুত্র; তাহা হইলে আমি তাঁহাকে নিরাপত্তিতে কন্যা সংপ্রদান করিব। গন্ধর্ব্বসেন এক রাত্রির মধ্যেই ফর্ম্মাইস মত এক দুর্গ প্রস্তুত করিলেন। সুতরাং রাজ কন্যাকে বিবাহ করিলেন। কতিপয় দিবস মধ্যে এক দাসীর গর্ভে ও গন্ধর্ব্বসেনের ঔরসে এক পুত্র হইল। এই পুত্রের নামই ভর্ত্তৃহরি। ইহার কিছু দিন পরে রাজকন্যার গর্ভে গন্ধর্ব্বসেনের আর এক পুত্র হইল। ইনিই প্রাতঃস্মরণীয় ভুবনবিখ্যাত বিক্রমাদিত্য। গন্ধর্ব্বসেন দিনে গর্দ্দভ-শরীর এবং রজনীতে মনুষ্য-শরীর ধারণ করিতেন। বিক্রমাদিত্য জন্মিবার কিছু পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বসেন যেই একদিন রজনীতে গর্দ্দভ-শরীর রাখিয়া মনুষ্য-শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, ধাররাজ অমনি তাঁহার গর্দ্দভ-শরীর ভস্ম করিয়া ফেলিলেন, সুতরাং গন্ধর্ব্বসেন শাপ হইতে মুক্ত হইলেন। তখন ধাররাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পিতৃভবনে চলিয়া গেলেন। এদিকে বিক্রমাদিত্য এবং ভর্ত্তৃহরি বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত নানাশাস্ত্রে বিশারদ হইয়া উঠিলেন। ধাররাজ স্বীয় দৌহিত্র বিক্রমাদিত্যকে মালব দেশ প্রদান করিয়া তথাকার রাজা করিয়া দিলেন। জ্ঞানবৃদ্ধ ও পরম ধার্ম্মিক বিক্রমাদিত্য জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের রাজত্ব করা যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ জানিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ভর্ত্তৃহরিকে রাজত্ব ছাড়িয়া দিলেন। ভর্ত্তৃহরি সুখে উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ভর্ত্তৃহরির অঙ্গনা ও পিঙ্গলা নামে দুই স্ত্রী ছিল। অঙ্গনার অপ্সরা-নিন্দিত রূপ-লাবণ্য দেখিয়া ভর্ত্তৃহরি এরূপ মোহিত হইয়া গেলেন যে রাজকার্য্য ছাড়িয়া সর্ব্বদা অঙ্গনাকে লইয়া দিনপাত করিতেন। সুশাসন

অভাবে রাজ্যে নানারূপ অরাজকতা আরম্ভ হইল। একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্য ভর্তৃহরিকে তাঁহার ত্রুটী প্রদর্শন করিয়া নানা সদুপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু ঔদাসীন্য-নিবন্ধন তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বরং অঙ্গনার কুপরামর্শে বিক্রমাদিত্য তাঁকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিলেন।

একদা ভর্তৃহরি তাঁহার দুই স্ত্রীর নিকট একটী পতিব্রতা স্ত্রীর সহমরণের কথা বর্ণনা করিতে ছিলেন। তাহা শুনিয়া পিঙ্গলা সেই সতীর নানা প্রশংসা করিয়া তাহাকে দেবীর ন্যায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গনা সে কথায় দৃক্‌পাতও করিলেন না। ইহাতে নৃপতির অঙ্গনার চরিত্রের উপর বিষম সন্দেহ হইল। একদা নৃপতি মৃগয়ায় গিয়াছিলেন; তিনি, স্ত্রীদের চরিত্র পরীক্ষার জন্য বাটীতে 'রাজাকে ব্যাঘ্রে নষ্ট করিয়াছে' এইরূপ মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র পিঙ্গলা বিষাদে প্রাণত্যাগ করিলেন। কিন্তু অঙ্গনার এই সংবাদ শুনিয়া আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এখন উপপতিকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে পারিব।

আর একদিন একজন তপস্বী ব্রাহ্মণ ভর্তৃহরিকে একটী অলৌকিক ফল আনিয়া দিলেন। ঐ ফল উদরস্থ করিলে মনুষ্য অমর হয়। ভর্তৃহরি অঙ্গনাকে প্রাণাধিক ভাল বাসিতেন সুতরাং ফলটি নিজে না খাইয়া অঙ্গনাকে দিলেন, অঙ্গনা তাঁহার উপপতিকে দিল, উপপতি তাহার প্রিয়তমা এক বারাঙ্গনাকে দিল, সে আবার উহা ভর্তৃহরি মহারাজাকে পাঠাইয়া দিল। রাজা পুনরায় ফল পাইয়া অঙ্গনার সমুদায় চক্রান্ত অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। অঙ্গনার চরিত্রের পরিচয় পাইয়া তাহাকে রাক্ষসীর ন্যায় বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তখন সতীসাধ্বী পতিব্রতা পিঙ্গলার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার বিরহে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নিজের সমুদয় ভ্রম বুঝিয়া হৃদয়-বিদারক অনুতাপ উপস্থিত হইল। সংসার স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজত্ব ছাড়িয়া বনে গমন করিলেন। ১

যদিও আমরা উল্লিখিত প্রাচীন মতটিকে উপন্যাসে বলিয়াছি, কিন্তু দেখিতে গেলে উহার মধ্যে ভর্তৃহরি সম্বন্ধে অনেক বাস্তবিক ঘটনা নিহিত আছে। উহার শেষ ভাগের সার সংগ্রহ করিলে এই মাত্র জানা যায় প্রিয়তমা স্ত্রীর লোক-বিগর্হিত কার্য্যে অতিমাত্র মর্ম্মাহত হইয়া ভর্তৃহরির সংসারের উপর ঘোরতর বিতৃষ্ণা জন্মিল, পরিশেষে বনবাসী হইলেন। তিনি এই উদাসীন অবস্থায় বলভীপতি নরেন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং উল্লিখিত ষষ্ঠ মতটী প্রামাণ্য

১ [যাঁহারা সংবৎ-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে পাশ্চাত্যদের ইতিহাস ব্যতীত আর কিছু না জানেন তাঁহারা রাজ তরঙ্গ প্রভৃতি একবার খুলিয়া দেখুন :—

না হউক নিতান্ত অসংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় না। তাই বলি একথায় ভরতমল্লিকের মতেরই পুষ্টি সাধন করিতেছে। কিন্তু কোন গ্রন্থকার বলেন ভর্ত্তৃহরি স্বয়ং স্বাধীন নৃপতি হইয়া অন্য রাজার আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। একথা আমরা অসঙ্গত জ্ঞান করি না। কিন্তু তর্কস্থলে বলিতে পারি যে, (মনে করুন) ভর্ত্তৃহরি নরেন্দ্র নৃপতির একজন বন্ধু ছিলেন তখন তাহার এমন সাংসারিক কষ্টে নিতান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছিল, বন্ধুর নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ করিলে দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইবে এই মনে করিয়া তিনি তখন কিয়ৎকাল বন্ধুর আশ্রমে ছিলেন এবং এবং সেই সময়ে ভট্টি-কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ কোন অবস্থায় পতিত হইয়া একজন স্বাধীন নৃপতি অন্য নৃপতির আশ্রমে অবস্থিতি করিলে তাঁহার কোন গৌরবের হানি হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুন্তল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তিনি যখন শকুন্তলার ক্রোধ বর্ণনা করিতেছেন তখন রাজার মনে হইতেছে

মন্যোব বিম্ববণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃপ্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য॥

ইহা দ্বারা আমাদের মনে তাদৃশ ক্রোধের ভাব হয় না। এখানে উপমা অতি লঘু, কিন্তু অনেকে বলিবেন যে, রাজার সে সময় মনের ভাব যেরূপ ছিল তদুপযুক্ত উপমা হইয়াছে ইহা বলিলে কালিদাসকে দোষ হইতে মুক্ত করা হয় না, তিনি অন্য ব্যক্তির দ্বারা অথবা রাজার অন্য উপমা দ্বারা ক্রোধ দেখাইতে পারিতেন। ইহা কালিদাসের ওজোহীনত্বের পরিচয়। আমরা মহাভারতের এই বিষয়ে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করি।

সৈবমুক্তা বরারোহা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী।
নিঃসংজ্ঞেব চ দুঃখেন তস্থৌ স্থাণেব নিশ্চলা॥
সংরম্ভামর্ষতাম্রাক্ষী স্ফুরমানৌষ্ঠসম্পুটা।
কটাক্ষৈর্নির্দহন্তীব তির্য্যগ্রাজানমৈক্ষত॥
আকারং গূহমানা চ মন্যুমা চ সমীরিতা।
তপসা সম্ভৃতং তেজোধারয়ামাস বৈ তদা॥

এ বর্ণনা যদিও সরল তথাপি কালিদাসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শকুন্তলা যখন ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে ভর্ৎসনা করিতেছে এবং বলিতেছে "অনার্য্য, আত্মনোহৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে" ইত্যাদি, তখন বর্ণনা উত্তম হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা এক্ষণে দেখিলাম যে কালিদাস ওজোগুণবিশিষ্ট বর্ণনা করিতে সচরাচর সমর্থ নহেন। অতএব ওজোগুণের অভাব তাঁহার তৃতীয় দোষ। এবার আমরা তাঁহার করুণরসের বর্ণনার বিষয় কিছু বলিব। কালিদাস কয়েক স্থানে শোকের বর্ণনা করিয়াছেন। কুমারের চতুর্থ সর্গে রতিবিলাপ, রঘুর অষ্টম সর্গে অজবিলাপ এবং শকুন্তলার ষষ্ঠাঙ্কে রাজা দুষ্মন্তের অনুতাপ। * এ সকল বর্ণনা শোকোদ্দীপক নহে। ইহা প্রকৃত করুণরস নহে, ইহা বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। ইহাদের সহিত যদি উত্তর চরিতে রামবিরহের † তুলনা করা যায় তাহা হইলে আমরা দেখিব, যে কালিদাসের বর্ণনা অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এবং আমাদের হৃদয়গ্রাহী নহে। এ সকল বর্ণ-

* বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কে যে বর্ণনা আছে তাহা শোকের নহে। তাহা উন্মত্ততার বর্ণনা, সেই জন্য আমরা এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

† উত্তর-চরিতের অঙ্গী রস কি এ সম্বন্ধে আলঙ্কারিকদের মতামত আছে। আমরা কিন্তু উত্তরচরিতকে করুণরস-প্রধান বলিব। যদিও এরূপ বলা নাটকের নিয়মবিরুদ্ধ। আর উত্তরচরিতের বিরহ ও অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিরহ প্রভৃতির সহিত প্রভেদ দেখাইবার জন্য এসকলকে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার বলা গেল।

নাতে আমরা স্পষ্টরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রেমের ভাব সকল দেখিতে পাই, সেই আসঙ্গ-লিপ্সা, সেই কামুকতা। এখানে কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। রতি খেদ করিয়া পূর্ব্বঘটনা স্মরণ করিতেছেন ও বলিতেছেন

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতা-
স্যুপগূঢ়ানি সবেপথূনি চ।
* * চ তানি তে রহঃ
স্মর সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে॥

ইহা অতি কদর্য্য ভাব, বিশেষতঃ শেষ চরণটী অশ্লীল, এরূপ শোকের সময় সেই সকল ব্যাপার মনে করিয়া যেন ইন্দ্রিয়জ্বালায় কাতর হওয়া অতি কদর্য্য। আবার এসময়ে সুরকামিনীদিগের প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়াও অসম্ভব, কিন্তু রতি বলিতেছে

অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা
পুনরঙ্কাশ্রয়িণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ
প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি॥

এরূপ ভাব বিস্তর আছে কিন্তু এসকল অনৈসর্গিক, ইহাতে কালিদাসের অশ্লীলতা এবং কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়*। রঘুতে অজবিলাপ রতিবিলাপ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সেখানেও অনেক দোষ দেখা যায়। অনেক স্থানে রতি এবং অজর ভাব এক প্রকার তাহা পাঠ মাত্রেই অবগত হওয়া যায়। আমরা অজবিলাপ হইতে কেবল দুটী অশ্লীল ভাবের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি যে এরূপ ভাব শোকের সময় আসিলে আমাদের মনে করুণার উদ্রেক হয় না, বরঞ্চ আমরা তাহাতে বিরক্ত হই ও আমাদের রসভঙ্গ হয়।

"ইয়মপ্রতিবোধশায়িনীং
রসনা ত্বাং প্রথমা রহঃসখী।
গতিবিভ্রমসাদনীরবা
ন শুচা নানুমৃতেব লক্ষ্যতে॥"

আবার,

"নমু শব্দপতিঃ ক্ষিতেরহং
ত্বয়ি মে ভাবনিবন্ধনা রতঃ॥
মদিরাক্ষি মদাননার্পিতং
মধু পীত্বা রসবৎ কথং নু মে।
অনুপাস্যসি বাষ্পদূষিতং
পরলোকোপনতং জলাঞ্জলিম্॥"

রতিবিলাপের মধ্যে মধ্যে যত অশ্লীল ভাব আছে, ইহা সেরূপ নহে তথাপি সময়োচিত নহে।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠাঙ্কের কথা আর কি বলিব, ইহাতে কিছু অশ্লীলতা নাই কিন্তু সেই মদনজ্বালা আছে, ইহাতেও আমাদের শোক উদয় হয় না। কিন্তু রামবিরহ পাঠ করিলে আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি না, আমাদের হৃদয় শোকে

* কেহ বলিবেন যে রতি রত্যাখ্য ভাবের মূর্ত্তি, তাহার এইরূপ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা নয়, (See note 24) কালিদাসের সর্ব্বত্র এইরূপ ভাব আছে, অজর বর্ণনাতে কেবল সেইরূপ ভাব কিন্তু অজও কি এত কামুক ছিলেন? তাহা নহে, এ সকল ব্যক্তি দ্বারা কালিদাস আপনার অন্তঃস্বরূপের অবস্থা দেখাইতেছেন।

অভিভূত হইয়া যায়। আমরা তখন এরূপ তন্ময় হই যে রামের ভাব সকল আমাদের নিজের ভাব মনে করি। যাহা হউক এখানে আর একটী বিষয় বক্তব্য আছে। কালিদাসও রামচরিত আদ্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু সে বর্ণনা অকিঞ্চিৎকর, রামের প্রকৃত স্বভাব কালিদাস বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরত্ব স্নেহবত্তা প্রভৃতি হৃদয়গ্রাহী গুণ সকল কালিদাসের লেখনীতে প্রকাশিত হয় নাই, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাম-রাবণের সমর বর্ণনা কিছুই হয় নাই, তাহা বীররসের বিড়ম্বনা। এখানে করুণ রসের কথা বলিতে গিয়া দেখিতেছি যে রাম সীতা পরিত্যাগ সময়ে বলিতেছেন

"তস্যাপনোদায় ফলপ্রবৃত্তৌ
উপস্থিতায়ামপি নির্ব্বাপেক্ষঃ।
তক্ষ্যামি বৈদেহসুতাং পুরস্তাৎ
সমুদ্রনেমিং পিতুরাজ্ঞয়েব॥"

ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে রাম অতি নিষ্ঠুর। তিনি অনায়াসে গর্ভমন্থরা সীতাকে ত্যাগ করিবেন, আর যেন সীতা ও "সমুদ্রনেমি" এক প্রকারের বস্তু ও সুতরাং সমান আদরণীয়। এ সকল ভাব রামের স্বভাববিরুদ্ধ সন্দেহ নাই। রাম যে সীতার প্রতি কিরূপ স্নেহবান ছিলেন ও এক দিকে সীতা নির্ব্বাসন আর এক দিকে প্রজাদিগের সন্তোষবিধান, এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া কি মানসিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন তাহা ভবভূতি অদ্বিতীয় ক্ষমতার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তরচরিতের সে সকল অংশ পাঠ করিলে এরূপ মর্ম্মভেদী শোক উপস্থিত হয় যে

অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্।

Creates a soul
Under the ribs of death

গোবর্দ্ধনাচার্য্য একজন যথার্থ রসগ্রাহী, তিনি ভবভূতির উপর একটী কবিতা লিখিয়াছেন।

ভবভূতের্হি সম্পর্কাৎ
ভূধরভূরেব হি ভারতী ভাতি।
তস্মিন্ করুণাস্পর্শিনি
কিমদ্ভুতা রোদিতি গ্রাবা॥

এখানে পাঠক দেখিবেন যে ভূধরভূঃ বলাতে ভারতীর মহত্ব ও গভীরত্ব সূচিত হইতেছে। কালিদাসের এতাদৃশ ক্ষমতা ছিল না। এবং সীতাপরিত্যাগের পর রামের যে শোক হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কালিদাসে প্রায় কিছুই নাই। বোধ হয় কালিদাস নিজের ক্ষমতা জানিতেন। পাছে আবার এক অজবিলাপ লিখিয়া বসেন এই জন্য রামের শোক বর্ণনা বাহুল্যরূপে করেন নাই। বস্তুত রামচরিতের ন্যায় আদরণীয় এবং বর্ণনার বস্তু সমস্ত রঘুবংশে নাই কিন্তু এ অংশে কালিদাসের কবিত্ব কিছুই প্রকাশ পায় নাই।*

আমরা যে সকল উদাহরণ দিয়াছি

* মধ্যে মধ্যে সমুদ্র বর্ণনা, দণ্ডকারণ্য বর্ণনা প্রভৃতি উত্তম বস্তু আছে, কিন্তু রামচরিতের সহিত তাহার বিশেষ সম্পর্ক নাই, রাম চরিত বর্ণনা কালিদাসের ভাগ্যে নাই

তাহা করুণ রসের নহে। আমরা বলিয়াছি যে এ সকল বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার। অভিজ্ঞান শকুন্তলের চতুর্থ অঙ্কে, এবং রঘুর স্থানে স্থানে কালিদাস করুণ রসের বর্ণনা করিয়াছেন *। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্ক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, এবং সাতিশয় হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু এ স্থলে আমাদের স্নেহরস উদ্রিক্ত হয় কারণ যথার্থ শোক উদয় হইবার বিষয় নহে। কন্যা শ্বশুরালয়ে গমন করিবে, ইহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখ হইবে শোক হওয়া অলক্ষণের কথা। অতএব আমরা দেখিলাম যে প্রকৃত মর্ম্মভেদী করুণ রস কালিদাসে নাই। এখানে আমরা কালিদাসের রস সকলের পর্য্যালোচনা সমাপ্ত করিলাম এবং তাঁহার শক্তি সকল রস ভাল বর্ণনা করিতে পারে না তাহাও স্পষ্ট বুঝা গেল। কালিদাসের কবিত্ব শক্তির বিচার করিয়া দেখিলাম যে তাঁহার কয়েকটি দোষ আছে যে সকল দোষ নাটকীয় শক্তির অনিষ্ট করে। অতএব আমাদের মতে তিনি নাটককার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। কবিত্বের কথা ধরিতে হইলে তাঁহার গুণ যথেষ্ট আছে। তাঁহার বর্ণনা সকল অতি চমৎকার, সেরূপ বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। যদি কালিদাসের বর্ণনা "শক্তির" কথা ধরা যায় তাহা হইলে কালিদাস একজন জগতের প্রধান কবি। কিন্তু তাঁহার শক্তি বহির্জগৎ বর্ণনা করিতে যেরূপ পারে নাটকীয় শক্তির অভাব বশতঃ অন্তর্জগৎ বর্ণনা করিতে সেরূপ পারে না। গিরি নদী, তপোবন, সমুদ্র, আকাশ, অলকা, অযোধ্যা, উজ্জয়িনী, দণ্ডকারণ্য এ সমস্ত যেন চিত্রপটে ন্যস্ত দেখিতে পাই। কালিদাসের উপমা সকল পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তন্ন তন্ন করিয়া তিনি নিসর্গ-শোভা অবলোকন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার উপমা সকল এত চমৎকার, যেন বর্ণিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেয়, যখন তিনি বাহ্য জগৎ বর্ণনা করেন তখন তাঁহার কল্পনাশক্তি যেন পাঠকের মনকে উড়াইয়া লইয়া যায়, এবং বর্ণিত বস্তু সকল প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেয়। মেঘদূত পাঠ করিলে আমাদের শরীর পুলকিত হয়, আমরা যেন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ব্যোম মার্গে উড়িয়া যাই, আমরা যেন উজ্জয়িনীতে মহাকালের আরতি দেখিতে পাই এবং নর্ত্তকীদের নূপুরধ্বনি যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, আমরা যেন হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত শিখরমালাকে দৃষ্টিগোচর করি, এবং আমাদের মনে হয় যে "রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ" আমরা দেখিতেছি। পরে মেঘ যখন অলকা-

* রঘুর যে সকল স্থানে করুণ রস আছে তাহার বর্ণনা কালিদাস কিছুই করেন নাই যথা দশরথ কর্ত্তৃক মুনিপুত্র বধ। এমন শোকোদ্দীপক ব্যাপার কালিদাস উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। আবার যখন লক্ষ্মণ সীতাকে বনে ছাড়িয়া আসিতেছেন, তখন বর্ণনা যাদৃশ শোকাবহ হওয়া উচিত তাদৃশ হয় নাই—ভবভূতির যেরূপ বর্ণনা, তাহার সহিত তুলনা করিলে অতিশয় অকিঞ্চিৎকর মনে হয়।

পুরীতে উপনীত হইল আমরাও যেন সে খানে গিয়া যক্ষ সকলের বিহার মধুপান সমস্তই অনুভব করি, আবার যখন যক্ষপত্নীর বর্ণনা হইতেছে, তখন আমাদের মনে হয় যেন কালিদাস এক খানি ছবি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিলেন। এরূপ আশ্চর্য্য বর্ণনা আর দেখিতে পাওয়া যায় না, য়ুরোপীয় কবিদের মধ্যেও বিরল।

আমাদের মনে হয় যে কালিদাস যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন সকলের মধ্যে মেঘদূত, বিক্রমোর্ব্বশীর ৪র্থ অঙ্ক এবং কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট—কুমারের তৃতীয় সর্গে কি অলৌকিক বস্তু আছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। কালিদাসের কাব্যে উন্নত গভীর ভাব সচরাচর নাই, কারণ, তিনি অনাবশ্যক স্থলেও আদিরস আনিয়া ফেলেন। কিন্তু তৃতীয় কুমারে তাঁহার মোহিনী তন্ত্রীতে হোমর ও মিলটনের গভীর তান শুনিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈঃ,
অধঃ কথঞ্চিৎ কৃতভূমিভাগঃ।
শনৈঃকৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ,
পর্য্যঙ্কবন্ধং নিবিড়ং বিভেদ॥"

Comp. Iliad I. Book.

হোমর জুপিটারের এইরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন

" He spoke and awful bends his sable brow,
" Shakes his ambrosial curls and gives the nod,
" The stamp of fate, and sanction of the God;
" High heaven with trembling the dread signal took,
" And all Olympus to the centre shook."

আবার যে সকল শ্লোকে শিবের ধ্যান ও লতাগৃহ দ্বারে নন্দী নিস্তব্ধ তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা আছে তাহা অতিশয় চমৎকার এবং রোমহর্ষণ—আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী
বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়ৈব
মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ॥ ৪১
নিষ্কম্পনক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং
মূকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং
চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে॥ ৪২
অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহম
অপামিবাধারমমুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ
নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥ ৪৩
মনোনবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি
হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদোবিদুস্তম্
আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥ ৪৪
স্থিরস্তথাভূতময়ুগ্মনেত্রং
পশ্যন্নদূরান্মদনস্তমেব।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসম্বৃতঃ সঃ
স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ॥ ৪৫

শেষোক্ত শ্লোকে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে মহাদেবকে দর্শন করিয়া কন্দর্প এতাদৃশ

ভীত হইল যে ধনুর্ব্বাণ হস্ত হইতে যে স্খলিত হইল তাহা জানিতে পারিল না। এ ভাবটী অতি চমৎকার এবং যথার্থ ভয়-সূচক।

এ সর্গে অন্যান্য বর্ণনাতেও যথেষ্ট চমৎকারিত্ব আছে। ওজোগুণ-বিশিষ্ট বর্ণনা কালিদাসে বিরল তাহা দেখিয়াছি কিন্তু এ সর্গে অনেক স্থলে সে গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার পার্ব্বতীর বর্ণনা ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬ শ্লোক যেমন তৃতীয় সর্গে চমৎকার, এরূপ প্রথম সর্গে হয় নাই এবং মেঘদূতের যক্ষপত্নীর বর্ণনা ব্যতিরেকে এরূপ আর কুত্রাপি নাই। এ বর্ণনাতে কালিদাসের যাহা প্রধান দোষ—আদিরসের প্রাচুর্য্য—তাহা নাই। হরপার্ব্বতীর ভাব-ব্যক্তি কিরূপ হইল তাহাও সৌদর্য্যে পরিপূর্ণ। যথা

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যা
শ্চন্দ্রোদয়ারম্ভইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে
ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭
বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবং
অঙ্গৈঃ স্ফুরৎবালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ
মুখেন পর্য্যন্তবিলোচনেন ॥ ৬৮

আবার যদি কুমারে তৃতীয় সর্গের বসন্ত বর্ণনার সহিত রঘুর নবম সর্গের বসন্ত বর্ণনার তুলনা করা যায়, তাহা হইলে বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। অতএব আমরা দেখিলাম যে কুমারের তৃতীয়তে যা যা বস্তু আছে তাহা সমস্তই অলৌকিক কবিত্বের পরিচয়। কুমারের পঞ্চম সর্গেও চমৎকার বর্ণনা আছে কিন্তু তৃতীয় অপেক্ষা ঈষৎ নিকৃষ্ট। এ সর্গে ছদ্মবেশী মহাদেব ও তপস্বিনী পার্ব্বতীর যে কথোপকথন আছে তাহাতে কালিদাস কবিত্বের একশেষ দেখাইয়াছেন।

কালিদাসের যে সমস্ত গুণ আছে তাহা সংস্কৃত পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কালিদাসের কবিতার ন্যায় মধুময় প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট সরস কবিতা কোথাও নাই। আমরা কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র কিন্তু তাঁহার যে কি কি গুণ আছে তাহা উত্তম রূপে দেখিতে গেলে তাঁহার কাব্য সকল আদ্যন্ত পাঠ করা উচিত। আমরা যে সকল দোষ দেখাইয়াছি তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। কিন্তু এ সকল দোষ সত্ত্বেও তিনি একজন প্রধান কবি তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছি যে কালিদাসের মন কখন ভবভূতি অথবা Wordsworth অথবা Tennyson এর মত ছিল না। অনেকে বলিবেন যে তাহা ছিল না এতে ক্ষতি কি। কবি যে একজন স্মার্ত্তবাগীশ হইবে এরূপ কোন নিয়ম নাই এবং অনেক কবি এমন কি Shakespeare পর্য্যন্ত অশ্লীল বর্ণনা করেন। কিন্তু আমরা বলি যে প্রধান কবিদের সে গুণ থাকা আবশ্যক, কারণ কাব্যের উদ্দেশ্য যে কেবল কিয়ৎক্ষণ চিত্তবিনোদন করা এরূপ নহে, চিত্তবিনোদনের সহিত আমাদের

স্বভাব ও মন পরিমার্জ্জিত হইবে। রাস্‌কিন বলিয়াছেন যে প্রধান প্রধান চিত্রকরগণের নীতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক, তেমনি কবিদের হওয়া অধিকতর আবশ্যক।

আবার কাব্যপ্রকাশে প্রথমেই বলা হইয়াছে যথা—

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে
ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে
কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥

মম্মটভট্টের সূত্র দেখিয়া কিছু কালিদাস গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু নানা গ্রন্থে উপরোক্ত গুণ সকল দেখিয়া তবে মম্মট কাব্যের লক্ষণ লিখিয়াছেন। আমরা দেখিতেছি যে কালিদাসের কাব্য সমূহে কোন উপদেশ পাই না। বরঞ্চ মানুষের যে সমস্ত রিপুকে দমন করা উচিত কালিদাস সেই সকল রিপুকে আদরণীয় ও জগতে সার বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আর অন্য কবিদের দোষ দেখাইয়া কালিদাসের দোষাপনয়ন করা হয় না। Shakespeare যেখানে অশ্লীল বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে তিনি নিশ্চয় দোষী। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ সকলে উপদেশ যথেষ্ট আছে, ভাব ওরূপ আর কোথাও নাই। Shakespeare পাঠ করিলে বোধ হয় যে তাঁহার মন অতিশয় উন্নত ছিল, তাঁহার অশ্লীলতা তৎসময়ের রুচিনিবন্ধন। কিন্তু কালিদাসের মন সেরূপ নহে। যাহা হউক এ বিষয়ে যদিও কালিদাস দোষী তথাপি অন্যান্য কর্ত্তব্য বিষয়ের বর্ণনাতে তাঁহার ঔচিত্য ভঙ্গ দেখা যায় না, যথা দিলীপের ধেনু রক্ষা, রঘুর বদান্যতা, পার্ব্বতীর মনস্বিতা ইত্যাদি। এ সকল বর্ণনাতে আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে কালিদাস্ গুণগ্রাহী ও ভাবুক ছিলেন এবং ঐ সকল গুণ তাঁহার আদরণীয় ছিল। কালিদাসের জীবনের ইতিহাস কিছু নাই, এজন্য তাঁহার স্বভাব কিরূপ ছিল তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠে যাহা কিছু অবগত হওয়া যায় তাহা আমরা ইঙ্গিতচ্ছলে বলিলাম, কোন কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতের এ সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করা উচিত।

আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি, কালিদাস বাহ্য জগৎ বর্ণনাতে অদ্বিতীয়, কিন্তু বাহ্য জগৎ দর্শন করিলে সময় ও অবস্থানুসারে মনে যে কিরূপ ভাব উদিত হয় কালিদাসে তাহা কোথাও নাই। আমরা দেখিতেছি যে, এ দোষ কেবল কালিদাসের নহে, সংস্কৃত কবি মাত্রেরই আছে। তাঁহারা মনের ভাব সকল স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করেন না। দিগন্তবিস্তীর্ণ মহাসাগর, অভ্রভেদী পর্ব্বতশিখর, জনশূন্য নিবিড় বন প্রভৃতি প্রকৃতির শোভা দেখিয়া আমাদের মনে কত উন্নত ভাবের উদয় হয়, কিন্তু সে সকল ভাব সংস্কৃত কবিগণ বর্ণনা করেন না। কিন্তু ইয়ুরোপীয় কবিগণের ক্ষমতা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। তাঁহারা বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয় বর্ণনাতে সমান নিপুণ এবং

প্রকৃতির শোভা অবলোকন করিয়া মনে যে কি অদ্ভুত ভাব সকলের উদয় হয় তাঁহারা চমৎকার রূপে বর্ণনা করেন এবং তাঁহাদের বর্ণনার এমনি গুণ যে পাঠকের মনেও সেই সব ভাবের উদয় হয়—Popo বলিয়াছেন যে যথার্থ কবি—

Can make me feel each passion that he feigns
Enrage compose with more than magic art,
With pity and with terror tear my heart.

ইহা ইয়ুরোপীয় কবিদের মধ্যে বিশেষ রূপে দেখা যায় কিন্তু সংস্কৃত কবিদের মধ্যে পাই না—

আমরা যাহা বলিলাম তাহার প্রমাণ করিবার জন্য এখানে কালিদাস ও বায়রণ * হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইবে যে আমরা যাহা বলিলাম তাহা সত্য। এক বস্তু দ্বারা উভয়ের মনে কি ভাব উদিত হইতেছে পাঠক তাহা দেখুন—

সমুদ্র বর্ণনা—রঘুবংশ ১৩ শ সর্গ।

বৈদেহি পশ্যামলয়াৎ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন-
মাকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্॥

এ উপমাটী চমৎকার,

৫ তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়ম্
ঈদৃক্‌তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা॥
৭ পক্ষচ্ছিদা গোত্রভিদাঞ্চগন্ধাঃ
শরণ্যমেনং শতশো মহীধ্রাঃ।
নৃপাঃ ইবোপপ্লবিনঃ পরেভ্যঃ
ধর্ম্মোত্তরং মধ্যমমাশ্রয়ন্তে॥
১০ সসত্ত্বমাদায় নদীমুখান্তঃ
সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ।
অমী শিরোভিস্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈঃ
ঊর্দ্ধং বিতন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥
১১ মাতঙ্গনক্রৈঃ সহসোৎপতদ্ভিঃ
ভিন্নান্ দ্বিধা পশ্য সমুদ্রফেনান্।
কপোলসংসর্পিতয়া য এষাং
ব্রজন্তি কর্ণক্ষণচামরত্বম্।
১৪ প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুম
আবর্ত্তযোগাদ্ ভ্রমতা ঘনেন
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ
প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ॥

এ সকল কবিতা উত্তম হইয়াছে। সমুদ্রের যেরূপ শোভা তাহা (২) শ্লোকে বলা হইয়াছে, অন্যান্য শ্লোকে তিমি নক্র প্রভৃতি ভীষণ জন্তুদের ক্রীড়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য প্রকাণ্ড ভীষণ বস্তু দেখিলে যে মনে কিরূপ আনন্দ ও কিরূপ উন্নত উদার ভাব সকল জন্মায় তাহা এ

* বায়রণের সহিত কালিদাসের সাদৃশ্য কতক আমরা দেখিয়াছি, এখানে অন্য কবির সহিত তুলনা না করিয়া বায়রণের সহিত করিলাম। কারণ বায়রণ কালিদাসের ন্যায় বর্ণনা বিষয়ে প্রায় অদ্বিতীয়। সেই জন্য উভয়ের বর্ণনা-শক্তির তুলনা করা আবশ্যক।

সকল শ্লোকে নাই—এখানে বায়রণের সমুদ্র বর্ণনার সহিত তুলনা করা যাক্—

(CHILDE HAROLD IV. CLXXV.)

* * * *

Yet once more let us look upon the sea ;
The midland ocean breaks on him and me,
And from the Alban mount we now behold
Our friend of youth, the Ocean. * *

178

There is a pleasure in the pathless wood,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep Sea, and music in its roar !
I love not Man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne'er express, yet cannot all conceal.

(এখানটী পাঠ করিলে আমরা যথার্থই বায়রণের আনন্দ অনুভব করি।) *

179

Roll on, thou deep and dark blue Ocean—roll !
Ten thousand fleets sweep over thee in vain ;
Man marks the earth with ruin,—his control
Stops with the shore ;—upon the watery plain
The wrecks are all thy deed, nor doth remain
A shadow of man's ravage, save his own,
When for a moment, like a drop of rain,
He sinks into thy depths with bubbling groan
Without a grave, unknelled, uncoffined and unknown.

181

The armaments which thunderstrike the walls
Of rock-built cities, bidding nations quake,
And monarchs tremble in their capitals,
The oak-leviathans, whose huge ribs make
Their clay creator the vain title take
Of lord of thee, and arbiter of war ;
These are thy toys, and, as the snowy flake,
They melt into thy yeast of waves, which mar
Alike the Armada's pride, or spoils of Trafalgar.

182

Thy shores are empires, changed in all save thee—
Assyria, Greece, Rome, Carthage, what are they ?
Thy waters washed them while they were free,

* আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে সংস্কৃত কবিদের মধ্যে এমন চমৎকার ভাব কোথাও নাই, কিন্তু ইহা কেবল সংস্কৃত কবিগণের মধ্যে নাই এমন নহে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি ব্যতিরেকে অন্য সময়ের কবিগণের মধ্যে আমরা পাইতে পারি না, এরূপ ভাব সকল আধুনিক, অতএব সংস্কৃত কবিদের নাই বলিয়া আমরা কখনই দোষারোপ করিতে পারিব না। আমরা এস্থলে অন্যান্য উদার ভাবের সহিত কালিদাসের বর্ণনার তুলনা করিতেছি।

And many a tyrant since; their shores obey
The stranger, slave, or savage; their decay
Has dried up realms to deserts:—not so thou,
Unchangeable save to thy wild waves' play—
Time writes no wrinkles on thy azure brow—
Such as creation's dawn beheld, thou rollest now.

183

Thou glorious mirror, where the Almighty's form
Glasses itself in tempests; in all time,
Calm or convulsed—in breeze, or gale, or storm,
Icing the pole, or in the torrid clime
Dark-heaving;—boundless, endless, and sublime—
The image of Eternity—the throne
Of the Invisible; even from out thy smile,
The monsters of the deep are made; each zone
Obeys thee; thou goest forth, dread, fathomless, alone.

এখানে দুই তিন স্থানে পাঠক কালিদাস হইতে উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখিবেন, কিন্তু সেই সাদৃশ্য মধ্যে কত প্রভেদ; ৫ম শ্লোকে সাদৃশ্য আরও অধিক, এ শ্লোকের সহিত বায়রণের 183 সংখ্যক পাঠ করা উচিত, কালিদাস সমুদ্রের মহিমা ও রূপ বিষ্ণুর ন্যায় অনবধারণীয় বলিতেছেন, বায়রণও সমুদ্রকে ঈশ্বরের ছায়া বলিতেছেন, এবং "তাং তাং অবস্থাং" বায়রণ কি ক্ষমতার সহিত লিখিয়াছেন! কালিদাস বলিতেছেন

"ঈদৃক্‌তয়া রূপনিরূপণীয়া" বা

বায়রণ বলিতেছেন "boundless, endless, and sublime"—এই বর্ণনা দ্বয়ের মধ্যে অন্যান্য ভাবেরও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বায়রণ কি অপূর্ব্ব মনোহর গভীর ভাব আনিয়াছেন তাহা কালিদাসে নাই। আমরা বিস্তর উদাহরণ এবং অন্যান্য কবিগ্রন্থ সকল উদ্ধৃত করিতে পারি, তাহাতে কেবল সময় নষ্ট করা হইবে, কারণ যাহা বলিয়াছি কেবল তাহা দৃঢ়ীভূত হইবে। কিন্তু আর একটী উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি। এবার উদার ভাবের কথা নহে কিন্তু তথাপি গভীরতা যথেষ্ট আছে।

অযোধ্যা বর্ণনা—১৬শ সর্গ রঘু—

কুশ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তুমি কে, কাহার স্ত্রী এবং আমার নিকট আসিবার প্রয়োজন কি?

৭। "বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং
মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্"

প্রশ্নের উত্তর দিয়া অযোধ্যার অধিদেবতা বলিতেছেন,

বন্ধৌকসাবাম্ অভিভূয় সাহং
সৌরাজ্যবন্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।
সমগ্রশক্তৌ ত্বয়ি সূর্য্যবংশ্যে
১০। সতি প্রপন্না করুণামবস্থাং॥
বিশীর্ণতালাট্টশতো নিবেশঃ
পর্য্যস্তশালঃ প্রভুনা বিনা মে।

বিড়ম্বয়ন্তাস্তনিমগ্নসূর্য্যং

১১। দিনান্তমুদ্গ্রানিলভিন্নমেঘম্॥

ইহার পর কালিদাস এবং সংস্কৃত কবিদিগের যেমন রীতি আছে, শিবাসঙ্কুল রাজপথ, রমণীশূন্য সোপান, বানর কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট উদ্যান-লতা প্রভৃতির বর্ণনা চলিল—কিন্তু এ সকল দেখিয়া মনে যে কিরূপ ভাব উদয় হয়, তাহার কোন উল্লেখ নাই। বায়রণ গ্রীশকেও এক রমণী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু উভয়ের প্রভেদ বিস্তর। কালিদাসে অযোধ্যা এক জীবিতা রমণী, বায়রণের গ্রীশ এক সদ্যোপরতা সুন্দরী, বায়রণ কেবল "বিভর্ষি চাকারমনির্বৃতানাং মৃণালিনী হৈমমিবোপরাগম্" এরূপ একটী উপমা দিয়া ক্ষান্ত হইবার কবি নহেন, ওরূপ রমণী দেখিতে হইলে পাঠকের মনে কি হইত, তাহা পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া পাঠককে সমদুঃখিত করেন।

GIAOUR.

He who hath bent him o'or the dead
Ere the first day of death is fled,
The first dark day of nothingness,
The last of danger and distress,
(Before Decay's effacing fingers,
Have swept the lines where beauty lingers,)
And mark'd the mild angelic air,
The rapture of repose that's there,
The fix'd yet tender traits that streak
The langour of the placid cheek,
And—but for that sad shrouded eye,
That fires not, wins not, weeps not, now,
And but for that chill, changeless brow,
Where cold obstruction's apathy
Appals the gazing mourner's heart,
As if to him it could impart
The doom he dreads, yet dwells upon;
Yes, but for these and these alone,
Some moments, aye, one treacherous hour,
He still might doubt the tyrant's power;
So fair, so calm, so softly seal'd,
The first, last look by death revealed!
Such is the aspect of this shore;
'Tis Greece, but living Greece no more!
So coldly sweet, so deadly fair,
We start, for soul is wanting there.

আমরা বায়রণের রোম-বর্ণন উদ্ধৃত করিতাম, কিন্তু তাদৃশ উন্নত গভীর ভাব না দিয়া কালিদাসের ন্যায় মৃদুভাব দিলাম, কত প্রভেদ! তথাপি এখানেও বিস্তর অনৈক্য। আমরা বলিয়াছি যে এক প্রকারের বস্তু উভয়ের মনে বিভিন্ন ভাব উৎপাদন করে, আমরা তাহার প্রমাণ দিলাম—এখানে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন কাহার ভাবের চমৎকারিত্ব অধিক—কে আমাদের অন্তঃকরণকে ভাবার্দ্র করিতে পারে। এই শেষোদ্ধৃত বর্ণনাদ্বয়ের আর একটী বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কালিদাসের বহির্জগৎ বর্ণনাতে বিশেষ ক্ষমতা ছিল, এই জন্য তাঁহার উপমা সকল সমস্তই বহির্জগৎ সম্বন্ধীয়, এখানে বায়রণের সহিত তুলনা করাতে তাহা সবিশেষ দেখা যাইতেছে—কালিদাস অযোধ্যার দেবীকে নীহারপীড়িতা মৃণালিনীর ন্যায় বলিতেছেন, কিন্তু বায়রণ সেরূপ উপমা দেন নাই—

গ্রীষ্মের অবসন্ন ভাব দেখিয়া ভাবুকের মনে যে সকল সূক্ষ্ম ভাব ক্রমশ উদিত হয়, বায়রণ তাহা আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত চিত্রিত করিয়াছেন—এ সকল সূক্ষ্ম ভাব * আমরা সংস্কৃত কবিদের মধ্যে পাইতে বৃথাই যত্নবান হইব।

পরিশেষে বলা কর্ত্তব্য যে নৈসর্গিক বস্তু অবলোকন করিলে হৃদয়ে যে নানাবিধ উদার ভাব উপস্থিত হয়, কালিদাস স্থানে স্থানে সে সকল ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন—যথা শকুন্তলে

যাতোকতোঽস্তশিখরং পতিরোষধীনাং
আবির্ভবত্যরুণপুরঃসর একতোঽর্কঃ।
তেজোদ্বয়স্য যুগপদ্ব্যসনোদয়াভ্যাং
লোকো নিয়ম্যত ইবাত্মদশান্তরেষু॥
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

এবঞ্চ

অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবং
ভজতে কৈব কথা শরীরিষু॥ ইত্যাদি

এরূপ শ্লোক সকল কালিদাসে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, কিন্তু কালিদাস যখন কোন বিরহী প্রেমিকের বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণের সূক্ষ্ম ভাব (pathos) সকল উত্তম রূপে দেখাইতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা অতিশয় প্রশংসনীয়—আমরা এখানে বাহুল্যভয়ে আর অধিক কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, কালিদাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে মেঘদূতে যক্ষপত্নীর বিরহ বর্ণনা এবং বিক্রমোর্ব্বশীর ৪র্থ অঙ্কে * পুরূরবার উন্মত্ততা—এই দুই স্থলে উভয়বিধ ভাব যথেষ্ট আছে—এবং বহির্জগৎ দেখিলে কাম-পরায়ণ জনের মনের যে অবস্থা হয়, তাহা অতি চমৎকার রূপে বর্ণিত হইয়াছে—বিশেষত পর্ব্বত, কানন, পশু, পক্ষী প্রভৃতি দর্শন করিয়া একজন কামান্ধ বিরহীর যেরূপ অবস্থা হয়, পুরূরবার যথার্থ সেইরূপ হইয়াছে—এমন বর্ণনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না—

শ্রীকালীপদ ঘোষ।

* এ প্রস্তাবে "ভাব" শব্দটী দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে sentiment এবং pathos পাঠক তাহা স্থান বিশেষে বুঝিতে পারিবেন—pathos শব্দের প্রকৃত বাঙ্গালা শব্দ না থাকায় অগত্যা "ভাব" শব্দ ব্যবহার করা গেল। এখানে ভাবের অর্থ pathos কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে উহার অর্থ sentiment পাঠক মহাশয় উপমা প্রভৃতির এবং ভাবের প্রভেদ স্মরণ রাখিবেন।

* আমরা দুঃখিত হইতেছি যে এ প্রস্তাবে বিক্রমোর্ব্বশীর কথা কিছু বলা হয় নাই—কারণ উহা আমাদের সীমার বহির্ভূত। আমরা কেবল প্রসঙ্গক্রমে কালিদাসের অন্যান্য গ্রন্থের কথা বলিয়াছি মাত্র।

ভট্টি।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশেষতঃ কেবল ভরতমল্লিকই যে ভর্তৃহরিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা বলিয়াছেন তাহাও নহে। রাজতরঙ্গ-প্রণেতা মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা বলেন "এই ভর্তৃহরি (বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ) কৃত অনেক কাব্যাদি শাস্ত্রের প্রচার অদ্যাবধি লোকেতে আছে।"* এক ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরি ব্যতীত অন্য কোন ভর্তৃহরিনামক কবি সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রের উন্নতি করেন নাই। সুতরাং রাজতরঙ্গ-প্রণেতার সময়ে, (১৮০২ খৃঃ অব্দে) লোকে ভর্তৃহরি নৃপতিকেই ভট্টিকাব্যের প্রণেতা জানিতেন, কিন্তু একথা সত্য নহে। ভট্টিকাব্য-প্রণেতাকে যে অনেকে ভর্তৃহরিনামক ব্যক্তি জানিতেন তাহা দেখাইবার জন্যই এ সকল মত গ্রহণ করিতেছি।

আমরা এ সম্বন্ধে আরো একটী প্রমাণ দিতে সমর্থ, যাহাতে প্রতীতি হইবে যে ভরতমল্লিকের পূর্ব্ববর্ত্তী বুধমণ্ডলীও ভট্টিকাব্য-প্রণেতাকে ভর্তৃহরি বলিয়া জানিতেন, যতদূর জানা যায় তাহাতে পুণ্ডরীকাক্ষ-কৃত "কলাপ-দীপিকা" নাম্নী ভট্টিকাব্যের টীকা ভরত মল্লিকের টীকার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। কেননা ভরত মল্লিক অনেক স্থলে পুণ্ডরীকাক্ষ-টীকা একেবারে উদ্ধৃত করিয়াছেন—ভরতমল্লিকের টীকা মুগ্ধবোধ-সম্মত গ্রন্থ হইলেও পুণ্ডরীকাক্ষের কাতন্ত্র-সম্মত গ্রন্থ হইতে মধ্যে মধ্যে কাতন্ত্রের মত উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা হস্ত-লিখিত কয়েক খানি প্রাচীন পুণ্ডরীকাক্ষের টীকা দেখিয়াছি, তাহার দুই একখানিতেও

"ভর্তৃহরির্নাম কবিঃ শ্রীরাম-
কথাশ্রয়ং মহাকাব্যং চকার।"

এই কথাটী লিখিত আছে; আবার কয়েক খানিতে এ কথা লিখিত হয় নাই। ইহাতে এই মাত্র উপলব্ধি হয় যে পুণ্ডরীকাক্ষ ঐ কথা লিখিয়া গিয়াছেন, লিপিকর-প্রমাদবশতঃ তাহা কোন কোন গ্রন্থে পতিত হইয়া গিয়াছে, এবং ইহাও হইতে পারে যে ভরতমল্লিকের গ্রন্থ হইতে পরে কেহ উহা

* রাজতরঙ্গ ৪৭ পৃষ্ঠা, রাজতরঙ্গ প্রায় ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়মস্থ পাঠশালার পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা (তর্কালঙ্কার !) কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়া প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়। শুনা যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিবর্দ্ধক মিসনারী সাহেবগণ ইহার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও অত্যাবশ্যক বিষয় সন্নিবেশিত আছে। এই মহা প্রয়োজনীয় গ্রন্থ লুপ্তপ্রায়, গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রিত হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষা এমন হতভাগিনী যে নিজের মূল্যবান্ সম্পত্তিও রক্ষা করিতে পারেন না, অথচ অন্যের নিকট ভিক্ষা করিতে পটু।

পুণ্ডরীকাক্ষের টীকায় যোজনা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমাদের নিকট পুণ্ডরীকাক্ষের উদ্ভাবিত মত বলিয়াই বিলক্ষণ বিশ্বাস হয়। এখন কথা এই—যদি পুণ্ডরীকাক্ষ উহা লিখিয়া থাকেন তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ভরতমল্লিকের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকেরাও ভর্তৃহরিনামক ব্যক্তিকে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা জানিতেন।

আমরা ইহা অপেক্ষাও একটী অমোঘ প্রমাণ দিতে পারি। 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামক প্রসিদ্ধ অভিধান-কর্ত্তা পুরুষোত্তম দেব, উক্ত গ্রন্থের ব্রহ্মবর্গে বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস ভবভূতি, ভারবি প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ভর্তৃহরির নামোল্লেখও আছে;——

"——————

হরির্ভর্তৃহরিঃ স্মৃতঃ।
রঘুকারঃ কালিদাসো
মেধারুদ্রশ্চ কোটিজিৎ॥
ভারবিঃ শতপুষ্পঃ স্যাদ্
ভবভূতিশ্চ বিশ্রুতঃ।"

মেদিনী-কোষ-প্রণেতা মেদিনীকর খৃঃ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন*। তিনি মেদিনীকোষে ত্রিকাণ্ডশেষের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।† সুতরাং ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতা পুরুষোত্তম খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বের লোক,* তাহা হইলে ভরতমল্লিকের অনেক পূর্ব্বেও লোকে ভর্তৃহরিনামক কবির নাম জানিতেন। পুরুষোত্তম যখন অন্যান্য ভারতীয় শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থকারদের নামের সহিত ভর্তৃহরির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তখন ইনি সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরি ব্যতীত আর কেহ নহেন; কেননা পুরুষোত্তম; কালিদাস, ভবভূতি, পাণিনি, চাণক্য প্রভৃতি ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর গ্রন্থকারদের কাহারও নামোল্লেখ করেন নাই; ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরি ব্যতীত যদি ঐ রূপ কোন উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার থাকিতেন তবে তিনি কখনই সাধারণে অপরিচিত থাকিতেন না। অতএব পুরুষোত্তম-উল্লিখিত ভর্তৃহরিই যে ভট্টিকাব্য-প্রণেতা তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আমরা দেখিতেছি, অধিকাংশ মহোদয়ই ভট্টিকাব্য-প্রণেতার নাম ভর্তৃহরি জানিতেন। আবার জয়মঙ্গল প্রভৃতি তাঁহাকে ভট্টি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি এই দুই ভিন্ন মতের কোন্ মতের কথা অধিক সারবান্ বলিব? অনেকে বলিয়া থাকেন, জয়মঙ্গল ভরতমল্লিক হইতে পূর্ব্ব-সাময়িক, সুতরাং তাঁহার মতই

* Preface to the Medini; by Som Nath Mokharji.

† মেদিনী-কোষের উপসংহার-শ্লোক দ্রষ্টব্য।

* পুরুষোত্তম সম্বন্ধে শীঘ্র একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা রহিল, এজন্য এস্থানে তৎসম্বন্ধে কিছু লিখিলাম না।

সমধিক সারবান্। এ কথায় আমাদের এই মাত্র বক্তব্য ; জয়মঙ্গল ভরতমল্লিক হইতে প্রাচীন লোক হইতে পারেন, কিন্তু পুরুষোত্তম হইতে কখনই প্রাচীন নহেন, অতএব আমরা পুরুষোত্তম ভরতমল্লিক প্রভৃতির কথাই অধিক প্রামাণ্য বলিব।

তবে কি জয়মঙ্গলের মত একেবারে অগ্রাহ্য হইবে? না, তাহাও নয় ; এস্থলে আমাদের একটী বক্তব্য আছে। পাঠক এই ক্ষুদ্র লেখকের নিকট ভুবনবিখ্যাত মোক্ষমূলর প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতদের ভাষা সমালোচনা এবং অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকারের পাণিনি-বিচারের ন্যায় সমালোচনা দেখিয়া হাসিবেন না।

একটুকু বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে অর্থের মিল না থাকিলেও ভর্তৃহরি শব্দের সংক্ষেপ "ভর্তৃ" হইয়া, পরে ভর্তৃ শব্দ অপভ্রংশ হইয়া ভট্টি বা ভত্তি রূপে পরিণত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা সংস্কৃত ও তদপভ্রংশ প্রাকৃতের শব্দ-সাদৃশ্য মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ কথায় একটুকুও আপত্তি করিতে পারেন না। আমাদের বিবেচনা হয়, তৎকালীন সাধারণ প্রাকৃত-ভাষীগণ ভর্তৃহরিকে সংক্ষেপ করিতে যাইয়া ভর্তৃ করিয়া ফেলাইয়াছিলেন এবং সর্ব্বসাধারণ-জনগণ ঐ "ভর্তৃ" নামকেই ভট্টি বলিয়া উচ্চারণ করিত আর এই সাধারণের উচ্চরিত নামই পরে দেশবিখ্যাত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয়, মহাত্মা ভর্তৃহরি তাঁহার কাব্যের কোন নামকরণ করেন নাই। স্থলে সাধারণ প্রচলিত নাম "ভট্টি" হইতে ভট্টিরকাব্য (ভর্তৃর কাব্য) এই অর্থে "ভট্টি-কাব্য" নাম হইয়া গিয়াছে। এবং এই সাধারণ-প্রচলিত নামই জয়মঙ্গল ও অন্যান্য গ্রন্থকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক জয়মঙ্গল বা ভরতমল্লিক প্রভৃতি কাহারই কোন রূপ প্রমাদ লক্ষিত হয় না—তাঁহাদের ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিতদের ভ্রম প্রমাদ হওয়া বা বিনা প্রমাণে কল্পনা করিয়া একটী অলীক কথা সৃষ্টি করা কখনই সম্ভাবিত নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভট্টি নামটি ভর্তৃহরির নামান্তর বলিতে হইবে। যেমন কৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে বিষ্ণু নাম প্রয়োগ করিলে কোন দোষ হয় না, সেই রূপ ভর্তৃহরি নামের পরিবর্ত্তে ভট্টি নাম লিখিলে দোষ নাই।—ভর্তৃহরি নাম হইতে ভর্তৃনাম উৎপন্ন হওয়া যে আশ্চর্য্য নহে তাহা এখনকার দৃষ্টান্ত দিয়াও দেখান যাইতে পারে। সকলেই জানেন এখনো সাধারণ লোক শ্রীনাথকে "ছিরু" শ্রীদামকে "ছিদাম" বিশালাক্ষীকে "বিশুনী" মাধবকে "মাধাই" বলিয়া থাকেন। এবং অপভ্রংশ নামই এত বিখ্যাত হইয়া পড়ে যে প্রকৃত নাম বলিলে সহসা কেহই বুঝিতে পারে না*—

* "ভট্টি" এই শব্দটী ভর্তৃহরির উপাধি বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কেননা ভট্ট শব্দের এক অর্থ পণ্ডিত। তাহার উত্তর অস্তার্থে ইন্ করিয়া নিপাতনে ভট্টি হইতে পারে এবং ভট্টির (ভট্টি উপাধি-

রাজতরঙ্গ এবং উল্লিখিত ষষ্ঠ মতানুসারে ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরিকে বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া প্রতীতি হয়। কিন্তু একথা আমাদের নিকট নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়; কেননা জয়মঙ্গলের টীকার সূচনা এবং সমাপ্তি-স্থলে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে জানা যায়, ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ব্রাহ্মণ ছিলেন, ও তাঁহার পিতার নাম শ্রীস্বামী। ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতা পুরুষোত্তম দেবও ভর্তৃহরিকে অন্যান্য ভুবনবিখ্যাত ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব মহাত্মাদের সহিত ব্রহ্মবর্গে—একাসনে স্থান দিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন। এ দিকে বিক্রমাদিত্যের অগ্রজ ভর্তৃহরি নৃপতি ইন্দ্রাত্মজ গন্ধর্ব্বসেনের পুত্র। যদিও তিনি ধারারাজাশ্রিত দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাচ ক্ষত্রিয় বলিয়া সাধারণের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু তিনি শাস্ত্রানুসারে আরও নিম্নতম জাতি হইবার পাত্র। সুতরাং ভট্টিকাব্য-প্রণেতা এবং নৃপতি ভর্তৃহরি কখনই অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন না।—এই জন্যই রাজতরঙ্গ-প্রণেতা এবং উল্লেখিত ষষ্ঠ মত-প্রচারক নাম-সাদৃশ্য দেখিয়া বিষম ভ্রমে পড়িয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভট্টিকাব্য-প্রণেতা নিজ পরিচয়-স্থলে বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীধরের পুত্র, নরেন্দ্র নৃপতির বলভী-পুরীতে ভট্টিকাব্য প্রণয়ন করেন। এই বলভী বা বল্লভী পুরী গুজরাটের অন্তর্গত কাট্টিয়ার প্রদেশে কাম্বে উপসাগর-কূলে অবস্থিতা।

বলভীপতি নরেন্দ্র কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। কাহারো মতে বল্লভী নামক নৃপতির নামানুসারে তদীয় রাজধানীর নাম বল্লভী হয়। গুজরাট দেশে বল্লভী সংবৎ নামে এক অব্দ প্রচলিত ছিল। সুবিখ্যাত কোষ-প্রণেতা জৈনেন্দ্র হেমচন্দ্র বা হেমাচার্য্যের আদেশে কুমারপাল নামক নৃপতি ৮৫০ বল্লভী সংবৎ মধ্যে সোমেশ্বরের ভগ্নপ্রায় মন্দিরের পুনঃসংস্কার করেন, একথা উক্ত মন্দিরের প্রস্তরফলকে লিখিত ছিল। রামদাস বাবু বলেন রাসমালার মতে হেমচন্দ্র ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন। কুমার পালের প্রায় ত্রিংশৎ (৩০) বৎসর বয়ঃক্রম কালে হেমচন্দ্র আপনাকে অতি প্রাচীন জানিয়া নির্ব্বাণ-কামনায় ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। যদি আনুমানিক ২৪ বর্ষ বয়ঃক্রমে (১১৬৮ খৃষ্টাব্দে) কুমারপাল হেমচন্দ্রের আদেশে মন্দিরের পুনঃসংস্কার করিয়া থাকেন তবে (১১৬৮—৮৫০ =) ৩১৮ খৃষ্টাব্দে বল্লভী সংবৎ আরম্ভ হয়, ইহা স্পষ্ট চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়; ইতিহাসপাঠে

ধাত্রীর) কাব্য এই অর্থে ভাট্টি-কাব্য হইতে পারে। কিন্তু এরূপ কল্পনা করা তাদৃশ সমীচীন বোধ হয় না। এবং ব্যাকরণগতও তত শুদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ ভাট্টিকাব্য-প্রণেতার সময়ে এত উপাধির বর্ষণ ছিল না।

জানা যায় যে গুপ্তোপাধিক একটী হিন্দু-রাজবংশ (সম্ভবতঃ যাঁহারা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কানাকুব্জে ছিলেন) ৩১৮ খৃষ্টাব্দে সুরাষ্ট্র এবং গুজরাট অধিপতি সাহা বংশীয় নৃপতিকে পরাজয় করিয়া বল্লভীতে দ্বিতীয় রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই গুপ্তবংশই বল্লভী রাজবংশ বলিয়া পরিচিত *। সুতরাং কুমারপালের মন্দির-সংস্কার করার সময় এবং গুপ্তবংশের গুজরাট-বিজয়ের সময়—এ উভয় পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যায়, বল্লভী সংবৎ ৩১৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়। সুতরাং যিনি প্রথম সাহা নৃপতিকে বিতাড়িত করিয়া ৩১৮ অব্দে বল্লভীতে রাজধানী স্থাপন করেন, তিনিই বল্লভী গুপ্ত। এই বল্লভীর বংশে কয়েকটী নৃপতি অতি পরাক্রমশালী হইয়া আর্য্যাবর্ত্ত এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে জয়-পতাকা উড্ডীন করেন। বল্লভী রাজবংশের ছয় জন নৃপতি মহারাজাধিরাজ (Lord paramount) উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইহার দ্বিতীয় নৃপতি সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত গুজরাট এবং সিংহল দ্বীপ অধিকার করেন। এই বল্লভী রাজবংশাবলী ৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তোরমান নৃপতি হইতে শেষ হয়। অতঃপর ৫২৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যরাজ নসিরবানের পুত্র বল্লভী-পুরী লুঠ করেন। কেহ বলেন, সম্ভবতঃ নসিরবানের আদেশে পারস্যদেশীয় সসেনীয়ান্ সৈন্য কর্ত্তৃক গুজরাট আক্রান্ত হয়। নসিরবান ৫৩১ হইতে ৫৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারস্যের অধিপতি ছিলেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বল্লভীপতি নরেন্দ্রগুপ্ত এই বল্লভীবংশীয় নৃপতি ছিলেন। তিনি যখন বল্লভীপুরীর রাজা, তখন তিনি যে বল্লভীগুপ্ত (৩১৮ খৃষ্টাব্দ) হইতে অনেক পরবর্ত্তী লোক, তাহা নিঃসন্দেহ। আবার তাঁহার আশ্রিত পণ্ডিত ভর্ত্তৃহরি (ভট্টি) মহাকবি কালিদাসের পূর্ব্ব-সাময়িক ছিলেন; সংস্কৃতগ্রন্থাবলীতে এ কথার সুন্দর আভাস পাওয়া যায়।

(ক) ভোজ-প্রবন্ধ-প্রণেতা, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতিকে ভোজরাজার সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভুক্কুণ্ড নামক চোর দ্বারায় ভোজরাজকে কি বলিতেছেন শুনুন—

ভট্টির্নষ্টো ভারবিশ্চাপি নষ্টো
ভিক্ষুর্নষ্টো ভীমসেনোঽপি নষ্টঃ।
ভুক্কুণ্ডস্যেদ্ ভূপতিশ্চাপি নষ্টঃ
অন্যাং পংক্তিং বেত্তকঃ সম্প্রবিষ্টঃ॥

সুতরাং ভোজপ্রবন্ধ-প্রণেতা জানিতেন কালিদাস * প্রভৃতি যখন বর্ত্তমান ছিলেন,

* ভারত-ইতিহাস-লেখক হণ্টার সাহেব কহেন—৩১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লভীগণ গুজরাটের গুপ্ত রাজবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু এই কথা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, কেননা ৩১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বল্লভী রাজবংশ বা বল্লভী নামে কোন পুরী ছিল না; বল্লভী সংবৎই এ কথা সপ্রমাণ করিতেছে। এ কথা লইয়া আরো অনেক বিচার করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম।

* অনেকে এই কালিদাসকে মহাকবি

তখন ভট্টি পার্থিব লীলা সংবরণ করিয়াছেন, গতিকেই তাঁহার মতে ভট্টি কালিদাস অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

(খ) আবার পুরুষোত্তম দেব কালিদাস প্রভৃতির পূর্ব্বে ভট্টির নাম স্থাপন করিয়া ভট্টিকে কালিদাস প্রভৃতি হইতে প্রাচীন বলিয়া আভাস দিতেছেন। কিন্তু এ যুক্তি ততদূর সমীচীন নহে।

(গ) পুনশ্চ; কাতন্ত্র-পরিশিষ্টকার শ্রীপতি যিনি প্রায় (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন) কোন সূত্রের উদাহরণ-স্থলে একটী শ্লোক প্রাচীন প্রয়োগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ শ্লোকটী ভট্টিকাব্যের দ্বিতীয় সর্গস্থ ৪২ সংখ্যক শ্লোক—

অজিগ্রহত্তং জনকোদযুক্তং
সেনাঙ্গিতৈকৈতাপুরং পিনাকী।
জিজ্ঞাসমানোবলমস্য বাহ্বো-
র্ঘনস্তত-স্ফীত্রযুনন্দনশ্চ ॥

শ্রীপতিদত্ত; মহাকবি কালিদাস, মাঘ, ভারবি, বাণভট্ট প্রভৃতি অনেকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ও তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু আর কাহাকেও প্রাচীন বলেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায়, শ্রীপতি ভট্টিকে কালিদাস হইতে অনেক প্রাচীন বলিয়া জানিতেন।

এই সকল কারণে আমাদেরও ভট্টি কাব্য-প্রণেতাকে কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং আমরাও ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরিকে কালিদাসের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব-সাময়িক বলিব *।

কালিদাস হইতে স্বতন্ত্র ও পরবর্ত্তী লোক বলিতে চাহেন; কিন্তু আমরা এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। যদি ভোজ-প্রবন্ধের কালিদাস, রঘুবংশ-প্রণেতা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইলেন, তবে ভোজপ্রবন্ধের ভবভূতি এবং দণ্ডীকে স্বতন্ত্র ভবভূতি এবং দণ্ডী বলা উচিত; কেননা মহাত্মা দণ্ডী ও ভবভূতি ভোজরাজ হইতে প্রায় ছয় শতাব্দীরও পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহাদিগকেই যখন ভোজপ্রবন্ধ-প্রণেতা কল্পনা-বলে ভোজরাজার সভায় আনিতে পারিলেন, তখন মহাকবি কালিদাসকে ভোজরাজার সভায় আনিবেন, তাহা একটুকু আশ্চর্য্য নহে। আমাদের বিবেচনায় ভোজপ্রবন্ধের কোন কথাতেই ঐতিহাসিক সত্য নাই। উহা কোন আধুনিক লোক প্রায় কল্পনাছলে প্রণয়ন করিয়াছেন।

* অনেকে এ কথায় আপত্তি করিবেন সন্দেহ নাই। কেন না কাহার কাহার সংস্কার আছে, ভট্টি মধ্যে মধ্যে কালিদাসের ভাব চুরি করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এ কথায় সমাদর করিতে সাহসী হইলাম না। কেন না এইরূপ অনিশ্চিত আনুমানিক কথায় ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবিষ্কার হইতে পারে না। কালিদাস অনেক পুরাণ হইতে উৎকৃষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিয়া নিজের অতুলন কাব্যকে আরো অত্যুজ্জ্বল করিয়াছেন। তিনি যে ভট্টি হইতে দুই একটী ভাব গ্রহণ করেন নাই; তাহাই বা কে জানে। যাঁহারা এইরূপ অনর্থক কথা লইয়া গোল করেন, তাঁহারা একজন কৃতবিদ্য লোক কি বলেন, শুনুন—"ইহাদের (পৌর্ব্বাপর্য্য-নির্ণয়কারীদের) নির্ণয়-প্রণালী অপূর্ব্ব। আজি

কালিদাস প্রভৃতি মহারাজ হর্ষবিক্রমাদিত্যের সভা-পণ্ডিত ছিলেন। হর্ষবিক্রমের (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর) পূর্ব্বে বল্লভীতে যে সকল নৃপতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই বল্লভী-রাজবংশ-সম্ভূত। আর যিনি এই বংশের শেষ নৃপতি, তিনি হর্ষবিক্রমের সমসাময়িক। সুতরাং নরেন্দ্র নৃপতিকে তোরমান গুপ্তের (৪৯৮ খৃষ্টাব্দের) অন্ততঃ এক শতাব্দীর পূর্ব্বের এবং বল্লভী গুপ্তের (৩১৮ অব্দের) পরের লোক বলিতে হয়। আর নরেন্দ্র নৃপতিকে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরার্দ্ধের লোক বলিতে হয়। আমরা বিশেষ আশঙ্কা না করিয়া ভর্ত্তৃহরিকেও খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর লোক বলিতেছি।

নরেন্দ্র নৃপতিকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিলাম না; কেননা সে সময় নবরত্ন-স্থাপয়িতা হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সময়। বল্লভী রাজবংশ মোটমাট ১৮০ বৎসর বল্লভী পুরীতে রাজত্ব করেন, ইহা হইতে যদি পঞ্চম শতাব্দীর ৯৮ বৎসর বাদ দিই, তবে আর ৮২ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। গড়পড়তা প্রতি রাজার রাজত্ব ২০ বৎসর ধরিলেও এই ৮২ বৎসরের মধ্যে চারিটীর অধিক নৃপতি হইতে পারেন না। যদি নরেন্দ্রকে বল্লভী-রাজবংশের তৃতীয় নৃপতি বলা যায়, তবে তিনি ৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে রাজা হন ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

নরেন্দ্র নৃপতিকে বল্লভী গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারি না, কেননা ইহার পূর্ব্বে বল্লভী পুরী নামই হয় নাই। নরেন্দ্র যখন বল্লভীর রাজা, তখন অবশ্য তিনি বল্লভী গুপ্তের উত্তরবর্ত্তী।

নরেন্দ্রকে তোরমাণ গুপ্তের পরবর্ত্তী বলা যায় না, কারণ তোরমানের পরে বল্লভীতে—

কীর্ত্তিরতো ভবতান্নৃপস্য তস্য।
ক্ষেমংকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্

এই শ্লোকার্দ্ধ-চরিতার্থক কোন নরেন্দ্র নৃপতি যে বল্লভীতে ছিলেন, ভারত-ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভর্ত্তৃহরি (ভট্টি) যখন হর্ষবিক্রমের (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর) পূর্ব্বের লোক, তখন নরেন্দ্র কোনক্রমেই তোরমানের পরবর্ত্তী নহেন।—যদি ভারত-ইতিহাসে কোনরূপ প্রমাদ না থাকে, তবে দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে, "ভট্টি" বা ভর্ত্তৃহরি নামক কবি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।

কালিদাসের মধ্যে ভবভূতির ভাবের একটী কবিতা পাইয়া একজন বলিলেন "কালিদাস ভবভূতির পর"; কালি আর একজন (যিনি আগে কালিদাস পড়িয়াছেন) বলিলেন "ভবভূতিই ও স্থলে কালিদাসের অনুবর্ত্তী"। কে সত্য কে মিথ্যা জানিবার কোন উপায় নাই, অথচ উভয়েই প্রাণ দিবেন সেও স্বীকার, মত ত্যাগ করিবেন না। যেমন কাব্যাদিতে তেমনি দর্শনেও। আজি গৌতম-সূত্রে বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ নিরাকরণ দেখিয়া বলিলাম গৌতম আগে, বুদ্ধ পরে; কাল হয় ত বৌদ্ধসূত্রে ন্যায় শাস্ত্রের পরমাণুবাদ নিরাকৃত দেখিব," ইত্যাদি (বঙ্গ দর্শন)—

ভট্টিকাব্য-প্রণেতা ভর্তৃহরি সম্বন্ধে আর অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই, সুতরাং সে চেষ্টা বৃথা। তবে তাঁহার কাব্যের উপসংহার-স্থলের কয়েকটী শ্লোক পাঠে জানা যায়, তিনি কিয়ৎ পরিমাণে আত্ম-গুণস্পর্দ্ধী ছিলেন। সে শ্লোক তিনটী এই—

ইদমধিগতমুক্তিমার্গচিত্রং
বিবুধিষতাং বদতাঞ্চ সন্নিবন্ধাৎ।
জনয়তি বিজয়ং সদা জনানাং
যুধি সুসমাহিতমৈশ্বরং যথাস্ত্রম্ ॥ ১
দীপতুল্যপ্রবন্ধোঽয়ং
শব্দলক্ষণচক্ষুষাম্।
হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং
ভবেদ্ ব্যাকরণাদৃতে ॥ ২
ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্য-
মুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্
বিদুষাং প্রীতয়ে ময়া

ইহার স্থূল অর্থ এই—(১) যেমন সুশৃঙ্খলতা নিবন্ধন যুদ্ধে সুশাণিত ঐশ্বরাস্ত্র—(পাশুপত) সদা বিজয় জন্মায়, সেইরূপ এই জ্ঞাতব্য এবং বচন-সোপান চিত্রিত মহাকাব্য বচন প্রবর্ত্তমান এবং বাক্যাভিলাষী ব্যক্তিদের সদা জয় জন্মায়। অর্থাৎ এই কাব্য জানা থাকিলে সুসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ জন্য ঠেকিতে হয় না।

(২) এই প্রবন্ধ শব্দ-লক্ষণ-পারদর্শিদের দীপতুল্য, কিন্তু ব্যাকরণ বিনা ইহা অন্ধদের হস্তামর্ষ স্বরূপ। অর্থাৎ শব্দলক্ষণ-পারদর্শিগণ ভট্টি পাঠ করিয়া প্রদীপ লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করার ন্যায় যে কোন জটিল সংস্কৃত বুঝিতে পারিবেন। আর ব্যাকরণ না জানা থাকিলে, অন্ধগণ যেরূপ হস্তস্থিত বস্তুর গুণ না বুঝিয়া ক্রোধ করেন, সেইরূপ ভট্টি হাতে লইয়া ইহার কিছু না বুঝিয়া ক্রোধ করিবেন।

(৩) পণ্ডিতগণেরও এই গ্রন্থ ব্যাখ্যান বিনা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। এই কাব্যে (ব্যাকরণানভিজ্ঞ) দুর্মেধাগণ আমাদ্বারা অনুগৃহীত হইবেন না, সুতরাং ইহা পণ্ডিতগণের জন্য—(বিরচিত।)

এই সকল উক্তিতে ভর্তৃহরির গর্ব্ব প্রকাশ পাইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার উক্তি অত্যুক্তি-দোষ-দূষিত নহে। তিনি তাঁহার গ্রন্থ সুকাব্য বলিয়া গর্ব্ব করেন নাই। তিনি যে গুণে ভট্টিকাব্য লইয়া গর্ব্ব করিয়াছেন, তাহার একটুকু মিথ্যা নহে, সুতরাং তাঁহার কথা প্রত্যেক অক্ষরে স্বীকার করি।

ভট্টিকাব্যের টীকাকারগণ।

আমরা এপর্য্যন্ত ভট্টিকাব্যের তিন খানি টীকা দেখিয়াছি।

(১) জয়মঙ্গল-কৃত "জয়মঙ্গলা" নাম্নী পাণিনি-সম্মত টীকা।

(২) পুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যাসাগরকৃত "কলাপদীপিকা" নাম্নী কাতন্ত্র-সম্মত টীকা।

(৩) ভরতমল্লিক-কৃত "মুগ্ধবোধিনী" নাম্নী মুগ্ধবোধ-সম্মত টীকা।

(জয়মঙ্গল)

ভট্টির টীকার মধ্যে জয়মঙ্গলের টীকাই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। জয়মঙ্গলের অপর দুই নাম জটেশ্বর (বা জটীশ্বর) এবং জয়দেব।—ইনি অনেক শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অনুকরণ করিয়া ভট্টি-টীকা প্রণয়ন করেন। এ কথা তৎকৃত ভট্টি-টীকার সমাপ্তি-স্থলে উল্লেখ আছে—

* * * * * জটীশ্বরো জয়দেবো
জয়মঙ্গল ইতি চ নামভিস্ত্রিভিঃ সুপ্রসিদ্ধস্য
অনেকশাস্ত্রব্যাখ্যানুকৃতৌ টীকায়াম্॥
ইত্যাদি।

(পুণ্ডরীকাক্ষ)

পুণ্ডরীকাক্ষের পিতার নাম ত্রিকাণ্ড পণ্ডিত। ইনি বিদ্যাসাগর উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার উপাধি অনুসারে ইঁহার টীকাও বিদ্যাসাগর নামে খ্যাত। ইনি কাতন্ত্র ব্যাকরণেরও এক উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। তথাহি—

নত্বা শঙ্করচরণং
জ্ঞাত্বা সকলং কলাপতন্ত্রঞ্চ।
দৃষ্ট্বা পাণিনিতন্ত্রং
বদতি শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষঃ॥ ১
* * * * *
কুলিবন্ধুতমস্তোম-
মপহন্তুমিতুং নয়া।
কলাপদীপিকা চক্রে
সৎপথালোকনায় চ॥
(পুণ্ডরীকাক্ষ)

পুনশ্চ—

ইতি মহামহোপাধ্যায়শ্রীত্রিকাণ্ড-
পণ্ডিতাত্মজ-শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ-বিদ্যাসাগর
কৃত-কলাপ-দীপিকাখ্যায়াং ভট্টিটীকায়াং
ইত্যাদি।

ভরতমল্লিক।

ভরতমল্লিক বৈদ্যবংশীয় সেন-কুলোদ্ভব ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শঙ্করসেন। এই ভরতসেনের অমর-কোষের টীকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদি আছে।

তথাহি—

নত্বা শঙ্করমন্বহঃ ●
গৌরাঙ্গমল্লিকাত্মজঃ।
ভট্টিটীকাং প্রকুরুতে
ভরতো মুগ্ধবোধিনীম্॥

পুনশ্চ—

কুলবিতরণবিদ্যাবৈভবাম্বষ্ঠগোষ্ঠী-
বরবরিহরখানখ্যাতবংশাম্বুধীন্দোঃ।
ভুবনবিদিতকীর্ত্তিঃ সেন-গৌরাঙ্গতো যো-
ঽজনি স ভরতসেনো ভট্টিটীকাং চকার॥
(ভরতঃ)

সারদামঙ্গল।*

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকের এই গ্রন্থখানি বঙ্গ-ভাষার একটি অমূল্য রত্ন—একপ সরস কল্পনার জ্যোৎস্নাময় কাব্য আমরা আর দেখিয়াছি কি না, কিম্বা অচিরাৎ আর দেখিতে পাইব কি না, সন্দেহ। আমরা স্বীকার করি যে, বঙ্গ সমাজের সকল স্থানেই ইহা সমাদৃত হইবে না, কারণ ইহাতে উপন্যাসের নাম গন্ধ নাই,—ইহাতে শব্দের আড়ম্বর নাই,—ইহাতে অপহৃত বিজাতীয় ভাব-সমূহের অবতারণা নাই,—"ভারত-মাতার" নিরবচ্ছিন্ন রোদন-ধ্বনি নাই।—সমস্ত কাব্য খানি পাঠ করিলে কেহ কেহ হয় ত বলিতে পারেন যে, কাব্যখানি এক-জন উন্মত্তের প্রলাপ-মাত্র. কিন্তু যদি কেহ ইহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত অবগাহন করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ইহা উন্ম-ত্তের প্রলাপ নহে, ইহা একজন উন্মত্তের মর্ম্মোচ্ছ্বাস,—প্রকৃত কবি-রূপ উন্মত্তের হৃদ-য়ের তরঙ্গ-ভঙ্গ!—ইহা যেন একজন প্রগাঢ় সারদা-ভক্তের কাতর দীর্ঘ শ্বাস—একজন সেবকের ধূপ ধুনার তরল ধূমরাশি! সেই ধূম-রাশির স্রোত-প্রবণতা বহির্দ্দিকে নয়,—অন্তর্দ্দিকে,—মর্ত্ত্যদিকে নয়,—স্বর্গের সীমন্ত-দিকে!

সংসার রূপ অনন্ত অনলকুণ্ডে একজন প্রকৃত কবির সমস্ত শান্তি সরস্বতী-বন্দ-নাতে, সমস্ত উল্লাস সরস্বতী সেবাতে, সমস্ত প্রমোদ সরস্বতী-ভাবনাতে। এই দুরন্ত মরুভূমির মধ্যে বন্দনাই তাঁহার বিনোদ নন্দন-কানন, এবং সরস্বতীই সেই কান-নের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।—কবিতার জ্যোৎস্না-ময় উচ্ছ্বাসে যখন তাঁহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে, এবং মরমের শিরায় শিরায় যখন সেই মোহময় তুফান প্রবাহিত হইতে থাকে, যখন নিজের ভাবেই কবির নয়ন-পল্লব নিমুদিত হইয়া আইসে এবং সমস্ত শরীর এক অপূর্ব্ব রসে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে,—সেই সুখের অবস্থা, সেই উন্মত্ত অবস্থা, সেই এক প্রকার "নির্ব্বাণ" অবস্থা, মর্ত্ত্যলোকে অমরের বাঞ্ছিত, পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ-স্বপ্ন—একজন প্রকৃত কবিকে এই অবস্থায় দেখিলে কে না ঊর্দ্ধকণ্ঠে সেই কবিকে এই রূপ অমৃতময় ভাষাতে সম্বোধন করেন—

"হে যোগেন্দ্র! যোগাসনে
ঢুলু ঢুলু দুনয়নে
বিভোর বিহ্বল প্রাণে কাহারে ধেয়াও!
কমলা ঠমকে হাসি,
ছড়ান্ রতন-রাশি,
অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে যাহা ফিরেও না চাও!

* শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী-বিরচিত। কলিকাতা, নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভাবে ভোলা খোলা প্রাণ—
ইন্দ্রাসনে তুচ্ছ-জ্ঞান—
হাসিলে পাগল বলে, পাগল সকলে ?"

যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস' না এ যোগী-জন তপোবন স্থলে !"

কিন্তু সেই সুখের দশা, সেই "বিচিত্র মত্ত দশা"-হারা হইলে,—সুমেরু-শিখরস্থিত কবির হৃদয় আঁধার পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে ধূলিসাৎ হইলে—কবিতার মোহময় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়া নীরস সংসারের কঠোরতায় আবার সে হৃদয় প্রতিহত হইলে, কবির চক্ষে সেই কল্পিত নন্দনকানন আবার বিকট শ্মশানাকারে পরিণত হইয়া পড়ে! তখন তাঁহার মনে আর উল্লাস থাকে না, সুখ থাকে না, শান্তি থাকে না,—সংসারের ভীষণ কল্লোল ক্রমাগতই তাঁহার শ্রবণে ধ্বনিত হইতে থাকে, সমাজের কুটিল তরঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমাগত তাঁহার আত্মাকে ছিন্ন বিছিন্ন করিতে থাকে, এবং পার্থিব ধন-মান রূপ আলেয়া-আলোতে ক্রমাগতই তিনি যাতনার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন।

প্রকৃত কবির মনের এই সকল বিচিত্রতা চিত্রিত করাই "সারদামঙ্গলের" উদ্দেশ্য! কিন্তু "উদ্দেশ্য" কথাটি আমরা নিতান্ত সঙ্কুচিত মনে ব্যবহার করিলাম। কারণ, "সারদামঙ্গলের" প্রকৃত উদ্দেশ্য কিছুই নাই—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহা কেবল একজন প্রকৃত কবির মর্ম্মোদ্‌গার ;—সংসার-পীড়িত প্রকৃত কবির হৃদয়ভেদী দীর্ঘ শ্বাস, এবং সময়ে-সময়ে সারদা-মিলিত প্রকৃত কবির হর্ষ তুফান! এই রূপে "সারদামঙ্গল" সঙ্গীতকার নিজের সহিত সরস্বতীর বিরহ, বিচ্ছেদ ও মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত ভাবই প্রেমের ভাবে সংরঞ্জিত!————কেন ? প্রেমের প্রহেলিকা বুঝিতে গেলে ইহা অগ্রেই বোঝা উচিত যে আরাধ্য বস্তুর দিকে প্রথমে আমরা ভক্তি ও ভয়ের সহিত আগুয়ান হই—তাহার পরে ভক্তি ও স্নেহ, তাহার পরে সখ্যতা, তাহার পরে প্রেম, এবং প্রেমের চরম উৎকর্ষ স্বরূপ অদ্বৈত ভাব! যখন শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন "সোঽহং ব্রহ্ম" তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন প্রেমের চরম উৎকর্ষ কি ? যখন রিকটর বলিয়াছিলেন যে "হে গ্রহনক্ষত্রগণ! তোমরা আমাকে তোমাদের সহিত সম্মিলিত করিয়া লও" তখন রিকটর বুঝিয়াছিলেন, প্রেমের চরম উৎকর্ষ কি,——যখন শেলী প্রকৃতির সুন্দর ভাবে বিমুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন "হে প্রকৃতি! আমাতে তোমাতে অভেদ আত্মা!" তখন শেলীই বুঝিতে পারিয়াছিলেন প্রেমের চরম উৎকর্ষ কি! কিন্তু এই চরম উৎকর্ষ লাভ করা যুগযুগান্তরের তপস্যার ফল—ইহা প্রকৃত ঘটনা অপেক্ষাও কল্পনার প্রভাত-স্বপ্ন-বিশেষ!

আমাদের "সারদামঙ্গল"-গায়ক কবি বি-

মল-কমল-বাসিনী-সারদা-প্রেমের সেই চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই বটে,—কিন্তু তাঁহার কাব্য পাঠ করিলে বিলক্ষণ বোধ হয় যে তিনি সারদাকে ভক্তি ও ভয় অথবা ভক্তি ও স্নেহ, অথবা সখা ভাবে আর দেখেন না,—তিনি সারদা-প্রেমে প্রেমিক, সারদা-প্রেমে মাতোয়ারা। এই উন্নত প্রেমের প্রভাবে সারদাকে তিনি নানা ভাবে দেখিতেছেন বটে, কিন্তু প্রধানতঃ প্রেমের ভাবেই তিনি মুগ্ধ——প্রেমের জ্যোৎস্নাতেই তিনি আলোকিত,—প্রেমের তরঙ্গেই তিনি তরঙ্গিত। সেই প্রেমের প্রভাবেই তিনি সারদাকে সংসার-মরুভূমির মানস-সরোবর—সংসার-সমুদ্রের ধ্রুবনক্ষত্র রূপে দেখিতেছেন। কিন্তু সেই সারদা কে?—এই মৃত্তিকাময় পৃথিবীতে কেমন করিয়া এবং কোথা হইতে তিনি অবতীর্ণ হইলেন?—সহৃদয় পাঠক, তাহা শ্রবণ কর——

অবনে অরুণোদয়,
তলে ফুলে ফুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুলু কুলু স্বনে;
নিরখি লোচনলোভা
পুলিন-বিপিন-শোভা
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।
শাখি-শাখে রসসুখে
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে
কতই সোহাগ করে বসি দুজনায়,
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত পাখা ধরণী লুটায়।
ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি দরশন
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায়;
সহসা ললাটভাগে
জ্যোতির্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নব ঘনে।
কিরণে কিরণময়,
বিচিত্র আলোকোদয়,
ত্রিভুবন রবি-ছবি, ভুবন উজলে।
চন্দ্র নয়, সূর্য্য নয়,
সমুজ্জ্বল শান্তিময়,
ঋষির ললাটে আজি না জানি কি জ্বলে!
কিরণ-মণ্ডলে বসি
জ্যোতির্ময়ী সুরূপসী
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে,
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হয়ে স্থির
মুগ্ধ নেত্রে বাল্মীকির মুখ পানে চেয়ে।
করে ইন্দ্রধনু-বালা,
গলায় তারার মালা,
সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলে, ঝলমলে কানন;
কর্ণে কিরণের দুল,
দোদুল্ চাঁচর চুল
উড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে ঢাকিয়ে আনন।
হাসিহাসি-শশী-মুখী,
কতই কতই সুখী।

মনের মধুর জ্যোতি উছলে নয়নে।
কভু হেসে ঢল ঢল,
কভু রোষে জ্বল জ্বল,
বিলোচন ছল ছল করে প্রতিক্ষণে।"

তাঁহাকে দেখিতে চাও ?——দেখ—

"রূপের ছটায় তুলি
শ্বেত শতদল তুলি
আদরে পরাতে যান সীমন্তে সবার,
তাঁরাও তাঁহারি মত
পদ্ম তুলি যুগপত
পরাতে আসেন সবে সীমন্তে তাঁহার।
অমনি স্বপন প্রায়
বিভ্রম ভাঙিয়া যায়,
চমকি আপন পানে চাহেন রূপসী ;
চমকে গগনে তারা,
ভূধরে নির্ঝর ধারা,
চমকে চরণ তলে মানস-সরসী।
কুবলয়-বনে বসি
নিকুঞ্জ-শারদশশী
ইতস্তত শত শত সুরসীমন্তিনী,
সঙ্গে সঙ্গে ভাসি যায়,
অনিমেষে দেখে তায়,
যোগাসনে যেন সব বিহ্বলা যোগিনী।
কিবে এক পরিমল
বহে বহে অবিরল !
শান্তিময়ী দিগঙ্গনা দেখেন উল্লাসে।
শূন্যে বাজে বীণা বাঁশী,
সৌদামিনী ধায় হাসি,
সংগীত অমৃত-রাশি উথলে বাতাসে।
তীরে ঘেরে, যোড় করে
অমর কিন্নর নরে
সম স্বরে স্তব করে, ভাসে অশ্রুজলে—
অমর কিন্নর নরে ভাসে অশ্রুজলে॥

সেই রূপরাশি ধ্যান করিতে করিতে, সেই স্বর্গীয় সুষমার ভাবে ভোর হইয়া, কবি সারদার চরণেই হৃদয় মন উৎসর্গ করিলেন। প্রেমে মুতোয়ারা কবি প্রেমের যোগাসনে বসিয়া, উথলিত সোহাগে উচ্ছ্বসিত হইয়া, সারদাকে সম্বোধন করিয়া গম্ভীর গদ গদ স্বরে বলিতেছেন—

তুমিই মনের তৃপ্তি,
তুমি নয়নের দীপ্তি,
তোমা-হারা হ'লে আমি প্রাণ-হারা হই ;
করুণা-কটাক্ষে তব
পাই প্রাণ অভিনব,
অভিনব শান্তিরসে মগ্ন হয়ে রই।
যে ক দিন আছে প্রাণ,
করিব তোমায় ধ্যান,
আনন্দে ত্যজিব তনু ও রাঙা চরণতলে॥
অদর্শন হ'লে তুমি,
ত্যজি লোকালয় ভূমি,
অভাগা বেড়াবে কেঁদে নিবিড় গহনে ;
হেরে মোরে তরু লতা
বিষাদে কবে না কথা,
বিষণ্ণ কুসুম কুল বন-ফুল-বনে—
'হা দেবী, হা দেবী,' বলি
গুঞ্জরি কাঁদিবে অলি ;
নীরবে হরিণীবালা ভাসিবে নয়নজলে॥
নির্ঝর ঝর্ঝর রবে
পবন পূরিয়ে রবে

আঘোষিবে সুরপুর কাননের করুণ ক্রন্দন-
হাহাকার,
তখন টলিবে হায় আসন তোমার,—
হায় রে তখন মনে পড়িবে তোমার !
হেরিবে কাননে আসি
অভাগার ভস্মরাশি,
অথবা হাড়ের মালা, বাতাসে ছড়ায় ;
করুণা জাগিবে মনে,
ধারা ববে দুনয়নে,
নীরবে দাঁড়ায়ে রবে, প্রতিমার প্রায় ।
ভেবে সে শোকের মুখ
বিদরে আমার বুক,
মরিতে পারিনে তাই আপনার হাতে ;
বেঁধে মারে, কত সয় !
জীবন যন্ত্রণাময়
ছারখার চুরমার বিনি বজ্রাঘাতে ।
অন্তরাত্মা জর জর,
জীর্ণারণ্য চরাচর,
কুসুমকানন-মন বিজন শ্মশান ;
কি করিব, কোথা যাব,
কোথা গেলে দেখা পাব,
হৃদি-কমল-বাসিনী কোথা রে আমার !
কোথা সে প্রাণের আলো,
পূর্ণিমা-চন্দ্রিমাজাল,
কোথা সেই সুধামাখা সহাস বয়ান !
কোথা গেল সঞ্জীবনী !
মণি-হারা মহা ফণি,
অহো সেই হৃদিরাজ্য কি ঘোর আঁধার !
তুমি তো পাষাণ নও,
দেখে কোন্ প্রাণে সও,
অয়ি সুপ্রসন্ন হও কাতর পাগলে !

ক্রমে সংসারের অত্যাচারে, সমাজের তাড়নায়, কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে কবি সারদা-হারা হইয়া, এই বলিয়া মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছেন—

কেমনে বা তোমা বিনে
দীর্ঘ দীর্ঘ রাত্র দিনে
সুদীর্ঘ জীবন-জ্বালা সব, অকাতরে,
কার আর মুখ চেয়ে
অবিশ্রাম যাব বেয়ে
ভাসায়ে তনুর তরী অকূল সাগরে !
কেন গো ধরণী রাণী
বিরস বদনখানি,
কেন গো বিষণ্ণ তুমি উদার আকাশ,
কেন প্রিয় তরু লতা
ডেকে নাহি কও কথা,
কেন রে হৃদয় কেন শ্মশান উদাস !
কোন সুখ নাহি মনে,
সব গেছে তার সনে ;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার !
বল কোন্ নন্দনে
লুকায়েছ সংগোপনে,
দেখিব কোথায় আছে সারদা আমার !

কিন্তু কবিবর বিশেষ অনুসন্ধানেও সারদাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না। তখন দারুণ বিরহে সন্তপ্ত হইয়া, মর্ম্ম যাতনায় উৎপীড়িত হইয়া, প্রেমের পরাধীনতায় আপনাকে নিতান্ত দুর্ব্বল ভাবিয়া কবি জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

কেনগো পরের করে

সুখের নির্ভর করে,
আপনা আপনি সুখী নহে কেন নর!
সদাশিব সদানন্দ,
সতী বিনে নিরানন্দ,
শ্মশানে ভ্রমেন্ ভোলা ক্ষেপা দিগম্বর।
হৃদয়-প্রতিমা লয়ে
থাকি থাকি সুখী হয়ে,
অধিক সুখের আশা নিরাশা শ্মশান;
ভক্তিভাবে সদা স্মরি,
মনে মনে পূজা করি,
জীবন-কুসুমাঞ্জলি পদে করি দান।

গভীর অপমানে, গভীর মর্ম্মবেদনায়, কবি অবশেষে নিতান্ত নাস্তিক ভাবে আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

তবে কি সকলি ভুল!
নাই কি প্রেমের মূল!
বিচিত্র গগন-ফুল কল্পনা লতায়?
মন কেন রসে ভাসে
প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুলহার?
শত শত নর নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি,
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি?
হেরে হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ যায়;
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি!
ফুটিলে প্রেমের ফুল
ঘুমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল;
সেই স্বর্গ-সুধা পানে
কত যে আনন্দ প্রাণে,
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল।

কিন্তু যখন কবি তাঁহার নরমের অন্তস্তল পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যখন স্বাতন্ত্রের বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং "যে যার সে তার"—রূপ ন্যায়শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত পরিধি অতিক্রম করিয়া নরমের সূক্ষ্ম শিরা পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তখন সহসা তাঁহার মনে এই অনৈসর্গিক সত্য প্রতিভাত হইল—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী;
এ এক নেশার ভুল,
অন্তরাত্মা নিদ্রাকুল,
স্বপনে বিচিত্র-রূপা দেবী যোগেশ্বরী।

তখন কবিবর প্রেমের সার্থকতা দেখিয়া, প্রেমের নেশায় উন্মত্ত হইয়া, বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়েও সারদাকে দেখিতে গেলেন—কিন্তু তখন তাঁহার সেই পদ্মবন-বিহারিণী সারদা, সেই উল্লাসিনী সারদা, সেই সঙ্গীত-মুগ্ধকারিণী সারদা আর সে সারদা নাই—কবি দেখিলেন, শারদীয় বিমল পূর্ণশশীকে আবার মেঘ আসিয়া ঢাকিয়া ফেলিয়াছে—দেখিলেন বাল্মীকি-তনয়া কি ভাবিয়া, কি চিন্তিয়া, অবসন্ন হৃদয়ে নলিনী-নয়নে অশ্রুপাত করিতেছেন—কাহার দুঃখে জানি না, কাহার বিরাগে জানি না, কি সঙ্কল্প করিয়া জানি না, সেই হাস্যময়ী সারদা আজ নলিনী-নয়নে অশ্রুপাত করিতেছেন। তাহা দেখিয়া

আর কবি থাকিতে পারিলেন না—তিনি সেই অবস্থায় সারদাকে দেখিবামাত্রই এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—

হায় ফের বিষাদিনী !
কে সাজালে উদাসিনী !
সম্বর এ মূর্ত্তি দেবী, সম্বর সম্বর !
বটে এ শ্মশান মাঝে
এলোকেশী কালী সাজে,
দানব-রুধির-রঙ্গে নাচে ভয়ঙ্কর !—
আবার নয়নে জল !
ওই সেই হলাহল,
ওরি তরে জীর্ণজরা জীবন আমার ;
গরজি গগন ভোরে
দাঁড়াও ত্রিশূল ধোরে !
সংহার-মূরতি অতি মধুর তোমার।
আমার এ বক্ষবুক,
ত্রিশূলেরো তীক্ষ্ণ মুখ,
দাও দাও বসাইয়ে এড়াই যন্ত্রণা !
সম্মুখে আরক্তমুখী,
মরণে পরম সুখী,
এ নহে প্রলয়-ধ্বনি, বাঁশরী-বাজনা।
অনন্ত নিদ্রার কোলে,
অনন্ত মোহের ভোলে
অনন্ত শয্যায় গিয়ে করিব শয়ন,
আর আমি কাঁদিব না,
আর আমি কাঁদাব না,
নীরবে মিলিয়ে যাবে সাধের স্বপন !
তপন-তর্পণ-জ্বাল
অসীম যন্ত্রণা-জাল,
প্রশান্ত অনন্ত ছায়া অনন্ত যামিনী ;
সে ছায়ে ঘুমাব সুখে,
বজ্র বাজিবে না বুকে,
নিস্তব্ধ মাটিকা ঘুমা, নীরব মেদিনী।
বাঁধ বুক, ত্যজ ভয়,
পুণ্য এ, পাতক নয় ;
খুনে আর পরিত্রাণে অনেক অন্তর।
ভালবাসা তারি ভাল,
সহে যারে চিরকাল ;
বাঁচুক্ বাঁচুক্ তারা হউক্ অমর !
হবে না হবে না আর,
হয়ে গেছে যা হবার,
ধোরো না ধোরো না, বৃথা রুধ না আমাকে !
এ পোড়া পিঞ্জর রাখি
উড়ুক পরাণ পাখী,
দেখুক দেখুক যদি আর কিছু থাকে !

কিন্তু সারদা আর ফিরিয়া দেখিলেন না, সেই গলদশ্রু লোচনেই তিনি কবির মানস চক্ষু হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন—তখন কবির কি অবস্থা হইল ?—তখন তিনি কি বলিয়া আপনার হৃদয়ের দুর্জ্জয় মর্ম্মযাতনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ?—

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে মরে,
মরু—মরু—মরুময় জীবন-লহরী ;
এ বিরস মরুভূমে
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল ;
কভু মরীচিকা মাঝে
বিচিত্র কুসুম রাজে,
উঃ ! কি বিষম বাজে যেই ভাঙে ভুল !

এত যে যন্ত্রণা জ্বালা,
অবমান অবহেলা,
তবু কেন প্রাণ টানে! কি করি, কি করি!
ভাবিতে পারিনে আর!
অন্ধকার—অন্ধকার—
ঝটিকার ঘূর্ণী ঘোরে মাথার ভিতর;
তরঙ্গিয়া রক্তরাশি
নাকে মুখে চকে আসি
বেগে যেন ভেঙে ফেলে; ধর ধর ধর;—
ধর, আত্মা, ধৈর্য্য ধর,
ছিছি একি কর কর,
মর যদি, মরা চাই মানুষের মত;
থাকি বা প্রিয়ার বুকে,
যাই বা মরণ-মুখে,
এ আমি, আমিই রব; দেখুক্ জগত।

এই সারদা-বিচ্ছেদে কাতর হইয়া, দাব-দগ্ধ হৃদয়ে, বিচূর্ণিত মরমে কবি সারদার অন্বেষণে দিগ্‌দিগন্তে উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হিমালয়ের কঠোর প্রদেশে আসিয়া পড়িলেন—সেখানে সারদার সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল,—কমলার সেই ত্যক্ত ভূমি—উদারতার সেই বিহার-ক্ষেত্র—ঔদাস্যের সেই রঙ্গস্থলে এবং সরস্বতীর সেই লীলা-কাননে সারদার সহিত তাঁহার সম্মিলন হইল—প্রকৃতির সেই অপ্রাকৃতিক মহান ব্যাপার তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল—হিমালয়কে দেখিয়াই তিনি মনের ভ্রম সংশোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

অসীম নীরদ নয়;
ও-ই গিরি হিমালয়!
উথলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি;
ব্যেপে দিগ্ দিগন্তর,
তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।
বিশ্ব যেন ফেলে পাছে
কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার!
কি এক মহান্ মূর্ত্তি,
কি এক মহান্ স্ফূর্ত্তি,
মহান্ উদার সৃষ্টি প্রকৃতি তোমার!
পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম,
তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র, নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা
ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন, যেন দেখিছে তাহারে।
কত শত অভ্যুদয়,
কতই বিলয় লয়,
চক্ষের উপর যেন ঘটে ক্ষণে ক্ষণে;
হরহর হরহর
সুর নর থরথর
প্রলয়-পিণাক-রাব বাজেনা শ্রবণে।
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে,
বুকে খেলা করে ধেয়ে
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত-অনল-ছবি
ধক্ ধক্ জ্বলে রবি,
কিরণ-জ্বলন-জ্বালা-মালা শোভে গলে।
কালের করাল হাসি

দলকে দামিনী রাশি,
কড়মড় দন্তে দন্তে ভীষণ ঘর্ষণ ;
ত্রিজগত ত্রাহি ত্রাহি ;
কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাহি ;
কে যোগেন্দ্র ব্যোমকেশ যোগে নিগমন !

এই ভয়াবহ ভীষণ স্থানে সারদার সঙ্গে কবির মিলন হইল—এই সেই স্থান, যেখানে বিভবের আড়ম্বর নাই, সুখ্যাতির সুরভি-নিঃশ্বাস নাই, পদমর্য্যাদার শূন্য আস্ফালন নাই—সেই খানে কবির সহিত সারদার সুখের মিলন হইল—এই সেই স্থান, যেখানে সংসারের কোলাহল নাই, সমাজের অত্যাচার নাই, গৃহস্থাশ্রমের মোহময় বন্ধনজ্বালা নাই, সেই খানে সারদার সহিত কবির আবার সুখের মিলন হইল—এবং ভগ্ন-হৃদয় কবি সেই বিজন বিকট স্থানে দিগন্ত-চমৎকারিণী সারদাকে সহসা দেখিয়া মনের অপ্রতিহত, অনিবার্য্য, অসংযত সোহাগ-বিলাস-ভরে বলিয়া উঠিলেন—

উদার—উদারতর
দাঁড়ায়ে শিখর-পর
এই যে হৃদয়-রাণী ত্রিদিব-সুষমা !
এ নিসর্গ-রঙ্গভূমি,
মনোরমা নটী তুমি,
শোভার সাগরে এক শোভা নিরুপমা !
আননে বচন নাই,
নয়নে পলক নাই,
কাণ নাই মন নাই আমার কথায় ;
মুখখানি হাস হাস,
আলুথালু বেশ বাস,
আলুথালু কেশপাশ বাতাসে লুটায়।
না জানি কি অভিনব
খুলিয়ে গিয়েছে ভব
আজি ও বিহ্বল মত্ত প্রফুল্ল নয়নে !
আদরিণী, পাগলিনী,
এ নহে শশি-যামিনী ;
ঘুমাইয়ে একাকিনী কি দেখ স্বপনে !
আহা কি ফুটিল হাসি !
বড় আমি ভালবাসি
ওই হাসিমুখখানি প্রেয়সী তোমার,
বিষাদের আবরণে
বিমুক্ত ও চন্দ্রাননে
দেখিবার আশা আর ছিল না আমার !
দরিদ্র ইন্দ্রত্ব লাভে
কতটুকু সুখ পাবে,
আমার সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার ;—
কবির সুখের সিন্ধু অনন্ত উদার !
ও বিধু-বদন-হাসি
গোলাপ-কুসুম-রাশি,
ফুটে আছে যে জনার নেশার নয়নে ;
সে যেন কি হয়ে যায়,
সে যেন কি নিধি পায়,
বিহ্বল পাগল প্রায়,
বেড়ায় কি বোকে বোকে আপনার মনে,
এস বোন, এস ভাই,
হেসেখেলে চ'লে যাই
আনন্দে আনন্দ করি আনন্দ কাননে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে !
হে প্রশান্ত গিরি-ভূমি,

জীবন জুড়ালে তুমি,
জীবন্ত করিয়ে মম জীবনের ধনে!
এমন আনন্দ আর নাই ত্রিভুবনে!
প্রিয়ে সঞ্জীবনী লতা,
কত যে পেয়েছি ব্যথা
হেরে সে বিষাদময়ী মূরতি তোমার!
হেরে কত দুঃস্বপন
পাগল হয়েছে মন,
কতই কেঁদেছি আমি কোরে হাহাকার!
আজি সে সকলি মম
মায়ার লহরী সম
আনন্দ সাগর মাঝে খেলিয়া বেড়ায়।
দাঁড়াও, হৃদয়েশ্বরী,
ত্রিভুবন আলো করি,
দুনয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়!
দেখিয়ে মেটে না সাধ,
কি জানি কি আছে স্বাদ,
কি জানি কি মাখা আছে ও শুভ আননে!
কি এক বিমল ভাতি,
প্রভাত করেছে রাতি;
হাসিছে অমরাবতী নয়ন-কিরণে!
এমন সাধের ধনে
প্রতিবাদী জনে জনে,
দয়া মায়া নাই মনে, কেমন কঠোর!
আদরে গেঁথেছে বালা
হৃদয়-কুসুম-মালা,
কৃপাণে কাটিবে কে রে সেই ফুলডোর!
পুনঃ কেন অশ্রুজল!
বহ তুমি অবিরল!
চরণ কমল আহা ধুয়াও দেবীর!
মানস-সরসী-কোলে
সোণার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর!
বিহঙ্গম! খুলে প্রাণ
ধর রে পঞ্চম তান!
সারদা-মঙ্গল গান গাও কুতূহলে!

আমরা বলিয়াছি ও আবার বলিতেছি যে, যে কোন পাঠক "সারদা-মঙ্গলের" উচ্চ আদর্শের প্রকৃত কবির লেখায় উন্মত্ত না হইয়া,—সেই মোহে মুগ্ধ না হইয়া, সেই নেশায় "মস্‌গুল্‌" না হইয়া, সেই ভাবে আত্মহারা না হইয়া, "সারদা মঙ্গল" পাঠ করিবেন, তিনি হয় ত হতাশ হৃদয়ে বিফল যত্ন হইয়া ফিরিয়া আসিবেন,—কিন্তু যদি কোন পাঠকের হৃদয়ের রক্তরাশি, কখন' সারদা ধ্যানে আবর্ত্তময় হইয়া এই লেখকের সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে, তরঙ্গিত হয়, সেই সুরের তানে তানে, সেই উচ্ছ্বাসের ঘূর্ণ তুফানে বিলোড়িত হয়, তাহা হইলে সেই পাঠকই বুঝিতে পারিবেন যে "সারদা-মঙ্গল" বঙ্গ-সাহিত্যের একটি অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ—বঙ্গদেশীয় কবিত্বের একটি অনন্ত সাক্ষী-স্বরূপ।

মালতী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তর মধ্যদিয়া বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া সুখময়ী নদী বক্র ভাবে বহিয়া যাইতেছে। তীরে লতাচ্ছাদিত একখানি কুটীর, কুটীরের দুই পার্শ্বে মালতী-লতাবেষ্টিত দুইটি ঝাউ গাছ, তাহার তলায় দুইজনে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; চতুর্থীর চাঁদ, নিরাশ হৃদয়ে ক্ষীণ আশার মত গগন প্রাঙ্গনে একটি ধারে মলিন জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিয়াও যেন করিতে পারিতেছে না; চঞ্চল নদীবক্ষ ঈষৎ উচ্ছল করিয়া, ফুটন্ত মালতী ফুলগুলি আরো ফুটাইয়া মালতীর মুখে সেই চাঁদ পড়িয়াছে। মালতী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা, মালতী জ্যোৎস্নাময়ী প্রতিমা—মালতী মৃদুহাসাময়ী কুসুমকলিকা। মালতী কথা কহিতে কহিতে একবার চাঁদের পানে চাহিয়া দেখিল, একবার জ্যোৎস্না-ধৌত সুখময়ীর তরঙ্গ-উচ্ছাস দেখিল, একবার সন্ধ্যাসমীর আন্দোলিত মালতীলতা হইতে কতকগুলি ফুল লইয়া দেখিতে দেখিতে হাসিয়া বলিল,

"দাদা, আর দশ দিন আছে মাত্র, তবুও আমার মনে হচ্চে দিন বুঝি আর ফুরাবে না।"

যুবকের হর্ষোৎফুল্ল মুখ এই কথায় আরো প্রফুল্ল হইল, ঈষৎ রক্তিম আভায় রঞ্জিত হইল, যুবক একটু হাসিতেই তাহার কথায় উত্তর করিলেন। মালতী গোলাপকলির মত রাঙা মুখ খানি নাড়িয়া হাসিয়া হাসিয়া আবার বলিল,

"দাদা, আমরা দু'জনে চিরকাল এই কুটীরটিতে আছি, শোভনা এলে আমাদের একটি লোক বাড়বে, তুমি যখন দিনের বেলা কাজে যাবে আমাকে আর একলা থাকতে হবে না।" যুবক হাসিয়া বলিলেন, "সেই জন্যই মালতী তোর বুঝি এত আহ্লাদ?"

মালতী ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল, "না, দাদা, আমি শোভনাকে কত ভাল বাসিয়াছি তুমি তা জান না।"

যু। "তাকে না দেখেই এত ভালবাসা কি করে হোলো? তোদের বুঝি স্বপ্নে স্বপ্নে এত ভাব হোয়ে গেল?"

মা। আমি নাই বা দেখলুম তোমার কাছে তার কথা শুনেশুনেই আমার ভালবাসা হয়েছে, তাকে দেখতে যে কি ব্যগ্র হয়েছি তা আর কি বলব। বিয়ের আগে, দাদা, একদিন তাকে দেখাবে না?"

যু। "সেতো এ গ্রামে নয়, যে দূরে যেতে হয়, তুই ছেলেমানুষ কষ্ট হবে যে—নইলে কি আর আমি তোকে তার কাছে নিয়ে যেতেম না? শোভনাও যে তোকে কতবার দেখতে চেয়েছে তার ঠিক নেই।"

মা। "তবে কি, দাদা, সেও আমাকে ভালবাসে?"

যুবকের উত্তর অপেক্ষা না করিয়াই পূর্ণ উচ্ছ্বাস ভরে বালিকা তখনি আবার বলিল, "আহা, দাদা, তোমার বিয়ে হবে, আমার যে কি আহ্লাদ হচ্ছে কি বলব। তুমি যখন না থাকবে, তাতে আমাতে আমার ঐ বাগানটিতে বেড়াব, তাকে কত সাজাব, তুমি এলে দেখে কতই খুসী হবে, দু'জনে কতই গল্প করব।"

যু। "তুই দেখছি এখন থেকেই মনে মনে সব কল্পনা করে রেখেছিস।"

সহসা গল্পের মধ্যে বালিকা মৌন হইয়া পড়িল, তাহার প্রফুল্ল মুখ খানি বিষাদে আচ্ছন্ন হইল, যুবার কথায় কাণ না দিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দাদা, আহা আজ যদি মা থাকিতেন, তাঁর এ বিয়েতে কত আহ্লাদই হোত।"

যুবাও যেন এই কথায় বিমর্ষ হইলেন, কি যেন ভাবিতে ভাবিতে আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন "তাই কি? তিনি থাকিলে কি এ বিবাহ হইত?"

বালিকা আশ্চর্য্য হইল, বালিকা কুতূহল হইয়া বলিল, "তিনি থাকিলে এ বিবাহ হইত না? কেন?"

যুবক নিস্তব্ধ, যুবক গম্ভীর, এ কথায় কোন উত্তর করিলেন না।

বালিকা আবার বলিল, "দাদা, মা থাকিলে এ বিবাহ হইত না কেন?"

যুবা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে স্থির-গম্ভীরভাবে বলিলেন, "মালতি, তুই এখন বড় হ'য়েছিস্ তোর এখন সকল কথা বুঝিবার ক্ষমতা হয়েছে, এতদিন ধরে তোর নিকট যে একটি কথা লুকিয়েছি, আজ তা' বলিব, মালতি তুই আমার সোদরা ভগিনী ন'স্।"

মালতী সোদরা ভগিনী নহে! মালতীর তবে সংসারে কেহই নাই? যুবাকে সে একমাত্র সংসার বন্ধন—একমাত্র ভাই—বলিয়া জানিত। যুবাও তাহার ভাই নহেন! মালতীর বুকে বজ্রের মতন কথাটি পড়িল। যুবা আবার বলিলেন, "মালতি, তুই মায়ের একজন সখীর মেয়ে। এক বৎসর বয়সে তোর বিধবা মা মরিলে আমার মা তোকে আপনার মেয়ের মত করিয়া রাখেন—তখন আমার বয়স সাত বৎসর, সেই জন্য সে সব কথা আমার বেশ মনে আছে। মায়ের ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে আমার বিবাহ দেন, তাতেই মনে হয় মা থাকিলে এ বিবাহ হইত কি না সন্দেহ।"

সব কথা গুলি মালতীর কাণে গেল না, সে চারি দিক যেন অন্ধকার দেখিল, কি একটি অসহ্য বেদনায় তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল—অথচ তাহার কারণ সে নিজেই বুঝিতে পারিল না।

যাহাকে অন্ধকার মধ্যে আলো বলিয়া জানিত—অন্য আপন কেহ না থাকা সত্ত্বেও যে ভাইটিকে পাইয়া তাহার আর অভাব মনে হইত না—যাহাকে সে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসে সে তাহার ভাই নয়। সে তাহার কেহই নয়। তাহার সহিত কোন সম্পর্কই নাই। সে ভাল বাসাতেও তাহার অধিকার নাই। এ সংসারে মালতী অনাথা বালিকা, রমেশের ন্যায্য স্নেহের সামগ্রী নহে, তাহাতে তাহার জোর নাই, তাহার কৃপা-ভাজন আশ্রিত মাত্র। হয়তো এই সকল কারণেই তাহার হৃদয় ব্যথিত হইল, কিন্তু এত কথা তাহার মনে আসে নাই; কেন যে তাহার কষ্ট, কষ্টের কথা রমেশ কি বলিলেন, সে তাহা বুঝিল না, অথচ অকারণে কি একটি মর্ম্মভেদী তীব্র-যাতনায় তাহার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে চতুর্থীর ক্ষীণচন্দ্র মেঘের কোলে লুকাইল, উদ্যান নদী পৃথিবী অন্ধকার করিয়া চন্দ্র নিভিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে চিরহাস্যময়ী মালতীর হৃদয় অন্ধকার করিয়া চন্দ্র আজ অস্তমিত হইল। শোক বিহ্বল চিত্তে অজ্ঞানের মত বালিকা কাঁদিতে লাগিল।

রমেশ যেন তাহার মনের ভাব বুঝিলেন। ব্যথিত হইয়া বলিলেন,

"মালতি কাঁদিস কেন? আমার সোদরা না হইলেও তুই আমার ভগিনী। আমি সোদর না হইয়াও তোর ভাই। কোন সম্পর্ক না থাকিলেও আমাদের এ অশৈশব স্নেহ কখনই ঘুচিবে না, ইহা হৃদয়ে বদ্ধমূল। তুই জানিস, মালতি, আমার আপন ভগিনী হইলেও তোকে ইহা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতে পারিতাম না। আমাদের এ ভালবাসা অকাট্য, বিশুদ্ধ স্বর্গীয়। ইহা দেবতারও লোভনীয়!"

মালতীর অশ্রুজল শুকাইল, মালতীর বিষাদময়ী মূর্ত্তি এই কথায় আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। যদি তাহাদের সেই ভালবাসাই রহিল, যদি মালতী তেমনি করিয়া হৃদয় পুরিয়া ভাল বাসিতেই অধিকারী হইল, তবে আর মালতী কি চায়? তাহার আর তবে কিসের দুঃখ।

দ্বিতীয়—পরিচ্ছেদ।

দুই তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে,—ঘটনারূপ পদচিহ্ন প্রত্যেক মানুষের জীবনে অঙ্কিত রাখিয়া, এই দুই তিন বৎসর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ রমেশের শয়ন কুটীরে প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া শোভনা পান সাজিতেছিল, রমেশ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় বসিয়া সংস্কৃত রত্নাবলী নাটক হইতে শোভনাকে পড়িয়া শুনাইতেছিলেন। রমেশ গঙ্গারাম বিদ্যারত্নের পুত্র, সেই জন্য সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। শোভনার পান সাজা হইল,

হাত ধুইয়া শোভনা হাতে মুখটী রাখিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রত্নাবলী শুনিতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে রমেশ বলিলেন, "শোভনা আজ মালতী কোথায়? সে যে এখনো রত্নাবলী শুনিতে এলো না?"

শোভনা ধীরে ধীরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বলিল, "আমি কি ডেকে আনব?"

রমেশ। "সে কোথায় ফুল তুলছে, কোথায় পাখীকে পড়াতে শেখাচ্ছে, কোথায় নদীর ধারে ছুড়ী কুড়াচ্ছে, তুমি তাকে কি করে খুজে পাবে? সে আপনি আসবে এখন।"

যুবা আবার পড়িতে লাগিলেন,

"হুল্লহজলঅণুরাও
লজ্জা গুরুই পরব্বসো অপ্পা।
পিঅসহি বিসমং পেম্মং
মরণং সরণং ণবরিঅমেক্কং॥"

পড়িয়া তাহার মানে বলিতে বলিতে শোভনার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন শোভনার পদ্মকোরক সদৃশ নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু শোভিতেছে। যুবা হাসিয়া বলিলেন, "শোভনে, এই কবিতাটি কি তোমার এতই মনে লাগিল, যে চোকে জল আসিল?"

শোভনা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "কি কবিতা?"

যুবক দেখিলেন শোভনা অন্যমনা, শোভনা চিন্তামগ্ন, শোভনা কবিতা শুনিয়া কাঁদে নাই। যুবার আর পড়া হইল না। বই খানি রাখিয়া শোভনাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "শোভনা তোমার সে আগেকার হাসি এখন কোথায়? বিবাহের আগে যখন তোমাদের বাড়ী যাইতাম, তখন তোমার মুখে যে হাসি দেখিতাম, যে একটি প্রফুল্লভাবে মুখখানি উৎফুল্ল দেখিতাম—আজ কাল তোমার সে ভাব নাই কেন? তোমাকে সর্ব্বদাই প্রায় বিষণ্ণ দেখি—জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাই না; শোভনে, আমাকে বিবাহ করিয়া কি অনুতাপ হইয়াছে?"

শোভনার নয়ন হইতে অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল—গদ গদ কণ্ঠে বলিল, "সর্ব্বস্ব ধন! তোমাকে বিবাহ করিয়া অনুতাপ! তোমার সহিত চিরজীবন নরকে থাকিলেও আমার অনুতাপ হইবে না—তোমার সহিত নরকবাসও আমার স্বর্গ—তোমাকে বিবাহ করিয়া অনুতাপ! কিন্তু—"

যু। "কিন্তু কি শোভনে বল? তোমার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমার কি ভয়ানক যাতনা হয়, তাহা যদি বুঝিতে—" শোভনার হৃদয়ে কথাটি প্রবেশ করিল, শোভনা ব্যথিত হইয়া বলিল "ভাই—আমার কি হইয়াছে জানি না, আমার মনে হয় আমাকে বিবাহ করিয়া তোমার অনুতাপ হইয়াছে।"

যু। "সে কি কথা শোভনা? আমার কি কার্য্যে, কি কথায়, কি ভাবে, আমি তোমাকে ও রকম মনে করিতে দিয়াছি শোভনে?"

শোভনা দুই হস্তে আঁচলের একটি কোন্ নখাগ্রে খুটিতে খুঁটিতে আনত মস্তকে

বাধ' বাধ' স্বরে বলিল, "নাথ. আমার কি গুণ আছে যে আমাকে বিবাহ করিয়া সুখী হইবে? আমার এমন রূপ নাই যে দেখিলেই ভালবাসা জন্মাইতে পারে, আমার এমন গুণ নাই যাহাতে রূপের অভাব সত্ত্বেও তোমার হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে পারে, আমার বিদ্যা নাই—যে আমার সহিত কথা কহিয়া তুমি সুখী হইবে; আমি মূর্খ, লেখা পড়ার কথায় তোমার সহিত যোগ দিতে পারি না, এমন বুদ্ধিও নাই যে শীঘ্র লেখা পড়া শিখিয়া তোমাকে সন্তুষ্ট করি, এক কথায়, আমা হইতে তোমার সকল রূপ অভাব পূরণ হইতে পারে না—এমন কি তুমি যে গান শুনিতে এত ভাল বাস, দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাও আমার আসে না, তবে কিসের জন্য তুমি আমাকে ভাল বাসিবে? রূপে গুণে বিদ্যা বুদ্ধিতে তোমার সমকক্ষ হওয়া দূরে থাক, কিছুতেই আমি তোমার পায়ের নিকটও পৌঁছিতে পারি না, আপন অযোগ্যতা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমি বুঝিতে পারিতেছি। আগে মনে করিতাম, রূপ গুণ নাই থাক আমার এ অসীম ভাল বাসার তো প্রতিদান আছে, কিন্তু এখন আর তাও মনে করিতে পারি না——"

রমেশ নিস্তব্ধে সকল শুনিলেন, শোভনার কথা শেষ হইলে একটু হাসিয়া বলিলেন, শোভনে কে বলে যে বিদ্যা বুদ্ধিতে তুমি আমার অসমযোগ্য। কজন পুরুষ আজ এ বিষয়ে তোমার মত বক্তৃতা করিতে পারিত! আর তোমার রূপের বিচারক? সে তুমি নও সেও আমি। ইহাই যদি তোমার কষ্টের কারণ হয় তো আশ্বাস দিতেছি তোমার কষ্ট অমূলক। না শোভনে ঠাট্টা নয়, কোন্ দেবী তোমা হইতে গুণবতী, তা তো আমি জানি না, আর তা হইলেও আমি কোন স্বর্গীয় দেবীর সহিতও তোমাকে বিনিময় করিতে প্রস্তুত নই—তুমি আমার হৃদয়, আমার রত্ন, আমার দেবতা—তুমি আমার কে নও আমি বলিতে পারি না—তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তোমাকে পাইয়া আমি সুখী নই শোভনে? তুমি আমার সুখের প্রতিমা।"

শোভনার আহ্লাদে কথা ফুটিল না। শোভনার তবে কি সকলি কল্পনামাত্র, সকলি ভ্রম? শোভনা স্বামীর চরণে মাথা লুকাইয়া বলিল, "আমি পাপী, নরকেও আমার স্থান হইবে না—তাই তোমার মত স্নেহময় স্বামীর প্রতি সন্দেহ করিয়াছি—আমার কিসে প্রায়শ্চিত্ত হইবে জানি না—কিন্তু আজ যখন মন খুলিতে বসিয়াছি, আজ মুক্তকণ্ঠে আমার হৃদয় খুলিব—আমি কি নরক যাতনা মৌনে সহ্য করিয়া আসিতেছি, আজ তাহা তোমাকেই খুলিয়া বলিব, যদি আমার অপরাধের মার্জ্জনা না থাকে তো তুমিই তাহার শাস্তি দাও, তোমার হাতেই আমার জীবন মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। নাথ, আমার হৃদয়ে দাবানল জ্বলিতেছে, তোমার মত, দেবতার মত স্বামী পাইয়াও আমার নিজের মনের গুণে আমি সুখী হইতে পারিলাম না—হৃদয়ধন, আমার মনে হয়

তুমি আর আমাকে ভালবাস না, তুমি মালতীকে—"শোভনার আর কথা ফুটিল না লজ্জায় অনুতাপে কণ্ঠে সে থামিল।

যুবা তাহার কথায় বিস্মিত হইলেন, তাহার সম্পূর্ণ মনের ভাব বুঝিলেন না, ধীরে ধীরে তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন "শোভনে, কি বলিলে! মালতীকে কি?"

শোভনা থামিয়া থামিয়া বলিল, "ভালবাস।"

যুবা বিস্মিত নেত্রে বলিলেন "মালতীকে ভালবাসি। ইহার মর্ম্ম? মালতী আমার ভগিনী না হইয়াও আমার ভগিনী—তাহাকে তো আমি ছেলে বেলা হইতে ভালবাসি।"

এই কথায় শোভনার আবার কথা কহিবার শক্তি হইল, দৃঢ়তার স্বরে বলিল, "এ আমি সে ভালবাসার কথা বলিতেছি না—আমা হইতেও ভালবাস, এ প্রেমের ভালবাসা।"

"প্রেমের ভালবাসা!" যুবা অবাক হইলেন, যুবা এতক্ষণে শোভনার মন বুঝিলেন, তাঁহার কণ্ঠের ভিতর একটু হাসিও আসিল, বলিলেন, "শোভনে, তাহা হইলে কি মালতীকে বিবাহ করিতাম না? তবে তোমাকে বিবাহ করিলাম কেন?"

শো। "যখন বিবাহ করিয়াছিলে তখন আপনার মন বোঝ নাই।"

যুবা। "তা যদি না বুঝিয়া থাকি তাহা হইলে এখনো বুঝি নাই—আমি তাহাকে বরাবর যেমন ভালবাসি, এখনো তাহা অপেক্ষা বেশী ভাল বাসি বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হই নাই; এ ভালবাসা বিশুদ্ধ ভগিনী স্নেহ, ইহা প্রণয়ের ভালবাসা নহে।"

শো। "প্রেম যখন অল্পে অল্পে হৃদয়কে অধিকার করে, তখন নিজেই তাহা বোঝা যায় না—তোমার হৃদয় তুমি যাহা না বোঝ—আমি তাহা বুঝিতে পারি।" এই স্থির সন্দেহে যুবার মনে বড় আঘাত লাগিল, কি করিয়া তাহা দূর করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন,

"আমার কি ব্যবহারে তোমার ঐরূপ ধারণা হইল।"

শো। "তোমার সকল কথায়, সকল ভাবে সকল ব্যবহারেই তোমার মনের ভাব প্রকাশ পায়। প্রেমে বাধা না পড়িলে অনেক সময় তাহা পূর্ণতা লাভ করে না; হয়তো ছেলেবেলা হইতে তোমার যে অঙ্কুর হইয়াছে, তাহা তুমি তখন প্রেম বলিয়া বোঝ নাই, তাই আমাকে ভালবাসিয়া ভ্রমে মনে করিয়াছ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, মালতীকেই তুমি ভালবাস।"

যুবা ঈষৎ বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "শোভনে, প্রেমে বাধা না পাইলে তাহা থাকে না—ইহা অনেকে বলে বটে, তুমিও বলিতেছ কিন্তু যদি মালতীকে ভালই বাসি, কি বাধা পাইয়া আজ তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে?"

শো। "আমাকে বিবাহ করিয়া। আমিই তোমাদের বাধা"। বলিতে বলিতে শোভনার আবার কণ্ঠে কথা বন্ধ হইল; যে যাতনা এতদিন হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়া-

ছিল, তাহা যেন উচ্ছলিত হইয়া নয়নে উথলিয়া উঠিল, কষ্টে অশ্রুজল সামলিয়া শোভনা আবার বলিল, "নাথ, আমিই তোমাদের বাধা। যখন বিবাহ হয় নাই, তখন মালতী ছাড়া তোমার আর কেহই ছিল না; মালতীকে লইয়া সারাদিন গল্প করিলে সোহাগ করিলে কেহই কাঁদিবার ছিল না। তখন অবাধে মন পুরিয়া তুমি তাহাকে স্নেহ করিতে পারিতে, মন পুরিয়া তাহাকে ভালবাসিতে পারিতে, তাহাতে তোমার সঙ্কুচিত হইবারও কোন কারণ ছিল না—সেই জন্য তখন সে ভালবাসা পাকে নাই, অন্তত: তাহা প্রেম বলিয়া বোঝ নাই। কিন্তু এখন সকল সময় ইচ্ছা হইলেও মালতীর সহিত মন খুলিয়া কথা কহিতে পার না, এখন অনিচ্ছা হইলেও আমার সহিত থাকিতে হয়, আমিই তোমার বালাসুখ ভাঙ্গিয়াছি, আমিই তোমাদের ভালবাসায় বাধা হইয়া তাহা প্রেম রূপে পরিণত করিয়াছি।"

শোভনার যুক্তি শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তাঁহার হাসি আসিল, হাসিয়া বলিলেন "তুমি শোভনা যে এক দিন কোন ন্যায় পঞ্চাননের সহিত তর্কে জয়ী হইবে, তাহাতে বড় সন্দেহ হইতেছে না, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়, তার পর? তোমার সকল যুক্তিই কি ফুরাইল? না আরো কিছু বাকি আছে?"

শোভনার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা পড়িল, কিন্তু দেখিতে দেখিতে তাহা মিলাইল, বিষাদ-গম্ভীর ভাবে শোভনা বলিল, "ভাই হাসিও না, যদি তুমি আমাকে বোঝাইতে পার যে ইহা প্রেম নয়, যদি আমি বিশ্বাস করিতে পারি তুমি আমারি, তাহা হইলে আর আমি কি চাই, তাহা হইলে আর আমার মত সুখী কে? আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিতেছে তাহা তুমি কি বুঝিবে? ঐ আমার তপ, জপ, ঐ আমার ধ্যান হইয়াছে, সমস্ত দিন রাত আমি ঐ ভাবিতেছি, ঐ লইয়া মনে মনে কখনো সন্দেহে কখনো বিশ্বাসে বিচলিত হইতেছি; আমার নিকট ইহার যুক্তির আর অভাব নাই। এক কথায় ঐ ভাবিয়া ভাবিয়া এখনো আমি পাগল হই নাই—এই আশ্চর্য্য।"

যু। "শোভনে, আমি আর শুনিতে পারি না, যাহাকে দেখিয়া আজও আমার আশ মেটে নাই, যাহাকে ভালবাসিয়া আমার এখনো তৃপ্তি হয় নাই, যাহাতে আমার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ, তাহার মুখ হইতে আর এরূপ অবিশ্বাস সহ্য হয় না, ইহা অপেক্ষা বজ্রেও আমার অধিক লাগিত না।"

তড়িতের মত কথাগুলি শোভনার বুকে বিঁধিল, স্বামীর চরণে ধরিয়া শোভনা বলিল, "নাথ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত করিব? আমি থাকিতে তোমার সুখ নাই। এ জঘন্য-ঘৃণিত মন থাকিতে কাহারো সুখ হইতে পারে না, আমাকে মরিতে দেও, আমি এ প্রাণ দিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।"

যুবা শোভনাকে এখনো হৃদয়ের কোথায় রাখিবেন খুঁজিয়া পাইতেন না, এখনো তাঁহার ভালবাসার উচ্ছ্বাস কিছুমাত্র

শমিত হয় নাই, শোভনার কথায় তাঁহার মন গলিয়া গেল, তিনি অশ্রুজল মুছিয়া বলিলেন, "না, শোভনা, যাহা বলিলাম উহাতে কিছু মনে করিও না, তীব্র কষ্টে উহা বাহির হইয়া গিয়াছে। তুমি হৃদয় খুলিয়া বলিয়াছ ভালই হইয়াছে, তাহাতে কষ্টের মধ্যেও আমি সুখ অনুভব করিতেছি। তোমার আরো যাহা মনে হইয়াছে সকল খুলিয়া বল, কিছু লুকাইও না।" শোভনা বলিল, "আজ যেকালে মন খুলিয়াছি, সেকালে কিছুই লুকাইব না, ইহাতে আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক তাহা অবাধে সহ্য করিব সঙ্কল্প করিয়াই আমি বলিতে বসিয়াছি, সকল শুনিয়া এ পাপীকে পরে চরণে স্থান দেও দিও, নহিলে মরিতে আমার ভয় নাই, কত শতবার দিনে নিশীথে আমি মৃত্যুকামনা করি, তাহা দেবতাই জানেন," বলিয়া শোভনা অশ্রুজল মুছিল, যুবা ব্যথিত-চিত্তে তাহার কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

আপনাকে শামলাইয়া লইয়া সোভনা আবার বলিল, "নতুন বিবাহের পর তুমি সন্ধ্যা-কালে বাড়ী আসিয়া আমাকে দেখিতে যেরূপ ব্যগ্র হইতে এখন আর সেরূপ দেখিতে পাইনা কেন? এখন তাহার পরিবর্ত্তে কাহাকে সন্ধ্যাকালে না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া পড়? আবার কাহাকে দেখিলে সেই বিষণ্ণ-মুখে স্বর্গীয় প্রফুল্লতার ভাব আসিয়া পড়ে? কত সময় তোমার সেই ছবি আঁকিবার জন্য আমার চিত্রকর হইবার ইচ্ছা হইয়াছে, কেন না তাহা হইলে তোমাকে তাহা আঁকিয়া দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু আঁকিতে পারি না পারি, তোমার সেই ছবি আমার মনে অঙ্কিত আছে। মালতীর সহিত গল্প করিতে করিতে কিরূপ ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়, তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। তোমার প্রতি কথায়, প্রতি ব্যবহারে, প্রত্যেক ভাবে, মালতীর প্রতি তোমার ভালবাসা আমাকে দেখাইয়া দেয়, আমাকে জীবন্তে পোড়াইতে থাকে। প্রতি পদে আমি বুঝিতে পারি, মালতী ও আমি তোমার নিকট কত ভিন্ন। আমার নিকট তোমার সেই মন-খোলা হর্ষের হাসি বিকাস পায় না, আমার নিকট তুমি আপন-হারা হও না, মালতী না থাকিলেই তুমি যেন মুমূর্ষু হইয়া পড়।"

যু। "মালতীকে দেখিলে যে আমার ভাল লাগে, মালতীকে যে আমি ভাল বাসি তাহা তোমার নিকট কখনই অস্বীকার করি নাই, এখনো করিব না, কিন্তু তুমি আপন কল্পনা দ্বারা স্নেহ হইতে তাহা যেরূপ উচ্চে উঠাইয়াছ, তাহার কিছুই তাহাতে নাই! তোমাকে কি বলিয়া বোঝাইব আমি কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না, যদি বিশ্বাস কর—"

স্বামীকে কথা শেষ করিতে না দিয়া শোভনা বলিল, "একটি কথা তোমাকে বলা হয় নাই, তাহাও লুকাইব না, মালতীর বিবাহের সম্বন্ধ হইল, তুমি তাহাতে গড়িমসি করিয়া এখনো তাহার

বিবাহ দিলে না, ইহাও আমার সন্দেহ বৃদ্ধির একটা কারণ হইয়াছিল।"

যুবা আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "সেকি! মালতী যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, সম্বন্ধের পরেই সে বিদেশে কার্য্যে গিয়াছে, দুই তিন বৎসর হইল, এখনো আসিল না, আসিলেই তাহাদের বিবাহ হইবে, মালতীর অমতে অন্যের সহিত আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা হইল না বলিয়া কি ইহাতেও তুমি প্রেম দেখিলে ঈর্ষাতে মানুষকে কি অন্ধই করে!"

শোভনা লজ্জিত হইল, আপনার ভ্রম যেন বুঝিল। যুবা আবার বলিলেন "শোভনা, তুমি ওরূপ ভাবিয়া আর নিজের অনর্থক অসুখের কারণ হইওনা, আমাকেও আর এরূপ আহত করিও না, বল আমি কি করিলে তোমার অবিশ্বাস দূর হইবে? যাহা করিতে বল এখনি করিব। পবিত্র ভালবাসার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমাকে বই আমি আর কাহাকেও জানি না। শোভনা, আমি মালতীকে ছাড়িয়া চিরকাল থাকিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমাকে না দেখিতে পাইলে আমার কষ্ট হয়। যতক্ষণ বাহিরে কাজের জন্য থাকিতে হয়, তখন কাহার কথা সমস্ত ক্ষণ মনে জাগিতে থাকে? কাহার জন্য ব্যাকুল ভাবে সমস্ত কাজ ভুলিয়া যাই? কাহার ছবি মনের নিভৃত কক্ষে ধ্যানে দেখিয়া আবার মনে বল পাই? শোভনা! শোভনা! তুমি আর আমাকে অবিশ্বাস করিয়া আঘাত দিওনা—শোভনা, আমার হৃদয় এরূপ নির্দ্দয় ভাবে আর ভাঙ্গিও না," মনের ব্যাকুলতায় যুবা তাহার চরণে হাত দিলেন। চমকিয়া শোভনা তাঁহার হাত উঠাইয়া বক্ষে রাখিল, পৃথিবী তাহার চক্ষে ঘুরিতে লাগিল, তাহার যেন সমস্ত স্বপ্নবৎ জ্ঞান হইল। শোভনা তাঁহার নিজের মত জগতে আর কাহাকেও সুখী দেখিল না, শোভনা বুঝিল তাহার ঘৃণিত কল্পনা-গুণেই বৃথা দোষে স্বামীকে দোষী করিয়াছে। শোভনার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। স্বামীর বুকে মুখ রাখিয়া শোভনা কাঁদিতে লাগিল, মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু মুখিতে সাহসী হইল না। যুবা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন, বুঝিলেন তাহার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে, আর ওরূপ ভাব মনে আসিবে না। সুখে অভিভূত হইয়া উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

এই সময় মালতী সহসা তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিল, হাসিয়া একটি গোলাপ ফুল যুবার হাতে দিয়া বলিল "দেখ দেখ আজ তোমার জন্য কেমন একটি নতুন জিনিস এনেছি—আমার সেই শুকনো গাছটিতে আজ নতুন এই ফুলটি ফুটেছে।"

সেই শোকাকুল গৃহ যেন মালতীর হর্ষোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইল। মালতীর অজ্ঞান-সরল-হর্ষের ভাবে যুবার চক্ষে এক বিন্দু জল আসিল। মালতী বালিকা জানে না, তাহাকে লইয়াই তাহার ভ্রাতার যত বিপদ, তাহাকে ভাল বাসিয়াছে বলিয়াই আজ রমেশ অসুখী, রমেশের শোভনা অসুখী, তাহার জন্যই

তাহাদের এত যাতনা।" বুঝা সেই সরলা বালিকার পানে চাহিয়া চাহিয়া হর্ষ-বিষাদ ভাবে একটু হাসিলেন, হাসিতে হাসিতে গোলাপটি লইয়া আঘ্রাণ করিলেন।

আবার আগুন জ্বলিল, শোভনা সেই হাসি দেখিল, সে আর আপন মনকে স্থির রাখিতে পারিল না। মানুষ আত্ম-বিরোধী অস্থিরচেতা। এই অল্পকাল পূর্ব্বে শোভনা ভাবিয়াছিল তাহার মনে আর ওরূপ সন্দেহ কখনো স্থান পাইবে না, কিন্তু কেন যে আবার তাহা আসিল সে নিজেই বুঝিল না। রমেশের অত কথায় যে ফল হইয়াছিল, রমেশের ঐ হাসিটুকুতে তাহা উবিয়া গেল। অমন প্রেমময়, অমন স্বপ্নময় হাসি রমেশের মুখে শোভনা আর কখনো দেখে নাই। রমেশ নিশ্চয়ই আপন মন বোঝেন না—নহিলে এ হাসি কি করিয়া হাসিলেন? কই, ইহাতো শোভনার কপালে আর ঘটে না; অমন মধুর সোহাগময় হাসি,—অমন প্রেমে বিজড়িত, আদরে সুমার্জ্জিত অনুরাগে সুরঞ্জিত হাসি ত শোভার কপালে কখনো ফুটে না। রমেশ শোভনাকে তবে কি এতক্ষণ ছলনা করিয়া ভুল বুঝাইলেন? না, তাহা নহে, রমেশ আপন মনের ভাব আপনিই বোঝেন না। রমেশ, সত্যই কি তুমি আর শোভনার নও? সত্যই কি তুমি তবে মালতীর? রমেশের সেই হাসি শোভনার মনে জাগিতে লাগিল, তাহার হৃদয়ে আবার বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ।

শকুন্তলা-সমালোচনার সমালোচনা।

দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল ভারতীদেবীর একটি অমূল্য রত্ন-দান বলিয়া তাঁহার ভক্ত-জনগণের নিকট প্রথিত আছে, আজ যদি কোন সমালোচক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাহার অকিঞ্চনতা ঘোষণা করেন—সার্ব্বলৌকিক মতের বিরুদ্ধে স্বমতের জয়-ঘোষণা করেন—তবে অবশ্য লোকের মনে এই এক সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, সমালোচক কালিদাসের কবিত্বের মর্ম্ম গ্রহণ করিতেই অশক্ত। ভারতীতে ঐ গ্রন্থের যে সমালোচনা চলিতেছে, তাহাতে তাহার লেখকের সম্বন্ধে আমাদের ঐরূপ ধ্রুব বিশ্বাস। আজকের কালের যেরূপ বিচিত্র

শিক্ষাপ্রণালী—কালিদাসের সমালোচনাটি ঠিক তাহারই উপযোগী হইয়াছে;—হৃদয়ের বক্তকে হৃদয় দিয়া বিচার কর, তা নয়—তেমন সুকুমার সামগ্রীর উপর অলঙ্কারশাস্ত্রের কঠোর দণ্ডবিধি প্রয়োগ! তাহাও আবার যথাযথ রূপে নয়—আপনার স্বকপোল-কল্পিত ভাষা-অনুসারে! অসম্পূর্ণ শিক্ষা একটি অতি ভয়ানক লোক—তিনি ছাত্রদিগের মস্তিষ্ক এবং হৃদয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া, উকিলের ন্যায় উভয়েরই যথা-সর্ব্বস্ব শোষণ করিয়া ছাড়িয়া দেন,—নিরীহ হৃদয় একেবারেই মুসড়িয়া যায়, মস্তিষ্ক সর্ব্বস্বান্ত হইলেও আপনার বড়ত্বের গর্ব্ব কিছুতেই ভুলিতে পারে না;—অদ্ভুত বলো, কিম্ভূত বলো, সৃষ্টিছাড়া বলো, এমন কোন বিস্ময়-জনক সামগ্রী জগতে নাই যাহা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের ন্যায় ঐ প্রকার শুষ্ক মস্তিষ্ক হইতে অনর্গলধারে বাহির হইতে না পারে। সমালোচক স্বচ্ছন্দে বলিতেছেন যে, কালিদাস মানব-প্রকৃতি কিছুই বুঝিতেন না!—কিন্তু, যাহা জগতের তিনি একজন অদ্বিতীয় মর্ম্ম-গ্রাহী ছিলেন! একটি গল্প আছে যে, জন-কতক জন্মান্ধ ব্যক্তি হস্তী কিরূপ তাহা জানিবার জন্য কেহ বা হস্তীর লাঙ্গুল কেহ বা পদ, যে যাহা সম্মুখে পাইল সে তাহা স্পর্শ দ্বারা নিরূপণ করিয়া একো একো ব্যক্তি একো একো সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। লাঙ্গুলধারী বলিল হস্তী একগাছি দড়ির মত, পদস্পর্শী বলিল হস্তী একটা স্তম্ভের মত, ইত্যাদি! আমরা নিম্নে প্রমাণ করিব যে বাহ্য-জগৎ পর্য্যন্তই সমালোচকের দৃষ্টির সীমা; কাজেই কালিদাসের কবিতাতে মানব-প্রকৃতিগত-সৌন্দর্য্য যতই থাকুক না কেন তাহা তাঁহার অধিকার-বহির্ভূত; হস্তীর লাঙ্গুলধারী অন্ধ ব্যক্তি যদি সেই লাঙ্গুলকেই হস্তীর সর্ব্বস্ব মনে করিতে পারিল, তবে একদিক্-দর্শী সমালোচক কালিদাসের একাংশকেই কালিদাসের সর্ব্বস্ব মনে করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি! আমরা যে কথা গুলি বলিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা ক্রমে প্রকাশ পাইবে।

প্রথমেই সমালোচক ভাষা এবং ভাব দুয়ের মধ্যে একটা ঘরাও বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, ইহাতে ভারতীদেবীর উপাসকেরা ভীত হইবেন না, এ বিষয়ে তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকুন যে, সেরূপ বিবাদ আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসম্ভব। সমালোচক বলিতেছেন "এখানে আমাদের পাঠকমহাশয়ের নিকট একটি অনুরোধ আছে——তিনি যেন ভাষার প্রতি মমতা শূন্য হইয়া আমাদের মতের বিচার করেন। সংস্কৃত ভাষার স্বভাবতঃ এমন একটি মোহিনী-শক্তি আছে যে, ভাবের চমৎকারিত্ব না থাকিলেও পাঠকের মনে শব্দ-মাধুরি দ্বারা কুহক লাগাইয়া দেয়——তখন তাঁহার ভাবের প্রতি লক্ষ্য থাকে না—ভাষাতে মুগ্ধ হইয়া মনে করেন ভাবও চমৎকার।" এ কথাটির প্রতিবাদ-কার্য্যে বেশি কাল-ক্ষেপ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই, তথাপি এবিষয়ের একটা মী-

মাংসা করিয়া রাখা ভাল বোধ করিতেছি; ভাব-শূন্য শব্দ-মাধুর্য্যে ভাষা-মাধুর্য্য হয় না, তাহা যদি হইত তবে অর্থ-শূন্য ভাব-শূন্য সেতারের বোল অতি সুন্দর ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত, ও জয়দেবের ভাষা কালিদাসের ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইত, কিন্তু বাস্তবিক কি তাই? নিম্নলিখিত দুইটি কবিতার কোন্‌টির ভাষা (সুমধুর শব্দ-বিন্যাস নহে কিন্তু ভাষা) ভাল?

"ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমল-
মলয়-সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিত-কোকিল-
কূজিত-কুঞ্জকুটীরে॥"
জয়দেব।

"সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহুৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।
স্ত্রীসংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাৎ
উৎক্ষিপ্যেনাং জ্যোতিরেকং তিরোঽভূৎ॥"
কালিদাস।

"স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ"—কি সুন্দর ভাষা—কি সুন্দর ভাব! জ্যোতির্ম্ময়ী স্ত্রী বলিলে কত যে ভাব-হানি হইত তাহা বলা যায় না; তাহা হইলে অলৌকিক একজন নারী বিদ্যুতের মত আসিয়া শকুন্তলাকে উঠাইয়া লইয়া গেল, ইহা অমনধারা ঠিকঠাক প্রকাশ পাইত না। শব্দ মনে কর যেন মৃত্তিকা, ভাষা মনে কর যেন মৃণ্মূর্ত্তি,—মৃত্তিকা এবং শব্দ উভয়কেই ভাবের সহায়তা ব্যতীত আয়োজন করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাবের সহায়তা ব্যতীত ভাষাও সুন্দর হইতে পারে না মৃণ্মূর্ত্তিও সুন্দর হইতে পারে না; মূর্ত্তি-নির্ম্মাতার ভাব ভাল হইলে তবেই তাঁহার নির্ম্মিত মূর্ত্তি ভাল হইতে পারে, নচেৎ তাহা কখনই ভাল হইতে পারে না—কিন্তু যদি মৃত্তিকাও ভাল হয় অর্থাৎ মসৃণ এবং পেশল হয় তবে সোনার উপর সোহাগা হয়; তেমনি লেখকের ভাব ভাল হইলে তবেই তাহার ভাষা ভাল হইতে পারে নচেৎ তাহা কখনই ভাল হইতে পারে না—কিন্তু তাহার উপর শব্দ-গুলিও যদি সুশ্রাব্য হয়, তবে ত তাহার কথাই নাই। মৃত্তিকা, ভাব এবং নির্ম্মাণ-শক্তি এই তিনের উৎকর্ষের উপর মৃণ্মূর্ত্তির উৎকর্ষ নির্ভর করে, তেমনি—শব্দ, ভাব এবং ভাবপ্রকাশের শক্তি এই তিনের উৎকর্ষের উপর ভাষার উৎকর্ষ নির্ভর করে; বরং মৃত্তিকার উৎকর্ষ না হইলেও চলে কিন্তু ভাব এবং নির্ম্মাণ-শক্তির উৎকর্ষ না হইলে মৃণ্মূর্ত্তির উৎকর্ষ কোন মতেই সম্ভবে না; তেমনি বরং শব্দের উৎকর্ষ না হইলেও চলে, কিন্তু ভাব এবং রচনাশক্তির উৎকর্ষ ভিন্ন ভাষার উৎকর্ষ কোন মতেই সম্ভবে না; অতএব সমালোচকের এটি মস্ত ভুল যে, ভাবের চমৎকারিত্ব না থাকিলেও ভাষার চমৎকারিত্ব হইতে পারে। কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ এবং ভাষা-রচনা দুয়ের মধ্যে এই একটু প্রভেদ দেখা যায় যে, ভাল মৃত্তিকা বাহির হইতে সংগ্রহ করিতে হয়, কিন্তু ভাল শব্দ স্মরণের পুঁজি হইতে আহরণ করিতে হয়—কল্পনার তেমন তেজ থাকিলে

ভাল ভাল, শব্দ কল্পনার তোড়ে আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত-স্থলে আমরা সামান্য একটি কবিতা-পংক্তি নিম্নে প্রদর্শন করিলাম,

টল টল করে জলমন্দ মন্দ বায়।

বঙ্গভাষায় টল টল শব্দ যদি না থাকিত তাহা হইলে, ঐ পংক্তিটির ভাব অন্য কোন প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে না পারিত এমন নয়—কিন্তু ওরূপ ভাল করিয়া কিম্বা উহা অপেক্ষা ভাল করিয়া উক্ত ভাবটি প্রকাশ করা লেখকের ক্ষমতা-সাপেক্ষ; লেখকের মনে ভাব না থাকিলে ওরূপ ভাব-প্রকাশোপযোগী শব্দগুলি কখনই স্ব স্ব স্থানে বসিতে পারিত না। ঐস্থানে যদি আর একজন লেখক এইরূপ পংক্তি রচনা করেন—

বিচলিত জলদল সুললিত বায়।

তাহা হইলে শব্দলালিত্য উভয়েরই ত সমান দেখা যাইতেছে, তবে কেন আমরা বলি যে, পূর্ব্বোক্তের ভাষা শেষোক্তের ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট? পূর্ব্বোক্তে জলের এবং বায়ুর ভাব উৎকৃষ্ট রূপে প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া কি নহে? তাহা যদি হয় তবে দাঁড়াইতেছে—ভাষাতে মুগ্ধ হওয়া এবং ভাষার ভাবে মুগ্ধ হওয়া একই কথা। বড় বড় কবিদিগের লেখনী হইতে ভাবের তোড়ে অনুপ্রাস-যুক্ত ভাল ভাল শব্দ-বিন্যাস আপনা আপনি বিনির্গত হইয়া পড়ে, যথা—

" How sweet the moonbeam sleeps
upon this bank"
সেক্‌স্‌পিয়র।

" In maiden-meditation fancy-free"
ঐ

sweet-শব্দ এবং sleep-শব্দ অনুপ্রাস-যুক্ত, তেমনি maiden-শব্দ এবং meditation-শব্দ, fancy-শব্দ এবং free-শব্দ। এরূপ শব্দালঙ্কার যেখানে দেখা যায় তাহা যে শুদ্ধ কেবল শব্দালঙ্কার মাত্র—তাহার মধ্যে ভাবের থাকিবার স্থান নাই, এই অলীক অতিবাদটি বিশ্বাস করিতে হইলে জয়দেবকে শুধু কেবল শব্দালঙ্কার পদবী দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে। জয়দেব অবশ্য আদিরস ভিন্ন আর কোন রসকেই গীতগোবিন্দের মধ্যে স্থান দান করেন নাই—সুতরাং তাঁহার কবিতাতে বীররসের ভাব নাই, করুণরসের ভাব নাই; কিন্তু তাহা বলিয়া জয়দেবের কবিতা ভাবশূন্য ললিত শব্দাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে, এরূপ কথা গীতগোবিন্দ-পঠন-ক্ষম শুকপক্ষীর মুখেই শোভা পায়; তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, জয়দেব কালিদাসের মতও কবি নন, ভবভূতির মতও কবি নন, তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি অনেক নিম্নশ্রেণীর কবি। সমালোচক সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষার শ্রুতিমাধুর্য্য এবং ভাবশূন্যতা প্রমাণ করিবার জন্য প্রথমেই নৈষধের (!) একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; নৈষধের ভাবশূন্য শব্দাড়ম্বর একটি দেশ-বিখ্যাত

বিষয়; যদি সাধারণতঃ সকল কাব্য নৈষধের মত হইত তবে নৈষধ ঐ দোষটির জন্য বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করিতেন না; নৈষধকে দিয়া সাধারণ কবিদিগের (এমন কি কালিদাস—যাঁহার কবিতার শব্দাড়ম্বর-শূন্য প্রসাদ মাধুর্য্য যে দেখে সেই মোহিত হয়—তাঁহার পর্য্যন্ত) অনুপ্রাস-বাহুল্য এবং শব্দাড়ম্বর প্রমাণ করিবার এই যে চেষ্টা ইহাতে লেখকের অভিসন্ধিতে দোষ পৌঁছিতেছে; তিনি যে ব্রতটি পালন করিতে মনস্থ করিয়াছেন—"Nothing extenuate nor set down aught in malice"—এখানে তাহা রক্ষা পাওয়া ভার। মনে কর একজন ইংরাজকে আমি এই বার্ত্তাটি জানাইলাম যে, সাধারণতঃ বাঙ্গালিরা মধ্যাহ্নে রুটি খায়, এবং তাহার দৃষ্টান্ত-স্থলে আমি এরূপ একজন বাঙ্গালির নাম উল্লেখ করিলাম যাহাকে সকলেই জানে যে, সে মধ্যাহ্নে রুটি খায়, তবে সেই অনভিজ্ঞ ইংরাজটির প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয়? মনে কর ইংরাজি-ভাষানভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে সাধারণতঃ ইংরাজি কাব্য কিরূপ? আমি Hudibras খুলিয়া তাহার গোটাকত পংক্তি অনুবাদ করিয়া তাহাকে শুনাইলাম, ইহাই বা কিরূপ আচরণ। [এই জন্য বলি—সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যের বিচারস্থলে নৈষধকে আনা ভাল কাজ নহে—তাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক-গণের প্রতি অন্যায়াচরণ করা হয়; ও স্থলে জয়দেবকে আনাও ভাল কাজ নহে; কেননা জয়দেবের দোষই থাকুক আর গুণই থাকুক তাহা জয়দেবেরই সাধারণতঃ সংস্কৃত-কাব্য—না সে দোষের ভাগী না সে গুণের ভাগী, তবে কেন সাধারণতঃ সংস্কৃত কাব্যের বিচারস্থলে জয়দেবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া দাঁড় করানো? আবার মাঘ হইতে যে কবিতাটি লেখক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা শব্দালঙ্কারের একটি সুন্দর আদর্শ বলিয়া গণ্য হইতে পারে; মাঘের কবি জানিয়া শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ কোন কোন স্থলে শব্দালঙ্কার ফলাইয়াছেন, অতএব প্রমাণ হইল যে, সংস্কৃত কাব্যের অধিকাংশ কেবল এক শব্দালঙ্কারেরই ব্যাপার! এরূপ যুক্তির সম্মোহন বাণ যাঁহাদের সহায় তাঁহাদের পক্ষে কালিদাসকে কেন—স্বয়ং বৃহস্পতিকে তুণজ্ঞান করা অতি সহজ ব্যাপার। সমালোচক প্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, সংস্কৃত কাব্যের অনেক স্থলে ভাষা ভাল কিন্তু ভাব ভাল নয়, এবং কেমন যে ভাষা ভাল তাহা দেখাইবার জন্য এরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহাতে ভাল ভাষার অসামান্য কোন চিহ্নই লক্ষিত হয় না, শুদ্ধ কেবল শব্দাড়ম্বরেরই বাহুল্য দৃষ্ট হয়; আশ্চর্য্য এই যে কালিদাসের গ্রন্থাবলীতে ভাল-ভাষার কবিতা এত রহিয়াছে যে তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কিছুমাত্র আয়াস পাইতে হয় না, কিন্তু সমালোচক তাঁহার রচিত একটি কবিতা-ও উদ্ধৃত করেন নাই—অথচ কালিদাসের

কবিতাই তাঁহার প্রকৃত সমালোচ্য বিষয়। ভাল ভাষা যে কাহাকে বলে তাহার দুটি নমুনা আমরা কালিদাসের মেঘদূত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

গচ্ছন্তীনাং রমণ-বসতিং
যোষিতাং তত্র নক্তম্
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে
সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনক-নিকষ-
স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো
মাস্মভূর্বিক্লবাস্তাঃ॥

সূচিভেদ্য অন্ধকারে* রুদ্ধ পথ ঘাট।
নিশীথে অভিসারিণী গণিবে বিভ্রাট॥
কষ্টি-শিলে যেইরূপ স্নিগ্ধ হেম-রেখা।
তেমনি বিদ্যুৎ দিবে পথ যাবে দেখা॥
ধারা-বরিষণ আর গরজন-স্বরে
মুখর হয়োনা যেন—একে ভয়ে মরে॥

মেঘদূত।

এখানে অভিসারিকার ব্যথার ব্যথিত্ব—যক্ষের চরিত্রের সহিত কেমন লাগিয়া গিয়াছে! যে পাঠক মানব-চরিত্র-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি বলিতে পারেন উহা সুরুচি-সঙ্গত হয় নাই; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, কণ্বমুনির পক্ষে উহা সুরুচি-সঙ্গত না হউক একজন যক্ষের মুখে উহা অতি সুন্দর মানাইয়াছে। মিল্‌টনের palpable darkness অপেক্ষা "সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ" আরো ভাল বসিয়াছে, "সৌদামিন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া" কি চমৎকার কবিভাষা! ভাব যদি ভাল না হইত, তবে ভাষা কি এরূপ ভাল হইতে পারিত? তেমনি আবার

জ্ঞাতং বংশে ভুবনবিদিতে
পুষ্করাবর্ত্তকানাং
জানামি ত্বাং প্রকৃতি-পুরুষং
কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বয়ি বিধিবশাৎ
দূরবন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে
নাধমে লব্ধকামা॥

ঐ

এখানে যক্ষ পাগলের মত হইয়াছে তথাপি স্বকার্য্য কেমন করিয়া উদ্ধার করিতে হয় সে বিষয়ে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে—আর একজন যে-সে কবি হইলে যক্ষকে বিচারশক্তি-বর্জ্জিতের মত করিয়া অভিনয় করাইত; সে মনে করিত যে পূর্ব্বে যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি—

"অচেতন-ভূতে সে চেতন করি মানে।
স্মরের প্রভাব এত বিরহীর প্রাণে॥"

এখন কেমন করিয়া তাহাকে দিয়া বলাই—

হে মেঘ-কুলের গর্ব্ব খ্যাত সর্ব্বভূমি।
জানিহাত—জানি আমি—বাসবের তুমি॥

* সূচিভেদ্য অন্ধকার, অর্থাৎ ছুঁচ-দিয়ে বুঝি বা বেঁধা যায় এমনি ঘন অন্ধকার।

বিধির বিপাকে হেতু পড়েছি সংকটে।
আনুকূল্য মাগি তাই তোমার নিকটে॥
মহতে যাচ্ঞা যদি নিরর্থক হয়।
সেও ভাল তথাপি অধমে কভু নয়॥

ইহাতে যক্ষের সচেতন ভাব বেস্ প্রকাশ পাইতেছে! কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, যে কারণে যক্ষ অচেতন মেঘকে সচেতন জ্ঞান করিল, সেই কারণেই সচেতন ব্যক্তির নিকট হইতে যেরূপ করিয়া কাজ আদায় করিতে হয় তদুপযোগী বাক্য ব্যবহার করিল। প্রেয়সীর নিকট সংবাদ পাঠাইবার জন্য যক্ষ এমনি খেপিয়া উঠিয়াছে যে, অচেতন মেঘকে সচেতন করিতেও তাহার কিছুমাত্র বাধে নাই; এবং তাহাকে যত কেন স্তব-স্তুতি করিতে হয়—সব স্বীকার, কিন্তু তাহাকে-দিয়া প্রেয়সীর নিকট সংবাদ পাঠাইতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হইবে না। মানব-প্রকৃতি-অনভিজ্ঞ নিকৃষ্ট কবি হদ্দমুদ্দ একটা পাগলের বর্ণনা করিতে পারে, কিন্তু রকম রকম পাগলের রকম রকম পাগলামি বর্ণনা করিতে পারে না; যক্ষ এবং পুরূরবা উভয়ে তেমন কোন নিকৃষ্ট কবির হাতে পড়িলে উভয়েরই পাগলামি একই রকম হইয়া দাঁড়াইত। সে যা' হো'ক্—"যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা"—কি সুন্দর ভাষা! সুন্দর ভাবের সহায়তা ব্যতীত কি ওরূপ সুন্দর ভাষা বাহির হইতে পারিত? শুদ্ধ কেবল শব্দ-বিন্যাসের পারিপাটো একটা অর্থশূন্য ভাব শূন্য বাহ্য-শোভন ভাষা খাড়া হইতে পারে, কিন্তু সে প্রকার নির্জীব ভাষা নির্ম্মাণ করা কাহাদের কার্য্য? তাহা—না পারস্যদেশীয় হাফেজের কার্য্য, না ইংলণ্ডদেশীয় সেক্স্-পিয়রের কার্য্য, না ভারতবর্ষীয় কালিদাসের কার্য্য; তাহা যাঁহাদের কার্য্য, তাঁহাদিগকে সকল দেশেই অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ইংরাজি নাম (Poetaster অর্থাৎ) উপর চাখা কবি; তাঁহারা প্রকৃত কবিদিগের ভাবগর্ভ সুন্দর শব্দ বিন্যাসের মধ্য হইতে শব্দ-বিন্যাসের সৌন্দর্য্য-টুকুই সার করিবার চেষ্টা পান—ভাব-সৌন্দর্য্যটি তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে আইসে না। বোধ হয় সমালোচক শব্দ বিন্যাসের পারিপাটাকে ভাবের উৎকর্ষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, জীবন-শূন্য ভাষাকে উৎকৃষ্ট ভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যদি হয় তবে সেরূপ ভাষার উৎকর্ষ না কালিদাসের সম্ভবে, না ব্যাসের সম্ভবে, না বাল্মীকির সম্ভবে—তবে যদি ক্রীড়াচ্ছলে কখন কখন সেরূপ ভাষা তাঁহাদের লেখনী হইতেও বাহির হইয়া থাকে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। প্রকৃত কথা এই যে, কালিদাস-প্রভৃতি মহাকবিদিগের ভাষার প্রকৃতিই স্বতন্ত্র, তাঁহাদের মনঃসম্ভূত ভাব-সকল এরূপ জীবন্ত যে, উদয়-মাত্রেই তাহারা সুন্দর ভাষা পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন হইয়া বাহির হয়—ভাষার জন্য তাহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হয় না; সকলেই অবগত আছেন যে, সেক্স্পিয়রের নাটকের পাণ্ডুলেখায় কখন কোন কাটাকুটি দেখা যায় নাই।

কবিতার হীনাবস্থায় সকল দেশেই ভাবের অনটন হয়—তখনকার সময়ের কবি-যশঃ প্রার্থীরা ভাবের অভাব বশতঃ প্রাচীন কবিদিগের অনুকরণে ধাবিত হন, কিন্তু ভাব অনুকরণের আয়ত্তাধীন নহে—সুতরাং পরিচ্ছদেরই আড়ম্বরে তাঁহাদের সমস্ত কবিত্ব ক্ষেপিত হয়।"

মিলটন্ ডান্টে প্রভৃতির নানা রঙের তাক্-পরিচ্ছদ-পরিধানা মাইকেল মধুসূদনের শব্দাড়ম্বরপূর্ণ কোড়া-তাড়া-লাগানো ভাষা অপেক্ষা কবি-কঙ্কণের টাট্‌কা টাট্‌কা হৃদয়-প্রসূত খাঁটি বাঙ্গলা-ভাষা যে কত উৎকৃষ্ট তাহা তুলনা করিয়া দেখিলেই জানা যাইতে পারে। মাইকেল মধুসূদন—অনুকরণের নিমিত্ত কবিকঙ্কণের "দেউটি" (প্রদীপ) "দেউল" (দেবালয়) প্রভৃতি কতকগুলি শ্রুতি-কোমল শব্দ অনুকরণ করিয়াছেন—এ ভিন্ন কবিকঙ্কণের গ্রন্থের অকৃত্রিম দেব-ভক্তি—দেবীর অকৃত্রিম ভক্তবৎসলতা—অকৃত্রিম স্নেহ—অকৃত্রিম প্রেম, অকৃত্রিম পিতৃভক্তি ইত্যাদির কোন একটিরও অনুকরণে সমর্থ হন নাই। তিনি "হায়" "কি আর বলিব" "হায়রে যেমতি" "মরি" "দানিনু" (দিনু) "কুলনিল" (কুলিল) প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ-যোজনা এবং পয়ার-ছন্দের মানান্-সই এক প্রকার স্বৈর-গতি সম্পাদন দ্বারা ভাবের অপ্রতুলতা ঢাকা দিতে সমূহ চেষ্টা পাইয়াছেন—এমন কি অনভিজ্ঞ জনেরা তাঁহাকে জানেন যে তিনি পৃথিবীর মহা-কবিদিগের মধ্যে এক জন; আবার এমনও ব্যক্তি আছে যিনি এ কথাও মুখে আনিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হন নাই যে, মাইকেল মধুসূদন মিলটনের মত অতদূর উচ্চ কবি

এই ত গেল সংস্কৃত ভাষার বিচার; ইহার পর আনিতেছে "অভিজ্ঞানশকুন্তল যে, অলৌকিক পদার্থ এবং মনুষ্যের ক্ষমতায় যে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রচনা সম্ভবিতে পারে না এরূপ আমরা স্বীকার করি না;"—এরূপ আমরাও স্বীকার করি না, কারণ আমরা ভবিষ্যদ্বক্তা নহি, ভবিষ্যতে কালিদাসের সমান বা তাঁহা-অপেক্ষা উচ্চতর কবি জন্মিবে কি না তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ; কিন্তু এ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্কে বলিতে পারি যে, সেক্‌স্‌পিয়র ভিন্ন কালিদাসের সমকক্ষ কবি অদ্যাপি পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে নাই; ইহা যদি নিশ্চয় জানিতাম যে, অনন্ত ভবিষ্যৎকালের কোন কালে মর্ত্য জীবের পক্ষে উঁহাদের মত কবি হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তবে তাঁহাদিগকে অলৌকিক বলিতে সাহসী হইতাম,—আমাদের জ্ঞানের যতটুকু দৌড় তাহাতে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, উভয়ই অদ্ভুত-পূর্ব্ব অদ্বিতীয় কবি। কিন্তু সমালোচক বলেন যে, "দুর্ব্বাসার শাপ, অঙ্গুরীয় দর্শন, মারীচাশ্রমে রাজার সহিত

ত নহেনই, কিন্তু কালিদাসকে তিনি যে পরাস্ত করিয়াছেন ইহাতে আর লেশমাত্রও সংশয় নাই,—কে এমন সাহসী পুরুষ যিনি এরূপ কথা অকুতোভয়ে বলেন? আর কে—মাইকেল মধুসূদন স্বয়ং! এ বোধ নাই যে, বিবেচনা করিয়া দেখিলে কালিদাস বড় কি মিলটন বড় তাহাই সন্দেহ স্থল।

শকুন্তলার মিলন প্রভৃতি মহাভারতে নাই, কালিদাস এ সকল ঘটনা মূল উপাখ্যানে সংযোজন করিয়াছেন, এরূপ করাতে নাটক অতি মনোহর হইয়াছে বটে, কিন্তু (!) * * * * যদি কালিদাস ইহা অপেক্ষা আখ্যায়িকা আরো চমৎকারিণী করিতে না পারিলেন তাহা হইলে তিনি উচ্চ শ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না।" এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, মূল উপাখ্যান এরূপ সংক্ষিপ্ত পদার্থ যে, তাহা আর কোন কবির হস্তে পড়িলে তিন-অঙ্কের নাটক বাহির হওয়াও দুর্ঘট হইত, ভাগ্যে তাহা কালিদাসের হস্তে পড়িয়াছে, তাই সাত অঙ্কে পরিণত হইতে পারিয়াছে; বড় বড় নাট্য-লেখক প্রায়ই নাটকের আখ্যায়িকাংশটি বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং তাহাকে আবশ্যকমতে রূপান্তরিত করিয়া ও তাহার ভিতরে আপনাদের কবিতা-রস-মাধুর্য্য নিঃশ্বসিত করিয়া তাহাতে নূতন এক প্রাণ সঞ্চার করেন। সেক্সপিয়রের আখ্যায়িকাংশ সেক্স্‌পিয়রের নিজের নহে, কালিদাসের আখ্যায়িকাংশ কালিদাসের নিজের নহে,—কি তবে তাঁহাদের নিজের? না সেই আখ্যায়িকাতে নূতন জীবন সঞ্চার করা। উপন্যাসেরই আখ্যায়িকাংশ সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ, কিন্তু নাটকের প্রধান অঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাব-মাধুর্য্য বা ভাব-মাহাত্ম্য অবিতথ-রূপে প্রদর্শন করা। এজন্য কালিদাস এবং সেক্স্‌পিয়র উভয়ই মূল-উপাখ্যানকে গড়িয়া পিটিয়া মানব-প্রকৃতির বিশেষ কোন কোন ভাব-সৌন্দর্য্য প্রকাশের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের রচিত নাটক-সকল স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে যে, আখ্যায়িকার বিশেষ এমন কোন গুণ নাই যাহা নাটকে কবিতা-সৌন্দর্য্য দিয়া-দিতে পারে। ওথেলোর আখ্যায়িকাংশটি অতি যৎসামান্য,—ডেস্‌ডেমোনার সহিত ওথেলোর বিবাহ, উভয়ের বিদেশ যাত্রা, আইয়াগোর পাকচক্র, ওথেলোর ঈর্ষা, স্ত্রীহত্যা এবং আত্মহত্যা,—বস্; শকুন্তলার আখ্যায়িকাংশও ঐরূপ, উভয়ের কোনটিই সর্‌ওয়ালটর্ স্কটের আইবান্‌হো উপন্যাসের ন্যায় নানাবিধ শাখা-উপশাখায় পরিকীর্ণ নহে—তাই বলিয়া কি কবিত্ব-অংশে সেক্স্‌পিয়র বা কালিদাসকে স্কট্ অপেক্ষা অপকৃষ্ট বলিতে হইবে? কালিদাস কিংবা সেক্স্‌পিয়রের আখ্যায়িকা সর্ ওয়াল্‌টর স্কটের মত চমৎকারিণী নহে বলিয়া তাঁহাদের কবিতা-মাধুর্য্যের—কি-তাহাতে ব্যতিক্রম হইতেছে? অতএব কালিদাসের আখ্যায়িকা আপনা অপেক্ষা আরো চমৎকারিণী হইয়া কাজ নাই—যেমনটি আছে তাহাই থাকুক—ঐ সামান্য একটি আখ্যায়িকার মধ্যে যে এত অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য ধরিয়াছে, ইহা অসাধারণ কবিতা-শক্তির ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার ভিন্ন আর কিছু নহে। কালিদাসের শকুন্তলার আখ্যায়িকার গুণপনা দেখিয়া নহে—কবিতা মাধুর্য্য দেখিয়াই জর্ম্মানদেশীয় মহাকবি গেটে বলিয়াছেন,

Would'st thou the young year's
[blossoms
and the fruits of its decline
And all by which the soul is charmed
enraptured feasted fed,
Would'st thou the earth and heaven
[itself
in one sole name combine,
I name thee O Sakuntala
and all at once is said.

তরুণ-বয়সের নব কুসুম-কলি,
প্রবীন-বয়সের সাঁসালো ফল,—
যা কিছু হরে মন, করে আপনা-হারা,
পিয়ো যা' জিয়ে প্রাণ—সুধা বিমল,—
এতেক সবাকারে, চাহ কি একাধারে,
স্বরগ-বসুমতী একই ঠাঁই,—
তবে শকুন্তলা, নাম করিনু তোর
আর না কিছু আমি বলিতে চাই।

যে সে লোক নয়—গেটে এইরূপ বলিয়াছেন,—যিনি জগতের মধ্যে প্রধান এক জন কবি এবং প্রধান এক জন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ! কিন্তু এ কবিতাটি সমালোচকের মনঃপূত হয় নাই, তাই তিনি নিম্ন-লিখিত টিপ্পনীতে বলিয়াছেন "কালিদাসের প্রশংসার জন্য সকলেই গেটের প্রণীত কবিতা উদ্ধৃত করেন, কিন্তু সে স্তুতিবাদ কোন কাজের নহে, কারণ গেটে সর্ উইলিয়ম জোন্‌সের জর্ম্মান অনুবাদ পাঠ করেন ইহা দ্বারা মূলের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিশ্চয় বিলুপ্ত হইয়াছিল। তবে যে, গেটে প্রশংসা করিয়াছিলেন তাহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যে এমন বস্তু আছে ইহা তিনি কখন আশা করেন নাই।" সমালোচক যখন কালিদাসকে বলিয়াছেন যে তিনি মানবপ্রকৃতির কিছুই জানেন না তখন বলিলেই হইত যে, গেটে কবিতার মর্ম্ম কিছুই বোঝেন না, তাই তিনি শকুন্তলার প্রশংসায় ওরূপ উন্মত্ত-ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন! নিশ্চয়ই তিনি জর্ম্মানদেশীয় গেটেকে ভারতবর্ষীয় কালিদাস অপেক্ষা সমীহ করেন, কেননা—কোথায় তিনি কালিদাসের স্তুতি-কারী গেটের বক্ষ লক্ষ করিয়া ছুরি চোখাইবেন, তা' নয়—তিনি (Falstaff) ফাল্‌ষ্টাফের রাজনির্ণায়ক (instinct) সংস্কারের অনুগামী হইয়া গেটেকে বড় কিছু বলেন নাই,* বরং তাঁহাকে বাঁচাইবারই চেষ্টা পাইয়াছেন। গেটের সরল এবং উৎসাহ পূর্ণ ভাষা দেখিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে গেটে, সত্য সত্যই শকুন্তলার কবিত্ব-রসপানে মত্ত

* *Falstaff.* * * * * should I turn upon the true prince? Why, thou knowest I am as valiant as Hercules: but beware instinct; the lion will not touch the true prince. Instinct is a great matter; I was a coward on instinct. &c.
Shakespeare.

হইয়া ঐ চারিপংক্তি কবিতা-কুসুমাঞ্জলি কালিদাস-ভারতীর চরণে অর্পণ করিয়াছেন, কিন্তু সমালোচক টিপ্পনী-বলে কালিদাসের প্রাপ্য সেই যজ্ঞ-ভাগটি লোপ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন! অনেকের বিশ্বাস এই যে অনুবাদ পাঠেই যখন গেটের হৃদয় ওরূপ ভাবে-উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনাকে আপনি ধারণ করিতে অক্ষম হইয়াছিল, না জানি মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে তাঁহার মন কিরূপ হইত! কিন্তু এখনকার নূতন মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, মূলগ্রন্থ পাঠ করিলে গেটে ভারতবর্ষকে নয় আর একটু বেশী আশ্চর্য্য মনে করিতেন—এই পর্য্যন্ত, কালিদাসের শকুন্তলা কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র হইত! এ বড় হাসির কথা যে, সর উইলিয়ম জোন্‌স্ শকুন্তলার অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য আংশিক-রূপেও প্রকাশ করিতে পারেন নাই,—হয় তিনি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝেন নাই, নয় ইংরাজি ভাষায় তাঁহার এতটুকুও ব্যুৎপত্তি ছিল না যে, মূলের সৌন্দর্য্য আংশিক-রূপেও অনুবাদে প্রতিবিম্বিত করিতে পারেন! প্রথম পক্ষ যদি সত্য হয়, তবে অনুবাদ-কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তিই হইতে পারে না, দ্বিতীয় পক্ষ যদি সত্য হয়, তবে অনুবাদ-কার্য্য তাঁহার সাধ্যায়ত্তই হইতে পারে না,—কে তিনি? না অদ্বিতীয় ভাষা-বিৎ পণ্ডিত সর উইলিয়ম জোন্‌স্! আবার গেটে ইংরাজি ভাষায় এমনি অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, সর উইলিয়ম জোন্সের অনুবাদের জর্ম্মান অনুবাদ ভিন্ন শকুন্তলা-রসাস্বাদনের তাঁহার আর উপায়ান্তর ছিল না—গেটে-তিনি কে? না হ্যাম্‌লেটের একজন সুবিচক্ষণ প্রথম-শ্রেণীর সমালোচক! এরূপ যখন সব কাণ্ড-কারখানা, তখন অগত্যা বলিতে হইতেছে যে, শকুন্তলার অনুবাদ-পাঠে মনকে অত-দূর মুগ্ধ হইতে দেওয়া গেটের মত অসামান্য কবির পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই—তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি কলঙ্কিত হইবার আটক নাই—অত বড় কাব্য-রসজ্ঞ হইয়া তিনি কিনা বলেন শকুন্তলা সর্ব্বগুণে গুণবতী—ধিক্! তবে গেটেকে বাঁচাইবার কেবল একটি পথ আছে—এবং সেই পথের জন্য গেটের এবং তাঁহার ভক্তগণের উচিত আমাদের সমালোককে ধন্যবাদ দেওয়া—সে পথ এই যে, ঐ সরস কবিতাটি গেটের সর্ব্বান্তঃকরণ-হইতে উচ্ছ্বসিত হয় নাই—তাঁহার কেবল মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষীয় লোকদিগেরও কবিতা-লেখা আসে—অসভ্য ভারত-বাসীরাও মিউসের (বিলাতি সরস্বতীর) হার্প (বিলাতি বীণা) লইয়া টুং টাং করিতে পারে! এবং শুদ্ধ কেবল সেই বিস্ময়-ভাবটির উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বোচ্চ কবিকে যেরূপ প্রশংসাবাদ করিতে হয়, তিনি কালিদাসকে তাহার এক শেষ করিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার কবিতা-উপহারে তিনি ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন! গেটে নাকি খুব বড় কবি তাই তিনি উথো-র একটি বিস্ময়-জনক গুণ দেখিয়া মুখো-র

যৎপরোনাস্তি প্রশংসাবাদ করিতে পারিয়াছেন, এবং অল্প একরত্তি গুণ দেখিয়া তাঁর মনে সামান্য একটু ভাবোদয় হইলেও ওরূপ ভাবাতিশয্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন—তাঁহার মনে যদি আদবেই কোন ভাবোদয় না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি উহা অপেক্ষাও সরস কবিতা লিখিতে পারিতেন! কাজেই আমাদের স্বীকার করিতে হইতেছে যে, গেটের অত গভীর অন্তর্দৃষ্টি অমন অনায়াসে তুলাইয়া পাওয়া যে-সে ডুবুরির কাজ নহে!

সরস্বতী-আহ্বান।

(হিমাচলে)

সাধের নিকুঞ্জ বন, সোহাগের পদ্মাসন,
তেয়াজিয়ে কেন গো আজি হিমাদ্রি-শিখরে?
দুরন্ত উত্তর বায়, অলকা উড়িয়ে যায়,
চৌদিকে নীহার-রাশি, ঘিরে স্তরে স্তরে—
শিথিল আঁচল খানি, কেন আজ, বীণাপাণি,
বলাকা রেখার মত উড়িছে জলদে?
ঘোর উন্মাদিনী প্রায়, স্খলিত কবরী হায়,
অবাধে দুয়ারে পোড়ে আছে, গো সারদে?
বিমল জোছানা তেয়াজে, ঘোর কুহেলিকা মাঝে,
—হেমন্তে পূর্ণিমা-শশী-সম বিমলিন,—
কহ কোন্ অভিমানে, এ ঘোর বিকট স্থানে,
কোন্ প্রাণে আসি, দেবি, র'য়েছ আসীন?
নাহি সূর্য্য, নাহি শশী, না ভাতে তারকা-রাশি,
নাহিক শ্যামল কুঞ্জ—উপবন হেথা—
না ফোটে একটি ফুল, না গাছে বিহঙ্গ-কুল,
না চলে তটিনী রাণী গাহি মৃদু গাথা!
না বহে মৃদুল বায়, ঈষৎ লোমাঞ্চ কায়,
ধ্বনিয়ে মরম-তারে ঈষৎ ঝঙ্কার—
না নাচে সরসী-বালা, তুলিয়ে তরঙ্গমালা,
না দোলে কমল-কলি উরসে তাহার!

চারিদিক ভীতিময়, তুষারে তুষারময়,
অনন্ত তুষার-ঢেউ দিগন্ত প্রসারি—
ঘন ঘোর তমোরাশি, উথলে চৌদিকে আসি,
ভীষণ তরঙ্গে, দেবি, ও পদ আবরি—
নির্ম্মম উত্তর বায়, অবাধে বহিয়ে যায়,
কড় কড় ভেঙ্গে পড়ে জমাট তুষার,
গড়ায়ে গড়ায়ে যায়, শব্দে ব্যোম ছির প্রায়,
শব্দে দিগঙ্গনাগণ স্তম্ভিত আকার!
সুদূরে দেবতাচয়, তটস্থ দাঁড়ায়ে রয়,
নিঃশব্দে সুদীর্ঘ শ্বাসে, করে আর্ত্তনাদ,
সুদূরে প্রকৃতি হায়, জড় পুত্তলিকা-প্রায়,
মরমের শিরে শিরে গণে পরমাদ!
ধূ ধূ করে চারি ধার, দিগন্ত নাহিক তার,
বিভীষিকা-সমাকীর্ণ—শূন্যাকার প্রায়,
উঠি শৃঙ্গ স্তরে স্তরে, উঠেছে জলদ পরে,
উঠেছে জলদ লক্ষি—কে জানে কোথায়!
এ হেন বিকট স্থানে, কেন আজ, বরাননে!
রহিবে সকল ভোজি উন্মাদিনী প্রায়—
কিজানি কিভাবে ভোর, কি লেগেছে ঘুমঘোর
—উন্মাদিনী কেন আজ এ মূরতি হায়!
সেই সে মুকুতাহার, সুষমা কোথায় তার?
ছিঁড়িয়ে কেন গো আজ ভূমেতে লুটায়?
একটি একটি খুলে খুলে, গড়ায় শিখর-মূলে,
অথচ ভ্রূক্ষেপ মাত্র, নাহিক তাহায়!
মণির মুকুট তব, (নিতি নিতি অভিনব)
অদূরে কন্দরে ওই ভেঙ্গে চুরমার—
গণদক্ষ দেবতারা, পাঁতি পাঁতি খুঁজি তারা,
যতনে কুড়িয়ে রাখে রতন তাহার!—
—বুঝেছি বুঝেছি মনে, দেবতার ত্যজ্য স্থানে—
— ...তার তা জা এই আর্য্যা মরুস্থলে
দেখিবে না ও নয়নে, মাড়াবে না ও চরণে,
বাঁচো যেন—আর্য্যাবর্ত্ত সিন্ধুসাৎ হোলে—
কিন্তু গো থাকিতে প্রাণ, এ ভক্তির অপমান,
কখনো করিতে, দেবি, দিব না তোমায়,
অমরা, অলকা, পুরে, থাকুন্ কমলা বিরে,
ছড়ান রতন-রাশি,—কে তাঁহারে চায়!
তুমি কিন্তু তেজ বেশ, বাঁধো গো স্খলিত কেশ,
সাধের বীণাটি তব, ধর গো উরসে—
পরিয়ে মুকুতাহার, ঝলসিয়ে চারি ধার,
নামিয়ে এস' গো দেবি, উন্মত্ত হরষে!
শত শত শত নরে, শত হৃদি এক ক'রে,
পেতে আছে তোমা তরে শতদলাসন!
শত কণ্ঠ সমস্বরে, ধ্বনিয়ে গগন ভোরে,
করিবে তোমারি দেবি মহিমা-কীর্ত্তন!

এস তবে সরস্বতী, উর তবে সাধ্বী সতী,
হৃদয়-রুধিরে আজ প্লাবিব চরণ—
শত শত নারী নর, দাঁড়ায়েছে স্তরে স্তর,
"উরঃ উরঃ সরস্বতী" করে আবাহন—
শোকের বেদনা ভুলে, সাধের বীণাটি তুলে,
ছিন্নতার বীণা সুরে মিলায়ে গভীরে—
বাজায়ে করিবে গান, সপ্তমে তুলিয়ে তান,
ঝাঁপিয়ে পড়িবে ঢেউ সাগরের তীরে,
মধুর সে ঘোর রব, ধ্বনিয়ে হিমাদ্রি সব,
জাগাইবে প্রতিধ্বনি কুমারিকা দেশে—
ব্রহ্মপুত্র তরঙ্গিয়ে, সিন্ধুনদ আলোড়িয়ে,
বিকম্পিত আর্য্যাবর্ত্তে ভাসাবে উল্লাসে—
দিগন্ত-দিগন্ত আহা, ভাসাবে উল্লাসে!

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	নোট, শেষ লাইন	ভূমি	বিধিঃ
		সীতা হরণ করে।	সীতাহরণ করে। (২০) নোট দেখ
	(২৫) নোট		delight

(২৮) নোট insert after "delight" the following passage:
"কালিদাসের কল্পনা" &c to "এবং অন্যান্য স্থানেও বিস্তর আছে।
নোট ২৬, insert after "স্পষ্ট বোধ হয়।" the following sentence "যদি কালিদাসের কোন ইতিহাস থাকিত তাহা হইলে আমাদের অনুমান দৃঢ়ীকৃত হইত।" and after this insert "কারণ আমরা যখন Ovid বা Anacreon পাঠ করি" &c to "চরিত্রের পরিণাম মাত্র"।

যে বায়রণ যেমন

মালতী।

তৃতীয়—পরিচ্ছেদ।

সেই দিন হইতে শোভনা আর সহস্র কষ্টেও মুখ ফুটিত না, কখনো সন্দেহে কখনো অনুতাপে তাহার হৃদয় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু মনে মনেই সে তাহা সহ্য করিতে সঙ্কল্প করিল। মালতী এ সকল কিছুই জানিল না,তাহাকে লইয়া তাহাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটির মধ্যে যে কি রূপ বিপ্লব চলিতেছে তাহা সে কিছুই জানিল না, সেই জন্য তাহার হাসিমাখা মুখখানির হাসি আর নিভিল না।—কখনো কখনো মাত্র দুটীরের অন্ধকার সেই জ্যোৎস্নাময়ী বালিকাকেও স্পর্শ করিত। শোভনা আর তাহার সহিত হাসিয়া হাসিয়া বাগানময় ঘুরিয়া বেড়ায় না, আর লুকাচুরি খেলিবার ছলে মালতীকে ফাঁকি দিয়া রমেশের নিকট পালাইয়া মালতীকে জব্দ করে না, মালতীর ফুলগুলি ছিঁড়িয়া আর মালতীকে কাঁদায় না—মালতীর সঙ্গে আড়ি করিয়া তাহাকে আর সাধায় না—রমেশের রাত্রের গল্প করিয়া আর তাহাকে হাসায় না—আজ কাল শোভনা বড় গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ। শোভনা বলে তাহার আর ছেলেমানষি করিবার সময় নাই। চিরকাল কি ছেলেমানুষ থাকিবে? চিরকাল কি আর খেলিয়া বেড়াইবে? মালতী তাহার কথার অর্থ যেন বুঝিতে পারে না—মালতী অবাক হইয়া ভাবে সে আবার কি? চিরকাল আমরা খেলিব না? ছেলেমানুষ ছাড়া কি আর কাহাকেও খেলিতে নাই? তবে মালতীর বিবাহ হইলে তাহারও কি খেলা বন্ধ হইবে? মালতী যেন কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিত না, তাহার সহিত রঙ্গ করিতেছে ভাবিয়া সে হাসিয়া হাসিয়া শোভনাকেও হাসাইতে চেষ্টা করে—শোভনার সাধের ফুলগুলি তুলিয়া তাহাকে মারিতে থাকে, তাহাতেও শোভনার গম্ভীর বিষণ্ণ মুখটি প্রফুল্ল না হইলে তখন মালতীর চমক ভাঙ্গে, সেই অন্ধকার তখন তাহাকেও স্পর্শ করে। সত্যই তবে শোভনা বড় হইয়াছে, আর সে খেলিবে না, সে আর হাসিবে না, অমনি মালতীও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে—তাহার কান্না পায়, লুকাইয়া কাঁদিতে সে সেখান হইতে নিঃশব্দে চলিয়া যায়। বনে বনে বেড়াইয়া আবার হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসে। আসিয়া যদি রমেশকে দেখিতে পায়,যদি রমেশকে প্রফুল্ল দেখিতে পায় তো বড়ই আমোদ, নহিলে বিষণ্ণ দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে থাকে। সে জানে স্ত্রীলোকেই বড় হইলে সংসারী হইয়া গম্ভীর হয়, বিষণ্ণ হয়; শোভনার কাছে সে তাহা শুনিয়াছে, শোভনাতে সে তাহা দেখিয়াছে, কিন্তু রমে-

শের আবার কেন ও ভাব আসিবে? সে দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ণ ভাবে না খাইয়া ঘুমাইতে যায়। রমেশকে প্রফুল্ল দেখিলে সে কতকি বকে, কত গল্প করে—কিন্তু বিষণ্ণ দেখিলে কথা কহিতে সাহস করে না। এক দিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে সঙ্কল্প করিল এবার বিষণ্ণ দেখিলে সে রমেশকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবেই করিবে। ইহাতে তাহার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক। কিন্তু প্রত্যাশিত দিন আসিল, রমেশকে বিষণ্ণ দেখিল, কিন্তু কই? তাহার প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? সে প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারিল না—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—কতবার জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেল, শেষে না পারিয়া ভগ্ন হৃদয়ে কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নদী তীরে আসিয়া কাঁদিতে বসিল। কিছু পরে হঠাৎ রমেশ আসিয়া সে খানে দাঁড়াইলেন, মালতীকে একাকী বিজনে কাঁদিতে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইলেন, যেন ব্যথিত হইলেন, ধীরে ধীরে সাদরে তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া বলিলেন "একি মালতি,—এখানে কাঁদছিস?" মালতী সে কণ্ঠস্বর চিনিল, মালতী মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিল, মালতী আর পারিল না, মালতীর অশ্রুধারা উথলিয়া উঠিল। কেন যে মালতী কাঁদিতেছে মালতী তাহা বুঝিতেই পারিল না, সুতরাং সে আর রমেশকে বুঝাইবে কি? রমেশ ধীরে ধীরে অশ্রুধারা মুছাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "মালতি, কাঁদিস কেন? শোভনা তোর সঙ্গে কি আড়ি করেছে মালতি?" রমেশ জানেন শোভনা আড়ি করিলেই মালতী কাঁদে। মালতী অনেক কষ্টে অশ্রু জল সামলাইয়া বলিল "না, শোভনা আর আড়ি করে না"—এমন বিষাদাক্রান্ত স্বরে মালতী ঐ কথাটি কহিল যে রমেশ চমকিয়া বলিলেন—

"তবে তোর কিসের দুঃখ, মালতি?" মালতী ধীরে ধীরে বলিল আড়ি করেনা বোলেই আমার কষ্ট।" রমেশ হাসিয়া বলিলেন "তাই তোর এত দুঃখ, তবে আমি আড়ি করিতে বলিব এখন; চল্ তবে তার কাছে নিয়ে যাই।"

মালতী উঠিল না, মালতী হাসিল না, মালতী বিষণ্ণ মনে বসিয়া রহিল, মালতী ভাবিতে লাগিল "কি করিয়া রমেশের বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করি।" রমেশ দেখিয়া শুনিয়া আবার বলিলেন, "শোভনা আড়ি করে না বলেই তোর এত দুঃখ?" মালতী এবার তাহার ইচ্ছা পুরাইতে সহসা সুযোগ পাইল, সে কত বার থামিয়া থামিয়া অতি ধীরে ধীরে অতি মৃদু স্বরে বলিল "আরো একটি কারণ আছে,—দাদা, তোমার কি হয়েছে, কেন আর সারাদিন তেমন কোরে গল্প কর না—আমি কি—কোন দোষ করেছি।"

মালতীর সরল প্রশ্নে, তাহার সেই সশঙ্কিত অর্দ্ধস্ফুট জড়িমা-জড়িত প্রশ্নে রমেশের চক্ষে জল আসিল, এক বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে মালতীর হস্তে পড়িল, মালতীর হৃদয় স্তম্ভিত হইল, মুখ শুকাইয়া গেল,

মালতী নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করিয়াছে, নহিলে তাহার কথায় রমেশের চক্ষু দিয়া জল পড়িল কেন? মালতীর সমস্ত সঙ্কোচ দূর হইল, আর কুণ্ঠা বাধিল না—ব্যগ্রতার ব্যাকুল ভাবে আবার মালতী বলিল—"দাদা, আমি কি দোষ করেছি বল?"

অশ্রু মুছিয়া যুবা বলিলেন "তুই কি দোষ করিবি মালতি?"

মালতি। "দাদা রাগ করিলে? না, রাগ করিও না—বল ভাই কি দোষ করেছি—" যুবা তাহার কাতরতায় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "না মালতি, তুই তো কিছুই দোষ করিস নি।"

মা। "তবে কেন তুমি আর তেমন করে আমার সহিত কথা কওনা? কেন আজ আমার সহিত কথা কহিতে কহিতে কাঁদিলে?"

সুখেই যে মানুষে হাসে তাহা নহে, নিভিবার আগেও প্রদীপ জ্বলিয়া ওঠে—অন্ধকারেও বিদ্যুৎ চমকে। আজ যুবা বালিকার কথায় অতি দুঃখেও হাসিয়া বলিলেন, "মালতি, তোর জন্য কি আমি কাঁদিলাম? না। কি দুখে আমার যে আগেকার সে ভাব নাই, কি দুখে যে এ কঠোর চোকেও জল পড়িল তাহা তুই কি বুঝিবি, মালতি? আজ তোর মত ছেলেমানুষ অজ্ঞান বালিকা তা কি ক'রে বুঝিবে, মালতি?"

মালতী ছেলেমানুষ হইলেও মালতী স্ত্রীলোক; স্ত্রী-লোকে দুঃখের দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, না হইয়া থাকিতেই পারে না—আর কিছু বুঝুক না বুঝুক, পরের ব্যথা বুঝিবার সময় স্ত্রীলোকে আর ছেলে মানুষ থাকে না, অন্য সকল বিষয়ে বালিকা থাকিলেও সে সময় শত বর্ষের বৃদ্ধও তাহার মত হৃদয়ের সহিত অন্য হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে সক্ষম হইবে না। বালিকা মালতী আজ গম্ভীর প্রৌঢ়ার মত বলিল "দাদা, আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিব না? ছেলেমানুষ! আজ তিন বৎসর আগে একদিন আমাকে কি অন্য রূপ ভেবে তোমার মনের কথা বলনি? আমি কি এখনো দাদা তার চেয়েও বড় হই নি?"

পৃথিবীতে যথার্থ ব্যথার ব্যথী অতি দুর্লভ। একটি সুন্দর গোলাপ দেখিয়া যত্নে কে না গ্রহণ করে? তাহাকে কে না ভাল বাসে? কেন না তাহাতে চক্ষের তৃপ্তি হয়, তাহাতে নিজের সুখ হয়—কিন্তু সেই গোলাপটি শুকাইলে কে তাহাকে মায়া-দৃষ্টিতেও একবার চাহিয়া দেখে? কজনের চক্ষু হইতে তাহাতে অকৃত্রিম শোকাশ্রু পড়ে? তাহা পড়ে না বলিয়াই অকৃত্রিম অশ্রুর এত আদর, নিস্বার্থ ভালবাসার এত আদর। স্বর্গ তুচ্ছ করিয়াও লোকে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে—তাহাতে লোকে এত মুগ্ধ হয়। রমেশও মানুষ, তিনিও সে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারিলেন না—তাঁহার হৃদয়-দ্বার খুলিয়া গেল, একজন ব্যথার ব্যথী পাইবার জন্য তাঁহারও হৃদয় ব্যগ্র হইল, তিনি বলিলেন, "আমার কষ্টের কথা শুনিবে, মালতি? যাহা হইতে আমার সুখ, তাহা হইতেই মালতি আমার দুঃখ,

শোভনা আজ কাল কল্পনার প্রাচুর্য্যে নিজেও অসুখী, আমাকেও অসুখী করিয়াছে" বলিয়া যুবা সংক্ষেপে শোভনার সন্দেহ বৃত্তান্ত বলিলেন।

মালতী নীরবে অনিমেষ নেত্রে সকল শুনিল। মালতীতে আর মালতী নাই। শুষ্ক অধর ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল। দীন যাতনাময় দৃষ্টি শূন্যে সংলগ্ন হইল, মালতী থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যুবাও কাঁদিতে লাগিলেন। নীরবে সেই সন্ধ্যা কালে সুখময়ীর চঞ্চল বক্ষে সে জল মিশাইল। আকাশে চাঁদ নাই, শত শত তারা উঠিয়াছে। তাহারা সে দুঃখ বুঝিল না, তাহা দেখিয়া হাসিল মাত্র। হাসিবে নাই বা কেন?—তাহাদের নিকট মমতা কে প্রত্যাশা করে? তাহারা ত অনন্ত কাল পর্য্যন্ত হাসিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে—সুতরাং সেই নির্ম্মমতায় কাহারো হৃদয়কে আহত করিতে পারে না কিন্তু সুখের বিষয় এই যে সেই প্রশান্ত সুখময়ী-তীরে জনমানবের আর নাম গন্ধও ছিল না। মালতীদের অশ্রুজল দেখিয়া হাসিবার,তাহাদের দীর্ঘশ্বাসে উপহাস করিবার, তাহাদের কাতরতায় আমোদ উপভোগ করিবার এক জনও গুপ্ত বা প্রকাশ্য আত্মীয় পর কেহই ছিল না। যাহাদের মমতাশূন্য মূর্ত্তি দেখিলে অশ্রুজল প্রবাহিত না হইতে হইতেই নীহারবৎ জমাট হইয়া পড়ে, দীর্ঘশ্বাস আপনা আপনি মরমের নিভৃত কন্দরে অবরুদ্ধ হইয়া যায়, এমন জনপ্রাণীও সে খানে ছিল না। সুতরাং মালতী আজ অবাধে কাঁদিয়া ফেলিল। থাকিয়া থাকিয়া বালিকা বলিয়া উঠিল "দাদা কি বলিলে? শোভনা কি মনে করে তুমি আমাকে শোভনা হইতে ভাল বাস? আমিই তোমাদের তবে অসুখের কারণ? আমার জন্যই তোমার প্রফুল্ল মুখ, ও শোভনার হাসিমুখ আজ মলিন! আমিই তোমাদের অশান্তির মূল! আমিই তোমাদের কষ্টের কারণ! দাদা, কি করিলে তোমাদের পূর্ব্ব সুখ আবার ফেরে? কি করিলে তোমাদের শান্তি বরাবর থাকে?"

মালতীর নিস্বার্থ স্নেহ-উথলিত বাক্যে যুবার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া বলিলেন "মালতি, মালতি, তুই আমাদের অসুখের কারণ কি করে হবি মালতি? আমাদের অকারণ—"

মালতীর আজ কথা ফুটিয়াছে, মালতী আর রমেশকে কথা কহিতে না দিয়া বলিল "না দাদা, আমাকে আর ভুলাইও না—আমি তোমার কথায় আর ভুলিব না। দাদা বল, কি করিলে তোমাদের সুখ ফিরিয়া আসে? আমি দাদা মরিলেও কি তোমাদের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রনা শেষ হয় না?"

সকল রূপ ভালবাসার কি মর্ম্মান্তিক ভাব একই প্রকার? মরিতে ইচ্ছাই কি ভালবাসার স্বাভাবিক? তাহার কথায় রমেশ নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন। তাহার মনের ভাব বুঝিয়া কোন কথা কহিতে

পারিলেন না—মালতীও কোন কথা কহিল না, মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করিল মনেই রাখিল। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধেই কাটিল, দুজনের মনে কত কথা বহিয়া গেল দুজনে বলিতে ইচ্ছাও করিলেন না। ক্রমে দুজনে এত গভীর চিন্তামগ্ন হইলেন, দুজনের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যেন ভুলিয়া গেলেন, একাকী আছেন জ্ঞানে যুবা আপন মনেই যেন বলিলেন "যাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসি তাহার নিকট অবিশ্বাসই কি প্রতিদান। তাহার নিকট এই দারুণ আঘাতই কি আমার পুরস্কার!" এই কথায় মালতীর চিন্তা ভঙ্গ হইল—আবার বলিল "কি বলিলে দাদা? শোভনার চেয়ে তুমি আমাকে ভাল বাস? এই কি শোভনার বিশ্বাস?"

যুবা কোন উত্তর করিলেন না।

মালতী আবার বলিল "সত্যিই কি শোভনার এই বিশ্বাস? তুমি শোভনা হইতে আমাকে ভালবাস!

যু। "হাঁ।"

সহসা এই সময় শোভনা পশ্চাৎ দিকে আসিয়া দাঁড়াইল—মালতীর শেষ প্রশ্ন ও যুবার শেষ উত্তর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। আর কোন ভুল নাই, এই বার শোভনার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল,—এ তো আর কল্পনা নহে। মালতী ও রমেশের প্রেমালাপ সে স্বকর্ণে শুনিতে পাইল। উন্মত্ত বেদনায় শোভনা অজ্ঞানের মত সেখান হইতে ছুটিয়া কিছু দূরে নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইল—আপন সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আগে একবার আকাশ পৃথিবী নদী কুটীরপানে চাহিয়া দেখিল, নিমেষ মধ্যে একবার কত কথা তাহার হৃদয় মধ্যে বহিয়া গেল। "আমি কে? আমি কার? আমি যখন আমার স্বামীরই নই তখন আমি কার? আমার স্বামীই যখন আমায় চান না, তখন আমাকে আর কে চায়? সংসার আমাকে চায় না, সমাজ আমাকে চায় না, আমার আত্মীয়েরাও হয় তো আমাকে চায় না, অন্য সব দূরে থাক—আমি নিজেই আমাকে চাইনে, তবে বাঁচিয়া আর নরক ভোগ কেন? আমি আজ মরিলে কেই পূর্ব্বের মত পৃথিবী মেরুদণ্ডে ঘুরিবে, সংসার সেই পুরাতন ভাবে সমান চলিবে, আবার হেমন্তের পর বসন্ত আসিবে, আমাবস্যার পর চাঁদের উদয় হইবে, আত্মীয়েরা সেই আগেকার মত খাইবে শুইবে, বন্ধুরা একবার মাত্র অশ্রু জল ফেলিয়া আবার নূতন আমোদে মত্ত থাকিবে, আর আমার সর্ব্বস্বধন—যারপর নাই সেই স্বামী?—তিনি?—তিনি কি করিবেন? এক ফোটা অশ্রুজল ফেলা দূরে থাক, হয় ত নিষ্কণ্টক হইয়াছেন ভাবিয়া তিনি সুখীই হইবেন, তবে—তবে? আর একবার শোভনা চারিদিক চাহিয়া দেখিল, মাথা ঘুরিতেছিল, চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না—অন্ধকার পৃথিবী, অন্ধকার আকাশ, অন্ধকার নদীর অন্ধকার জল, তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। শোভনা সেই ঘূর্ণ-নদীর আবর্ত্ত মধ্যে বিঘূর্ণিত হৃদয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শোভনাকে নিকট দিয়া ছুটিতে দেখিয়া কিছু কারণ না বুঝিয়াও সঙ্গে সঙ্গে রমেশ ও মালতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পড়িতে না পড়িতে রমেশও লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে তীরে তুলিলেন, মালতী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

চতুর্থ—পরিচ্ছেদ।

শোভনাকে লইয়া যুবা তাঁহার শয়নাগারে আসিলেন। গৃহে আসিয়া তাহাকে শয্যায় বসাইয়া আপনিও পার্শ্বে বসিলেন। শোভনা একবার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল, যাহা আর জনমে দেখিতে পাইবে না ভাবিয়াছিল—আবার সেই সকল পরিচিত সামগ্রী তাহার চক্ষে পড়িল। সেই কুটীর, যে কুটীরে বিবাহ অবধি দু জনে কাটাইয়াছে, যাহাতে তাহাদের জীবনের কত সুখদুঃখময় ঘটনা যেন অঙ্কিত আছে, সেই কুটীর সেই সাধের কুটীর আবার দেখিল। কুটীরে, তাহাদের শয্যা তেমনই সজ্জিত রহিয়াছে, শয্যার শিয়র দেশে সেই রত্নাবলী উত্তররামচরিত শকুন্তলা সজ্জিত, আবার যে কখনো স্বামীর সুধা কণ্ঠে তাহা শুনিতে পাইবে সে আশা তাহার ছিল না। দীপটি জ্বলিতেছে, কিন্তু তেলের অভাবে তেমন উজ্জ্বল রূপে জ্বলিতেছে না—মুমূর্ষুর জীবনের মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে, নিভ নিভ হইয়াছে, অথচ নিভিতেছে না। শোভনার জীবনও নিভ নিভ হইয়াছিল কিন্তু নিভিল না। শোভনা লজ্জায় এতক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই, এইবার চাহিল; যাহাকে—যে হৃদয়রত্নকে আর জনমে দেখিবার আশা করে নাই তাহাকে কি আর দেখিতে সত্যই পাইবে? ব্যগ্র ভাবে সে স্বামীর পানে চাহিল। রমেশের সেই বিষাদ-গম্ভীর ছবি দেখিয়া শোভনা বজ্রাহত হইল, তখনি চক্ষু নত হইয়া পড়িল, শোভনা নীরবে কাঁদিতে লাগিল, রমেশও নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মুহূর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় মানুষের জীবনকে যেরূপ পরিবর্ত্তিত করে, এমন একটি বহু-কাল-ব্যাপি মহা কাণ্ডতেও পারে না। এই জন্যই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজমন্ত্রী ডিজরেইলি বলিয়াছেন যে, মনুষ্য জীবন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাবলীর সমষ্টি মাত্র। শত শত বৎসরের বিপ্লবে যাহা না করিতে পারে, একটি মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র ঘটনাতেও তাহা সম্পন্ন হয়। পশুচুরি অপরাধে দণ্ডিত না হইলে মহা কবি সেক্সপিয়রের নামও হয়ত কেহ শুনিতে পাইতেন না। বৃহৎ ঘটনায় মানুষকে দলিত করিতে পারে, কিন্তু পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না। সম্রাট পথের ভিখারী হইয়াও জীবন ধারণ করেন, প্রিয়তম পুত্র কন্যা বিয়োগও সহ্য করিতে পারা যায়, প্রণয়ে আহত হইয়া কত ভগ্ন হৃদয়ও জীবিত থাকে, কিন্তু আবার কখনো কাহারো এক মুহূর্ত্তের একটু অনাদর বাক্যেই হয়ত হৃদয়ের অন্তর-তার সহসা এমন ছিন্ন হইয়া যায়, যে তাহা আর কিছুতেই জোড়ে না, তাহা হইতেই হয়ত জীবনের

কাঁটা একেবারে এমন বিপথে গিয়া পড়ে, যে তাহা আর কিছুতেই সোজা হয় না। আবার তেমনি যে গর্ব্বিত-হৃদয় ভাগ্যের সকল প্রকার উৎপীড়ন জীবনের সকল প্রকার অত্যাচারকে ভ্রূকুটী করিয়া উড়াইয়া দেয়,যে পাষাণ হৃদয়ে শত শত মনুষ্য শোনিত কিছুমাত্র বিকার জন্মাইতে পারে না, যাহা কিছুতেই নরম হয় না, সেই গর্ব্বিত পাষাণ হৃদয়ও কাহারো একটী স্নেহ বাক্যেতেই একেবারে দ্রব হইয়া যায়। যে আণ্টনি অসীম কষ্টে পড়িয়াও অপার বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়াই কেশিয়াস ও ব্রটাসকে পরাজীত করিয়াছিলেন, সেই ভীম পরাক্রমশালী মহাবীর আণ্টনিই কি ক্লিয়োপেট্রার একবিন্দু অশ্রু দর্শনে বিজয়ী হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করেন নাই? কিসে যে হৃদয়ের কি হয়—কি প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা যে চলিতেছে তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নয়। নিউটন গেলিলিও অনেক ভাবিয়া বাহ্যিক জগতের নিয়ম বাহির করিয়াছেন, কিন্তু মনের নিউটন এখনো জন্মায় নাই। কবে জন্মাইবে কে জানে?

আজকের সন্ধ্যাকালের এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে শোভনার জীবন-স্রোত যেন উলটাইয়া ফেলিল, শোভনা সকলি নূতন দেখিল, জলমগ্নের পরক্ষণ হইতে শোভনার যেন জীবন আবার নূতন হইয়া আরম্ভ হইল। রমেশকে সে পূর্ব্বকার সেই স্নেহময় স্বামীই দেখিল,তাঁহাতে প্রণয় ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কি করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও অন্য রূপ মনে করিতে পারিয়াছিল শোভনা নিজেই যেন বুঝিতে অক্ষম হইল।

আস্তে আস্তে তাহাদের কথা আরম্ভ হইল, আস্তে আস্তে নূতন প্রেম-সম্ভাষণের মত শোভনা স্বামীর ক্ষমা প্রার্থনা করিল, রমেশের নিকট আনুপূর্ব্বিক সকল শুনিয়া তাহার হৃদয় অনুতাপে পূর্ণ হইল। এ অনুতাপ হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ হইতে উথলিত, ইহা মিশ্রিত নহে, ইহাতে সন্দেহ বা অবিশ্বাস কিছুই ছিল না।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল,এখনো তাঁহারা সেই জলসিক্ত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই, তাহা গাত্রেই শুকাইয়া গিয়াছে। সহসা শোভনার তাহা মনে পড়িল, রমেশের কাপড়ে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল "কেন আমার মরণ হইল না,যাহাকে বুকে রাখিয়া তৃপ্তি হয় না, আমার জন্যই তাহার এত কষ্ট, উঠ উঠ—এত রাতে কি না আমার জন্যই এখনো ভিজা কাপড়ে কষ্ট পাইতেছ?" শোভনার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। রমেশ বলিলেন "শোভনে, এ কি আর কষ্ট! এখন আমার মত সুখী এ সংসারে কে? তোমার পূর্ব্ব মন ফিরিয়া পাইয়াছি, তোমার অবিশ্বাস ঘুচিয়াছে, এখন কি শত শত অন্য বিপদ আসিলেও আমি তাহা কটাক্ষে উড়াইয়া দিতে পারি না?" সহসা নিশাকালের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাদের সেই সুখ-বিহ্বল মোহ ভঙ্গ করিয়া, দূরে নিশীথ গগণ গীত ধ্বনিতে

পূর্ণ হইল। রমেশ মালতীর গলা চিনিতে পারিলেন। এত রাত্রেও মালতী ঘরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে, তিনি আশ্চর্য্য হইলেন, বলিলেন "শোভনা, মালতী এখনো কুটীরে আসে নাই, একাকী বেড়াইতেছে!" বলিয়াই যেন রমেশের কি মনে হইল; একটু হাসিয়া বলিলেন "শোভনা, ইহা হইতে না জানি আবার আমার কত ব্যাকুলতাই কত প্রেমই দেখিবে?" শোভনা লজ্জিত হইয়া বলিল "সত্যি মালতী এখনো একেলা বেড়াচ্ছে, হয়তো সব দেখে শুনে রুষ্টে সে আজ ঘরে আসে নাই। আমি মালতীর নিকট ঘোর অপরাধে অপরাধী, আমি যাই—তাহাকে ডেকে আনি, আমি যাই, তাহার কাছে কেঁদে মার্জ্জনা ভিক্ষা করি, আমি হাজার দোষ করিলেও মালতী কখনো রাগ করে নাই, আজ কি আমি পায়ে ধরিলেও আমাকে মাপ করিবে না?" রমেশ বলিলেন "না শোভনে, বাহিরে বড় অন্ধকার, মালতী কোথায় তার ঠিক নেই, তোমার গিয়ে কাজ নেই, আমিই খুঁজে আনি"

সহসা আবার গীত ধ্বনি উথলিয়া উঠিল, স্পষ্ট রূপে কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল, তাঁহারা শুনিলেন—

দূর বিজন বনে একাকী যাইব চ'লে
মানুষ-নিশ্বাস-বায়—যে খানে নাহি উথলে,
অনাথিনী উদাসিনী, যাব চলি একাকিনী,
আরতো দোসর আশা রাখিনা মরম তলে।
ভালবাসা প্রতিদান, সে আশাও অবসান
অবসান সুখআশা সব সাধ এ কপালে—
সুখেরি জনম যার, এই এ দুখিনী আর
দিবেনা সে সুখে বাধা—কাঁদাবে না পলে পলে,
সাক্ষী থেকো রবি শশী, জ্বলন্ত তারকারাশি
সাক্ষী থেকো গিরি নদী তোমরা সকলে—
যতই যাতনা স'ই, যে খানেই মোরে রই,
সুখে রব সুখী ভেবে দেখিও হৃদয় খুলে।

গানটি তাঁহাদের হৃদয়ের গভীর তল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল, সেই বিষাদময় অথচ সুধাবর্ষী গগণ স্পর্শী সুরে রমেশ চমকিয়া উঠিলেন, অজ্ঞাত কারণে তাঁহার হৃদয় বড়ই চঞ্চল হইল, হৃদয়ে কি একটি যেন বেদনা বোধ হইতে লাগিল, উঠিয়া কুটীর দ্বার খুলিলেন, অমনি বাতাস আসিয়া দীপটি নিভিয়া গেল, কুটীর অন্ধকারময় হইল। শোভনার অন্ধকারে ভয় ছিল না, সহসা আজ নূতন অজ্ঞাত ভয়ে সে কাঁদিয়া উঠিল। রমেশ একবার ফিরিয়া চাহিলেন, শোভনার ঝাঁপ দিবার কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। সহসা গান বন্ধ হইল, সেই আঁধার নিশীথের নিস্তব্ধতা আবার মুহূর্ত্তকাল জন্য সম্পূর্ণ রূপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিল, রমেশের হৃদয়ে ও কেমন একটি স্থির বিষাদ ভাব আসিয়া আধিপত্য করিল। রমেশ দৌড়িয়া ব্যাকুল ভাবে সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া কুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কেন যে তাঁহার মন দারুণ ভারাক্রান্ত হইল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

চারি দিক কি অন্ধকার, চারিদিক কি প্রশান্ত—কি গম্ভীর কি নিস্তব্ধ। আকাশে শত শত তারা জ্বলিতেছে

তবু আকাশ অন্ধকার, গাছে গাছে পাতায় পাতায় অসংখ্য অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে তবু পৃথিবী অন্ধকার। সেই আঁধার নিঃশব্দ প্রান্তর দিয়া চলিতে চলিতে একটি অসাধারণ ভয়ে রমেশ শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয় যেন স্তম্ভিত হইল, শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ যেন বন্ধ হইল, চলৎশক্তি তাঁহার যেন রহিত হইল। কিন্তু সহসা একি এ! এই প্রান্তরের ভীষণ নিঃশব্দতা মুহূর্ত্তের জন্য কিসের শব্দে ভীষণ ভাবে ভঙ্গ হইল? কই, আর শুনা যায় না; নদীগর্ভে কিছু কঠিন দ্রব্য পড়িবার শব্দ কি এ?"

আবার সেই সন্ধ্যাকালের ভয়ানক ঘটনার কথা রমেশের মনে পড়িল, রমেশ যেন মনশ্চক্ষে তাহা দেখিলেন রমেশ, কণ্টকিতকায় হইলেন।

রমেশের নির্জ্জীব প্রাণে প্রাণ আসিল, শোণিত বেগে বহমান হইল, দেহে আবার বল আসিল, রমেশ কাতর চিত্তে মালতী মালতী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে নদীতীরে ছুটিয়া আসিলেন। দেখিলেন নদীবক্ষে তরঙ্গ নাই, উচ্ছ্বাস নাই, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব-প্রকাশক অসাধারণ কোন ভাবই নাই, মৃদু মৃদু নিয়মিত ভাবে নিঃস্তব্ধে সুখময়ী বহিয়া যাইতেছে।

রমেশ এদিকে ওদিকে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। মালতীর কোন চিহ্ন পাইলেন না।

রমেশ উন্মত্তের মত আবার মালতী মালতী বলিয়া ডাকিলেন, নদী, প্রান্তর আকাশ পৃথিবী তাঁহার আর্ত্তনাদে প্রতিধ্বনিত হইল, কিন্তু হায়—কোন মালতীই আর উত্তর করিল না।

সমাপ্ত।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

সমালোচক এক কটাক্ষেই জানিতে পারিয়াছেন যে কালিদাস উচ্চ শ্রেণীর নাটককার নহেন—সে কটাক্ষটি এই, "দান্তে তাঁহার আশ্চর্য্য কল্পনা-শক্তির সহায়ে জগদ্বিখ্যাত দিবাইনা কমেদিয়া লিখিয়াছেন। সেক্সপিয়র এবং স্কট অতি সামান্য গল্প অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্ব নাটক এবং উপন্যাস রচনা করিয়াছেন *। অতএব যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলি সম্ভব।

* সেক্সপিয়রের প্রধান প্রধান মুদ্রাঙ্কনকারেরা দেখাইয়াছেন যে, উহার আখ্যায়িকা-সকল তাহাদের মূল উপাখ্যান-সমস্ত

* * * * * অতএব আমাদের বিশ্বাস এই যে যদি কালিদাস ইহা অপেক্ষা আখ্যায়িকা আরো চমৎকারিণী করিতে না পারিলেন তাহা হইলে তিনি উচ্চ শ্রেণীর নাটককারদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না।" লেখকের অভিপ্রায় এই যে, যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলি সম্ভব —কালিদাসের পক্ষে সেক্সপিয়র হওয়া সম্ভব—মিল্‌টন হওয়া সম্ভব—দান্তে হওয়া সম্ভব—নিদেন পক্ষে স্কট হওয়াও ত সম্ভব, তবে কেন তিনি উঁহাদের এক জনের মত ও না হইলেন, ইহাতে অবশ্য তাঁহার হার—আর উঁহাদের সকলেরই জিত! আর এক সমালোচক এইরূপ বলিতে পারেন যে, মিল্‌টনের কবিতাবলী যেমন বাটালি-খোদা ধরণের, সেক্সপিয়রের কবিতা তেমন নহে, সেক্সপিয়রের কবিতা দেখিলে মনে হয় যেন তাহা জলের মত অবাধে চলিয়াছে—"যিনি যথার্থ কবি তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব" সেক্সপিয়র যদি যথার্থ কবি হইতেন তবে মিল্‌টনের মত কবি হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত, কিন্তু সেক্সপিয়র মিল্‌টনের মত কবিতা লিখিতে পারেন নাই, অতএব প্রমাণ হইল যে সেক্সপিয়র উচ্চ শ্রেণীর নাটককার নহেন! যা'ক্,—প্রকৃত কথা এই যে, সেক্সপিয়রও মিলটনের মত নহেন, মিল্‌টন্‌ও দান্তের মত নহেন, দান্তেও সেক্সপিয়রের মত নহেন, সেক্সপিয়রও কালিদাসের মত নহেন, ইহাতে বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ভিন্ন আর কিছুই প্রমাণ হয় না। দান্তের মত বা মিল্টনের মত কবি হইতে চেষ্টা করা বর্ত্তমান কালের কোন বঙ্গ-কবিকুল-চূড়-কেই শোভা পায় —তাহা কালিদাসকেও শোভা পায় না, সেক্সপিয়রকেও নহে; সেক্সপিয়র এবং কালিদাস উভয়ই স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ—ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু সেক্সপিয়রের গ্রন্থ-হইতে লেখক যে সুন্দর কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন সে-বিষয়ে কালিদাস কোন অংশেই হীন নহেন, সে কবিতাটি এই The poet"s eye in fine frenzy rolling

---

হইতে প্রায় কিছুই ভিন্ন নহে—সুতরাং সেক্সপিয়র তাঁহার নাটকের গল্পচাতুরীর জন্য বড় একটা সম্মান পাইতে পারেন না,—সেক্সপিয়রের কবিত্বই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। টেম্পেস্টের গল্প-চাতুরী শকুন্তলার অপেক্ষা কম বই বেশী নহে —তবে কেন টেম্পেস্ট একটি অতি চমৎকার নাটক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল? সুবিখ্যাত সমালোচক শ্লেগেল এইরূপ বলেন "The Tempest has little action or progressive movement ; the union of Ferdinand and Miranda is settled at their first interview, and Prospero merely throws apparent obstacles in their way the shipwrecked band goleisurely about the island; the attempt of Sebastian and Antonio on the life of the king of Naples and the plot of caliban and the drunken sailors against Prospero are nothing but a feint for we foresee that they will be completely frustrated by the magical skill of the latter.

Doth glance from heaven to earth
and earth to heaven &. &.

যে কালিদাস আসমুদ্রক্ষিতীশানাং আনাকরথবর্ত্মনাং-রাজাদিগের জীবন-চরিত-গানে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন তাঁহার যদি চক্ষু পৃথিবী হইতে স্বর্গে স্বর্গ-হইতে পৃথিবীতে ঘূর্ণায়িত না হইবে তবে আর কাহার হইবে? কালিদাস যতবার তাঁহার নায়ক-নায়িকাদিগের সহিত পৃথিবী-হইতে স্বর্গে এবং স্বর্গ-হইতে পৃথিবীতে যাতায়াত করিয়াছেন ততবার সেক্সপিয়র নিজে করিয়াছেন কিনা সন্দেহ! ইন্দ্র, দেব-দেবী, মাতলী-সারথী, চিত্ররথ, দক্ষ, অযোধ্যা-পুরলক্ষ্মী, অলকা-পুরী, মারীচাশ্রম ইত্যাদি কত যে তাহা সংখ্যাতীত সমস্তই কালিদাসের ঘরের সামগ্রী—এ ত গেল অমরকোষের স্বর্গবর্গ, আবার যদি ক্ষিতিবর্গ দেখিতে চাও তবে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত—সমুদ্রের গর্ভ হইতে হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া পর্য্যন্ত সকলই কালিদাসের নখদর্পণে! অথচ লেখক কালিদাসের কবিতাতে আশ্চর্য্য কিছুই দেখিতে পা'ন নাই, তিনি বলেন "এক জন রাজা মৃগয়া করিতে গিয়া তপোবনে এক পরমা সুন্দরী বালা দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হইল ইহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নাই!" তিনি ইহাও বলিতে পারেন যে, টেম্পেষ্ট-নাটকের ফর্‌ডিনাণ্ড একটা উপদ্বীপে উঠিয়া এক পরমা সুন্দরী বালা দেখিতে পাইলেন, ইহাতে তাঁহার মনে প্রেমের সঞ্চার হইল ইহাতেও কিছুই আশ্চর্য্য নাই! তবে যদি ডাইনের পুত্র কালিবান্‌কে দেখিয়া মিরাণ্ডার মনে প্রেমের সঞ্চার হইত অথবা কালিবানের মাতাকে দেখিয়া ফর্ডিনাণ্ডের মনে প্রেমের সঞ্চার হইত, তাহা হইলে অবশ্য একটা অত্যাশ্চর্য্য পরমাদ্ভুত ব্যাপার হইত সন্দেহ নাই; সেক্সপিয়র তাঁহার "আখ্যায়িকাকে আরো চমৎকারিণী" করিবার অমন সুযোগ পাইয়াও ছাড়িয়া দিলেন—হায় কি দুরদৃষ্ট! তাহার পরে সমালোচক দুষ্মন্ত-রাজার প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিতেছেন "সকলেরই এরূপ হওয়া কিনা রূপবতী যুবতীকে দেখিয়া হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হওয়া) সম্ভব, তাহাতে আবার সে-কালের রাজারা বহু বিবাহ এবং অন্যায় প্রেমকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করিতেন না।" এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, রাজাদিগের বহুবিবাহ সে-কালের দেশাচার ছিল সুতরাং সে দোষের জন্য দুষ্মন্ত রাজা দায়ী হইতে পারেন না—কিন্তু তাই বলিয়া যে-সকল রাজা অবৈধ প্রেমকে দোষ বলিয়া জ্ঞান করেন না দুষ্মন্ত রাজা কি সেই দলের লোক? লেখক দুষ্মন্ত রাজার চরিত্রের মর্ম্মই বুঝিতে পারেন নাই; দুষ্মন্ত রাজা যদিও শকুন্তলার অসামান্য রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন তথাপি যতক্ষণ না তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা তাঁহার বৈধ প্রেমের পাত্রী ততক্ষণ তিনি আপনার মনের রশ্মি সংযমন করিয়া রহিয়াছিলেন—

কেন? তিনি অবৈধ প্রেমকে দোষ-জ্ঞান করিতেন না বলিয়া কি? এবং অমন পরমাসুন্দরী শকুন্তলাকে তিনি যে পশ্চাতে পরস্ত্রী-বোধে প্রত্যাখ্যান করেন —তাহারও কি করিণ ঐ? এখানে লেখক ছয় "Nothing extennate nor set down aught in malice" এই তাঁহার ব্রতটি ভঙ্গ করিয়াছেন, নয় দুষ্মন্ত রাজার চরিত্রের কণা-মাত্রও বুঝিতে পারেন নাই! লেখক অতঃপর বলিতেছেন "পরে রাজা সেই যুবতীকে গান্ধর্ব্ব-মতে বিবাহ করিলেন এবং শীঘ্রই নবোঢ়াকে রাজবাটীতে লইয়া যাইবেন স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ইহাতেও মনোহারিত্ব নাই।" রোমিও জুলিয়েট্‌কে লুকাইয়া বিবাহ করিয়াছিল, ইহাতেও মনোহারিত্ব নাই,—কেন না শত শত পঞ্চম শ্রেণীর নবেলে ঐরূপ ঘটনা নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যাহা আশ্চর্য্য এবং মনোহারী, দুষ্মন্ত যাহা দেখিয়া পাগল, তাহা লেখকের হৃদয়ে আমলই পায় নাই—এমনি মনোহারী যে, তাহা দেখিবা-মাত্র দুষ্মন্ত বলিয়া উঠিলেন।

অহো মধুরমাসাং দর্শনং।
শুদ্ধান্ত-দুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনোযদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥

দুষ্মন্ত। অহো! কি মধুর-দর্শন!
অন্তঃপুর-দুর্লভ রূপ-মাধুরী,
আশ্রম-বাসি-জনের এ যদি—বলিতে কি বা তবে—
গুণ-গরিমায়, এযে, বন-লতা
দূরে ফেলি দিয়াছে উদ্যান-লতা-সবে॥

এস্থলে কালিদাস যে প্রগাঢ় বিস্ময়ের ভাবটিকে দুইটি পংক্তির মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়াছেন এবং যাহা তিনি ইসারায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাকে যে, কত বিস্তার করিয়া বলা যাইতে পারে তাহা সেক্সপিয়র নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তিতে দেখাইয়াছেন।

Ferdinand. Admired Miranda
Indeed the top of admiration; worth
What's dearest to the world! Full many
I have eyed with best regard; and many a time
The harmony of their tongues hath into bondage
Brought my too deligent ear; for several virtues
Have I liked several women; never any
With so full soul, but some defect in her
Did quarrel with the noblest grace she owed,
And put it to the foil: but you, O you!
So perfect and so peerless are created
Of every creature's best.

এস্থলে ফর্ডিনাণ্ড আপনার মনের বিস্ময়-

ভাব প্রেয়সীর শ্রবণগোচরে অনাবৃত করিয়া ঢালিয়া দিতেছে, এজন্য ইহা এত বিস্তারিত না হইলে ঠিক হইত না, কিন্তু দুষ্মন্তের ঐ যে বিস্ময়ের ভাব উহা তাঁহার আত্মগত, এজন্য তাঁহার মুখ হইতে অল্প একটু আভাস যাহা বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহার মনের ভিতরকার প্রকৃত বিস্ময়-ভাবের পরিচয় দিতেছে; এস্থলে কালিদাস দুষ্মন্তকে অধিক কথা কহাইলে দুষ্মন্তের দর্শনেন্দ্রিয়ের একনিষ্ঠ তদ্গত-ভাবের ব্যাঘাত জন্মানো হইত—দুষ্মন্তকে কালিদাস এখানে এরূপ করিয়া দাঁড় করাইয়াছেন যে, বাহুল্য কথা একটিও উচ্চারণ করিবার তাঁহার অবকাশ নাই—তবে দুষ্মন্তের মনে নিতান্ত যখন এরূপ কোন ভাব উদয় হইয়াছে যাহাকে মনোমধ্যে ধরিয়া রাখা যায় না তখনই কেবল তাঁহার কণ্ঠ হইতে তৎকালোচিত বাক্য নিঃসারিত হইয়াছে। আশ্রম-বাসিনী এক জন রূপ-যৌবন-সম্পন্না বালার অকৃত্রিম সখ্যালাপ ও হৃদয়ের সরল প্রেমোচ্ছ্বাস আশ্চর্য্য কিছুই নহে—রাফেয়েলের কৃত মেরি এবং শিশু যীশুর ছবিই বা কি এমন আশ্চর্য্য পদার্থ? মাতা শিশুকে কোলে করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে এতে কা'র কি এ'ল গেল, অথচ যে দেখে সেই বলে—চমৎকার। কালিদাস বলো, সেক্সপিয়র বলো, মিলটন্ বলো, সকলকেই জিতিয়াছে—এক যা' গ্রন্থ আরব্য উপন্যাস! সেই গ্রন্থখানিকে চক্ষের সামনে ধরিয়া তাহার মধ্য দিয়া কালিদাসের শকুন্তলাকে দেখিলে মনে হইবে যে, এ এক জন আশ্রম-বাসিনী সামান্য বালিকা বই নহে—রাজা-রাজড়ার মেয়ে নহে—ইহাকে লাভ করিবার জন্য রাজাকে কোন অলৌকিক ভৌতিক ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় নাই—তবে একে নিয়ে কেন এত গণ্ডগোল! দুর্ব্বাসার শাপে রাজার স্মৃতিরোধ অবধি করিয়া শকুন্তলার সমাপ্তি পর্য্যন্ত লেখক একটি কোথাও আশ্চর্য্য খুঁজিয়া পা'ন নাই; তিনি বলেন "যদাপি এমন হইত যে, কোন ইয়াগোর ন্যায় সয়তানের দুরভিসন্ধিতে রাজার প্রেমময় মন কলুষিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য তিনি শকুন্তলাকে অবমাননার সহিত দূরীকৃত করিলেন, পরে সমস্ত অবগত হইয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া শকুন্তলাকে পাইলেন তাহা হইলে কল্পনার পরিচয় পাওয়া যাইত *। কারণ রাজার মনকে অবস্থান্তরে লইয়া যাওয়া ও পরে ক্রমশ যথার্থ ঘটনা-সকল প্রকাশ করা ইহাতে অনেক কৌশলের আবশ্যক হইত। কিন্তু দুর্ব্বাসার শাপ সংযোজনা করাতে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহাতে মূল উপাখ্যান অপেক্ষা নাটক ভাল হইয়াছে বটে কিন্তু একটি দোষ ঘটিয়াছে। যখন আমরা জানিলাম যে দুর্ব্বাসার শাপ-বলে এরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল তখন আমাদের যাদৃশ ঔৎসুক্য †

* এস্থলে কল্পনা-শব্দের পরিবর্ত্তে গল্প-রচনা-কৌশল বলিলে ঠিক হইত।

† আখ্যায়িকা সম্বন্ধীয় ঔৎসুক্য স্বতন্ত্র এবং কবিত্ব-সম্বন্ধীয় ঔৎসুক্য স্বতন্ত্র; আমরা

হওয়া সম্ভব তাদৃশ হইল না। কারণ যদিও জানিলাম যে, দুর্ব্বাসার শাপ-বলে শকুন্তলাকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িতে হইবে তথাপি কবি কিরূপ করিয়া একই দুষ্মন্ত রাজাকে দুই অবস্থায় দুইরূপ আচরণ করাইবেন, অমন সরলা বালা শকুন্তলাকেই বা কিরূপ আচরণ করাইবেন, ইহার ঔৎসুক্য আমাদের মনে প্রবল না হইয়া থাকিতে পারে না পরে যখন শকুন্তলা-দর্শনে দুষ্মন্ত রাজাকে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে বলিতে শুনা যায় "কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-লাবণ্যা" তখন আমাদের মনে কি যে এক অপূর্ব্ব কৌতূহল জন্মে তাহা বলা যায় না; তখন মনে হয় যে, রাজার মর্ম্মাভ্যন্তর হইতে প্রসুপ্ত স্মৃতি উঁকি ঝুঁকি করিতেছে কিন্তু শাপের গুরুভার কিছুতেই ঠেলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না—রাজা কি বলে শুনা যাক—শকুন্তলাই বা কি বলে শুনা যা'ক! গল্প-চাতুরী আমাদের মনে যেরূপ কৌতূহল জন্মাইয়া দেয় তাহা অবশ্য প্রধান, কিন্তু আমরা যে কৌতূহলের কথা বলিতেছি তাহা ভাব-প্রধান! রাজপুত্র সদাগরের পুত্র পাত্রের পুত্র কোটালের পুত্র চারিজন চারি পথে চলিল, এখন কাহার কি অবস্থা হয় দেখা যা'ক—এই এক কৌতূহল. আর এ এক কৌতূহল যে,এমন সুকুমার বস্তু শকুন্তলা—তাহার সম্মুখে কি না জানি এক নিদারুণ বিপদ মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, তেমন কঠোর বিপদের সময় ওরূপ কোমল হৃদয়টির ভাব কিরূপ হয় দেখা যা'ক, শকুন্তলার প্রেমে উন্মত্ত এমন যে রাজা দুষ্মন্ত, শাপভারে প্রপীড়িত হইয়া তাহারই বা মনের কিরূপ ভাব হয় দেখা যাক্, এইরূপ কৌতূহল উদ্দীপন করা,ও তাহাকে রীতিমত চরিতার্থ করাতেই নাটকের নাট্যনিপুণতা প্রকাশ পায়। এমন এমন স্থল আছে যেখানে গল্প-নিপুণতা দেখাইতে গেলে নাট্য-নিপুণতার ব্যাঘাত হয় ও নাট্য-নিপুণতা দেখাইতে গেলে গল্প-নিপুণতার ব্যাঘাত হয়; এ সকল স্থলে নাটককারের গল্প-নিপুণতা না নাট্য-নিপুণতা, কি হইলে ভাল হয়? ষড়যন্ত্র দ্বারা রাজাকে শকুন্তলার পাণিগ্রহণে বঞ্চিত করানো হইলে খুব নয় একটা ভাল গল্প খাড়া হইত, কিন্তু তাহা হইলে,—স্মৃতি প্রসুপ্ত,ধর্ম্ম প্রহরীরূপে জাগ্রত, প্রেম দুয়ের মধ্যে দোলায়মান, এই যে একটি মনোহর নাট্য, এটির কি দশা হইত?

ঋষিরা প্রায় দেবতা বলিলেই হয়, এমন কি কেহ কেহ দেবতা অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী *। তাঁহারা যাহা বলিবেন

* টেম্পেষ্ট সম্বন্ধেও স্লেগেল বলেন যে, The attempts of Sebastian and Antonio on the life of the king of Naples and the plot of Caliban and the drunken sailors against Prospero are nothing but a feint for we foresee that they will be completely frustrated by the magical skill of the latter. কিন্তু এই দোষটি খণ্ডন করিয়া তিনিই আবার বলিয়াছেন যে, Yet this want of movement is so admirably concealed by the most varied display of the fascinations of poetry * * * that it requires no small degree of attention to perceive that the denuement is in some degree anticipated in the exposition. ইহার ভিতরকার ভাব এই যে, নাটকের গল্প-চাতুরী অপেক্ষা কবিতা-মাধুর্য্যের মূল্য অধিক—এত অধিক যে গল্পচাতুরীর অভাব সত্ত্বেও টেম্পেষ্ট সেক্সপিয়রের একটি ওস্তাদি রচনা বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ।

তাহা বিধাতার আজ্ঞার ন্যায় কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না; অতএব অদৃষ্টে আছে বলিয়া যেমন লোকে শোক সম্বরণ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করে আমরাও তেমনি শকুন্তলার অদৃষ্টে দুঃখ ভোগ আছে বলিয়া ক্ষান্ত হই এবং আমাদের ঔৎসুক্য হ্রাস হয়।" ইহার প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, বড় বড় নাট্যকারদিগের নাটক মাত্রই একটি সর্ব্বাঙ্গীন অখণ্ড বস্তু, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Organic whole; তাহার মধ্য হইতে একটা কোন কিছু নড়াইয়া তাহার স্থানে আর একটা কিছু বসাইলে আশ্চর্য্য একটা ব্যাপার খাড়া হইতে পারে সত্য কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যটি একবারে লোপ পাইয়া যায়—তাহা হইলে কার্ত্তিকটি গণেশ হইয়া পড়ে। হস্তীর কি সৌন্দর্য্য নাই? আছে, কিন্তু যদি হস্তীর মুণ্ডে মানুষের ধড় যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে হস্তীর সৌন্দর্য্যটিও প্রস্থান করে মনুষ্যের সৌন্দর্য্যটিও অন্তর্ধান হয়, তাহা হইলে হইবার মধ্যে একটা গণেশ ঠাকুর খাড়া হন। শকুন্তলা কিরূপ, দুষ্মন্ত কি রূপ, কণ্বমুনি কিরূপ, এ-গুলি একবার অনুধাবন করিয়া দেখিলেই ইহাগোর ন্যায় এক ব্যক্তিকে শকুন্তলার মধ্যে স্থান দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং দুর্ব্বাসাকে কণ্বাশ্রমে আনা সঙ্গত হইয়াছে কি না তাহা স্পষ্টাক্ষরে বুঝা যাইতে পারিবে। দুষ্মন্ত একজন রাজধর্ম্মপরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, দয়া-দাক্ষিণ্যশালী, শ্রদ্ধাভক্তি-সমন্বিত প্রজাবৎসল রাজা; শকুন্তলা একটি নির্ম্মলসুন্দর বনলতা, ছলচাতুরী জানে না—মনে প্রেম উদয় হইলে তাহা ছলে কলে প্রকাশ করিতে জানে না—ঋজুকে পষ্টাপষ্টি এক চিঠি লিখিয়া বসিল—(লেখক একস্থানে এই ভাবে বলিয়াছেন যেন শকুন্তলা নাগরী জনের ন্যায় হাব ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, ইহার প্রতিবাদ যথাস্থানে আসিবে) শকুন্তলা গান্ধর্ব্ব বিবাহের কথা ইতিহাসে শুনিয়াছিল সুতরাং উহার বৈধতা-বিষয়ে তাহার একটুও সংশয় ছিল না, এবং রাজা যখন তাহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, তিনি তাহাকে অচিরাৎ অন্তঃপুরের গৃহিনী করিবেন তাহাতেও তাহার একটুও সংশয় হয় নাই—সুতরাং দাম্পত্য-প্রেমের বিধান অনুসারে বিচার করিলে না রাজাকে না শকুন্তলাকে উভয়ের কাহাকেও কোন অংশে দোষী করা যায় না। কণ্বমুনির চরিত্র যেমনটি হইতে হয় তাই—তিনি অরণ্যবাসী তপস্বী কিন্তু তাঁহার হৃদয় অতি অমায়িক, প্রশস্ত, স্নেহ-মমতায় পরিপূর্ণ; তিনি সংসারের সকলই তুচ্ছ করিয়াছেন, অথচ সকলেরই প্রতি তাঁহার প্রাণের টান বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে; মারীচমুনি এবং কণ্বমুনি দোঁহার সহিত দোঁহার তুলনায় উভয়ের গুণ-বৈপরীত্য-বশতঃ উভয়েরই সৌন্দর্য্য স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হয়; এতদ্ব্যতীত শার্ঙ্গরব বলো, শারদ্বত বলো, রাজার শ্যালক নগরপাল বলো, একজনও কু-অভিসন্ধির লোক নহে;

ধর্ম্মের তপোবন, ধর্ম্মের রাজ্য, ধর্ম্মের সংসার, দুষ্মন্তরাজ্য রাজধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ এবং শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া, এমনি যে—তাহার গুণে প্রথমতঃ তপোবনের সখীদিগের সরস সখ্যালাপ, দ্বিতীয়তঃ অতবড় রাজার আশ্রমবাসিনী সখীদের নিকট অতদূর নীচু হওয়া, তৃতীয়তঃ শকুন্তলা-বিরহে রাজার রাজকার্য্যে অপ্রবৃত্তি—ইত্যাদি-সমুদয় অশাস্ত্রীয় কাজগুলিও উল্‌টো আরো পবিত্র মাধুর্য্য ধারণ করিয়াছে; সখীদিগের ধর্ম্ম-জ্ঞান থাকাতেই তাহাদের সরস সখ্যালাপের মধ্যে কু কোন-কিছু প্রবেশ করিতে পারে নাই, তপোবনের প্রতি রাজার অসাধারণ শ্রদ্ধা ভক্তি থাকাতেই সেখানে রাজার হেঁট মস্তক সুন্দর শোভা পাইয়াছে, এবং রাজকার্য্যে রাজার অপ্রবৃত্তি হইলেও তিনি প্রকারান্তরে কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের ত্রুটি করেন নাই ইহাতে তাঁহার মহৎ প্রকৃতি আরো জাজ্বল্যরূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপ সেখানে—সেখানে ইয়াগোর ন্যায় একটা ঘোর নারকীকে আনিয়া দাঁড় করাইলে কি যে এক অদ্ভুত কাণ্ড করা হয় তাহা আর বলিবার নহে। সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে যে, সমালোচ্য নাটক-খানি কিভাবের নাটক—তাহার অঙ্গ-বিশেষ কিরূপ হওয়া উচিত তাহার বিচার পরে; যদি নাটক হস্তীর মত হয় তবে তাহার গজ-দন্ত না থাকিলে তাহার মুখে গজ দন্ত বসাইয়া দেও, সে অতি উত্তম কাজ; কিন্তু নাটক যদি অশ্বের মত হয় তবে তাহার দন্ত-গুলি ভাঙিয়া ফেলিয়া তাহার পরিবর্ত্তে বৃহৎ দুইটা গজদন্ত বসাইয়া দিলে তাহা কেবল যন্ত্রণারই কারণ হয়। পুনশ্চ, সে-কালের কালিদাস যেন দুর্ব্বাসার শাপের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন, একালের আর কোন বড় নাটককার কি সেরূপ কোন অলৌকিক ক্ষমতার সহায়তা গ্রহণ করেন নাই? সেক্সপিয়র্ কি করিয়াছেন? প্রস্পেরো আপনার মন্ত্র-বিদ্যা-বলে ফর্ডিনাণ্ড এবং মিরাণ্ডাকে পরস্পরের প্রেম-পাশে বদ্ধ করিতে পারিলেন—আর দুর্ব্বাসা শাপ-দ্বারা রাজার স্মৃতি-রোধ করিতে পারিবেন না?—বড় বড় কবিরা ওরূপ যে করেন, তাহা কি অক্ষমতাবশতঃ না তাহার আর কোন অর্থ আছে—এটাও ত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। কালিদাস রাজার স্মৃতি-ভ্রংশ মহাভারত হইতে পাইয়াছেন, কিন্তু কালিদাসের দুষ্মন্তও মহাভারতের দুষ্মন্ত নহে, কালিদাসের শকুন্তলাও মহাভারতের শকুন্তলা নহে; কালিদাসের ভাবনা এই যে, দুষ্মন্তের মহৎ চরিত্র, তপোবনের বন্য সরল ভাব, এবং আর আর দেশ কাল পাত্র অবস্থার সঙ্গে ঠিক্ সংলগ্ন হইবে অথচ দুষ্মন্তের স্মৃতি-ভ্রংশ হইবে—এই বিষম সমস্যাটি কিসে পূরণ হয়; কোন দুষ্ট ব্যক্তির কল-কৌশলে রাজার স্মৃতি-ভ্রংশ করা একটা কিম্ভূত ব্যাপার, তাহাতে আবার শকুন্তলা যে ভাবের নাটক তাহাতে চানক্যের মত দুষ্ট লোক তাহার ত্রিসীমাতেও পদার্পণ করিবার যোগ্য নহে, এরূপ স্থলে দুর্ব্বাসার শাপকে আনা যে, কত ক্ষমতার কার্য্য তাহা বলা যায় না; ঐ একটিতে করিয়া সকল দিক্

রক্ষা পাইয়াছে,—তপোবনের তপোবনত্ব, রাজার মহত্ব, মহাভারতের আখ্যায়িকা, শকুন্তলার প্রেমাতিশয্য, সখীদের শকুন্তলা-গত-প্রাণ সখীত্ব, এত গুলি যে কেবল রক্ষা পাইয়াছে তাহা নহে—অতি সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। সেক্‌স্‌পিয়রের টেম্পেস্টে ইয়াগোর মত ষড়-যন্ত্র নাই বলিয়া কি টেম্পেস্ট্ ওথেলো-অপেক্ষা নিকৃষ্ট? বরং সেক্‌স্‌পিয়র প্রস্পেরোর সহায়তা ব্যতিরেকেও তাঁহার নায়ক-নায়িকার মনে প্রেমোদ্দীপন করিতে পারিতেন—কিন্তু কালিদাস যাহা করিয়াছেন কাহারো সাধ্য নাই যে,তাহার পরিবর্ত্তে আর একটি-কোন-কিছু স্থাপন করেন। মহাভারতের আখ্যায়িকার গল্পাংশটির উপর কালিদাস হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, তাহার কোন অংশ ছাঁটিয়া ফেলিতেও পারেন না, কিন্তু তাহাকে চাই বাড়া'ন, চাই তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করুন—তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং তাহাই তিনি করিয়াছেন। বাড়াইবার অধিকার আছে কেন—না মহাভারত দুষ্মন্তের জীবনের সকল বৃত্তান্ত বলেন নাই, যাহা তিনি বলেন নাই তাহা আর এক জন বলিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, আখ্যায়িকার ভাব-পরিবর্ত্তনে অধিকার আছে কেন—না মহাভারতের মূল কথাটি বজায় রাখিয়া যিনি যে ভাবে তাহা দেখুন বা বলুন না কেন তাহাতেও মহাভারতের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় না, কিন্তু মহাভারতে যেখানে আছে স্মৃতিভ্রংশ আর এক জন যদি সেই খানে তাহার পরিবর্ত্তে ক্রোধান্ধতা বা অন্য কোন কিছু বসা'ন তাহা হইলে মহাভারতের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। মিল্‌টন বাইবেলের সয়তানের যার পক্ষ নাই, ভাব-পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আদমের সহিত গেব্রিএল প্রভৃতির কথোপকথন যাহা বাইবেলে নাই তাহাও তিনি আপনার পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু বাইবেলের একটা কোন বৃত্তান্তের পরিবর্ত্তে আর একটা বৃত্তান্ত তিনি কোথায় বসাইয়াছেন দেখাইয়া দেও। অলৌকিক ফল ভক্ষণের পরিবর্ত্তে তিনি আর একটা এমন উপন্যাস সাজাইতে পারিতেন যাহাতে আদম ঈশ্বরের কোপে পড়েন অথচ অলৌকিক কোন কিছুর সহিত তাঁহার সম্পর্ক না থাকে—কিন্তু খ্রীষ্টান হইয়া তিনি তাহা করিবেন কেন? ঐ কারণেই কালিদাস হিন্দু হইয়া মহাভারতের আখ্যায়িকার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতে পারেন নাই,—পারিয়াছেন কেবল ভাব-পরিবর্ত্তন করিতে এবং বাড়াইতে। অতএব কালিদাস দুষ্মন্ত রাজার স্মৃতি-ভ্রংশের পরিবর্ত্তে আর কোন কিছু বসাইতে পারেন না,—এই গেল এক কথা, আর এক কথা এই যে, কাহারো বিপক্ষে সহস্র ষড়-যন্ত্র করিলেও তাহার স্মৃতি-ভ্রংশ সম্ভবে না, তবে যদি কোন শত্রু-পক্ষীয় লোক গুপ্ত-ভাবে রাজাকে কোন মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া তাঁহার স্মৃতি-সংহার করে, তাহাই যা' এক হইতে পারে, কিন্তু রাজার স্মৃতিসংহার করিবার জন্য

ওরূপ উপায় অবলম্বন করা একটি অতি হাস্যজনক ব্যাপার,—এরূপ স্থলে দুর্ব্বাসার শাপ যে কি লগ্ন-মাফিক আসিয়াছে তাহা বলা যায় না; বিশেষত শকুন্তলার অন্যমনস্কতা কবিত্ব-রসে পরিপূর্ণ। নাটকের প্রধান গুণ যেটি—যাহাতে সহজে বড় কবি ছোট কবি ধরা পড়ে—সেটি কি? না আগা গোড়া চরিত্র ঠিক রাখা সেই উদ্দেশেই কালিদাস দুর্ব্বাসার শাপের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন—তাহাতে আখ্যায়িকার বিশেষ কিছু চমৎকারিতা বাড়ে নাই—কেবল কবিত্ব-শক্তির একশেষ প্রকাশ পাইয়াছে।

"আখ্যায়িকার চমৎকারিত্ব" এই যে একটি ধুয়া লেখক ধরিয়াছেন, ইহা ক্রমাগতই চলিয়াছে। লেখক বোধ হয় নবেলের বিশেষ এক জন অনুরাগী,—ভাবের উচ্ছ্বাস কবিতা-মাধুর্য্য ইত্যাদি অপেক্ষা আখ্যায়িকার মনোহারিত্ব তিনি কিছু বেশী বোঝেন,—কিন্তু যাঁহারা শকুন্তলা নাটকের প্রকৃত চমৎকারিত্ব হৃদয়ঙ্গম করেন তাঁহারা আখ্যায়িকার গুণপনার দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না, শকুন্তলা পাঠ করিতে করিতে তাঁহাদের মনে আশ্চর্য্য এক ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যায়; গেটের মনে কিরূপ ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া গিয়াছিল তাহা কাহারো অবিদিত নাই; গেটের ন্যায় কবিতা-সমালোচক ক-জন আছে—তিনি যেমন কবিদিগের মধ্যে এক জন শ্রেষ্ঠ কবি, তেমনি প্রকৃত কবিদিগের এক জন প্রধান গুণ-গ্রাহী, তিনি যেমন রত্ন তেমনি জহরী—তাঁহারই লেখনী-প্রসাদাৎ সেক্সপিয়রের হ্যামলেটের অসাধারণ কবিত্ব সমাক প্রকারে জন-সাধারণের চক্ষে পড়ে, সেক্সপিয়রের যেমন গেটে কালিদাসের তেমনি একজন সমালোচক হইলে তবেই ঠিক মানায়। বোধ হয় লেখক সেক্সপিয়রের রুদ্ররসাত্মক নাটককে (Tragedyকে) আদর্শ করিয়া শকুন্তলার বিচার করিয়াছেন, তাই তিনি শকুন্তলাতে কিছুই চমৎকারিত্ব (অর্থাৎ গুরুতর ঘটনার লোমহর্ষণ ব্যাপার) আদবেই খুঁজিয়া পা'ন নাই। এ জ্ঞান তাঁহার নাই যে, রুদ্র-রসাত্মক নাটক এবং শান্তি-রসাত্মক নাটক দুয়ের অবয়ব ঠিক একই প্রকার হইতে পারে না। ঘটনা-সকলের ক্রম-পরিপাক বশতঃ দারুণ এক রুদ্রকার্য্যে তাহাতের পরিসমাপ্তি এ যে একটি ব্যাপার—যাহা ম্যাগবেথ বা ওথেলোতে ভয়ানকরূপে দেখিতে পাওয়া যায়—তাহা টেম্পেটের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—তবে আর টেম্পেষ্টের কবিত্ব কবিত্বই নহে—অবাক্ কাণ্ড! ওথেলো বা ম্যাকবেথের কার্য্যাবলীর অলক্ষিত-অথচ-অব্যর্থ-গতি নিদারুণ পরিপাক যেমন একটি গুণ, শকুন্তলার প্রশান্ত সরল মাধুর্য্য এবং সৌন্দর্য্য তেমনি একটি গুণ, জবা ফুলের রক্তবর্ণ যেমন একটি গুণ, গোলাব ফুলের পাটল বর্ণ তেমনি একটি গুণ, দোষ কোনটিই নহে; গায়ে রক্ত মাখিয়া জবা-ফুলের মত হওয়া গোলাব-ফুলকে শোভা পায় না; মিরাণ্ডা বরং কাটের বোঝা বহন করিতে পারে, কিন্তু ওথেলোর ন্যায় ঈর্ষার ভার, এবং ম্যাকবে

থের ন্যায় দারুণ হত্যাকাণ্ডের ভার বহন করা তাহার কার্য্য নহে। আর একটা দেখিতে হইবে এই যে, মিথ্যা বলিলে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আর দশটা মিথ্যা বলা আবশ্যক হয়—কুকার্য্য-মাত্রই এইরূপ; তাহার সাক্ষী ম্যাক্‌বেথের খুনাখুনি ব্যাপার; তেমনি আবার একটা দারুণ দুষ্কর্ম্ম করিতে গেলে কতদিক না সামলাইয়া চলিতে হয় ও আপনার অভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য কত না আয়াস পাইতে হয়; দেখ আইয়াগো কত চেষ্টার পর তবে আপনার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল; অতএব ইহা বলা বাহুল্য যে, দারুণ দুষ্কর্ম্মের পরিণাম এবং "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" দেখানো যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহাতে ঘটনার গতি-বৈচিত্র্য অলঙ্ঘনীয় কিন্তু মনুষ্যের ভালোর দিকটা দেখানো যে নাটকের উদ্দেশ্য তাহাতে ওরূপ ঘটনার জটিলতা কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় না; মিথ্যাকেই ডালপালা দিয়া সাজাইতে হয়—সত্যকে নহে,মনুষ্যের মন্দের দিক দেখাইতে গেলেই একটা কুকার্য্যকে বাঁচাইবার জন্য আর দশটা কুকার্য্য আবশ্যক হয়, এবং পরিশেষে ঐরূপ-সমস্ত কার্য্য চারিদিক হইতে ঘনীভূত হইয়া মহা এক দারুণ কার্য্যে পরিণত হয়। কিন্তু মনুষ্যের ভালোর দিক্ দেখাইতে গেলে অমন-ধারা ঘন-ঘটা আড়ম্বরের আবশ্যক হয় না। শকুন্তলা যদি ম্যাক্‌বেথ এবং এথেলোর মত কুটিল ষড়যন্ত্রে পূর্ণ হইত তবে শকুন্তলা-নাটকের শকুন্তলাত্ব ঘুচিয়া যাইত। একটা উপবনে প্রবেশ করিয়া কেহ যদি বলেন যে, এস্থানের একটি প্রধান দোষ এই যে,শ্মশানে যেমন শকুনিরা মাংস ছেঁড়াছিঁড়ি করে এখানে সেটি নাই, তবে তিনি যেমন রসজ্ঞ ও ভাব-গ্রাহী—কালিদাসের শকুন্তলার মধ্যে আইয়াগোর মত লোক দেখিতে না পাইয়া যিনি ক্ষুব্ধ হ'ন তিনি তাঁহা-অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন। লেখক যে দুটি বিষয়কে শকুন্তলার বিশেষ দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, উভয়ই টেম্পেস্টে দেদীপ্যমান রহিয়াছে—সে দুটি বিষয় কি? না অলৌকিক ক্ষমতা দ্বারা ঘটনা-বিশেষ উৎপাদন করা এবং আখ্যায়িকাতে গল্পচাতুরী না থাকা। সমালোচকের নূতন দণ্ড-বিধি অনুসারে নাটকের দোষ গুণ বিচার করিতে গেলে টেম্পেস্টকে আকাশ হইতে পাতালে নিক্ষেপ করিতে হয়; ভাবুক ব্যক্তিরা যে রত্নটি সেক্‌সপিয়রের মুকুট-শোভী বলিয়া জানেন তাহাকে সেক্‌সপিয়রের পাদুকাতলেরও অনুপযুক্ত বলিতে হয়। টেম্পেস্ট যেরূপ একটি সাদা সীদা গল্প তাহাতে সমালোচক সচ্ছন্দে বলিতে পারেন;—ফর্ডিনাণ্ড সুন্দরী যুবতী মিরাণ্ডাকে দেখিয়া প্রেম-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িয়া গেলেন ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই, তাহাতে আবার প্রস্পেরোর যাদু বিদ্যা তাহাদের উপর কার্য্য করিয়াছে! দুর্ব্বাসা রাগের মাথায় একটা শাপ দিয়া বসিলেন—কিন্তু প্রস্পেরো সজ্ঞান অবস্থায় কেবল যাদুই করিতেছেন যাদুই করিতেছেন—আর তাঁহার কোন কর্ম্ম কাজ নাই। ক্যালিবান্ একটা ডাইনের ছেলে—

সে যে অমন-ধারা বনা কুৎসিৎ এবং হিংসা-পরায়ণ জীব হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই; আর কতক-গুলা নিম্ন-শ্রেণীর লোক যে মাতলামি করিবে ইহাতেও আশ্চর্য্য কিছুই নাই; আর এরিয়েল যদিও আশ্চর্য্য একটা পদার্থ বটে কিন্তু সে দুর্ব্বাসার ন্যায় অলৌকিক ক্ষমতা-শালী—যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে, সুতরাং তাহার পরিবর্ত্তে আইয়াগো প্রভৃতির ন্যায় নৈসর্গিক কোন কিছু কল্পনা করিলেই ভাল হইত। আর কুচ-রিত্র ব্যক্তি সুযোগ পাইয়া রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্যের লোভে ভ্রাতৃ-হত্যা করিবে ইহাতেও আশ্চর্য্য কিছুই নাই। আর গল্পালো ত এক জন গরিব বেচারা ভাল মানুষ তাহার চমৎকারিত্ব কিছুই নাই,—অতএব হুকুম হইল যে টেম্পেস্ট-নাটককে চারি শ্রেণী নীচে নাবাইয়া দেওয়া যায়—শকুন্তলা অপেক্ষাও এক শ্রেণী নীচে। ইহার পর আসিতেছে—নাটকীয় ব্যক্তিগণের চরিত্র।

পুরুষোত্তম।

" কবিঃ প্রবর্য্যোঽমর-পার্থিবাচ্চ
পূজ্যোপিতুপাদমরোপি দেবাৎ।
কবেশ্চরিত্রং সুখদং সুরাণাং
সম্মান-শিক্ষা-প্রতিভা-প্রবন্ধং॥"

শাব্দিক-প্রধান মহাত্মা পুরুষোত্তম দেব ত্রিকাণ্ড-শেষ, হারাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করিয়া ভারতীয় সাহিত্য-সংসারে কয়েকটী অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হারাবলী ও ত্রিকাণ্ড-শেষ;—অমর, মেদিনী, বিশ্ব প্রভৃতি কোষের ন্যায় বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন ঐ সুপ্রসিদ্ধ কোষদ্বয়ের প্রণেতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে শীর্ষস্থানীয় বুধ-মণ্ডলীর মধ্যেও অনেকে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ পুরুষোত্তমের গ্রন্থাবলীর দুষ্প্রাপ্তি ও ঐতিহাসিক চর্চ্চার অভাব। এতন্নিবন্ধনই অনেকে ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রণেতার নাম "অমরসিংহ" বলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কুচিত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রথম পৃষ্ঠার দুই চারি পংক্তিও দর্শন করিয়াছেন তাঁহারা একথা বলিতে কদাপি সাহসী হইতে পারেন না। ত্রিকাণ্ড-শেষের সূচনা-স্থলে স্পষ্টতঃ লেখা আছেঃ—

" অলৌকিকত্বাদমরঃ স্বকোষে
ন যানি নামানি সমুল্লিলেখ।
বিলোক্য তেষামধুনা প্রচার-
ময়ং প্রযত্নঃ পুরুষোত্তমেন। ২

বর্গক্রমস্তথানাম-
লিঙ্গয়োস্তূপদেশতঃ।
পরিভাষাদিকং সর্ব্ব-
মত্রাপ্যমরকোষবৎ। ৩

অর্থাৎ—অলৌকিকতা (অপ্রচলিত ?) জন্য যে সকল নামাদি অমর সিংহ স্বকোষে উল্লেখ করেন নাই অধুনা তাহাই অনুসন্ধান করিয়া পুরুষোত্তমের প্রযত্নে এই গ্রন্থ (ত্রিকাণ্ড-শেষ) প্রচারিত হইল। আর ইহাতে বর্গক্রম, নাম, লিঙ্গ, পরিভাষাদি সকলই অমরকোষের ন্যায় ব্যবহৃত হইল।

ইহা দ্বারা এই জানা গেল যে ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রণেতার নাম পুরুষোত্তম,—অমর সিংহ নহে। তবে ত্রিকাণ্ড-শেষ যখন অমরকোষের অভাব পূরণ করিবার জন্য বিনির্ম্মিত হইয়াছে অথচ অমরসিংহের উল্লিখিত নামাবলী প্রায় অনেক স্থলেই পুনরুল্লেখ হয় নাই; তখন ইহাকে অমর-কোষের পরিশিষ্ট বলিতে হয়। বাস্তবিক দূরদর্শী পণ্ডিতদের মধ্যে ত্রিকাণ্ডশেষ অমরকোষের পরিশিষ্ট বলিয়াই বিখ্যাত। এবং ত্রিকাণ্ডশেষ-প্রণেতার যে তাহাই উদ্দেশ্য উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় পাঠ করিলে তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

আর "ত্রিকাণ্ড-শেষ" এই নামটীও সেই কথার প্রমাণ করিতেছে। কেন না অমর-কোষ তিন কাণ্ডে বিভক্ত। স্বর্গবর্গ হইতে পাতালবর্গ পর্য্যন্ত—প্রথম কাণ্ড। ভূমি-বর্গ হইতে শূদ্রবর্গ পর্য্যন্ত—দ্বিতীয় কাণ্ড। আর বিশেষ্যনিঘ্ন বর্গ হইতে লিঙ্গাদি সংগ্রহ বর্গ পর্য্যন্ত,—তৃতীয় কাণ্ড। ত্রিকাণ্ড-শেষের কাণ্ডবিভাগও ঠিক অমরকোষের ন্যায়। তিন কাণ্ড অমরকোষের শেষ (পরি-শিষ্ট) এই অর্থেই যে "ত্রিকাণ্ড-শেষ" নাম হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

অমর-কোষের প্রকৃত নাম যে—"নাম-লিঙ্গানুশাসন" তাহা অনেকেই জানেন। পুরুষোত্তমও ত্রিকাণ্ড-শেষের প্রত্যেক বর্গের সমাপ্তিস্থলে লিখিয়াছেন——

ইতি পুরুষোত্তম দেবকৃতে
(নামলিঙ্গানুশাসনে
ত্রিকাণ্ডশেষে
* * বর্গঃ
সমাপ্তঃ।"

অতএব ত্রিকাণ্ড-শেষ-প্রণেতা পুরুষো-ত্তম যে সুবিশ্রুতনামা অমরসিংহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহাতে আর একটুকুও সন্দেহ নাই।

পুরুষোত্তমের বিষয় অধিক কিছুই জানিবার উপায় নাই; এমন কি তিনি কোন্ সময়ে ভারতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। পুরুষোত্তম হারাবলীর উপসংহার-স্থলে লিখিয়াছেন:—

"শব্দার্ণবউৎপন্নিনী
সংসারাবর্ত্ত ইত্যপি।
কোষা বাচস্পতিব্যাড়ি-
বিক্রমাদিত্যনির্ম্মিতাঃ॥
আদায় সারমেতেষা-
মন্যেষাঞ্চ বিশেষতঃ।

হারাবলী নির্ম্মিতেয়ং
ময়া দ্বাদশবৎসরৈঃ ॥ "

অর্থাৎ—শব্দার্ণব, উৎপলিনী, সংসারাবর্ত্ত এবং বাচস্পতি, ব্যাড়ি ও বিক্রমাদিত্য-প্রণীত কোষাদি বিশেষতঃ অন্যান্য গ্রন্থাদির সার সংগ্রহ করিয়া আমা কর্ত্তৃক দ্বাদশ বৎসরে এই হারাবলী নির্ম্মিত হইল।

ইহার মধ্যে বাচস্পতির সময় নির্ণয় করা বড় কঠিন ব্যাপার নহে। ভারতবর্ষে ন্যায়-দর্শন শাস্ত্রের উন্নতিবর্দ্ধক বাচস্পতি মিশ্র ব্যতীত অন্য কোন বাচস্পতি দেখা যায় না। এই বাচস্পতি-কৃত "ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা" শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তসূত্রের "ভামতি" নাম্নী টীকা, সাঙ্খ্য-তত্ত্ব-কৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থ আছে *। আমরা "উদয়নাচার্য্য" শীর্ষক প্রস্তাবে বাচস্পতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি, সুতরাং এস্থলে অধিক কিছু বলিব না। বাচস্পতিকে কাউয়েল সাহেব খৃঃ দশম শতাব্দীর লোক বলিয়াছেন। আবার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সাঙ্খ্য-তত্ত্ব কৌমুদীর ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছেন, "বাচস্পতি মিশ্র কৃত, শ্রীহর্ষ-প্রণীত "খণ্ডন খণ্ড খাদ্যের" "খণ্ডনোদ্ধার" নামক একখানা প্রত্যুত্তর স্বরূপ গ্রন্থ আছে। "খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন। এই শ্রীহর্ষ উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলির শ্লোক খণ্ডন খণ্ড খাদ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের প্রতিবাদ করিয়া আবার বাচস্পতি খণ্ডনোদ্ধার প্রণয়ন করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য আবার বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকার "ন্যায়বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" নামক টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। সুতরাং এখন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় শ্রীহর্ষ, উদয়ন এবং বাচস্পতি; ইঁহারা তিন জনই সমসাময়িক লোক †। যদি অধ্যাপক তর্কবাচস্পতি মহোদয়ের কথার অকাট্য প্রমাণ থাকে তবে উল্লিখিত যুক্তির বলে বাচস্পতিকে শ্রীহর্ষ উদয়ন প্রভৃতির সমকালবর্ত্তী অর্থাৎ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিতে হয়। মাধবাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রকে সুবিশ্রুত নামা শঙ্করাচার্য্যের (খৃঃ নবম শতাব্দীর প্রারম্ভের) অনেক পরবর্ত্তী লোক জানিতেন। সুতরাং কাউয়েল সাহেবের আনুমানিক সময় অপেক্ষা বাচস্পতিকে পরবর্ত্তী লোক বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই তাঁহাকে উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির সমসাময়িক নির্দ্দেশ করিতে নিতান্ত সন্দিহান হই না।

যখন পুরুষোত্তম দেব বাচস্পতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক।

এ দিকে মেদিনীকোষ-প্রণেতা মেদিনীকর পুরুষোত্তমের ত্রিকাণ্ডশেষ এবং হারা-

*, ভামতি নাম্নী টীকায় বাচস্পতি কৃত গ্রন্থাবলীর তালিকা আছে।

† ভারতী, তৃতীয় খণ্ড ২৪৭ পৃ, উদয়নাচার্য্য শীর্ষক প্রস্তাব।

বলীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষোত্তমকে মেদিনীর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং বাচস্পতির পরবর্ত্তী বলিতে হয়। এক্ষণে আমরা মেদিনী সম্বন্ধে কিছু বলিয়া লইঃ—

জনৈক কৃতবিদ্য মহাত্মা বলেনঃ—"কয়েকটী নিশ্চয় যুক্তি দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রকাশ-প্রণেতা মহেশ্বর, আচার্য্য খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। আর মুকুট,—পূর্ণাবয়ব রায় মুকুটমণি-উপাধিক বৃহস্পতি, তাঁহার কৃত পদচন্দ্রিকা নামক অমরকোষের উৎকৃষ্ট টীকা ৪৫৩২ কলিগতাব্দে (যাহার সহিত ১৪৩০ খৃষ্টাব্দের ঐক্য আছে ‡) প্রণয়ন করেন। মেদিনীকর তাঁহার গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বিশ্বপ্রকাশের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি রায়মুকুট কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব আমরা মেদিনীকরের সময় নির্ণয় জন্য মহেশ্বর এবং রায়মুকুটের মধ্যে তিন শতাব্দী প্রাপ্ত হই।

যদি আমরা তাঁহাকে গোবর্দ্ধন আচার্য্য (যাঁহাকে তিনি উপসংহার-স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন) এবং রায়মুকুটের মধ্য স্থলে স্থান দিই তবে সন্ধিস্থল আরো সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। যে সময় গোবর্দ্ধনাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হয়েন তাহা প্রায় খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া নিরূপিত। অতএব আমরা যদি তাঁহার (মেদিনীর) সময় এয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে নির্দ্ধারণ করি, তবে বড় অন্যায় হইবে না।" §।

প্রোক্ত লেখক আর্য্যসপ্তশতীর প্রস্তাবনার মর্ত্ত গ্রহণ করিয়া গোবর্দ্ধনকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এস্থলে কিছু প্রমাদ লক্ষিত হয়। কেন না, গোবর্দ্ধন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চ রত্নের অন্যতম রত্ন ছিলেন। অধিকাংশ সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের মতে লক্ষ্মণসেন ১১০১ হইতে ১১২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং গোবর্দ্ধনকে বিশ্বপ্রকাশ-প্রণেতা মহেশ্বর আচার্য্যের সমসাময়িক বলিতে হয়। যাহা হউক, আমরা যদি মেদিনীকরকে মহেশ্বর এবং গোবর্দ্ধনের পরবর্ত্তী এবং রায়মুকুট বৃহস্পতির এক শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের লোক বলি তবে উল্লিখিত মহাত্মার যুক্তির সহিত কিছুই মতভেদ হয় না।

এক্ষণে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে পুরুষোত্তম দেবকে খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর পরার্দ্ধের লোক বাচস্পতি এবং খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের লোক মেদিনীকরের সময়ের সন্ধিস্থলে স্থান দিতেছি। অতএব অধিক প্রমাদ আশঙ্কা না করিয়া শাব্দিকপ্রধান পুরুষোত্তম দেবকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

‡ Colbrook Essays; Asiatic reserches. Vol. V11 P 215,

§ Preface to the Medine by Som Nath mukharje 1869.

পুরুষোত্তমের নামের অন্তে "দেব" উপাধি দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে কায়স্থ মনে করিতে পারেন। বাস্তবিক তাহা নহে। ইনি দেব উপাধিধারী অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) ছিলেন। বৈদ্য বংশীয় মহাত্মাগণ আধুনিক বঙ্গীয় সংস্কৃতসাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অসংখ্য বৈদ্য গ্রন্থকারগণ বহু গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ব্যাকরণ সাহিত্য অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রেতেও বহু বৈদ্য গ্রন্থকার আছেন। বোপদেব শ্রীপতি বিশ্ব প্রণেতা মহেশ্বর, মেদিনীকর, বিশ্বনাথ কবিরাজ, প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ সকলেই বৈদ্য। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ হইতে বৈদ্যগ্রন্থকারের সংখ্যা কম নহে। কিন্তু কায়স্থদের প্রণীত কয়খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে? যাঁহারা পুরুষোত্তমকে কায়স্থ করিবার জন্য লালায়িত আমরা তাঁহাদের কথা সমাদর করিতে একটুকুও সাহসী হই না। বৈদ্যকুলে দেববংশে ঈশানদেব প্রভৃতি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন আয়ুর্ব্বেদ-টীকাকার ছিলেন। বিশেষতঃ পুরুষোত্তম যে সময়ের লোক সে সময়েই বৈদ্যগ্রন্থকারগণ বঙ্গদেশকে সংস্কৃত গ্রন্থাদি দ্বারা প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই জন্যই মহামহোপাধ্যায় পুরুষোত্তম দেবকে অম্বষ্ঠ বংশীয় বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে।

পুরুষোত্তম যে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন নিম্নে তৎ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটী বিবরণ লিখিতেছি।—

ক। ত্রিকাণ্ডশেষ। ত্রিকাণ্ডশেষের বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এখানি অমরকোষের পরিশিষ্ট। সমুদয় গ্রন্থ ১০৩২ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। এখানি হেমচন্দ্রের অভিধানের ন্যায় বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ।

খ। হারাবলী। হারাবলী ২৭৮ শ্লোকে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি এক সুন্দর অভিনব নিয়মে রচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ে এক একটী শব্দের নামাবলী ঠিক এক একটী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "শ্লোকাবধি।" দ্বিতীয় অধ্যায়ের এক একটী শব্দের নামাবলী ঠিক এক একটী অর্দ্ধ শ্লোকে শেষ হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "অর্দ্ধশ্লোকাবধি।" তৃতীয় অধ্যায়ের নাম "পাদাবধি"। এই অধ্যায়ে এক একটী শব্দের নামাবলী ঠিক এক একটী পাদে (শ্লোকের চতুর্থাংশে) শেষ হইয়াছে। অতঃপর চতুর্থ অধ্যায়ে নানার্থ (Dictionary of Homonymous words) লেখা হইয়াছে। এই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধশ্লোকাবধি প্রণালীতে এবং পরার্দ্ধ সাধারণ নিয়মে লেখা হইয়াছে। তথাহিঃ—

অব্যাধিশব্দতঃ শ্লোকৈ
রর্দ্ধৈরাতলিনাত্ততঃ।
শব্দাঃ পাদৈর্ব্বিবোদ্ধব্যাঃ
প্রাগনেকার্থতস্ততঃ॥

(সূচনা—হারাবলি)

এই অভিধান খানি পর্য্যায়-বিভাগের সুনিয়ম থাকাতে বুঝিবার পক্ষে অতি সহজ হইয়াছে। হারাবলি অল্পের মধ্যে একখানি

অত্যুৎকৃষ্ট অভিধান। বোধ হয় হারাবলিই পুরুষোত্তম দেবের সর্ব্ব প্রথম অভিধান।

(গ) "একাবলিকোষ"। এই কোষ ক, খ, হইতে হ, ক্ষ * প্রভৃতি ৩৪ চৌত্রিশটী ক্রমপঠিত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণ শুধু এক এক সরবর্ণ-যোগ করিয়া তাহার অর্থ লেখা হইয়াছে। একাবলি-কোষ ৫৪ শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রথম শ্লোকে লেখা আছেঃ—

ধ্যাত্বা বিশ্বস্য ধাতারং
পাতারং পুরুষোত্তমং।
পঞ্চেন ক্রিয়তে কোষো
বিহায় পুরুষোত্তমং।

(ঘ) একাক্ষরা-কোষ। একাক্ষরা কোষ ঠিক একাবলী-কোষের নিয়মে বিরচিত হইয়াছে। এখানিকে একাবলী-কোষের পরিশিষ্ট বলিতে হয়। কেন না ইহাতে কেবল একাবলী-কোষের অভাব পূরণ হইয়াছে অথচ একাবলীতে যে অক্ষরের যেরূপ অর্থ বলা হইয়াছে তাহা আর পুনরুল্লেখ হয় নাই। তবে অধিকন্তু ইহাতে অ, আ প্রভৃতি চতুর্দ্দশটী স্বর এবং অং অঃ এই দুইটী বর্ণ সহিত ষোলটী বর্ণের অর্থ লেখা হইয়াছে। ইহা ৩২টী শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে †।

পুরুষোত্তম ধৃতিসিংহ এবং জনমেজয় নামক পণ্ডিতদ্বয় ও অন্যান্য বহুদর্শী পণ্ডিতদের কোষের সাহায্য লইয়া দ্বাদশ বৎসরে হারাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। তথাহিঃ—

উপাস্য সর্ব্বজ্ঞমনন্তমীশং
ভূত্বাতিথিঃ শ্রীধৃতিসিংহবাচাম্।
হারাবলী দ্বাদশ-মাস-মানৈ * *
র্বিনির্মিতেয়ং পুরুষোত্তমেন। ২৭৫

...

সুধিয়া জনমেজয়েন যত্নাদ্
ধৃতিসিংহেন সমং নিরূপিতেয়ম্।
বিদিতো বহুদৃশ্বভিঃ কবীন্দ্রৈ
র্ভূরি-কোষানুমতঃ শ্রমো মদীয়ঃ॥ ২৭৭

বোধ হয় ধৃতিসিংহ এবং জনমেজয় নামক তদানীন্তন কোন খ্যাতনামা পণ্ডিতদ্বয় পুরুষোত্তমের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

পুরুষোত্তম যে যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া হারাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার এক তালিকা দিয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে উদ্ধৃত করিলাম না। ২৮ শ্লোক আয়তনের হারাবলী প্রণয়ন করিতে দ্বাদশ বৎসর লাগিয়াছে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হইল। আমাদের মতে তেমন কৃতবিদ্য মহাত্মার পক্ষে এরূপ ক্ষুদ্রায়তনের গ্রন্থ

* "ক্ষ" এই সংযুক্ত বর্ণটী পুরুষোত্তম ও ব্যঞ্জন বর্ণের শেষ বর্ণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন।

† কেহ কেহ একাবলী কোষকেও একাক্ষরার পরিশিষ্ট বলিতে পারেন। সব সমান কথা।

* * কালগ্রন্থিঃ সমা সংবৎ মাস মানো যুগাং শকঃ। (হারাবলী ২৮)

অর্দ্ধ বৎসরেই বিরচিত হইতে পারে। গতিকেই ইহা পুরুষোত্তম হারাবলী প্রণয়নে প্রতি বৎসর ১৫ দিনের অধিক গড়ে কর্ত্তন করেন নি।

বলিতে গেলে পুরুষোত্তমের "ত্রিকাণ্ড শেষ" হারাবলী হইতে অনেক উচ্চ দরের গ্রন্থ। কিন্তু পুরুষোত্তম হারাবলী লইয়া অতিমাত্র গর্ব্বোক্তি করিয়াছেন:—

আরম্ভ স্থলে:—

১। মুক্তামণ্ডাতিমধুরা মসৃণাবদাত
ছায়াধিরাগ তরলাঞ্চল সদ্‌গুণশ্রীঃ।
সাধ্বী সতাং ভজতু কণ্ঠমসৌ প্রিয়েব
হারাবলী বিরচিতা পুরুষোত্তমেন। ৪

২। কিংনৈব সন্তি সুধিয়ামভিধান কোষাঃ
কিন্তু প্রসিদ্ধ বিষয় ব্যবহার ভাজঃ।
গোষ্ঠীষু বাদপরমোহফলাসু কেষাং
হারাবলী ন বিদধাতি বিদগ্ধিমানং! ৫

৩। একতমেব গণয়ন্তি পরং বিদগ্ধা
বাচাং বিদগ্ধিমনিমজ্জতি যস্যা লোকঃ।
গোষ্ঠীষু যঃ পরম শাব্দিক-দুর্গমাসু
দুর্ব্বোধশব্দগত সংশয় মুচ্ছিনত্তি। ৬

উপসংহার স্থলে:—

৪। হিত্বা মহাশাব্দিকতাভিমানং
মাৎসর্য্যমন্যত্র মুহুর্নিধায়।
হারাবলীং যঃ প্রকরোতি কণ্ঠে
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু পরং স ভাতি॥ ২৭৮

উল্লিখিত উক্তিতে পুরুষোত্তমের সামান্য গর্ব্ব প্রকাশ পায় নাই। হারাবলী লইয়া এই রূপ গর্ব্ব করাতে গর্ব্বের গুরুত্ব রক্ষা পাইয়াছে কি না তাহা সন্দেহের বিষয়।

শ্রী যঃ

প্রেম-মরীচিকা।

(রাগিণী মিশ্রিত খাম্বাজ।)

ও কথা বোল না তারে, কভু সে কপট নারে,
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন!
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মত করে অন্বেষণ।
ভাল সে বাসিত যবে করে নি ছলনা,
মনে মনে জানিত সে,সত্য বুঝি ভাল বাসে,
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।
হরষে হাসিত যবে হেরিয়া আমায়
সে হাসি কি সত্য নয়?—সে যদি কপট হয়
তবে সত্য বোলে কিছু নাহি এ ধরায়!
স্বচ্ছ দর্পণের মত বিমল সে হাস—
হৃদয়ের প্রতি ছায়া করিত প্রকাশ।
তাহা কপটতাময়?—কখনো কখনো নয়,
কে আছে সে হাসি তার করে অবিশ্বাস।
ও কথা বোল না তারে,কভু সে কপট নারে
আমার কপাল-দোষে চপল সে জন,
প্রেম-মরীচিকা হেরি, ধায় সত্য মনে করি
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন॥

য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র ॥

দেখ, তোমাকে যে পত্র লিখেছি, তা' ভারতীতে আমার ইচ্ছামতে প্রকাশ করা হোয়েছে। তাতে এক জায়গায় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমার মত প্রকাশ কোরেছিলুম, সম্পাদক মহাশয় তার বিরুদ্ধে এক নোটের বাণ বর্ষণ কোরেছেন। কিন্তু সেটা সম্পাদক মহাশয়ের লেখা কিনা, সে বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ বর্ত্তমান। তিনি যে সেটা লেখেন নি, তা'র প্রধান প্রমাণ হোচ্চে এই যে, সম্পাদক মহাশয়ের গাম্ভীর্য্য এতদূর বিচলিত হোতে আর কখনো দেখিনি; দ্বিতীয়তঃ যে-সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হোয়েছে, তা' সম্পাদক মশায়ের লেখনীর অযোগ্য। খুব সম্ভব, কোন উদ্ধত যুবক সম্পাদকের ক্ষমতা নিজের তরুণ স্কন্ধে গ্রহণ কোরে ভারতীর এক কোণে অলক্ষিত ভাবে এই নোটটি গুঁজে দিয়েছেন। নোটে খোঁচা মারার প্রধান গুণ হোচ্চে যে, তা'র উত্তর দিতে বোস্‌তে প্রবৃত্তি হয় না। একটা নোটের বিরুদ্ধে "যুদ্ধং দেহি" বোলে কোমর বেঁধে আড়ম্বর করা শোভা পায় না। গোলা দিয়ে ওড়াতে এলে রীতিমত যুদ্ধসজ্জা কোর্ত্তে হয়, কিন্তু তুড়ি দিয়ে ওড়াতে এলে আর কথাটি নেই। কিন্তু নানা কারণে একটা উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হোলুম। লেখক মহাশয় আমার মুখে কতকগুলো কথা গুঁজে দিয়েছেন, যা' আমি একেবারেই বলিনি ১; তিনি কতকগুলো কথা নিয়ে অনর্গল বুকাবকি কোরে গিয়েছেন যা একেবারে উত্থাপন করবারই কোন আবশ্যক ছিল না ২; তিনি অনেক জায়গায় তলোয়ার নিয়ে তুমুল আস্ফালন কোরেছেন, কিন্তু তা'র ঘা লেগেছে বাতাসের গায়ে; আবার অনেক জায়গায় তিনি আমার লেখার বিরুদ্ধে বন্দুক ছুঁড়েছেন, তার থেকে আগুনও ছুটেছে, ধোঁয়াও বেরিয়েছে, শব্দও হোয়েছে, কিন্তু তা'তে গুলি নেই, ফাঁকা আওয়াজ; ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য ও শব্দের প্রাখর্য্য থেকে পাঠকেরা কল্পনা কোর্ব্বেন যে,

১ যথার্থ যদি এরূপ হইয়া থাকে তবে সে কথা-গুলা লেখকের উচিত ছিল উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া। সং

২ কেন যে, আবশ্যক ছিল না তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। লেখক আমাদের নিরীহ দেশটির প্রতি সন্ধন্ধে ধিক্কারের খরশাণ কৃপাণ এবং উপহাসের তীক্ষ্ণ বাণ অনর্গল চালাইতে পারেন আর এক ব্যক্তি ঢাল দিয়া তাহা আটকাইতে গেলে সে তাহা পারিবে না কেননা লেখকের মতে তাহা অনাবশ্যক! এমন কি হইতে নাই যে, লেখক এক পক্ষে বেশী ঝোঁক দেওয়াতে তাঁহার চক্ষে তিনিই দেখিতেছেন যে, তাঁহার বিরোধী পক্ষের কথাগুলি উত্থাপনেরই যোগ্য নহে? সং

যার প্রতি লক্ষ্য করা হোয়েছে সে ব্যক্তি বাসায় গিয়ে মোজা থাকবে; কিন্তু সে ব্যক্তির কানে তালাধরা ও নাকে ধোঁয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন রকম সাঙ্ঘাতিক অপকার হয় নি ১। লেখক-মশায় বোলেছেন যে, "শুধু কেবল স্বাধীনতা হইলেই যদি স্ত্রীলোকদের আর কোন গুণের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলেই আমরা লেখকের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারিতাম; কিন্তু তাহা ত নহে, যেমন স্বাধীনতা চাই তেমনি তাহার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, উচ্চের প্রতি ভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি দয়াদাক্ষিণ্য ইত্যাদি অনেক গুণ থাকা চাই," ইত্যাদি। কিন্তু এতটা হাঙ্গামা কেন? বাঙ্গালা বা সংস্কৃত, আর্য্য বা অনার্য্য, সাধু বা অসাধু কোন ভাষার অভিধানে যদি স্বাধীনতা অর্থে বেহায়ামো, অবিনয়, অসরলতা, উচ্চের প্রতি অভক্তিমত্তা, নীচের প্রতি অদয়া দাক্ষিণ্য লেখা থাকৃত, তা' হোলে এতটা বাক্যব্যয় শোভা পেত, নইলে সরল-হৃদয় পাঠকদের চোকে ধূলো দেওয়া ছাড়া, নাথি মেরে মেরে এতটা বাক্যের ধূলো ওড়ানোর আরও কোন ফল দেখিনে ১। এই

১ লেখক কি ভাবে কি কথা বলিতেছেন তাহার প্রতি তত আমাদের লক্ষ্য নহে যত—পাঠকেরা তাঁহার কথা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার প্রতি। আজিকার কালের কৃতবিদ্য ব্যক্তিমাত্রেরই লক্ষ্য দেশীয় কুসংস্কারের উপর—যিনি একটু কলম ধরিতে জানেন তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহার উপরেই আপনার গোলোন্দাজির পরীক্ষা করিতে যা'ন, কিন্তু তাহার বন্দুকের গুলিগুলো লাগে কোথায়? না, দেশীয় রীতি নীতি প্রথা যত কিছু আছে সকলেরই গাত্রে —তা' সে সু-ই হউক আর কু-ই হউক্—তা'র আর বাক্‌বিচার নাই। আমাদের লক্ষ্য আর এক দিকে—আমাদের দেশের ভাল রীতি ভাল প্রথা ইংরাজি রীতি-নীতি-প্রথার সহিত না মিলিলেই আজকের কালের কৃতবিদ্য লোকেরা সমস্ত-গুলিকেই কুসংস্কারের কোটায় ফেলিয়া দেন—সেই-গুলিকে বাঁচানই আমাদের লক্ষ্য। পাছে লোকের মনে এই একটি কুসংস্কার জন্মে যে, বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ-ধারণের নামই স্ত্রী-স্বাধীনতা, আর আমাদের কুল-স্ত্রীদিগের চাল্ চোল্ ধরণ ধারণের নামই হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি—অধুনা কেবল তাহারই প্রতিবাদ করা আমাদের এক মাত্র লক্ষ্য। সং

১ অবশ্য কোন অভিধানে স্ত্রীস্বাধীনতার ওরূপ অর্থ পাওয়া যায় না—কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? লেখক যদি বিলাতি বিবিদিগকে আদর্শ না করিয়া বিশুদ্ধরূপে স্ত্রী-স্বাধীনতা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতার অতগুলি পার্শ্ব-রক্ষক Body-guard আবশ্যক হইত না; কিন্তু লেখক বিলাতি বিবিদিগের চাল্-চোল্ ধরণ ধারণের আনুষঙ্গিক রূপে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন. এ জন্য বিলাতানভিজ্ঞ অধিকাংশ লোকের মনে সহসা এইরূপ একটা কুসংস্কার জন্মিতে পারে যে কার্য্যতঃ স্ত্রী-স্বাধীনতা আর কিছুই নহে—কেবল বিবিদিগের চাল্-চোল্, ধরণ-ধারণ ইত্যাদি। ইহা একটি লোক-বিখ্যাত বিষয় যে, বিবিদিগের shoping-এর জ্বালায়, নির্দোষ (?) আমোদাসক্তির জ্বালায়, তাহাদের স্বামীরা

সকল বক্তাবকির পর লেখক মহাশয় যেখানে " প্রকৃত কথা " বোলেছেন, সেই খানেই আমি সব চেয়ে কম আয়ত্ত কোরতে পেরেছি। তিনি বলেন, " প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের দেশে এক্ষণে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, শিক্ষা বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা, ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার অভাব আছে, তাহার সঙ্গে কি মাত্রায় স্ত্রী-স্বাধীনতা, ভালোয় ভালোয় টেকিয়া থাকিতে পারে, তাহাই এখন বিবেচনা-স্থলে !" "প্রথমতঃ শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা, রুচি বিষয়ক স্বাধীনতা" ও "ইত্যাদি অনেক স্বাধীনতার" অর্থ আমিত ভাল কোরে বুঝ্‌তেই পারলুম না ১ দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন্‌খানটা যোগ আছে, তাই আমি ভাল কোরে দেক্‌তে পেলেম না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই বোল্লে এই বোঝায় যে, আমরা ইংরাজদের

ধনে প্রাণে মারা যায়, অথচ স্ত্রী-স্বাধীনতার একটু কোথাও পাছে আঁচড় লাগে এই ভয়ে তাঁহারা সকল অত্যাচার ঘাড় পাতিয়া ল'ন, সকল বিষ হজম করিয়া ফেলেন। ইউরোপ-ভিন্ন আর কোথাও যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই এমন নহে—জাপানে আছে, বোম্বাইয়ে আছে, কিন্তু সে সকল নিয়ে আলোচনা করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে—সর্ব্বদেশ-সম্মত স্ত্রী-স্বাধীনতার বিশুদ্ধ আদর্শ নিয়ে আলোচনা করাও লেখকের উদ্দেশ্য নহে, ইংলণ্ডে যেরূপ স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত তাই যা' কেবল লেখকের এক মাত্র আলোচ্য বিষয় ; এরূপ যখন—তখন ইংলণ্ডের প্রচলিত স্ত্রী-স্বাধীনতা যে কি ভয়ানক বস্তু—তাহা যে শত সহস্র স্থানে নামে স্বাধীনতা কাজে স্বৈরচারিতা—তাহা যে ঔদ্ধত্য, প্রগল্‌ভতা, গুরু-জনের প্রতি অবজ্ঞা, দেহ-পীড়ন-বেশ-বাহুল্য এরূপ কতশত দোষে দূষিত, Saturday Review প্রভৃতি কাগজে যাহার চীৎকার কাঁছ'ন মধ্যে মধ্যে ভুক্ত-ভোগী জনের বুক ফাটিয়া বাহির হইয়া পড়িতে শুনা গিয়া থাকে, লেখক যে সকল কথার একটুও উল্লেখ না করাতে দেশীয় লোকের চক্ষে এক রূপ ধূলি দেওয়া হইয়াছে—প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিবিদিগের অনুকরণ করিলেই আমাদের কুল-রমণীরা নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতা-পথে বিচরণ করিতে পারিবেন ; আমরা সেই ধূলি অপনয়ন করিবার জন্যই

বলিতেছি যে, যখন স্বাধীনতার সঙ্গে শোভন লজ্জাশীলতা, বিনয়, সরলতা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, নীচের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য, অপ্রগল্‌ভতা, ঔদ্ধত্য-বিহীনতা ইত্যাদি গুণ-সমূহ থাকিবে তখনই জানিবে যে তাহা প্রকৃত স্বাধীনতা—ইংলণ্ডীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা তাহা হইতে বহুদূরে স্থিতি করে ; বোম্বাই দেশে যেমন স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে সেরূপ তীব্রতা-বিহীন নির্বিষ স্ত্রী-স্বাধীনতা যদি লেখকের অভিপ্রেত হইত তবে তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক তাহা আমরা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিতাম। যে স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের দোহাই দিয়া শত সহস্র স্বেচ্ছাচারিতা নিত্য নিত্য পার পাইয়া যাইতেছে সে স্ত্রী স্বাধীনতার নাম শুনিলেই আমাদের আপদ-মস্তক শিহরিয়া উঠে। সং

১ অর্থাৎ আমাদের আপনার দেশের রাজা-শাসন-প্রণালী স্বদেশীয় লোকের আয়ত্তাধীন নহে। তাহা যদি আমাদের আপনাদের আয়ত্তাধীন হয় তাহা হইলে আমরা রাজনীতি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

অধীনে বাস কোরচি ১ ; যদি এমন হোত যে, স্ত্রী-লোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ জাতি, তা'দের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে দিলে ইংরাজদের রাজত্ব লোপ হবার সম্ভাবনা, তা'হোলে বুঝতাম যে, রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা নেই বোলে আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার ঘোরতর ব্যাঘাত বর্ত্তমান! একটা স্বাধীনতা নেই বোলে পৃথিবীতে

শূন্য-গর্ভ উপাধির টানে পড়িয়া আমাদের দেশের লোক স্বাভিপ্রেত শিক্ষালাভে বঞ্চিত হয়, ও যেরূপ শিক্ষা তাহাদিগকে জোর করিয়া গিলাইয়া দেওয়া হয় তাহাই তাহারা কণ্ঠস্থ করে। শিক্ষাদান যদি আমাদের আপনাদের অভিপ্রায় মাফিক হয়, তবেই আমরা শিক্ষা-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই।

কোট্ হ্যাট্ পরিলে কালোয় কালোয় মিসিয়া বাঙ্গালিকে ভূতের মত দেখিতে হয় তবু তাহা ভাল—কেন? না যেহেতু তাহা ইংরাজ-পছন্দ! রুচিরও কখনও কখনও দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিতে সাধ যায়। রুচি যদি আমাদের আপনাদের আদর্শ-মাফিক হয়, অন্যের ধামাধরা না হয়, তবেই আমরা রুচি-বিষয়ক স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই। সং

১ বটেই ত; ইংরাজদের অধীনে বাস করচি বোলেই ত আমরা আমাদের স্ত্রীদিগকে তাহাদের সমক্ষে বাহির করিতে সঙ্কুচিত হই। আমাদের দুই দিকেই সঙ্কট; যদি আমরা ইংরাজদিগকে জেতৃ-জাতীয় লোক মনে করিয়া তাহাদের নিকটে কুঁকড়িয়া সুঁকড়িয়া থাকি তবে তাহারা আমাদের অতি অপদার্থ জ্ঞান করিবে ও আমাদের স্ত্রীগণকে আয়াদিগের হইতে এক ধাপ নয় উঁচু মনে করুক্—কিন্তু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখিতে হয়, তাহা তাহারা কখনই করিবে না; ক্রমাগতই শুনা যায় যে, বাঙ্গালীর স্ত্রীস্বাধীনতা রেল-গাড়িতে ইংরাজের পুরুষ-স্বাধীনতার হস্তে যার পর নাই অপমানিত হইয়া থাকে; এই একদিক্, আর এক দিক্ এই যে, যদি আমরা ইংরাজদিগের সহিত সমকক্ষ ভাব ধারণ করিতে যাই তবে প্রথম প্রথম হয় ত তাহারা মুখে একটু আপ্যায়িত করিবে এই পর্য্যন্ত, ভিতরে ভিতরে যে আমাদিগের স্পর্দ্ধা-নিবারণের উপায় চিন্তা করিবে ইহাতে আর কিছু মাত্র ভুল নাই। ইংরাজেরা কত বাঙ্গালিকে খুন করিয়া স্বচ্ছন্দে পার পাইয়া যাইতেছে, আর, একজন স্ত্রীলোকের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ভয় পাইবে—ইহার কি কোন অর্থ আছে? যদি পরিশেষে বাঙ্গালি বিচারকর্ত্তার হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত তবেই যা তাহাদের ভয়ের কারণ হইত—কিন্তু আমাদের দেশীয় বিচারালয়ের বিচার যেরূপ ইংরাজ-ঘেঁসা তাহাতে আমাদের দেশের যেমন না কেন রাজ-রাণী হউন না, এক জন সামান্য ইংরাজ তাঁহার যথেষ্ট অপমান করিলেও আদালতের সূক্ষ্ম বিচারে দাঁড়াইবে যে, বরং বাদিনীর দোষ—কেন সে প্রতিবাদীকে রাগাইয়া দিল—প্রতিবাদীর কোন দোষ নাই। আবার, আমাদের দেশের এমন কতকগুলি ভাব আছে যাহা বিদেশীয় বিচারকের আমলেই আসিতে পারে না; আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোকের গায়ে সামান্য একটু অপমানের আঁচ লাগিলে তাহা যে কত অধিক বলিয়া বোধ হয় তাহা বিদেশীয় সর্ব্ব-সহন-ক্ষম কঠোর মনে এক মুহূর্ত্তও স্থান পাইতে পারে না। আমাদের দেশীয় লোকেরা আমাদের দেশীয় স্ত্রীলোক দিগকে যেরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে ইংরাজেরা কখনই সেরূপ দেখে না ইহারও আবার প্রমাণ দিতে হইবে নাকি? এই

যদি আর কোন রকম স্বাধীনতা না থাকে, তা'হোলে আমাদের দেশে পুরুষদের স্বাধীনতা আছে কি কোরে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরু-

সে দিন একজন ইংরাজ বিচারকর্ত্তা প্যায়দাকে দিয়া একজন দেশীয় স্ত্রীলোকের ঘোমটা খোলাইলেন—এ কি বল দেখি? একজন বাঙ্গালি বিচারকর্ত্তা যদি ইউরোপীয় কোন স্ত্রীলোকের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করিত—তবে কাণ্ডটা কি হইত বল দেখি! এই সব বিচার-কর্ত্তার হস্তে যখন আমাদের ধন প্রাণ মান নির্ভর করিতেছে তখন স্ত্রীস্বাধীনতাতে কি আর রুচি হয়? বরং একজন কেরাণীর পক্ষে বহুমূল্য ইংরাজী আসবাব কেনা শোভা পায়—কেন না তাহাতে সে কেবল ধনে এবং পরিশেষে প্রাণে মারা যায় মাত্র; কিন্তু একজন রাজরাণীর পক্ষেও স্ত্রী-স্বাধীনতা শোভা পায় না—কেন না অমূল্য কুলমানের বিনিময় ভিন্ন আমাদের দেশে স্ত্রীস্বাধীনতা কিনিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—জেতৃজাতি জিতজাতির কুলমানের মূল্য অতি যৎসামান্য মনে করে; আমাদের ভদ্রলোকের স্ত্রীদিগকে আমাদেরই সামিল মনে করে—তা-চেয়ে নীচু বই উঁচু মনে করে না। কোন বাঙ্গালি ভদ্র ঘরের স্ত্রী দুর্ভাগ্য বশতঃ কতিপয় সভ্য ইংরাজমণ্ডলীর সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাইতে বসিয়াছিল, সেই সভা-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ বলা কহা করিতে লাগিলেন যে, "শেষকালে মেৎরাণীর সঙ্গে আমাদের এক টেবিলে খানা খাইতে হইল।" বিদেশীয় রাজ্যে বাস করাতেই আমাদের ভাগ্যে সময়ে সময়ে ঐরূপ ঘটে; ম্যাঞ্চেষ্টরের একজন তাঁতির ছেলে সেখানে আমাদের দেশের ভদ্রবংশীয় কায়স্থ-কন্যাকে মেৎরাণী বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেখানে

নতা আছে কি কোরে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নেই, অতএব পুরু-

ভদ্রবংশীয় স্ত্রী-লোকদিগকে কত সাবধানে আগলিয়া রাখা কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিবার কহিবার বিষয়। ঠিক্ বিপরীত পৃষ্ঠ দেখিতে চাও ত বলি শুন;—আমাদের জাতসম্বন্ধে একবার কোন নৌকাযাত্রী-ভদ্রলোকের নৌকার তলা ফুটা হইয়া যাওয়াতে তিনি স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে তাড়াতাড়ি ডাঙায় উঠিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ডাঙায় কতকগুলি কুঁড়ে ঘর ও চাল-ডালের দোকান ছিল; তথাকার সকল লোকে মিলিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীলোকটির সম্মান রক্ষার জন্য একটি কুঁড়ে ঘরের চারদিকে ঘের-ঘার দিয়া দিবা একটি নিভৃত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আবশ্যক যত কিছু—সকলেরই সহায়তা করিল, পারিতোষিকের কথা একবার মুখেও আনিল না; যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছিল সে ঘর ভাড়া স্বরূপ যাহা পাইল তাহাতেই সন্তুষ্ট। দেখ আমাদের দেশের চাসা-ভুষা ইতর লোকেরাও কুল-স্ত্রীকে কিরূপ সম্মান-চক্ষে দেখে; ইহা ইউরোপদেশের অতি-ভক্তি-পূর্ণ গ্যালেণ্ট্রী নহে—ইহা আর এক বস্তু; কি? না পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ পবিত্রভাবে দেখা। স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মান করিবার প্রথা আমাদের দেশের যেটি আছে তাহার সহিত এবং ইউরোপ দেশীয় Gallantryর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দুয়ের মধ্যে স্বর্গ-নরক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেশীয় কুলরমণীর যে একটি পবিত্র মর্য্যাদা তাহা কি Gallantry-পরায়ণ ব্যক্তিরা জানে? না তাহাদিগকে তাহা বলিয়া বুঝানো যাইতে পারে?—কিন্তু গ্যালাণ্ট্রী যে কি বস্তু তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝি—

সবা অন্তঃপুরে প্রবেশ করে না কেন ১? রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে স্ত্রী-স্বাধীনতার যদি কোন যোগ থাকে, তবে পুরুষ-স্বাধীনতার সঙ্গেও তা'র সেই পরিমাণে যোগ আছে সন্দেহ নাই। দেশীয় রাজার অধীনে থাকলে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের এখনকার চেয়ে কি সুবিধা হোত ও কেন সুবিধা হোত, সেইটে বোল্লেই আমি চুপ কোরব ২। লেখক মহাশয় হয়ত

তাহার বশবর্ত্তী হইয়া একটি সুন্দরী মিস্ তাহার গুরুজনকে পশ্চাতে ফেলিয়া আপনি স্বচ্ছন্দে হট্ হট্ করিয়া প্রধানে আসন গ্রহণ করেন—আমাদের দেশে এই সকল চাল্-চোল্ শিক্ষা হইলেই সর্ব্বনাশ! ইংরাজেরা যখন জেতৃজাতি এবং তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কুল মর্য্যাদার কোন তক্কাই রাখে না তখন আমাদের কী এত দায় পড়িয়াছে যে, তাহাদের সমকে আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে বাহির না করিলেই নয়। সং

১ পুরুষের অপমানিত হওয়া এবং স্ত্রীলোকের অমপানিত হওয়া যদি একই কথা হইত তাহা হইলে লেখক ঠিকই বলিতেছেন যে, স্ত্রীজাতিকে যেরূপ সাবধানে রক্ষা করা হয় পুরুষ জাতিকে সেরূপে রক্ষা করা না হয় কেন? কিন্তু বিলাতি গ্যালাণ্ট্রী-শাস্ত্রেও ত আছে যে স্ত্রীর গায়ে আঘাত লাগিলে যত লাগে পুরুষের গায়ে আঘাত লাগিলে উহার তুলনায় তাহা কিছুই নহে। সং

২ আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে অতি এক নির্ব্বিঘ্ন নিষ্কণ্টক স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত ছিল ইহা কাহারও অবিদিত নাই; বোম্বাই প্রদেশে এখনো তাহার কতকটা আভাস দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাতেই বোলবেন, এখনো আমাদের দেশে স্ত্রী স্বাধীনতার সময় আসে নি, সময় এলে স্বাধীনতা আপনাআপনিই আস্‌বে। হঠাৎ যদি আজই সমস্ত স্ত্রীলোকেরা স্বাধীন হয়, তা' হোলে তা'র থেকে খারাপ ফল হোতে পারে। খুব সম্ভব আমাদের দেশে আজো স্ত্রীলোকদের স্বাধীন হবার সময় হয় নি, কিন্তু আমি ত আর তলবার হাতে কোরে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচার কোরচি নে; কিম্বা আমিত আজই ভারতবর্ষের Governor general হোয়ে আইন বের কোরচিনে যে, যারা স্ত্রী-কন্যাদের স্বাধীনতা না দেয় তা'দের ফাঁসি দেওয়া হবে! আমি একটা কাগজে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে আমার মত প্রকাশ কোরেছি; আমার আশাও ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না যে, আমার প্রবন্ধটি পড়বামাত্র অমনি ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোক তৎক্ষণাৎ তাদের স্ত্রী কন্যা ভগ্নীদের অন্তঃপুর থেকে মুক্ত কোরে তাঁদের অসূর্য্যম্পশ্য রূপত্বের গর্ব্ব থেকে বঞ্চিত কোরবে। আমি বিলক্ষণ জানতেম, সূর্য্যের এত সৌভাগ্য আজো হয় নি, যে, এত সহজে তার যুগযুগান্তরের আশা পূর্ণ হবে! আমার অভিপ্রায় এই

যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে স্বদেশীয় স্ত্রী-স্বাধীনতা স্বদেশীয় রাজা-শাসন-প্রণালীর আয়ত্তাধীনেই সুন্দর শোভায় পরিস্ফুট হইতে পারে। যেমন মুসলমানদিগের বাহুবল, তেমনি ইংরাজদিগের বাহুবল-তিরস্করিণী মন্ত্র-বিদ্যা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিশী স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী। সং

ছিল যে, যদি বা স্ত্রী-স্বাধীনতার সময় আমাদের দেশে এখনো না এসে থাকে তবে সেই সময় যত শীঘ্র আসে আমাদের তার চেষ্টা করা উচিত ১। প্রথমে আন্দোলন তার পরে কাজ, তার পরে সিদ্ধি। সময় আসে নি বোলে যদি মুখ বন্ধ কোরে বোসে থাকতে হয়, তাহোলে সময় কোন কালে আসে না। পৃথিবীতে কোন্ দেশে এমন কোন্ বৃহৎ সমাজ-সংস্কার হোয়েছে যা' আন্দোলন না কোরেই হোয়েছে? অত কথায় কাজ কি আমাদের বাঙ্গলা দেশে অতি অল্প দিন পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম-সংস্কারের আরম্ভ হয় ও আজ পর্য্যন্ত যার আন্দোলন চোলচে, সেই বিষয়ে উদাহরণ দিলেই আমার যুক্তি অতি সহজে বোধগম্য হবে ২। ভারতবাসীদের মন এখনো অজ্ঞতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন আছে, নিরাকার ঈশ্বরের ভাব তারা বুঝতে পারবে না, সুতরাং এখনো সত্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার সময় হয়নি বোলে যদি রামমোহন রায় নিশ্চেষ্ট হোয়ে বোসে থাকতেন, যদি তখনকার বৃদ্ধ পৌত্তলিক সমাজের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম না কোরতেন, সময়ের অভাব, সময়ের শূন্য ভিক্ষার ঝুলি পুর্ণ করবার চেষ্টা না কোরে তিনি যদি ভিক্ষুক ভাবে অঞ্জলি পেতে সময়ের মুখ প্রতীক্ষা কোরে বোসে থাকতেন, তাহোলে আজকের এই ব্যাপ্যমান ব্রাহ্মধর্ম্ম কোথায় থাকত ৩, আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার অভাব লোকে এখনো ভাল কোরে অনুভব কোর্ত্তে পারে নি, কিন্তু তাই বোলে কি চুপ কোরে বোসে থাকতে হবে? ব্যক্তি বিশেষের যদি অস্বাভাবিক কারণে ক্ষিদে আদবে না থাকে, তা হোলে তাকে খেতে দিওনা, কেননা, সে হজম কোরতে পারবে না; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তা'কে কবিরাজ দেখানো

১ যত শীঘ্র আসে" এ চেষ্টা আপেক্ষা যত শোভন-ভাবে, নির্ব্বিঘ্ন ভাবে, নিরুপদ্রব ভাবে আসে, এই চেষ্টা অধিক প্রার্থনীয়। যদি বল যে শেষোক্ত চেষ্টা বৃথা হইবে, তবে আর একজন বলিবে পূর্ব্বোক্ত চেষ্টা ও বৃথা হইবে; প্রকৃত কথা এই যে, দুই চেষ্টারই ফলের আশা এত অল্প যে,আমাদের ভাগ্যে উভয়ই এক প্রকার দুরাশা; কিন্তু যদি "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ" এই ভাবিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতে হয় তবে শেষোক্ত প্রকারের চেষ্টাই সর্ব্বোতোভাবে শ্রেয়। সং

২ আন্দোলন যাহাতে রীতিমত হয় অর্থাৎ এক-দিক্-ঘেঁসা না হয় এই জন্যই বর্ত্তমান প্রস্তাবটির পদে পদে টিপ্পনী-সংযোগের এত আয়াস পাওয়া যাইতেছে। সং

৩ রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দেওয়া হোক্,—তিনি যেরূপ দেশীয় আকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, স্ত্রী-স্বাধীনতা সে-ভাবে প্রচারিত হইলে আমরা ত বাঁচিয়া যাই—কিন্তু এ ত তা নয়—এ হচ্চে বিবিদের গৌণের আঁচল ধরিয়া চলা—আয়া-গিরি করা। বোম্বাই দেশেও ত স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে; স্বাধীন যুক্তি ও রুচি সহকারে স্ত্রী-স্বাধীনতার ভাল একটা আদর্শ দাঁড় করাও—তাহা আমরা মাথায় করিয়া লইব; কিন্তু তাহা বলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার নামের খাতিরে তাহার একটা অন্তঃসার-শূন্য চিকণ-চাকণ আদর্শকে "এই উচ্ছিষ্টই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট" বলিয়া গলাধঃকরণ করিতে পারি না। সং

কর্ত্তব্য, যাতে তার ক্ষিদে হয়, এমন বটিকা সেবন করানো আবশ্যক। আমি তাই ভেবে চিন্তে ভারতীতে সমাজের জন্যে এক রতি বটিকার ব্যবস্থা কোরেছিলুম; কিন্তু রোগ এমন বদ্ধমূল, ও কবিরাজের সাধ্যমত বটিকার মাত্রা এমন যৎসামান্য, যে, তা'তে উপকার হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। কিন্তু আমাদের দেশের সকল কবিরাজ মিলে যদি এই রকম বটিকা সেবন আরম্ভ করান, তাহোলে অচিরাৎ রোগীর ক্ষুধার সঞ্চার হবে। লেখক মহাশয় বলেন "উঃ ইনি স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ কোরেছেন" এরূপ কেউ যদি মনে করেন, তবে তাঁহাদের জানা উচিত যে, এ স্বাধীনতা দেশেরও স্বাধীনতা নহে, আত্মারও স্বাধীনতা নহে, কেবল পর পুরুষগণের সহিত স্ত্রীলোকগণের আমোদ প্রমোদে মেলা মেশা! কথা গুলো এমন কোরে বসানো হোয়েছে যে, শুন্‌লে অনেক পাঠকের গা শিউরে উঠ্‌বে! "পর পুরুষ!" "আমোদ প্রমোদ!!!" "মেলা মেশা!!!" কি সর্ব্বনাশ!!! আমাদের ভাষায় "পর পুরুষ" কথাটার সঙ্গে একটা দারুণ বিভীষিকা লিপ্ত আছে, লেখক মহাশয় সেই সুবিধা পেয়ে কথাটা ব্যবহার কোরেছেন। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই, গরিব "পর পুরুষ" কথাটি কি অপরাধ কোরেচে, যে, সে বেচারীর ওপরে এত নিগ্রহ! পর বোলেই কি তার এত দোষ১? কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে বলে মহাত্মা লোকদের "বসুধৈব কুটুম্বকং।" "আমোদ প্রমোদ" ও "মেলা মেশা" কথা দুটো এমন ভাবে ব্যবহার করা হোয়েছে যে তার মধ্যে থেকে একটা ঘোরতর রহস্যপূর্ণ অর্থ প্রকাশ পাচ্চে। কিন্তু আমি আশা করি, আমাদের দেশের রুচি এখনো এমন বিকৃত হোয়ে যায় নি দেশীয় লোকের মন এমন পশুত্বে পরিণত হয় নি, তাঁদের দৃষ্টি এমন "পিঙ্গল" হোয়ে যায় নি ও তাঁদের "কল্পনার দূরবীক্ষণ" এত দূর পর্য্যন্ত বিগ্‌ড়ে যায় নি যে, তাঁরা "আমোদ প্রমোদ" ও "মেলা মেশা" মাত্রেরই মধ্যে একটা হীন, একটা জঘন্য একটা বীভৎস ভাব দেখ্‌তে পা'ন১। অতএব

১ এক জন পর-মানুষ কিছু দোষ করে নাই বলিয়া তাহার সহিত আত্মীয় স্বজনের মত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে ঘরের স্ত্রী-লোকদিগের সহিত মেলা-মেশা করিতে দিতে হইবে, ইহা কোন ইংরাজি আইনে পাওয়া যায়? সং

১ লেখকের মত এই যে, যেমন পুরুষে পুরুষে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেশা নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে, পরপুরুষে পরস্ত্রীতেও তাহা তেমনিই নিষ্কণ্টকে চলিতে পারে; কিন্তু কাজে কি দেখা যায়? দুইজন পুরুষ মানুষের মধ্যে যতই কেন বন্ধুতা ও ঘনিষ্টতার মাত্রা বাড়ুক না তাহাতে বিশেষ কাহারো কিছু আইসে যায় না; কিন্তু পরস্ত্রী এবং পরপুরুষের মধ্যে নির্দোষ বন্ধুতার মাত্রা বাড়িলে অনেকেরই তাহা শঙ্কার বিষয় হয় কেন? ইংরাজ-সমাজের বিধানানুসারে পর-পুরুষদের সঙ্গে পরস্ত্রীদের হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে-পর্য্যন্ত কোন দোষ নাই,—কিন্তু আমাদের চক্ষে ওটা কিছু আমোদ-প্রমোদ মেলা-মেশার

যদি "আমোদ প্রমোদ" ও "মেলা মেশা" মাত্রেরই খারাপ অর্থ না থাকে ও "পর-পুরুষ" মাত্রেই যদি বাঘভাল্লুক বা চোর ডাকাত না হয়, তাহোলে "পর-পুরুষের সঙ্গে "আমোদ প্রমোদ" "মেলা মেশায়" কি দোষ আছে? এক জন অন্যায় রূপে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেবার বিরুদ্ধে তুমিত বোল্‌তে পার যে, "এ স্বাধীনতা আত্মারও স্বাধীনতা নহে, দেশেরও স্বাধীনতা নহে, কেবল স্বজাতিবর্গের সহিত এক ব্যক্তির আমোদ প্রমোদে মেলা মেসা, এ কতদূর স্বাধীনতা নামের যোগ্য তাহাই সন্দেহ স্থল!" আত্মার স্বাধীনতা ও দেশের স্বাধীনতা ব্যতীতও আরো অসংখ্য স্বাধীনতা আছে, যা প্রার্থনীয় ১! উপসংহারে

আতিশয্য বলিয়াই ঠেকে। আমাদের দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল না এমন নহে এবং এখনো তাহা কোথাও কোথাও আছে, কিন্তু তথাপি স্ত্রীলোকেরা আমাদের এমনি সম্মানের পাত্রী যে পর-কেহ তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে ইহা আমরা দেখিতে পারি না। সখ্য এবং দাম্পত্য দুয়ের মধ্যে কেবল একটা বালির বাঁধ সংস্থাপন করিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন তাঁহারাই বলিতে পারেন—এতে দোষ কি, তা'তে দোষ কি, কিন্তু যাঁহারা স্ত্রী-স্বাধীনতা চা'ন অথচ সখ্য ও দাম্পত্য দুইকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিতে চা'ন তাঁহারা ঐ স্থানে প্রস্তরের বাঁধ ভিন্ন আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। লেখক যে বলিবেন—সু-চক্ষে দেখিলে সকলই সু, কুচক্ষে দেখিলে সকলই কু, তাহার জো নাই,—সহস্র বন্ধুনী হউন না কেন তাঁহার বাড়িতে যদি পুরুষ-মানুষ কেহ না থাকে তবে ইংরাজি শাস্ত্রে তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সহিত সখ্যালাপ করা অবিধি হইল কেন? সু চক্ষে দেখিলে তাহাতে ত কোন দোষ নাই। সং

১ আত্মার স্বাধীনতা সকল অবস্থাতেই নির্দোষ কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা যে অংশে বুঝায় "পর পুরুষগণের সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা" সে অংশে তাহা নির্দোষ হইতেও পারে, না হইতেও পারে; কে বলিতে পারে যে, তাহা নির্দোষ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এখনো বলিতেছি যে, পর পুরুষদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা আত্মার স্বাধীনতার ন্যায় দোষাশঙ্কার সীমা-বহির্ভূত এমন কোন বস্তু নহে যে, তাহা স্ত্রীলোকের অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে; উহা অপেক্ষা বরং আপনাদিগকে মিথ্যা-অপবাদ নিন্দা-গ্লানি প্রভৃতি হইতে রক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের বেশী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রার্থনীয় নহে—ইহা আমরা কোন কালে বলিও নাই বলিবও না, কিন্তু যে-প্রকার স্ত্রীস্বাধীনতা হইতে সু-ফল অপেক্ষা কুফলেরই অধিক সম্ভাবনা, সে স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকা অপেক্ষা না থাকা-ই অধিক প্রার্থনীয়। যে দেশে বুদ্ধিমান লোকের নিকট বিবাহ বিভীষিকা-বিশেষ, সে দেশের স্ত্রীস্বাধীনতার অনুকরণ করিবার জন্য হিন্দুসমাজের কি যে দায় পড়িয়াছে তাহা ত বুঝা যায় না;—বোম্বাই দেশে কি স্ত্রীস্বাধীনতা নাই—মহারাষ্ট্রীয় দেশে কি স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই—সে-সব অগ্রাহ্য করিয়া ভয়ানক উৎপেতে ইউরোপীয় স্ত্রী-স্বাধীনতাকে আদর্শ করিয়া চলিতে আমাদের যে, এত ব্যগ্রতা, তাহার অর্থ আর কিছুই নয় খালি—বিধাতার বিড়ম্বনা; তাহার অর্থ,—অর্থের অপব্যয়, সময়ের অপব্যয়, শরীরের কষ্ট, মনের কষ্ট আর মেম্-সাহেবি একটা-তমো—এই যা' কিছু। সং

সম্পাদক মহাশয় বোলেছেন যে, স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে রাখা পুরুষদের স্বার্থপরতার ফল নয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্মের অনুরোধে তা' স্বভাবতই হোয়ে দাঁড়িয়েছে! স্ত্রী স্বাধীনতা বিরোধীদের এই এক অতি পুরোণো যুক্তি আছে; কিন্তু আমার বোধ হয় এটা আর কারো চক্ষে আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না যে, প্রাচীরবদ্ধ অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকালের জন্যে প্রবেশ করা ও সমস্ত পৃথিবীর থেকে আপনাকে রুদ্ধ কোরে রাখা স্বাভাবিক হওয়াই নিতান্ত অস্বাভাবিক ১। যদি সত্যই স্বাভাবিক হোত, তা' হোলে য়ুরোপে কেন এ স্বভাবের নিয়মের পরিবর্ত্তন হোল? এখানে কি স্ত্রীলোকদের স্বামী নেই, না সন্তান হোলেই তারা গঙ্গা-সাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে আসে? লেখক মহাশয় বলেন "কুল-রমণীরা যে, যে-সে পুরুষের সঙ্গে আমোদ করিয়া বেড়ায় না; সে কেবল পতির শাসন-ভয়ে নহে, পতির প্রতি ভালবাসাই তাহার কারণ।" ও হরি! আমি কি বোলেছি যে কুল-রমণীরা "যে-সে" পুরুষের সঙ্গে কেবল "আমোদই" কোরে বেড়াবে? রেখা গুলিকে ঈষৎ বেঁকিয়ে চুরিয়ে বাড়িয়ে কমিয়ে, একটি সুশ্রী ছবিকে ও কদর্য্য করা যায়, শিবকেও বাঁদর গোড়ে

১ স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সহিত এখানকার সম্পর্কই নাই—এখনকার যা'কিছু বিচার তা' কেবল সুবিধা অসুবিধা নিয়ে। আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর-বাস-প্রথা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ বলিয়াই তাহা প্রার্থনীয়; যদি চতুর্দ্দিকে মান হানির ভয় সত্য সত্যই বিদ্যমান না থাকিত তাহা হইলে অন্তঃপুরকে কারাগারের সহিত তুলনা করিলে দোষের হইত না, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, অন্তঃপুর কুল-স্ত্রীদিগের কঠোর কারাগার নহে তাহা তাহাদের নিরাপদ-দুর্গ, অভয়-নিকেতন; আগে যথার্থ ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা চারিদিকের জঞ্জাল পরিষ্কার কর তাহার পরে অন্তঃপুর-প্রথা অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তন কর—তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র অমত নাই। কিন্তু তা'ও বলি অন্তঃপুর-প্রথা একেবারেই উচ্ছেদ করা কখনই হইতে পারেও না পারিবেও না; এমন কি ইউরোপেও অন্তঃপুর প্রথা একেবারে যে নাই তাহা বোধ হয় না; ও-দেশে যদি পুরুষদিগের মেলামেসা করিবার স্বতন্ত্র স্থান ও স্ত্রীলোকদের মেলামেসা করিবার স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট না থাকে তবে সে অভাব যত শীঘ্র পূরণ হয় ততই ভাল। Boudoir বোধ হয় কতকটা আমাদের অবরোধের কাছা-কাছি যায়। যাহা হউক্—আমাদের দেশের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার যদি আবশ্যক হয় তবে আমাদের আপনাদের রকমে তাহা করা উচিত। "আপনাদের রকমে" কাহাকে বলে তাহার একটি দৃষ্টান্ত;—আমাদের দেশের অতিথি-সেবা যেমন স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহাকে আদর্শ করিয়া আমাদের অন্তঃপুর-প্রথা পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, এমন কি অন্তঃপুরের গৃহিণী কোন অভ্যাগত ব্যক্তির অতিথি-সৎকার করিলে তাহা আমাদের দেশাচারের চক্ষে ভাল বই মন্দ দেখিতে হয় না। বোম্বাই প্রদেশে এই রূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

সং

তোলা যায়! কোন পাঠক মহাশয় কি আমার লেখা থেকে মনে কোরেছেন যে আমাদের কুল-রমণীরা পথে ঘাটে যাকে তাকে দেখবে তারই সঙ্গে আমোদ কোরে বেড়াবে ১? অত কথায় কাজ কি? কোন্ দেশের পুরুষেরাই 'যে-সে' পুরুষের সঙ্গে 'আমোদ' কোরে বেড়ায়? আমরাত অনেক লোকের সঙ্গে মিলে থাকি, আমরা কি কেবলমাত্র আমোদ করবার জন্যেই মিলি? আমরা কাজ কর্ম্মের জন্যে মিলি, ভদ্রতার খাতিরে মিলি, বন্ধুভাবে মিলি, সাহায্য কোরতে মিলি, সাহায্য গ্রহণ কোরতে মিলি এবং মেলবার এমন আরো অসংখ্য উপলক্ষ আছে। পৃথিবীতে শত সহস্র মানুষ আছে ও মানুষ সামাজিক জীব, সুতরাং মানুষে মানুষে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হওয়াই স্বাভাবিক। নিতান্ত চোকে ঠুলি দিয়ে না বেড়ালে বা অন্তঃপুরের সিন্ধুকে চাবি বন্ধ না থাক্‌লে এরকম দেখা সাক্ষাৎ নিবারণের আর ত কোন উপায় নেই। তা ছাড়া অন্য লোকের সঙ্গে মেশা কি স্বামীর প্রতি অপ্রীতির চিহ্ন? আমি ত তার একটা অর্থ খুঁজে পাইনে ১। তোমার একটি নিতান্ত

১ যে-সে লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া বেড়ানো সর্ব্বদাই হউক আর কদাচ কখনই হউক্, তাহা কুল-স্ত্রীকে শোভা পায় না,—যে-সে লোক বলিলে শুদ্ধ যে, কেবল দুষ্ট লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল অভদ্র লোকই বুঝায়, শুদ্ধ যে কেবল পথের লোকই বুঝায় তাহা নহে; শান্তশিষ্ট লোক বল, ভদ্র লোক বল, পরিচিত লোক বল, অবস্থা-বিশেষে সকলেই যে-সে লোকের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন। লোকটি ভদ্রবংশীয়, লেখা পড়া জানে, কথাবার্ত্তা বেস্, ভদ্র আচার ব্যবহার, আমার পরিচিত—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আমি তাহার ধর্ম্মাধর্ম্ম এবং চরিত্রের জন্য দায়ী নহি—এমন যে ব্যক্তি ইনিও এক হিসাবে যে-সে লোকের মধ্যে ধর্ত্তব্য—কোন্ হিসাবে? না যখন তাঁহাকে অন্তঃপুরের স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিবার কথা। যাহার সহিত সবে মুতন আলাপ হইয়াছে তাহার সহিত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে স্ত্রী জনের যদি কোন বাধা না থাকে তবে যে-সে লোকের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতে যে কিসের বাধা, তাহা বুঝা যায় না—সকল সময়েইত কিছু আর আমোদ-প্রমোদ দোষে কলঙ্কিত হয় না। সং

১ কুল স্ত্রীরা যে পর-পুরুষদিগের সহিত বেশী মেলা-মেসা ও আমোদ-প্রমোদ করে না তাহার কারণ অনেক্ গুলি যথা; (১) পাছে কুলোকে কুভাবে; যাহাকে খুব ভাল বলিয়া জানা আছে তাঁহারও অন্তঃকরণ কু হইবার আটক নাই; (২) পাছে স্ব-লোকে কু ভাবে,—ইহাতেও আটক নাই; পরস্ত্রী পরপুরুষে মেলা-মেসা কতটুকু পর্য্যন্ত শোভা পায় তাহার একটা মাত্রা রাজ-নিয়ম দ্বারা আজি পর্য্যন্তও নির্দ্ধারিত হয় নাই; আমি যাহা দেখিয়া বলিব "ইহাতে দোষ নাই" আর একজন বলিবে "এতটা ভাল নয়"; সেক্সপিয়রের উইণ্টর্স্ টেলের হরমিওনী বেচারির ও তাঁহার স্বামীর দুর্দ্দশা বিবিসাহেবদিগকে বিলক্ষণই ভোগ করিতে হয়, কিন্তু কি করিবেন? দুর্জ্জয় দেশাচার—সুতরাং নাচার! (৩) পাছে স্বামীর মনে কু-আশঙ্কা স্থান পায়; স্বামীর মনে হয় ত এই রূপ একটা মাত্রা নির্দ্ধারিত আছে যে,

অন্তরঙ্গ প্রাণের বন্ধু আছে, কিন্তু তাই বোলে কি তুমি ঘোমটা টেনে বোসে

পর-পুরুষদের সহিত স্ত্রীলোকের এইটুকু পর্য্যন্ত মেলা মেশাই ভাল তাহা-অপেক্ষা বেশী ঘনিষ্টতা ভাল না; যে-স্ত্রী স্বামীকে ভাল বাসে সে স্ত্রী সেই মাত্রাটি অতিক্রম করিয়া স্বামীর মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হইবে না ত আর কে হইবে? সে মাত্রা কতটুকু স্বামীই তাহা জানে, স্ত্রী তাহা জানে না, সুতরাং যদি স্বামীর মনঃপীড়া জন্মানো স্ত্রীর প্রার্থনীয় না হয়, তবে শেষোক্তের উচিত পর-পুরুষদের সহিত আমোদ-প্রমোদে মেলা-মেসা না করা; যে স্ত্রী স্বামীকে অধিক ভালবাসে তাহার তাহাতে প্রবৃত্তিই হয় না। সেক্সপিয়রের উইন্টর্স্ টেলে লিয়ণ্টীসের স্ত্রী হরমিওনী যখন লিয়ণ্টীসের এক জন বন্ধুর সহিত যেকহ্যাণ্ড করিতেছেন তখন লিয়ণ্টীস আপন মনে বলিতেছেন।

Too hot, too hot!
To mingle friendship far, is mingling bloods.
I have *tremor cordis* (হৃৎকম্প) on me
my heart dances
But not for joy,—not joy.— This entertainment
May a free face put on: derive a liberty
From heartiness from bounty, fertile bosom,
And well become the agent; it may I grant:
But to be paddling palms and pinching fingers;
As now they are; and making practised smiles,

থাকবে ১? ও পর-পুরুষের (অর্থাৎ বন্ধু ছাড়া অন্য কোন পুরুষের) মুখ দেখবে না

As in a looking glass; and then to sigh, as twere
The mort of the deer (হরিণের মরণ কালীন দীর্ঘ নিশ্বাস); O, that is entertainment
My bosom likes not, nor my brows.

এইত গেল সেক্সপিয়র;—আমাদের কোন সুবিচক্ষণ সাহেব-বন্ধুর মুখে আমরা স্বকর্ণে এইরূপ শুনিয়াছি;—"কি! আমার স্ত্রীর গাত্র অন্য লোকে স্পর্শ করিবে;—আমি অন্য লোকের স্ত্রীর গাত্রস্পর্শ করিব—ছি!" (৪) স্বামী মনে করিতে পারে যে, আমি আমার স্ত্রীর চরিত্র যেরূপ জানি তাহাতে সে পরপুরুষদের সহিত সহস্র মেলা-মেসা করিলেও কোন দোষের সম্ভাবনা নাই কিন্তু সে রূপ করিলে অমুক অমুক ব্যক্তিরা কুমনে করিতে পারে—মিছামিছি একটা কলঙ্ক কুড়াইয়া প্রয়োজন কি? এরূপ যখন হইতেও পারে হইয়াও থাকে, তখন পরপুরুষদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিবার কী-এমন মূল্য যে, তাহার জন্য স্ত্রী স্বামীর মনে একমুহূর্ত্তেও ঐরূপ দুর্ভাবনা উদ্দীপন করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিবে। সং

১ অত্যুক্তি। অন্তরঙ্গ লোকের নিকট কে ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকে? ঘোমটা যা' দেওয়া থাকে তাই থাকে, টানিয়া বাড়াইবার প্রয়োজনাভাবে শুধু শুধু কেন তাহা করিবে? অন্তরঙ্গ—প্রাণের কেন—মুখের বন্ধুর সঙ্গেও সকল স্ত্রীলোকেরই ত সহজভাবে কথাবার্ত্তা চলিয়া থাকে। তবে যদি বল যে ঘোম্‌টা দেওয়াটাই অন্যায়—তবে সে কোন কাজের কথা নহে, কেন না তাহা ন্যায়ও নহে, অন্যায়ও নহে, তাহা দেশাচার

বা তাদের সঙ্গে কথা কবে না ১? তাদের মুখ দেখলে বা তাদের সঙ্গে কথা কইলে কি তোমার বন্ধুর ভালবাসার প্রতিদান দেওয়া হোল না? এমন বন্ধুর সঙ্গে আমি ত কোন কারবার রাখিনে ২।

যাহোক্—"এই সকল যৎপরোনাস্তি দুরূহ বিষয়ের তত্ত্ব" এই বাঙ্গালিকে শিখাই দেবার জন্যে লেখক মহাশয় একটা নূতন বিশ্ব বিদ্যালয় সৃষ্টি করবার পরিশ্রম স্বীকার নাকোরে যদি তাঁর অবসর মত এই ভারতীতে এবিষয়ে মাঝে মাঝে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, তা'হোলে এই য়ুরোপ প্রবাসী বঙ্গ-যুবক গুরু দক্ষিণা স্বরূপ তাঁর নোটানলের ইন্ধন-যোগ্য আরো কতকগুলো সৃষ্টিছাড়া সমাজ সংস্কারক মত পাঠিয়ে দেবে।

সেক্‌সপিয়রের নায়িকা-কল্পনা।

আজকাল কালিদাস ও সেক্সপীয়ার লইয়া সাহিত্য-সমাজে হলস্থূল পড়িয়াছে। কেহ সেক্সপীয়ারের বিন্দু বিসর্গও না জানিয়া তাঁহাকে কালিদাসের পদানত করিতেছেন, কেহ বা কালিদাসের বিন্দুবিসর্গও না জানিয়া কালিদাসকে সেক্সপীয়ারের পদানত করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উভয় কবিই স্বকীয় মহিমায় বিরাজ করি-

---

মাত্র; তাহা দেখিতেও ভাল বই মন্দ নহে, যদি ঘোমটা না দেওয়া প্রথা থাকিত তাহা হইলে কালিদাসের এই সুন্দর কবিতাটি আমরা দেখিতে পাইতাম না "কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-লাবণ্যা।" অতি-পরিস্ফুট লাবণ্যের তীব্রতাও নহে, অপরিস্ফুট লাবণ্যের মন্দতাও নহে, কিন্তু উভয়ের মাঝা মাঝি অনতিপরিস্ফুট লাবণ্যের যে একটি মাধুর্য্য তাহা কেবল অবগুণ্ঠন দ্বারাই রক্ষিত হইতে পারে। সং

১ মুখ দেখিতেও দোষ নাই, কথা কহিতে দোষ নাই, আলাপ করিতেই দোষ, সুতরাং এটাও অত্যুক্তি। সং

২ আমার বন্ধুর সহিত আমি কোন কারবার রাখিব না, এমনকি তাহার মুখ দর্শন করিব না,—অপরাধ? না তিনি তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দেন নাই; একটা ব্যাঘ্রের মুখ হইতে আমিষ কাড়িয়া লইলে তাহারই বটে ঐরূপ ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে কিন্তু লেখকের অতবড় রাগের তেমন ত কোন গুরুতর কারণ দেখা যায় না; ইংরাজেরা দেখ কেমন ধীর-প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের স্ত্রীরা পরপুরুষদিগের সহিত নাচিলেও তাঁহাদের ধৈর্য্যলোপ হয় না। সং

তেছেন। সেক্সপীয়ার যদি এক সৌর জগতের সূর্য্যস্বরূপ হয়েন, তাহা হইলে কালিদাস, আর এক সৌর জগতের সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। সত্য বটে, দিগন্তব্যাপিনী,—দিগন্ত-অতিক্রম-কারিণী সেক্সপীয়ারের কল্পনার সমক্ষে রুদ্র রস, ভয়ানক রস, অদ্ভুত রস, বীভৎস রস, মনুষ্য-প্রকৃতির সুন্দর ও কুৎসিৎ কোমল ও কঠোর ভাব সকলই নখাগ্রবৎ পরিদৃশ্যমান, সকলই দর্পনবৎ চক্ষের সম্মুখে। কালিদাসের বিষয়ে আমরা ঠিক সে কথা যদিও বলিতে পারি না, তবুও একথা বলিতে হইবে যে কালিদাসের স্বর্গ-মর্ত্য-ব্যাপিনী মহতী কল্পনা সুন্দর ও চমৎকার রসে এতদূর মগ্ন হইতে—এতদূর পরিপ্লুত হইতে—এতদূর 'মস্‌গুল' হইতে ভাল বাসিত যে কালিদাস ভয়ানক বস্তু হইতেও—বীভৎসময় বস্তু হইতেও—অদ্ভুতবস্তু হইতেও সুন্দর ভাবটুকু বাছিয়া লইয়া তাহাই কল্পনার অপূর্ব্ব সুন্দরতম কুসুমে সাজাইতে ভাল বাসিতেন। সৌন্দর্য্যই তাঁহার কল্পনার পরিধি—কালিদাস সৌন্দর্য্য-জগতের রাজা। লজ্জাশীলা শকুন্তলা; ছলনাময়ী উর্ব্বশী, তপস্বিনী পার্ব্বতীই তাঁহার কল্পনার চরম উদাহরণ। সে সময় শুভ কর্ম্ম ও দেবতাদিগের যাত্রার সময় নাটক অভিনীত হইত সুতরাং সে সময়ে রৌদ্রাদি রসের অবতার-সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপ সাধিত হইবে কি না ভাবিয়াই হয়ত কালিদাস ঐ সকল রসের অবতারণা হইতে বিরত হইয়াছিলেন কিন্তু কালিদাস কি করেন নাই সে বিষয়ের আলোচনায় বিশেষ ফল নাই—তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই আমাদের আলোচ্য। সেক্সপীয়রের কল্পনার প্রকৃতি এই যে, সেক্সপীয়ারের কল্পনা সমুদ্রবৎ বিস্তৃত ও গভীর, কিন্তু যদিও প্রভাত-শিশিরবৎ অফেলিয়া হইতে ঝটিকাবৎ ক্যাথারিণী পর্য্যন্ত, স্বজন-ত্যাগী টাইমন হইতে সর্ব্বগ্রাসী কুব্জ রিচার্ড পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার আয়ত্তাধীন; বিলাসিনী ক্লিয়োপেট্রা, ও সতী সাবিত্রী ডেস্‌ডিমোনা, নিশাচরী লেডী ম্যাক্‌বেথ্ ও ফুল-বিহারিণী পর্‌ডিটা—সকলই সেই আকাশ-পাতাল ভেদকারী কল্পনার আয়ত্তাধীন,—কি এরিএল্, কি পক্, কি ডাকিনীদল, কি সুরনারী মণ্ডলী—সকলই সেই বিশ্ব-অতিক্রম-কারিণী কল্পনার নিয়মাধীন—শাসনাধীন—আজ্ঞাধীন—কিন্তু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সূক্ষ্ম গঠনবিধিতে কালিদাস কোন কোন বিষয়ে যে সেই অদ্বিতীয় সেক্সপীয়রকে পর্য্যন্ত পরাভূত করিয়াছেন—তাহা বলিতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হইব না। সেক্সপীয়ার একটি নন্দনকানন সৃজনে অতিশয় নিপুণতা দেখাইতে পারেন বটে, কিন্তু সেই নন্দনকাননের প্রত্যেক ফুলের, প্রত্যেক ফুলের প্রত্যেক পাপড়ীর, প্রত্যেক পাপড়ীর প্রত্যেক শিরায় যে কত মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য নিহিত আছে, তাহা কালিদাস ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন কবিই আর প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সে সৌন্দর্য্যের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুভব করা নিতান্ত সহজ নহে। যে রমণীয় উপাদানে, যে

পারিজাতের পরিমলে, যে ইন্দ্রধনুর বর্ণে, যে কবিতার কল্পনাতে,যে কল্পনার জ্যোৎস্নাতে শকুন্তলা সৃজিত হইয়াছিল,—তাহা সহজে কে বুঝিবে ?—দ্বীপবাসিনী মিরান্দা ত সে শকুন্তলার সম্মুখে সূর্য্যালোকে দীপালোক মাত্র,—চন্দ্রালোকে খদ্যোতালোকমাত্র। কালিদাস ও সেক্‌সপীয়রকে তুলনা করিয়া এক জন ফরাসী গ্রন্থকর্ত্রী এইরূপ বলিয়াছেন—"বোধ হয় ভারতবর্ষীয় কবি পারিপাট্য (Finesse), সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণদর্শিতাতে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়াছেন; যাহা ধরিতে ছুঁইতে পারা যায় না, ইনি তাহাই ধরিয়া পাইয়াছেন, তিনি অতি এক গভীর প্রদেশ হইতে সত্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা যে সে স্থান নহে—স্ত্রীলোকের হৃদয়[১]।"

আমরা এই কথা প্রতিপন্ন করিবার আশায় এক জন প্রখ্যাত-নামা সমালোচকের "শকুন্তলা ও মিরান্দা" সমালোচনার সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য এই যে কালিদাসের সৌন্দর্য্য-প্রতিমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত সুষমার গভীর আলোক কতদূর দুরবগাহনীয় তাহাই সকলের সম্মুখে আজি প্রকাশ করি।

বিখ্যাত সমালোচকের কথাগুলিই আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,২—

"কিন্তু শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন তাঁহার লজ্জা, লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা। মিরান্দার সে রূপ নহে। মিরান্দা এত সরলা যে তাহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে তাহার লজ্জা হইবে ? তাহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে সে কখন দেখেই নাই।

অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরান্দার অভাব নাই, এ জন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরান্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য্য অধিক।

শকুন্তলা সমাজ-প্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে, কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে, কিন্তু মিরান্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়-লক্ষণ বাক্যে অধিক পরিস্ফুট হইবে।"

সুবিচক্ষণ সমালোচকের এই কয়েকটি পংক্তিতে মানব-প্রকৃতি-বিষয়ক, রমণী-হৃদয়-বিষয়ক, এমন কি,—সেক্সপীয়ার-বিষয়ক এতগুলি বিকট ভ্রান্তি প্রকটিত হইয়াছে যে তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রদর্শন না করিলে সাধারণ পাঠকের মনে একটা বিষম ভ্রান্তি থাকিয়া যাইবে। সমালোচক আরম্ভেই বলিতেছেন যে "শকুন্তলা সুশিক্ষিতা"——এ গূঢ় গুপ্ত কথা তিনি কোথা হইতে জানিলেন ?—কালিদাস ত কোথাও

১ Les Heroines de Kalidasa to. Les Heroines de Shakespeare, Per Mary Summer (Madame Foucoux) Paris 1879-P 117.

২ বিবিধ সমালোচন, শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

বলেন নাই যে শকুন্তলা জন্মেও কোন শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শকুন্তলা হইতেও যে মিরান্দা সুশিক্ষিতা,তাহা সেক্সপীয়ার আপনিই মিরান্দার পিতা প্রস্পেরোর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—প্রস্পেরো নিজেই বলিতেছেন যে "এই জন-মানব-শূন্য দ্বীপে আসিয়া তোমার শিক্ষা-গুরু রূপে আমি তোমাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দান করিয়াছিলাম,—এমন কি, অন্য অন্য রাজকুমারীরা এমন শিক্ষা কখনই পাইতে পারে না *।" যদি কেহ বলেন যে সে শিক্ষা পিতার দেয় শিক্ষা, অর্থাৎ তাহাতে সংসারের নাম-গন্ধও নাই—রসাভাসের নাম গন্ধও নাই—সমাজের নাম গন্ধও নাই—উহা কেবল নৈতিক ও ধর্ম্ম-শিক্ষা মাত্র,—আমরা তাহার উত্তরে এই বলি যে সে কথা ভ্রান্তিমূলক। যখন প্রস্পেরো আপন নির্ব্বাসনের কথা মিরান্দার কাছে ব্যক্ত করিয়া,—তাঁহার প্রতি তাঁহার সহোদরের অত্যাচার বর্ণনা করিয়া মিরান্দাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"এখন বল দেখি,—এই রূপ ব্যক্তি আমার সহোদর হইতে পারে কি না?"—মিরান্দা উত্তর করিলেন—

"আমার পিতামহীকে অসতী ভাবিলেও আমার পাতক আছে—কিন্তু অনেক উন্নতমনা জননী ও অঘন্য পুত্র প্রসব করিয়াছে"———এই উত্তরেই মিরান্দার সংসার জ্ঞান,সমাজ-জ্ঞান,মনুষ্য-প্রকৃতির রহস্য জ্ঞান পর্য্যন্ত কি প্রকাশ পাইতেছে না? তবে মিরান্দা অপেক্ষা শকুন্তলা যে সুশিক্ষিততর, তাহা কিরূপে প্রকাশ পাইতেছে?. কণ্বমুনির কাছে শকুন্তলা কখনই সাংসার ও সমাজের শিক্ষা পাইতে পারেন না ১, কারণ কণ্বমুনি নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি সে সব বিষয়ের কিছুই জানেন না, প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়া যে কখন আশ্রমের বহির্দ্বারে গিয়েছিলেন এমন কথা কালিদাস কোথাও বলেন নাই, গোতমী ও আগন্তুক ঋষিবৃন্দ যে শকুন্তলার কাছে কখন' প্রণয়-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্ভবই নহে, অথচ মিরান্দা জানেন যে নিজের খুল্লতাতকে মন্দ বলিলে পিতামহীর সতীত্বের উপর নিন্দা অর্শায়, এবং তা অপেক্ষা আরও তিনি জানেন যে শুদ্ধমনা জননীরাও নীচমনা পুত্র প্রসব করিয়া থাকে ২। —সুতরাং ইহাতে কি এই প্রতিপন্ন হয় না যে শকুন্তলা অপেক্ষাও মিরান্দা সুশিক্ষিততর ছিলেন? তবে সুপ্রসিদ্ধ লেখক কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন যে শকুন্তলা বিশেষ সুশিক্ষিতা ও সংস্কারসম্পন্না ছিলেন? তিনি বলিতেছেন "শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন,—তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন তাঁহার লজ্জা।" লেখককে জিজ্ঞাসা কর যে শকুন্তলা লজ্জাশীলা কেন?—তিনি বলেন যে শকুন্তলা সুশিক্ষিতা। আবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর যে শকুন্তলা কিসে সুশিক্ষিতা

* Tempest, act I. Scene II.

১ ইহা ঠিক নহে, সখীমুখে ব্যক্ত আছে যে তাহারা ইতিহাসে অনভিজ্ঞ ছিল না। সং

২ যখন সখীরা শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত রাজার গোচর করিয়াছিল তখন ইহা সম্ভব নহে। সং

হইল ?—তাহার উত্তর এই যে তিনি লজ্জা শীলা। ইহাকেই ন্যায়শাস্ত্রে চক্রভ্রান্তি কহে। জিজ্ঞাসা কর "পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে কেন?" উত্তর—"পর্ব্বতে বহ্নি আছে"—আবার জিজ্ঞাসা কর "পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তাহা কিরূপে জানিলে?" উত্তর—"কেন না পর্ব্বতে ধূম উঠিতেছে?

প্রকৃত প্রস্তাবে, শিক্ষার সঙ্গে লজ্জার যে কতদূর নিগূঢ় সম্বন্ধ তাহা আমরা পরে দেখাইব—আমরা পরে দেখাইব যে আশ্রম-বাসিনী শকুন্তলার লজ্জাশীলতা অপেক্ষা দ্বীপান্তর-বাসিনী মিরান্দার লজ্জাশূন্য সরলতা কখনই মধুরতর নহে। কিন্তু তাহা দেখাইবার পূর্ব্বে অগ্রে দেখা আবশ্যক যে সেক্‌সপীয়ারের "সুশিক্ষিতা ও সমাজ-সংস্কার-সম্পন্না" নিয়ত-উচ্চারিত নামা নায়িকাদের মধ্যে লজ্জার ভাব কতদূর পরিণত। তাহা হইলেই সহজে বুঝিতে পারিব যে ঐ লজ্জা-সম্বন্ধে কালিদাসের কল্পনা সেক্সপীয়ারের কল্পনা হইতে কতদূর বিভিন্ন। সেই প্রভেদের কারণ বুঝিতে পারিলেই মিরান্দা অপেক্ষা শকুন্তলাকে সহস্রগুণে "লোকললামভূতা' বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। পাখার আড়ালে মুখ লুকাইলে, বা রুমালে চক্ষু ঢাকিলে যে লজ্জার উদ্দেশ্য সাধন হয়, আমরা সে লজ্জার কথা বলিতেছি না,—সে লজ্জা ত ছলনার নামান্তর মাত্র,—সে লজ্জা ত বিভ্রম-বিলাসের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু যে লজ্জা রমণী-হৃদয়ের নিভৃত উৎস হইতে উৎসারিত, যাহার প্রভাবে প্রাণমন স্তরে স্তরে আপনাপনি কাঁপিয়া উঠে ও অভিপ্রেত কথা গুলি রসনাতে আপনাপনি বিজড়িত হইয়া যায়, যে লজ্জা প্রকৃত সরলতার সঙ্গিনী, বিনয়ের জননী ও সৌন্দর্য্যের নিদানভূত, আমরা সেই লজ্জার কথাই বলিতেছি, এবং দেখিব যে সেক্সপীয়ারের কল্পিত সুশিক্ষিত সংস্কার-সম্পন্ন নায়িকা-মণ্ডলে সে লজ্জা কতদূর বলবতী।

ব্রেবান্‌শীয়ো-দুহিতা ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোর সঙ্গে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলে পর, তাহারা বিচারালয়ে আনীত হইল। তখন মর্ম্মপীড়িত ব্রেবানশীয়ো নিজ দুহিতার নির্দ্দোষিতার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকিয়াই তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে বলিলেন, "এস, এস, তোমার কি বক্তব্য আছে বল। তুমি ত জানই যে এখানে কাহার প্রতি তোমার বশম্বদতা প্রদর্শন করা উচিত।' তখন ডেস্‌ডিমোনা উত্তর করিলেন, "পিতঃ এখানে আমার কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আপনার নিকটে আমি আমার জীবন ও শিক্ষার কারণে ঋণী আছি বটে, এবং সেই হেতুই আমি আপনাকে সম্মান করিব, আমার সমস্ত কর্ত্তব্যের নিয়ন্তা আপনিই, আপনি আমার পিতা, কিন্তু ইনি আমার স্বামী, সুতরাং আমার জননী তাঁহার নিজ পিতার অপেক্ষাও আপনার প্রতি যত অধিক যত্ন ও কর্ত্তব্য-শীলতা দেখাইয়াছিলেন, আমিও আপনার অপেক্ষাও এই আমার স্বামীর প্রতি অধিকতর সেইরূপ যত্ন ও কর্ত্তব্য-শীলতা দেখাইতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইব না"। (১)

(১) Othello. Act 1. Scene III.

বৃদ্ধ রাজা লীয়ার যখন দুহিতাত্রয়কে ডাকিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন, তখন সেক্‌সপীয়ারের নায়িকা-শ্রেষ্ঠা কর্ডিলিয়া শুভ্র-কেশ-শির হিমালয়-সদৃশ রাজপিতার মুখের উপরেই বলিলেন,—

"পিতঃ, আপনি আমাকে জন্ম দিয়াছেন, আমাকে লালন পালন করিয়াছেন, আদর যত্ন করিয়াছেন;—আমিও সেই অনুসারে—সেই আদান প্রদানের উচিত নিয়মানুসারে আপনাকে মান্য করি, ভালবাসি এবং সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করি। . . .

"কিন্তু আমি যখন বিবাহ করিব, তিনিই যিনি আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমার ভাল বাসা যত্ন ও কর্ত্তব্যশীলতার অর্দ্ধেক অধিকারী হইবেন। আমি নিশ্চয়ই এমন বিবাহ করিব না যে আমার ভগিনীদের মত বিবাহ করিয়াও পিতাতেই সকল ভালবাসা উৎসর্গ করিব।"

লীয়ার। "কিন্তু এই কি তোমার হৃদয়ের কথা?

কর্ডিলীয়া। "হাঁ পিতঃ।"

লীয়ার। "এত অল্প বয়সেও এত নিষ্ঠুর?"

কর্ডিলীয়া। "রাজন! এত অল্প বয়সেও আমি এত সত্যবাদিনী।" (২)

আবার যখন ইংলণ্ডাধিপতি সিম্বেলাইন তদীয় দুহিতা ইমোজেনকে অজ্ঞাত কুলশীল পস্থুমসের সহিত বিবাহের জন্য উৎসর্জনা করিয়া বলিলেন—

"রে দুর্ব্বৃত্ত পামরি!—তোর এই যে উচিত কায, অর্থাৎ, আমার বিগত যৌবনকে পুনরুদ্ধার করা,—তাহা না করিয়া তুই আমার এই বৃদ্ধ বয়সের উপর আরও বৎসরেকের বার্দ্ধক্য স্বচ্ছন্দে চাপাইতেছিস্?"

ইমোজেন্। "হে পিতঃ, আমি আপনাকে অনুনয় করিতেছি যে আপনি বিরক্ত হইয়া আর কষ্ট পাইবেন না। আপনার ক্রোধ আমি এখন অনুভব করিতে অক্ষম, কেন না আপাততঃ আমার কষ্টের প্রভাবে আমার অন্য সকল প্রকার জ্বালা-যন্ত্রণা শমিত হইয়াছে।"—

সিম্বে। "তুই এক জন ভিখারীকে বিবাহ করিয়া আমার সিংহাসনকে কি নীচত্বের আসন করিতে চাস্?"

ইমো। না, আমি তাহাতে উচ্চতর আভা প্রদান করিয়াছি।"

সিম্বে। "রে তুই নীচ পামরি!

ইমো। "মহাশয়! আমি পস্থুমসকে যে ভাল বাসিয়া ফেলিয়াছি, সে কেবলই আপনার দোষে! আপনিই তাহাকে আমার খেলার সঙ্গীরূপে প্রতিপালিত করিয়াছিলেন, আর এখন আমি দেখিতেছি যে তিনি রমণীমাত্রেরই উপযুক্ত পাত্র—সুতরাং আমাকে তিনি বরং আমার অনুচিত মূল্যে কিনিয়াছেন।"

সিম্বে। "কি? তুই কি পাগল হইয়াছিস্?

ইমো। "প্রায়ই তাই। ঈশ্বর আমাকে নীরোগ করুন! এই আমার চূড়ান্ত

(২) King Lear. Act I. Scene I.

বাসনা যে আমি এক জন চাষার দুহিতা হইয়া পস্থুমস্-রূপ এক জন চাষা-পুত্রের কেন প্রণয়িনী হইলাম না।

সিম্বে। "রে তুই মূর্খ পামরি!" (৩)

আচ্ছা, যদি পিতাই না লজ্জার পাত্র হইল,—যদি বৃদ্ধ "তমাদিগ্রস্ত" জনকই না লজ্জার পাত্র হইল,—কিন্তু প্রণয়ের সদাবিকাশে প্রণয়ী ত লজ্জার পাত্র হইলেও হইতে পারে? কিন্তু সেক্সপীয়ার সেখানেই বা কি রূপ লজ্জা রক্ষা করিয়াছেন তাহা দেখা যাক্—

রোমীয়ো জুলীয়েটকে কখন দেখে নাই—জুলিয়েট্‌ও রোমিওকে কখন দেখে নাই, দুজনে কেহই কাহাকেও চিনে না, জানে না, ভাবেও নাই—এই অবস্থায় জুলিয়েট্‌দের রাজ-ভবনে এক দিন মহা সমারোহ হইল। রোমীয়ো নিজ প্রণয়িনী রোজালীনকে দেখিবার আশাতে ছদ্মবেশে সেই খানে উপস্থিত হইলেন। সেই খানে উপস্থিত হইয়া সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা জুলিয়েট্‌কে দেখিতে পাইলেন।—তাঁহাকে দেখিয়াই রোমিয়োর হৃদয় হইতে রোজালীনার প্রতিমা বিসর্জ্জিত হইল; এবং জুলীয়েটের উজ্জ্বল রূপ-মাধুরী জাগিয়া উঠিল। জুলীয়েট্‌ও সেই ভাবে গদগদ হইলেন, রোমীয়োর রূপে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া অপরিচিত শত্রুর হস্তেই মনে মনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিলেন। এই দুই অপরিচিত মুগ্ধ-মুগ্ধাদের মধ্যে—রাশি রাশি লোক-সমাজের মধ্যে, সেই ছদ্মবেশের মধ্যে দুই জনে এইরূপ কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল,—

রোমীয়ো। "আমি আপনার শরীর-রূপ পবিত্র মন্দিরকে যদিএই অনুপযুক্ত হস্তে কলঙ্কিত করি, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে আমার ওষ্ঠাধর-রূপ লজ্জাশীল যুগল তীর্থযাত্রী সে কলঙ্ক মোচন করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে।" ১

জুলিয়েটও সেই কথার তেমনি একটী উত্তর দিলে পর, দুই অপরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে অধরে অধরে চুম্বনের "অষ্টম আইন্" অর্থাৎ "চিরোবন্দোবস্ত" দিব্য রূপে সংস্থাপিত হইল। কায়িক সুখের পরিণামে রোমীয়ো জুলিয়েট্ উভয়েই জানিলেন যে উভয়েই শত্রু পক্ষীয়।

এইরূপ Twelfth Night এ, এইরূপ As You Like It এ—এইরূপ সেক্সপীয়ারের যত্র তত্র। এইরূপে সেক্সপীয়ারে লজ্জার বলিদানে সরলতা, বিনয়ের বলিদানে মুক্তকণ্ঠতা, রমণীর রমণীয়তার বলিদানে পৌরুষিক ওজস্বিতা পদে পদে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু কালিদাসে ওরূপ নির্লজ্জতার আভাসমাত্রও পাওয়া যায় না। তাহার কারণ কি? শকুন্তলার জড়িমা-জড়িত কথা বার্ত্তা, উর্ব্বশীর লতামণ্ডপে অকূল বিজড়ন, পার্ব্বতীর সখীসমাজে অপ্রস্তুত ভাব, এ সকল কোথা হইতে আসিল? এ সকল কোথা হইতে কালিদাসের কল্পনায় প্রতিফলিত হইল? যদি বল, যে কালিদাস আসিয়ায় জন্মিয়াছিলেন বলিয়া—তাহা হইলে সেক্সপিয়ারের দিগন্ত-ব্যাপিনী কল্পনার উপর দোষারোপ করা হয়। ক্রমশঃ

(৩) Cymbeline. Act I. Scene I.

১ Romeo and Juliet, Act I. Scene I.

বুদ্ধদেবের স্বপ্ন ভঙ্গ।

আর ঘুমাব না, আর ঘুমাব না,
আর না মুদিব অলস আঁখি—
যা ঘটে ঘটুক, যাতনার জ্বালা
সহিব না আর ভবনে থাকি।
বিজন কাননে আপনার মনে
আপনার ধ্যানে মগন রব—
মায়ার বিকারে, মোহের যাতনা,
বুঝিয়েও আর কেনই সব'
আহা, সেই সেই প্রথম প্রহরে
যে স্বপন আমি দেখিনু হায়—
এখনো স্মরিলে কেঁদে ওঠে প্রাণ
মরমে মরম গলিয়ে যায়।
আহা, কেই বা সে অশীতি-বয়সী—
লাঠির উপরে রাখিয়ে ভর,
হেরিনু যাহারে পাহাড়ের পথে
যায় ধিরি ধিরি সাঁঝের পর!
বাতাসে দশন কেঁপে কেঁপে পড়ে,
লোল হয়েছে গলিত মাস,
ভাঙ্গিয়ে গিয়েছে কোমরের হাড়,
চলিতে সঘনে বহিছে শ্বাস।
দৃষ্টি নাহি চলে দুনয়নে আর,
দুনয়নে তার পড়েছে ছানি,
এলিয়ে পড়িছে হস্ত-পদ তার,
লুটিয়ে পড়িছে শরীর খানি,
চলিতে চলিতে খেতেছে হোঁচট্,
পাহাড়ের পথে গড়ায়ে যায়,
হাড় গোড় হয় ভেঙ্গে চুরমার,
আবু ধরি পুনঃ উঠিতে চায়!
কাঁপিতে কাঁপিতে, উঠিতে উঠিতে
আবার—আবার সাপটি পড়ে,
আর্ত্তনাদ তার বাতাসে মিশায়,
প্রাণ যেন আর না রয় ধড়ে!
অনেক কাঁপিয়ে, অনেক হাঁপিয়ে
অশীতি বয়সী শেষেতে উঠি—
বেঁকে চুরে ভয়ে চলিতে লাগিল,
স্থান ছেড়ে পড়ে অধীর লাঠি!
উঃ কি ভীষণ ভয়ানক স্থানে
উপজিনু গিয়ে তাহার পরে,
দিগন্ত-ব্যাপিনী মরুভূমি মাঝে
চমক ভাঙ্গিল কাহার স্বরে?
বলিষ্ঠ গঠন যুবা একজন
ভূমেতে লোটায় বিকার-দায়,
অনলের কণা বালুকা মাঝারে
উলটি পালটি গড়ায়ে যায়!
অরুণ-বরণ, যুগল নয়ন,
অথচ নয়নে জলের নাই,
আঙ্গার বরণ হয়েছে শরীর,
অধর শুখায়ে হয়েছে ছাই—
তৃষার জ্বালায়, যাতনা জ্বালায়—
মিছে বলে বলী হইয়ে হায়,
দন্ত কড়মড়ি উঠিছে যেমন
অমনি আবার গড়ায়ে যায়।
অনল মাখিয়ে অনিল বহিছে,
ছুটিছে বালুকা অনল-ধারা,
ভিতরের তাপে জ্বলিছে যুবক,
উপরে তপন আগুন পারা।

কভু করাঘাত করে নিজ বুকে,
আপনার কেশ আপনি ছেঁড়ে,
তখনি আবার জড়ের মতন
—মড়ার মতন লুটায়ে পড়ে।
সঙ্গে ছিল যারা, পলায়েছে তারা,
লোক জন সব কোথায় এবে,
এমন বিপদে একটি ও প্রাণী
নিকটে নাহি যে তাহারে সেবে।
এক ফোঁটা জল করি আহরণ
কেহই নাই যে মুখেতে দেয়,
ঝামা হোয়ে গেছে লোল রসনা;
তৃষায় বক্ষ ফাটিয়া যায়।
চারি ধারে তার, বিকট আকার
যমদূত সব তাকায়ে রয়,
কেহ বা নাচিছে, কেহ বা হাসিছে
—ছায়ার আকারে আমোদময়!
কেহ বা নয়নে উগরে অনল,
কার (ও) বা রসনা বিজলী ঝলে,
কেহ বা গরজি খাইবারে ধায়,
কেহ বা বসিছে উরস-স্থলে!
উঃ কি ভীষণ, সেই সে স্বপন,
হৃদি কেঁপে ওঠে স্মরি তা যেই,
—আবার—আবার—তৃতীয় প্রহরে
ছিঃ ছিঃ কি স্বপন দেখিনু সেই!
ছিঃ ছিঃ স্মরিব না আর সে স্বপন,
স্মরিতেও ঘৃণা উপজে মনে,
কিন্তু যেন সেই ভাগিরথী-তীর
গ্রথিত রহেছে মরম সনে।
সেই সে পুলিনে তৃতীয় প্রহরে
নেহারিনু মৃত রমণী—কে সে?
আ-নাভি মগন জাহ্নবীর জলে,
ষোড়শী শয়ান পুলিন-দেশে।
নৈশ পদ্মবৎ কান্তিহীন তনু,
অথচ রূপের আভাস-ময়,
শীয়রে নিকট বিকট শ্মশান,
অধোভাগে ধীরে তটিনী বয়।
কাদায় জড়িত চাঁচর চিকুর,
হেথায় হোথায় অবাধে পোড়ে,
বসনের চীর যা ছিল শরীরে
কোথায় গিয়েছে স্রোতের তোড়ে।
না মুদিতে সেই নলিনী নয়ন—
নখরে শকুনী অবাধে ছেঁড়ে,
গৃধিনীর দলে তাড়ায়ে শৃগাল
নিলীম অধর খেতেছে কেড়ে।
প্রতাড়িত হয়ে গৃধিনীর দল
বিছাইয়া পাখা আকাশ-দেশে,
বামার নিটোল পীন পয়োধরে
গভীরে গরজি বসিছে এসে।
হেথায় বিশুষ্ক গোলাপ-কপোলে
বায়স ছিঁড়িয়ে খেতেছে ঠোঁটে,
বাম হাত খানি টানিয়ে হোথায়
অদূরে কুকুর গরজি ওঠে—
নিরখিয়ে ছিঃ! ছিঃ! সে বর বপুর
হইতেছে দশা এমন ধারা,
তেড়ে গেনু যেই শৃগাল কুকুরে
অমনি আসিল গরজি তারা।
আচম্বিতে তাই ভেঙ্গে গেল ঘুম,
জাগিয়ে উঠিনু তরাশ ভরে,
আবার—আবার জাগিয়ে জাগিয়ে
অচেতন হ'নু ঘুমের ঘোরে।
সহসা স্বপনে আসিনু যেথায়
মানস-সরসী বিছায়ে রয়,

হিমাদ্রীর শির করিয়ে অধীর
মৃদুল মধুর বাতাস বয়—
ঈষৎ ঈষৎ সরসীর জল
থাকিয়ে থাকিয়ে কাঁপিয়ে ওঠে,
হোথায় সারস সারসীরে ল'য়ে
অস্ফুটো কমল কাননে ছোটে!
শূন্যে শূন্যে ওড়ে চক্রবাকী দল,
শূন্যে শূন্যে ওঠে শিখর-মালা—
সুদূরে সেথায় মেঘের আড়ালে
চকিতে চমকে, বিজলী-বালা!
সেই সে শ্যামল সরোবর জলে
ওই কে দাঁড়ায়ে তাপস-বর—
জটা জাল তাঁর অবাধে এলায়ে
পোড়েছে সরসী-সলিল পর।
দণ্ড কমণ্ডলু শোভে দুই হাতে
গেরুয়া বসনে আবৃত কায়,
রজত-বরণ-শ্মশ্রু কেশরাশি
বাতাসে দুপাশে উড়িয়ে যায়।
জানি না—জানি না কিসের কারণে,
কিসের ভাবেতে হইয়ে ভোর,
প্রশান্ত ভাবেতে—উদার ভাবেতে
মুদিত নয়নে ফেলিছে লোর—
সে লোর লহরী শান্তি-মাখা যেন,
অনল-আভাস নাহিক তায়,
হিমালয়-সম উন্নত হৃদয়ে
যেন রে জাহ্নবী উথলি ধায়।
ভাবে জ্ঞান হয় মায়া-মোহ-ক্লেশ
সে মনে যেন না পশিতে পায়,
মহান—উদার—প্রশান্ত ভাবের
জোছনা যেন সে বদনে ভায়।
কমলাও যেন সে চরণ-তলে
লুটাতেও নাহি ভরসা পান,
বাসব আপনি যেন তাঁরে হেরে
দিগন্তে সভয়ে মিশায়ে যান।
সে মূরতি চিতে, ভাবিতে ভাবিতে
সহসা ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর—
রাজ-আড়ম্বর!—দূরে থাক্ তুই
চরণে বিদায় লইনু তোর!
এখনি ছিঁড়িব রাজ-আভরণ,
মায়ার শীকল, মোহের ফাঁশ,
জরা-মৃত্যু-ময় আশ্রম আলয়ে
কার্ রে বাসনা করিতে বাস?
কার্ রে বাসনা অনল-মাঝারে
জ্বলিয়ে পুড়িয়ে করিতে বাস—
রাজ আড়ম্বর! দূরে থাক্ তুই,
ছিঁড়িব আজিকে মোহের ফাঁশ!
বিজনে বিজনে, বনে বনে বনে
বাকলে ঢাকিয়ে মাটীর কায়—
বন ফল খেয়ে, নদী-জল পিয়ে
ভাসিব আপন ভাবেতে হায়!
চাহি না হইতে রাজ-অধিরাজ—
ঝড়ে মহীরুহ আগেই পড়ে,
বিভব-বাসনা নাহি রাখি চিতে
—মণির কারণে ফনিনী মরে—
প্রণয়?—প্রণয়?—প্রণয় কারণে
আজি কি আটক্ রহিব গেহে?
কিবা সে প্রণয়!—কার বা প্রণয়।
কিসেরি প্রণয় মাটীর দেহে?
বিজনে বিজনে, বনে বনে বনে
বাকলে আবরি ধূলার কায়—
বন-ফল খেয়ে, নদী জল পিয়ে,
ভাসিব আপন ভাবেতে হায়।

শকুন্তলা সমালোচনার সমালোচনা।

নাটকীয় ব্যক্তি-গণের চরিত্র-সম্বন্ধে লেখক যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই ;—

"রাজা দুষ্মন্ত একজন ধীরললিত নায়ক। তাঁহাতে উদাত্ত গুণও কিছু লক্ষিত হয়। তিনি আত্মশ্লাঘাবর্জ্জিত বিনয়ী ধর্ম্মভীরু এবং ক্রূরতাশূন্য এই সকল পরিচয় আমরা অতি স্পষ্টরূপে পাই। বস্তুতঃ দুষ্মন্ত যে একজন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তাহা নহে।"

দুষ্মন্ত প্রশংসনীয় ব্যক্তি ছিলেন না এ-বিষয়ে লেখকের এমনি দৃঢ়বিশ্বাস যে তিনি কেবল ঐ কথাটি উল্লেখ-মাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ; কোন্ বিষয়ে যে, দুষ্মন্ত রাজা অপ্রশংসনীয় তাহা তুলেও একবার উত্থাপন করেন নাই; তিনি দুষ্মন্তের প্রশংসনীয় গুণ-গুলি আনুপূর্ব্বিক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন অথচ পদে পদে পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—খবরদার যেন তাঁহারা সে সমস্ত গুণ-গুলিকে প্রশংসনীয় মনে না করেন, এ কথার প্রতি তাঁহারা যেন দ্বিরুক্তি না করেন যে, শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় নম্রতা শৌর্য্য-বীর্য্য ভদ্রতা দাক্ষিণ্য সৌন্দর্য্য-রসাভিজ্ঞতা—এসকল গুণ প্রশংসার অযোগ্য —কেন তাহা ? না যেহেতু লেখকের সে বিষয়ে আদবেই সংশয় নাই ;—ইহা অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে ? দুষ্মন্ত-রাজা যে কেমন অপ্রশংসনীয় ছিলেন তাহা লেখক অতঃপর প্রদর্শন করিতেছেন, তিনি কিন্তু-পূর্ব্বক বলিতেছেন ;—

"কিন্তু প্রাচীন কালে সচরাচর রাজারা যেরূপ ছিলেন তাহা কালিদাস চিত্রপটের ন্যায় লিখিয়া গিয়াছেন। দুষ্মন্তের ঋষিদিগের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও যত্ন ছিল। তাঁহারা নিরুদ্বেগে তপশ্চরণ করিতেছেন কিনা ইহা জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল; এবং যখন তপোবনের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন তখন সূতকে বলিলেন তপোবননিবাসিনাং উপরোধো মাভূৎ এতাবত্তোব রথং স্থাপয়। দুষ্মন্ত অতিশয় বিনীতস্বভাব, তিনি বনে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আভরণ ও ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়া গেলেন কারণ বিনীতবেশেন প্রবেষ্টব্যানি তপোবনানি নাম। (তাঁহার বিনয়ের পরিচয় সপ্তম অঙ্কেও যথেষ্ট আছে, তিনি মাতলির প্রশংসা শুনিয়া যেন বিরক্ত হইতেছেন ও আপনাকে ইন্দ্রের অনুগ্রহের যোগ্যপাত্র মনে করেন না।) তপোবনে-প্রবেশ-কালে তাঁহার মন শারদীয় আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ছিল। ক্ষণকাল-পরে তাঁহার দক্ষিণ-বাহু স্পন্দন হওয়াতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ

চারুলা উপস্থিত হইল কিন্তু তিনি যেন তাচ্ছিল্য করিয়াই বলিলেন অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র। এই কথার দ্বারা তাঁহার প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য স্পষ্টই সূচিত হইতেছে। পরে তাঁহার বিশুদ্ধ গম্ভীর চিত্তে কিরূপে প্রগাঢ় প্রেম জন্মিল, তাহা কালিদাস উত্তম রূপে দেখাইয়াছেন। প্রথম প্রবেশ করিয়া রাজা যখন শকুন্তলা ও তৎসখীদ্বয়কে জলসেচন করিতে দেখিলেন তখনই যে একবারে লঘুপ্রকৃতির ন্যায় মন্মথ-বাণে আবিদ্ধ হইলেন তাহা নহে, তিনি দেখিয়া বলিলেন 'আহো মধুরমাদাং দর্শনম্। এই প্রশংসা-বাক্যে বিস্ময় বুঝাইতেছে কিন্তু প্রেমের কোন লক্ষণ নাই—সুন্দরী কিশোরবয়স্কা বালা দেখিয়া কাহার না চক্ষুঃপ্রীতি জন্মে ও হৃদয় আহ্লাদিত হয়। প্রথমে রাজারও সেইরূপ হইয়াছিল। পরে কিয়ৎক্ষণ দর্শন করিতে করিতে তাঁহার মনে কক্ষণার উদয় হইল। তিনি মহর্ষি কণ্বকে অসাধুধর্ম্মী মনে করিলেন, কারণ তিনি শকুন্তলাকে তপঃকার্য্যে নিযুক্তা করিয়াছেন। এখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে রাজার মনে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এখনও স্পষ্ট রূপে প্রেমের ভাব উদিত হয় নাই। আমরা জানি যে 'pity melts the soul to love' ইহার পর রাজা সতৃষ্ণ নয়নে শকুন্তলার প্রতি অবলোকন করিতে লাগিলেন। তিনি শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন 'কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।' এখন তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। তিনি "লোভনীয় কুসুমকে" কি রূপে লাভ করিবেন তাহাই ভাবিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন যে শকুন্তলা যদি মহর্ষির অসবর্ণ-ক্ষেত্র-সম্ভবা হয় তাহা হইলে তিনি বিবাহ করিতে পারেন। ইহা দুষ্মন্ত রাজার প্রকৃতি-অনুযায়ী, তিনি ধার্ম্মিক এবং তাঁহার মনে ক্রূর বা অসদভিপ্রায় নাই। তিনি অসৎ প্রেমের কথা ঘুণাক্ষরেও মনে করেন নাই, শকুন্তলাকে বিবাহ দ্বারা লাভ করিবেন কিন্তু অনুরাগ তাঁহার মনে এত বদ্ধমূল হইয়াছে যে শকুন্তলাকে নিশ্চয় পাইব এইরূপ স্থির করিলেন, ও মুগ্ধ হইয়া ঈষৎ গর্ব্বের সহিত বলিতেছেন "অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।" এরূপ গর্ব্বও এখানে অতি সুন্দর, কারণ যখন লোকে প্রেমে মত্ত হয় তখন তাহাদের আত্ম-অভিমান বৃদ্ধি হয়।" (লেখকের এ কথাটি ঠিক নহে; প্রেম আত্মাভিমানের গর্ব্বকে এমনি খর্ব্ব করিয়া দেয় যে, অত বড় রাজা এক জন আশ্রম-বাসিনী কন্যাকে আপনার রাজ-মর্য্যাদা অপেক্ষা অধিক মনে করিতে একটুও কুণ্ঠিত হ'ন নাই; ও-শ্লোকটির তাৎপর্য্য কেবল এইমাত্র যে, "অনার্য্য আচরণের প্রতি স্বভাবতই আমার মন পরাঙ্মুখ, তবে আজ কি আমার মন তাহার প্রতি ধাবিত হইবে? এ কখন হইতে পারে না, এ যুবতী নিশ্চয়ই ক্ষত্র-পরিগ্রহক্ষমা"—ইহা আত্মাভিমান নহে, ইহা আশার প্রবোধ-বাক্য।) ক্রমে রাজা আত্মপ্রকাশ করিলেন ও নানাবিধ কথোপ-

কথন হইতে লাগিল। রাজার কথোপকথন অতি মনোহর এবং স্ত্রীদিগের প্রতি সম্মান-সূচক। আমরা প্রথম অঙ্ক পাঠ করিলে উপরোক্ত ভাব সকল অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।"

লেখক এই যে কথাগুলি বলিলেন ইহা খুব ঠিক; দুষ্মন্তের প্রকৃতি-চরিত্র ঐরূপই বটে—অর্থাৎ প্রকৃত এক জন হিন্দু রাজার যেমনটি হইতে হয়; দুষ্মন্তের সহিত এক জন মুসলমান রাজার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইবে; আমাদের দেশের প্রকৃতি-গত একটি যে সহজ-শোভন ভাব দুষ্মন্তরাজা আপদ-মস্তক সেই উপাদানে গঠিত; সে উপাদান যে কি তাহা বলিয়া বুঝানো বড় সহজ নহে,—তাহাতে নবাবি হাস্কামা নাই কিন্তু অন্তঃসার-সূচক রাজ-মহিমা সম্পূর্ণই আছে, তাহাতে আদব-কায়দার আড়ম্বর নাই অথচ তাহাতে বিনয় নম্রতা ভদ্রতা সভ্যতা মনুষ্যত্ব যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অদ্যকার কালের সভ্যতম জাতির সভ্যতম ব্যক্তিকে শিক্ষাদান করিতে পারে। বিনীতবেশে তপোবনে প্রবেশ করাতে দুষ্মন্তের মনের যে-এক মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছে তাহা আকবরসার হীরা-জহরত-শোভিত মুকুটই বল, আর নেপোলিয়নের দিক্‌ধর্ষী কিরীটই বল, সে-সবকে তৃণ অপেক্ষাও লঘু করিয়া দিয়াছে; কেননা আধ্যাত্মিক মহত্ত্বের নিকট পার্থিব মহত্ত্ব, তপোবলের নিকট বাহুবল, বাস্তবিকই তৃণ অপেক্ষা লঘু; রামায়ণে আছে "ধিক্‌বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলং"—যথার্থই তাহা। লেখক দুষ্মন্ত রাজার ভাব-চরিত্র ঠিকঠাক্ বর্ণনা করিয়া আসিতেছিলেন, আমাদেরও তাহা বেস হৃদয়ঙ্গম হইতেছিল—গীত বেস্ জমিয়া আসিতেছিল—এমন সময় কোথা-হইতে এক বে-সুরো "কিন্তু" আসিয়া সব মাটি করিয়া দিল; যথা,—"কিন্তু রাজার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় গুণ লক্ষিত হয় না;"—বিনা-মেঘে বজ্রাঘাত! কোথাও কিছু নাই মধ্যে-থেকে এমনি এক 'কিন্তুর' অবতারণা করা হইল যে, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্! লেখক এতক্ষণ পর্য্যন্ত দুষ্মন্ত রাজার কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহার ভাব ভক্তি সকলই সুন্দর ও মনোহর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়া পথিমধ্যে হঠাৎ বেঁকিয়া দাঁড়াইলেন, অনেক ক্ষণ ধরিয়া দিবা একটি প্রতিমা গঠন করিয়া এক আছাড়ে তাহা ভাঙিয়া চুরমার করিলেন, দুষ্মন্ত-রাজার যথেষ্ট গুণ বর্ণনা করিয়া অবশেষে স্বচ্ছন্দে বলিলেন "কিন্তু রাজার স্বভাবের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় গুণ লক্ষিত হয় না;" কেন? না "সমস্ত নাটক পাঠ করিলে প্রথম অঙ্কে যে-সকল গুণ দেখিলাম সেই সকল পূর্ব্বাপর দৃষ্ট হয়।" দুষ্মন্ত রাজার গুণ-গুলি পূর্ব্বাপর-সমান—তবে আর সে-গুলিকে কেমন করিয়া গুণ বলিয়া প্রশংসা করা যাইতে পারে? উচিত—বাহ্বটের কন্যার সঙ্গে দুষ্মন্ত রাজা সমস্বরে বলেন "দুষধাতো

রিবাস্মাকং দোষনিষ্পত্তয়ে গুণাঃ" অর্থাৎ দুষ-ধাতুর গুণেতেই যেমন দোষ হয় আমাদেরও দশা সেই রূপ! দুষ্মন্ত রাজার যদি আজ এক রূপ গুণ, কাল আর এক রূপ গুণ, পরশ্ব আর এক রূপ গুণ হইত, তবেই যা তাঁহার গুণের একটা মূল্য থাকিত, তাহা যখন হয় নাই তখন সে-সব গুণ কোন কার্য্যেরই নহে! তবে, লেখকের মতানুসারে, দুষ্মন্ত রাজাকে এক-বিষয়ে প্রশংসা দেওয়া যাইতে পারে,—শকুন্তলার-বিরহে তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং শকুন্তলার পুনর্মিলনে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন দুই অবস্থায় তাঁহার দুই রূপ গুণ দেখা দিয়াছিল—এক অবস্থায় চিত্তের গভীরতা, আর এক অবস্থায় চিত্তের প্রফুল্লতা,—অতএব এই একটি ছুতা ধরিয়া দুষ্মন্ত রাজাকে একটু প্রশংসা দেওয়া হোক, তাহাতে রাজারও মান রক্ষা হয়, লেখকের ও কোট বজায় থাকে, আপসে বিবাদ মিটিয়া যায়! লেখক ত দুই চারি কথায় বিচারনিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, কিন্তু আসল বৃত্তান্তটা কি দেখা যা'ক,—দুষ্মন্ত রাজা তপোবনে আপনার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুরাগিতা-গুণের পরিচয় দিয়াছেন; শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তিনি আপনার আধ্যাত্মিক বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন; শকুন্তলা-বিরহে রাজকার্য্যে যখন তাঁহার অপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল তখনও তিনি বিধিমত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ প্রজাপালনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে; ইন্দ্রের সহায়তা করিতে যাওয়াতে তাঁহার বীরত্ব প্রকাশ পাইয়াছে; এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গুণের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; তবে—শকুন্তলার সহিত প্রেমালাপ, শকুন্তলার বিরহ, এবং শকুন্তলার মিলন এই গুলিই গ্রন্থের প্রধান অঙ্গ, এজন্য অন্যান্য-গুণ অপেক্ষা রাজার সহৃদয় প্রেমিকতা গুণ অধিক-মাত্রা জায়গা জুড়িয়াছে—এই পর্য্যন্ত; সেক্সপিয়রের রোমিওর-ও তাই—ফার্ডিনাণ্ডেরও তাই; সেক্সপিয়রের ম্যাক্‌বেথের গুণও প্রধানতঃ একটিমাত্র—বড় হইবার ইচ্ছা; হ্যামলেটেরও প্রধানতঃ একই প্রকার গুণ—অন্যায় ব্যবহারে অসহ্য মনোবেদনা অথচ তাহার প্রতিশোধ-কার্য্যে অপটুতা; কিন্তু তাহাতে মন্দটা কি হইয়াছে তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না, তাহার বিপরীত-টাই ত আমাদের চক্ষে মন্দ ঠেকে; আমরা ত চিরকালই শুনিয়া আসিতেছি যে, নাটকীয় ব্যক্তির পূর্ব্বাপর একই প্রকার গুণ রক্ষা করিতে পারাই নাটককারদিগের যা-নইলে-নয় এমনি একটি গুণ ও যে-নাটককার তাহা না পারে সে ব্যক্তির নাটক না লেখাই কর্ত্তব্য।

লেখক অতঃপর বলিতেছেন,—

"দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা যখন তাঁহার প্রণয়-ব্যাপার মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন তখন তাঁহার সেই গম্ভীর স্নেহময় স্বভাব প্রকটিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন।

"কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্তু তদ্ভাবদর্শনাশ্বাসি।

অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয়প্রার্থনা কুরুতে ॥"

আবার মুহুল্লসা করিয়া বলিতেছেন।

"এবমাকৃতিপ্রায়সম্ভাবিতেঽপি জনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্বাতে।" ইত্যাদি

ইহাতে যেন আমরা রাজা চিন্তামগ্ন ও লক্ষ্যশূন্য হইয়া এক দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন তাহা চিত্রপটের ন্যায় দেখিতেছি।"

উহা অপেক্ষা নাটকের অধিক গুণ আর কি হইতে পারে—তাহা ত জানি না; দৃশ্য-কাব্যের ঐ গুণটি সেক্সপিয়রের বিশেষ রূপে মনে ধরিয়া ছিল, তাই তিনি নাটক-অভিনয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন

"Overstep not the modesty of nature; for any thing so overdone is from the purpose of playing whose end both at the first and now was and is to hold as'twere the mirror up to nature."

কিন্তু প্রকৃতির ঐ যে একটি অবগুণ্ঠনবতী চারু লজ্জাশীলতা তাহা লেখক দেখিতে পারেন না, তিনি চান বাড়াবাড়ি একটা কিছু,—কি-যে তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য তিনি বলিতেছেন।

"এ অঙ্কে (অর্থাৎ পঞ্চম অঙ্কে) ঋষিদিগের সহিত কথাবার্ত্তাতে তাঁহার সেই বিনয় ও শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অঙ্কে তাঁহার অনুতাপের মধ্যেও সেই প্রশান্তা সরলা স্নেহ-যুক্তা প্রকৃতি। অতএব দেখা যাইতেছে যে তাঁহার স্বভাব যেরূপ বর্ণনা করা কালিদাসের অভিপ্রেত তাহা উত্তম হইয়াছে কিন্তু আমাদের বিশেষ মনোজ্ঞ নহে।"

আবার "কিন্তু"—লেখক কালিদাসের যেখানেই প্রশংসনীয় কোন কিছু দেখিতে পান সেইখানেই তাঁহার মনে বিদ্যুতের মত একটা "কিন্তু" উদয় হইয়া চকিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়; কি ভাগ্য এবারে লেখক কিন্তুর একটা কারণ দর্শাইয়াছেন, তিনি বলেন,

"রামের চরিত্র সবিস্তরে পাঠ করিলে আমাদের হৃদয় যেমন স্নেহরসে আর্দ্র হইয়া যায়, রাবণের পরাক্রম ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞতা দেখিয়া আমরা যেমন বিস্মিত হই; যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মনিষ্ঠতা দেখিলে আমাদের মনে যেমন ভক্তির উদয় হয়; এরূপ কোন ভাব দুষ্মন্ত-চরিত্র-পাঠে আমাদের হৃদয়ে উদয় হয় না। অতএব দুষ্মন্ত রাজার চরিত্র বর্ণনাতে কোন দোষ ঘটে নাই বটে কিন্তু কালিদাসের ক্ষমতার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না। দুষ্মন্ত রাজার ন্যায় ব্যক্তি সংস্কৃত নাটকে বিস্তর দেখা যায়।"

এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা হার মানিলাম; আমাদের ছাড়িয়া দেও—এমন সুবিজ্ঞ জহরী জগতে কেহ আছে কি না সন্দেহ যিনি একখণ্ড হীরক দেখিয়া বলেন যে, সুবর্ণের ন্যায় ইহার মনোহর পীত বর্ণ নাই, নীলকান্ত মণির ন্যায় নীল বর্ণ নাই, রজতের ন্যায় উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ নাই, এ ত একটা ক্ষুদ্র বেলোয়ারি এর আবার মূল্য কি? এমন ধারা কতশত স্ফাটিক পদার্থ পথে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, এমন কি একটুকরা মিছরির দানার সঙ্গে ইহার সঙ্গে বেশী প্রভেদ দেখিতে

পাওয়া যায় না," এইরূপ একজন জহরী ব্যতীত আর কাহার সাধ্য লেখকের ওকথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে;—দুষ্মন্ত রাজা রামের মত নহেন, যুধিষ্ঠিরের মত নহেন, রাবণের মত নহেন, সেক্সপিয়রের লিয়র রাজাও উহাদের কাহারো মত নহেন, অতএব উভয়ের কাহারো চরিত্র পাঠে আমাদের মনে যদি কোন ভাবের উদয় হয় তবে সেটি আমাদের মস্ত ভুল।

মনুষ্য-প্রকৃতির মুখের সমক্ষে আয়না ধরিলে মনুষ্য, একেবারেই দেবতা কিংবা একেবারেই পশু, দেখিতে দেখায় না; আর গুণাতিশয্যে দেবতার মত না হইলেই যে মনুষ্য প্রশংসনীয় হইবে না এমন কোন কথা নাই; মনুষ্যের মত মনুষ্য হইলেই তিনি যথেষ্ট প্রশংসা পাইতে পারেন; কিন্তু লেখক তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন,—তিনি বলিতেছেন;

"পঞ্চম অঙ্কে রাজার চরিত্র সেই রূপ ধর্ম্মভীরু বিনীত এবং ক্রূরতাশূন্য। তাঁহার স্মৃতিলোপ হইয়াছে, কি করেন আপনাকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়া শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারেন না। আর শকুন্তলার সৌন্দর্য্য-দর্শনে যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিবেন তাঁহার প্রকৃতি এরূপ লঘু নহে।" এ বেস্ কথা, কিন্তু পরে আসিতেছে এই যে একটি টিপ্পনী—যে,

"রাজা যে শকুন্তলার রূপে মুগ্ধ হইয়াও তাহাকে গ্রহণ করেন নাই এরূপ ধর্ম্মভীরুতা দেখিয়া অনেকে প্রতীহারীর ন্যায় বিস্মিত হইবেন কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য মনে করি না, কারণ তিনি প্রথমে অস্বীকার করিয়া কিরূপে আবার গ্রহণ করেন! আবার তিনি এক জন মহান রাজা, তাঁহার এরূপ লঘুচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব প্রত্যাখ্যান করাই উচিত, ইহাতে প্রশংসা নাই, না করিলে বরঞ্চ দোষ পড়িত।"

এটা কিরূপ কথা? রাজা যে, লঘুচিত্ত নহেন, ও তাঁহার চিত্তে যে একটু অধর্ম্মের লেশ সহা হয় না, ইহা প্রশংসনীয় নহে? লেখক সজোরে বলিতেছেন—"না" বিচার-কর্ত্তার যে প্রচণ্ড ধমক—দুষ্মন্ত রাজার কৌন্সলী কাজেই নিরুত্তর! দুষ্মন্ত রাজা এক জন মানুষের মত মানুষ—এক জন রাজার মত রাজা, কিন্তু তাহা হইলে হইবে কি—তাঁহাতে এমন একটা ঘোরতর অদ্ভুত পদার্থ কিছুই নাই যা লেখকের মুখ হইতে প্রশংসা-ধ্বনি বাহির করিতে পারে। এক হিসাবে নাটকের দোষ গুণ বিচার-স্থলে তাহার নায়ক প্রশংসনীয় কি অপ্রশংসনীয় এ কথাটাই অপ্রাসঙ্গিক,—নায়কের চরিত্র আগা-গোড়া ঠিক্ আছে কি না ইহাই কেবল বিচার্য্য। সেক্সপিয়রের লিয়র্ রাজা কি বড় প্রশংসনীয়? না লিয়ন্টীস্ রাজা বড় প্রশংসনীয়? নাটকের নায়ক নিন্দনীয় বলিয়া নাটক নিন্দনীয় হইবে? না নাটকের নায়ক প্রশংসনীয় বলিয়া নাটক প্রশংসনীয় হইবে? সেক্সপিয়রের রোমিও এমন কি প্রশংসনীয় তা'ও নয় এমন কি নিন্দনীয় তা'ও নয়—সে তাহার দেশের এবং তাহার কালের একজন বড় ঘরের সুন্দর যুবা

পুরুষ আর জুলিয়েটের প্রেমে উন্মত্ত—এই যা' কেবল;—দুষ্মন্ত রাজা প্রশংসনীয় হউন বা না হউন্ তাহাতে শকুন্তলা নাটকের কিছুই আইসে যায় না, তিনি তাঁহার দেশের এবং তাঁহার কালের এক জন রাজার মত রাজা—এই পর্য্যন্ত হওয়াতেই ঠিক্ হইয়াছে—এক জন ভাল রাজার যেরূপ প্রকৃতি হইয়া থাকে তাহারি মুখে আর্না ধরা হইয়াছে ও সেই আয়নার ভিতর জীবন্ত এক রাজ-শ্রী প্রতিবিম্বিত হইতেছে— এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট;—করিতে যাও অধিক, হইবে কেবল ধিক্। এ সম্বন্ধে সেক্সপিয়র কি বলিয়াছেন একবার শোনা কর্ত্তব্য,—এই তাঁহার অনুশাসন "Overstep not the modesty of nature; for any thing so overdone is from the purpose of playing."

ক্রমশঃ

সুখ-দুঃখ।

মানুষ দুইটী পরস্পর-বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত, মানুষ দুইটী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল—একটী সেই অসীম অশরীরী আত্মা আর একটী এই জড় দেহ যাহা সেই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে। আত্মা ও শরীর ভিন্ন দুই পদার্থ কি না সে বিষয়ে তর্ক করা আমাদের উদ্দেশ্যের সীমা-বহির্ভূত। আত্মা ও শরীর—এই দুয়ের প্রকৃতি যদিও বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন তথাপি ইহাদের একটা স্পষ্ট-লক্ষণাক্রান্ত সম্পর্ক আছে। সৃষ্টির প্রত্যক্ষপরিদৃশ্যমান অবস্থাতে ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক ঠিক একটা বস্তুর আয়তন (volume) ও তাহার গাঢ়ত্বের (density) পরস্পর-সম্পর্কের ন্যায়। একটার বৃদ্ধি হইলে অপরের নিশ্চয়ই ক্ষয় হইবে কিন্তু একটা একেবারে না থাকিলে অন্যটীও বর্ত্তমান অবস্থাতে সংরক্ষিত হইতে পারে না—মানুষ পৃথিবীর মানুষ রূপে থাকিতে পারে না। শরীরের অতিরিক্ত সেবা সুশ্রূষা করিলে মানুষের জড়ত্বের আনুসঙ্গিক যত প্রকার গুণ তাহার উৎকর্ষ ও সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক গুণের হ্রাস হয়। উদ্ভাবনী-শক্তি প্রভৃতি গুণ, যাহার প্রকৃতি সীমাবদ্ধ নহে এবং সেই জন্য যাহাকে মানুষের আত্মার অসীমোন্মুখী বৃত্তির গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা ও-রূপ শরীর-পরায়ণ লোকের সম্ভবে না। পৃথিবীর মহাকবিদিগের মধ্যে কেহই বোধ হয় স্থূলকায় ছিলেন না, কাহারো শরীর বোধ হয় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ

করে নাই—অবশ্য শারীরিক সৌন্দর্য্য কখন শরীরের উৎকর্ষের ফল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আবার উপবাসাদির দ্বারা শরীরকে ক্লিষ্ট ও ক্ষীণ করিলে লোকের আধ্যাত্মিক শক্তির বৃদ্ধি হয়। যে সকল আতিভৌতিক দৃষ্টির বিষয় শুনিতে কিম্বা পড়িতে পাওয়া যায় সে সকল বোধ হয় কেবল শরীরকে ক্লিষ্ট করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বর্দ্ধনের দ্বারাই মানুষের চক্ষুর গোচর হইয়াছে। দিব্য-চক্ষুষ্মান (clairovoyant) মাত্রেই বোধ হয় অল্পাহারী ও নিরামিষভোজী; বিখ্যাত দিব্য-চক্ষুষ্মান স্বেডেনবর্গ কখনো অপরিমিতাহার কিম্বা আমিষভোজন করেন নাই; কেবল একবার মাত্র তিনি এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছিলেন বলিয়াই স্বর্গবাসী আত্মারা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া ছিল, কথিত আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যদিও আত্মা ও শরীর পরস্পর-বিরোধি-স্বভাবাপন্ন বস্তু, তথাপি একের সম্পূর্ণ অভাব হইলে অন্যের কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। একটা এমন অবস্থা আছে যে সেখানে উপস্থিত হইলে পর এ দুয়ের আর পূর্ব্ববৎ হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তখন দুইটীরই একত্রে হ্রাস হইতে থাকে; কিন্তু নিশ্চয়ই ইহাতে দুয়ের একত্ব সপ্রমাণ হইতেছে না। পাত্রের আকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত জলেরো আকৃতির পরিবর্ত্তন হয়; তাহা বলিয়াই কি জল ও পাত্র একই বস্তু? কালব্যাপী অনশনে মনুষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তির হ্রাস হয় বলিয়াই কি আহারীয় ও আত্মার একত্ব সপ্রমাণ হইতেছে? শরীরকে আত্মার বাসোপযোগী করিতে কতক পরিমাণে আহারীয়ের প্রয়োজন হয়, নচেৎ আত্মার সহিত জড় ইন্দ্রিয়ের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না। এই দুই বিরুদ্ধ-স্বভাবাপন্ন বস্তুর পরস্পর প্রতিঘাত দ্বারাই মানুষের জীবন; এই দুয়ের পরস্পর বাধাই জীবনের মূল। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইতেছি যে মানুষের দুঃখেরো ইহাই মূল।

সুখ-দুঃখের একটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা একপ্রকার অসাধ্য। মিষ্টের সংজ্ঞা নিরূপণ করা বচন-দ্বারা হইবার নহে, রসনাই কেবল তাহার ভাব-গ্রহণে সমর্থ,—উহাও সেইরূপ। তবে সংক্ষেপে এইরূপ বলা যাইতেপারে যে অনতিক্রমনীয় বাধার ভাবই দুঃখ, আর তাহার অভাবই সুখ।* ইহা হইতে স্পষ্টই আসিতেছে যে মানুষের জীবনের ও কারণ যাহা মানুষের দুঃখেরও কারণ তাহাই। মানুষের আত্মা অসীম, শরীর সেই আত্মাকে সীমাবদ্ধ করিয়াছে; সীমাবদ্ধ করাও যাহা আর বাধা দেওয়া তাহা; অতএব জীবনই দুঃখ সুতরাং দুঃখই মানুষের স্বভাব-সিদ্ধ।

এই জন্যই একজন চিন্তাশীল বিজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীর সমুদায় রাজা ও রাজমন্ত্রী মিলিয়াও একজন জুতাবুরুষকারীকে সুখী করিতে পারে না।

* See Mill's Examination of Hamilton's Philosophy—The Chapter on Pleasure and Pain.

দুর্ভাগ্যকারীর শরীরের সকল অভাবই তাহাদের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে তাহার যথার্থ সুখ হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে তাহার অসীম প্রকৃতিকে ভুলিয়া থাকিতে পারে ততক্ষণই তাহার কিছুমাত্র সুখ হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু সে কতক্ষণ? যাহা অসীম তাহার অসীম না মিলিলে কখনই দুঃখের অপলোপ হইতে পারে না। লর্ড বায়রণ্ চাইল্ড্ হ্যারল্ডে বলিয়াছেন যে হ্যারল্ড যদিও সম্পূর্ণরূপে পার্থিব সুখে নিমগ্ন ছিলেন তবুও সময়ে সময়ে কি যে দুঃখ তাঁহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইত তাহা তিনি বুঝিতেই পারিতেন না (At times strange pangs would flash across Childe Harold's breast;) বায়রণ্ এখানে মুক্তকণ্ঠে নিজের কথাই বলিতেছেন, সেই জন্য এই কথাটা বিশেষ মূল্যবান। ইহা হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে মানুষের অসীম প্রকৃতি তাহার পার্থিব সুখের স্রোতে নিমগ্ন থাকিলেও মাঝে মাঝে মাথা ভাষাইয়া উঠে। জর্ম্মাণ মহা-কবির সুবিখ্যাত ফাউস্ট (Faust) নামক নাটকেও এমতটী অতিসুন্দর রূপে বিবৃত রহিয়াছে। বাস্তবিকই আধ্যাত্মিক-আত্মহনন ব্যতীত মানুষের শুধু পার্থিব সুখে সুখী হইবার কোন সম্ভাবনার লেশ মাত্রও নাই। আর এ প্রকার অবস্থাতে, বোধ হয়, মানুষ নামের উপযুক্ত কেহই এরূপ সুখে সুখী হইতে ইচ্ছাও করিবেন না, যদিও প্রতিক্ষণে মানুষে সুখী হইতে ইচ্ছা না করিয়া থাকিতে পারে না; কেননা মানুষের আত্মা চিরন্তন অসীম অভিলাষী, অসীম মিলিলেই তাহার সুখের চরম হইবে, সুতরাং মানুষের আত্মার সুখাভিলাষ স্বভাব-সিদ্ধ। আবার অসীমের দিকে ধাবমান হইতে প্রতিপদে বাধা পাইতে হয় কাজেই প্রতিপদে মানুষ দুঃখ পায়।

কার্লাইল জিজ্ঞাসা করেন যে, "যখন সুখ ও দুঃখ উভয়ই স্বাভাবিক তখন, তোমার সহিত এমন কি লেখা-পড়া আছে যে তুমি কেবল সুখেরই অধিকারী হইতে চাও?" যদিওএই কথাটী সত্য কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সত্য নহে, সত্যের অংশ মাত্র। মানুষের সুখী হইবার তো কোন স্বত্বই নাই কিন্তু দেখা যাইতেছে যে জীবনের সত্তা ও দুঃখের সত্তা অবিচ্ছেদ্য; দুঃখই স্বাভাবিক, সুখ অস্বাভাবিক। মানুষের জীবনের জন্য যেরূপ বায়ুর আবশ্যক, মানুষের মনুষ্যত্বের জন্য সেইরূপ দুঃখ প্রয়োজনীয়। দুঃখই মানুষের মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের বন্ধন—দুঃখই পৃথিবী ও স্বর্গের সেতু। যে লোক আমাকে বলে যে "আমি কখনো দুঃখ ভোগ করি নাই" তিনি খুব বড় লোক হইতে পারেন কিন্তু তাঁহাকে বন্ধুত্বে বরণ করিতে আমি কুণ্ঠিত হইব। প্রাচীন ঋষিদিগের যে দুঃসহ তপশ্চর্য্যা দ্বারা সুখ-দুঃখ-সমান জ্ঞান জন্মাইত তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল এই যে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন যে দুঃখ স্বাভাবিক, এমন কি অবস্থা-বিশেষে দুঃখ প্রার্থনীয়। দুঃখ ভোগ করিতেই মানুষের জন্ম। দুঃখ ভোগ

করিবার অধিকারেই মানুষ ও পশুর প্রভেদ হইয়াছে। বয়ঃ-প্রাপ্ত শিশু ল্যাম্ (Lamb) একখানি চিঠীতে লিখিয়াছেন যে "জীবনই দুঃখ দুঃখ যত তীব্রতর জীবনের অস্তিত্বের তত্তো অধিক পরিচয়।" জীবনের এক প্রধান উদ্দেশ্যই এই, যে দুঃখ ভোগ করিয়া মানুষ আত্মার উন্নতি সাধন করিবে। দুঃখ ভোগ না করিলে মানুষ আপনাকে বুঝিতে পারে না। দুঃখ ভোগ করা একটা শ্লাঘার কথা। যাহার মন যত উন্নত দুঃখ ভোগ করিবার পক্ষে তাহার তত অধিক অধিকার জন্মে; যে যত অধিক দুঃখ ভোগ করে পৃথিবী হইতে সে তত অধিক উচ্চ। এই জন্যই পৃথিবীতে মহাকবি ও সমসাময়িক দিগের অপেক্ষা উন্নত-মনা লোকদিগকে কখনো সুখী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না; আর এইজন্যই তাহাদের দুঃখ যে-সে লোকে বুঝিতেও পারে না। দুঃখ মানুষের মন্দ অংশ হইতে ভাল অংশকে বাছিয়া লইয়া তাহার উৎকর্ষ সাধন করে। এই জন্য ইংরাজিতে দুঃখের এক নাম tribulation এই শব্দের উৎপত্তি লাটিন tribulum শব্দ হইতে; ইহা এক প্রকার যন্ত্র; এই যন্ত্রের দ্বারা রোমদেশীয়েরা শস্যের অসার অংশ হইতে সারাংশের প্রভেদ করিত। আর এই সব বুঝিয়াই কেটো বলিয়াছিলেন যে "এক জন উন্নতমনা লোকের পৃথিবীর দুঃখের সহিত যুদ্ধ দেবতাদেরও দেখিবার উপযুক্ত দৃশ্য।"

প্রস্তাবের এই অংশ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদের আর একটী বক্তব্য আছে। এই প্রস্তাবে যাবতীয় "দুঃখ" শব্দকে কেহ "কষ্ট" এই শব্দের সহিত মিশাইয়া এরূপ বলিবেন না যে শরীরে ছুরিকা প্রবিষ্ট করিলে যে দুঃখ হয় তাহার দ্বারাও তো মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে; অসূয়াপরবশ লোকেরা পরশ্রী দেখিয়া মনে যে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে তবে তাহাও তো অপ্রার্থনীয় নহে, কিন্তু সেই জাতীয় দুঃখ সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি বলি নাই। এরূপ নীচ কষ্টকে আমি দুঃখ শব্দের উন্নত শিখরে সমান ভাবে বসাইতে পারি না; আমার মনে দুঃখের যে উন্নতিকারী উচ্চ স্বর্গীয় আদর্শ স্থাপিত আছে ইহাতে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। এরূপ কষ্ট দুঃখ নামেরই যোগ্য নহে। যে কষ্টে হৃদয়কে উন্নত করে, আত্মাকে ক্রমশঃ মহান হইতে মহান করিয়া তোলে; সেই উপভোগ্য কষ্টই দুঃখ নামের যোগ্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞানের চক্ষে দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাহাকে আমরা দুঃখ বলি অনেক সময় তাহা হইতে আমাদের সুখেরও উৎপত্তি হয়; অনেক সময় দুঃখই আমাদের সুখের একটা উপকরণ হয়; অর্থাৎ, অনেক সময় দুঃখ আমাদের মনে এরূপ ভাব জন্মায় যাহা আমাদের ভাল লাগে। দুঃখ ভোগ করিয়া মানুষ নিজের স্বর্গীয়ত্ব বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিয়া এমন এক আত্ম-প্রসাদ অনুভব করে যে কোন দুঃখই সে আত্মপ্রসাদকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে না। এই স্বর্গীয়ত্ব

হেতু মানুষ যদি পার্থিব পদার্থ হইতে দুঃখ পায় তবে সে সেই দুঃখের কারণ পার্থিব পদার্থ অপেক্ষা আপনাকে উচ্চতর মনে করিয়া পৃথিবীর ঝটিকা ঝঞ্ঝার মধ্যেও শান্তিময় আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিয়া থাকে; নিজের যোগ্যতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার মনে করিয়া তাহার সহস্র দুঃখের মধ্যেও আত্ম-প্রসাদ বিচলিত হয় না। ইহাতে বোধ হয় আত্ম-প্রসাদের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হয়; যাহাতে দুঃখের উৎপত্তি (বাধা) তাহাতেই মানুষের স্বর্গীয় ভাব আরো স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

এক এক সময় মনের এমনই এক অবস্থা হয় যে সে সময় দুঃখ একটা ভোগ্য বস্তুর মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়; তখন মনের সে অবস্থাটাকে একটা শান্তিময় অবস্থার সহিত বিনিময় করিতেও ইচ্ছা হয় না। কোন্ জননী তাহার মৃত শিশু সন্তানটীকে ভুলিতে স্বীকার করিবে, যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে স্মৃতিজাত দুঃখের আর শেষ থাকে না? কোন নিরাশ প্রেমিক তাহার প্রেমের বৃত্তান্ত ভুলিতে স্বীকার করিবে, যদিও স্মৃতি তাহার হৃদয়ে রাবণের চিতা জ্বালান ব্যতীত আর কোন সান্ত্বনাই দিতে পারে না? অভিমান হইতেও মানুষের বিশেষ দুঃখ উৎপন্ন হয় কিন্তু তাহা বলিয়া কি কেহ অভিমান পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিবে? অভিমানের দুঃখ ভোগ করিতে মনুষ্যের এই মনে করিয়া ভাল লাগে যে, "কাহার জন্য আমি এত ভোগ করিতেছি?—যাহাকে আমি এত ভালবাসি তাহার জন্য দুঃখ ভোগ করিতেও আমার সুখের অনুভব হয়।" এই সকল ভাবিয়া হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাস-ভরে একজন কবি বলিয়াছেন যে,

যাতনার এই দুঃখময় সুখ,
তুই কি বুঝিবি, সজনি;
কি বুঝিবি তুই কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে বিরল রজনী।

আর এই বুঝিয়াই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কবিকুলশিরোভূষণ গাহিয়াছেন,

Ti's better to have*lov'd and lost,
Than never to have lov'd at all. *

বাস্তবিকই দুঃখ উপভোগ্য ও প্রার্থনীয়; কিন্তু দুঃখ উপভোগ্য ও প্রার্থনীয় হইয়াও সকল সময় উপভোগ্য ও প্রার্থনীয় না হইবার কয়েকটী কারণ আছে। মানুষ কিসে নিজের হিত, তাহা সকল সময় বুঝিতে পারে না। মায়াবিনী কার্ত্তীর উপদ্বীপে ইউলিসীস যখন শূকররূপে পরিণত অনুচরবর্গের উদ্ধারের জন্য যত্নশীল হন তখন তাহারাই তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছিল। এইরূপ হইবার আর একটী কারণ আছে এই যে অনাগত দুঃখের কল্পনা করিবার সময় আমরা কেবল তাহার ভীষণতাই কল্পনা করিতে পারি, তাহার সুখ-জনক ভাব আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু দুঃখ যখন আমাদের উপর আসিয়া পড়ে তখন আমরা দেখিতে

* ভালবেসে খোয়ানও ভাল
কভু ভাল না বাসার চেয়ে।

পাই যে আমাদের কল্পনা আমাদিগকে কতদূর প্রতারণা করিয়াছে; তখন আমরা যেখানে কেবল বিভীষিকাময় মরুভূমি প্রত্যাশা করিতেছিলাম সেখানে শ্যামল শস্যপূর্ণ সুমিষ্ট-জল-বিশিষ্ট ভূমি-খণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হই। আমার নিজের জীবন হইতে আমি বলিতে পারি কে আমার জীবনে যে সকল দুঃখময় ঘটনা অতীত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের স্মৃতি হইতে আমি এত সুখময়-দুঃখ অনুভব করি যে সেই জন্য আমি ঐ সকল দুঃখের ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই সন্তুষ্ট আছি। বিগত দুঃখেরও স্মৃতি একেবারে দুঃখময় নহে; তাহাতেও সুখ মিশ্রিত। বিগত সুখের স্মৃতিও সুখ ও দুঃখে বিজড়িত। কোন বিখ্যাতনামা কবি বলিয়াছেন,

A sorrow's crown of sorrow is rememb'ring happier things. *

কিন্তু এই উক্তিটা অত্যন্ত একদিক-ঘেঁসা, ইনি পূর্ব্ব-স্মৃতি-জাত বিষাদময় সুখ একেবারে দেখিতেই পান নাই। কবিতা মাত্রেই স্মৃতি; মানুষ নিজে উপস্থিত মুহূর্ত্তে যে কি—তাহা কখনো বুঝিতে পারে না; বর্ত্তমানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে কি ছিল তাহাই কেবল বুঝিতে মানুষ সক্ষম। পূর্ব্বোল্লিখিত কবির মত যদি ঠিক হয় তাহা হইলে কবিতা মাত্রেই শুধু দুঃখময়ই হইবে অর্থাৎ কবিতা কাহারো নিকট সুখ-প্রদ হইবে না। তাহা হইলে অন্ততঃ, সুখের গান হইতেই শুধু আমোদ হইত, দুঃখের গান কাহারো ভাল লাগিত না; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সুখের কবিতা আমাদের মনের উপর তেমন মুদ্রিত হয় না; দুঃখের কবিতাই আমরা বিশেষরূপ উপভোগ করি, ঐরূপ কবিতারই রসাস্বাদন করিয়া আমরা স্থায়ী সুখ অনুভব করি। দুঃখময় কবিতার সুখ-প্রদায়িত্ব বিষয়ে অধুনাতন সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং সকল সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে একজন যথার্থ স্বর্গীয় কবি, অসামান্য ক্ষমতা সহকারে গাহিয়াছেন,

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. *

আমরা বোধ হয় আমাদের ন্যায্য সীমা অতিক্রম করিতেছি; আমাদিগকে পুনরায় প্রস্তাবিত বিষয়ে আসিতে হইবে। দুঃখ সাধারণতঃ প্রার্থনীয় ও উপভোগ্য হইয়াও সকল সময় প্রার্থনীয় ও উপভোগ্য না হইবার আর একটী বিশেষ কারণ আছে। পৃথিবীর অতি,সুখ-প্রদ বস্তুও একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে আর তাহার সুখপ্রদায়িত্ব থাকে না। আলোকের সম্পূর্ণ অভাব হইলে মানুষ চক্ষে কিছুই দেখিতে পায় না: আবার আলোক একটা নির্দ্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে তাহা হইতেই মানুষের চক্ষু অন্ধ হয়। সেইরূপ দুঃখেরও একটা মাত্রা আছে যাহার অধিক হইলে দুঃখ আর

* দুঃখের চরম দুঃখ পূর্ব্ব সুখ-স্মৃতি।

* সেই গান সুমধুরতম
কহে যাহা গাঢ়তম দুঃখের কাহিনী।

প্রার্থনীয় ও উপভোগ্য থাকে না; দুঃখ মনের উপর তখন কেবল ক্লেশময় ফলই উৎপন্ন করে। অতিশয় তীব্র দুঃখে মানুষের শরীর ও আত্মা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে কিম্বা শরীর এমন বিকৃত হইতে পারে যে মানুষ চিরকালের মত উন্মাদ হইয়া যায়। কুমারসম্ভবে রতির সমক্ষে যখন হরকোপানলে মদন ভস্মাবশেষ হইল তখন রতি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, তাহার পর, দুঃখের তীব্রতার হ্রাস হইলে রতি যখন ভূতপূর্ব্ব দাম্পত্য সুখ স্মরণ করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছে তখন যে রতির অমিশ্র দুঃখই হইতেছে এরূপ বোধ হয় না, রতির দুঃখের ভিতর হইতেও একটু একটু সুখের আভাস পাওয়া যাইতেছে।

তীব্র দুঃখের অনুপভোগ্যতা ও সেই দুঃখই মন্দীভূত হইলে উপভোগ্য হওয়ার এক প্রধান দৃষ্টান্ত-স্থল মানুষের কাব্যরসাস্বাদনী-শক্তি। যে সকল ঘটনা বাস্তবিক জীবনে দেখিলে আমরা দুঃখে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি সেই সকল ঘটনাই আবার নাটকে পড়িয়া কিম্বা রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয় বটে কিন্তু সে দুঃখের মধ্যেও আমরা অতি বিশুদ্ধ সুখ উপভোগ করি। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে এই রূপ হইবার আর কোন কারণই নাই, কেবল দুঃখের মাত্রাভেদই ইহার মূল। যে দুঃখময় ঘটনা বাস্তবিক জীবনে দেখিলে আমরা তীব্র দুঃখে একেবারে মূর্চ্ছামান হই তাহার তীব্রতা মন্দীভূত হইলেই তাহা আবার আমাদের উপভোগ্য হয়; বর্ণিত বা অভিনীত ঘটনা যে অলীক গল্প মাত্র অজ্ঞাতসারে এই কথাটী আমাদের মনে উপস্থিত থাকিয়া ঐ দুঃখের তীব্রতার হ্রাস করে, সেই জন্যই আমরা দুঃখের বর্ণনাতে দুঃখ-ভোগ করিয়াও সুখ পাই।

যাহা হউক এই হৃদয়বেগ সামলাইয়া আমাদিগকে দুঃখের আর দুই একটী কারণের উল্লেখ করিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার ভিত্তির সহিত দুঃখের দুইটী কারণ এমনই বিজড়িত যে তাহার নিরাকরণ সম্ভবে না। সে দুইটী এই—রাজনৈতিক বন্ধন ও সামাজিক বন্ধন। এ দুই বিষয়ে অধিক কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই; সকলেই অবগত আছেন এই দুইটীর কি অর্থ। মনুষ্য জাতির বর্ত্তমান অবস্থাতে সকল মনুষ্যই যে নিজের স্বাভাবিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার উপযুক্ত পাত্র এরূপ নহে যথার্থই অধিকাংশ লোক স্বেচ্ছাচার ও স্বাধীনতার প্রভেদ বুঝিতে পারে না। কাজেই সকলের শাসনের জন্য প্রত্যেককে তাহাদের স্বাধীনতার কতক অংশ শাসনকর্ত্তাদিগের হস্তে দিতে হয়। অবশ্য "শাসন-কর্ত্তা" শব্দ এখানে অতি বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হইল, ইংরাজীতে হয় ত ইহাকে Sovereign Power বলিবে। শাসনতন্ত্রের আদর্শ যত দূর উচ্চ, মানুষ যত দিন তাহার মধ্যে অবস্থিতি করে তত দিন রাজনৈতিক বন্ধন হইতে কোন বাধা পায় না বলিয়া এই কারণ হইতে কোন দুঃখও পায়

না; কিন্তু যখন কোন উন্নতমনা মানুষ এই আদর্শ হইতে উর্দ্ধে উঠিতে যান তখনই তিনি নিজের কারাগারের আয়তন বুঝিতে পারেন, তখনই তাহার মাথায় বাধা পড়ে। যখন এই আদর্শ অতি নীচু হয় এবং সেই জন্য যখন অধিকাংশ লোকেরই মাথা ইহাতে আহত হয় তখন সজোরে এই আদর্শকে উন্নমিত করিতে রাজবিপ্লবের উৎপত্তি হয়।

রাজনৈতিক বন্ধনের বিষয় যাহা বলা হইল মোটমাট সামাজিক বন্ধনের বিষয়েও সেইরূপ সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলা হইল না।

এখানে কষ্টের বিষয় একটা কথা বলিতে হইবে। যে কষ্টের বিষয় বলিতেছি তাহা যদিও দুঃখের নিকটবর্ত্তী তথাপি ইহাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যদিও এই কষ্টের মূলে এমন কিছু নাই যাহাতে এই কষ্টকে অলঙ্ঘ্য করে কিন্তু পৃথিবীতে প্রায়ই ইহা এমন হইয়া দাঁড়ায় যে ইহাকে এড়ান বড় দুর্ঘট। মানুষের কতকগুলি মানসিক গুণের অস্তিত্বই এই কষ্টের কারণ। এই সকল মনোবৃত্তি নিয়মিত পথে চালিত হইলে শুভ-ফল-প্রদ হয় কিন্তু ইহারা বড় অস্থির অতি অল্পেতেই ইহাদিগকে বিপথে চালাইয়া ইহাদের প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। আমি কোন্ কোন্ মনোবৃত্তির উপর দৃষ্টি রাখিয়া, এই কথা গুলি বলিলাম বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, সেগুলি বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি নামে অভিহিত। ইঁহারা এক প্রকার স্বর্গচ্যুত শয়তান; অন্যের উন্নতি দেখিয়া নিজের উন্নতি করিবার ইচ্ছা অতি প্রশংসনীয়, অতি মহৎ, কিন্তু বিপথে গমন করিলে এই দেবতা যথার্থই শয়তান রূপ ধারণ করে। এই সকল মনোবৃত্তি না থাকিলে পৃথিবীর অর্দ্ধেক কষ্ট অন্তর্হিত হইত। যাহার হৃদয়কে ইহারা একবার অধিকার করিয়াছে, ঈশ্বর তাহার মঙ্গল করুন, কিন্তু এ পৃথিবীতে তাহার আর কষ্টের সীমা থাকে না। উপরের কয়েক ছত্রে আমি "দুঃখ" শব্দ ব্যবহার না করিয়া কেন যে "কষ্ট" শব্দ ব্যবহার করিলাম তাহা ইতিপূর্ব্বে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই বিপর্য্যস্ত মনোবৃত্তিগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়ার ন্যায় মনকে অনুন্নত দুঃখ দিবার জন্য এমন কোন সুন্দর উপায় আছে কি না বলিতে পারি না। যাহার মন এই সকলের উপস্থিতি দ্বারা কলুষিত নয় তিনি পৃথিবীতে থাকিয়াই প্রকৃত পক্ষে স্বর্গের উপযুক্ত।

ক্রমশঃ

গাথা।

খড়্গ-পরিণয়।*

(১)

ঘুমঘোরে ঢোলে, তারকার কোলে
শোভিছে চাঁদিমা আকাশ মাঝে;
অম্বরের রাজা, পৃথ্বিরাজ বালা
দ্বিতীয় চাঁদিমা প্রাসাদে রাজে।

নব উষা জিনি বরণ-মাধুরী,
কল্পনারি সুধু প্রতিমা হেন,
বাসব ধনুর মাধুরীটি দিয়ে,
জোছনা মাখিয়ে সৃজিত যেন।

স্থির-বিজলির স্নিগ্ধ-দ্যুতি সম
বিছানায় বালা রয়েছে শুয়ে,
ঈষৎ ঈষৎ এক পাশে ফিরে
রয়েছে হাতটি উরসে খুয়ে।

মুক্ত বাতায়নে আসিছে জোছনা
ঝলসে ওই যে কৃপাণ গায়,
এক দৃষ্টে বালা অনিমেষ চোখে
আপনা ভুলিয়ে দেখিছে তায়।

কল্পনা লহরী ছুটিছে তাহার,
উথলে হৃদয়ে সুখের তোড়,
বিভল হৃদয়ে আশার নেশায়
সাধের স্বপনে রয়েছে ভোর।

সহসা বালিকা উঠিল চমকি
সাধের স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল,
ডাকিয়া তাহারে, সজনী চপলা
হাসিয়া হাসিয়া কাছেতে এল।

"ডাকিছেন রাণী আয়লো, অলকা,
শুনেছিস কিলো খবর, তবে?
বিখ্যাত সুরথ বুন্দি-নরপতি
তার সনে তোর বিবাহ হবে"।

"সুরথের সনে হইবে বিবাহ;"—
অশনির সম বাজিল বুকে,
শোণিত লহরী থামিল বহিতে
গোলাপ কলিকা শুকালো মুখে।

নীহার পীড়িত শ্বেত পদ্ম সম,
এলায়ে পড়িল, অবশ কায়;
নয়নের জ্যোতি হইল মলিন,
প্রভাতে-চাঁদিমা যেমতি, হায়!

শোভিল বদনে হিম-স্বেদ-কণা,
বুক হ'তে হাত পড়িল খসি,
ক্রমে ধীরে ধীরে ভাঙ্গিল সে মোহ,
বলিল ব্যাকুলা উঠিয়া বসি;—

* Rutna (Rana of Mewar) had married by stealth the daughter of Prithuraj of Amber His double edged sword, the proxy the Rajput cavalier, represented Rutna on this occasion.
—Tod's Rajasthan Vol I— Page 308.

"উপহাস তুমি করিও না আর
সখিলো, তোমায় মিনতি করি,
হাসিবার কথা নয় এতো, সখি,
বল সত্য কথা চরণে ধরি।

শুনিয়ে সে আমি নেইলো আমাতে,
আমি যে-সধবা—আমার বিয়ে?
মাথা খাস, সখি, রাখ্ উপহাস,
কি সুখ আমারে বেদনা দিয়ে?"

কহিল চপলা শুনিয়ে একথা
ব্যথিত পরাণে মুছিয়ে বারি,—
"ছেসে যদি থাকি ক্ষমগো, অলকা,
সুখের সে নয়, শপথ করি।

সত্যই, সকল, হইয়াছে স্থির,
তব সনে হবে বিবাহ তার,
প্রকাশো এবার বিবাহ তোমার
গোপনে কেমনে রাখিবে আর।

মুমূর্ষু বালিকা ধীরে ধীরে ধীরে
বলিল যাতনা অস্ফুট স্বরে;—
"বিবাহের কথা কেমনে প্রকাশি,
প্রাণেশ যে মানা করেছে মোরে।

ঐ তরবারি তাঁরি প্রতিনিধি,
যা' দেখি বাঁচিয়ে রয়েছি আমি,
রাজা হ'লে পর উহার বদলে
প্রকাশ্যে আমারে লবেন স্বামী।

এখন একথা প্রকাশ হইলে
তাঁরে যে বিপদে পড়িতে হবে,
না পাবে রাজত্ব প্রাণেশ তাহ'লে
কেমনে সেকথা প্রকাশি, তবে?"

চপলা নয়নে জ্বলিল চপলা,
শুনিয়ে সরোষে কহিল সখী,—
"মুক্তকণ্ঠে আজ বলিব সকল
এত দিন যাহা রেখেছি ঢাকি।

পাপিষ্ঠ অধম সেই দুরাচার,
জানিনে কি বলে দেবরে গালি;
ছলে সরলার ছলি অবিচারি
চরণে দলে সে কোমল কলি!

হয়েছে সে রাজা, পেয়েছি খবর
কোথায় প্রতিজ্ঞা রহিল তার?
তুমি হেথা একা দহিছ বিরহে
তাহারি ধেয়ান করিয়ে সার।

কিসের বন্ধন—গেছে সে বাঁধুনি;
কর, কর সখি বিবাহ পুন,
ফেলে দেও দূরে প্রতিনিধি অসি
তোল সে প্রণয় মিনতি শুন"।

"হয়েছে সে রাজা, হয়েছে সে রাজা
তবু সে প্রতিজ্ঞা রাখিল নারে!"
—পারিল না বালা সামালিতে আর
মূরছি পড়িল যাতনা-ভারে।

---

(২)

নাহি সে অলকা, সে শরীর এবে
প্রভাহীন যেন উষার তারা,
মলিন বরণ, মলিন মুখানি
নয়নে কেবল বহিছে ধারা।

এক মাস শুধু পেয়েছে সময়,
বিবাহ তাহার মাসেক পরে,
চিতোর-রাণায় পাঠায়েছে লিপি,
পথ চেয়ে আছে তাহারি তরে।

অবশাই রাজা লইতে আসিবে
ভগন পরাণে রেখেছে বাঁধি,
ভয়ে ধুক ধুক করে তবু হিয়া,
দিবস যামিনী কাটায় কাঁদি।

"ঐ যে বাজনা-বাজে ও কিসের
আসিছে আমার প্রাণেশ নাকি" ?—
অধীর পরাণে ছোটে বাতায়নে
খোঁজে চারিদিক আকুল আঁখি।

"ও কিসের গোল?—আসিছে কি সেনা ?
ঐ না বিষম উড়িছে ধূলী ?
অখের হ্রেষাতে পুরে যে গগন"—
দূর পানে চায় মাথাটি তুলি।

নিমেষে নিমেষে, পলকে পলকে,
দেখে মরীচিকা আশার ছলে,
আবার তখনি নিরাশায় পড়ে
স্বরগ হইতে পাতাল তলে।

কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুম এল যদি,
স্বপনে চমকি জাগিয়া ওঠে,—
"ঐ বুঝি এল প্রাণেশ আমার "—
আশার কুহকে আবার ছোটে।

দিন যায়, ক্রমে গেল আধা মাস,
সমাচার তবু এল না কোন,
দেখিয়ে চপলা অলকার দশা
বলিল, "সজনি, শোন লো শোন।

স্বরগ-কুসুম তুমি, লো অলকা,
পিশাচ অধম চিতোর রাণা,
তার তরে তুমি সঁপিবে পরাণ,
শুনিবে না তবু কাহারো মানা ?

রাগে-দুখে হৃদি জ্বলে যায় মোর,
বল, লো সজনি, বল, লো, মোরে,
তো-হেন এমন অমূল রতনে
সে মূঢ় কি কভু চিনিতে পারে ?

যদি সখিত্বের থাকে মূল্য কিছু,
তাহারি শপথ দিলো তোরে,
বিয়ে কর পুন প্রকাশিয়ে সব,
ক দিন রহিবি কৃপাণ ধোরে" ?

কেঁদে কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত আঁখি দুটি,
ক্লান্ত কায়-মন সহিয়ে জ্বালা,
শূন্য-পারা আঁখি তুলি সখী পানে
স্খলিত বচনে বলিল বালা ;—

"যাতনার এই দুখময় সুখ
তুই কি বুঝিবি, সজনি ?—
কি বুঝিবি তুই, কি যে এত সুখ
কাঁদিয়ে দিবস-রজনী ?

এমনি অমূল্য যাতনার এই
জীবন আমার ঠাঁই, লো,
চির হাসিময়-সুখের জীবন
বিনিময়ে নাহি চাই, লো।

হাসিবার কথা নয় এ তো, সখি,
হেসো না এ কথা শুনিয়ে,
হেসো না, হেসো না, দিও না-ক ব্যথা
আর, লো, ভুলিতে বলিয়ে।

আজীবন ধরে জ্বলিব, পুড়িব
সারাটি দিবস রজনী,
তবুও, তবুও, হৃদয়ের ধনে
ভুলিব না কভু, সজনি।

তবু-তবু, এই সাধের আগুন
নিভাব না কভু জনমে,
পুষিয়ে রাখিব যতন করিয়ে
মরমের জ্বালা মরমে"।

রাগে দুখে জ্বলি বলিল চপলা,
"থাক্ তবে তারি ভাবেতে ভোর,
নতুন আমোদে নব প্রেমে মজি
হেলয়ে যে জন হৃদয় তোর।"

অবহেলা করে রতন তাহারে
মজিয়ে নূতন আমোদে প্রেমে!—
বাজিল কথাটি অলকার বুকে
বলিল বালিকা একটু থেমে।—

"সত্যিই কি তবে ফুরায়েছে সব
সকলি এখন স্বপন প্রায়?
ভক্তি, স্নেহ, প্রেম, হৃদয়ের ভাব
তাও ফুল হেন শুকায়ে যায়?

উঃ! একি কথা, কি মরম ব্যথা,
একিরে প্রণয় কি রীতি তোর!
পার হাসি হাসি গলে দিতে ফাঁসি
পরায়ে সোহাগে কুসুম-ডোর।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! একিরে প্রলাপ আবার
কি কথা বলিনু মরম-দুখে?
প্রাণের প্রেয়সী ললনা লইয়ে
থাক্ সে আমার মনের সুখে।

বিবাহের কথা হবে না প্রকাশ
প্রকাশ করিতে আছয়ে মানা,
এ প্রাণ থাকিতে হ'বে না তাহা তো
যদিন আদেশ না দেন রাণা।

নিন্দো না লো তায়, মিনতি তোমায়
ভুলুন আমারে ক্ষতি তো নাই;
অধীনী এ জনে চরণে দলিয়ে
হয় যদি সুখ হোক্ না তাই।

আমিতো, সজনি, মরিতে বসেছি,
নাহি সাধ আর কোনো-ই সুখে,
আমি তো প্রবাহে দিয়েছি লো ঝাঁপ
ভেসেছি তো আমি স্রোতের মুখে;

মরিতে তো আমি করিয়াছি পণ
মরণে কিছুই ভয় তো নাই,
মরিবার আগে দু'একটি কথা
তাঁর কাছে শুধু শুনিতে চাই।

কি বলেন তিনি তাই শুনিবারে
এ প্রাণ এখনো রয়েছি ধ'রে,
কি তাঁর বলিতে আছে তা' না শুনি
সুখী ও, সজনি, হব না ম'রে"

বলিতে বলিতে তীব্র যাতনায়
আলোড়ি উঠিল হৃদয় তল,
মরম ভেদিয়া উৎসের মত
নয়নে উথলি উঠিল জল।

নীরবে নীরবে কাঁদিল অলকা,
সখীও কাঁদিল তাহার দুখে,
সামালিয়া পুন বলিল সখীর
হাতটি রাখিয়া আপন বুকে,—

"ব্যথার ব্যথিনী, তুমি গো সজনি
একটি মিনতি করি গো তোরে,
তুই না বাঁচালে কে বাঁচাবে আর
এ হেন দারুণ বিপদ ঘোরে?

দিগন্ত বেয়াপী বিকট শ্মশানে
তুমি গো একটি কুসুম মম,
আঁধার আঁধার, অনন্ত আকাশে
জ্বলিতেছ ধ্রুব তারকা-সম।

রাখ কথাটি লো স্বহস্তে লিপিটি
দিয়ে এস তাঁরে মিনতি ধর,
পূর্ব্ব পত্রটির না পেনু উত্তর
জানিনে সখি, এ কেমন তর।"

করুণ-হৃদয়া সম-সুখ-দুখী
চিঠিখানি লয়ে আপন হাতে,
সন্ন্যাসিনী সাজে চপলা রূপসী
চলিল চিতোর সেই সে রাতে।

---

(৩)

বিবাহ হইয়ে গেছে অলকার
ফুল শয্যা আজি—লেগেছে ঘটা,
বুন্দি নগরেতে বাজিছে বাজনা
ধাঁধিছে নয়নে দীপের ছটা।

কুসুমে কুসুমে সাজান সহর—
ফুলের বিছানা ফুলের ঘর,
সুবাসে সুবাসে উথলায় দিক,
ফুলময়-তনু বধূ ও বর।

চার দিক হতে পড়ে হুলু ধ্বনি,
বরের বামেতে বসেছে ক'নে,
কিন্তু ওকি, হায়! ও কিসের ছবি,
হ'তেছে কি বিয়ে মৃতের সনে?

নেত্রে নাহি জ্যোতি, না পড়ে পলক,
শুধু শোণিত বালার বুকে,
নিশ্বাস প্রশ্বাস পড়েনা তো—কই?
অমানুষি শ্বেত-বরণ মুখে।

কি ঘোর বিষণ্ণ আনন্ত মুখানি
দেখিয়ে পরাণ শিহরে হায়,
উৎসব আমোদ উথলে চৌদিকে
সে-সবে বালিকা মৃতের প্রায়।

মুখানি শুখানো ফুলের মতন
তবু সে মুখের নাহিক তুল,
অঙ্গের কুসুম কি করিবে আর—
ফুলের সমাধি করিছে ফুল!

সহসা থামিল মঙ্গলাচরণ
ঘোর কোলাহলে পুরিল দিশি,
ভয়ে শিহরিল কুলনারী গণ,
রণ বাদ্যে কাঁপি উঠিল নিশি।

এসে, মহারাজে দিল সমাচার—
"নগর বেড়েছে চিতোর রাজ,
বলে অলকারে লইবেন তিনি
উৎসবের শিরে পড়িল বাজ"।

বজ্রের মতন পড়িল কথাটি,—
নবোঢ়া রমণী ফেলিয়ে খুয়ে,
ছেড়ে সুকোমল কুসুম শয়ন
চলিল ভূপতি সমর ভুঁয়ে।

ছিঁড়ি, নারীগণ, ফুল আভরণ—
ফেলিয়া রাখিয়া আমোদ হাসি,
বিদায় লইতে স্বামীগণ সাথে
চলিল নয়ন-সলিলে ভাসি।

সবে গেল চলি, একাকী অলকা
বসিয়ে রহিল বিছানা পরে,
হৃদয় মাঝারে কি যে হলস্থূল
বর্ণিবা কে তাহা বলিতে পারে?

সহসা চপলা দেখা দিল আসি
পত্র একখানি সঁপিল হাতে,
নিভিবার আগে জ্বলে যথা দীপ,
জ্যোতিহীন আঁখি জ্বলিল তা'

বলিল চপলা,—"তোর নাম করি
রাজা সনে আগে করিনু দেখা,
পত্রখানি এই দিলেন আমায়
উত্তর এ নয়, আগের লেখা।

পরে, তোর সব কহিনু কাহিনী,
হাতে দিনু তোর লিপিটি লয়ে,
এসেছেন তাই উধারিতে তোরে
লিপির উত্তর আপনি হয়ে।"

বালিকা অধীর বিকম্পিত হিয়া
হিম আর্দ্র হাতে লিপিটি খুলি,
সুরা-পায়ী যথা চায় সুরা পানে
পড়িল সতৃষ্ণে আপনা ভুলি——

"গত নিশি স্বপনে, মরমের বিজনে
মরি কি তোমার রূপ দেখেছিনু, অলকে,
সেই ছটা মহিমা, সেই প্রেম প্রতিমা
দেখিতে দেখিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল পলকে।
যেন হেসেহেসে, লো, প্রেমময়ী বেশেলো,
সোহাগে প্রেয়সি তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে,
কিবা ধীর তাকানি, লাজ আধো মুখখানি
ঈষৎ পড়েছে ঢাকা অলকের আড়ালে।
কতগুলি এলোচুল-করিয়ে লো যেন ভুল
ছেয়েছে ঝাঁপায়ে পড়ি আধো-বাম নয়নে,
প্রেমাশ্রুতে মাজিয়ে, অপরূপ সাজিয়ে
লতাইয়া পড়িয়াছে ফণিনীর ধরণে।
নীহারেতে ধোয়ানো একরতি নোয়ানো
গোলাপটি যেন মরি মুখখানি বিকাশে,
আঁখি দুটি ঢলিয়ে ভাবে যেন গলিয়ে
স্নিগ্ধ বিজলির মত দ্যুতি নব প্রকাশে।

সুধা মাখা অধরে হাসি রাশি না ধরে,
মনের উচ্ছ্বাস যেন তরঙ্গিছে শরীরে,
সরমের লাগিয়ে রাঙা রাগে রাগিয়ে
কি মধুর সাজিয়াছে মুখখানি মরিরে।

আমি উঠি অধীরে, কণ্টকিত শরীরে
যেমন ধরিতে যা'ব তোমারে লো হরষে,
তুমি সেই রমণী, উবে গেলে অমনি,
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর প্রভাতের পরশে।

সে অবধি, সরলে, জ্বলি মনো-অনলে
কি দুখে কাটাই দিন বলিব তা' কেমনে?
একবার আয়, লো, পরাণ যে যায়, লো,
জ্যোতির প্রতিমা তুই এ আঁধার জীবনে।

রাজ-ব্রত ধরিয়ে ছিনু যেন মরিয়ে
কি যাতনা সহিনু যে নাহি পারি কহিতে,
আর যে তা হয় না, প্রাণ তাতে রয়না
সসৈন্য সেনাপতি ভেটি তোকে লইতে।

তোর পিতা মাতারে ভাই বন্ধু সবারে
প্রকাশিয়ে এ বিবাহ, আয় ত্বরি আসনে,

তোর ধন এ হিয়ে হাতে হাতে সঁপিয়ে
যতকিছু অপরাধ ডুবাইব মিলনে।"

সজল নয়ন, দুরু দুরু হিয়া,
কি পড়িছে যেন জানে না বালা,
কতই পড়িল, কতই চুমিল
বুকেতে রাখিল নিভাতে জ্বালা।

বলিল সখিরে,—"শেষ ভিক্ষা মোর
শেষ অনুরোধ রাখ, লো সই,
ছদ্মবেশে তারে আনগে এখানে
জনমের মত দেখিয়ে লই ;

মুহূর্ত্তের তরে দেখিব রতনে
একবার তারে আনিয়ে দেহ
সন্ন্যাসীর বেশে আন গো তাহারে,
বাধা তাহা হ'লে দেবে না কেহ।

কি আশে বাঁচিব অদভুত কথা
দুই বিয়ে, হায়া কাহার আমি ?
বিবাহের দিন প্রতি মুহূর্ত্তেকে
ভাবিনু লইতে আসিছে স্বামী।

মরিবারে গেনু, মরিতে দিলে না,
জানিনে কেমনে হয়েছে বিয়ে,
জানিনে কেমনে কি যে কি হয়েছে
যামিনী কেটেছে কোথায় দিয়ে।"

শুষ্ক অধর নীরস রসনা
আশাতেও যেন ভরষা নাই,
সম সুখ দুখী চপলা তখন,
চলিল রতন রাণার ঠাঁই।

একেলা অলকা, কেবা দিবে বাধা ?
এলোথেলো করি ফেলিল কেশ,
কূলের গহনা ফেলিল ছুড়িয়া,
ধরিল বালিকা বিধবা বেশ।

কুসুম বিছানা টেনে ফেলি দূরে
কঠিন ভূতলে সঁপিয়া কায়,
আপনার মনে গুণ গুণ স্বরে
কাতর পরাণে গানটি গায়,—

"তারে দেহ গো আনি,
ঐ যে ফুরায় বুঝি অন্তিম যামিনী ;
একটি শুনিব কথা একটি শুনাব বাথা,
একবার দেখেনিব ও-মধুর মুখানি,
সেই কোলে জীবনের শেষ সাধ মিটিবে—
সেই কোলে জীবনের শেষ স্বপ্ন ছুটিবে,—
জনমে পুরেনি যাহা, আজ কি পুরিবে তাহা,
জীবনের চির সাধ মিটালো সজনি।"

---

(৪)

শত শত তারা দলে হাসিয়া অম্বর তলে
ভ্রুভঙ্গে উড়াতে চায় অন্ধকার স্থির,
শতেক জোনাকি ভাতি চমকে ভীষণ রাতি,
ভীষণ আঁধার তবু অটল গম্ভীর।
সৈন্যগণ হুহুঙ্কারে, রণসজ্জা আড়ম্বরে,
রজনীর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবারে চায়,
বিজনে উদ্যান মাঝে, তবু কি প্রশান্তি রাজে,
সে রবে নিস্তব্ধভাব দ্বিগুণ বাড়ায়।
নিস্তব্ধ হেথায় দিশি, নিস্তব্ধ গভীর নিশি,
নিস্তব্ধ রতন রাণা, অলকা কুমারী,
কথা তার নাহি সরে, নয়ন ধরণী পরে,
ঝর ঝর অবিরত বহে অশ্রু বারি।

দেখিয়ে হৃদয় ধন, উথলি উঠেছে মন—
এই সেই ? দেবজ্ঞানে যাহারে সে বালা—
পূর্ণ বিশ্বাসের ভরে, হৃদয় সঁপেছে করে
সে-ই আজ অবিশ্বাসী !—কি অসহ্য জ্বালা !

এই সে কি ? যেই জন, পাইতে বালার মন
পারিত ঠেলিতে পায়ে, স্বরগের ধন,
আজিকে হৃদয় পেয়ে বিষাক্ত কৃপাণ দিয়ে
ছিন্ন করি সুখে তাহা দেখিছে এখন !"

বালা নম্র বিষাদিনী, আজিকে সে গরবিনী
বহিতে দিবে না ধরা গর্ব্বিত নয়নে,
মরমের শিরা, টুটো, ঐকবিন্দু অশ্রু উঠে
হাসিয়ে দেখিবে কেহ তাই বালা মনে।

আঁখি হতে উৎস ধায়, দিবেনা বহিতে তায়
আটকি রাখিতে তারে চায় প্রাণপণে ;
প্রণয়ের অপমানে, দারুণ বেজেছে প্রাণে
ছিন্ন ভিন্ন মনঃ প্রাণ বিষম বেদনে।

বেদনা পাইছে এত, ব্যথা না ভাবিছে তা তো
সাধ করি উপভোগে যেন সেই জ্বালা,
কার তরে পায় দুখ ? দুখেতেই তার সুখ
দুখ জানাতেও বাম, অশ্রু ঢাকে বালা।

কিন্তু শৈল শির দিয়া, ভেদিয়া পাষাণ হিয়া
নিরঝর ঝর ঝর ওই যে উথলে ;
বাধা কোন নাহি মানে, চলেছে আপন টানে
আটকি রাখিতে গিরি পারে কি তা বলে ?
অলকার অশ্রু মুখ দেখিয়ে দহিছে বুক
তবু না ফুটিতে পারে চিতোরের রাজ,
দোষী মনে মনে হায় সাহস নাহিক পায়,
কেমনে কি বুঝাইবে অলকারে আজ ?
মৌন তাই নরপতি, তাহাতে ভাবিছে সতি
তাহার বিষাদ দুখে স্বামী অন্যমনা,
নূতন প্রণয় কথা, হয়তো হৃদয়ে গাঁথা
ভেঙেছে কপাল তার গেছে গেছে জানা।

নিবারিতে অশ্রু জল, আয়ো বালা করে বল
গরবিনী ক্রিয়মানা তাতে বাধা পেয়ে,
রাখি মাথা বাহু পরে, তখন দৃঢ়তা স্বরে
বলিল আগের সেই লজ্জাবতী মেয়ে।

"উথলিত অশ্রুবারি, এ পোড়া নয়নে হেরি,
ভাবিওনা—আমারে যে ভুলেগেছ কাঁদি তাই,
তুমি আছ শান্তি সুখে, কাঁদিব আমি কি দুখে ?
কে আমি করিব আশা ও-হৃদয়ে পেতে ঠাঁই।

ভাল যে বাসনা মোরে, ভুলেছ যে একেবারে
ভালই করেছ সখে কি আর ভাবনা তবে,
ভাবি দুখিনীর কথা, আর তো পাবেনা ব্যথা
তুমিতো নিশ্চিন্ত হলেহোক যা আমার হবে।

পাছে সম দুখী জনে, ব্যথা দিই অকারণে,
আমা দুখে পাছে তব মুখানি মলিন হয়,
এই যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল
আরতো বাস না ভাল হয়েছ পাষাণময়।
তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
নাইতো প্রেমের ডোর কে আর রাখিবে বাঁধি,
নিশ্চিন্তে মরণ বুকে, যেতেছি ঘুমাতে সুখে
সুখ অশ্রু পড়ে তাই ভেবোনা দুখেতে কাঁদি।"

শুনি সে বিষাদ কথা কাঁপিল উদ্যান লতা
বিষাদে কুসুম বায়ু নীরবে কাঁদিল,
হয়ে দুখ-বিচঞ্চল কাঁপিল কমল দল
নীরবে নীহার বিন্দু খসিয়া পড়িল।
বাজিল রাজার বুকে, কথা বাহিরিল মুখে
ধীরে ধীরে বিনাইয়া বলিল তখন,——
"তুমিই প্রেয়সি মোর, কেন এ সন্দেহ ঘোর,
ক্রিয়মান অভিমানে কেন গো এমন ?

কাজে ব্যস্ত সর্ব্বদাই,আসিতে পারিনি তাই
আমারি অদৃষ্ট দোষে আমারি মরণ,
কি দারুণ বেদনায়, হৃদয় জ্বলিয়ে যায়
তোমার কোমল হৃদে দিয়াছি বেদন !

কেঁদনা কেঁদনা হায়, প্রিয়ে লো হৃদয়ে আয়
তোরে বই চন্দ্রাননে কাহাকে না জানি,
একবার পেলে তোরে,আর না ছাড়িব ওরে,
হৃদয় রাজ্যের মোর তুই রাজরাণী।

তুমিই প্রাণের প্রাণ, মনে ভাবিও না আন,
আর কারো নই আমি ছুঁয়' না আমায়,
ভুলে কি ছিলাম সাধে,হাত কি বিধির বাদে ?
এখন এ বক্ষ হতে কে লবে তোমায় ?"

একিরে একিরে কেন, হৃদয় কাঁপেরে হেন
সত্যই কি সেই স্বর পশিল শ্রবণে ?
সেই মধু মাখা সুরে, হৃদিতো উঠিল পুরে
অথচ প্রভেদ কেন আগেকার সনে ?

সেই কথা মধুমাখা, কিন্তু যেন মন-রাখা
প্রণয়ের উন্মত্ততা কইগো তেমন ?
সব সেই, সব সেই, কি যেন অথচ নেই,
অভাব কি এক যেন অনুভবে মন।
আগের উচ্ছ্বাসময়, সে ভাব এভাব নয়
মর্ম্ম যেন কথা হয়ে দেখা দিত মুখে,
কথা আজ হৃদি মাঝে তেমনি মধুর বাজে
হৃদয় বঞ্চিত কেন তেমন সে সুখে ?
কি যেন পাইয়ে ব্যথা, একটি কহিতে কথা
খুলিবে খুলিবে মুখ অসকা-সুন্দরী,
অমনি চপলা সতি, আসিয়ে সত্বর গতি,
বলিল, "এসগো রাজা মোরে অনুসরি—
শুন গো আমার কাছে সম্মুখে বিপদ আছে,
বিবরিয়া কহিবার নাহি অবকাশ।"

চলিল চপলা-মেয়ে,—বারেক ফিরিয়ে চেয়ে
পশ্চাতে চলিল রাজা হইয়া হতাশ।

---

(৫)

কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ শিখরোপরি ?
মধুর ঝলকে শুকতারা যেন
উষাতে আকাশ আলোক করি।

তেজোময় বটে, নহে তীব্র তেজ
প্রখরতা গেছে বিষাদে ঢাকি,
স্নিগ্ধ মাধুরীতে, স্নিগ্ধ চারিদিক,
ওরূপে নাহিক ঝলসে আঁখি।

এলোথেলো দীন পাগলিনী বেশ
শূন্যে উড়ি উড়ি ছড়ায় কেশ,
নিরাশা মাখান মধুর মুখানি
অটল গম্ভীর যোগিনী বেশ।

মধুর অধরে নাহিক সুহাস
বিষাদ কপাট দিয়াছে তায়,
নলিনী নয়ন নহে ফুল্ল ফোটা
ফুটিয়েও যেন মুদিত প্রায়।

শরীরে তাহার কিসের যতন
লুটিছে ধরায় লুটুক চুল,
কিছুতেই কিছু নাহি ভ্রূক্ষেপ
সকলি মায়ার, সকলি ভুল।

স্বামী প্রতিনিধি অসিখানি সুধু
এখনো রয়েছে বুকের পরে,
সকলি গিয়াছে আছে সেই খানি
মরণেও তাহা থাকিবে ধোরে।

দেখিতে দেখিতে পূরব গগনে
উদয় হলেন ঊষার রাণী,
রাঙা করি তুলি ভাঙা মেঘ গুলি
পুইলেন তা'তে চরণ খানি।

একিরে সহসা ভীমগরজনে
চকিতে দিগন্ত কাঁপিল কেন ?
শান্ত ঊষা সনে অশান্তি উদয়
কেন বিপরীত নিরখি হেন ?

রবির উদয়ে হাসে যদি নভ
ধরায় একি রে জলদ মালা ?
মাঝে মাঝে ওকি জ্বলে কড়মড়ি
আঁধারে ও কিও বিজলি খেলা ?

ঘোরতর মহা বাধিল সমর
সেনাপদ-দাপে কাঁপিল ভূম,
ঝন ঝনি অসি, চমকে পরাণ
কামান গরজি উগারে ধূম।

শোণিতে শোণিতে বহি গেল নদী
উঠে জয়ধ্বনি, উড়ে নিশান ;
"অলকাকুমারী আমাদের রাণী"
চারিদিকে এই উঠিল তান।

সহসা থামিল সে ঘোর গর্জ্জন
মন্ত্র শুদ্ধ যত সেনানী চয়,
রাজার ইঙ্গিতে নত করি অসি
যেথায় যেজন দাড়ায়ে রয়।

সুরথ রতনে ধরিল কৃপাণ
দোঁহার ঝগড়া মিটাতে দোঁহে,
শুদ্ধ সেনানীরা রহিল চাহিয়া
সভয়ে বিস্ময়ে চমক মোহে।

ঝনঝনি অসি অশনি গর্জ্জনে
বলিল সরোষে চিতোর রাজ,—
"দাস অনুদাস বুঝি অধিকারী
মিবারের রাণী হবে গো আজ ?

হুঙ্কারে যাহার কাঁপে ত্রিভুবন
তার অপমান, ও হীন হাতে ?
প্রতিশোধ এর, প্রতিশোধ চাই
প্রতিশোধ লব শোণিত পাতে"।

রাগে অপমানে উন্নত মস্তক,
নয়নে ঝলকে অনল জ্যোতি,
বিকম্পিত স্বরে সতেজে, অধীরে
উত্তরিল পূর্য্য ভূমদিপতি,—

"সাক্ষী ঐ রবি, সাক্ষী দেবদেবী
কাহার অন্যায়, কাহার ন্যায়,
কাহার অলকা ধরম বনিতা
কে পাষণ্ড বলে হরিতে চায় ?

যদি ধর্ম্ম বোলে থাকে একজন,
সত্যের প্রভাব আজিও রয়,
দেখিব দেখিব আজি এ সমরে
কার পরাজয়, কার বা জয়।"—

বলিয়া দুজনে, নীরবে গরজি
রাখিবারে প্রথা রণের আগে,
নমিয়ে অসিরে, প্রণমিতে রবি
চাহিল অমনি আকাশ ভাগে।

হোলনা হোলনা, রবিরে প্রণাম
প্রাসাদ শিখরে পড়িল আঁখি
অনিমেষ চোখ, রতন রাণার,
কে বালা হোথায় কাহাকে দেখি ?

হোলনা প্রণাম হোলনা প্রণাম,
কোথায় আকাশ, কোথায় ধরা ?
অপনা পাসরি রতন কুমার
চাহিয়ে রহিল বিহ্বল পারা।

পূর্ব্ব অনুরাগে উথলিল হৃদি
পুরাণ স্বপন উঠিল জেগে;
প্রেমের তুফান আবার বহিল
কি এক সহসা বেদনা লেগে।

নব রাজ্য মদে, নতুন প্রমোদে,
শুকায়ে গেছিল যে প্রেম, আহা !
ফিরিল সে নেশা নিরাশ অন্তিমে,—
শ্মশানে আবার জ্বলিল তাহা।

কে যেন সমুখে মূরতি করাল
হাসে সুবিকট ভীষণ হাসি,
নিমেষে এখনি ফুরাইবে সব—
দুঃখ, জ্বালা, সুখ, প্রমোদ রাশি।

এ দারুণ কালে, আবার আবার
মরমে একিএ মরম টান ?
ও মুখানি দেখে আবার এখন
পূর্ব্বভাবে কেন উথলে প্রাণ ?

আবার আবার ঘুমন্ত এ হৃদে
প্রণয় তুফান কেনরে বয় ?
শুষ্ক প্রেমহীন সেই সে নয়ন,
কেন রে হইল সলিল-ময়,

অসময়ে একি আলেয়ার আলো
দেখাইছে ঠাট ছলিবে বলে ?
বিস্মৃতি-মগন ছিল, ভাল ছিল,
কি আগুণ পুনঃ উঠিল জ্বলে ?

বিগত সেই সে সুখের স্বপন,
সবে-ফোটা সেই হৃদয় কথা,
মোহময় সেই নব অনুরাগ,—
কেন মনে পড়ি জাগায় ব্যথা ?

প্রেম-অশ্রু-মাখা সেই আঁখি দুটি
জ্বলন্ত, বিঘোর ভাবের ভরে,
অনুরাগ মাখা প্রদীপ্ত মুখানি
কেন মনে পড়ে—কিসের তরে ?

আধো ফুটো ফুটো প্রেমময় সেই
ফুলের সুবাস জিনিয়া বাণী,
প্রথম যে দিন দেখিনু তাহারে,
দেখা দিল যেন স্বরগ রাণী।

সেই সে রূপসী ভুবন মোহিনী
আজিকে তাহার এ হেন বেশ,
ধূলায় লুটিছে আহা মরি মরি
কুসুমে সাজান সেই সে কেশ !

কুসুম কলিকা—নাই কেন বাস ?
অকালেতে মরি শুকালো, হায় !
আমিই নিঠুর নাশিয়াছি তায়—
যাতনায় হিয়া জ্বলিয়া যায়।

ভুলেছিনু সে যে ছিল মোর ভাল
আবার এ দেখা হইল কেন ?
দেখা যদি হ'ল কেন গো আবার
আইল সে প্রেম নবীন যেন ?

প্রেম যদি ফিরে এল পুনরায়,
স্থান ব্যবধান কেন রে মাঝে ?
হৃদয়ে হৃদয়ে মিশাইতে সাধ
এ বিষম বাধা বড়ই বাজে।

কুসুম কাননে মিলন যাহার
দেখা হ'ল আজি শ্মশানে তার,
এখনিরে যদি ফুরাইবে সব,
নিভে যাক প্রেম চাহিনে আর।"

নিমেষে চকিতে কতশত ভাব
বহে গেল তার হৃদয় দিয়ে,
চাহিয়ে রহিল অলকার পানে
অনুতাপে দুখে দলিত হিয়ে।

মনে হ'তে গেল সমরের কথা,
হাত হতে অসি পড়িল নেমে,
ভুলিয়ে সকল সম্ভাষি বালারে
বলিল ভূপতি মাতিয়া প্রেমে।

"আকাশের পটে মধুর মূরতি
আবার আজিকে দেখি রে কেন?
কেন রে আবার নয়নে উদিলি
প্রভাতি চাঁদের জোছনা হেন?

জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
কঠোর পাষাণও গলিয়ে যায়?
জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
শবের তনুও জীবন পায়?

জাননাকি প্রিয়ে; ও মূরতি দেখি
এই এ আমার অসাড় প্রাণে?
মাতিয়ে বহিছে প্রেমের তুফান
আপনি ভাসিয়ে যাই সে টানে।

জাননাকি প্রিয়ে, ও মূরতি দেখি
হৃদি কবাট আপনি খোলে,
গলে গলে যায় মরম আমার,
মধুর কি এক নেশার ভোলে?

তবে কেন তুই দেখা দিলি ওই
হাসিলি কেন ও দুঃখের হাসি?
বিষাদের ঐ ম্লান-চাহনিতে
কেন বরষিলি পীযূষ রাশি?

দেখা দিলি যদি জুড়াতে এ হৃদি
সুদূর অম্বরে কেন লো তবে?
তোর লাগি এই পেতেছি হৃদয়
আয় হৃদে হৃদে মিশাই এবে।"

চিতোরের রাণা বকে কি প্রলাপ,
সহসা উন্মাদ হইল একি?
সম্মুখ সমরে কই সে বিক্রম,
কই সে সিংহের গরব দেখি?

একিএ ভীরুতা? একি অসম্ভব
হাত হতে অসি পড়িছে খসি!—
চিতোর সেনানী অধীর সরমে
উন্মত্তে ঝননি উঠিল অসি।

সূরয অবাক ফিরাইল মুখ
দেখিল প্রাসাদ শিখরে চেয়ে,
বুঝিল রতন হতজ্ঞান কেন,
প্রাসাদে দেখিল অলকা মেয়ে।

গরজি উঠিয়া বলিল সূরয,
রোষে তাপি উঠে শোণিত বারি,—
"কাপুরুষ ভীরু, ধররে কৃপাণ,
উন্মত্ত হেরিয়ে পরের নারী!"

ভাঙ্গিল চমক অপমানে, তেজে
সবলে কৃপাণ ধরিল করে,
বিঁধিবার আগে শত্রু বক্ষে তাহা
উঁচুতে চাহিল বারেক তরে।

বারেকের তরে আর একবার
দেখি অলকায় নয়ন ভরি,
হানিল কৃপাণ সতেজে সজোরে,
আঘাতে আঘাতে ব্যাকুল করি।

ঝন ঝন ঝন চমকে কৃপাণ,
এ বিঁধিতে অসি উহার গায়,
অলকা প্রাসাদে যেন জ্ঞান হীন
দাঁড়ায়ে রয়েছে পাথর প্রায়।

চারিবার রাণা ঝননিয়ে অসি
বিঁধে বিঁধে যেন সুরথ বুকে,
চারিবার তাকে করিয়ে বিফল
সুরথ আঘাত করিল রুখে।

এই মুখামুখি, পিছু হঠে পুন
রক্তেরক্ত অসি সমুখে ধরে ;
অবসন্ন তবু অটল উভয়ে,
দ্বিগুণ ভীষণ বিফল তরে।

ঐ না সুরথ পড়িল এবার ?—
হাতের কৃপাণ পড়িল খসি,
অন্তিম নিশ্বাস পড়িল তাহার—
বুকেতে রতন বিঁধেছে অসি।

অবসন্ন রাণা বিক্ষত শরীর
সেও মাটী পরে পড়িল শুয়ে ;
শেষ বলটুকু গিয়াছে তাহার,
সহজে সুরথ পড়েনি ভুঁয়ে।

শোণিত লহরী উঠিছে ঝলকি
নিদান আঘাতে চেতনা হারা,
দেখিল অলকা দেখিল সকলি
চেতনা বিহীন পাগল পারা।

পারিল না আর, পারিল না আর,
অটল মাথাটি হইল নত,
ক্ষনেক তবুও রহিল দাঁড়ায়ে
বোঁটায় মোহান কমল মত।

ধীরে ধীরে খুলি বুক হতে অসি
বারেক তাহারে দেখিয়া লয়ে,
চুমিল আবার অধীরে যতনে
কত ভাব গেল নিমেষে বয়ে।

তোরি সনে অসি পরিণয় মোর
জানিনে তোছাড়া কাহাকে আমি,
স্বামীরূপে তোকে বুকে ধরি, ওরে
কেটেছে সুখের দিবস যামী।

তোমারি চিরদিন তরে আছিনু,
চিরদিন তরে থাকিব তোরি,
বিবাহ হোয়েছে তোর সাথে অসি,
মরিবও তোরে বুকেতে ধরি।

বলিয়ে সে বালা অনন্য হৃদয়া
বুকেতে বিঁধেয় খড়গ আজ,
শূন্য দেশ হতে তারাটির মত
পড়িল যুগল পতির মাঝ।

দুর্গসিংহ ও ময়ূরভট্ট।

আমরা ভারতীতে "কাতন্ত্র-জীবনী" নামক প্রস্তাবে দুর্গসিংহ সম্বন্ধে একটী অধ্যায় লিখি। আমরা উক্ত প্রস্তাবে প্রমাণ করিয়াছি যে, দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে বিশ্ব-সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অধুনা একটী প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে আমাদের পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত সময়ের গুরুত্ব লইয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইতে পারে। বাস্তবিক দুর্গসিংহ সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব-নিরূপিত সময় যে ভ্রান্তিমূলক নহে তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য আজ এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিতেছি।

বৈয়াকরণ-প্রধান মহাত্মা দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের আখ্যাত বৃত্তির দ্বিতীয় পদে "ইনঞ যজাদেরুভয়ং" এই সূত্রের উদাহরণ জন্য ময়ূরভট্টের "সূর্য্যশতক" এবং ভারবি হইতে দুইটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা:—

(১) তবদর্শনং কিং ন ধত্তে। (ভারবি)

(২) কমলবনোদ্ঘাটনং কুর্ব্বতে যে।

(সূর্য্যশতক, শ্লো, ২)

দুর্গসিংহকৃত বৃত্তির ঐ উদাহরণ স্থলে ত্রিলোচন বলিয়াছেন:—

" • • মহাকবিনিবন্ধপ্রয়োগাশ্চ দৃশ্যন্তে; যদাহ ভারবি:—"তবদর্শনং কিন্ন ধত্তে" • • • • ॥ তথা ময়ূরোঽপি—'কমলবনোদ্ঘাটনং কুর্ব্বতে যে' ইতি • যে বন্দ্যা ইত্যর্থ:।

(কাতন্ত্র-পঞ্জিকা, ৭।২।৪)

ভারবির সময় এখনো নিশ্চয় রূপে জানা যায় নাই। আমাদের বিশ্বাস তিনি খৃ: পঞ্চম শতাব্দীর পরবর্ত্তী লোক নহেন। সময়ান্তরে এ কথার প্রমাণ করিব। "বাণভট্ট" নামক প্রস্তাবে বাবু রামদাস সেন ময়ূরভট্টকে বাণভট্টের শ্বশুর এবং সমসাময়িক লোক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ঐ প্রস্তাবে বাণ ও ময়ূর সম্বন্ধে যে কয়টি উপন্যাস উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতেও ময়ূরকে বাণের শ্বশুর এবং সমসাময়িক বলিয়া উপলব্ধি হয়। আবার—

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা
যন্ মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভাঃ
সমো বাণ-ময়ূরকঃ॥

শার্ঙ্গধর পদ্ধতির এই শ্লোকানুসারেও বাণ এবং ময়ূরকে শ্রীহর্ষ রাজার সভাপণ্ডিত ও সমসাময়িক লোক বলিয়া জানা যায়।

রামদাস বাবু বাণভট্টের সময় নির্ণয় করিবার জন্য বলিয়াছেন—

• কুলচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি টীকাকারগণ কর্ত্তৃক এই দৃষ্টান্ত দুর্গ সিংহের প্রয়োগ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"বাণভট্ট হর্ষচরিত-প্রণেতা। কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত তাঁহার বাল-সখিতা ছিল, এজন্য হর্ষচরিতে তাঁহার গুণাবলী বর্ণন করিয়াছেন। হর্ষবর্দ্ধন ৬০৭ খৃঃ অঃ হইতে ৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনদেশীয় লেখক মাতুলিনের মতানুসারে তাঁহার ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্য-শাসন-সময়ে কান্যকুব্জে গমন করিয়াছিলেন। আবুরিহান কহেন এই হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক "শ্রীহর্ষ অব্দ" প্রচলিত হইয়াছিল। এই অব্দ ৬০৭ হইতে ১১০০পর্য্যন্ত কান্যকুব্জ ও মথুরায় প্রচলিত ছিল। এই শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন, এবং ইনিই হিয়াঙ সিয়াঙের শ্রীহর্ষ শিলাদিত্য। বাণভট্ট তাঁহার পার্ষদ। সুতরাং তিনি খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে রামদাস বাবুর মতে ময়ূরভট্টও খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। আমরা "কাতন্ত্র-জীবনী" নামক প্রস্তাবে লিখিয়াছি যে "দুর্গ সিংহ খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে বিশ্ব-সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" কিন্তু যখন দুর্গসিংহ ময়ূরভট্টের গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তখন সাধারণ যুক্তিতে সকলেই বলিবেন, দুর্গসিংহ ময়ূরভট্ট হইতে অবশ্যই পরবর্ত্তী লোক। তাহা হইলে দুর্গসিংহ সম্বন্ধে যে সময় নিরূপণ করিয়াছি তাহার গুরুত্ব লইয়া সন্দিহান হইতে হয়। কিন্তু একটুক সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে আমাদের নিরূপিত সময়ে কিছুই প্রমাদ লক্ষিত হইবে না। মনে করুন, ময়ূরভট্ট যদি ৮০।৯০ বৎসর বয়ঃক্রমে—শ্রীহর্ষের রাজ্যাভিষেকের প্রথম অবস্থায় শ্রীহর্ষের সভাপণ্ডিত হয়েন তবে তিনি প্রায় খৃষ্টীয় ৫২০ কিম্বা ৫৩০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর দুর্গসিংহ যদি খৃঃ পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে অর্থাৎ প্রায় ৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তিনি ময়ূর হইতে মাত্র ২৫।৩০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া পড়েন যদি দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগেও বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত থাকিয়া, প্রায় সেই সময়ে কাতন্ত্র বৃত্তি প্রণয়ন করিয়া থাকেন; তবে ঐ সময়ে ময়ূরভট্টের বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বৎসর ছিল। ময়ূরভট্টের ন্যায় এক জন অসামান্য প্রতিভাশালী মহাত্মা ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রমে সূর্য্যশতকের ন্যায় একখানা ক্ষুদ্রায়তনের কাব্য লিখিবেন এবং দুর্গসিংহ সেই গ্রন্থ হইতে দুই এক পংক্তি উদ্ধৃত করিবেন তাহা তত আশ্চর্য্য ব্যাপার নহে। যদি কেহ বলেন যে, দুর্গসিংহের ন্যায় একজন ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত একটী সমকালবর্ত্তী অল্পবয়স্ক যুবকের গ্রন্থ হইতে কখনি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন নাই। তবে আমরা বলিব যে দুর্গসিংহ, কাতন্ত্রবৃত্তি প্রণয়নের ২০।৩০ বৎসর পরে যখন ময়ূরভট্টের গ্রন্থ এক খানি গণনীয় গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল তখন আবশ্যক বোধে তাহা হইতে এক

চন্দ্র উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাই বা আশ্চর্য্য কি? পরন্তু মাধবাচার্য্যের মতে ময়ূর অবন্তী দেশ বাসী ছিলেন।* দুর্গসিংহ ও অবন্তীতে বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন। অতএব এ উভয় মহাত্মার পরস্পর পরিচয় থাকা নিতান্ত সম্ভব। ময়ূর ভট্ট আবির্ভাব সময় হইতেই দেশে এক জন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। দুর্গসিংহ সেই প্রসিদ্ধ মহাত্মার গ্রন্থ হইতে এক পাদ শ্লোক উদ্ধৃত করিতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, এমত বোধ হয় না। এই সকল কারণেই ময়ূরভট্ট দুর্গসিংহ হইতে অল্পবয়স্ক এবং দুর্গসিংহের সমসাময়িক হইলেও তাঁহার গ্রন্থ হইতে দুর্গসিংহ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া একটুকু আশ্চর্য্য হই না। আর ঐ সকল কারণে দুর্গসিংহের জন্ম, পঞ্চম শতাব্দীতে হওয়া অযৌক্তিক জ্ঞান করি না।

আমরা প্রস্তাবান্তরে ষট্‌কারিকা-প্রণেতা ভব-সনন্দি (বা রভস) সম্বন্ধে কয়েক পংক্তি লিখিয়াছি।* ষট্‌কারিকার শেষ শ্লোক পাঠে জানা যায় উক্ত গ্রন্থ ভবসনন্দি ৪২০ অব্দে (এই অব্দ অবশ্য সংবৎ) প্রকাশ করেন। উক্ত ভব-সনন্দি দুই তিন স্থলে "টীকাকার" বলিয়া দুর্গসিংহকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। যখন ৪২০ সংবতে (৪৭৬ খৃষ্টাব্দে) ভবসনন্দি দুর্গসিংহের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তখন দুর্গসিংহকে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী লোক বলিতে হয়। সুতরাং ময়ূরভট্টের আবির্ভাবের প্রথম সীমা এবং সূর্য্যশতক প্রণয়ন কালকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে পর সাময়িক বলিতে পারি না।

গাঙ্গেয় বদ্বীপ ও কলিকাতার ভূতত্ত্ব।

বদ্বীপ কাহাকে বলে ও কিরূপে তাহা সংগঠিত হয় সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিয়া আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে অবতরণ করিব।

সমুদ্র কিম্বা হ্রদে প্রবেশ করিবার সময় কোন নদীর স্রোত কোন প্রকার বাধা প্রাপ্ত হইয়া যখন মন্দীভূত হয়, তখন তৎপ্রবাহিত বালুকা ও কর্দ্দম রাশি নদীর তলদেশে নিময় হয়। ক্রমে ক্রমে এই তল দেশের কিয়দংশ হইতে নদীর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত বালুকা কর্দ্দমে ভরাট হইয়া গিয়া মূল স্রোতস্বিনীর উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত সমতল জলা-ভূমি সকল গঠিত হয়। জলপ্লাবনের সময় এই সকল ভূমি কর্দ্দমময় জলে প্লাবিত হওয়াতে, মৃত্তিকা কিম্বা বালু-

* ভারতী, তৃতীয় ভাগ, ১৯ পৃষ্ঠা (১২৮৬)

কার একটি সূক্ষ্ম আবরণ তাহার উপর সঞ্চিত হয়, এবং এইরূপে ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া অল্পে অল্পে নদীর সাধারণ সমতল কে ছাড়াইয়া উঠে। এবং ঐ সকল ভূমির মধ্য দিয়া ঐ নদীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। ক্রমে এই সকল সমতল জলা-ভূমির উপর নানাবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়; ক্রমে জীবজন্তু সকলও সেখানে আহার ও আশ্রয় লাভ করে; এইরূপে, নদীর ক্রিয়া-প্রভাবে একটি নূতন রাজ্য সৃষ্ট হয়। নদীসংগঠিত এই সমতল ভূমিকে ইংরাজি ভাষায় Delta বলে—নীল নদী-সংগঠিত এই প্রকার ভূমির আকার গ্রীক ভাষার Delta অক্ষরের ন্যায় প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট প্রতীয়মান হওয়ায় তাহারা প্রথম উহার Delta নাম দেয়। এই Delta অক্ষরের সঙ্গে আমাদিগের বাঙ্গালা ব অক্ষরের সাদৃশ্য থাকায় Deltaর অনুবাদে বদ্বীপ আমাদের ভাষায় ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নদী-মুখে মৃত্তিকা সঞ্চিত হইয়া যে সকল ভূমি উৎপন্ন হয়, সাধারণত তাহাদের আকার প্রায় ব অক্ষরের মত, কারণ এই সমভূমি বদ্বীপগুলি প্রথমে সংকীর্ণ ভাবে আরম্ভ হয়। পরে সমুদ্রের দিকে যতই অগ্রসর হয় ততই প্রশস্ত আকার ধারণ করে।

সাধারণতঃ বদ্বীপ কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা বলা হইল, এক্ষণে গাঙ্গেয় বদ্বীপের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক। বঙ্গ-দেশের অধিকাংশই যে এই প্রকার গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর স্রোতোগতিতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং এই জন্যই বঙ্গদেশ অসাধারণ উর্ব্বরতা লাভ করিয়াছে। বদ্বীপের যেখান হইতে প্রথম সূত্রপাত হয়, তাহাকে বদ্বীপের শিরঃস্থান কহে। বঙ্গদেশীয় মহা বদ্বীপের দুইটি শিরঃস্থান আছে, সমুদ্র হইতে উভয়ই প্রায় সমদূর। প্রথমটি গঙ্গানদী-সমুৎপন্ন—রাজমহলের ১৫ ক্রোশ নিম্নে তাহার আরম্ভ এবং তাহা সমুদ্র হইতে ১০৮ ক্রোশ দূরে। দ্বিতীয়টি ব্রহ্মপুত্র-সমুদ্ভূত, চিরাপুঞ্জীর নিম্নদেশ হইতে তাহার আরম্ভ, এবং তাহা বঙ্গ-উপসাগর হইতে ১১২ ক্রোশ দূরে। যখন নদীর জল নিম্ন থাকে, তখন সমুদ্রের জোয়ার বদ্বীপের শিরঃস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু যখন বর্ষাকালীন বৃষ্টিজলে নদী সকল ফাঁপিয়া উঠে, তখন তাহাদের জলরাশি ও স্রোতোবেগ সমুদ্রের স্রোতকে বাধা দেয়, এই জন্য সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত জোয়ারের স্রোত তখন আর বড় অনুভব করা যায় না। অতএব এই সময়ে বদ্বীপে সমুদ্রের গতিবিধি, নদীর গতি-ক্রিয়ার অধীন হইয়া পড়ে, সুতরাং নদীর কার্য্যে অতি অল্পই ব্যাঘাত দিতে সমর্থ হয়। এই বার্ষিক জলপ্লাবনকালেই উচ্চতা ও বিস্তৃতিতে বদ্বীপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বৎসরের অন্য সময়ে আবার সমুদ্র স্বীয় স্রোতোবেগে জল-পথ সকল খনন করিয়া এবং কখন কখন উর্ব্বর পলি-গঠিত ক্ষেত্র সকল গ্রাস করিয়া প্রতিশোধ দিয়া থাকে।

Major Colebrooke তাঁহার গঙ্গানদীর গতি বিষয়ক বিবরণে বলেন যে, উক্ত নদীর

কতকগুলি শাখা প্রশাখা ভরাট হইয়া গিয়াছে ও কত বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি অল্পকাল মধ্যে অপসারিত হইয়া নূতন জল-প্রণালী সকল প্রস্তুত হইয়াছে, ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তিনি বলেন এক স্থানে ৪০ বর্গ মাইল মৃত্তিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে অপসারিত হয়। একজন মনুষ্যের জীবন-কাল অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে কত বড় বড় দ্বীপ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-নদীর শাখা প্রশাখা মধ্যে সৃষ্টি হয়, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে কত রাশি রাশি মৃত্তিকা উক্ত নদীদ্বয়ে প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে কতকগুলি ক্রোশব্যাপী দ্বীপ নদীর বাঁকের কোণে বালুচর পড়িয়া সৃষ্ট হয়; তৎপরে কোন কোন স্থলে স্রোতের গতি ফিরিয়া যাওয়ায় সেই চর গুলির চারিদিকে জল জমিয়া দ্বীপাকারে পরিণত হয়। নদীর তলদেশে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক থাকা নিবন্ধন আর কতকগুলি দ্বীপ উদ্ভূত হয়। একটা বৃহৎ বৃক্ষ কিম্বা কোন বাত্যাহত নৌকা জলগর্ভে থাকায় নদীর স্রোত আটকিয়া গিয়া বালুরাশি তল দেশে থিতিয়া পড়ে, এবং এই বালুরাশি জমিয়া নদীর অনেকটা অংশ ভরাট হয়, এই সময় সমস্ত নদীর তল দেশ সমানরূপে পূরণ করিবার জন্য নদীর প্রত্যেক দিকের তট ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, এবং প্রত্যেক বার্ষিক জল-প্লাবনের সময়ে আবার নূতন মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হওয়াতে এই দ্বীপ সকল পরে আরও বর্দ্ধিত হয়।

রেবেল বলেন, লক্ষ্মীপুরের নিম্নে গঙ্গা ও মেঘনা নদীর সঙ্গম-মুখে কতকগুলি দ্বীপ আছে, যাহা উর্ব্বরতা ও আয়তনে ওয়াইট দ্বীপের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই নদীর কোন কোন অংশে নূতন দ্বীপ সকল সংগঠিত হইতেছে, এবং অপরাংশে আবার পুরাতন দ্বীপ সকল ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে। এই সকল নূতন দ্বীপ শীঘ্রই কুশ কাশ এবং অন্যান্য তৃণ গুল্মে আচ্ছাদিত হইয়া দুর্গম অরণ্যে পরিণত হয়, এবং ব্যাঘ্র গণ্ডার মহিষ হরিণ এবং অন্যান্য বন্য পশুর আবাসস্থান হইয়া পড়ে। এই জন্য জীব জন্তু ও উদ্ভিজ্জের দেহাবশেষ কখন কখন নদীর স্রোতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় বদ্বীপ প্রদেশে যে মৃত্তিকা থিতিয়া পড়ে, তন্মধ্যে সেই সকল দেহাবশেষ সমাবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন এরূপ ঘটিয়া থাকে, যে সময়ে বার্ষিক জল-প্লাবনের চূড়ান্ত প্রকোপ, সেই সময় প্রবল ঝটিকা উত্থিত হয়, এবং তৎসঙ্গে সমুদ্রের প্রবল স্রোতের প্রাদুর্ভাব হয়— এই উভয় এক যোগে সম্মিলিত হইয়া নদীর নিম্নবহমান স্রোতকে কখন কখন ঠেলিয়া রাখে এবং এই কারণে ভয়ানক সর্ব্বগ্রাসী জলপ্লাবন সকল সংঘটিত হয়। তাবৎ সামুদ্রিক বদ্বীপের অধিবাসী বিশেষরূপে এই প্রকার দুর্ঘটনার আয়ত্তাধীন। এবং ইহা এক প্রকার নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে, গাঙ্গেয় বদ্বীপে যে অবধি মনুষ্যের বসতি হইয়াছে সে অবধি এই প্রকার শোচনীয় দুর্ঘটনা তথায় বারম্বার সংঘটিত হইয়াছে।

এই কারণ বশতঃ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মীপুরে নদীর জল সচরাচর সমতল হইতে ৬ ফীট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পশু মনুষ্য ঘরবাড়ির সহিত সমস্ত একটি প্রদেশকে একবার ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

যে মৃত্তিকারাশি, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জলে আটক থাকিতে দেখা যায়, তাহা পরিমাণে পৃথিবীর আর সকল নদীর অপেক্ষা অধিক। তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাহাদিগের শাখা সকল উচ্চতম পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত হয়, এবং যেরূপ রাইন নদী কনস্ট্যান্স্ নামক হ্রদে ও সোন নদ লেমিবা-হ্রদে পড়িয়া পরিষ্কৃত হয়, সেই রূপ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের জল পরিষ্কৃত হইবার কোন উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত নদীদ্বয় মিসিসিপি প্রভৃতি নদী অপেক্ষা বিষুব রেখার অধিক সন্নিকট। এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের যে প্রথম পর্ব্বত শ্রেণী ভারতবর্ষের সমভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার দক্ষিণ ধারে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। সেখানে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, প্লাবনের সময় তাহাদের প্রধান প্রবাহ বিস্তার করে সেখানকার সমুদ্র, বদ্বীপ হইতে ৩০ কিম্বা ৫০ ক্রোশ দূরে গিয়া তবে স্বীয় স্বাভাবিক স্বচ্ছতা পুনর্লাভ করে; এবং ইহাও মানিয়া লইতে পারা যায়—যেখানে সমুদ্রের জল প্রথম পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়—তাহার আরও দক্ষিণে কর্দ্দমের সূক্ষ্মতর অংশ গুলি স্রোতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই নূতন স্তরের সাধারণ ঢালু অতীব মন্দ-গতি। উৎকৃষ্ট সমুদ্রের চিত্র দেখিয়া অবগত হওয়া যায় যে,—বদ্বীপের তল দেশ হইতে বঙ্গ উপসাগরের ৫০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই অল্পে অল্পে এই উপসাগরের গভীরতা ৪০ হইতে ৬০ বাঁউ বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। অতদূরে কোন কোন স্থলে ৭০ কিম্বা ১০০ বাঁউ পর্য্যন্ত গভীর।

কিন্তু এই সমতল-নিয়মের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বদ্বীপের মধ্যদেশের সম্মুখে, উপকূল হইতে ১৫ কিম্বা ২০ ক্রোশ দূরে, একটি সামুদ্রিক খাত আছে—তাহার নাম অতলস্পর্শ—তাহার পরিসর ৭৷৷ ক্রোশ। সেখানে ১৮০ হইতে ৩০০ বাঁউ পর্য্যন্ত তলমান যন্ত্র ফেলিয়াও তাহার তল পাওয়া যায় নাই। উপকূলস্থ চড়ার ৪ মাইল ব্যবধান হইতে ঐ খাদের ঢালু আরম্ভ হইয়াছে; নদীর কর্দ্দম-ভারাক্রান্ত জল যে শুধু ইহার উপর দিয়া সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয় এরূপ নহে কিন্তু বাণিজ্য-বায়ু প্রবাহ কালে কর্দ্দম ও বালুকা-ভার বহন করত সমুদ্র আবার বদ্বীপ অভিমুখে প্রধাবিত হয়—এই রূপ অবস্থায় এই অতলস্পর্শ খাত কি রূপে যে উৎপন্ন হইল ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। উপসাগরের আর ৪০ ক্রোশ পর্য্যন্ত যখন কর্দ্দম রাশি বিস্তৃত বলিয়া জানা আছে—তখন এই অতলস্পর্শে যে অত্যন্ত গাঢ় কর্দ্দম রাশি সঞ্চিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া

যায় যে, হয় বঙ্গীয় উপসাগরের এই অংশের আদিম গভীরতা অত্যন্ত অধিক ছিল, নয় ইদানীন্তন কালে, মধ্যে মধ্যে ভূমি বসিয়া গিয়া এই রূপ ঘটনা হইয়াছে। এই শেষোক্ত অনুমানটি অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, যে হেতু বদ্বীপের সংগঠন কালে —কলিকাতার নিকটস্থ বদ্বীপ যে বসিয়া যাইতেছিল তাহার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অধিকন্তু পুরাকালে ভূমিকম্প প্রভাবে বঙ্গদেশের কিয়দংশ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী উপকূলের অনেকাংশ যে বসিয়া যায় তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখা যায়, সুমাত্রা অন্তর্ব্বর্ত্তী দ্বীপ এবং রামারি প্রভৃতি আগ্নেয়-গিরি প্রদেশ হইতে "অতলস্পর্শ" অধিক দূরে অবস্থিত নহে।

Fergusson সাহেব অনুমান করেন যে, যে অতলস্পর্শে ১৮০০ ফীট পর্য্যন্ত তলমান যন্ত্র নিঃক্ষেপ করিয়াও তল পাওয়া যায় নাই—তাহা আর কিছুই নয়—তাহা একটি জল-পথ মাত্র—সামুদ্রিক স্রোতের প্রবল বেগে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে কিম্বা স্রোত-বেগে ঐ স্থানে কোন মৃত্তিকারাশি সঞ্চিত হইতে পারে নাই। এই প্রকার অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি উল্লেখ করেন যে গঙ্গা নদীর জোয়ার কালে স্রোতের গতি ঘূর্ণায়মান দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভূতত্ত্ববিৎ লায়েল সাহেব বলেন—যদি Fergusson সাহেব ঠিক করিয়া বলিতে পারিতেন যে, সেই গতির বেগ-পরিমাণ কি রূপ—তাহা হইলে সেই বেগ-প্রভাবে এরূপ অতলস্পর্শী-খাত প্রস্তুত হইতে পারে কি না অনুমান করা যাইতে পারে। লায়েল সাহেব বলেন তাঁহার মতে এই অনুমানটি আরও সহজ যে পূর্ব্ব হইতেই ১০০০ ফিট কিম্বা ততোধিক গভীর একটি সামুদ্রিক খাত বর্ত্তমান ছিল—সেইটি হয়তো বঙ্গ উপসাগরের আদিম মূল-আধার-স্থানের একটি অংশ মাত্র! গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই দুই বৃহৎ-নদী বঙ্গীয় উপসাগরের এই গভীর ও মধ্য অংশটিতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সামুদ্রিক স্রোতের সহিত মিলিত হওয়াতে তাহাদিগের স্রোত মন্দীভূত হয় এবং তন্নিবন্ধন তাহাদিগের কর্দ্দম সেই স্থানেই থিতিয়া পড়ে, সুতরাং "অতলস্পর্শী খাত" পর্য্যন্ত সেই কর্দ্দম প্রবাহিত হইয়া সে স্থান ভরাট করিতে অবসর পায় নাই।

বঙ্গ-উপকূলের কোন কোন অংশে যদিও বিলক্ষণ বৃদ্ধি দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ উপকূলের বর্দ্ধনক্রিয়া অতীব মন্দগতিতে সাধিত হইতেছে; কারণ, যখন নদীর জল নিম্ন থাকে, তখন জোয়ার ভাটায় কর্দ্দমরাশি অনবরত অপসারিত হয়। সুন্দরবনে জোয়ার ভাটার উত্থান পতনের পরিমাণ প্রায় ৮ ফীট কিন্তু বদ্বীপের পূর্ব্বদিকে, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শীতকালে Hookor সাহেব দেখিয়াছিলেন, জোয়ারের জল ৬০ হইতে ৮০ ফীট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উঠিয়াছিল এবং এই কারণে মেঘনা ও কেনী নদীর মুখ-স্থিত দ্বীপ সমূহমধ্যে প্রবল 'বাণ' ডাকে এবং এই জল-

রাশি ক্রমশঃ নদীতে উঠিয়া নদীর জল ঠেলিয়া লইয়া যায়, আবার ভাটার সময় সেই জলরাশি প্রবল বেগে হটিয়া আইসে। এই জন্য চট্টগ্রামের দক্ষিণে বঙ্গ উপসাগরের জল ২০ ক্রোশ পর্য্যন্ত এরূপ লবণ-শূন্য যে সেখানে সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ আদবেই জন্মায় না। অতএব বেশ বুঝা যাইতে পারে উক্ত জলরাশির প্রবাহ বেগে কর্দ্দমের সূক্ষ্মাংশ সকল কত দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

মিসিসিপি নদীর ন্যায় গঙ্গার তলদেশের ও তটের সমভূমি ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছে।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীগত বদ্বীপের কোন অংশে কিম্বা সমুদ্রের ২০০ ক্রোশ অপেক্ষা কম নিকটে কর্করের ন্যায় কোন স্থূল পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলিকাতা সমীপস্থ ফোর্ট উইলিয়ামে ১৮৩৪। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে যে কূপ খনন করা হইয়াছিল, তাহাতে ১২০ ফীট নিম্নে কর্দ্দমের সহিত উপলখণ্ড বাহির হইয়াছিল। কলিকাতার সমতলভূমি হইতে ৪৮১ ফীট পর্য্যন্ত নীচে খনন হইয়াছিল এবং তৎকালে তত্রস্থ ভূতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে অবস্থা প্রকাশ হয় তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায় কলিকাতার উপরকার মাটীর প্রায় ১০ ফীট নিচে প্রায় ৪০ ফীট পুরু, এক প্রকার নীল মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়; তাহার নীচে বেলে মাটি, এই বেলে মাটির অব্যবহিত নিম্নে জীর্ণ উদ্ভিদরাশি এবং তন্নিম্নে ২ ফীট পুরু কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণ উদ্ভিদে এক প্রকার মৃত্তিকাস্তর রচিত হইয়াছে। পোর্টল্যাণ্ডের "জঙ্গল-স্তরের" (Dirtbed) ন্যায়, এই জীর্ণ উদ্ভিদের মৃত্তিকারাশি দেখিয়া এই রূপ অনুমান করা যায় যে উহা সুন্দরবনের কোন প্রাচীন বনের সুস্পষ্ট নিদর্শন। রক্তবর্ণ কাষ্ঠের গুঁড়ি ও শাখা প্রশাখা সকল এই মৃত্তিকাস্তরের উপরে এবং অব্যবহিত নীচে এরূপ অবিকৃত ভাবে ছিল যে তদ্দৃষ্টে Dr Wallich সুন্দরি কাঠ বলিয়া স্পষ্ট চিনিতে পারিয়াছিলেন। Dr Falconer বলেন যে কলিকাতার চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য স্থানেও ৯ কিম্বা ২৫ ফীট নিম্নে এই প্রকার মৃত্তিকা-স্তর আরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

ইহাতেই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রদেশে প্রথমে যে ভূমি ছিল, তাহা অনুমান ৭০ ফীট বসিয়া গিয়াছে; কারণ কলিকাতা সমুদ্রের সমতল হইতে কতিপয় ফীট মাত্র উচ্চ এবং এই সকল উদ্ভিদ-জাত মৃত্তিকাস্তর থাকাতেই বোধ হয় যে এই ভূমি ক্রমশ অল্পে অল্পে বসিয়া গিয়াছে।

এই উদ্ভিদ-স্তরের নিম্নে ১০ ফীট পুরু ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণের আর একটি মৃত্তিকা স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে বিস্তর কর্করের স্তবক আছে। এই কর্কর মধ্যে কিয়দংশ অতি অল্পদিনের বলিয়া বোধ হয়—সাহারণপুরের নিকট নদীপ্লাবনে যে কর্কর সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই ইহার উৎপত্তি। তৎপরে ১২০ ফীট নিম্নে প্রবেশ করিয়া কোমল মৃত্তিকা পাওয়া যায়—তাহাতে

অভ্র-শ্লেট এবং অন্যান্য প্রকার প্রস্তরের জীর্ণ অংশ সকল দৃষ্ট হয়, সে-সকল অংশ গঙ্গার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া সে স্থানে আসিবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত স্তরে কোন মৃত সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় নাই—যাহা কিছু সকলই নদী-জাত ও স্থলজাত-জীবের দেহাবশেষ। তাহার পর ৩ ফীট নিম্নে আর একটি জীর্ণ উদ্ভিদ-স্তরের উপর কর্দ্দম স্তর সন্নিবেশিত—ইহাতে এইরূপ বুঝা যাইতেছে আবার কিয়ৎকালের জন্য একটি বিরাম উপস্থিত হয়, এবং আরও বুঝা যায় যে ঐ অরণ্যাচ্ছাদিত ভূমি ৩০০ ফীট বসিয়া গিয়াছিল। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে উপরি উক্ত অধোগত ভূমিখণ্ডের উপর যখন বৃক্ষাদি ছিল তখন এখনকার অপেক্ষা বঙ্গভূমির আয়তন সমুদ্রের দিকে অধিক বিস্তৃত ছিল এবং ইদানীন্তন কালে গঙ্গার স্রোতঃক্রিয়ায় বদ্বীপের আয়তন যাহা কিছু বৃদ্ধি হইতেছে তাহা আসলে বৃদ্ধি নয়—সমুদ্র-অপহৃত ভূমি গঙ্গাদেবী অল্পে অল্পে পুনরায় অধিকার করিয়া লইতেছেন এই মাত্র। তৎপরে ৪০০ ফীট নিম্নে স্তর-সন্নিবেশ বিষয়ে একটি প্রকৃতি-গত আকস্মিক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়—এই স্থানের স্তরটি বালুকা ও স্থূল উপলখণ্ডে নির্ম্মিত। খনন-যন্ত্রে কোন দৈব-ব্যাঘাৎ উপস্থিত হওয়ায় খনন ক্রিয়া এই পর্য্যন্ত স্থগিত হয়।

১২০ এবং ৪০০ ফীট নিম্নে উপল খণ্ড দৃষ্ট হওয়ায় এইরূপ বুঝাইতেছে যে ঐ সময়ে কলিকাতার নিকটস্থ কিম্বা চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে ভৌগোলিক অবস্থায় একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। নদী-প্রপাত কিম্বা পলিময় ভূক্ষেত্রের সাধারণ ঢালু হয়তো পূর্ব্বে অধিক মাত্রায় ছিল কিম্বা ভূমির সাধারণ অধোগমনের পূর্ব্বে যে সকল ক্ষুদ্র পর্ব্বত, বদ্বীপের বর্ত্তমান জল-প্রদেশের নিকটতর স্থানে ছিল তাহারা হয়তো কয়েক শত ফীট উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া বঙ্গ উপসাগরে দ্বীপাকারে পরিণত হয় এবং সেই সকল দ্বীপ হয়তো ক্রমে বসিয়া গিয়া নদীগত সঞ্চিত কর্দ্দম মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়।

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্রোতে প্রতি বৎসর গড়ে কত পরিমাণ মৃত্তিকা প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে গিয়া পতিত হয়, তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিরূপণ করা যায়, তাহা হইলে এই গাঙ্গেয় বদ্বীপ কত দিনে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। গঙ্গার স্রোতে কত পরিমাণ মৃত্তিকা আনীত হয়, সে বিষয়ে Rev Mr Everest ১৮৩১-২ খৃষ্টাব্দে, সমুদ্র হইতে ২৫০ ক্রোশ দূরে, গাজিপুর নগরে পরীক্ষা-পরম্পরা প্রদর্শিত করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে, প্রতি সেকেণ্ডে গঙ্গা নদীতে যে জলরাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ঘনফীট

বর্ষাকালে (৪ মাস)	৪৯৪,২০১
শীতকালে (৫ মাস)	৭১,২০০
গ্রীষ্মকালে (৩ মাস)	৩৬,৩৩০

অতএব দেখা যাইতেছে গড়ে প্রায় ৫০০,০০০ ঘনফীট জলরাশি বর্ষাকালের ছয় মাস এবং ৫৫০০০ ফীট জলরাশি বাকি ৮ মাস প্রতি০ সেকেণ্ডে প্রবাহিত হয়।

বর্ষাকালে এই প্রবাহিত জল রাশিতে যে কর্দ্দমরাশি আলম্বিত ছিল তাহার গুরুত্ব, $\frac{১}{৪২৪}$ অংশ; জলের বৈশেষিক গুরুত্ব শুষ্ক মৃত্তিকার গুরুত্বের প্রায় অর্দ্ধেক। এই জন্য নীরেট মৃত্তিকা পরিমাণে $\frac{১}{৪৫৬}$ অংশ কিম্বা ৫৭৭ ঘনফীট প্রতি সেকেণ্ডে। অতএব বর্ষাকালের ১২২ দিনের প্রবাহিত মৃত্তিকার পরিমাণ মোট ৬,০৮২,০৪১ ঘনফীট—অন্য ঋতুতে যে মৃত্তিকা প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অতি অল্প। শীতকালীন ৫ মাসের পরিমাণ ২৪৭,৮৮১৬০০ ঘনফীট এবং তিন মাস গ্রীষ্মকালের পরিমাণ ৩০,১৫৩,২৪০ ঘনফীট অতএব এক বৎসরের মৃত্তিকা-প্রবাহের সমষ্টি ৬,৩৬৪,০৭৭,৪৪০ ঘনফীট।

এই মৃত্তিকা রাশি এক বৎসর কাল মধ্যে ১১৪ $\frac{১}{৪}$ বর্গ ক্রোশ পরিমাণ ভূমি উঠাইতে পারে—তাহার প্রত্যেক দিক ৭ $\frac{১}{২}$ ক্রোশ এবং তাহার উচ্চতা এক ফুট। ইহা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার তাহা একবার পাঠকের মনে ধারণা করিয়া দিবার জন্য, আমরা প্রথমে এইটি ধরিয়া লইতেছি যে শুষ্ক কর্দ্দমের বৈশেষিক গুরুত্ব গ্রেনাইট্ প্রস্তরের গুরুত্বের অর্দ্ধেক (একটু হয়তো বেশি)। তাহা হইলে, এক বৎসরে যে মৃত্তিকারাশি গঙ্গা স্রোতে প্রবাহিত হয়, তাহার পরিমাণ ৩,১৮৪,০৩১,৭২০ ঘনফীট গ্র্যানীট প্রস্তরের সমান। এক্ষণে দেখা যায়, ১২ $\frac{১}{২}$ ঘনফীট গ্র্যানীট ওজনে এক টন এবং ইহাও গণনায় নিরূপিত হইয়াছে যে মিশর দেশের বৃহৎ পীরামিড যদি নীরেট্ গ্রেনাইট প্রস্তর হইত তাহা হইলে তাহা ওজনে ৬,০০০,০০০ টন হইত। অতএব এই গণনানুসারে প্রতি বৎসরে গঙ্গায় যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহা ওজনে ও আয়তনে ৪২ টা পীরামিড অপেক্ষাও অধিক এবং বর্ষাকালে ৪ মাসে যে কর্দ্দম রাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ৪০টা পীরামিডের সমান হইবে। কিন্তু কর্দ্দমরাশির বৈশেষিক গুরুত্ব আনুমানিক রূপে না ধরিয়া নীরেট মৃত্তিকার পরিমাণ Everest সাহেব বাস্তবিক ওজন করিয়া যাহা পাইয়াছিলেন তাহাই যদি ধরা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে বর্ষাকালের ১২২ দিন ধরিয়া যে কর্দ্দম রাশি গঙ্গায় প্রবাহিত হয় তাহা ওজনে ৩৩৯,৪১৩,৭৬০ টন——৫৬ $\frac{১}{২}$ পিরামিডের সমান এবং সমস্ত বৎসরে কর্দ্দমরাশির ওজন ৩৫৬,৩৬১,৪৬৪ টন কিম্বা প্রায় ৬০টা পিরামিডের সমান।

মিসরদেশের বৃহৎ পিরামিডের তল দেশের আয়তন ১১ acres এবং ইহার খাড়াই উচ্চতা প্রায় ৫০০ ফীট। অতএব গঙ্গা নদীতে শান্ত ভাবে ও অলক্ষিত

ভাবে কি প্রকার ব্যাপার চলিতেছে, তাহা এই পিরামিডের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই কল্পনায় কিয়ৎপরিমাণে ধারণ করা যাইতে পারে।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে এটনা নামক আগ্নেয়-গিরি হইতে যত ধাতুপিণ্ড নিঃসারিত হয়, তত অধিক পরিমাণে ঐতিহাসিক কাল মধ্যে আর কখনই নিঃসৃত হয় নাই। Ferrara গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে এটনা হইতে ঐ কালে ১৪০,০০০,০০০ ঘনগজ ধাতু নিঃসৃত হইয়াছিল, এই হিসাব অনুসারে গাজিপুর দিয়া প্রতি বৎসরে গঙ্গা নদীতে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয়, তাহার পঞ্চম অংশের এক অংশের সমান হয় না; সুতরাং পরিমাণে ইহার সমান হইতে গেলে এটনা গিরির এইরূপ ৫টা অগ্ন্যুৎপাত বা মহাধাতু-নিস্রব আবশ্যক হয়। Bengal Engineer দলের Colonel R. Strachey বলেন যে Everest সাহেব যে খানে তাঁহার পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন সেই গাজিপুর, সমুদ্র হইতে শুধু ২৫০ ক্রোশ দূরে এরূপ নহে, আবার এই একটি কথা যে, সেখানে গঙ্গা নদীর প্রধান প্রধান পোষক শাখা নদীগুলি আসিয়া মিলিত হয় নাই। এই সকল শাখা-নদী হিমালয়ের সমস্ত ৩৭৫ ক্রোশ আয়তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ইহার মধ্যে যে সকল শাখা-নদী গাজিপুরে আসিয়া মূল নদীর সহিত মিশিয়াছে তাহারা ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর ৭৫ ক্রোশ আয়তনের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। গাজিপুরের নিম্ন স্থানে, উত্তর হইতে ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, কুশী ও তিস্তা এবং দক্ষিণ হইতে বৃহৎ সোন নদ আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হিমালয়ের যে অবশিষ্ট ৩০০ ক্রোশ রহিল—সেই তিন শত ক্রোশের মধ্যেই ঘর্ঘরার অধিক প্রাদুর্ভাব। অতএব গাজিপুর দিয়া যে পরিমাণ জল প্রবাহিত হয়—তাহার ৪ কিম্বা ৫ গুণ পরিমাণ জলরাশি গঙ্গা নদী দিয়া সমুদ্রে নিপতিত হয়।

* Major Wilcoxএর গণনানুসারে ব্রহ্মপুত্র দিয়া পৌষ মাঘ মাসে গোয়ালপাড়ায় ১৫০,০০০ ঘনফীট জলরাশি নিঃসৃত হয়। বিভিন্ন ঋতুতে গাজিপুরে জল প্রবাহ সংক্রান্ত যেরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়—সেই নিয়মটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই রূপ আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার জল-প্রবাহের পরিমাণ গড়ে প্রায় সমান। এইটি অনুমান করিয়া লইয়া এবং অত্যুক্তির আশঙ্কা এড়াইবার জন্য, এভেরেস্ট সাহেবের গণনার প্রায় তিন অংশের এক অংশ বাদ দিয়া পণ্ডিতবর Lyell বলেন যে বঙ্গ উপসাগরে এক বৎসরে যে কর্দ্দমরাশি প্রবাহিত হয় তাহার পরিমাণ ৪০,০০০০০ ঘনফীট কিম্বা গাজিপুরের কর্দ্দম-প্রবাহ অপেক্ষা প্রায় ৬।৭ গুণ অধিক। Colonel Strachey গণনা করিয়া বলেন বঙ্গীয় বদ্বীপের যত

* Asiatic Researches Vol XVII P. 466.

খানি অংশ প্রতি বৎসর প্লাবিত হয় তাহা দীর্ঘে ১২৫ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৪০ ক্রোশ—সমস্ত আয়তনে ১০,০০০ বর্গ ক্রোশ। ইহার দক্ষিণের উপসাগর মধ্যে যতখানি স্থান ব্যাপিয়া কর্দ্দম প্রক্ষিপ্ত হয় তাহার আয়তন ২২,৫০০ বর্গ ক্রোশ—এই দুইটি অঙ্ক যোগ করিলে ৩২,৫০০ বর্গ ক্রোশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই ৩২৫০০ বর্গ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া উক্ত মহা-নদীদ্বয়ের কর্দ্দমরাশি প্রসারিত হয়। মনে কর যদি এই মর্দ্দম রাশির নিরেট অংশ ৪০০,০০০ Cubic feet হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত ভূমির-আয়তন এক ফুট ঊর্দ্ধে উঠাইবার জন্য—৪৫ ৩/১০ বৎসর কাল ক্রমাগত মৃত্তিকা-সঞ্চয়ের আবশ্যক কিম্বা ৩০০ ft ভূমি উঠাইবার জন্য ১৩,৬০০ বৎসর আবশ্যক হয়। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে [আমরা] দেখিয়াছি যে কলিকাতায় কূপ খনন-যন্ত্রে নদী-স্তর যত দূর পর্য্যন্ত বাস্তবিক খনন করা হইয়াছিল তাহার গভীরতা ৩০০ ft অপেক্ষা অনেক অধিক।

যাহা হউক এই বদ্বীপ ভবিষ্যতে কি পরিমাণে অগ্রসর হইবে, তাহা কখনই উপরোক্ত তথ্যগুলি হইতে নিরূপণ করা যায় না—এবং এই সমস্ত ভূমি সমভাবে থাকিবে কিম্বা কালে সমুদ্রের স্থান অধিকার করিবে তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। ইদানীন্তন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের পর্য্যবেক্ষণে এই আশ্চর্য্য সত্যটি প্রকাশ পাইয়াছে যে, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল, Scandinavia দেশ এবং প্রশান্ত সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ যেরূপ এক দিকে ধীরে ধীরে অলক্ষিত ভাবে উন্নত হইতেছে—সেইরূপ পক্ষান্তরে গ্রীনল্যাণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশ সকল ক্রমশ অধোগত হইতেছে। গ্রীনল্যাণ্ডের ন্যায় যদি আমাদের এই প্রদেশে অধোগতি ক্রিয়া চলিতে থাকে তাহা হইলে ১৩,০০০ বৎসরের পর বঙ্গ উপসাগর এক্ষণকার অপেক্ষা গভীর হইলেও হইতে পারে। Lyell বলেন, যদি প্রতি শতাব্দিতে বঙ্গীয় বদ্বীপ ১ফীট ৩ ইঞ্চ করিয়া বসিয়া যায়—[এত অল্প পরিমাণ যে বঙ্গবাসীরা তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিবে না]—তাহা হইলে উক্ত মহানদীদ্বয় তদীয় বদ্বীপের সীমা পরিবর্দ্ধনের যতই চেষ্টা করুক না কেন, ঐ পরিমাণ অধোগমনে যথেষ্ট প্রতিবিধান ও প্রতিক্রিয়া সাধিত হইবে। এই বঙ্গীয় বদ্বীপে নদীগত মৃত্তিকা প্রবাহের শক্তি অপেক্ষা, ভূমির অধোগমন রূপ বিরোধী শক্তি যে অধিকতর প্রবল, তাহার নিদর্শন "অতলস্পর্শের" অস্তিত্বেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কলিকাতার খনন-ক্রিয়ায় তাহা সপ্রমাণ হয়। এই জন্যই বঙ্গভূমি উন্নত হইতে সমর্থ হয় না, এবং এই জন্যই বঙ্গ উপসাগরের অধিকাংশ, কর্দ্দমরাশিতে পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু কালে উন্নমন কি অধোগমন কোন্ শক্তিটি বঙ্গদেশে প্রবল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

সেক্সপিয়রের নায়িকা-কল্পনা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মহাকবি সেক্সপিয়রের নানা স্থল উদ্ধৃত করিয়া গতবারে আমরা দেখিয়াছি যে সেই মর্ম্ম-উৎসারিত লজ্জা, যাহা রমণী-সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ উপকরণ, তাহা সরস্বতীর ইংলণ্ডীয় বর-পুত্রের নায়িকা-মণ্ডলে অতি বিরল। কি সুশিক্ষিতা, কি "অশিক্ষিতা," তাঁহার সকল নায়িকাতেই পুরুষোচিত মুক্তকণ্ঠতা এত দূর প্রবল, যে তাহাতে তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে। আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে সরল-স্বভাবা মিরাণ্ডা, ফুল বিহারিণী পরডিটা, তেজস্বিনী হরমাইয়োনী, শুচিতুরা রোজালিণ্ড, একাগ্রমনা জুলিয়েট, প্রেম-মুগ্ধা অফিলীয়া, সর্ব্বত্যাগিনী ডেস্‌ডিমোনা, পিতৃ-বৎসলা কর্ডিলীয়া, আমাদের স্নেহের সামগ্রী, ভালবাসার সামগ্রী, ভক্তির সামগ্রী—কেহ বা আমাদের পূজারও সামগ্রী। নানা গুণে তাহারা বিভূষিত বলিয়া আমরা তাহাদিগের দোষ অনুসন্ধান করিতে কখন ভ্রমেও সঙ্কল্প করি না,—কখন ভ্রমেও সে রূপ কৌতূহল জন্মায় না। কিন্তু স্থির-চিত্তে ও বিষয় অনুধাবন করিলে দেখিতে পাই যে তাহাদের গুণে কি যেন একটি অভাব আছে,—কি একটি যেন "নাই—নাই" মনে হয়, সেই অভাব-নিবন্ধন তাহাদের সকল গুণের কি একটি যেন পাপড়ী ঝরিয়া গেছে। বিশেষ প্রবিধান করিলে বুঝা যায় যে তাহাদের লজ্জার ভাব হয় একেবারেই নাই, অথবা স্থল-বিশেষে লজ্জার কেবল আভাস মাত্র আছে। যদি কেহ বলেন যে লজ্জাতে প্রকৃত সরলতার কেবল বিঘ্ন হয়,—লজ্জা কেবল ছলনার আবরণ ও চাতুরীর আড়ম্বর, আমাদের মতে কেবল অঙ্ক শাস্ত্র ও প্রতি বৎসরের "নূতন পঞ্জিকা" ব্যতীত কাব্য-শাস্ত্র কখনই তাঁহার স্পর্শ করা উচিত নহে। প্রাকৃতিক অনেক পদার্থে, মানসিক অনেক ভাবে, হৃদয়ের অনেক উচ্ছ্বাসে এমন একটি অনির্দ্দিষ্ট—সূক্ষ্ম, প্রগাঢ়, অথচ স্বপ্নময় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য গভীর ভাবে নিহিত আছে যে তাহা অনুভব করা সকলের সাধ্য নাই, সকলের সৌভাগ্যে নাই। বর্ষাকালে গভীর রাত্রে বিদ্যুৎ-বজ্র সমাকীর্ণ বৃষ্টি-ধারা মুষলধারে পড়িতে দেখিয়া একজন কৃষক হয়ত বলিবে যে "এবারে ধান্য অত্যন্ত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইবে;" একজন শরীর-তত্ত্বজ্ঞ হয় ত বলিবেন যে "এই বিদ্যুৎপাতে বায়ু অত্যন্ত পরিষ্কৃত হইবে;" কিন্তু সেই নিশীথ নিস্তব্ধতা-ভঙ্গকারী মেঘ-গর্জ্জনে, সেই

দিগন্ত-বিহারিণী বিজলী রঙ্গে, সেই অজস্র বৃষ্টি-ধারায় কি যে এক মোহ-মন্ত্র, কি যে এক স্বপ্নের আভাস, কি যে এক কল্পনাময় মাধুর্য্য নিহিত আছে তাহা কেবল অনুভবের সামগ্রী, বর্ণনার সামগ্রী নহে।—সে মাধুর্য্য ন্যায়-শাস্ত্রে সমর্থন হয় না, অঙ্কশাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ করা যায় না, তর্কবিতর্কে সিদ্ধ করা অসম্ভব। সেই রূপ রমণী-চরিত্রে লজ্জার সুষমা বর্ণনার পদার্থ নহে, তর্কবিতর্কের পদার্থ নহে, তাহা কেবল অনুভবের বিষয়,—ভোগের বিষয়—স্বপ্নের বিষয়। যদি এ বিষয়ে কাহারো দার্শনিক কৌতূহল নিতান্তই পরিতৃপ্ত করিতে হয়, ত আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, লজ্জা সাহসের বিরোধী বলিয়াই রমণী-মাধুর্য্যের একটী প্রধান উপকরণ। সাহসিক মুক্তকণ্ঠতা নিতান্ত পৌরুষিক, বিশেষতঃ প্রেমের বিষয়ে তাহাতে কতকটা অরমণীয় ভাব আছে। কারণ, মর্ত্ত্য লোকের প্রেমের অরুণ-আভা-সেও শরীরের ঈষৎ ছায়া পড়ে, সেই ছায়া-মাত্রটীর স্বপ্নময় অনুভবে রমণী-হৃদয় আপনাআপনি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে—সেই দুর্ব্বলতা প্রকাশের আশঙ্কায় রমণী-হৃদয় আপনাআপনি জড়সড় হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ প্রেমের প্রথম প্রহরে, যখন প্রণয়ী প্রণয়িনীর পরস্পরের মন জানা-জানি হয় নাই, যখন প্রণয়িনী "প্রজ্বলিত অনুরাগে" জ্বলিয়াও প্রতিদানের আশা রাখিতেও তাহার সাহস হয় না, তখন প্রেম-রূপ কমল-কলি লজ্জার সুকুমার কিস-লয়ে আবৃত থাকে,—ক্রমে কুসুমকলি যতই ফুটন্ত হইবার উপক্রম হইতে থাকে, ততই সেই কিসলয় অপসারিত হইয়া যায়, এবং অবশেষে সেই প্রস্ফুটিত কুসুমের রক্তদেহে এলাইয়া পড়ে। এ কথা বাল্মীকি হইতে জয়দেব পর্য্যন্ত সকলেই জানিতেন, বুঝিতেন, ও কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইংলণ্ডীয় মহাকবিতে এ বিষয়ে ততদূর সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিতে পাই না। প্রণয়ের প্রথম উদ্রেকের অপরিহার্য্য যে লজ্জা, তাহা তিনি স্বীয় বিশ্বব্যাপিনী প্রতিভা বশতঃ জানিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা তিনি জ্ঞানে জানিতে পারিয়াছিলেন মাত্র—হৃদয়ে অনুভব করিতে পারেন নাই। আমরা যে বলিয়াছি যে, লজ্জাই মুকুলিত প্রেমের অপরিহার্য্য সঙ্গিনী, তাহা সেক্সপীয়রের দ্বারাই প্রমাণ করিতে সঙ্কুচিত নহি, কিন্তু সেই সেক্সপীয়রের দ্বারাই ইহাও প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি, যে তিনি সে লজ্জার মর্ম্মগত সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়েন নাই বা হইতে পারেন নাই। উল্লিখিত প্রসিদ্ধ সমালোচক (১) বলিয়াছেন যে "মিরান্দা সংস্কার-শূন্যা, সৌকিক লজ্জা কি তাহা জানে না"—একথা আমরা স্বীকার করি না। "সংস্কারশূন্যা" মিরান্দা প্রখ্যাত-নামা সমালোচকের অপেক্ষাও জানিতেন "লৌকিক লজ্জা" কাহাকে বলে। যখন

১ শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ সমালোচন—১৩১ পৃষ্ঠা।

মিরান্দা ও ফরদিনান্দ্ দুইজনে বিজনে প্রেমালাপের সুবিধা পাইল, যখন "সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দা স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইল, তখন মিরান্দা ফরদিনান্দ্‌কে এই বলিলেন যে (২) "আমি আমার নিজের অযোগ্যতা ভাবিয়াই কাঁদিতেছি! কারণ, আমি আমার অযোগ্যতা ভাবিয়া আপনাকে সেই ভালবাসা দিতে সাহস করিতেছি না, যে ভালবাসা আপনার নিকট হইতে না পাইলেই আমার মৃত্যু অপরিহার্য্য।—কিন্তু ইহাও ত সামান্য কথা, তা' ছাড়া যতই আমার ভালবাসা আপনাআপনি লুকাইতে চেষ্টা করিতেছে ততই তাহা পূর্ণতর অবয়ব ধারণ করিতেছে। অতএব, হে লজ্জাময়ী কপটতা, তুমি আমা হইতে দূরে থাকো, এবং, হে পবিত্র সরলতা! তুমিই আমাকে উত্তেজিত কর!" মিরান্দার এই উক্তিতে স্পষ্ট প্রকাশ হইতেছে যে, "সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দা তিনটি বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন—প্রথম, লজ্জা প্রকারান্তরে কপটতা-মাত্র, দ্বিতীয়, প্রেম ঢাকিতে গেলেই তাহা আরও প্রকাশ হইয়া পড়ে, তৃতীয় "লজ্জাময়ী কপটতার" সহিত "পবিত্র সরলতার" বিশেষ বিরোধ আছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—সংস্কার-শূন্যা মিরান্দা কোথা হইতে এসকল জ্ঞান লাভ করিল? মিরান্দা তিন বৎসর বয়স হইতে পিতার সহিত দ্বীপে আসিয়াছে—তাহার পরে মানব-শূন্য বিজন দ্বীপে বাস করিয়া পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছে। সেই অবস্থায় তাহার সহিত ফরদিনান্দের দেখা হইল—দেখা হইয়া মমতা হইল—মমতা হইয়া দুঃখ হইল,—দুঃখ হইতেই প্রেম হইল। কিন্তু প্রেম হইবামাত্রই কোথা হইতে লজ্জা আসিল? কেনই বা ফরদিনান্দের কাছে মনের কথা খুলিতে গিয়া মিরান্দা বলিল, "রে লজ্জাময়ী কপটতা! আমা হইতে তুমি দূরে থাক!"—লজ্জা যে কপটতাময়ী—এ কথা, এ গূঢ় সত্য, এ মর্ম্মভেদী রহস্য মিরান্দা কেমন করিয়া জানিতে পারিল? এবং "পবিত্র সরলতা" যে লজ্জার বিরোধী—তাহাই বা কেমন করিয়া তাহার "অশিক্ষিত" হৃদয়ে প্রতিভাত হইল?—প্রসিদ্ধ সমালোচকের "অশিক্ষিতা, সমাজ-সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দাতে যত দূর শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার দেখিতে পাইতেছি, এত দূর শিক্ষা ও সংস্কার আমরা স্বর্গবিলাসিনী উর্ব্বশীতেও দেখিতে পাই কি না সন্দেহ—ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে—প্রেমের প্রথম উদ্রেকে লজ্জা রমণী-স্বভাব-সুলভ,—কি সুশিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা,—যে রমণী প্রেম অনুভব করিতে পারে, সে রমণী লজ্জাও অনুভব করে। প্রেমের অরুণ-আভাসে প্রেম লজ্জার অস্ফুট রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইবেই হইবে। মহাকবি সেক্সপীয়ারের বিরুদ্ধে আমরা একথা বলিতেছি বটে, কিন্তু তিনিই আমাদের প্রধান সাক্ষী। শুদ্ধ "অশিক্ষিতা ও সমাজ-সংস্কার-শূন্যা" মিরান্দাতে

২ Tempest. Act III. Scene 1I.

নহে,—সুশিক্ষিতা ও সমাজ-সংস্কার-সম্পন্না ইমোজেন্ ও জুলিয়েটেও তিনি তাহা দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু কি রূপে, তাহা দেখা যাইতেছে—

অজ্ঞাত কুলশীল রোমিয়োর সঙ্গে নৃত্যভূমিতে প্রেম-পূজার পশুপুস-স্বরূপ চুম্বনাদি ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিয়া কুমারী জুলিয়েট রোমীয়োর ধ্যানেই নিমগ্ন হইলেন। এক রাত্রে জুলিয়েট বিরহ-ব্যথায় উৎকণ্ঠিত হইয়া শয্যা হইতে উঠিয়া নিজ ঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড আকাশের দুইটি নক্ষত্রকে মাত্র লক্ষ্য করিয়া রোমিয়োর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে রোমিয়োও প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া সেই বাতায়নতলে উপস্থিত ছিলেন। প্রেম-মুগ্ধ জুলিয়েটের মনোগত সকল কথা শুনিয়া প্রেমময় রোমীয়ো আর আত্ম-গোপন করিতে পারিলেন না,—তিনি সুচতুর ভাবে নিজের পরিচয় দিয়া জুলিয়েটের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।——প্রণয়ী প্রণয়িনীতে দেখা-সাক্ষাৎ হইল—প্রেমের প্রথম আলাপ হইল—মন খোলা খুলি হইল——দুজনেই জানিতে পারিল যে দু জনেই পরস্পরকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসে।—তখন জুলিয়েট্ ইতিপূর্ব্বের স্বগত-উক্ত প্রেমের সকল কথা গুলির উপর লক্ষ্য রাখিয়া রোমীয়োকে বলিতেছে—

"তুমি ত জানিতেই পারিতেছ যে আমার মুখ এই নিশীথের অন্ধকারে আবৃত; তাহা যদি না হইত, ত আমি ইতি পূর্ব্বে যাহা আপনাআপনি বলিতেছিলাম, সে সকল কথা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই শরম-রাগে আমার মুখ রঞ্জিত দেখিতে পাইতে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে আমি লৌকিক প্রথাই অবলম্বন করি, এবং আমার ইতিপূর্ব্বের স্বগত উক্তি সকল অস্বীকার করি। কিন্তু, রে লৌকিক আড়ম্বর! তোর নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম।

* * *

হা প্রশান্ত রোমীয়ো! তুমি যদি সত্যই আমাকে ভালবাস, ত তাহা সরল হৃদয়ে আমার নিকট প্রকাশ কর,—কিন্তু যদি তুমি মনে কর যে এইরূপে তুমি নিতান্ত অল্প আয়াসে আমার হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছ—ত তাহাও সরল হৃদয়ে বল'—কেন না তাহা জানিতে পারিলে আমিও সাধারণ প্রথানুযায়ী তোমার প্রেমের মুক্তকণ্ঠতায় প্রথমে বিরুদ্ধ ভাব দেখাইব, এবং কথাতে তোমার প্রেমের প্রতিদান দিতে কখনই চাহিব না; তাহা হইলেই তুমি আরও আমার মন রাখিবার চেষ্টা করিবে।"*

আমরা আরও বিস্তর উদাহরণ দ্বারা ইহা দেখাইতে পারি, লজ্জা যে রমণী-হৃদয়ের একটি সহজ ও স্বাভাবিক ভাব, তাহা সেক্সপীয়ার বিলক্ষণ জানিতেন। কিন্তু আমরা আবার বলিতেছি যে তিনি সে লজ্জার ইন্দ্রধনুবৎ সুকোমল বর্ণচ্ছটা কল্পনার চক্ষে দেখেন নাই এবং

* Romeo and Juliet. Act II, Scene II.

তাহার মাধুর্য্য মরমের স্তরে স্তরে অনুভব করেন নাই। আমাদের বোধ হয় যে এই লজ্জা যদি সেক্সপায়ারের কল্পনারই পদার্থ না হইল, তবে তাহা তাঁহার জ্ঞানের পদার্থ না হইলেই ভাল ছিল। কারণ, প্রকৃতির একটি অত্যন্ত মধুর ও সুকোমল ভাব জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া যদি আমরা তাহা কল্পনায় ধারণা করিতে না পারি তবে কেবল কষ্টকর ফলই উৎপন্ন হয়; যদিও সেক্সপিয়ার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া কোন রূপ উপহাস করিতে আমাদের হৃৎকম্প হয়, তবুও এ কথা আমরা জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারি না যে রোমিয়োর সঙ্গে জুলিয়েটের যে আলাপ আমরা উপরে উদ্ধৃত করিলাম, তাহা কি প্রেমের বাজারে "দোকানদারীর" মত শুনায় না? যখন জুলিয়েট্ বলিতেছেন, "হে রোমিয়ো! তুমি সত্য করিয়া বল আমাকে ভালবাস কি না? কিন্তু যদি তুমি এমন মনে কর আমাকে বিনা আয়াসে তুমি হস্তগত করিলে, তাহা হইলে প্রেমের প্রাচীন প্রথা-অনুসারে আমিও কপট রোষ প্রকাশ করিয়া তোমার প্রেমের প্রতি প্রতিকূলতা দেখাই। এই রূপ করিলেই তুমি আমাকে সাধ্য-সাধনা করিতে বাধ্য হইবে! কিন্তু তাহা না হইলে, হে মণ্টেগু—সমস্ত পৃথিবীর জন্যও আমি সে সকল কপট আড়ম্বর করিব না।" প্রেমময়ী জুলিয়েটের এই কথাগুলি পড়িতে পড়িতে কি মনে হয়? সকলেই জানেন যে কোন কোন "দোকানদার" এক এক জন "পাড়াগেঁয়ে খরিদ-দারকে" বলিয়া থাকে যে "বাপু! আমি তোমার সঙ্গে কোন দর-দাম্ করিব না,—কেনা দরেই তোমাকে জিনিস্ ছেড়ে দিব, কারণ তুমি আমার বহনীয় খদ্দের!———এতেও যদি তুমি মনে কর যে আমি তোমাকে ঠকাচ্ছি, তা হ'লে বাপু তোমার সঙ্গে আমাকে নিতান্তই দরদাম করিতে হবে,—নিতান্তই কেনা দামের উপর পাঁচসিকে চড়িয়ে বলিতে হবে। নহে ত, এই লও তোমার জিনিষ, ধর্ম্ম সাক্ষী, দরদাম আর আমি করিলাম না।"

এরূপ "দোকানদারী,"—এরূপ সরলতাময় পৌরুষিকতা, এরূপ কষ্টকর মুক্ত-কণ্ঠতা আমাদের চক্ষে নিতান্ত কদর্য্য। পূর্ণমাত্রায় "বেহায়াপী" করিতে গিয়া, আমি যে লজ্জা করিতে জানি, এরূপ হৃদয়-শূন্য জ্ঞানের ভান করা অপেক্ষা, লজ্জা যে কি পদার্থ তাহা জানি না,—এরূপ অজ্ঞতা সহস্র গুণে মধুরতর। এই রূপ মিরান্দাও যখন ফর্দিনন্দের মুখের উপরে বলিতেছেন "রে লজ্জাময়ী কপটতা! আমি তোমাকে চাই না,"—তখন কাহার না মনে হয় যে সরলমতি "অশিক্ষিতা" মিরান্দা যাত্রার সখীদের মত অভিনয় করিতেছে? কাহার না মনে হয়,—মিরান্দা ভাবিতেছে যে লজ্জা-রূপ নৃশংস দানবকে প্রেমের নন্দন-কানন হইতে "জোর-যবরদস্তী" করিয়া তাড়াইতে হইবেই? কিন্তু প্রেমিক রমণী-হৃদয়ের লজ্জার ভাব বাস্তবিক কি রূপ?—কখনই তাহা রাগের পদার্থ নহে,—

বিরক্তির পদার্থ নহে—এমন কি, জলন্ত জ্ঞানেরও পদার্থ নহে। প্রেমের প্রথম উদ্রেকে শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের মুখের দিকেও চাহিতে পারে নাই, উর্ব্বশীর অঞ্চল যখন মাধবী-লতাতে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, পার্ব্বতী যখন ধ্যানমগ্ন মহাদেবের হস্তে ফুল-মালা উৎসর্গ করিতে গিয়াও লজ্জায় "চমকে চমকিত" হইয়া পড়িতেছেন, তখন কি ইহাই মনে হয় না যে দারুণ লজ্জার সময়েও লজ্জার প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের বুদ্ধিতে বিকাশ পাইতেছে না?—

কেহ বলেন যে সেক্সপীয়ারের নায়িকারা লৌকিক আড়ম্বরের অধীনা নহে বলিয়াই তাহাদের মুক্তকণ্ঠতা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জনীয় ও মধুর। কিন্তু তাহার উত্তরে আমরা এই কথা বলি যে লৌকিক আড়ম্বরের সঙ্গে স্বাভাবিক বিনয় ও লজ্জাশীলতার কোন সম্পর্কই নাই।—যদি বল যে "স্বাভাবিক বিনয় বা লজ্জাশীলতা" ব্রহ্মাণ্ডে নাই, তাহা হইলে আমরা এই বলিয়া উত্তর করি যে সেক্সপীয়ার নিজেই সে বিষয়ে সাক্ষী দিলে প্রকাশ হইবে যে, প্রেম ও লজ্জা এক সূত্রে চির দিন আবদ্ধ। আমরা সমস্ত সেক্সপীয়ারে ইহাই দেখিতে পাই যে সেক্সপীয়ার জানিতেন, প্রেম ও লজ্জা এক বৃন্তে দুইটি পদ্মের মত সমান প্রস্ফুটিত হয়,—একটি যেমন স্বাভাবিক, অন্যটিও তেমনি স্বাভাবিক;—কিন্তু সেক্সপীয়ার কেবল দেশ-কালের অধীন হইয়া, সেই সময়ের সামাজিক ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া, তিনি স্বীয় প্রতিভার নির্দ্দিষ্ট স্থল হইতে এবং স্বীয় কল্পনার অধিকৃত স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, নহিলে মিরাণ্ডা, জুলিয়েট্, ওলিভিয়া, জুলিয়া ইত্যাদি নায়িকামণ্ডলে কেনই বা তিনি রমণী-লজ্জার ঈষৎ আভাস তুলিয়া, পরক্ষণেই ঘোর পৌরুষিক কঠোরতায় তাহা পরিণত করিয়াছেন?—মহাকবি সেক্সপীয়ার জানিতেন যে রমণীমণ্ডলে লজ্জা বলিয়া একটি সুকোমল সামগ্রী আছে, অথচ তিনি জানিয়াও জানিতেন না যে রমণী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় তাহাই একটি অপরিহার্য্য উপকরণ;—তিনি জানিতেন যে কি স্ত্রীলোকে, কি পুরুষে,—উভয় সম্প্রদায়েই আমরা লজ্জাশীলতা না দেখিতে পাইলেও অন্য অন্য উন্নততম গুণরাশি দেখিয়াই বিমুগ্ধ হইতে পারি—তিনি জানিতেন যে একজন স্ত্রীলোক-নেপলীয়ন বা স্ত্রীলোক-সক্রেটীস পৌরুষিক নেপোলীয়নত্ব ও সক্রেটীসত্ব রক্ষা করিয়া আমাদের প্রশংসার, ভক্তির, আদরের সামগ্রী হইতে পারেন; কিন্তু স্ত্রীলোকে এবং পুরুষে লজ্জা-বিষয়ে যে প্রকৃতিগত প্রভেদ, তাহা সেক্সপীয়ারের হৃদয়ে সূক্ষ্ম রূপে কখনই প্রতিভাত হয় নাই। একটি উদাহরণেই আমরা সমস্ত দেখাইতে পারি।

রোমিও ও জুলিয়েটে, জুলিয়েট্ যাহা প্রাচীর-উল্লঙ্ঘন-কারী লম্পট রোমীয়োকে বুঝাইবার জন্য এতদূর কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, প্রেম-পাগলিনী শকুন্তলা তাহা দুষ্মন্তকে কি ভাবে বুঝাইয়াছি

লেন? যখন দুষ্মন্ত বলিতেছেন যে "আমাদের কথায় শকুন্তলা যোগ দিতেছেন না, অথচ আমি কথা কহিলেই তিনি যে অনন্যমনা হইয়া আমার কথাই শুনিতে থাকেন;—নিজ অঙ্গভঙ্গীর উপর কোন শাসন-প্রমাদ না ঘটাইয়াও তিনি যে আমার পানেই ক্রমাগত চাহিয়া আছেন—ইহাই কি প্রেমের চিহ্ন নহে?" (১)

"——এই যে শকুন্তলা সকল কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াও কিছুই বলিতে পারিতেছেন না,—এই যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাবের দ্বারা মর্ম্মের গভীর অথচ সরল সত্য সকল অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞাপিত করা,—শকুন্তলার এই যে "বলি-বলি-আর-বলা-হ'ল-না"—রূপ লজ্জার আভাসটুকু জ্বলন্ত অক্ষরে প্রকাশ করা,—ইহা যতদূর মধুর, জুলিয়েটের "দোকানদারী" কি ততদূর মধুর? আরও যদি দেখিতে চাও ত দেখ! দুষ্মন্ত রাজা বিরহ-কাতরা শকুন্তলার হস্তে মৃণাল-বলয় পরাইতে পরাইতে বলিতেছেন—(২)

দুষ্মন্ত।—কি চমৎকার কোমলতা! এই সুন্দর হস্তদ্বয় পুনর্জ্জীবিত কমললতার মত আবার বিগতশ্রী ও শক্তি ধারণ করিয়াছে, অথবা ইহা কন্দর্পের মত হর-কোপানলে দগ্ধ হইয়া আবার দেবতা-বর্ষিত অমৃতে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছে।

শকু। শীঘ্র শীঘ্র, আর্য্যপুত্র, আমাকে এই মৃণাল-বলয় পরাইয়া দাও।

এই "আর্য্যপুত্র" রূপ সম্বোধন শুনিয়া দুষ্মন্ত যে পুলকিত চমকিত, আহ্লাদিত—হইলেন, তাহার অর্থ কি?—আর, স্বামীর প্রতি প্রযোজ্য "আর্য্যপুত্র" সম্বোধনটি যে শকুন্তলা ব্যবহার করিলেন, তাহারই বা অর্থ কি?—যে কেহ কালিদাসের শকুন্তলা পাঠ করিয়াছেন তাহার মনে ইহা প্রতিভাত হইবেই হইবে যে এই মর্ম্ম-প্রকাশক "আর্য্যপুত্র"—সম্বোধনটী শকুন্তলা ভাবিয়া, গুছাইয়া, ছলনা করিয়া ব্যবহার করেন নাই। এই সম্বোধনটি অন্যমনস্কে—সহসা—মর্ম্মের উচ্ছ্বাস-ভরেই লজ্জাশীলা শকুন্তলা বলিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু কেন?—শকুন্তলা মনে মনে দুষ্মন্তের চরণে হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছিল, মনে মনে দুষ্মন্তের আশা-অনুরূপ ভালবাসার প্রতিদানে এতদূর আশ্বাসিত হইয়াছিল, এতদূর দুষ্মন্তের প্রণয়িনী রূপে তাঁহার সঙ্গে "একপ্রাণ" হইয়া পড়িয়াছিল যে দুষ্মন্তকে এক দণ্ডের জন্যও নিকটে পাইয়া আর দুষ্মন্তকে "পর" ভাবিতে পারিল না—সেই জন্য সহসা—অন্যমনস্কে—উৎসারিত হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসে, অজ্ঞাতসারে দুষ্মন্তকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া ফেলিয়াছিল।——ইহাতে ছলনা নাই—দোকানদারী" নাই—লজ্জার চতুর আড়ম্বর নাই—প্রচলিত প্রেমের সূক্ষ্ম "কারুগিরি" নাই—বিনা-আয়াসে মুগ্ধা শকুন্তলার মুখ হইতে ঐ কথা যেন

১ শকুন্তলা ৩য় অঙ্ক।

২ এই অংশটুকু কুন্তলার কোন কোন মুদ্রাঙ্কনে দৃষ্ট হয় না। সং

লজ্জাকে প্রবঞ্চনা করিয়া নির্গত হইয়া পড়িয়াছে। এই স্থলেই আমরা নৈসর্গিক জগতের উপরে হৃদয়-জগতের প্রাধান্য—ঘটনার উপর ভাবের প্রাধান্য, মাটীর উপর আত্মার প্রাধান্য দেখিতে পাইতেছি।—কিন্তু এই প্রাধান্য কালিদাস বুঝিয়াছিলেন, সেক্‌সপিয়র পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই।

অন্য অন্য অনেক বিচক্ষণ সমালোচক সেক্‌সপীয়ারের নায়িকামণ্ডলের সপক্ষ হইয়া আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে লজ্জা, কি সুশিক্ষিতা এবং কি অশিক্ষিতা, সকল রমণীর স্বভাবসিদ্ধ হইলেও, অবস্থা-বিশেষে তাহা সকলের থাকে না স্ফূর্ত্তি পায়। তাঁহারা বলেন, প্রেমেও যে মিরান্দার লজ্জা স্ফূর্ত্তি পায় নাই, তাহার কারণ এই যে, শকুন্তলার মত সেই বিজন দ্বীপে মিরান্দার এমন কোন সখীই ছিল না, যাহার সমুখে মিরান্দা লজ্জা করিতে পারে। সুতরাং ফরডিনণ্ডকে "মনের মানুষ"-রূপে পাইয়া মিরান্দা অবাধে মুক্তকণ্ঠ হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে লজ্জা যদি স্বভাবসিদ্ধই হইল, তাহা হইলে, মিরান্দার বৃদ্ধ পিতা অপেক্ষাও কি শকুন্তলার সখীদ্বয় লজ্জাস্ফূর্ত্তির বিশেষ কারণ হইতে পারে? বৃদ্ধ প্রস্পেরো যখন ফরডিনণ্ডের প্রতি মিরাণ্ডার অনুরাগ দেখিয়া তিরস্কারছলে তাহাকে বলিলেন যে "এই ফরডিনণ্ডকে অন্য সকল লোকেদের সঙ্গে তুলনা করিলে, তাহাকে কুৎসিত কদাকার ক্যালিবানের মত বোধ হইবে, এবং সেই জন্য সকল লোককে দেবতা বলিয়া প্রতীতি জন্মাইবে," তখন মিরান্দা উত্তর করিল যে "তা হোক্—আমার অনুরাগ তাহা হইলে নিতান্ত বিনীত এবং অতি অল্পেই সন্তুষ্ট, কারণ ফরডিনণ্ড অপেক্ষা আমি আর সুন্দরতর পুরুষ দেখিতে চাই না।" আজন্মসহচরী সখীদের কাছেও শকুন্তলা প্রেমের প্রথম উদ্রেকে এত দূর মুক্তকণ্ঠ হইতে সাহস পায় নাই। আর ফরডিনণ্ডের সমুখে মুক্তকণ্ঠ হইবার কথা সমালোচকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ত নিতান্ত অসার। এক জন প্রণয়িনী তাহার চির-বিশ্বাসী সখীর কাছে প্রেমের যে কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারে, সে কথা তাহার প্রণয়ীর কাছে সহজে কখনই বলিতে পারিবে না। প্রণয়িনীর মনের ভাব অবগত হইয়া সখীরা নিতান্ত পক্ষে উপহাস করিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রণয়ী হয় ত তাচ্ছিল্য করিতে পারে—বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারে—এমন কি, ঘৃণা পর্য্যন্ত করিতে পারে। এই সকল তীব্র আশঙ্কা স্বয়ং প্রকৃতি দেবীই রমণী-হৃদয়ে নিহিত করিয়া রাখেন। রমণী-হৃদয়ের এই গূঢ় রহস্যটী সংস্কৃত কবিরা বিলক্ষণ জানিতেন—এই জন্যই শকুন্তলার মনের ভাব দুষ্মন্ত জানিবার অগ্রে অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা জানিতে পারিয়াছিল, এইজন্যই উর্ব্বশীর চিত্রলেখা, মালতীর লবঙ্গিকা ও রত্নাবলীর সুসঙ্গতা সর্ব্বাগ্রেই স্ব স্ব সখীদের প্রেমের স্ফূর্ত্তি বুঝিতে পারিয়াছিল।

অন্য আর এক সম্প্রদায়ের সমালোচকেরা

বলেন যে মিরান্দা ও ফরডিনও, রোমীয়ো ও জুলীয়েট ইত্যাদি প্রায় সকল নায়ক নায়িকা প্রায় সমান পদবীগত, সুতরাং পদবীর তারতম্যে যে লজ্জা ও ভয়ের উদ্রেক হওয়া সম্ভব, তাহা তাহাদের মধ্যে আর ঘটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু কালিদাস মর্ত্ত্যের পুরূরবার সহিত স্বর্গের অপ্সরার প্রেম-বর্ণনায় ও ভবভূতি সমান পদবীগত মালতী-মাধবের প্রেম বর্ণনায় ঐ স্বভাবসিদ্ধ লজ্জার একটি পাপড়ীও খসাইয়া ফেলেন নাই। প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর পদবীর তারতম্যে প্রেমের প্রতিদান-বিষয়ে ভয়ের ও আশঙ্কার তারতম্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত লজ্জার সঙ্গে তাহার কি সম্পর্ক?

আর এক সম্প্রদায়ের সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে সেক্সপীয়ারের নায়িকাদের প্রেম এতদূর প্রচুর ও প্রবল যে তাহা লজ্জার "আধা-বাধা" অতিক্রম করিয়া পূর্ণ উচ্ছ্বাসে রসনায় উৎসারিত হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে সেক্সপীয়ারের নায়িকাদের অপেক্ষা যে, কালিদাস বা ভবভূতির নায়িকারা সহস্রগুণে অধিক মাত্রায় প্রেমে উন্মত্ত, তাহা কি কেহই অস্বীকার করিতে পারেন? যদি ত্যাগ-স্বীকার প্রেম-প্রাচুর্য্যের জলন্ত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে সেক্সপীয়ারের কোন্ নায়িকা প্রেমের আশায় পার্ব্বতীর মতন যৌবনে যোগিনী হইয়া দারুণ কঠোর ব্রত-সাগরে আপনাকে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল? তাঁহার কোন্ নায়িকা উর্ব্বশীর মত স্বর্গের অনন্ত সুখ-সচ্ছন্দতা প্রায় ইচ্ছাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া মর্ত্ত্যে থাকিতে অভিলাষিণী হইয়াছিল? তাঁহার কোন নায়িকা রত্নাবলীর মত লজ্জার ভয়ে, অথচ প্রেম-প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন মৃত্যুর হস্তে আপনাকে উৎসর্গ করিতে গিয়াছিল? জুলিয়েটের মৃত্যুর কথা ত আমরা জানি; কিন্তু জুলিয়েট্ কখন্ আত্মহত্যা করিয়াছিল?

ক্রমশঃ